গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

সূচীপত্র

পূর্ব পুরুষ

উপক্রমণিকা

নিভার চিঠি পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অথচ মন খারাপ হবার কথা নয়। খুশী না হোক, নিশ্চিন্ত হবার কথা। আর, যার সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে—তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া মানেই তো খুশী হওয়া। তবু কে জানে কেন, মনটা অনেকক্ষণ ধরেই কেমন ভার-ভার হয়ে রইল, কোথায় যেন একটা বেদনাবোধ খচখচ করতে লাগল—অকারণেই। হেমন্ত মার মৃত্যুতে শোক করার কোন কারণ নেই, শোক করবার মতো কেউ বেঁচেও নেই আর—আমি তো পরস্যাপি পর—তথাচ, কেন জানি না, চিঠিখানা পাবার পর থেকে কী একটা বিষণ্নতা পেয়ে বসল আমাকে।

আর সেটা, ক'দিন ধরে, অসংখ্য কাজের মধ্যে, সহস্র কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে বার বারই অনুভব করতে লাগলুম। খুব ছোট্ট মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে থাকলে যেমন একটু বেদনা-বোধ হয়—তেমনিই। তাতে কাজ আটকায় না, তার জন্যে ব্যস্ত হতে হয় না, তবু একটু খচখচানি, একটু অস্বস্তি-বোধ হতেই থাকে।

হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। অনেকদিন কোন খবর পাই নি। মানে নিই নি। হেমন্ত মা কেমন আছেন কে জানে, এখনও কি বেঁচে আছেন? এতদিনও? বেঁচে থাকা মানে আরও দুর্গতি, কিন্তু বুড়ির যা কপাল—অত সহজে কি মরবে?

নিভাদের কাছে ছিলেন এটা জানি। অন্তত শেষ যা খবর পেয়েছি। নিভাদের ঠিকানা একবার দিয়েও ছিলেন আমাকে—সে-ই শেষ চিঠি তাঁর—অবশ্যই সেটা যত্ন ক'রে রাখি নি। আছে কোথাও, তবে কোথায় তা মনে পড়ল না অনেক ভেবেও। নিতান্ত আন্দাজে আন্দাজেই একটা চিঠি দিয়েছিলুম। দৈবক্রমে সেটা ওদের কাছে পোঁচেছে। তারই জবাবে খবরটা দিয়েছে নিভা।

হেমন্ত মা মারা গেছেন—গত ডিসেম্বরে।

এবারের শীতের ধাক্কাটা আর সামলাতে পারলেন না। মাত্র তিন-চারদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে গেল। তবে—সত্যি সত্যিই যে এত টপ ক'রে মারা যাবেন উনি—ওরা বুঝতে পারে নি, তাই কোন খবর দেবার চেষ্টা করে নি। দিলেও অবশ্য লাভ হত না। অকারণে ব্যস্ত হওয়া ও ব্যস্ত করা সার হত। তার পরও, নানা কারণে বিব্রত ছিল বলে মৃত্যু-সংবাদটাও দিতে পারে নি। আমি যেন কিছু মনে না করি। ইত্যাদি—

মনে করার কিছু নেই। নিভা ওঁর ভাইঝি—কিন্তু সে খুব নিকট সম্পর্ক নয়। নিভার বাবা হেমন্ত মার পিসতুতো ভাই হতেন, তাও আপন কিনা সন্দেহ। সে তুলনায় ওরা যা করেছে—ঢের করেছে। এতখানি ঝক্কি নিকট-আত্মীয়রাও নেয় না। শেষের দিকে অথর্ব নয়, একেবারে অশক্তই হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না, প্রাকৃতিক-কৃত্যও ঘরের মধ্যে নর্দমার ধারে সারতে হত। নিভার অবস্থাও এমন ভাল নয় যে, একটা আলাদা ঝি-চাকর রেখে দেবে ওঁর জন্যে। যা কিছু করতে হয়েছে নিজেদেরই।

সাধারণ গৃহস্থ ঘরে বিয়ে হয়েছিল নিভার, কুষ্ঠিয়ার কাছে এক গ্রামে। ওরই মধ্যে একটু সচ্ছল সংসার ছিল ওদের। তবে সে সবই জমিজমার আয়ের ওপর নির্ভর। অর্থাৎ চাষী-গৃহস্থ ঘর—নগদ টাকা-পয়সা খুব বিশেষ ছিল না, তাই স্বাধীনতার পরও বছর-দুই সেখানেই পড়ে ছিলেন ওর স্বামী-শাশুড়ি। কে তাঁদের বুঝিয়েছিল যে, নদীয়ার ঐ অংশটুকু এধারের সঙ্গে জুড়ে দেবে। ফলে যখন চলে আসতে হল তখন কিছুই প্রায় নিয়ে আসতে পারলেন না। ব্রাহ্মণের ঘর—গুরুবংশ, বাসনকোসনই ছিল নাকি দু' সিন্দুক বোঝাই। তবু, শেষ মুহূর্তে এই জমি বদলের ব্যবস্থাটা হয়ে গিয়েছিল তাই রক্ষে। যা ফেলে এসেছেন তার তুলনায় অনেক কম, গ্রাসাচ্ছাদনটা চলে যাচ্ছে, এই পর্যন্ত। বাড়িও একটা পেয়েছেন, পাকাবাড়িই।

তাও—এ বাজারে কষ্টই হত—যদি না নিভার স্বামী এখানে এসে একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিতে পারতেন। স্থানীয় গ্রামের ইস্কুলে নিচের দিকে মাস্টারী—তবু তাতেই কিছুটা সামলে নিতে পেরেছিল ওরা। এখন অবশ্য নিভার সব ছেলেই চাকরি-বাকরি করছে, তেমনি প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে—ছেলেপুলেও। অর্থাৎ নিজস্ব সংসার এক-একটি।

সে হিসেবে, ওদের অবস্থার তুলনায় যা করেছে যথেষ্টই বলতে হবে।

তা নয়, আমি ভাবছি হেমন্ত মার কথা।

সেই মানুষ! কী প্রতাপই না ছিল!

ওঁকে দেখলে ভাবাও যেত না যে, কোনদিন বাংলদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে সাধারণ গৃহস্থবাড়িতে—অসহায় পরের গলগ্রহ হয়ে পড়ে থেকে—সবার অগোচরে একদিন এমনভাবে নিঃশব্দে বিদায় নেবেন। মনে হত উনি যেদিন চলে যাবেন সেদিন একটা ইন্দ্রপাত হবে। জীবনেও যে তেজ ছিল মৃত্যুতেও সেই তেজেরই আর একটা বিকাশ দেখতে পাবে সকলে। দাপট যেমন ছিল, তেমনি শক্তিও। নব্বুই বছর বয়সেও জোয়ান হিন্দুস্থানী মুটেকে একটা চড় মারলে সে ঘুরে পড়ে যেত। ঐ লোক যে এমন অসহায় পঙ্গু হয়ে পড়বেন কোনদিন, তা ওঁকে দেখলে ধারণাও করা যেত না। যেমন শক্তি তেমনি মনের বল। কখনও কারও এতটুকু সাহায্য নিতেন না। কারও কাজ পছন্দও হত না। শুধু স্বাবলম্বী নয়, শৌখীনও ছিলেন যথেষ্ট। জামা-কাপড় বিছানা-মাদুর ধপধপ করত, ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার ঝকঝক করত। নিজে-হাতে ঝাড়ামোছা করতেন প্রত্যহ, এতটুকু ধুলো কি ঝুল কোথাও জমবার অবসর পেত না। বিছানার চাদর টান ক'রে গোঁজা না থাকলে শুতেন না।

সেই মানুষের এই হাল!

তীর্থে মৃত্যুর খুব শখ ছিল মহিলার। তীর্থে ছিলেনও বহুদিন। অনেক ঘুরে দেখে শেষে কাশীতে এসে বাসা বেঁধেছিলেন।

খুব ইচ্ছা ছিল মণিকর্ণিকা পাবেন। তবে বলতেনও, 'হবে কি? আমার যা কপাল! মরার মতো মরাটাও ভাগ্যের কথা। জপতপ করো কি, মরতে জানলে হয়।' উচ্চারণ করতেন জপো-তপো।

সেই হেমন্ত মাকেই গিয়ে থাকতে হল—থাকতে হল কেন মরতেও হল—একেবারে

অগঙ্গার দেশে। তীর্থ তো নয়ই, কাছাকাছি একটা মন্দিরও আছে কিনা সন্দেহ। নিভাদের বাড়ি একবার গেছিও আমি—ওঁরই পাঠানো কিছু জিনিস পৌঁছে দিতে, শীতের ফসল—বোধহয় বেগুন পেয়ারা ইত্যাদি। মধ্যমগ্রাম স্টেশনে নেমে অনেকটা যেতে হয়, নিতান্তই পল্লীগ্রাম। আমি যখন গেছি তখনও বিজলীবাতি জ্বলে নি ওদের বাড়ি, হয়ত এতদিনে জ্বলে থাকবে। পুরনো মুসলমান জোতদারের বাড়ি, এরা সামান্য সারিয়ে নিয়েছে এই মাত্র। মোটা মোটা মাটির গাঁথুনি দেওয়াল—কেমন স্যাঁৎসেঁতে ভাব—যেটা হেমন্ত মা মোটে দেখতে পারতেন না।

অথচ উপায়ই বা কি? ভাগ্যের দিক দিয়ে যত যা হোক—স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভগবান ওঁকে অনেক দিয়েছিলেন। কিন্তু অফুরন্ত কিছু নয়। শারীরিক শক্তির সীমা আছে, ভীমকেও একদিন অনড় হয়ে পড়ে যেতে হয়েছিল, গাণ্ডীবী ধনুক তুলতে পারেন নি। একশ' বছরেও উনি যদি না মরেন, শরীর আর কি করতে পারে! কত সহযোগিতা করবে সে! তার দোষ দেওয়া যায় না বিশেষ। দোষ ওঁর পরমায়ুরই। নিজেই বলতেন হেমন্ত মা, 'আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বসে আছি বাবা, আমার মৃত্যু নেই। বিধাতাপুরুষ ওটার কথা লিখতে ভুলে গেছেন। মনে হয় মহাপ্রলয়ের দিন মার্কণ্ডর সঙ্গে আমিও জলে ভাসব।'

এখনও তাঁর সেই মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে, দন্তহীন মুখের দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে একরকমের তিক্ত হাসির ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টিতে যেন বিশ্বসংসারের ওপর একটা অবিশ্বাস আর বিদ্রূপ। মুখে যতই যা বলুন, তিনি যে কোনদিন অশক্ত হয়ে পড়বেন তা বোধহয় তিনিও ভাবেন নি। মৃত্যু তো হবেই, একদিন পূর্ণচ্ছেদ টানতেই হবে জীবনে, কিন্তু সে হঠাৎ আসবে—তাই ভেবে রেখেছিলেন।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন—সব দিক দিয়েই। প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল তাঁর, রাগলে জ্ঞান থাকত না, কাউকে পরোয়া করতেন না। মুখ এবং হাত দুই-ই চলত—ক্ষেত্রবিশেষে পা-ও। তবে ইদানীং দিনকাল খারাপ হয়ে পড়েছে বলে পা সম্বরণ করেছিলেন, লাথি-টাথি মারতেন না কাউকে। সে রকম ঘটনা আমি অন্তত দেখি নি। আগে নাকি—মানে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে—তেমন তেমন ত্যাঁদড় রিক্সাওলা কি ডুলিওলাকে তাঁর লাথিও খেতে হয়েছে। তখন অবশ্য তারা কিছু বলতে সাহস করত না, চেনাশোনা লোকেরা তো নয়ই। যারা একটু চিনত বা জানত তারা ওঁকে শ্রদ্ধাও করত খুব। কারণ শাসনও যেমন ছিল তেমনি স্নেহও। স্নেহ বললে হয়ত ভুল হবে—করুণা। কারও অসুখ করেছে কিংবা কেউ বিপদে পড়েছে শুনলে সে পক্ষ থেকে অনুরোধ-আমন্ত্রণের অপেক্ষা করতেন না—কী জাত কিংবা কোন্ দরের লোক তাও বিচার করতেন না। অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে সেবা করতেন, বুক দিয়ে গিয়ে পড়তেন।

তবে, আতুর বা বিপন্ন লোকেরও বেচাল দেখলে মুখ ছোটাতে কসুর করতেন না। তাঁকে দেখলে মনে হত—একমাত্র আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যায়। কখন অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে, কেঁপে উঠবে তার চারপাশের মাটি—তা কেউ বলতে পারে না।

সেই লোক অসহায় পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলেন—কোথায় এক প্রায়-পর পরিবারের করুণা ও বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রে! প্রথম যখন নিভাদের বাড়ি আসেন তখন অশক্ত হয়ে

পড়লেও একেবারে অনড় হন নি—বসে বসে ওদের সংসারে আড়াইসের ডালের বড়ি দিয়েছেন একহাতে বেটে ফেনিয়ে—এক এক বেলায়। উনিই লিখেছিলেন আমাকে, বোধকরি তার মধ্যে একটু আত্মপ্রসাদ কিংবা আশ্বাস ছিল যে, একেবারে পরনির্ভরশীল হন নি তিনি। তবে সে বেশীদিন নয়। অতকাল পশ্চিমে বাস ক'রে এসে এখানের এই ভিজে নোনা মাটি তাঁর সহ্য হয় নি, বছরখানেক পরেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন।

কে জানে—তখনও তাঁর ক্ষুরধার রসনা তেমনি অগ্ন্যুদ্গীরণ ক'রে গেছে কিনা! মনে হয়, না। ক্রোধও তাঁর যেমন ছিল প্রচণ্ড, বুদ্ধি আর বিবেচনাও ছিল সেই মাপে। পরের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হলে কিছুটা অবহেলা সহ্য করতেই হয়—এই সাধারণ জ্ঞানটুকু তাঁর ছিল নিশ্চয়ই। তবু ভীমরতি বলেও তো একটা কথা আছে। হয়ত সেই হেমন্ত মা-ই অপরের কত মুখনাড়া তিরস্কার খেয়ে গেছেন মরার আগে, যেমন অপরকে করেছেন এককালে। নিভা খুবই বিবেচক—তবু মানুষের মন আর মেজাজ সব সময়েই হিসেব ক'রে চলবে তা সম্ভব নয়। সহ্যশক্তির সীমা আছে, সেবা করারও। রুগ্ন পঙ্গু লোক প্রায়ই স্বার্থপর অবিবেচক হয়ে পড়ে, তখন ধৈর্য ধরে তার সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করা কঠিন বৈকি!

খুবই কৌতূহল হয় জানতে—শেষটা কিভাবে কাটল হেমন্ত মার। হয়ত কোনদিন নিভাদের সঙ্গে দেখা হলে জানা যাবে। তবে কতটা—সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। মানুষ যে সব সময় নিজেদের দোষ ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ইচ্ছে ক'রে হিসেব ক'রে ঢেকে কথা বলে তাও নয়, অধিকাংশ সময়ই নিজেদের মানসিক দৈন্যের প্রকাশ সম্বন্ধে নিজেরা সচেতন থাকে না। অথবা, থাকলেও ভুলে যায় খুব শীগগির।

আর, নিভার সঙ্গেই কি কোনদিন দেখা হবে? আমার পক্ষে এই কৌতূহল নিবারণ করতে অত দূর যাওয়া সম্ভব নয়। সে-ই বা আসবে কেন? তারও ঢের বয়স হয়েছে।

॥ ২ ॥

এতদিন পরে হঠাৎ হেমন্ত মার কথাটা মনে পড়ার কারণ ছিল।

ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রটা বড় বিচিত্র।

কাশীতে মানসরোবরের গলির যে বাড়িতে আমার ঠাকুমা থাকতেন, সেই বাড়িরই একটা অংশে থাকতেন হেমন্ত মা। ওখানকার ছেলে বুড়ো সবাই—সম্পর্ক-নির্বিশেষে ওঁকে হেমন্ত মা বলত—সেই হিসেবেই আমিও তাই বলতুম। নইলে ঠাকুমা ওঁকে দিদি বলতেন, সে সম্পর্কে ঠাকুমাই বলা উচিত। তাছাড়া আমরা কায়স্থ, উনি ব্রাহ্মণের মেয়ে।

অভয়াচরণ তর্কচূড়ামণির বাড়িটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন—ঠিক গঙ্গার ওপর না হলেও ওঁর দোতলা তেতলার বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যেত। তেতলা থেকে তো কথাই নেই, ওদিকে রামনগরের রাজবাড়ি থেকে এদিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পর্যন্ত (এখন বোধহয় মালব্য সেতু নাম হয়েছে)। তর্কচূড়ামণির বাড়িটা দু'ভাগ করা ছিল,

একদিকের দোতলা তেতলা নিয়ে উনি নিজে থাকতেন, আর একদিকের দোতলায় থাকতেন আমার ঠাকুমা, তেতলায় হেমন্ত মা। নিচের তলার প্রায় অব্যবহার্য ঘরগুলোর ভাড়া নিতেন না তর্কচূড়ামণিমশাই, কয়েকটি দরিদ্র বিধবা এমনিই বাস করত।

ঠাকুমা আর হেমন্ত মার মধ্যে খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল না—বলা বাহুল্য। বাহুল্য এই জন্যে যে, এমনিই দুটি মেয়েছেলের হৃদ্যতা হওয়া কঠিন; মেয়েতে মেয়েতে—অল্পবয়সেও—পুরুষের মতো বন্ধুত্ব বিশেষ হয় না, ওদের বন্ধুত্ব ওষ্ঠে ও ভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৃদ্ধাদের তো কথাই নেই, তারা মৌখিক সৌহার্দ্যের অন্তরালে, আড়ালে-সরস-আলোচনা-করার-মতো পরস্পরের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত থাকে। তার ওপর হেমন্ত মার মতো মেজাজী মানুষ—নিতান্ত বিপন্ন হয়ে না পড়লে তাঁকে সহ্য করা যে-কোন মেয়েছেলের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

বলতে নেই, আমার পিতামহীরও স্বভাব খুব কোমল ছিল না। বয়সে মানুষ এমনিই খিটখিটে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, তার ওপর তাঁর আরও কিছু দোষ ছিল। কোন্ সুদূর অতীতে তিনি জমিদারের স্ত্রী ও ক্ষুদে জমিদারের মা ছিলেন, পরেও তাঁর এক ছেলে তখনকার দিনেই আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরি করতেন, একথা তিনি ভুলতে পারতেন না কিছুতেই; তার চেয়েও বড় কথা—অপরকে ভুলতে দিতেন না। কোন অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ হলেই, এমন কি চেনা লোকের সঙ্গেও—বিবিধ-প্রসঙ্গের ফাঁকে, এই কথাগুলি শুনিয়ে দিতেন। তাঁর জ্যেঠামশাই জজ ছিলেন, বাপেরবাড়িতে পোষা হাতী ছিল, শ্বশুরবাড়ির সামনে দিয়ে কোন প্রজার জুতো-পায়ে বা ছাতা-মাথায় চলবার হুকুম ছিল না; তাঁর সেজছেলেকে সাহেব-সুবোরাও এককালে 'স্যার' বলে এসে সেলাম করত, দাঁড়িয়ে কথা বলত—তিনি না বললে কেউ চেয়ারে বসতে সাহস করত না—ইত্যাদি, ইত্যাদি, বার বারই শুনতে হত সবাইকে।

এই 'বড়াই' বা 'জাঁক করা' নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করত, ঠাট্টাবিদ্রূপ করত—তবে সে আড়ালে। হেমন্ত মা ওসব শৌখীন ভদ্রতার ধার ধরতেন না। তাঁর সামনে এ প্রসঙ্গ উঠলে উপক্রমণিকাতেই—যাকে বলে 'ছিরি ফাঁদা'—তিনি গায়ে জল ঢেলে দিতেন, 'রাখ দিকি বাপু! অমনি ওঁর বড়াই শুরু হয়ে গেল…আরে মর মাগী, এতটা বয়স হয়ে গেল—চার কুড়ি পেরিয়ে গেছে কবে, নিজেই তো বলিস—গঙ্গাপানে পা ক'রে বসে আছিস, কী কথার কি অর্থ হয় বুঝিস না?…এখানে তো এই দশ টাকা ভাড়ায় বাস করছিস, না আত্মীয় না স্বজন, সাতজন্মে কেউ খোঁজ নিতে আসে না, একটা রাঁধুনী বামুনি রেখেও খাবার সামর্থ্য নেই, এক ঠিকে-ঝি ভরসা, এ অবস্থায় অত বড়মানুষির জাঁক করলে লোকে টিটকিরি করবে না? আড়ালে গায়ে থুথু দেবে যে!…এত যদি দরের মানুষ তো এভাবে পড়ে আছিস কেন—লোকে বলবে না? লক্ষপতি জমি দার সব যার ছেলে—সে তো একরাশ আশ্রিত প্রতিপাল্য নিয়ে থাকবে!'

'তারা যদি বেঁচে থাকত তাহলে কি আর এভাবে পড়ে থাকতুম! তেমন ছেলে ছিল না আমার। মাতৃভক্ত মাতৃ-অন্ত প্রাণ। কী বলব পোড়াকপাল—সব খেয়ে বসে আছি তাই, একটা ছেলেতে ঠেকেছে শিবরাত্তিরের সলতে, সেও তো আধমরা। চিরদিন দেশে রইল জমিজায়গা নিয়ে, কখনও যে আধমুঠো ভাতের জন্যে চাকরি নিতে হবে তা

তো আর ভাবে নি, সেখানে অনাহারী ম্যাজেস্টার ছিল এই পাকিস্তানের আমলেও—এখন একবস্ত্রে চলে আসতে হয়েছে নাতোয়ান হয়ে—কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। তার কি ক্ষ্যামতা বলো গাড়িভাড়া দিয়ে আমাকে দেখতে আসবে হুট হুট ক'রে?'

মুখ গোঁজ ক'রে উত্তর দেন আমার ঠাকুমা।

'ব্যস ব্যস। হয়েছে। বুঝেছি। এখন কিছু নেই যখন, চুপ ক'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনকার যা অবস্থা সেইভাবে চলো। কবে ঘি খেয়েছি—এই দ্যাখো এখনও হাতে গন্ধ, ওটা ভারী লজ্জার কথা। তুমি তো শুনতে পাও না, আমি শুনি— কত টিটকিরি দেয় লোকে। কী দরকার গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়ার!'

আর একটু থেমে, হয়ত মর্মান্তিক উপসংহার টানতেন, 'কী ঘোষের মেয়ে তুমি মাঝে মাঝে সন্দ হয়। আশি বছর পেরিয়ে গেল, এখনও আক্কেল হল না!''

এর পর আমার ঠাকুমা কি চোখে দেখবেন ওঁকে তা সহজেই অনুমেয়।

তবে, একেবারে ছেঁটে ফেলে দিতেও পারতেন না। কারণ তাঁর ছিল বাতের শরীর, মধ্যে-মধ্যে বাত-জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন। তখন দেখবার লোক ঐ হেমন্ত মা-ই। যদিচ তিনি ঠাকুমার চেয়ে বেশ খানিকটা বয়সে বড় ছিলেন—তবু তাঁকে কোনদিন কারুরও দেখতে হয় নি। হেমন্ত মা বকা-ঝকা করতেন যথেষ্টই, 'ঐ জন্যেই একশোবার বলি অত মন্দানি দেখিয়ে নিত্যি গঙ্গায় চান করতে যেতে হবে না। সয় না তো বাহাদুরী দেখাতে যাস কেন? এই ঠাণ্ডায় নিত্যি চান করতে যাওয়া—হিম লাগিয়ে!' কিন্তু করতেনও ঢের, যাকে বলে 'গুয়েমুতে করা'—তাই।

তা ছাড়া, এ বিদ্যাটা উনি জানতেনও ভাল। রোগী শুয়ে থাকতেই বিছানা পাল্টানো, রোগীকে স্পঞ্জ করা, ঘর পরিষ্কার রাখা—এসব কাজে তাঁর তুলনা ছিল না। ঠাকুমা অপর কারুর হাতে ভাত খেতেন না—প্রসাদ ছাড়া। হেমন্ত মাও তা খেতে বলতেন না। ভাত খাবার হলে, পথ্য করার দিন, তর্কচূড়ামণির গৃহদেবতার প্রসাদ আসত। গৃহিণী নিজে দিয়ে যেতেন। কিন্তু অন্যদিন, সাবু বার্লি ফলের রস দুধ যা খাওয়ার, হেমন্ত মা-ই ক'রে দিতেন যতদূর সম্ভব শুদ্ধাচারে। এমন সেবা আর কেউ করবে না, ঠাকুমার নাতনীরা বা বৌমারা তো নয়ই। তাছাড়া তাদের চিঠি লিখে খবর দিয়ে আনাতেই তো ওঁর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। ঠাকুমা হঠাৎ-হঠাৎই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন, পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকতেন। শুধু সেবা নয়—মালিশ পুলটিস, কোনটায় কী উপকার হয়—তাও হেমন্ত মা জানতেন, বেগতিক দেখলে কবিরাজ বা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডাকতেন—একেবারে নিকটআত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করতেন, অযথা সঙ্কোচে ঠাকুমার তরফ থেকে নির্দেশ বা অনুরোধের অপেক্ষা করতেন না।

সুতরাং এ অবস্থায়, 'কাটান-ছিঁড়েন' করা যাকে বলে, তা করা চলত না। তবে ঠাকুমা আড়ালে যথেষ্টই বিষ উদ্গার করতেন। 'কাপ্তেন মেয়েমানুষ' 'মদ্দা মেয়েমানুষ' 'মেয়ে বর্গী'—এই তাঁর কাছে হেমন্ত মার অভিধা। আমি একটু বেশী ওপরতলায় যেতুম বলে আমার ওপরও চটা ছিলেন, 'কেন যাস ওপরে—অত যখন তখন? ওর ঐ

থগবগানি বচনামৃত না শুনলে বুঝি ভাত হজম হয় না? আর ওর ঘরে খাসই বা কেন?…এখানে খেতে পাও না? রক্তপুঁজঘাটা হাত ওর, নিজেই তো বলে, এ তো আর শোনা-কথা নয়! বামুনের মেয়ে ঐ পঙ্কজ্ন্ত, ওর কি জাতজন্ম আছে? তাছাড়া ওর স্বভাব-চরিত্তিরও কখনও ভাল ছিল না—।'

এইখানেই থামিয়ে দিতে হত। কখনও ঠাট্টা-তামাশা ক'রে, কখনও বা মনে করিয়ে দিয়ে যে, আমরা পথেঘাটে ট্রেনে হোটেলে-রেস্তোরাঁয় খাই, খ্রীস্টান মুসলমান কিছুই বাকী নেই আমাদের—আমাদের কাছে জাতের কথা হাস্যকর। আর স্বভাবচরিত্র? সে হিসেব রেখে যদি কারও হাতে খেতে হয়—তাহলে তো, নিজের হাতে ছাড়া খাওয়াই চলে না, কার ভেতর কি আছে কে জানে! কে কার মনের মধ্যে ঢুকছে! তারপর হয়ত চোখ টিপে বলি, 'তুমিই বয়সকালে কোথাও কিছু করেছ কিনা কি ক'রে জানছি?'

এই শেষের খোঁচাতেই যথেষ্ট ফল হবে জানা ছিল। হতও। উনি অকথ্য-কুকথ্য গালিগালাজ শুরু করতেন। 'আ মর ছোঁড়া, ড্যাকরা, ভারতছাড়া, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমি না তোর বাপের মা হই! এই তোমাদের শিক্ষা হয়েছে! এর নাম লেখাপড়া শেখা! গাধা তৈরী করেছে তোর বাপ একগাদা পয়সা খরচ করে! আমাদের স্বভাব-চরিত্তির! চন্দসূয্যি আমাদের মুখ দেখতে পেত না সেকালে—তা জানিস! পাশের জ্ঞাতের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে হলেও পাল্‌কী ক'রে যেতে হত, পাল্‌কী একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে থামত। তাও শাশুড়ি পিসশাশুড়ি ছাড়া কোথাও নেমন্তন্ন যাবার হুকুম ছিল না। বিধবা পিসশাশুড়ি সঙ্গে থাকত যমদূতের মতো, দারোগার বাড়া। এক চাউনি দিলেই পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যেত, আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হবার জো হত। জ্ঞাতের বাড়ি ছাড়া কোথাও পাত পেড়ে খাওয়ার হুকুম ছিল না, গিয়ে নৌকোতা করে চলে আসতে হত। পিসশাশুড়ি জ্ঞাতের বাড়িও খেতেন না, বিধবা মানুষ কড়েরাঁড়ি—জলস্পর্শ করতেন না কোথাও। শুধু আমাদের পাহারা দেবার জন্যেই যাওয়া। কোথায় কি বলতে হবে, কি করতে হবে—ক'পা এগুবো ক'পা পেছুবো, কোথায় বসবো—সে-সবে তাঁর হুকুম চাই—'

অর্থাৎ ট্রেন অন্য লাইনে চলে যেত নিরাপদে। শুরু হয়ে যেত তাঁর নিজের বৃত্তে আবর্তন। হেমন্ত মা তখনকার মতো অব্যাহতি পেতেন।

আমি সত্যিই যখন-তখন ওপরে যেতুম। হেমন্ত মার কাছে আমার আকর্ষণ ছিল দুটো। প্রথমত ওঁর তেতলার বারান্দা ও দ্বিতীয়ত উনি নিজে। এই শেষের আকর্ষণটা হয়েছে ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে। ওঁর বিচিত্র স্বভাবে, বিচিত্র কথাবার্তায়। আমি যত ঐ বয়সের মহিলা দেখেছি (ঐ বয়স অবশ্য কারুরই নয়, বলা উচিত যত বৃদ্ধা দেখেছি) উনি একেবারেই তাদের থেকে পৃথক। ঠাকুমা বলতেন 'হুতশুনে মেয়েমানুষ', কথাটা খুব মিথ্যে নয়। হুতাশনই বটে। দেখলে মনে হত বিরাট বহ্নিসম্ভাবনা বুকে নিয়ে একটা চলন্ত আগ্নেয়গিরি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওঁর চালচলনে কথায়-বার্তায় সর্বদাই একটা জ্বালা বিচ্ছুরিত হত। তবু, সেটাই সব নয়। এই মানুষেরই এত মধুর এত কোমল রূপ দেখেছি—যা প্রায় অবিশ্বাস্য। উপর্যুপরি আঘাত পেয়েও, মানুষের অসংখ্য হৃদয়হীনতা বিশ্বাসঘাতকতা স্বার্থপরতা দেখার পরও

সে কোমলতা আর সরসতা একেবারে নষ্ট হয় নি। স্নেহপিপাসু অন্তর তাঁর শুধু স্নেহ পেতেই চায় নি, দিতেও চেয়েছে—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

কিন্তু সেটা দীর্ঘ পরিচয়ের পরের কথা।

প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ ছিল ঐ বারান্দাটাই। সেটাও আমার ঠাকুমার একটা—ইংরেজীতে যাকে বলে 'সোর পয়েন্ট'—ক্ষতস্থান ছিল। উনি আগে এসেছেন এ বাড়িতে, তখন তিনতলাটা দিতে চান নি বাড়িওয়ালা। তিনি অন্য কি সব কারণ দেখিয়েছিলেন, তাঁর বৃদ্ধা মা কিন্তু রেখে-ঢেকে বলেন নি, আসল কারণটাই খুলে বলেছিলেন। 'কে জানে এরপর কে ভাড়াটে আসবে বাছা, তারা যদি বামুন হয়? তুমি যতই হোক কায়স্থ তো, তুমি তাদের মাথার ওপর চলবে ফিরবে—সে তো আমাদেরই পাপ হবে।' হেমন্ত মা যখন এলেন তখনও একবার কথাটা তুলেছিলেন ঠাকুমা, কিন্তু তখনও তর্কচূড়ামণিমশাই নানা অছিলায় প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন, বেশী ভাড়ার কথাও তুলেছিলেন; আসলে আমার ঠাকুমা বুঝেছিলেন, ব্রাহ্মণ বলেই ওপরটা পেয়ে গেলেন হেমন্ত মা এক কথায়। সেই জন্যে ওপরে যদি বা উঠতেন ঠাকুমা, ও বারান্দায় কখনও পা দিতেন না।

আমার অত অভিমান-বোধ ছিল না। তাছাড়া নিচের তলার আকর্ষণও ছিল কম। নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই বছরে দু'বার একবার আসতুম। অবশ্য শুধু কর্তব্য বললে সত্যের অপলাপ করা হবে, কাশীর প্রতি আকর্ষণটাও কর্তব্যনিষ্ঠ হবার একটা প্রধান কারণ ছিল। নইলে বাইরে বাইরে মানুষ হয়েছি আমরা—ঠাকুমার স্নেহ এত পাই নি যে, সেই টানে ছুটে আসব। তাঁর সঙ্গে গল্প করা মানেই সেই পুরাতন জাঁকের পুনরাবৃত্তি—সে আর কত শোনা যায়! তাছাড়া দোতলা থেকে গঙ্গার দৃশ্যও সীমাবদ্ধ।

সেই জন্যে, একটু ফাঁক পেলেই একখানা বই হাতে ওপরে চলে যেতুম। সকালের দিকটা খুবই নিরিবিলি থাকত, হেমন্ত মা তাঁর পুজোর যোগাড়, পুজো, রান্না প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অত গল্প করার সময় পেতেন না। সেটা আমার পক্ষে শাপে-বর হত। বিশেষ, শীতের দিনে মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বসে বই পড়া, আর কখনও কখনও ভেতরে একটা আঙ্গুল দিয়ে বই বন্ধ ক'রে রেখে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকা—বেশ লাগত।...নৌকোগুলো পারাপার করছে, কেউ বা মাল-বোঝাই কেউ বা মানুষ নিয়ে; কিংবা কেদার থেকে মণিকর্ণিকা—পঞ্চতীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছে বা শুধুই ঘাটের শোভা দেখাচ্ছে; কখনও কখনও সাহেব-মেমের দল বড় বজরার ছাদে বসে দূরবীন দিয়ে আমাদের দেখছে কি ফটো তুলছে; মধ্যে মধ্যে দু'একটা শুশুক ডিগবাজী খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মাঝগঙ্গায়; প্রসাদী গাঁদার মালা বা গঙ্গাকে নিবেদিত ফুলবেলপাতার গুচ্ছ জলে ভেসে যাচ্ছে অথবা যেতে পারছে না, নৌকা যাতায়াতে যে মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তারই আঘাতে প্রত্যাঘাতে এক জায়গাতেই স্থির হয়ে থেকে নাচছে শুধু; মাল্লারা নিচের ঘাটে আপসে ঝগড়া করছে; কোন বিধবা হয়ত ভোরে আসতে পারেন নি তখন স্নান সেরে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে উঠে আসছেন; গুম গুম ক'রে ট্রেন উঠছে মালব্য সেতুর ওপর—এমনি সব বহুপরিচিত ও অতি প্রিয় দৃশ্য বসে বসে দেখতুম।

॥ ৩ ॥

ঠাকুমার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করতে খুড়তুতো দাদা—অন্য কাকার ছেলেরা এসেছিলেন, এক কাকাও। মোট জন দুই-তিন। আমি তখন আসতে পারি নি। শ্রাদ্ধ-শান্তি সারার পর তাঁর এস্টেট্ পত্র কি হবে—অর্থাৎ তাঁর যা কিছু অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি, নিতান্তই ঘরকন্নার তুচ্ছ তুচ্ছ সব জিনিস—কিছু স্থির করতে না পেরে তাঁরা একটা ঘরে সব পুরে চাবি দিয়ে চাবিটা তর্কচূড়ামণির ছেলের কাছে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ভাগ্যে পণ্ডিতমশাই তার আগেই কাশীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর গর্ভধারিণীও, নইলে অত সহজে ঘর জোড়া ক'রে রেখে চাবিটা আবার ওঁদের কাছেই গছিয়ে আসা যেত না। যাই হোক—তারপর বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও চিঠি লেখালেখির পর আমার ওপরই ভার পড়েছিল সেগুলোর সম্গতি করার। বাড়িওয়ালারা ব্যস্ত হচ্ছেন, সুতরাং আমি যেন যেমন ক'রেই হোক একটু সময় ক'রে গিয়ে একটা সুব্যবস্থা ক'রে আসি।

ব্যবস্থার একটা সর্বসম্মত নির্দেশও ছিল। কমদামী বাসন-কোসন আমার বিবেচনামতো আমি যেন দান ক'রে দিই—পুরনো দাসী বা ঐরকম কাউকে। আর পুজো করার যেসব রুপোর বাসন-কোসন আছে, বা অন্য কোন নতুন বাসন যদি থাকে, ওঁর গুরুবাড়ি পাঠাতে হবে। সেটা অবশ্য এই কাশীতেই। এছাড়া বিক্রীর মতো যদি কিছু থাকে—ওর ভেতর আমার কোন জিনিস রাখতে ইচ্ছে হলে যেন রাখি, সংকোচ না করি—সব বিক্রী ক'রে টাকাটা যেন আমার কাকাকে দিয়ে দিই। কাকাই ওঁর একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান, তাঁর অবস্থাও ভাল না। ঠাকুমার সঙ্গে কিছু গহনা এবং নগদ টাকাও ছিল—দুঃসময়ের সম্বল, কত ছিল কাউকে কদাচ জানতে দিতেন না তিনি, সেগুলো ওঁরা আগেই নিয়েছিলেন। সেই টাকাতেই শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়েছে, যা যৎসামান্য বাকী ছিল—সেটাও কাকাকেই দিয়েছেন।

কাশীতে পৌঁছে সোজা হেমন্ত মার কাছেই উঠেছিলুম। কে জানে কেন, কোন সংকোচ বোধ হয় নি। মনে প্রশ্নও ওঠে নি যে, কোথায় উঠব। যেন হেমন্ত মার কাছে গিয়ে উঠব এইটেই স্বাভাবিক। হেমন্ত মাও খুব সহজভাবেই স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। গাড়ির কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলতে বলে, চা খাব না শরবৎ খাব জিজ্ঞাসা ক'রে একেবারে ভাত চাপিয়ে দিলেন। তিনি জানতেনই আমি ওখানে উঠব—তাঁর আচরণে অন্তত তাই মনে হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর ছোট্ট পেতলের হামানদিস্তেতে পান ছেঁচে মুখে ফেলে একটি গোপন সংবাদ দিলেন।

ওরা যা জানত, যা পেয়েছিল—'তাছাড়াও ঠাকুমার একটি ভারী গার্ডচেন হার ছিল অন্ততত সাত ভরি ওজন হবে। তিনি নাকি আমার জন্যেই এটা হেমন্ত মার কাছে রেখে গেছেন। বলে গেছেন, 'ও ছাড়া তো সাতজন্মে কেউ আসত না আমার খোঁজ নিতে, ওকে একটা কিছু দিয়ে যাব আমার ইচ্ছে। এমনি তোরঙ্গয় থাকলে মরার সময় যারা থাকবে—যে যা পাবে নিয়ে নেবে।...তুমি এটা তোমার কাছে রেখে দাও দিদি, তার হাতে দিও। যেন এটা ভেঙ্গে বৌকে একটা কিছু গড়িয়ে দেয়।'

খবরটি দিয়ে একটু মুচকে হাসলেন হেমন্ত মা। তারপর এক রকমের বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিয়ে চেয়ে বললেন, 'এটা তোর খুব নেবার ইচ্ছে?'

আমি তো অবাক। বললুম, 'ইচ্ছে কি অনিচ্ছে ভেবে দেখার সময় পেলুম কৈ বলুন! এই তো খবরটা শুনলুম সবে।...তবে আমার ঠিক এভাবে কোন জিনিস নিতে ইচ্ছে করে না। সবাইকে লুকিয়ে আলাদা।...কাকা কি অন্য খুড়তুতো ভাইরা যদি জানতে পারে তো কি মনে করবে? যা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা ক'রে মনে কষ্ট পাবে।'

'তা ঠিক।...শোন, তাহলে বলি, এ আর তোর নিয়ে কাজ নেই। আমি বাক্যিদত্ত, দিতে বাধ্য তাই দিলুম। তোর ঠাকুমার খুব শখ ছিল—কাশীতে এতদিন বাস ক'রে গেল, পাঁচজনকে দিতে দেখেছে তো—একটা অধ্যাপক-বিদেয় দেয়। এককালে কাশীতে খুব চল ছিল, এখন তেমন অধ্যাপকই বা কোথায়—এককালে মহামহোপাধ্যায়ের গুষ্টি ছিল এখানে—আর দেনেওলাই বা কোথায়! সে যাক গে, ও যদ্দিন এসেছে অনায়াসে দিতে পারত, তখন এত খরচও ছিল না, আমিও এসে দেখেছি, তেমন তেমন গরীব লোক নতুন মাটির সরাতে দুটো সন্দেশ, পৈতে, সুপুরি আর দুয়ানি কি সিকি দিয়ে পণ্ডিত বিদেয় দিয়েছে, তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা হাসিমুখে নিয়ে গেছেন। এটা তো পাওনার হিসেবে ধরতেন না পণ্ডিতরা, সম্মান একটা—নেওয়া তাঁদের কর্তব্য এই মনে করতেন।... তা প্রাণ ধরে এসব সঞ্চয় হাতছাড়া করতে পারে নি তো, মুখ খাবার ভয়ে নাতিদেরও বলতে পারে নি—হাতের টাকা খোয়াতে পারে নি, বলে—ক'দিন এখনও বাঁচব তার ঠিক কি, এই তো মাত্তর সম্বল। নাতিরা কিছু কিছু দিচ্ছে সত্যি কথা, যা দিনকাল পড়েছে, যদি না দেয়, না দিতে পারে? শেষে কি সত্যিই অন্নপূর্ণার গলিতে কাপড় বিছিয়ে বসতে হবে?...অবিশ্যি কেউ কিছু না দিলে—এতেই বা ক'দিন যেত, আমার মতো পেরমাই হলে?...সে যাক গে, তোর যদি এতে তেমন লোভ না থাকে তো হারছড়াটা বেচে একটা অধ্যাপক বিদেয় দিয়ে যা এই বাড়িতে; তার আত্মার তৃপ্তি হোক। নইলে, হয়ত ঐ জন্যেই আবার জন্ম নিতে হবে।'

'তদ্দিনে এসব পণ্ডিত-বিদেয়ের পাট উঠে যাবে, ভয় নেই।' আমি হেসে বলি, 'তা নয়। আমি অনায়াসে এর ক্লেম ছেড়ে দিতে রাজী আছি, কিন্তু এতে কি কুলোবে?'

'খুব কুলোবে। অতও লাগবে না। হারছড়াটা বেচলে নিদেন হাজার টাকা উঠবে। একশ' আটটি পণ্ডিতকে বিদেয় দে, বড় পেতলের সরা কি কাঁসার রেকাবীতে চারটে মিষ্টি, পাঁচসিকে করে দক্ষিণে, পৈতে, আর একটা কোন ফল—নিষ্ফলা দান দিতে নেই—কত আর পড়বে? বরং ঐ সঙ্গে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে, পণ্ডিত-বিদেয়ের পর খাওয়াতে হয়

অনেকে বলে, যা থাকবে কাঙ্গাল দুঃখী খাইয়ে দিয়ে যা। তার বুকের ধন বুক দিয়ে আগলানো সোনা, ওর আর কিছু নিয়ে কাজ নেই।'

সেই কারণেই বেশ ক'টা দিন থেকে যেতে হল সে যাত্রায়। ওঁর কাছেই রইলুম। কিছু খরচ দেবার প্রস্তাব করতে কান মলে দিয়েছিলেন (বুড়ির হাতে তখনও যথেষ্ট জোর), তাই সে কথা আর তুলি নি। সুখেই ছিলুম, সুখে এবং নিঃসঙ্কোচে। ফেরার সময়, বলতে গেলে ওবাড়ির সম্পর্ক চুকিয়ে আসতে, বরং একটা বেদনাবোধই হতে লাগল—এই নিঃসঙ্গ অনাত্মীয়া বৃদ্ধার জন্যে।

আসবার আগের দিন হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কোন বিশেষ কাজ ছিল না হাতে। একটানা বই পড়তে পড়তে চোখও টনটন করতে শুরু করেছে, তাই ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, এটা-ওটা জিনিস নেড়ে-চেড়ে। সেই সময় হঠাৎই চোখে পড়ল খানকতক খাতা। বেশ ভাল বাঁধানো—রুলটানা।

কৌতূহল হল, উল্টে দেখি হেমন্ত মারই হাতের লেখা। মুক্তোর মতো সুন্দর লেখা ছিল হেমন্ত মার—একশ' বছরের কাছাকাছি পেঁাছেও সে লেখা দুষ্পাঠ্য হয় নি।

কী লেখা? একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে মনে হল 'আমি' এই উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা হলেও ব্যাপারটা উপন্যাসের মতো।

ওঁর যে আবার এসবও আসত, একটু লেখার অভ্যাসও ছিল তা কোনদিন জানতুম না, কল্পনাও করি নি।

আমি অবাক হয়ে উল্টে দেখছি, পেছন থেকে এসে বললেন, 'কী দেখছিস, আমিও লেখিকা! তোর সঙ্গে তো অনেক প্রকাশকের খাতির আছে, দে না ছাপিয়ে, পারিস তো!'

আমি আরও অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে হেসে বললেন, 'কী ভাবছিলি? ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্য আছে এতে? ভয় নেই, পদ্য-টদ্য নয়। আত্মজীবনী। পদ্য হলে ছাপাবার কথা বলতুম না। এখানে এসেই লিখেছি। কাজ নেই, কথা কইবার লোক নেই—সেই-জন্যেই শুরু করেছিলুম একদিন। অনেকদিন ধরে লিখেছি একটু একটু ক'রে। প্রথম পাতাটা দু'তিনবার ক'রে লিখেছি। নিতান্ত মন্দ হয় নি, ফেলে দেবার মতো নয়। পড়ে দেখিস। তোর যা তাড়াতাড়ি পড়া—কতক্ষণই বা লাগবে?'

তারপর একটু থেমে কেমন একরকমের চোখ মটকে বললেন, 'ভাবছিস ওর আবার জীবন, তার আবার আত্মজীবনী! কার এত গরজ আছে যে, ছাপালে পড়বে?…তাই না? ওরে, লেখার মতো না হলে লিখতুম না। ছাপাতেই বা বলব কেন তা হলে, আমি কি পাগল না ছন্ন! লিখেও তো এতকাল ফেলে রেখেছি। ভেবে দেখেছি, ছাপালে নবেলের মতোই লাগবে।…তোরা কী ছাই-পাঁশ নবেল লিখিস—ভগবান যা লেখেন তা তোরা ভাবতেও পারবি না। নবেলের মতো যদি না লাগে তো জলে ফেলে দিস। দেখিস, অমন তোফা তোফা নবেলকে হার মানিয়ে দেবে।'…

মুখের ওপর 'না' বলতে পারি নি। নব্বুই পেরিয়ে গেছে বৃদ্ধার, এখনও সাহিত্যিক যশের আশা রাখেন—নতুন কীর্তির কথা চিন্তা করছেন!…হাসি পেলেও সামনে হাসতে পারি নি। ওঁকে শুধু ভক্তি নয়, এতদিনে বোধহয় একটু ভালও বেসে ফেলেছিলুম।

ওঁকে কোনরকম আঘাত দেওয়া সম্ভব নয়।

আরও একটা কথা মনে হয়েছে। সন্তান তথা উত্তরাধিকারী হাতড়ে বেড়িয়েছেন অনেকদিন। কে জানে, মানুষ তেমন কাউকে পান নি বলে শেষ পর্যন্ত এই সন্তানের কথাই ভেবেছিলেন। নিজের নাম পরবর্তী পুরুষের জন্য রেখে যাওয়া—সন্তান কামনার মূলে যে কথাটা, সেই চিন্তাই হয়ত এই রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল ওঁকে।

সুতরাং—খাতাগুলো পড়ে দেখব বলে নিয়েই আসতে হয়েছিল। এখানে এনেও ফেলে দিতে পারি নি। যা মানুষ, কোনদিন আবার চেয়ে বসবেন হয়ত, না পেলে অনর্থ করবেন। অবশ্য আত্মজীবনী—পড়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা। সকলেই মনে করে তার জীবনের মতো এমন জীবন আর কারও নয়, উপন্যাস লেখবার মতো। লেখক মাত্রেই জানেন, কত লোকের কাছ থেকে কত প্রস্তাব আসে—তাদের জীবন বা জীবনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখার জন্যে। সকলেই বলে—'এ গল্প লিখলে আপনার অন্য লেখাকে হার মানিয়ে দেবে। ম্লান হয়ে যাবে অন্য সব বই।' এও নিশ্চয় তা-ই। তার বেশী আর কি আশা করা যায় ?

খাতাগুলো বাড়ি ফিরে একটা তাকে ফেলে রেখেছিলুম—কিছু স্বল্প-ব্যবহার্য বই-খাতার সঙ্গে। যা হামেশা হরবখৎ দরকার হয় না, অথচ কোন সুদূর ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে এই আশঙ্কায় ফেলে দেওয়াও যায় না—এমন কিছু-না-কিছু পুস্তক-জাতীয় জিনিস সব বাড়িতেই থাকে। তার মধ্যে বাল্যকালে পড়া দু'-একখানা স্কুলপাঠ্য বইও খুঁজে পাওয়া যাবে হয়ত।

এমনি একটা জায়গাতেই পড়ে ছিল খাতাগুলো। হঠাৎ সেদিন পুজোর আগে বাৎসরিক ঝাড়া-মোছা করতে গিয়ে দেখি—সেখানে উই লেগেছে। গত বছর এমনি সময় একবার সাফ ক'রে গুছিয়ে রেখেছি, আর দেখা হয় নি অবশ্য। তবে এ উই লাগা বেশী-দিনের নয়। এই কীটগুলির কর্মরহস্য যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন এক একদিনে এদের ধ্বংস-কার্যে কতদূর এগিয়ে যায় এরা, কতখানি মাল অধিগত করে। সেদিক দিয়ে এদের চেঙ্গিজ, তৈমুর বা নাদির বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এক আলমারী বই নষ্ট করতে এদের দশ-বারোদিনই যথেষ্ট।

সৌভাগ্যক্রমে অত নষ্ট করতে পারে নি এখানে। হয়ত দিন দশ-বারোর মধ্যে কড়ির কাছ থেকে গাছটা নেমেছে। হয়ত আর ক'দিন আগে—অত লক্ষ্যও করি নি। এখন দেখলুম কাঠের কড়ির গা বেয়ে সরল রেখায় নেমে এসেছে এদের পথ বা 'গাছ'। তাকের দেওয়ালে লাগা বইগুলোর কিছু নেই আর—কিন্তু খাতাগুলো অত নষ্ট করতে পারে নি। এক নম্বর খাতাটা তো ঠিকই আছে প্রায়। পরেরগুলোই কিছু জখম করেছে। অনেকগুলো গর্ত হয়েছে মাঝখানে মাঝখানে, প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা, এ খাতা থেকে ও খাতা সোজা চলে গেছে। কোথাও আবার অজ্ঞাত কারণেই মাঝামাঝি গর্তটা বিস্তৃততর হয়েছে, ফলে বহু লেখাই আর পড়া যায় না।

খাতাগুলো দেখেই মনে পড়েছিল হেমন্ত মার কথা। একটু ভয়ও হয়েছিল। আরও কতকটা সেই জন্যেই নিভাকে চিঠি লিখেছিলুম।

কিন্তু ইতিমধ্যে, নিভার জবাব আসার আগেই আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। তাক

পরিষ্কার করে ডি. ডি. টি. পাউডার ছড়িয়ে দু'দিন খালি ফেলে রেখেছিলুম। তারপর আবার উই-ভুক্তাবশিষ্ট বইখাতাগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে—অলস কৌতূহলে একবার উল্টে দেখছিলুম খাতাগুলো। গুলো বলতে প্রথম খাতাটাই। দেখে কিন্তু চমকে উঠেছিলুম। ভাল ক'রে পড়েছিলুম আবার। তারপর অন্যগুলোও, অবশ্য যতটা পড়া যায়।

না, রচনার জন্যে নয়। ভাষার জন্যে তো নয়ই—টানটা কাহিনীরই। ঠিকই বলেছিলেন মহিলা, বিধাতার লেখা গল্পের কাছে মানুষের লেখা গল্প কিছু না। মানুষ লেখকের সাধ্য নেই বিধাতার কল্পনার ধারে কাছে পৌঁছয়। আর গল্প-উপন্যাসের মুখ্য বস্তুই তো কাহিনী। যে সব আধুনিক লেখকরা,—সব দেশেই—গল্প-উপন্যাস লিখতে বসে কাহিনীকে পরিহার ক'রে চলেন, তাঁরা কাহিনী বানাতে পারেন না বলেই করেন। সেটা তাঁদের অক্ষমতা। অক্ষমতাকে ইচ্ছাকৃত বাহাদুরী বলে জাহির করাই হল বর্তমান কালের প্রচার-কৌশল। কী রাজনীতি কী সাহিত্য-শিল্প—সর্বত্রই এই গোয়েরিং-নীতির জয়-জয়কার।

নিভার চিঠিতে হেমন্ত মার মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর প্রথমে ভেবেছিলুম খাতাগুলো গঙ্গায় দেব। কিন্তু তা পারি নি।

এমনিই তো একটু অনুতাপ বোধ হচ্ছিল। ভদ্রমহিলা যখন অত জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়ে দেখিস, একেবারে মন্দ হয় নি।' নিশ্চয়ই তখন আশা করেছিলেন, যে, আমি পড়ে একটু প্রশংসা করব। অত বড় মানুষটা মুখ ফুটে ঠিক বলতে পারেন নি, 'তোর মতামত জানাস'—স্বভাবতই সংকোচে বেধেছিল। এতদিন কেটে গেছে তারপর, আট-ন' বছর। আমার দিক থেকে ও প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্রও হয় নি। অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন মনে মনে। পছন্দ হয় নি সে একটা আঘাত। লেখক বিশেষ নতুন লেখকের পক্ষে সেটাও বড় কম নয়। কিন্তু এত কষ্টের এত যত্নের জিনিস আমি উল্টেও দেখি নি—অবহেলায় উপেক্ষায়, হয়ত বা কৌতুক-মিশ্রিত অনুকম্পায়, একপাশে ফেলে রেখেছি, কি ফেলেই দিয়েছি—মনে ক'রে থাকলে আরও বেশী আঘাত পেয়েছেন। হয়ত হাসাহাসি করেছি তাঁর এই প্রচেষ্টা নিয়ে, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করেছি—এ মনে করাও বিচিত্র নয়। মানব চরিত্রে তাঁর যা অসাধারণ জ্ঞান—এইটেই আগে মনে হওয়া স্বাভাবিক—ফলে খুবই কষ্ট পেয়েছেন নিশ্চয়।

আচ্ছা, সত্যিই ছাপিয়ে দিলে কি হয়?···তবু কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে আমার এই অবহেলা-অপরাধের।

যদি স্বর্গ থেকে এ মর্ত্যের সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়—তিনি তৃপ্ত হবেন। আমার মঙ্গল কামনা করবেন।···

এই ভেবেই আবার খাতাগুলো নিয়ে বসেছি। প্রথম খাতাটা ঠিকই আছে, একটু-আধটু বানান ভুল, দু'একটা শব্দের অপপ্রয়োগ, দু'এক জায়গায় গুরু-চণ্ডালী দোষ—সেগুলো শুধরে দিলেই চলবে, অন্য খাতাগুলোতে অত অল্পে কিছু করা যাবে না। অধিকাংশ জায়গাতেই কয়েক পৃষ্ঠা ক'রে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে কল্পনার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আবার নতুন ক'রে লিখতে হবে। ঐতিহাসিকরা

যেমন ক'রে শিলালিপির নষ্টাংশের পাঠোদ্ধার করেন, সম্ভাব্য শব্দ বসিয়ে—ইংরেজীতে যাকে **reconstruct** করা বলে—পুনর্সম্বন্ধ করা—তাই করতে হবে।

করব তাই? দোষ কি?

মন স্থির করার পর আর দেরি করি নি। কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছি।...

তবে, লিখতেই যখন হচ্ছে নতুন ক'রে, তখন আর লেখিকার ভাষা দিই কেন, তাঁর জবানীই বা ব্যবহার করার প্রয়োজন কি?—এই কথাটাই মনে এসেছে। প্রয়োজন তো নেই-ই, বরং অসুবিধা আছে। কল্পনায় যে অংশটুকু ভরাট করা চলে, আত্মকাহিনীর ভঙ্গীতে লিখলে হাত-পা বাঁধা হয়ে থাকতে হবে। অনেক কৈফিয়ৎ, অনেক জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে। তার চেয়ে সোজাসুজি উপন্যাসের ভঙ্গীতে লিখে যাওয়াই ভাল। আমি যখন স্বীকার করছি এর অন্তত ছ' আনা অংশ কল্পনা—তখন আর আপত্তি কি?

তবে—প্রথম খাতাটা যখন প্রায় ঠিকই আছে, সেটা এমনিই ছেপে দিচ্ছি। ভদ্রমহিলা কষ্ট ক'রে লিখেছিলেন, বার বার সংশোধন পরিবর্তন করেছেন। তাঁর ভাষা তাঁর জবানীতে পাঠকরা পড়লে তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে। আমাকে কিছুটা অদল-বদল করতে হয়েছে, বর্তমান পাঠকদের বোধগম্য করতে—তবু বেশীটা তাঁরই।

একই বইতে দু'রকম ভাষা হবে? তা হোক না। বর্তমানে কোন কোন বহুলপ্রচারিত বাংলা দৈনিকপত্রেও তো একই সঙ্গে দু'রকম ভাষা চলছে। তাতে যদি কোন দোষ না হয়, যদি পাঠকদের বুঝতে পড়তে অসুবিধা না হয় তো বইতেই বা হবে কেন?

নতুন ক'রে লেখার জন্যে, বিশেষ—কল্পনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে, নিশ্চয় কোথাও কোথাও সত্যের অপলাপ ঘটেছে। তা হোক, আমি জানি—হেমন্ত মার যে চরিত্রের ঔদার্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ছিল, তিনি এতে ক্ষুণ্ণ হবেন না। বেঁচে থাকলেও হতেন না।

॥ গ্রন্থারম্ভ ॥

(হেমন্ত মার কথা)

॥ ১ ॥

বাংলা ১২৭০ সনে আমার জন্ম। আমার বাবার নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হালিশহরের কাছে কোথায় আমাদের পৈতৃক দেশ ছিল তাহা আমরা জানি না। কখনও সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন বা আয়োজনও হয় নাই। আমরা থাকিতাম সিঁথির কাছাকাছি—রাস্তাটার নাম আর করিব না—সেইখানেই আমার জন্ম হয়। শুধু আমি কেন, আমরা সব কয়টি ভাইবোনই ওখানে জন্মিয়াছি। অবশ্য সেটা আমাদের নিজস্ব বাড়িই ছিল। পিতামহের কোন্ এক শিষ্য ভূতের ভয় নিবারণ করিতে না পারিয়া বাড়িটা গুরুকে প্রণামী দেন। সেই সূত্রেই নিজস্ব। ব্রাহ্মণের হাতে আসার পর নাকি ভূতের ভয় আর ছিল না। কে জানে,—পিতামহদেব ক্ষমা করিবেন—সে ভূতের উপদ্রবে তাঁহার কোন হাত ছিল কি না।

আমার বাবা জীবিকা হিসাবে কিছুই করিতেন না। দেশে কিছু জমি-জায়গা ছিল। সেও কখনও নিজে দেখিতে গিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। আগে তাঁহার ভগ্নিপতি ও ভাগিনেয়রা দেখাশুনা করিতেন। পরে একটু বড় হওয়ার পর দাদাই আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। তবে সেকালে এত ঠকানোর রেওয়াজ হয় নাই, অত অভাব ছিল না বলিয়াই বোধহয়, রক্তবীজের ঝাড়ের মতো এত মানুষও আমদানী হয় নাই—সুতরাং উপস্বত্ব যথানিয়মেই আসিত। তাছাড়া কিছু শিষ্যসেবকও ছিল। মোটের উপর সংসার একপ্রকারে চলিয়া যাইত। বাবার কোনদিন কিছু করার প্রয়োজন হয় নাই।

বাবাকে লোকে বলিত—দেবতুল্য ঋষিতুল্য লোক। তা চেহারাটা সেই রকমই ছিল। দীর্ঘ দাড়ি, গৌরবর্ণ, সৌম্য কান্তি; প্রশান্ত মুখভাব,—কখনও পরগোত্রে আহার করিতেন না, বাজারের খাবার তো নয়ই, ত্রিসন্ধ্যা জপ-আহ্নিক করিতেন। গোটা গীতা বইটা মুখস্থ ছিল। সম্ভবত এই সব কারণেই লোকের ঐ আখ্যা।

কিন্তু—পিতৃনিন্দা মহাপাপ, নিন্দা আমি করিব না—আমার কখনও স্বীয় পিতৃদেবকে দেবতুল্য বা ঋষিতুল্য বলিয়া মনে হয় নাই। আসলে তিনি ছিলেন, আমি যতদূর দেখিয়াছি, অত্যন্ত আরামপ্রিয়, অলস লোক। অর্থের প্রতি আকর্ষণ কিছুমাত্র কম ছিল না। তবে তাহার জন্য শ্রম করিতে নারাজ ছিলেন। পরগোত্রে খাইতেন না, সেজন্য মাকে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করিতে হইত। সন্তানাদি জন্মের সময় তাঁহার এক বৌদিকে দেশ হইতে আনানো হইত, কাজ মিটিয়া গেলেই 'পত্রপাঠ' তিনি দেশে চলিয়া যাইতেন। অন্য সময় কোন বাধা উপস্থিত হইলে—আমার জ্ঞান হওয়ার পর যা দেখিয়াছি—দাদাই ডাল-ভাত নামাইয়া লইতেন, আমার বাবার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকিত—তবে সেজন্য তিনি নিজে অঙ্গুলি-হেলনের পরিশ্রমও করিতেন না।

বাবার খোরাকও বেশ ছিল। আহার্যের পরিমাণও যেমন, তেমনি বৈচিত্র্যের প্রতি লোভও। সকালের জলযোগ-ব্যবস্থাই ছিল ভুরি-ভোজের মতো। শরবৎ, আদাছোলা, মাখন, মিশ্রী. ছানা-গুড়, সময়ের সব রকম ফল—শেষে দুই-একখানা লুচি বা নিমকি, সন্দেশ। মধ্যাহ্নে আবার—ভাজা পোড়া সুক্ত ডাল ডালনা মাছ মিলাইয়া আট-দশ পদ থাকা প্রয়োজন হইত। সঙ্গে পায়স, দধি বা ক্ষীর। গৃহে নারায়ণ ছিলেন। সুতরাং পায়স তো হইতই, তবে নিত্য যে জিনিস হয় তাহাতে মন ভরিত না, দধি কি ক্ষীর—আর একটা উপসংহার ব্যবস্থা না হইলে চলিত না। নহিলেই মুখভার করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া আক্ষেপ করিতেন, এ লক্ষ্মীছাড়া খাওয়া আর কতকাল নারায়ণ খাওয়াইবেন কে জানে, কবে তাঁহার কাছে ডাক পড়িবে! বিকালের দিকে সিঙ্গাড়া নিমকি কচুরি রসগোল্লা পান্তুয়া এসব চাই। বলা বাহুল্য এগুলি মাবেই শিখিয়া লইতে হইয়াছিল, বাবা নাকি উপনয়নের পর আর ময়রার দোকানের খাবার খান নাই—কিন্তু আগেকার খাওয়ার স্বাদ ও লোভ দুই-ই রসনায় থাকিয়া গিয়াছিল। দধি তো বটেই, নিত্য সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়া ঘরে তৈয়োরী করিতেন মা। সে জন্য ঘরে দুই-তিনটি গাভী রাখিতে হইয়াছিল। তাহাদের দেখিবার জন্য একজন চাকর ছিল বটে—সময়ে মাকেও গাভীর পরিচর্যা করিতে হইত।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যের আয়োজন—এ আমাদের সকলের জন্য করা সম্ভব হইত না। ক্রমে সংসার বাড়িয়াছে, ব্যয় বাড়িয়াছে—আয় আদৌ বাড়ে নাই। বরং শিষ্য সংখ্যা কমিতে শুরু করিয়াছিল। কারণ, এই কলিকাতার আশেপাশে যা দুই-চারি ঘর শিষ্যবাড়ি আছে, সেখানে ছাড়া বাবা কোথাও যাইতেন না। মফঃস্বলে তো নয়ই, এমন কি দেশের শিষ্যরাও,—যাহারা গরজ করিয়া এখানে আসিয়া দীক্ষা লইত তাহারাই পাইত, অন্যের মিলিত না। দেশে ভিন্ন-গোত্রে খাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। কারণ, ভাজ-ভাইপোরা ছিল, নিকট দশরাত্রির জ্ঞাতি, তবুও যাইতেন না। অজুহাত—ভগবানের নাম লইয়া ব্যবসায়, এ নাকি তাঁহার ভাল লাগিত না (সংসারের সুখভোগ ভাল লাগিত!)। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন বৃত্তির কথা চিন্তা করাই উচিত, এ প্রশ্ন কেহ তুলিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণ, গুরুবংশ, পরের চাকরি করিতে যাইবেন নাকি? কোন কোন শিষ্য বিরক্ত হইয়া অনুমতি গ্রহণান্তর অন্য গুরু ধরিয়াছিলেন। সে তো লোকসান বটেই। উপরন্তু মধ্যে মধ্যে শিষ্যবাড়ি ঘুরিয়া আসিলে প্রণামী-আদিতে বেশ কিছু আদায় হয়, সকলেই জানি সে কথা—গুরুর সেইটাই প্রধান আয়। গুরু যদি সাতজন্মেও না যান তো শিষ্যদের এত কি গরজ নিজে হইতে প্রণামী পাঠাইবে?

যাহা বলিতেছিলাম—অত রকমের খাদ্য আমাদের ভাগ্যে বিশেষ জুটিত না, কদাচিৎ কখনও হয়ত এক-আধটা ভাল খাবার সকলের জন্য হইত—নচেৎ শুধু বাবার মতোই প্রস্তুত হইত। যাহা খাইবার খাইতেন, বাকি অন্য সময় বা অন্যদিনের জন্য তাঁহার উদ্দেশেই তোলা থাকিত। তিনিও অম্লানবদনে, নিজেরই—বুভুক্ষু না হোক— লোলুপ সন্তানদের সামনে বসিয়া ধীরে-সুস্থে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিতেন, কিছুমাত্র তাঁহার সংকোচবোধ হইত না। অত্যন্ত স্বার্থপর মানুষ ছাড়া এমন কেহ পারে না।

স্বার্থপর তিনি সব দিক দিয়াই। স্বার্থপর ও কামুক। মাকে দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত। কোন পুষ্টিকর খাদ্য বা ঔষধ তো দূরের কথা, দুইবেলা দুইমুঠো ভাতই সময়মতো পেটে যাইত না। স্নানাহারের কোন নিয়ম ছিল না। দ্বিপ্রহরের খাওয়াটা সারিতেই কোন কোনদিন সন্ধ্যা গড়াইয়া আসিত, ফলে রাত্রে আর আহারের রুচি থাকিত না। ঘরের দুধ—তাও বাবার সুখাদ্য, দধি ক্ষীর পায়স প্রভৃতি করিয়া আমাদের এক-আধ পলা দিতেই শেষ হইয়া যাইত। মায়ের অদৃষ্টে কোনদিনই জুটিত না। ফলে মায়ের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অম্ল অজীর্ণ আমাশয়—শেষ অবধি সূতিকায় দাঁড়াইয়াছিল। অনেক দিন ভুগিয়া ইদানীং অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবু ছুটি মেলে নাই। না সংসারের কাজে বা হাঁড়িঠেলায়—না সন্তান-উৎপাদনে। পিতৃদেবের সৃষ্টি-স্পৃহা—নিজের বাবা বলিয়াই কাম শব্দটা বার বার ব্যবহার করিতেছি না—কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মায়ের সেই অর্ধ কেন, তিন-চতুর্থাংশ মৃতদেহটাকেও সম্ভোগ করিতে বাধে নাই। ফলে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আমাদের বাড়ি যে ধাত্রী কাজ করিত সে সোজা জবাব দিয়াছিল, 'ও মড়াকে আমি প্রসব করাইতে পারিব না। আপনারা অন্য লোক দেখুন।' বস্তুত—শেষ সন্তানটি তাঁহার এ পৃথিবীর প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করারও পূর্বে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া যায়। ফেলা—আমার কোলের ভাই (যাহাকে আমি কোনদিন চোখে দেখিতে পাই নাই, এমনই কপাল!) নাকি সত্যই মৃতার গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল।

সুতরাং—এই পিতাকে যদি দেবতা বা ঋষি বলিয়া ভাবিতে না পারি—পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। ইহার জন্য যদি কোন পাপ হয়—সে পাপের জবাবদিহি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে করিতে পারিব—সে জন্য প্রস্তুত আছি।...

মৃত বাদে আমরা ছয় বোন, দুই ভাই। দাদা সর্বজ্যেষ্ঠ, শিবু সর্বকনিষ্ঠ। আমার বোনদের মধ্যে আমি দ্বিতীয়া। কার্তিক মাসে জন্ম বলিয়া আমার জ্যাঠাইমা নাম রাখিয়াছিলেন হেমন্তবালা। বাবার নামটা তত পছন্দ হয় নাই, তবে অন্য নাম চিন্তা করিতে গেলে অনেক পরিশ্রম, মনটাকে অযথা ব্যস্ত করিতে হয় বলিয়াই বোধ করি—তেমন বাধাও দেন নাই।

আমরা ভাইবোন সকলেই সুশ্রী ছিলাম। আমার বাবা তো রীতিমতো সুপুরুষ ছিলেনই। মায়ের চেহারাও যা দেখিয়াছি—মনে হয় বয়সকালে সুন্দরীই ছিলেন। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে কেহই কুরূপ বা কুরূপা হই নাই। লোকে বলিত আমাদের ছয় বোনের ভিতর আবার আমিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলাম। 'লোকে বলিত' কথাটার মধ্যে কোন অযথা বিনয় নাই। দশ বছর বয়সে বিবাহ হইয়া পরের ঘরে চলিয়া যাই, তখনও পর্যন্ত রূপ সম্বন্ধে কোন সচেতনতা আসে নাই। বাড়িতে একটা ভাল আর্শিও ছিল না যে, এখনকার মেয়েদের মতো দিবারাত্র নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাইয়া থাকিব। সুতরাং অপরের চোখের উপর নির্ভর করিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি বলুন?

পরবর্তীকালে অনেকেই আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া, আক্ষেপ করিয়া ছড়া কাটাইতে শুনিয়াছি—'অতিবড় রূপসী না পায় বর।' আরও পরবর্তীকালে আমার সম্বন্ধে পুরুষের উগ্র লোলুপতা দেখিয়াও কতকটা অনুমান হইয়াছে যে, আমি দেখিতে ভালই

ছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, বড় হইয়া—এমন কি স্বাধীন হইবার পরও—এতখানি বয়সেও নিজের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার অবসর হয় নাই। ইচ্ছাও না।

॥ ২ ॥

আমার দিদিকে বাবা গৌরীদান করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণনগরে যে ঘরে তাহার বিবাহ হয়—সে সজ্জনের ঘর। অবস্থা তত ভাল ছিল না—দিদিকে ঐ বয়সেই গোয়াল কাড়া ও ধানভানার কাজ শুরু করিতে হইয়াছিল—তথাপি সবদিক দিয়া বিচার করিলে সে সুখেই ছিল বলিতে হইবে। সেও মায়ের মতো স্বল্পায়ু পাইয়াছিল, পঞ্চাশ বছর বয়স হওয়ারও আগে তাহাকে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়—তবু মোটামুটি তাহাকে সৌভাগ্যবতীই বলিব। সতীনের ঘর করিতে হয় নাই, মরার পরও স্বামী অন্য বিবাহ করেন নাই। ছেলেমেয়েগুলিও বেশ ভাল হইয়াছে—ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে?

আমার পাত্র খুঁজিতে কিছু দেরি হইয়াছিল, তাই গৌরীদান করা সম্ভব হয় নাই। খোঁজার কথাটা নিতান্তই সৌজন্যসূচক। বাবার দ্বারা কোনদিন কন্যার পাত্র অন্বেষণ করা যে হইয়া উঠিবে না ইহা তো জানা কথা। তিনি নিজের সাধন-ভজন (এবং ভোজনও) লইয়া থাকিতেন, এসব তুচ্ছ জাগতিক কর্তব্য লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় কোথায়? পাত্রপক্ষ অনেক সময় উপযাচক হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিত—অর্থাৎ উভয়পক্ষের পরিচিত কোন লোকের দ্বারা সম্বন্ধের কথা পাড়িত—তখন বাবা দয়া করিয়া কথাবার্তা কহিতেন।

তবে কথাটা তিনি ভালই কহিতে পারিতেন। ঐ সৌম্য শান্ত চেহারা, ঐ বক্ষলম্বিত দাড়ির রাশি, গম্ভীর কণ্ঠস্বর—তিনি যখন বিবাহ বিষয়ে কথা বলিতেন, মনে হইত তিনি কন্যাদান করিয়া পাত্রপক্ষকেই কৃতার্থ করিতেছেন। পাত্রপক্ষ সমীহ করিয়া কথা বলিত, বেশী দাবী-দাওয়া তুলিতে ভরসা পাইত না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মা যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনিই আত্মীয়-স্বজনদের পাত্রের জন্য তাগাদা করিতেন, আমার পরের বোনের বিবাহ পর্যন্ত তিনিই যোগাযোগ করাইয়াছিলেন, তাহার বেশী আর তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় নাই।

সুতরাং কেহ খোঁজ-খবর করিয়া পাত্র বাছিয়া আমাদের কোন বোনেরই বিবাহ দেয় নাই। যাহার যা বিবাহ হইয়াছে—নিজেদের ভাগ্যমোতাবেক, নিতান্তই ভবিতব্য অনুসারে। তবে ভাগ্য আমার সম্বন্ধে যতটা অপ্রসন্ন ছিলেন এমন আর কোন বোনের বেলাতেই নহে, এমন বিবাহ কাহারও হয় নাই।

সে কথা থাক। বড়র কথা কিছু বলিয়াছি, বাকি আরও চার বোনের কথা লিখিতে গেলে বাজীভোর হইয়া যাইবে। অত কথা আপনারা শুনিবেনই বা কেন? এমন লিখিবার মতো কিছু কাহিনীও নয়। সাধারণ ঘরে বিবাহ হইয়া সাধারণ জীবনযাত্রা যাপন করিয়াছে। এখন আর কেহ বাঁচিয়াও নাই। ভাইবোন কেহই না। আমিই

শুধু মার্কণ্ডেয়র পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া আছি। ভাগ্য যে আমার কেমন—এই দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাও তাহার একটা প্রমাণ। যমেরও অরুচি আমি। ভগবানও আমাকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইতে চাহেন না।…

আমার বিবাহ হয় হুগলী জেলার একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা আর না-ই করিলাম, নামটা নাকি তত ভালও নয়। কলিকাতা হইতে বেশী দূর নয়, এখন তো যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছে, শুনিয়াছি এক ঘণ্টার মধ্যেই পেঁছানো যায়। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখনও ওদিকে রেললাইন বসে নাই, মেন লাইনের কী একটা স্টেশনে নামিয়া পাল্কি বা গোরুর গাড়িতে যাইতে হইত। তবে সেও এমন কোন ব্যয়সাধ্য বা আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয় শুনিয়াছি, আগে আগে—যখন সুস্থ ছিলেন—সোজা হাঁটিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন।

তবুও না বাবা, না দাদা—কেহ কোনদিন ঐ গ্রামে গিয়া খবর লন নাই—যে বাড়িতে তাঁহারা কন্যাদান করিতেছেন বা যে ছেলেকে—সে বা তাহারা কেমন। দাদাকে তত দোষ দিই না, তখন তাঁহার মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়স, বাবা তো মহাস্থবির—তবু, তিনি কোন লোক মারফৎও খবর লইতে পারিতেন। আসলে তেমন কোন আবশ্যকও বোধ করেন নাই। ব্রাহ্মণ ও ভাল ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি প্রস্তাব আনিয়াছিল তাহার নিকট হইতে এই তথ্যটুকু অবগত হইয়াই বাবা পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

আমার শ্বশুররা চট্টোপাধ্যায়, কাশ্যপ গোত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে ঐ পদবী ও একগাছা করিয়া পৈতা ছাড়া আর কোন লক্ষণ ছিল না। আমার যখন বিবাহ হয় তখনই শ্বশুর মৃতপ্রায়—এক কোণের ঘরে পড়িয়া থাকেন—শাশুড়িই গৃহের কর্ত্রী। আমার স্বামীর সাত ভাই, ইনি তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো হইবে, রোগে ও অস্বাস্থ্যে আরও ছোট দেখাইত। ভাল করিয়া গোঁফের রেখাও দেখা দেয় নাই।

সমস্ত পরিবারটিই বসিয়া খাইত। জমি-জমার উপরই যাহা কিছু ভরসা। চাষী গৃহস্থও ঠিক নয়, চাষ সব ভাগেই হইত, নিজেরা মাঠে গিয়া কৃষাণকে দিয়া চাষ করাইতে পারিতেন না, তাহাতে নাকি ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যাইবে, উহা ভদ্রলোকের কাজ নয়। অথচ সংসারও বিরাট। বাবা মা, এক পিসীমা, ছয় ভাই, চার বৌ, তিন ভাইয়ের মোট ছয়টি ছেলেমেয়ে। এছাড়া আউঁতি-যাউঁতি যাহাকে বলে, সে তো ছিলই। দুই ননদেরই কাছাকাছি বিবাহ হইয়াছিল। তাহারা একুনে বছরে তিন-চার মাস করিয়া থাকিয়া যাইত, মায়েদের সহিত ছেলেমেয়েরা তো বটেই, বেশিরভাগ সময় ছেলেমেয়েদের জন্মদাতারাও। সবই যোগ, বিয়োগের মধ্যে এক ভাসুর ইতিমধ্যেই গত হইয়াছিলেন, সে বিধবা জাও বেশীদিন বাঁচেন নাই।

অবশ্য বসিয়া খাওয়া ছাড়া ইঁহাদের উপায়ও ছিল না বিশেষ। প্রথমত সকলেই মূর্খ, সামান্য বাংলা লেখাপড়ার বেশী কাহারও কোন শিক্ষা অগ্রসর হয় নাই, তাও পাঠশালায় কেহ পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জায়েদের মধ্যে আমারই—মায়ের কল্যাণে—অক্ষরপরিচয় ছিল (সেটাও আমার অন্যতম অ-গুণ) দ্বিতীয়ত—আমি

যখনকার কথা বলিতেছি তখন—ওখানে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া ছিল, সকলেই বারোমাস জ্বরে ভুগিতেন। আমার শ্বশুর মুমূর্ষুর মতো ধুঁকিতেন—কিন্তু তাঁহার অত কিছু বয়স হয় নাই, আসলে ম্যালেরিয়াতেই তাঁহাকে অমন পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। কেবল আমার শাশুড়িই বেশ শক্ত ছিলেন। বোধকরি সেই জন্যই তাঁহার অত প্রতাপ। বাকী সকলেই তো মাসের মধ্যে কুড়িদিন আধমরা হইয়া থাকিতেন।

আমাদের ইনিও সেই দলে। ফুলশয্যার রাত্রেই তাঁহার তিনখানা কাঁথার উপর শেষ পর্যন্ত আমাকেও চাপিয়া শুইয়া থাকিতে হইয়াছিল, এত শীত। তাহার পূর্বে এমন কাঁপুনি কখনও দেখি নাই। ম্যালেরিয়া জ্বর নাম শোনা ছিল এই পর্যন্ত, আমাদের পরিবারে কাহারও ছিল না। সে কাঁপুনির কাণ্ড দেখিয়া রীতিমতো ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। ভূতে পাইল কিনা মানুষটাকে—সন্দেহ হইয়াছিল।

বাড়িসুদ্ধ সকলেই অল্পবিস্তর ভুগিত কেবল আমি ছাড়া। ভগবান আমাকে এমনই স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন যে, কোন রোগ কোনদিন আমাকে কাবু করিতে পারে নাই। আর প্রধানত সেই জন্যই প্রথম হইতেই আমি শ্বশুরবাড়ির বিষ-নজরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার শাশুড়ির ভাষায় 'নিকড়ে গতর' আমার একটা প্রধান অপরাধ হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল—আমার 'ডাইনীত্বের' অন্যতম প্রমাণ—সকলে ভোগে, গ্রামসুদ্ধই—আমার কিছু হয় না কেন? ইহার মধ্যে অলৌকিক কোন কাণ্ডকারখানা না থাকিয়াই পারে না।

আমার মনে হয় আমার পূর্ববর্তী জায়েদেরও পর্যায়ক্রমে নির্যাতন সহিতে হইয়াছে, নূতন মানুষ আসামাত্র তাঁহারা একে একে নির্যাতিতর দল হইতে—ছেলেরা যাহাকে বলে 'প্রমোশন'—পাইয়া নির্যাতনকারীর দলে উঠিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। এবার আমার পালা। অথচ আমি আসাতে আমার জায়েদের সুবিধা হইয়াছিল ঢের। সকলেরই কোলে ছেলে—স্বাস্থ্যও কাহারও ভাল নয়—সেই অবস্থাতেই সংসারের কাজ বজায় দিতে হইত। অতবড় সংসারে কাজ বড় কম নয়। একটা 'জল-অচল' জাতের মেয়ে ছিল, সে দুইবেলা বাসন মাজিয়া বাহিরের রকে উপুড় করিয়া দিয়া যাইত শুধু। আর একটি আরও নিচু জাতের মেয়ে ভিতর-বাহিরের মেটে উঠান নিকাইয়া ছড়াঝাঁট দিয়া গোয়াল কাড়িয়া চলিয়া যাইত। বাড়ির মধ্যে যা কিছু কাজ, ঝাঁট দেওয়া, মোছা, মাটির ঘরগুলি নিকানো, ক্ষার কাচা, রান্নাঘরের পাট—সবই আমাদের করণীয় ছিল। মাজা বাসন একবার শুদ্ধ অর্থাৎ আমাদের-আনা জল দিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে হইত, কদাচিৎ তাহাতে কোন কালি বা উচ্ছিষ্টের আভাস দেখিলে আবার সবগুলি গোবরমাটি দিয়া মাজিয়া ধুইয়া—ঝিয়ের স্পর্শদোষ ঘটার জন্য—পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিতে হইত।

এছাড়া ধানের পাট ছিল বিরাট। ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, গরুর খড় কাটা—সবই আমাদের করিতে হইত। আগে নাকি ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার কাজটাও ছিল, আমার এক জায়ের গর্ভপাত হওয়ার পরে সেটা বন্ধ হইয়াছে, এক কিষাণের বৌ আসিয়া সে কাজটা করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করা ও শুকানো—সেইটাই তো একটা মস্ত পর্ব ছিল। বিশেষ বর্ষাকালে। ঐ দ্যাখ দ্যাখ—বুঝি জল আসিল, ধান জড়ো করিয়া ধামায় তোল, দাওয়ায় তুলিয়া রাখো, নয়তো টোকা চাপা দাও (জলের

বেগ বুঝিয়া), আবার আকাশ একটু পরিষ্কার হইল তো, সেগুলি পুনরায় ছড়াইয়া দাও, নাহলেই চালে 'নাদপচা' গন্ধ ছাড়িবে।

সেও এতটুকু দেরি হওয়ার জো ছিল না। অমনি শাশুড়ি ঠাকরুনের সুমধুর বাক্য বৃষ্টি হইতে থাকিত, 'চোখ-খাকীর দল কি রোদ বেরোলেও দেখতে পায় না? বলি, ফলনা চাটুয্যের সংসারে এসেছি বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি যে, উদয়-অস্ত এই নারদের সংসারে সব কাজ আমাকেই করতে হবে? বলি কুঁড়েপাতর গেলবার বেলায় তো সব ঠিক আছে। তখন দু'হাত ছেড়ে চার হাত বেরোবে, ধানগুলো না শুকোলে সে পিণ্ডির যোগাড়টা আসবে কোথা থেকে? তখন তো তাহলে এই শাশুড়িমাগীর হাতটা-পাটা কেটে সেদ্ধ ক'রে খেতে হবে। নিজেরা গিলবি—সে যোগাড়েও আলিস্যি!'

এ সামান্য একটু নমুনা দিলাম। অপেক্ষাকৃত নির্দোষ নমুনা ধরিয়া লইতে পারেন। সামান্য তিন-চারটি শব্দেই কাজ হয়, 'ন-বৌমা (কি নতুন বৌমা) ধানগুলো মেলে দিয়ে এসো।' কিন্তু সংক্ষেপে সরল ভাষা ব্যবহার করা আমার ঠাকুরানীর ধাতেই ছিল না। খোঁচা না দিয়া বা নিজের ভাগ্যের সম্বন্ধে একটু বিলাপ না জুড়িয়া কোন কথাই তিনি বলিতে পারিতেন না।···

যাহা বলিতেছিলাম। আমি আসার পর আমার সুস্বাস্থ্যের অজুহাতে এই সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজগুলিই আমার উপর চাপিয়াছিল। এক একদিন দিনে-রাতে একদণ্ডও অবসর মিলিত না। তথাপি জায়েরাও আমার উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহাদের মতো যখন তখন কোঁ-কোঁ করিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম না, অথবা গোপনে কুপথ্য করিয়া ঘন ঘন বাগানে ছুটিতাম না—এটা তাঁহাদের বড় ঈর্ষার কারণ ছিল। আমি যে 'ডাইনী' বা 'পিশাচে-পাওয়া' সে বিষয়ে তাঁহারাও আমার ঠাকুরানীর সহিত একমত ছিলেন। এবং মা মনসাকে ধুনার ধোঁয়া যোগাইতে—অর্থাৎ আমার শাশুড়ির কাছে আমার নামে সাতখানা করিয়া লাগাইতে তাঁহাদের উৎসাহের অবধি ছিল না। তাহাতে একটু সুবিধা এই হইত যে, তখনকার মতো শাশুড়ির সহিত, যে লাগাইত তাহার, গলায় গলায় ভাব হইয়া যাইত। সেই সময়টার জন্য অন্তত বাক্যবাণটা তাহার উপর বর্ষিত হইত না।

জায়েদের আরও একটা সুবিধা, তাহাদের সকলেরই বাপের বাড়ি হইতে খোঁজখবর করিত, মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইত। আমার ও পাট ছিল না। সব থাকিতেও নাই। একটি তো দাদা, তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া সেই বয়সেই কাজকর্ম দেখিতে শুরু করিয়াছেন, নহিলে সংসার চলে না। আমার বিবাহের সময়েই তাঁহাকে প্রথম বাহির হইতে হয়—কয়েকটি শিষ্যবাড়ি ঘুরিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমার বাবা নাকি এসব 'উঞ্ছবৃত্তি' বা 'ভিক্ষাবৃত্তি' পছন্দ করিতেন না—কিন্তু না করিলে এতবড় সংসারটা চলিবে কিসে, ক্রিয়াকলাপ পূজাপার্বন বিবাহ উপনয়ন এইসবই বা উঠিবে কিসে—সে প্রশ্ন করিলেও কোন সদুত্তর দিতে পারিতেন না। অগত্যা মায়ের কাতর বিলাপেই আরও, ঐ বয়সেই দাদাকে সংসার বুঝিয়া লইতে হইয়াছিল।

তা ছাড়াও, বিবাহিত মেয়েদের যখন-তখন বাপের বাড়ি আসা বাবা ভাল চোখে দেখিতেন না। বিবাহের পর আদৌ বাপের বাড়ি আসা উচিত নয়—এই ছিল তাঁহার অভিমত। কথায় কথায় তিনি সীতা, দ্রৌপদীর উদাহরণ দিতেন। রাজপুত রাজাদের কথা বলিতেন। সীতা, দ্রৌপদী এত কষ্ট পাইয়াছেন, তবু বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা কেহ চিন্তাও করেন নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া দ্যাখো না, কোন কন্যা বিবাহের পর পিত্রালয়ে গিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করো দিকি! এই যে রাজপুত রাজারা—সাত-আট বছরের মেয়েরা শ্বশুর ঘর করিতে আসে, একেবারে মরিয়া বাহির হয়। ইত্যাদি—

তখন বাপ-মায়ের, বিশেষ বাবার মুখের উপর কথা বলার রীতি ছিল না। এখন হইলে প্রশ্ন করিতাম, 'আপনি যত উদাহরণ দেন সবই তো রাজারাজড়ার ঘরের, আপনি কি আপনার মেয়েদের সেই রকম বিবাহ দিয়াছেন? তবে সে দৃষ্টান্ত দেন কেন? কাঁচ মেয়েদের কঠোর পরিশ্রম আর অসীম জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে দুই-একটা দিন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর দেওয়া আপনার কর্তব্য।'

তা নয়। এখন বুঝি—বাবা কোন ঝঞ্ঝাট পোহাইতে রাজী ছিলেন না। তিনি তো মেয়ে আনিতে যাইবেনই না, অপরকে অর্থাৎ ছেলেকে পাঠাইয়া আনিতে হইলেও জামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসা প্রয়োজন। সে যদি সত্যই আসিয়া হাজির হয়, বড় ঝামেলা নয় কি? খরচও তো বটে, এইসব কাজে বাজে-খরচ হইলে তাঁহার চর্বচোষ্য জোটে কোথা হইতে?

তবু আমার দাদা পরবর্তীকালে দুই-একবার গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার শাশুড়ি পাঠান নাই। কোন না কোন অজুহাত দেখাইয়া তখনকার মতো ফিরাইয়া দিয়াছেন, এমন কি মার মৃত্যুর পরও আমার যাওয়া হইয়া উঠে নাই। আমার দাদা নিজে আসিয়া দায় জানান নাই—একা লোক কত দিকেই বা যান—এক জাঠতুতো ভাইকে পাঠাইয়াছিলেন—এই অপরাধে যথেষ্ট বাঁকা কথা শুনাইয়া ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। এখান হইতে কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও যায় নাই। এমন কি যথারীতি নিমন্ত্রণ হয় নাই—এই ছুতায় লৌকিকতা করার দায়িত্বও এড়াইয়া গিয়াছেন। কোনমতে এখানেই নিয়ম-রক্ষার মতো একটা চতুর্থী করাইয়াছিলেন, সেই বোধ করি আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য।

আসলে এই ডাইনীর 'নিকড়ে গতরে' এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন আমার শাশুড়ি যে, একবেলাও থাকিব না মনে করিলে চোখে অন্ধকার দেখিতেন।

॥ ৩ ॥

এইবার বোধ হয় আমার পতিদেবতার কথা কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু কি বলিব? পতি পরম গুরু, আশৈশব মার মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু সেভাবে কোনদিনই মানুষটাকে দেখিতে পারি নাই। সেজন্য যদি কিছু অন্যায় হইয়া থাকে, মা সতীরাণী আমাকে মার্জনা করিবেন।

প্রথমত আমার যা স্বাস্থ্য ও বাড়নশা গঠন ছিল—স্বামী স্ত্রী মোটেই মানায় নাই। আমার শাশুড়ি তো আমার আসল বয়স বিশ্বাসই করিতেন না—বলিতেন, 'বাপ মিনসে নাকি মুনি ঋষি, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির শুনতে পাই।······একের নম্বরের মিথ্যেবাদী, গঙ্গাজলে বাস্বুলে! ঐ মেয়ের বয়েস দশ বছর! কেউ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বিশ্বাস করব না। বলি আমরা কি জাব খাই, না ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? ধানের চেলের ভাত খাই না আমরা, আমাদের চোখ নেই? দশ বছর ওর হাঁটুর বয়েস!' তা তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না, আমার জায়েরা সকলেই ছিলেন ক্ষয়াঘষা কেন্‌খুরি চেহারার মানুষ, তাঁহাদের বয়স বাড়িত না। আরও, তাঁহাদের দেখিয়াই বয়স সম্বন্ধে শাশুড়ির ঐ রকম ধারণা হইয়াছিল।

সুতরাং আমার স্বামীকে আমার পাশে ছোট ভাইয়ের মতো মনে হইত। আমার নিজেরই কেমন সেই ধরনের একটা অনুভূতি হইত মধ্যে মধ্যে। কোনদিন তাঁহার সহিত রাগারাগি হইলে ঝগড়া করি নাই। বয়স্কা দিদির মতোই ধমক দিয়াছি—বেশ মনে পড়ে।

আমার স্বামীর নাম ছিল হরিচরণ। নামটা দেখুন—বলিয়াই ফেলিলাম। তা মুখে তো বলিতেছি না—লিখিতে দোষ কি? এই এক জ্বালা, মুখে কোনদিন হরিনাম করিতে পারিলাম না। হরিবোল বলাও নিষেধ। ভুলিয়া যে এক-আধ সময় শব্দটা উচ্চারণ করি নাই তাহা নয়—তবে সে কদাচ কখনও।

রোগা লিকলিকে, পেটটা ডাগর, হাত-পা কাঠি-কাঠি—হরিদ্রাভ চোখ, ম্যালেরিয়া-নিঃশেষিত চেহারা। তেমন ঢ্যাঙ্গাও ছিলেন না, পুরুষ মানুষের একটা লক্ষণও ছিল না তাঁহাতে। অথচ ঐ বয়সেই—লেখাপড়া তো বাংলা দ্বিতীয় ভাগ এবং ইংরেজী বর্ণ-পরিচয় পর্যন্ত দৌড়, তাও দ্বিতীয় ভাগটাও শেষ হয় নাই বোধ হয়—নেশাতে পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তামাক খাইয়া খাইয়া দাঁত হলদে হইয়া গিয়াছিল, এখন মনে হয় গোপনে গাঁজাও খাইতেন। তখন গন্ধটা চিনিতাম না। পরে বুঝিয়াছি। তবু ঠিক যে ঘৃণা করিয়াছি কখনও এমন নয়, একটু বরং অনুকম্পার চোখেই দেখিয়াছি বরাবর।

সুতরাং—যাহাকে স্বামী বলিয়া আদৌ ধারণা হয় নাই, তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা—ইহা সম্ভব নয়। মধুর দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী বা বিবরণ ঐ বয়সেই যে একেবারে শুনি নাই তাহা নহে। পরবর্তী কালে তো অনেক শুনিয়াছি—কিন্তু আমার জীবনে সে অভিজ্ঞতা লাভ কখনও ঘটে নাই। তাছাড়া আমার মনে হয় আমার ভাবভঙ্গী, বলিষ্ঠ গঠন ও গায়ের জোর দেখিয়া, তিনি আমাকে একটু সমীহই করিতেন। স্ত্রী বা প্রেয়সী বলিয়া কখনও ভাবিতে পারেন নাই।···অথবা, অবিরাম 'ডাইনী' ও 'পিশাচে-পাওয়া' অভিধা দুইটা শুনিতে শুনিতে তিনিও কিছু ভয় পাইয়া থাকিবেন—কে বলিতে পারে!

তবে চেহারা ও স্বাস্থ্য যেমনই হউক—শুধু নেশা নয়, অন্যরকমেও বেশ পাকিয়া-ছিলেন। আমি ছাড়াও তাঁহার স্ত্রী-সংসর্গ ঘটিয়াছে। বিবাহের আগে কিনা বলিতে পারিব না, বিবাহের পরে তো বটেই। কথাবার্তার ফাঁকে, কখনও বা উত্তেজনার মুখে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উহারই মধ্যে এক-আধদিন যেটুকু রসের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে—সে সময়ও—তুলনামূলকভাবে। অভিজ্ঞতাটা প্রধানত হইয়াছিল, যে দাসী

আমাদের বাহিরের কাজ করিত তাহার কন্যাকে অবলম্বন করিয়া—এটা আমার কাছে তিনি স্বীকারই করিয়াছেন। তবে ঐখানেই যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাও জানি। হয়ত অমনিই কোন বর্ণেতর জাতির মেয়ের সর্বনাশ করিয়াছেন। বামুনের ছেলে দেখিলেই যাহারা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সর্বতোভাবে ব্রাহ্মণের সেবা করা যাহারা পুণ্যকর্ম মনে করে—সেখানে তাহাদের কাছেই এই শ্রেণীর ইতর লিপ্সা চরিতার্থ করা সুবিধা। তবে ঘরে ঘরেও যে কিছু হয় নাই—এমন কথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না।

আমার শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়াটাই ছিল বড় কদর্য। মানুষ অমানুষ হইতে বাধ্য।

যাহা হউক—ঘি আর আগুন কাছাকাছি থাকিলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করিবে ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? সমীহ করুন আর ঘৃণা করুন—যাহাই করুন না কেন, এক শয্যায় পাশাপাশি শুইয়া শরীরের ধর্ম পালন করিবেন না, ইহা সম্ভব নহে। বিশেষ যেখানে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াই গিয়াছে, স্বভাবের ধর্ম অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। ......আমার আদৌ ভাল লাগে নাই। যাহাকে স্বামী তো নয়ই—পুরুষ বলিয়া ভাবিতেই বাধে, যাহার দেহ বা সংসর্গ সম্বন্ধে কোন প্রকার আকর্ষণ নাই, যাহাকে ঘৃণার যোগ্যও মনে হয় না—অনুকম্পার পাত্র মনে করি, যে স্বামী অন্য নারীতে গমন করে জানিয়াও ঈর্ষা বোধ করি না—তাহার কাছে স্ত্রী হিসাবে আত্মসমর্পণ করিতে ভাল লাগার কথাও নয়। তবে সে সময় ছিল অন্য রকম, স্বামীর লালসা বা কামনায় বাধা দেওয়া সম্ভব—প্রতিবাদ করা বা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসা, কি অন্য শয্যায় চলিয়া যাওয়া চলে—এ তখন বড়-একটা কোন মেয়ে ভাবিতেও পারিত না। আমিও পারি নাই। ইহাই আমার ভাগ্য, আমার নিয়তি—এ সহ্য করিতেই হইবে। এইভাবেই সহ্য করিয়াছি। কখনও বাধাও দিই নাই বা এই লইয়া কলহ-কেজিয়াও করি নাই। তবে আমার তরফ হইতে কোন উৎসাহ বা কামনাও প্রকাশ পায় নাই। পুতুলের মতোই পড়িয়া থাকিয়াছি।

তবু তেরো বছর বয়স অবধি আমার গর্ভে সন্তান আসে নাই। আমি তো সে তথ্যের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিতে পাই নাই, কিন্তু আমার শাশুড়ি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যেই চারিদিকে মানত শুরু হইয়া গেল, বাবা তারকনাথের দোর ধরা হইল। মাদুলিও বেশ গুটিকতক হাতে-গলায় উঠিল—এবং আমার জায়েরা পরম তৃপ্তির সহিত শুনাইতে লাগিলেন, 'দেখো না মজা, বড়জোর আর ক'টা মাস দেখবে, তারপরই আমাদের দেওরের আর একটি বিয়ের জন্যে ঘটক লাগানো হবে।...এত ছেলে-মেয়ে বাড়িতে, তবু আমার শাশুড়ির হরিচরণের ছেলের জন্যে প্রাণ বেরিয়ে গেল একেবারে!'

আমি অবশ্য গোড়ার দিকে অত ভয় পাই নাই। বরং বলিয়াছি, 'ভালই তো, বাঁচা যায় তাহলে, আমি অব্যাহতি পাই।'

'উঁ! তা আর নয়।' জায়েরা মুখে 'পিচ' করিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিতেন, 'ভাবছ তোমাকে ছেড়ে দেবে? দিচ্ছে এই আর কি! বরং আরও ভাল ক'রে সংসারটি ঘাড়ে চাপাবে। গাধার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বলবে বাঁজাখাঁজা মানুষ খাটবে-না তো কি! এক বাপের বাড়ির তেমন জোর থাকত, সেকথা আলাদা।'

এই আঘাতটাই মর্মান্তিক লাগিত। সত্যই তো, আমার বাপের বাড়ির জোর কোথায়? আমার স্বামীর পুনরায় বিবাহ হইতেছে জানিলেও কেহ লইয়া যাইবে না, উঁকিই মারিবে না তো লইয়া যাওয়া—এই সংসারে এমনিই উদয়-অস্ত দাসীর মতো খাটিতেছি, তখন হয়ত সোজাসুজি দাসীর খাতাতেই নাম উঠিবে। এখন ঘরে শুইতে পাই, তখন হয়ত গোয়ালে শোওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

কথাটা ভাবিলেই দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিত। সতীন হইবে, স্বামীর ভাগ দিতে হইবে বলিয়া নহে—সে তো এই বয়সে এমনিই দিতে হইয়াছে—নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়াই আরও। বাবা আছেন দাদা আছেন—তবু কেহ একবার খবর লইতে আসেন না। সব থাকিতেও যে অনাথা, তাহাকে সকলেই দুই পায়ে দলিয়া থাকে।...

যাহা হউক, সে দুর্গতি আর পোহাইতে হইল না। আমার তো বটেই—আর একটা ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের মেয়ে যে আসিত—তাহার কথা ভাবিয়াই শিহরিয়া উঠি। আমার ভরা চোদ্দ বছর বয়সে একটি সন্তান কোলে আসিল। পুত্র-সন্তান। তারকনাথের দোরধরা বলিরা তারকনাথই নাম রাখা হইল।

এ অবস্থায়, অনেকেই ভাবিবেন যে, এবার আমার কিছু আদর বাড়িল—অন্তত পক্ষে নির্যাতনটা কিছু কমিল। হায়, হায়! আদর যাহার হইল তাহার হইল, আমি কে? আমি একটা যন্ত্র বই তো আর কিছু নয়। ছেলে আসিয়া গিয়াছে, এখন বধূ মরিলেই বা ক্ষতি কি? শাশুড়ি নিত্য ছড়া কাটাইতেন, 'বেঁচে থাক আমার মোহনবাঁশী, কত শত মিলবে দাসী!' বরং—ছেলেকে উপলক্ষ করিয়া লাঞ্ছনা আরও বাড়িয়াই গেল।...সেই সব মুহূর্তে ছেলেটাকে যেন শত্রু মনে হইত।

আর পরিশ্রম?

এখনকার মেয়েদের দেখি একটা ছেলে বা মেয়ে হইলে—হিন্দুস্থানীদের দেখাদেখি বাচ্ছা বলার চল হইয়াছে—পোয়াতী যেন রাতারাতি রাজরাণী বা আরও বেশী, দেবী বনিয়া যায়। তাহারা নড়িয়া ঘাস খায় না, গুরুজনরা—বিশেষ স্বামীও—তাহাদের কুটি ভাঙ্গিয়া দুটি করিতে দেয় না! তখন এ ধরনের আদিখ্যেতা ছিলও না। মাকে দেখিয়াছি আঁতুড় উঠিয়া গেলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াই হাঁড়ি-হেঁসেল তুলিয়া লইতেন। শুধু মা কেন আশেপাশে অনেক দেখিয়াছি, দেশে কলিকাতায়—ছেলে হইয়াছে বলিয়া সংসারের কাজ অচল হইবে, কিংবা অন্য লোক আমদানী করিতে হইবে—একথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। তাবড় তাবড় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদেরও দেখিয়াছি, ছেলের পায়ে কাপড় বাঁধিয়া রাখিয়া সংসারের কাজ করিতেছে। ছেলে-মেয়েকে একটু দুধ খাওয়াইবারই সময় পায় না। তাহাতে ছেলে-মেয়েরা মরিয়া যাইত না। আমার তো কথাই নাই, ভারী ভারী এবং কষ্টসাধ্য যাবতীয় কাজ যেমন আমার ঘাড়ে চাপিয়া ছিল—তেমনিই রহিল।

তবে এত দুঃখের মধ্যে ঐ একটা সান্ত্বনা মিলিয়াছিল—ছেলেটা। সহস্র কষ্ট-লাঞ্ছনার মধ্যেও উহার দিকে চাহিলে যেন সব ভুলিয়া যাইতাম, কিছুক্ষণের জন্য এ পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্ক থাকিত না।

আর তখন হইতেই হিসাব করিতাম, ছেলে কতদিনে বড় হইয়া উঠিবে, আমার দুঃখ ঘুচাইবে।

এদিকে আমার ছেলেও যেমন একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল—আমাদের ইনি তেমনি যেন দিন দিন ছোট হইয়া যাইতে লাগিলেন। কোথা হইতে যেন নানান খারাপ রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরিল। রোগ বলি কেন—রোগ তো সারিয়া যায়, আমার ভাসুররা তো জ্বর ও পেটের গোলমাল বেশ মানাইয়া লইয়া সহজভাবে ঘুরিয়া, বেড়াইতেছেন, বরং মনে হয় তাঁহারা আগের চেয়ে সুস্থই হইয়া উঠিয়াছেন—আসলে এ লোকটাকে দুর্ভাগ্যই আসিয়া ধরিয়াছিল।

এমনিতেই তো ক্ষীণজীবী এতটুকু মানুষ, ছেলের বাপ হইবার পরেও ভাল করিয়া দাড়ি উঠে নাই। তাহার উপর ক্রমে এখন যেন আরও কৃশ আরও খর্বকায় হইয়া গেলেন। জ্বর তো আছেই, আনুষঙ্গিক প্লীহা-যকৃতও—ইদানীং আবার গ্রহণী আসিয়া জুটিল। নিত্য আমাশয়—লাগিয়াই আছে। কত কি টোটকা ওষুধ খাওয়ানো, ঝাড়ফুঁকও করা হইল। শেষে একজন প্রবীণ কবিরাজও ডাকা হইল—কিন্তু কিছুতেই সারার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

বলা বাহুল্য—ইহার পুরা দায়িত্বটাই আমার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। ভাসুররা তবু কিছু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতেন, 'তখনই বলেছিলুম হরেটা ঐ ল্যাকপেকে ছেলে, ওকে ঐ রকম বুকচাপ মেয়ের সঙ্গে শুতে দিও না—তা আমাদের কথা তো শুনবে না, সবই তুমি বেশী বোঝ বেশী জানো—এখন ভাল ক'রেই বুঝবে।'

শাশুড়ী ও জায়েরা, একজন প্রকাশ্যে, বাকীরা একটু চোখের আড়ালে বলাবলি করিতে লাগিলেন, আমি 'ডাইনী'—স্বামীর রক্ত শুষিয়া খাইতেছি। জায়েরা সকলেই এই উপলক্ষে শাশুড়ির 'সো' হইয়া গেলেন, 'আপনিই তো বরাবর বলেছেন মা যে, এ মেয়ে কখনও সাধারণ মানুষ নয়। এদেশে এসেও যার ম্যালেরিয়া হয় না, তাকে কোন অন্যি-দেবতা রক্ষে করেন নিশ্চই।...তা সব জেনে-শুনে আপনি কেন একঘরে একখাটে শোওয়ার ব্যবস্থা করলেন? ওর দোষ কি, যদি সত্যিই অন্যি-দেবতায় ভর ক'রে থাকে—তার তো একটা খোরাক চাই! পিশাচে ভর করলে শুনেছি নিত্যি একপো ক'রে রক্ত খায় সে।...দুগ্‌গা দুগ্‌গা—আমাদের ছেলেগুলোর দিকে না নজর পড়ে!...আপনার নতুন ছেলে আসলে ডাইনীচোষা হয়ে যাচ্ছে, তা বুঝছেন না?"

শাশুড়ি অনেকদিনই বুঝিয়াছিলেন, আমার উপর অন্যত্র শোয়ারও আদেশ হইয়াছিল, তারক তাঁহার কাছে থাকিবে, আমি ভাঁড়ার ঘরে বিছানা করিয়া রাত্রে শুইব—এই রূপই হুকুম ছিল—কিন্তু বাধ সাধিয়াছিলেন তাঁহার পঞ্চম পুত্রই। তিনিই চেঁচামেচি করিয়া গালি-গালাজ দিয়া এ ব্যবস্থা রদ করাইয়াছিলেন। প্রতিবাদের প্রথম কারণটা লিখিতে লজ্জা হয়—স্ত্রী-সঙ্গ তাঁহার একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণটা প্রত্যক্ষ—সেবাযত্ন; পেটের অসুখে ঘন ঘন বাহিরে যাইতে হইত, আমিই প্রদীপ লইয়া সঙ্গে যাইতাম, হাত-পা সর্বদা কন্‌কন্ করিত—মধ্যে মধ্যেই উঠিয়া টিপিয়া দিতে হইত। এই সব সেবা মা কি ভাজদের দ্বারা সম্ভব নয়। তবু বেশীদিন তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। আসলে, সত্য কথা বলিতে কি, আমারও আর ভাল লাগিতেছিল না। কী সুখের জন্য আমি অবিরাম বাড়িসুদ্ধ লোকের বাক্য-যন্ত্রণা সহিব? শুধু বাক্যও নহে, তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া ঠাকুরানী ইদানীং মার-ধোরও শুরু করিয়াছিলেন, উপলক্ষ যাহাই হউক,

লক্ষ্যটা কোথায় তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিত না। তাছাড়া, একই কথা শুনিতে শুনিতে আমারও কেমন একটু ভয় ধরিয়া গিয়াছিল। মনে হইত—কথাটার মধ্যে সত্যই কিছু সত্য নাই তো? যথার্থই যদি এমন হয় যে, আমার নজরেই উঁহার এই দশা হইতেছে, দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছেন? সুতরাং আমিই কাঁদিয়া-কাটিয়া স্বামীর হাতে-পায়ে ধরিয়া মত করাইলাম। আমারই পরামর্শ মতো তিনি একটা শর্ত করিলেন, বৌ যদি অন্যত্র শোয় তাহা হইলে মাকে তাঁহার কাছে শুইতে হইবে।

সেই ব্যবস্থাই হইল, কিন্তু তাহাতেও সর্বনাশ ঠেকানো গেল না।

তারকের তিন বছরের সময় তাহার পিতামহ মারা গেলেন। তিনি যে এতকাল বাঁচিয়া ছিলেন—তাহাই যেন বাড়িসুদ্ধ লোক ভুলিয়া গিয়াছিল। ও পাশের একটা ঘরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া চিঁচিঁ করিতেন, আমার সতীলক্ষ্মী শাশুড়ি কখনও উঁকি মারিয়াও দেখিতেন কিনা সন্দেহ। সে করুনাও আমাকেই করিতে হইত। তবু, তাঁহার মৃত্যুও যে আমার জন্যই ত্বরান্বিত হইল—এমন কথাও বলিতে বাধিল না শাশুড়ি ঠাকুরুনের—'সব্বনেশে বৌ যেদিন বাড়ি ঢুকল সেইদিন থেকেই মানুষটা শয্যেধরা হয়ে পড়ল। তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার, কী বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুললুম।...ঐ ভয়ে আমার গোপালের বে'র কথা মুখে উচ্চারণ করছি না, আবার কি করতে কি হবে, কোন্ রাক্কুসী বাড়ি ঢুকবে তা কে জানে!...নইলে গোপালের বৌ দেখবেন ওঁর খুব সাধ ছিল।'

গোপাল আমাদের ইঁহার পরের ভাই। মাসীর কাছেই থাকে—নামে লেখাপড়া করে, আসল কথা মাসীর অবস্থা ভাল, একটা ছেলে যদি পরের উপর দিয়া মানুষ হয় তো মন্দ কি!

আমার শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই উনি যেন আরও কেমন দুর্বল হইয়া পড়িলেন, কেমন একটা মনমরা ভাবও। প্রায়ই বলিতে লাগিলেন, 'আমি আর বাঁচব না নতুন বৌ, আমার শেষ হয়ে এয়েছে। কিছুই তো পেলি না, কোন সাধই তো মিটল না বলতে গেলে, তার ওপর এই বয়সেই মাছ-ভাত খাওয়াটাও তোর দেখছি বন্ধ হয়ে গেল! তা আমি বলি কি, পেলে লুকিয়ে-চুরিয়ে খেয়ে নিস, পাপ হয় আমার হবে। সে কৈফেৎ আমি দিতে পারব চিত্তরগুপ্তকে!'

আমিও বুঝিলাম বেশী দিন নয়। খুব বাল্যে একবার কোন এক প্রতিবেশীর অসুখের সময় মা একটা কথা বলিয়াছিলেন, আমি কখনও ভুলি নাই। এতদিনের জীবনে কথাটার সত্যতা বার বার মিলাইয়া দেখিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন, 'ও আর বাঁচবে না। ওর নিজেরই যখন বাঁচবার আশা গেছে, ইচ্ছে গেছে, ও কোন ডাক্তার-বদ্যিতেই কিছু করতে পারবে না, ওরা দুর্গোচরণ ডাক্তারকে আনাচ্ছে, আনালে কি হবে, রুগীর বাঁচবার ইচ্ছেই নেই—কে বাঁচাবে! রোগ আট আনা সারে ওষুধে, আট আনা সারে রুগীর মনের জোরে।'

কথাটা যে আমার নিজের জীবনেই এ রকমভাবে খাটিবে কে জানিত! সত্যই যেন লোকটার বাঁচিবার আগ্রহ, রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাই চলিয়া গেল। ফলে আমার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর আট মাসের মধ্যেই উনিও চলিয়া গেলেন। তারকের তখন চার বছরও পুরা হয় নাই। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে আমি বিধবা হইলাম।

॥ ৪ ॥

এই মর্মান্তিক সংবাদ পাইয়া বাবা না হউক, দাদা আসিয়াছিলেন। না আসিলেই ভাল করিতেন। আমার তো কোন সুবিধা হইলই না, মাঝখান হইতে তাঁহার অপমানের শেষ রহিল না।

দাদা এবারও লইয়া যাইবার কথা বলিতে পারিলেন না। বাধা অনেক। তিনিও বিবাহ করিয়াছেন, নহিলে বাবার রান্না দাদাকেই করিতে হয়। যাহাকে অবিরাম দেশ ও কলিকাতা যাওয়া-আসা করিতে হইতেছে তাহার সময় কোথা? একটা ছোটবোন তখনও অনূঢ়া আছে বটে, তবে তাহাকে ঐ ঘানিগাছে জুতিয়া দিলে আর বোধহয় বিবাহ দেওয়া যাইবে না। সে এমনিতেই যথেষ্ট রোগা—মার পুরা শরীর খারাপে তাহার জন্ম। সাধারণ রান্না কি ঘরের কাজে কিছু ক্ষতি হয় না—কিন্তু আমাদের সংসারে দুটার কোনটাই সাধারণ নয়। বাবার আহারের পরিপাটি কিছুমাত্র কমে নাই, পান হইতে চুন খসিলেই আজকাল থালা ছাড়িয়া রাগ করিয়া উঠিয়া যান। সুতরাং দাদাকে বিবাহ করিয়া বাবার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়াইয়া—বৌকে জল-চল করিয়া লইতে হইয়াছে। সেও বালিকামাত্র শুনিয়াছি, তবে সেজন্য অনুকম্পা করিয়া কাজের চাপ কিছু কমাইবেন—বাবা এত দুর্বলচিত্ত লোক নহেন।

মোট কথা খরচ কমে নাই, উপরন্তু পর পর বোনদের বিবাহ দিয়া দাদা কিছু ঋণগ্রস্তও হইয়াছেন। অথচ আয় কমিয়াই যাইতেছে দিন দিন। শিষ্য-সেবকদের কাছে আদায় অনেক কমিয়াছে। বাবা গেলে যে কাজ হয় দাদা গেলে তাহা হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ বাবা বর্তমানে।

অবস্থা সব খুলিয়া বলিয়া, চিরদিনের জন্য যে আমার ভার লওয়া সম্ভব নয় সেইটাই আভাসে বুঝাইয়া দিয়া দাদা প্রস্তাব করিলেন, 'তা কাজকর্ম চুকে গেলে—মাসখানেক না হয় ওখানে—? সেই কথাই তোর শাশুড়িকে বলি—য়্যাঁ?'

আমি সবেগে মাথা নাড়িলাম। বয়স আমার যাহাই হউক, এই গত প্রায় আট বছর অবিরাম প্রতিকূল ভাগ্যের সহিত যুঝিয়া অভিজ্ঞতা অনেক হইয়াছে। সংসারটাকে ঢের বেশী চিনিতে শিখিয়াছি। আমি বলিলাম, 'না দাদা, একমাস কেন, দশ দিনের জন্যে নিয়ে গেলেও এরা আর আনবে না। তুমি সঙ্গে ক'রে এনে পেঁছে দিলেও ঢুকতে পারব কিনা সন্দেহ। যদি চিরকালের মতো বিধবা বোন-ভাগ্নের ভার নিতে পারো তো নিয়ে চলো। আমি তোমার সংসারে ঝিয়ের মতো খাটতে রাজী আছি। কিন্তু একমাস দু'মাসের জন্যে যাব না।'

দাদার মুখ আরও শুকাইয়া উঠিল। তবু মুখে জোর আনিয়া বলিলেন, 'ঢুকতে দেবে না মানে? এখন তো খোকার অংশ জন্মে গেছে, ও তো মালিক একজন। ওকে তাড়ায় কে?'

আমি শান্তভাবে শুধু একটি প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি মামলা করতে পারবে আমার

হয়ে—যদি তাড়িয়েই দেয় ?···পারবে না। ও থাক দাদা। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। দুটো দিনের জন্যে গিয়েই বা লাভ কি ?'

তারপর—তখনও একটু ক্ষীণ আশা বুঝি টিকিয়া ছিল—অর্ধস্বগতোক্তি করিলাম, 'ছেলেটাকে মানুষ করতে পারব না, সে তো বুঝছিই, তবু পৈতৃক বিষয়টা থেকে বঞ্চিত করি কেন ?'

দাদা মাথা হেঁট করিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'সবই বুঝি। এই বয়স তোর, একটা ছেলে। কিন্তু আমিই যে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে পারব তাও তো বলতে পারছি না।···এখন থাক, আর একটু বড় হোক। তোকে ছেড়ে থাকবার মতো হলে বরং ওখানে নিয়ে যাব। ইস্কুলে ভর্তি ক'রে একটু ইংরিজী শেখাবার চেষ্টা করব।'

'ততদিন বাঁচে তবে তো !' ম্লান হাসিয়া জবাব দিলাম, 'মায়ের মতো স্বাস্থ্য না পেলে এখানে বাঁচাই মুশকিল। আমাশা আর জ্বর—এ বাড়ির বাস্তু দেবতা।'

'ছি ছি ! ওসব কথা বলিস নি !' দাদা তাড়া দিয়া উঠিলেন।

আমার কাছে অব্যাহতি পাইলেও দাদা শাশুড়ির কাছে নিষ্কৃতি পাইলেন না। তাঁহারা সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, দাদা এবার আমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিবেন। সেরূপ কোন উচ্চবাচ্য না হওয়াতে তিনি মুখ ছুটাইলেন। দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাদা যাহাতে পরিষ্কার শুনিতে পান সেইভাবে বলিলেন, 'একটা ডাইনীকে গছিয়ে দে তো আমার জ্বলজ্যান্ত জোয়ান ছেলেটাকে শেষ করলে, আমার সব্বনাশ ক'রে ছাড়লে—আরও কি মতলব আছে ওদের সেইটে খুলে বলুক শুনি ! ধড়ফড়িয়ে মরে গেল বাছা আমার—ঐ ডাইনী আঁজলা-আঁজলা রক্ত চুষে খেলে—চোখের সামনে। আরও ক'টাকে খাবে বলে রেখে যাচ্ছে ওরা ? কী করলে ওদের মনস্কামনা পুন্ন হয় ?···শ্বশুর গেল, সোয়ামী গেল, এবার আমার যেতে বাকী। তা আমাকে খায় খাক—দুধের বাছা ভাসুর-পো-গুলোর দিকে না নজর দেয়—কিম্বা কচি দেওরগুলোর দিকে।···কী করলে এই আস্ত ডাইনীর হাত থেকে অব্যাহতি পাব—সেইটে যদি কেউ বলে দিতে পারত !···ও হো হো, বাবা আমার রে, হরি রে আমার, কী কুক্ষণেই তোর বে দিতে গিছলুম রে বাপ ! কী কুক্ষণেই হারামজাদী ক্ষেন্তি এসে বে'র কথা তুলেছিল ওখানে !'

দাদা নীরবে দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন। তবে তাহাতেও নিস্তার লাভ হইল না। তিনি ধামা ভর্তি করিয়া ফল বাতাসা ও কাপড়-চোপড় আনিয়াছিলেন। হুকুম হইল, 'মেজবৌমা, ওর বোন-ভাগ্নের জন্যে যা লাগে রেখে ওসব ফিরিয়ে নে যেতে বলো। অনেক দিয়েছে, ওদের বংশের মেয়ে এনে সপুরী একগাড়ে যেতে বসেছি—আর কিছু দিতে হবে না। যদি পারে তো যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে নে যাক।···ওর বাপ মিন্‌সে শুনেছি এক পোর বেলা ধরে জপ-আহ্নিক করে। সেই সময়টায় বুঝি বসে বসে গুণ্‌তুক করে—যাতে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি সব শ্মশান হয়ে গিয়ে সম্পত্তিগুলো ওদের ঘরে গিয়ে ওঠে !'

আরও বহুক্ষণ ধরিয়া এমনি সুধাবর্ষণ চলিল। দাদা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া এক সময় বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে—তাঁহার দেখিতে কোন অসুবিধা না হয় এইভাবেই—তাঁহার আনা জিনিসগুলি বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। নিজের মায়ের পেটের ভাই, অতটা পথ আসিয়া সেই ভরা দুপুরে অভুক্ত ফিরিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। কেহ একটু বসিতেও বলিল না, জলখাবার তো দূরের কথা, এক ঘটি শরবৎও দিল না। তখনকার দিনে অশৌচের বাড়ি অপরের খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সেরূপ ক্ষেত্রে সকলেই আশপাশের ব্রাহ্মণবাড়িতে ব্যবস্থা করে, পরস্পরের প্রয়োজনে লাগে বলিয়া সকলে সাগ্রহেই সে ভার লয়, অনেক সময় উপযাচক হইয়াও। তাছাড়া ফল এবং দুধে দোষ নাই।

কিন্তু সে কথা কেহ উত্থাপনও করিল না। আমার ভাসুররাও কেহ কোন কথা কহিলেন না। বরং দাদা মেজভাসুরকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি খিঁচাইয়া উঠিলেন, 'অশৌচ অবস্থায় পেন্নাম করতে আছে? কেমন বামুনের ঘরের গরু তুমি?'

দাদা চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন, আমিও দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিলাম। আর কি করিব?

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেলে শাশুড়ি সোজাসুজি বলিলেন, 'তা বলি, এখন কি করবে? সে ছোঁড়া এসে তো চুপি চুপি পাইলে গেল, নে যাবার কথা মুখে একবার উচ্চারণও করলে না।...বে হয়ে এস্তক দেখলুম না যে, স্বেচ্ছাসুখে কোনদিন বাপ-ভাই নে যেতে চাইলে! এমনই জিনিস তুমি! ঐ বয়েসেই বাপের ভেয়ের হাড় এমন ভাজাভাজা ক'রে খেয়েছেলে যে, তারা একদম ঘাড় পাততে চায় না। কোনমতে নাবিয়ে দে নিশ্চিন্তি! সে যাকগে, তাদের মড়া তারা ফেলে কি তুলে রাখে তারা বুঝবে, আমরা এই সাংঘাতিক চীজ বুকে ক'রে বসে থাকব না আর। যার সঙ্গে সম্পক্ক সে গেছে—এখন আস্তে আস্তে ভালয় ভালয় সরে পড়ো—যেখানে পারো। বাপ মিনসেকে চিঠি দাও, নয়ত ভাইকে লেখো—এসে নে যাক।'

এই প্রশ্ন যে উঠিবে আমি জানিতাম। ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। দশ বছরের বালিকা আসিয়াছিলাম, সেই যে ভয়ে ভয়ে থাকিতাম—ভয়টাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। শত অত্যাচারেও তাই কখনও তেমন জোরের সহিত প্রতিবাদ করিতে পারি নাই, বিবাদ করি নাই। কিন্তু এই কয়দিনে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছি। শোকে বিহ্বল হইয়া পড়ি নাই, সে-ই রক্ষা। স্বামীর সহিত এমন প্রেমের সম্পর্ক ছিল না যে, তেমন শোক হইবে। স্বামীর আসক্তি ছিল আমার দেহটার প্রতি, ইদানীং সেবা-যত্নেও লোভ জন্মিয়াছিল—কিন্তু আমার আসক্তির কোন কারণ ছিল না। তবে আট বছর ঘর করিলে জড়পদার্থের প্রতিও একটা মায়া পড়ে—এ তো মন্ত্রপড়া বিবাহিত স্বামী, সন্তানের পিতা। তাছাড়াও, ইদানীং মানুষটার প্রতি কিছু মমতাও দেখা দিয়াছিল মনে কোথায়, বড় অসহায় বোধ হইত; আপনারা মাপ করিবেন, স্বামীর মতো নহে—রুগ্ন আবদেরে ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে যেমন মমতা বোধ হয়—তেমনিই হইত।

যাহা হউক—শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই, তবে বড়ই একা, নিঃসহায় বোধ

করিতেছিলাম। ঐ এতটুকু মানুষটার হাড় ক'খানা যতদিন ছিল, তবু যেন একটা ভরসা একটা জোর ছিল। মৃত্যুর পর বড় ভয় ভয় করিতে লাগিল, মনে হইল বিপুল শত্রুপুরীতে আমি একা পড়িয়া গেলাম, এই দুধের ছেলেটাকে ইহাদের রোষ ও বিষ হইতে কে রক্ষা করিবে?

তবে ছেলেটার কথা চিন্তা করিয়াই শেষ পর্যন্ত মনকে বাঁধিলাম। ইহার জন্যই কঠিন হইতে হইবে, মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে হইবে, প্রয়োজনে লড়াই করিতে হইবে। বাপের বাড়িতে একটা বিড়ালী ছিল। এমনি খুব নিরীহ পোষমানা, ছোটবোনেরা তাহার ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি করিত—মুখের মধ্যে হাত পুরিয়া জিভ্ টানিবার চেষ্টা করিত—তবু সে কিছু বলিত না, খুব বিরক্ত করিলে বড় জোর একবার ফ্যাঁশ করিয়া শব্দ করিত—ভয় দেখাইত। কিন্তু সেই পুষিরই বাচ্ছা হইলে তাহার মূর্তি পাল্‌টাইয়া যাইত, তখন—এমন কি কাছে গেলেও গর্জন করিয়া উঠিত, ক্রোধে গায়ের লোম খাড়া হইত। আমার পরের এক বোন বসন্ত একদিন—কী বাচ্ছা হইয়াছে, ক'টা ছেলে ক'টা মেয়ে দেখিতে—যেমন বাচ্ছাগুলিকে তুলিতে গিয়াছে, বিড়ালীটা তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তারক্তি বাধাইয়া দিল। মা আমাদেরই বকাবকি করিলেন। বলিলেন, জীব মাত্রেরই ইহা স্বধর্ম। যত অসহায় নিরীহ প্রাণীই হউক, সন্তানের অনিষ্ট আশঙ্কা করিলেই মায়েরা বাঘিনীতে পরিণত হয়। ইহাই ভগবানের নিয়ম, নহিলে সৃষ্টি থাকিত না।

সেই কথাটাই মনে পড়িল।

আমিও অনেক দেখিয়াছি। এখানেও, সামনের আমগাছটাতে কাকের বাসা ছিল। গাছের নিচে দিয়া যাতায়াতের সময় প্রায়ই অকর্ম করিয়া দিত, আবার পুকুরে গিয়া নাহিয়া আসিতে হইত। যেহেতু কাকে ময়লা খায়, সেহেতু তাহার ময়লা গায়ে পড়া নাকি বড় দোষের। অথচ অন্য কোন জিনিসে পড়িলে দোষের হয় না। সে যাক—আমি একদিন অসময়ে এমনি বিব্রত করায় রাগ করিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া ছিলাম। তখন সেটা বোধ-হয় ডিমে 'তা' দিবার সময়, কাকিনীটা উড়িতে পারিল না। কিন্তু কাকটা আমাকে ঠোকর মারিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার পর আমগাছের কাছে গেলেই উভয়ে তাড়িয়া আসিত; একবার আমার গালে ঠোকর মারিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে আবার তারকের গুষ্টি কত রসিকতা করিয়াছিলেন। (আমাদের আমলে স্বামীকে 'অমুকের বাবা' বলিয়া উল্লেখ করার নিয়ম ছিল না। এমন কি ছেলে-মেয়েদেরও বলা চলিত না যে, 'তোর বাবাকে ডেকে দে।' 'তোর গুষ্টিকে ডেকে দে' এইভাবে বলিতে হইত।)

এইভাবেই—এইসব কথা স্মরণ করিয়াই—শেষ কয়দিনে বুক বাঁধিয়াছিলাম, নিজেকে শক্ত করিয়াছিলাম। এটা বুঝিয়াছিলাম যে, নরম হইলে আর চলিবে না। 'অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মাড়াবে'—কথাটা খাঁটি সত্য। আমি সোজা শাশুড়ির চোখের দিকে তাকাইয়াই উত্তর দিলাম, 'কেন, তারা নিয়ে যাবে কিসের জন্যে? আমিই বা যাব কেন? দাদা তো বলেছিল, আমিই বলে দিয়েছি এখন সুবিধে হবে না।'

এই প্রথম দেখিলাম আমার শাশুড়ী কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন।

আর যাহাই হউক—এ জবাবের জন্য বোধকরি তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তার মানে ?...এ অবস্থায় বাপের বাড়িই তো যায় লোকে !...তা সে যা ভাল বুঝবে তাই করবে, বাপের বাড়ি না যেতে চাও অন্য পথ দ্যাখো। মোদ্দা এখেনে থাকার সুবিধে হবে না। পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। ছেলেপুলে নাতি-নাতনী নে ঘর করি, তোমার মতো জ্যান্ত রাক্কুসীকে ঘরে পুষতে পারব না !'

'আমারও এখন অন্য জায়গায় যাওয়ার সুবিধে হবে না, আমিও পরিষ্কার বলে দিচ্ছি !' বেশ সহজভাবেই জবাব দিলাম।

বিস্ময়ে ক্রোধে আমার শাশুড়ি যেন তোৎলা হইয়া গেলেন।

'ত্-তার মানে ? এ কি গায়ের জোর নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। নিজের বাড়িতে থাকব—সেখানে জোর ক'রে থাকব না তো কোথায় থাকব বলুন !'

'নিজের বাড়ি ! তোর সেই চোদ্দগুষ্টির বাড়ি—তোর মার চোদ্দভাতারের বাড়ি !' আমার কণ্ঠ যত সংযত থাকে, তাঁহার কণ্ঠ ততই উত্তেজিত হয়, 'আমি বেঁচে থাকতে তোর কিসের বাড়ি লা হারামজাদী ডাইনী ?'

'আপনার কিসের অধিকার ? আপনি বাঁচুন মরুন যা খুশি করুন ! শ্বশুরের বিষয়, তাঁরও পৈতৃক। স্বকৃত কিছু নয়। আমি ওঁর মুখে সব শুনেছি। কেন মিথ্যে মাথা গরম করছেন ! ছেলে সাবালক হোক, তার অংশ বুঝে নিক, তারপর—সে রাখতে চায় রাখবে—তাড়াতে চায় তাড়াবে। সে তার সঙ্গে বোঝাপড়া। আমাকে বেরিয়ে যাও বলবার অধিকার আপনার নেই। বরং আমার নাবালক ছেলের হয়ে আপনাকে যাও বলবার অধিকার আমার আছে। সে মালিক একজন, আপনি নন।'

তাহার পর যে কাণ্ড হইল সে অবর্ণনীয়। ঠাকুরানী কাঁদিয়া কাটিয়া চুল ছিঁড়িয়া মাথা কুটিয়া পাগলের মতো ব্যাপার বাধাইয়া তুলিলেন। সে চিৎকারে আমার জায়েরা ভাসুরেরা ছুটিয়া আসিলেন। শাশুড়ির নালিশ শোনার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরা কেহই চুপি চুপি কথা বলি নাই, শাশুড়ি তো নয়ই—কিন্তু কে জানে কেন, সম্ভবত গর্তের ব্যাঙকে কোঁক্ করিতে দেখিয়া—(সেই যে চলতি কথা আছে না, গর্তের ব্যাঙকেও অনবরত খোঁচা মারিলে সে এক সময়ে কোঁক্ করিয়া প্রতিবাদ করে) তাঁহারাও একটু যেন অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, অথবা একটু ভয়ই পাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় পক্ষকেই কিছু তিরস্কার করিলেন, বিশেষ আমার মেজভাসুর বিষ্ণুচরণ তো আমার দিক টানিয়াই বেশী বলিলেন, সেজভাসুর শিবচরণ মাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া মাথায় জল থাবড়াইয়া সুস্থ করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই প্রথম, আমি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলাম।

ইহার পর কয়টা দিন একেবারে চুপচাপ কাটিল।

এত চুপচাপ যে, আমি মনে মনে বেশ একটু ভয় পাইয়া গেলাম।

যেমন কাজকর্ম করিতাম, আমিও তেমনি সহজভাবেই করিয়া যাইতে লাগিলাম, অন্য জায়েরাও স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। শুধু আমার শাশুড়ি হুকুম

দিলেন যে, আমার আনা জল না কেহ খায়, আমার রান্নাও না। সে আমার শাপে বর হইল। অতদূর হইতে ঘড়া ঘড়া খাওয়ার ও রান্নার জল বহিতে হইত—কারণ, সব পুকুরের জল খাওয়া যায় না। বোসেদের প্রতিষ্ঠা-করা পুকুর, খুব গভীর ও বিস্তৃত, বারোমাস পরিষ্কার জল থাকিত, তাহারা এ পুকুরে কাহাকেও বাসন মাজিতে বা ক্ষার কাচিতে দিত না—এমন কি নিজেরাও অন্য একটা ডোবামতো পুকুরে সে কাজ সারিত। সেই কারণেই ঐ বোসেদের বড় পুকুর হইতে রান্না খাওয়ার জল বহিতে হইত—সে দায় হইতে বাঁচিয়া গেলাম।

বলা বাহুল্য, আমার জায়েরা এ ব্যবস্থায় বড় সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং শাশুড়িকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, জল নারায়ণ, জলে কেহ নজর দিতে পারে না। কিন্তু আমার শাশুড়ির হুকুম রদ হইল না, তিনি বলিলেন, 'ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করো বাছা, তোমাদের সাহস থাকে খাওয়াও—আমি পিচেশে-পাওয়া মেয়েছেলের হাতে ভাত-জল খাব না। তোমরা আনতে না পারো, আমি বয়ে আনবো আমার মতো জল।'

ইহার পর আর কে সাহস করিয়া আমাকে জল আনিতে বলিবে ?

তবে আমার বিশ্বাস ইহাতে ঠাকুরানী একঢিলে দুই পাখী মারিলেন, বরং ঐ পাখীটাই বেশী মার খাইল। আমাকে একঘরে করিয়া রাখা হইল বটে—জায়েরাও এত-দিন বেশ আরামে ছিলেন, এখন জল বহিতে বহিতে তাঁহাদের মাজায় ব্যথা ধরিয়া গেল। আমার শাশুড়ি আমার হাতে খাইবেন না, তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, রান্নাটা তিনিই বেশী করিতেন—তিনি আর মেজ জা। মেজ জা-ই চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া এক কাঁসি নিরামিষ ভাত ধরিয়া দিতেন। আমি সব দিক দিয়াই বাঁচিয়া গেলাম।

তবু—এই এতটা শান্ত ভাব আমার ভাল লাগিল না।

বেশ বুঝিলাম এই নিস্তব্ধতা ঝড়ের পূর্বাভাস। এত সহজে ইঁহারা হাল ছাড়িবেন না, আর একটা আক্রমণ শীঘ্রই আসিবে। সেরূপ কোন আশ্বাস না পাইলে আমার শাশুড়ি এমন নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতেন না। আর, এবার যে আক্রমণ হইবে, তাহা আটঘাট বাঁধিয়া, সব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া—একটা মোক্ষম মার দিবার চেষ্টা হইবে। বিশেষ আমার মেজভাসুর সাংঘাতিক লোক, আমার স্বামীই সে কথা বলিতেন। বলিতেন, 'ওর মাথায় একটা পেরেক পুঁতে দিলে ইসকুরুপ হয়ে বেইরে আসবে।'

সুতরাং তিনি মায়ের মতো বৃথা চেঁচামেচি গালিগালাজ করিবেন না, অন্য পথ ধরিবেন। সেইটা কি, আক্রমণটা কোনদিক হইতে আসিবে বুঝিতে না পারিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।···

অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।

প্রথম ঘটনার দিন দশেক পরেই একদিন বিষ্ণুচরণবাবু আমার মেজ জায়ের মারফৎ একটা কি কাগজ পাঠাইয়া বলিলেন, 'এইটে নতুন বৌমাকে সই ক'রে দিতে বলো তো !'

জাকে আর বলিতে হইল না, কারণ আমি সামনেই দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মুগকড়াই বাছিতেছিলাম, আমি সবই শুনিতে পাইতেছি। ভাদ্রবৌয়ের সহিত সোজাসুজি কথা বলিতে নাই বলিয়াই এই 'ভট্টাচার্যের পত্র-আড়াল' ব্যবস্থা।

ভাসুর খুবই তাচ্ছিল্যভরে কথাটা বলিলেন, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। কিন্তু

আমি দেখিলাম কাগজখানা সাধারণ কাগজের মতো নহে—উপরে বড় করিয়া টিকিট বা স্ট্যাম্প ছাপা—যেমন দলিল-টলিলে দেখা যায়। বাপের বাড়িতে দলিল আমি অনেক দেখিয়াছি, সিন্দুকে নানা ধরনের দলিল-পত্র থাকিত, বহুবারই মা এটা-ওটা বাহির করিতে সিন্দুক খুলিয়াছেন, সেই অবসরে খুলিয়া খুলিয়া দেখিয়াছি। মাকে প্রশ্ন করিতে তিনিই বলিয়াছেন, 'রেখে দে, রেখে দে। ওসব দলিল। এ বাড়ির আছে, দেশের বাড়ি জমি জায়গার অনেক দলিল আছে।···আমাদের কাছে নবাবের ব্রহ্মোত্তরের ফার্মান পর্যন্ত আছে।···যেমন ছিল সাজিয়ে রেখে দে, নইলে দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

সুতরাং এ কাগজ আমি চিনি। কিন্তু ইহাতে কিছুই লেখা নাই, সবটাই সাদা। শুধু তলার দিকে ও পাশে কানের কাছে কালি দিয়া সূক্ষ্ম দুইটি চিকে-কাটা দাগ দেওয়া আছে, ভাসুর দেখাইয়া দিলেন, ঐ দুই জায়গাতেই সই করিতে হইবে।

নির্দেশটা এতই আকস্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত যে, কিছুক্ষণের জন্য যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম। অনেক কিছু ভাবিলেও ঠিক এ ধরনের সোজাসুজি আক্রমণ আশঙ্কা করি নাই—তাই ব্যাপারটা বুঝিতে, ইতিকর্তব্য স্থির করিতে কিছু সময় লাগিল।

ভাসুর সিয়াইয়ের দোয়াত ও কলম আগাইয়াই দিয়াছিলেন, আমাকে নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু যেন অসহিষ্ণুভাবেই বলিলেন, 'কি হল? বৌমা সই করতে জানেন না?···তুমি তো বলেছিলে উনি লেখাপড়া জানেন!'

অর্থাৎ আর অপেক্ষা করা চলিবে না। যা বলিতে হইবে, জবাব দিতে হইবে—এখনই।

আমিও নিজেকে তৈয়ারী করিয়া লইলাম। মুখের উপর ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলাম, 'এটা কিসের কাগজ দিদি? এতে তো কিছু লেখা নেই—?'

ভাসুরও আমার জায়ের মুখে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা করিলেন না; বলিলেন, 'লেখাটা হয়ে ওঠে নি, পূর্ণ মুহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছি—এলে লিখিয়ে নোব। সইটা বৌমার করা থাক—সেই মতো হিসেব ক'রে লিখে দেবে'খন—যাতে ঠিক সইটার আগে এসে লেখা শেষ হয়।'

আমি মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিলাম, 'কিন্তু এটা কিসের জন্যে তা জানতে পারব না? আমার সই লাগবে কিসে?'

ভাসুর যেন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, 'কিসের আবার, ওঁকে দিয়ে কি দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিচ্ছি? বলি কাজকর্ম চালাতে হবে তো, সামনে সেটেলমেণ্টের সময় আসছে, উনিই যে তারকনাথের গার্জেন সেটার জন্যে আদালতে একটা দরখাস্ত করতে হবে। তা উনি তো আর আদালতে যাবেন না, আমরাই জামিন হয়ে দরখাস্ত পেশ ক'রে দোব।'

জা-ও তাড়া দিয়া উঠিলেন, 'নে নে, সইটে ক'রে দিয়ে কাজ চুকিয়ে দে বাপু। অসুমর কাজ পড়ে চারিদিকে, দাঁইড়ে থাকলে চলবে না।'

আর ইতস্ততঃ করার সময় নাই, বৃথা সঙ্কোচে কাজ নষ্ট করারও না। আমি একা হইলে অন্য কথা, এখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, বাঘিনীর ন্যায় রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আমি ধীরে ধীরে কাগজখানা জায়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'কিসে সই করছি, কি দরখাস্ত—না দেখে আমি সই করতে পারব না মেজদি, আমাকে মাপ করবেন।'

ছিলাকাটা ধনুকের মতোই বিষ্ণুচরণ যেন ছিটকাইয়া উঠানে পড়িলেন, 'কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! না দেখে উনি সই করতে পারবেন না! তার মানে আমি জাল-জোচ্চুরি ক'রে ওঁকে দে সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে চাইছি!...আমাকে অবিশ্বাস!...আমি ফন্দবাজ, আমি জোচ্চোর, ঠগ!...জিগ্যেস করো মেজবৌ—কত লেখাপড়া উনি শিখেছেন যে, দলিল দেখলে পড়ে উনি বুঝতে পারবেন কিসে সই করছেন!...বলে আমরাই তাই একবর্ণও বুঝি না! আইনের লেখা কি প্রেথমভাগের কর-খল? আর এত কথাই বা কিসের? বলে যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! ওর ছেলের জন্যেই করা, হাজার হোক বংশের সন্তান—নইলে ওর জন্যে তো আমার ভেবে ঘুম হচ্ছে না! কাঁচ ভাইটাকে আমার চুষে খেয়ে শেষ ক'রে দিলে।...আমি জোচ্চুরি করব মনে করলে উনি এক কাঠা জমিও খুঁজে পাবেন—তারক যখন সাবালক হবে? এই সেটেলমেণ্টে যদি সব আমার নামে লিখিয়ে নিই, উনি টের পাবেন, না ঠেকাতে পারবেন? শিবে তো বলছিলই—আমিই ভালমানুষি করতে গেলুম, তার এই ফল! নচ্ছার, নাৎখোর মেয়েমানুষ—আমার মুখের ওপর এতবড় কথা!'

চেঁচামেচিতে অন্য ভাসুর জা—যারপরনাই শাশুড়ি ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই এক এক প্রস্থ—যাহার যাহা অন্তরে ছিল—বিষ ঢালিয়া গেলেন। শাশুড়ি সগর্বে বলিলেন, 'কেন, আমি যখন বলি তখন যে বড় মন্দ হয়ে যাই!...তুই-ই তো সেদিন আমাকে কত লম্বা লম্বা নেকচার ঝাড়লি, হাজার হোক ছেলেমানুষ, কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—সে সব কি হল এখন? বাবা, ও যে কী বেউড়বাঁশের ঝাড়, খুব চিনে নিয়েছি আমি, হাড়ে হাড়ে চিনেছি। এইবার তোরা চেন, দ্যাখ কী চীজ!' ইত্যাদি।

আমি তো ইহার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম। দুই-চারি ঘা মার খাইলেও বিস্মিত হইতাম না। স্থির হইয়া বসিয়া সমস্ত ঝড়টাই সহ্য করিলাম। দুটি ঠোঁট ফাঁক করি নাই, হাতের কাজও বন্ধ করি নাই। বোবার শত্রু নাই—এটা অবশ্য ঠিক নয়, অনেক সময় প্রতিবাদ না করিলেই বরং আক্রমণকারীর ক্রোধ বাড়িয়া যায়—তবে আপাতত আমি সেই নীতিই অবলম্বন করিলাম। ফলে বকিয়া বকিয়া উঁহাদেরই মুখে ফেকো পড়িয়া গেল, আমাকে ঝগড়ার মধ্যে টানিতে পারিলেন না।...

॥ ৫ ॥

ইহার পর আবার কয়েকটা দিন চুপচাপ কাটিল।

ইঁহারা যে সহজে ছাড়িবেন না—তাহা তো জানা কথাই। আবার কি না-জানি মতলব আঁটিতেছেন আঁচ করিতে না পারিয়া 'ঠাকুর ঠাকুর' করিতে লাগিলাম।

এমনি স্তব্ধতায় আরও দিন-আষ্টেক কাটার পরে আমার মেজ ভাসুর, আবারও যাহাকে বলে—রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।

সেও অমনি একটা সকালবেলায়, উঠানে ধান মেলিয়া দিতেছি, আমাকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে উপলক্ষ ধরিলেন, 'তোমার বুঝদার জাকে বলো মেজবৌ, আমাকে বা আমাদের যদি বিশ্বাস না হয়—তাহলে ওঁকেই সদরে যেতে হবে। আদালতে গিয়ে গার্জেননামার দরখাস্ত পেশ করতে হবে—কোথায় মোক্তার কোথায় মুহুরী ছুটোছুটি করতে হবে।... সে কি উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন, না একাই যাবেন ঠিক করুন। জমি-জমার ব্যাপার তো ফেলে রাখা যায় না!'

মেজ জা একবার অপাঙ্গে আমার দিকে চাহিয়া লইয়া ঝংকার দিয়া উঠিলেন, 'তোমাদেরও হয়েছে তেমনি নিঘিন্নে নির্পিত্তে স্বভাব! ওদের সম্পত্তি হেজে যাক মজে যাক—তোমাদের কি? এত সাধ্যিসাধনাই বা কিসের?'

'তা তো হয় না মেজবৌ', ভাসুর উদার গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, 'এর পর বড় হয়ে তারক যখন বলবে, জ্যাঠা, আমার ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দাও, তখন কি জবাব দোব? বলবে, তোমরা এতগুলো গুরুজন মাথার ওপর থাকতে আমি তোমাদেরই বংশের ছেলে বঞ্চিত হলুম!...তখন তো তোমরাই দুষবে। বলবে একটা মেয়েছেলে, বুদ্ধিহীন, সে কি করেছে না করেছে তার জন্যে নিজের ভাইপোটাকে পথে বসালে!'

যেন অগত্যাই আমার জা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'বলি ব্যালেস্টার সাহেব, এখন কি বলবে বলো—শুনলে তো সব দাঁইড়ে দাঁইড়ে!'

আমি বধূজনোচিত ব্রীড়ার সহিত সাধ্যমতো অনুচ্চকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'যদি আদালতে যেতে হয় তো যাবো। উনি বা ওঁরা যেদিন বলবেন—ওঁদের সঙ্গেই যাব!'

বোধকরি এইটাকেই মোক্ষম চাল মনে করিয়া আমার মেজভাসুর উল্লসিত হইতেছিলেন, এখন আমার জবাবে কিছুক্ষণের জন্য যেন নির্বাক হইয়া গেলেন। কেবল জা কয়েক মুহূর্ত গালে হাত দিয়া অবাক হইবার ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বলিস কী লো, ভদ্দর ঘরের মেয়েছেলে আদালতে যাবি, তা আবার ভাশুরদের সঙ্গে?'

'দরকার পড়লে যেতেই তো হয় মেজদি। শুনেছি বড় বড় রাণীরাও দরকার পড়লে দলিলে সই দিতে আদালতে যান—পাল্‌কী ক'রে।...আর ভাসুরের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করছি, একটু সঙ্গে গেলে কী এত দোষ তা তো বুঝতে পারছি না!'

এবার আমার জা দোদমা বাজীর মতো ফাটিয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'তোমার কিছুতেই দোষ নেই, তুমি ধন্যি মেয়েছেলে...তোর এত অবিশ্বাস তোর ভাসুরকে?... ওলো, তাতেই কি ছেলের বিষয় আগলাতে পারবি? পুরুষের বুদ্ধির সঙ্গে তুই পারবি পাল্লা দিতে? ওরা মন করলে তোকে পথে বসাতে কতক্ষণ? আর কী এমন দশবিশ হাজার টাকার বিষয় যে, এত ছিষ্টি ক'রে তোর ছেলেকে পথে বসাতে যাবে?...তা তো নয়, তুমি চাইছ এখন ছুতো ক'রে বাইরে বেইরে পুরুষ মানুষের সঙ্গে ফুর্তি করতে।... মা-ই ঠিক চিনেছেলেন, পিচেশে-পাওয়া মেয়েছেলে তুমি!...বামুনের ঘরের মেয়ে বলে তো বিশ্বেস হয় না। তা, তাই যাও না বাপু, কেন আমাদের এই শোকাতাপার ঘরে অশান্তি করছ, বাইরে বেইরে গিয়ে খাতায় নাম লেখাও গে, খাসা গতরখানি আছে— মোট মোট টাকা রোজগার হবে!'

আরও কত কি বলিয়া গেলেন, আমি আর শুনি নাই। উত্তর দিতে পারিতাম—

বলিতে পারিতাম আমার মতো হইলে তুমি অবস্থাটা বুঝিতে পারিতে, এখন তো স্বামীর দিক টানিতেছ নিজের দিক মনে করিয়া—ঈশ্বর না করুন, অতি বড় শত্রুরও এ অবস্থা কামনা করি না—যদি তোমার স্বামী এমনি চলিয়া যান, জ্ঞাতিরা আসিয়া এইভাবে চক্রব্যূহে ঘেরিয়া ধরে—পারিবে এই কথা বলিয়া তাহাদের সমর্থন করিতে?···কিন্তু কিছুই বলা হইল না। প্রথমত ঘৃণায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, দ্বিতীয়ত কোথা হইতে তপ্ত অশ্রু আসিয়া চোখের কোণে জমা হইয়া গেল। ধান মেলিয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বাঁশের আলনা হইতে গামছাখানা টানিয়া লইয়া ঘাটে চলিয়া গেলাম। স্নানের নামে পুকুরে নামিয়া কিছুক্ষণ তো কাঁদিয়া আসিতে পারিব!···

ইহার পর আর কোন আগল রহিল না। ভাসুর ও শাশুড়ি মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া স্ব-রূপেই রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। কুৎসিত গালি-গালাজ শুরু হইল। সেই সঙ্গে নানাবিধ ভীতি প্রদর্শন। ভাসুর বলিলেন, 'বিশ্বেস যখন করলে না, তখন আমিও এই বলে দিলুম, আমার নামেই আমমোক্তারনারা লিখে দে রেজেস্টারী ক'রে দিতে হবে—নইলে এক পয়সার জিনিস আর তোমাদের বলতে থাকবে না।···দশদিন দেখব, তারপর খোরাকিও বন্ধ করব। যার অত আইনে দখল, সে যাক—আদালতের দোর তো খোলাই আছে—মকদ্দমা ক'রে আদায় করুক তার হিস্যে।'

সেটাও বড় কথা নয়। ভয় হইল ছেলেটাকে লইয়াই। এমন ব্যবহার চলিতে লাগিল—মনে হইল গলা টিপিয়া শত্রুর শেষ করা ইহাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।··· যে ঝিটি বাসন মাজিত, সে একদিন পুকুরঘাটে চুপি চুপি আমাকে বলিল, 'খুব সাবধানে থেকো নতুন বৌদি, এরা সব পারে, হয়ত কোনদিন ছেলেটাকে মেরে ফেলে তোমাকে ধুতরোর বিষ খাইয়ে পাগল ক'রে দেবে। এক পয়সায় মরে বাঁচে এরা। বড়বৌদিকেও এমনি খুন করেছে বিষ খাইয়ে—রাতারাতি পুইড়ে এসে রট্টে দিলে ওলাউঠো হয়েছিল।··· আমার ননদ বলে এদের জ্বালায় সে নিজেই আপিং খেয়েছেল সর্ষের তেলে গুলে।··· তা সে যা-ই হোক, একই কথা।···ওলাউঠো হল অথচ আমরা টের পেলুম নি—দু'বেলা এ বাড়ি আসছি!'

আরও যেন সর্বশরীর হিম হইয়া গেল। কী করিব, কেমন করিয়া ছেলেটাকে বাঁচাইব এই রাক্ষসের পুরীতে—কিছুই যেন ভাবিয়া পাইলাম না। ইহাদের যে হিংস্র মূর্তি ক্রমে ক্রমে প্রকট হইতেছে—তাহাতে অসম্ভব কিছুই মনে হইল না, ছেলেটাকে, কি আমাকে বিষ দেওয়া এমন কি কঠিন ব্যাপার!

একটা শাপে বর হইল এই যে, আমার শাশুড়ি বোকার মতো বলিয়া বসিলেন, 'ওর কুঁড়েপাতর আমরা কেন যোগাব রোজ রোজ, মেজ বৌমা, তুমি খবরদার ওর রান্না রাঁধবে না।···বাইরে দাওয়ায় উনুন আছে বোগ্‌নো আছে, ওর ইচ্ছে হয় ঐখেনে নিজে রেঁধে খাক।'

তবু কিছুটা বাঁচিয়া গেলাম। নিজে হাতে চাল ধুইয়া নিজের আনা জলে ভাত চাপাইয়া দিতাম। বাগানে যা ফসল হয়—কাঁচকলা ডুমুর ঝিঙ্গা ইত্যাদি—দুই-একটা ভাতে ছাড়িয়া দিতাম, কোনমতে তাই একত্র চটকাইয়া গোরুর মতো খাওয়া। উহাদের তেল বা লবণ লইতে ভয় করিত—তবে এক চিম্‌টি লবণে আর কতটা বিষ দিতে পারে—

এই ভাবিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হইতাম। ছেলেটার দুধ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহাকেও ঐ গলা ভাত ফেনের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইতাম, রাত্রেও উহার মতো কয়েক দানা ভাত ফুটাইতে হইত। আমি তো বিধবা হইবার পর হইতেই রাত্রে উপবাসী থাকি। আমার শাশুড়ি মুড়ি চালভাজার নাড়ু, কলা প্রভৃতি খাইতেন, আমাকে কে দিবে ?

তবু, এততেও ঠিক নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। নিত্য নূতন হুমকী, নিত্য নূতন ভয় প্রদর্শন। মনে হইল চারিদিক হইতে বেড়া আগুনে ঘিরিতেছে—পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা। আমার ভাসুর-পোরা তো—কাহারও শিখনেতে কিনা জানি না—ফাঁক পাইলেই ছেলেটাকে ঢিবু-ঢিবাইয়া দেয়। এমন অমানুষিক প্রহার করে যে, তাহাতেই ঐ ক্ষীণজীবী ছেলেটার প্রাণ যাওয়ার কথা। একদিন চোখ লক্ষ্য করিয়াই খোঁচা দিতে গিয়াছিল, অল্পের জন্য চোখটা বাঁচিয়া গেল, পাশে রগের কাছে খানিকটা কাটিয়া রক্তারক্তি। অথচ চার বৎসরের দামাল ছেলেকে কেমন করিয়া দিন-রাত চোখে চোখে রাখি ?…এক একদিন নিজের এই অসহায় অবস্থা, এই উপায়হীনতায় নিজেই একা একা মাটিতে মাথা খুঁড়িতাম—নিজের মৃত্যু কামনা করিতাম। হায় রে, তখন যদি সত্যই মৃত্যু হইত। ভগবান যে অধিকতর দুর্ভাগ্যের জন্যই বাঁচাইয়া রাখিবেন আমাকে—তখন কে জানিত !

এ উপদ্রব তো কমিলই না, উপরন্তু নূতন উপদ্রব শুরু হইল।

এ একেবারে নূতন, এমন কখনও ভাবিও নাই।

আমার সেজ ভাসুর শিবচরণ অকস্মাৎ আমার উপর বড় প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

একদিন—সেইদিনই প্রথম লক্ষ্য করিলাম—কী একটা কথা লইয়া মেজদাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন। কি কথাতে আমার সম্পর্কে মেজদা অকারণে কটু কথা বলিতেছিলেন বলিয়াই তিরস্কার, 'ও কী হচ্ছে মেজদা ! তুমিও যে দেখছি মা-বৌদিদের মতো মেয়েকুঁদুলী ঝগড়া শুরু করলে ! এসবে কোন কাজের কাজ হয় না।'

আর একদিন, মার সঙ্গেও বেশ খানিকটা বচসা হইয়া গেল। মা রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরিতে গিয়াছিলেন, বেশ কিছু রূঢ় কথা শুনাইয়াই সেজ ভাসুরঠাকুর তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন। স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর বিষয়-আশয় উঁহাদের কয় ভাইতে অর্শাইয়াছে, এখন আর মা যথেচ্ছাচার করার অধিকারিণী নন। এখন উঁহাদের বিষয় উঁহারা যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন, মা যেন শুধু দুইবেলা নিরাপদে নির্বিবাদে আহার করিয়া ভগবানের নাম করেন, সেইটাই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।

এই ধরনের অনুগ্রহ বা আনুকূল্যে অন্য যে কোন মেয়ে হইলে কৃতজ্ঞ হইত, গলিয়া যাইত। আমার এমন বদ-স্বভাব—আমি সিঁদুরে-মেঘে আগুনের ছায়া দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

আর, সে শঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়—দুইদিন না যাইতেই প্রমাণিত হইল।

সেদিন ধানের পাট চুকাইয়া গা ধুইতে বেশ একটু বিলম্বই হইয়া গিয়াছিল, কাপড় কাচিয়া জল লইয়া যখন ফিরিতেছি তখন বেশ ঘোর-ঘোর ভাব ঘনাইয়া আসিয়াছে বাগানের পথে। দ্রুতই আসিতেছি, অকস্মাৎ একেবারে কাছে সেই আবছায়ার মধ্যে একটা কি সাদামতো নড়িয়া উঠিতেই ভয় পাইয়া লাফ দিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া

যাইতেছিলাম—কে একজন কোথা হইত সবলে আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

'আহা, আহা—পড়ে যাবে যে! আস্তে! এই ভারী ঘড়া নিয়ে অন্ধকারে কেউ এমনভাবে চলে।'

তখন চাহিয়া দেখিতে পারি নাই, সাহসেও কুলায় নাই, আর অত অন্ধকারে কী-ই বা দেখিব—কণ্ঠস্বরে চিনিলাম শিবচরণ।

জড়াইয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, তবু আকর্ষণটা যে নিতান্তই আকস্মিক নয়, এবং কোনমতে সামলাইয়া দেওয়ার মতোও নয়—সেটুকু বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাছাড়া এটা নিতান্তই অনাচার, ভাসুরের কাছে তখনকার দিনে ভাদ্রবৌ সকল অবস্থ্যাতেই অস্পর্শনীয়া ছিল, কোনমতে দৈবাৎ স্পর্শ-দোষ ঘটিলে উভয়কেই স্নান করিতে হইত, বোধ করি কী একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও ছিল। এখন দেখি ভাসুরদের 'দাদা' বলার রেওয়াজ হইয়াছে। বোনের মতো পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে—গাড়িতে পাশাপাশি বসিয়া যায়, পাশাপাশি বসিয়া থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে। তখন আমরা একথা ভাবিতেই পারিতাম না। এমন কি শানের মেঝেতে ভিজা পায়ে ভাদ্রবৌরা কি ভাগ্নেবৌরা চলিয়া গেলে—ভাশুর মামাশ্বশুরেরা সে ছাপ সাবধানে এড়াইয়া হাঁটিতেন— জল শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত।

আমার কান-মাথা আগুন হইয়া উঠিল। রূঢ় কণ্ঠেই বলিলাম, 'এ কী করলেন, আমাকে ছুঁয়ে দিলেন!'

'নইলে পড়ে যাচ্ছেলে যে!'

'যেতুম যেতুমই। তাতে মরতুম না।...আর আপনিই বা এখানে খিড়কীর পুকুরের ধারে কেন—জানেন তো মেয়েছেলেরা এই পথে যাতায়াত করে!'

কথা বলা নিষেধ—কিন্তু তখন আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোন জ্ঞানই ছিল না।

'না, মানে এত রাত্রে কেউ আসবে তা ভাবি নি। তা তুমিই বা এতে এত অস্থির হচ্ছ কেন? কেউ তো আর জানছে না!'

আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিলেন ভাসুরঠাকুর।

আমি বলিলাম—তখনও আমার মাথার আগুনটা নেভে নাই, আর কথা যখন বলিয়াই ফেলিয়াছি, তখন চুপ করিয়াই বা থাকিব কেন—'না-ই বা জানল! আমার তো পাপ। এখনই আবার নেয়ে আসতে হবে।'

'এই দ্যাখো!...খবরদার, খবরদার! অমন কাজও ক'রো না। তাহলেই সকলে জিজ্ঞেস করবে কেন এত রাত্তিরে নেয়ে এলে!...ওরে বাপ রে, সে ভীষণ ঘোঁট পাকাবে মাতে আর আমার বৌতে। আমি ওদিকে চলে যাচ্ছি, লক্ষ্মীটি!...হঠাৎ হয়ে গেছে, অজান্তে, ওতে দোষ নেই।'

তিনি সত্যই ওদিকের পথে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমিও দেখিলাম এইটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ, কেন আর এই ভরসন্ধ্যায় স্নান করিয়া রাজ্যের ঝঞ্ঝাট ডাকিয়া আনি! কিন্তু এ ব্যাপারের যে এখানেই শেষ নহে—তাহাও বুঝিলাম, আর সেই জন্যই আতঙ্কটা আরও বাড়িয়া গেল।

ইহার দিন-দুই পরে একদিন, ভোরবেলা ফাঁকে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম—তখনও বেশ অন্ধকার, তাই তখনই আর কাজে লাগিবার চেষ্টা না করিয়া পুনশ্চ ঘরে ফিরিতেছি—উঠানে পা দিবার মুখে চাপা গলায় কে ডাকিল, 'এই, শোন !'

শিবচরণবাবু !

বিস্ময়ে ভয়ে ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

আমি না শুনিয়াই ভিতরে যাইতেছি, তিনি আরও চাপা গলায় বেশ একটু জোর দিয়াই ডাকিলেন, 'শোন ! তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। না শুনলে এরপর বিষম পস্তাতে হবে !'

অগত্যা স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আতঙ্কে মুখ দিয়া স্বর বাহির হইতেছে না। কে কোথায় দেখিবে—শাশুড়ি ও ন-বৌ দুইজনেরই খুব ভোরে বাগানে যাওয়া অভ্যাস—কেলেঙ্কারীর শেষ থাকিবে না। এমনি তো প্রহার ছাড়া আর যত কিছু লাঞ্ছনা থাকিতে পারে—দিনে-রাতে বর্ষিত হইতেছে, তাহার উপর এই দৃশ্য কাহারও চোখে পড়িলে সোনায় সোহাগা হইবে।

শিবচরণেরও বোধ করি সে ভয় ছিল। তিনি হাত তিনেক ব্যবধান বজায় রাখিয়াই চাপা গলায় দ্রুত বলিয়া চলিলেন, 'এদের মতলব ভাল নয়। তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এ শত্রুপুরীতে একমাত্র আমিই তোমার বন্ধু হিতৈকাঙ্ক্ষী—মনে রেখো। যদি ছেলেকে বাঁচাতে চাও, তার বিষয়ের হিস্যে বুঝে নিতে চাও, আমার কথামতো চলতে হবে, আমাকে খুশী রাখতে হবে।'

আমি আর এক লহমাও দাঁড়াইলাম না। ওদিকে ন-বৌয়ের দরজায় খিল খুলিবার শব্দ হইয়াছে। শিবচরণও—ঘরে ঢুকিয়া আগড়টা ভেজাইয়া দিতে দিতে দেখিলাম—যেন ভোজবাজীর বলে সেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

দুশ্চিন্তার শেষ রহিল না। মতলব যে ভাল নয় সে আমার চেয়ে আর কে বোঝে ! কিন্তু কতটা খারাপ ? সেজভাসুর যাহা বলিতেছেন সত্য কি ? কতটা সত্য ? সত্যই কি ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিব না ? আর তেমন বিপদ উপস্থিত হইলে উনিই কি ঠেকাইতে পারিবেন ?...কথামতো চলাই বা কি ? কোন সাধারণ কূট-কৌশল, না কি—'নেকনজর' ?

যত ভাবিলাম—সেদিন ঝি আসিবে না বলিয়া গিয়াছে, অতএব গোয়ালকাড়া ছড়াঝাঁট দেওয়া সবই আমার উপরে—কাজ করিতে করিতে যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, শেষেরটাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হইল।...অর্থাৎ উনি চান গোপনে আমি উঁহাকে ভজনা করি।

কথাটা মনে হইতেই ঘৃণায় সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। স্বামী যেমনই হউন, হিন্দুর মেয়ের একরকম সহিয়া যায়, সেখানে দেহ সমর্পণ করিতে আর যাহাই হউক এতটা ঘৃণা বোধ হয় না। তাই বলিয়া এই পুরুষ !...এ বাড়ির বেটাছেলেরা কেহই দেখিতে ভাল নয়। সকলকারই হাত-পা সরু সরু, পেটটি ডাগর—কতকটা রোগে কতকটা অতিভোজনে—এক একজন এক এক বেলায় প্রায় একসের চালের ভাত খায়—চক্ষু কোটরগত ও হরিদ্রাভ। গুম্ফ-শ্মশ্রু বিরল, যাহাও বা আছে খোঁচাখোঁচা তামাটে

রঙের, পনেরো দিন অন্তর খেউরি হয়—অতিরিক্ত তামাক খাওয়ার ফলে দাঁতগুলি কালো কালো—এবং সর্বোপরি অশিক্ষিত, অসভ্য ও অসচ্চরিত্র। ইঁহাদের সকলেরই বাউরী-পাড়ায় যাতায়াত আছে, আশেপাশের গৃহস্থবাড়ি ইঁহাদের জ্বালায় অস্থির। এতদিন এখানে আছি—কাহারও গুণ জানিতে বাকী নাই। এই লোকের কাছে ধর্ম ও সতীত্ব বিকাইয়া দিব? ধিক্!

ছেলের বিপদ তো আছেই। এখনও যে ঐ দুধের বালকটা বাঁচিয়া আছে—নিতান্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। কিন্তু তেমন বিপদের সম্ভাবনা যদি থাকেই, ঐ লোকটার ঘৃণিত প্রস্তাবে মত দিলেই কি ঠেকাইতে পারিব? ওর বা কতটুকু সাধ্য! তাছাড়া এটা যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ নয়—তাহারই বা প্রমাণ কি?

[পরে জানিয়াছিলাম, অনেক পরে—তখন শিবচরণ বিষ্ণুচরণ কেহই বাঁচিয়া নাই—এই শেষের সন্দেহটাই ঠিক। হয়ত শিবচরণের লোভও কিছু ছিল—কারণ আমার চেহারা যেমনই হউক, সে গ্রামে অন্তত আমার অপেক্ষা রূপসী আর কেহ ছিল না এটা ঠিক—সে খুব সম্ভব এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার মতলবেই মেজদাকে বুঝাইয়াছিল যে, কোনমতে আমাকে নষ্ট করিতে পারিলেই প্রকাশ্যে ঝাঁটা মারিয়া তাড়ানো যাইবে, কোন 'বেটাবেটি' কিছু বলিতে পারিবে না। তখন যদি ছেলেটাকে লইয়া যাইতে চাই—দলিলে সই করাইয়া লইবে যে, স্বেচ্ছায় তাহার সমস্ত দাবী ছাড়িয়া যাইতেছি!]

ইহার পর কয়দিন যথাসম্ভব সাবধানে রহিলাম। বেশ বেলা না হইলে, অন্তত শাশুড়ি বা ন-বৌয়ের সাড়া না পাইলে বাহিরে আসিতাম না। অপরাহ্নেও অনেকখানি বেলা থাকিতে—মেজজা বা সেজজা, অথবা ন-বৌয়ের সঙ্গে পুকুরঘাটের পাট চুকাইয়া আসিতাম। সন্ধ্যার দিকে জল পান করাই ছাড়িয়া দিলাম, পাছে রাত্রে ফাঁকে যাইবার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু তাহাতেও ঐ পাপিষ্ঠটাকে এড়ানো গেল না। শেষে ছেলের মারফৎ চিঠি আসিতে শুরু করিল। আঁকাবাঁকা হরফ, বানানের মা-বাপ নাই—আমিও তখন যে খুব বানান জানিতাম তা নয়, লেখাপড়া তো অনেক বেশী বয়সে করিয়াছি—তবু আমারই হাসি পাইত এমন বানানের ছিরি—সম্বোধনও নাই, স্বাক্ষরও নাই—'কী করিতেছ? এই শেষ সাবধান করিয়া দিতেছি, কথা না শুনিলে তুমিও মরিবে, ছেলেটাও মরিবে।' 'আমার কথা শুনিতেছ না—পস্তাইতে হইবে।' 'কাল শেষ রাত্রে উঠিয়া পিছনের বাগানে আসিও, সাক্ষাতে সব বুঝাইয়া দিব।' 'আমার কথা শুনিয়া চলিলে তোমার সব দিক বজায় থাকিবে, নহিলে মৃত্যু অবধারিত।' 'এই বয়স হইতে তো ঠিক থাকিতে পারিবে না জানা কথা, আমার কাছে ধরা দিতে দোষ কি? আমি কি আমার ভাইয়ের চেয়ে খারাপ দেখিতে?' ইত্যাদি—

আমারই নির্বুদ্ধিতা, চিঠিগুলি রাখিয়া দিই নাই, সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আরও নষ্ট করিয়াছি এই জন্য যে, শাশুড়িকে দিলে তিনি ছেলের দোষ দেখিতেন না, উহার মধ্য হইতে আমিই যে তাঁহার ছেলের মাথাটি চিবাইয়া খাইতেছি—এই পরম সত্যটাই আবিষ্কার করিতেন, আমার 'ডাইনী'ত্বই প্রমাণিত হইত। একটা ছেলেকে খাইয়া আশা মেটে নাই, আর একটা ছেলের দিকে নজর দিয়াছি—এই গঞ্জনাই শুনিতে

হইত। জাকে দিয়াও ফল হইত না, গোপনে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিত হয়ত—কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণটাও নষ্ট করিয়া ফেলিত সঙ্গে সঙ্গে। অথবা কে জানে, ঝগড়াও করিত না—তাহাকেও হয়ত পূর্বাহ্নেই বুঝাইয়া রাখা হইয়াছে যে, নিতান্তই এটা বিষয় হস্তগত করার ছলনা।

যাহাই হউক, চিঠিগুলি থাকিলে—যখন শেষ পর্যন্ত কেলেংকারী বহুদূর গড়াইল—তখন সর্বজন-সমক্ষে বাহির করা চলিত। তবে এও মনে হয়, তাহাতেই কি আমার নিরপরাধ প্রমাণ হইত? হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা দাঁড়াইত—এবম্বিধ প্রলোভনে বা ভয়ে স্থির থাকিতে পারি নাই, স্বেচ্ছায় কুপথে পা দিয়াছি।

সে যাহা হউক, যখন রাখি নাই—তখন রাখিলে কি হইত ভাবা নিরর্থক। বড় কথা—দুর্ভাগ্য। অদৃষ্টে মন্দ থাকিলে কিছুতেই ঠেকানো যায় না। নহিলে অত সাবধানে থাকা সত্ত্বেও কেলেঙ্কারী ঘটিবে কেন?…

বোধকরি পাপিষ্ঠটা মনে মনে কালনেমির লঙ্কা ভাগ করিয়া রাখিয়াছিল। আমাকে উপলক্ষ করিয়া একটি বড় রকম সম্ভোগের স্বপ্ন দেখিতেছিল এতদিন। তাহার কিছুই সফল না হওয়াতে হতাশায় আর লালসায় অস্থির হইয়া একেবারেই হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।…

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই—তখনও পর্যন্ত বাড়ির ছেলেপিলেরা ঘুমায় নাই—একটু অন্ধকারের অবসরে দাওয়ার উপর আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

গায়ে যতই জোর থাকুক, সে পুরুষ—বয়সও এমন কিছু বেশী নয়, ত্রিশের ভিতরেই হইবে—আমি মেয়েছেলে, তাহার সহিত পারিয়া উঠিব কেন? ঝটকা মারিয়া তাহার কবলমুক্ত হইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না—পশুটা বোধ হয় সেজন্য প্রস্তুতই ছিল—তখন একেবারে চোখে অন্ধকার দেখিয়া একটা লাথি মারিলাম। ভাগ্যক্রমে পাশ হইতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, পিছন হইতে নহে। তাই বাহুবন্ধন ছাড়াইতে না পারিলেও কতকটা সামনাসামনি ফিরিতে পারিয়াছিলাম, লাথি মারা সম্ভব হইয়াছিল। লাথি অত হিসাব করিয়া কিছু মারি নাই। কিন্তু দৈবাৎ সেটা সজোরে গিয়া উদরের নিম্নে একটা মোক্ষম জায়গায় লাগিল। পশুটা 'বাপ রে' বলিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

এ সবই কয়েক লহমার ঘটনা। ভয়ে, ক্রোধে, উত্তেজনায় আমিও জ্ঞান হারাইয়াছিলাম, স্থানটাও গাঢ় অন্ধকার, ঠিক কি ঘটিয়াছিল তাহা তখন ভাল বুঝি নাই। পরে অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছিল। সেই অনুমানের কথাটাই আপনাদের বলিলাম।

এ ঘটনাও যেমন, পরের ঘটনাও তেমনি—বেশির ভাগই অনুমান। সে সময় কি কি ঘটিয়াছিল, আমারই বা কি অবস্থা, কে কি করিল, কি বলিল—তাহা সবটা বুঝিতে পারি নাই। সে অবস্থা ছিল না, আমিও কতকটা অজ্ঞানের মতোই হইয়া গিয়াছিলাম। যতটা মনে আছে, পরে যাহা চেষ্টা করিয়া করিয়া মনে করিতে পারিয়াছি,—তাহাই বলিব।

পশুটার চিৎকারে এদিক-ওদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিলেন। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'কি হইল', 'কি হইয়াছে।' দৃষ্টিটা আমাদের দিকেই, কারণ আমিও তখন দাওয়ায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছি। আমি বলিয়াই দিলাম, 'আমি ওঁকে লাথি মেরেছি।' ব্যস, আর

যায় কোথায়। অজ্ঞান মানুষটা পড়িয়া রহিল, তাহার শুশ্রূষা বলিতে আমার ছোট দেওর আসিয়া যা একটু মুখে-চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিল—বাকী সকলে আমাকে লইয়া পড়িলেন।

তবু তখনও সবটাই অনুমানে ছিল, একটু জ্ঞান হইতেই শিবচরণ উঠিয়া বসিয়া অম্লান বদনে বলিয়া বসিল, 'ঐ সব্বনাশী মেয়েছেলে আমাকে ইয়ে করতে এয়েছেল, কোঁচার কাপড় চেপে ধরেছেল সজোরে, আমি রাজী হই নি, ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করেছি—সেই রাগে আমাকে লাথি মেরেছে।'

আমার ন' ভাসুর শুধু বলিল, 'তা সেই অবস্থায় চেঁচে লোক জড়ো করতে পারলে না! আমরা তো এইখেনেই ছিলুম!'

সায় দিয়া জানোয়ারটা অক্লেশে বলিল, 'তাই করাই উচিত ছেল। আমি বলি বাড়ির কেলেঙ্কার কেচ্ছা—এ নিয়ে ঢাক পেটালে আমাদেরই তো মুখটা পুড়বে। আকাশের গায়ে থুথু ছুঁড়লে কার গায়ে এসে লাগে বলো!......এমন যে খুনে মেয়েমানুষ তা তো জানি না!'

ইহার পর আর কি কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। কারণ, শাশুড়ি আর সেজবৌ উভয়েই তখন আমার উপর তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি—কে কোন্‌টা মারিয়াছে, কীভাবে কতটা লাগিয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। সেই অন্ধকারে কিছু দেখি নাই,দেখার মতো অবস্থাও ছিল না। প্রতিবাদ করা কি সত্য কথা বলার অবসর মেলে নাই। সে অবসর কেহই দিল না। কাহারও একবার মনে হইল না যে, আমারও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমার তখন কোন কিছু চিন্তা করার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। সমস্ত মনটাই কেমন যেন স্তম্ভিত জড় হইয়া গিয়াছে। মার যে খাইয়াছি তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম, সমস্ত শরীরে কালসিটা পড়িয়া গিয়াছিল, শরীর একটু নাড়িবার অবস্থাও ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সাধারণ যন্ত্রণা ছাড়া বিশেষ কিছু বোধ করার মতো অনুভূতি ছিল না।

সেই সময়েই বোধহয় খুন করার কাজটা সারা হইয়া যাইত যদি না বাড়ির ছেলে-মেয়েগুলা তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিত। আমার ছেলেটা তো বটেই—ভাসুরদের ছেলে-মেয়েগুলিও ভয় পাইয়া একসঙ্গে কান্না জুড়িয়া দিল। আর সেই চিৎকারে আমাদের বাসন-মাজা ঝি, সে আমাদের বাগানের প্রান্তেই থাকে, আর ওপাশে একঘর নিকিরী প্রজা ছিল—তাহারা ছুটিয়া আসিল।

অগত্যা তখনকার মতো ক্ষান্তি দিতে হইল। তবে তাই বলিয়া আকাশের গায়ে থুথুটা কম ছিটানো হইল না। বোধকরি নিজেদের ভবিষ্যতের সুবিধার জন্যই শাশুড়ি ঠাকরুন আমার রীতি-চরিত্রের ঘৃণ্য কাহিনীটা সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিয়াছে বলিয়া ছেলের মুখে শুনিয়াছেন তাহা তো বটেই—যাহা ঘটে নাই, ঘটিলে আমাকে আরও জব্দ করার সুবিধা হয়—তাহাও। আমার যে চরিত্রটাই ঐরকম, আমি যে আমার সব ভাসুরের সহিতই 'থাকিতে' চাই, এরূপ লালসা প্রকাশ যে নূতন নয়, স্বামী বিদ্যমানে যে আমি ইহাকে-উহাকে লক্ষ্য করিয়া ছোঁক-ছোঁক করিয়া বেড়াইয়াছি, সেই দুঃখেই যে তাঁহার রোগা ছেলেটা মরিয়া গেল—তাহার ঝুড়ি ঝুড়ি কল্পিত বিবরণ

বিস্মিত হতচকিত শ্রোতাদের শুনাইয়া বার বার ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন।...

অতঃপর আমার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে আমার ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া ও কুলুপ লাগাইয়াই যদি তখনকার মতো অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহা হইলে অল্পেই পরিত্রাণ মিলিল বুঝিতে হইবে।

সুখের বিষয় বাড়িতে কোন পরিত্যক্ত খালি ঘর ছিল না। শহর বাজারে যেমন দেখিয়াছি—প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটা ঘুঁটে-কয়লার ঘর থাকে—তেমন কোন ঘর থাকিলে আমাকে নিশ্চয় সেই ঘরেই পোরা হইত। এখানে তেমন আধখানি ঘরও নাই। আছে রান্না ও ভাঁড়ার, সেখানে রাখিলে অসুবিধা, গোয়াল ঘরে কপাট নাই, তাছাড়া ভোর হইতেই গোয়ালে ঢুকিবার দরকার হইবে। আমার পরের দেবরটির বিবাহের পূর্বে আমার ঘর যদি খালি না হয় তাহা হইলে অন্তত একটা চালাঘরও তুলিতে হইবে—মেজ ভাসুর আর শাশুড়িতে এ আলোচনা হইতে আগেও শুনিয়াছি। যাহা হউক, সেই কারণেই বাঁচিয়া গেলাম। যেমন-তেমনই হউক, ঘরে একটা বিছানাও ছিল—কোনমতে দেহটাকে ঐ কয় পা টানিয়া লইয়া গিয়া বিছানাতেই পড়িতে পারিয়াছিলাম।

তাহার পর আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। সত্য সত্যই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শুধু সেই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই যেন মনে হইল ছেলেটা কোথায় একটানা কাঁদিয়া যাইতেছে, তবে সে যেন দূরে কোথাও, অনেক দূরে। সে বর্তমান কালের কথা, না স্বপ্ন, তাহাও ঠাওর হইল না।

পরের সারা দিনটা সেইভাবেই পড়িয়া রহিলাম। প্রবল জ্বর আসিয়াছিল, সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা আর ব্যথা। হাত-পাও নাড়িবার সামর্থ্য ছিল না। তাহার উপর আর একটা প্রবল অস্বস্তি, হয়ত কাহারও লাথিই আসিয়া লাগিয়া থাকিবে,—এমন একটা স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে যে, প্রাকৃতিক কার্যের উপায় নাই। সমস্ত পেটটা টনটন করিতেছে।

তবু নিঃশব্দেই পড়িয়া রহিলাম। কেহ দরজা খুলিল না, কোন প্রশ্নও করিল না। প্রাকৃতিক কার্যের জন্য ফাঁকে যাওয়ারও ব্যবস্থা করিল না। আহারের তো প্রশ্নই ওঠে না। জ্বরে ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। ছটফট করিলে, এপাশ-ওপাশ করিলেও কিছু স্বস্তি বোধ হয়। সে ক্ষমতাও ছিল না। ছেলেটাকে উহারা বোধহয় সরাইয়া রাখিয়াছে, ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। খুব দূর হইতে মধ্যে মধ্যে তাহার কান্না শোনা যাইতেছিল, 'আমি মার কাছে যাব। আমি মার কাছে যাব।' অসহায় শিশু জানে না তাহার মা আরও কত অসহায়।

সেই মুহূর্তে যদি মরিতাম! কেবলই জ্বরের ঘোরে, সেই অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় আশা হইতেছে এই বুঝি মরিব! এ যন্ত্রণা কাহারও সহ্য করা সম্ভব নহে, নিশ্চয়ই মরিব।...হায়, তখন কি জানি, ঈশ্বর আমাকে দিয়া বহু লাঞ্ছনা সহ্য করাইবেন বলিয়াই এই অদ্ভুত স্বাস্থ্য দিয়াছেন—যাহা কিছুতে ভাঙ্গে না, যাহার সহ্য-শক্তির শেষ নাই।

তবে, ইতিমধ্যেই যে সকালে ও দুপুরে আমার ঘরের বাহিরে বারান্দায় মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে, সেটা আমি টের পাইয়াছি। ফিসফিস গলার আওয়াজ—একাধিক, মধ্যে মধ্যে

এক-আধবার উত্তেজনায় চড়িয়া উঠিতেছে—আবার কেহ হয়ত সতর্ক করিয়া দেওয়ায়, অকস্মাৎ নামিয়া যাইতেছে।

ইহারা আমাকে খুন করিবে—সেটা অবধারিত। হয়ত সেই উপায়টাই উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে আমিও মরি, উহাদের গলাতেও দাঁড় না পড়ে—এইরূপ একটা পথ খোঁজা হইতেছে। বড় জোর ঘটনাটা—এখন বুঝিতেছি সত্যই। বোধ করি সেটা ঘটিয়াছে বলিয়াই, এত তাড়াতাড়ি সেভাবে কাজ সারিতে চায় না। ছেলেরাও এখন কিছু বড় হইয়াছে, তাহারা দেখিতে পাইবে—সে ভয়ও আছে। আবার এত বড়ও হয় নাই যে, কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিবে। সুতরাং এবার বেশ সাবধানেই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বৈকি!

আমার মনে হইল এইভাবে উপবাস করাইয়াই মারিবে। সে একরকম ভাল। যেমনভাবেই হউক, এ যন্ত্রণার অবসান হইলে হয়। কোনমতে যেন শীঘ্র মরিতে পারি।···

সারাদিন কাটিবার পর, সন্ধ্যারও বেশ খানিকটা পরে, দরজায় কুলুপ খুলিবার শব্দ হইল। দেখি আলো হাতে আমার শাশুড়ি ও দুই ভাসুর। সহসা আমার মনে হইল—ছোটবেলায় চণ্ডীর গান শুনিয়াছি, যাত্রাও দেখিয়াছি পাড়ায়—এবার আমাকে বধ্যভূমিতে বা মশানে লইয়া যাওয়া হইবে। আমি যেমন পড়িয়া ছিলাম তেমনিই পড়িয়া রহিলাম—দুই চোখ মুদিয়া; উঠিলামও না, মাথায় কাপড় দিবারও চেষ্টা করিলাম না। যে মরিবার জন্য প্রস্তুত তাহার আর লজ্জাই বা কিসের, ভয়ই বা কিসের?

কিন্তু না, দেখিলাম এখনও বোধ করি আমার বধের উপায়টা ঠিক উদ্ভাবিত হয় নাই। তাই সেরূপ কেহ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। আসল কথা তারককে আর রাখা সম্ভব হইতেছিল না কোনমতেই, তাই তাহাকে খাওয়াইয়া লইয়া আসা হইয়াছে, ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া আবার কুলুপ আঁটিয়া দেওয়া হইল। অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটা ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আমি সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।···

পরের দিন সকালে আবার তেমনি মিছিল করিয়া আসিয়া ছেলেটাকে সরাইয়া লওয়া হইল। ছেলেটা প্রথমে যাইতে চাহে নাই, আমার কাপড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, শাশুড়ি ঠাকরুন তাহার গালে প্রচণ্ড একটা চড় মারিয়া এক ঝটকায় ছাড়াইয়া লইলেন, 'হারামজাদা ছেলে, আমরা এত করছি তা নয়, ঐ সর্বনাশীর কাছে না থাকলে চলে না! যতই যা করো, রক্তের দোষ যাবে কোথায়!'

সেদিনও তেমনি পড়িয়া রহিলাম। ইহাদের মতলব কি বুঝি না। প্রাকৃতিক কৃত্য সারিতেই হইবে—অনেকক্ষণ বাদে ফুলাটা একটু কমাতেই সম্ভবত—সেটা কাল সন্ধ্যাতেই সারিতে হইয়াছে। তাঁহার অসুখের সময় শেষের দিকে ঘরের নর্দমাতেই সব কাজ সারিতেন, সেই পথই ধরিতে হইল। ঘরে কলসীতে জল থাকিত, সেটাও কাজে লাগিল। কিন্তু তার পর? এভাবে কতদিন চলিবে? কি ভাবিয়াছে উহারা? কি স্থির করিল?

প্রশ্নটা যে আমার উপরই চাপিবে তাহা তখন ভাবি নাই। সন্ধ্যার পর আবার আলো হাতে করিয়া সদলবলে শাশুড়ি ঠাকরুন দেখা দিলেন। কিন্তু আজ আর

ছেলেটাকে ঠেলিয়া দিয়াই পুনশ্চ কপাটে কুলুপ লাগাইলেন না, অল্প কিছুক্ষণ প্রদীপের আলোতে আমাকে দেখিয়া লইয়া, বোধকরি দুই দিনের উপবাসে অবস্থাটা কি দাঁড়াইয়াছে পর্যবেক্ষণ করিতেই—বলিলেন, 'তা কি ঠিক করলে বাছা? তোমার যা ডাইনে-ভর-করা গতর, উপোসে তোমার কিছু হবে না, খাড়া টাঙ্গিয়ে রাখলেও অমন দু'মাস যুঝবে। অত দিন তো আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। যদি অশেষ দুর্গতি থেকে বাঁচতে চাও…চালের মটকা আছে, পরনে কাপড় আছে। এই বাঁচবার পথ বাৎলে দে গেলুম। সাহস না থাকে, বিষ খেতে চাও বলো—কত্তার আপিং এখনও পড়ে আছে, সর্ষের তেলে ভিজ্জে দিয়ে যেতে পারি।…আর একটা দিন দেখব, যদি কিছু না করো পাড়ার লোক ডেকে, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কথা আগা-পাশতলা বলে, মাথা মুইড়ে গামছা পইরে গাঁয়ের বার ক'রে দে আসব—এই বলে দিলুম, তোমার কোন বাবা কোন ভাতার রুখতে পারবে না—আমার নাম ক্ষ্যামা বামনী—কে আমার সামনে দাঁড়ায় দেখি।'

বিচার তো আসামীর আড়ালেই হইয়া গিয়াছে, রায়টা পড়া শুধু বাকী ছিল, সে কাজ সারা হওয়ার পরই দরজায় আবার কুলুপ পড়িল।

ছেলেটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'মা, তোকে ওরা মেরে ফেলবে মা, আমার একটুও ভাল লাগছে না, কেন এখেনে পড়ে আছিস? চল না আমরা চলে যাই!'

কী বুঝাইব ঐ দুধের বালককে যে, স্বেচ্ছায় পড়িয়া নাই, ভাল আমারও লাগার কথা নয়। এও বলিতে পারিলাম না যে, শাশুড়ির যাহাই অভিরুচি হউক ভাসুররা এই এক ফোঁটা ভাইপোকেও বাঁচিতে দিবে না।…শুধু 'চুপ-চুপ, 'কাঁদে না লক্ষ্মীটি!' এ ছাড়া কোন সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া ছেলেটা এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। আমার চোখে ঘুম নাই, থাকা সম্ভবও নয়, চুপ করিয়া শুইয়াই রহিলাম, সবল সুস্থ দেহ, দুই দিনের উপবাস ও নির্যাতনে কিছু মরিয়া যায় না ঠিকই কিন্তু সবল সুস্থ দেহেই উপবাসের যন্ত্রণা বেশী।

তেমনি পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি: শাশুড়ির প্রস্তাবটাই গ্রহণ করিব নাকি? আমি আর কি সুখে বাঁচিব? আত্মহত্যা মহাপাপ? নরকে যাইতে হইবে? নরকে কি ইহার চেয়েও যন্ত্রণা? ছেলেটা ঘুমাইতেছে—ইহলোক ত্যাগ করার এই প্রকৃষ্ট অবসর—আবার ছেলেটার জন্যই ভয় হয়। ইহাকেও নিশ্চিত মৃত্যু ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলিয়া যাইতে হইবে।…কিছুই যেন দিশা পাইতেছি না এই অকূল অন্ধকারে, হঠাৎ মাথার কাছে সামান্য পদশব্দ হইল, ঘরে সামান্য ছায়া পড়িল।

মাথার কাছে একটি সামান্য গবাক্ষ ছিল, ছোট্ট একহাত চওড়া দেড়হাত লম্বা জানালা, ঘরের একমাত্র আলোবাতাস আসার পথ, সেইখানেই কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদনি রাত নয়, অন্ধকার পক্ষ—তবু নক্ষত্রের আলোরও একটা আভাস আছে, তাহাতেই ছায়াটা বুঝিলাম।

অন্য সময় হইলে ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমার আর এখন ভয়টা কি, মরার বাড়া গাল নাই। আরও ভাবিলাম, সেই পশুটা নিশ্চয় আসিয়াছে, হয়ত আরও জঘন্য কোন প্রস্তাব লইয়া। তবে বেশীক্ষণ সংশয়ে থাকিতে হইল না, যে আসিয়াছিল, সে চাপা গলায় ডাকিল 'নতুন বৌদি, ঘুমোচ্ছ?'

আমাদের ঝি কালিদাসী।

বোকার মতো বিছানা হইতে সাড়া দিলাম না। উহার বলার ভঙ্গীতেই বুঝিয়াছি গোপনে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাছে আসিলাম। ভাবিলাম উপবাস করিয়া আছি বলিয়া নিশ্চয় কিছু খাবার আনিয়াছে।

কাছে আসিতে হাত বাড়াইয়া আরও কাছে টানিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল 'বৌদি, এদের মতলব ভাল না। ওরা ষড় করেছে ঐ যে চেঁচে আপ্তঘাতা হবার কথা বলে গেল, এবার তোমার গলা টিপে মেরে নিজেরাই চালের আড়া থেকে ঝুইলে পাড়ার লোক জড়ো করবে।...বৌদি তুমি পালাও।'

বেশী কথা বলার সময় নাই, সংক্ষেপে বলিলাম, 'কি ক'রে পালাব—দোরে যে কুলুপ?'

'সে আমি ভেবে রেখেছি। ঠাকরুন রাত থাকতে উঠে পগারধারে যায়, সেখান থেকে পুকুর হয়ে ফেরে। চাবি তেনার কাছে থাকে, বালিশের নিচে। আমি তক্কে তক্কে থাকব, উনি বেরোলেই গিয়ে চাবি এনে দরজা খুলে দোব।'

'তারপর কোথায় যাব? কার সঙ্গে?'

'সে ব্যবস্থাও করিছি। নীলুদার এমনিই আজ ভোরে কলকেতা যাবার কথা। তেনাকেই বলিছি। তিনিও রাজী আছে। তেনার বাড়ির পাল্‌কি বলে রাখবে—তুমি বেইরে এধার দে বাগানের বাইরে এলেই পাল্‌কিতে তুলে ছুটবে বেয়ারারা—একেবারে ইস্টিশানে পেঁ ছে দেবে ওরা, নীলুদা হেঁটেই যাবে ওদের সঙ্গে। তোমাকে কলকেতার বাপের বাড়ি পেঁছে দে নিজের কলেজে না কোথায় চলে যাবে।'

প্রস্তাবটা একেবারে খারাপ নয়, পারিলে নীলুই পারিবে। নীলু বা নীলাম্বর গ্রামের তিলি জমিদারের ছেলে। তাহার পয়সা আছে। সে কলিকাতায় হিন্দু কলেজে পড়ে, কোন্ সাহেবদের বাসায় থাকে। এই লইয়া গ্রামে বেশ ঘোঁট হইয়াছিল, কিন্তু একে জমিদার তায় টাকার জোর আছে—কিছু করা যায় নাই।...আমাকে লইয়া যদি কোন বদনামও ওঠে—উহার কোন ক্ষতি হইবে না। আর সে এসব গ্রাহ্যও করে না।

'কিন্তু তোর কি হবে? তোকে যদি মারধোর করে?'

'জানতে পারবে না। ভাববে তোমার সঙ্গে নীলুদার ষড় ছিল, সে-ই এসে কুলুপ খুলে দেছে। আর না হলেও—আমার কি করবে? আমি তো তোমাদের ভদ্দর ঘরের বউ নই যে, প'ড়ে মার খাব? অনেক কেচ্ছা জানি ওদের—আমিও হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব না?...তা নয়, তুমিই সাবধান! ছেলেটা চেঁচাবে না তো—কথা কয়ে যদি ওঠে?'

'না রে, ওর খুব ভারী ঘুম, সেই সকাল অবধি ন্যাতার মতো পড়ে থাকে। ওকে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে পারব।'

'তাহলে ঐ কথাই রইল, ওকে কোলে নে তৈরী হয়ে থেকো। আমি এইখানেই বসে রইনু—গিন্নী উঠলেই আমার কাজ সারব।'

'কিন্তু ন-বৌ? সেও তো ভোরে ওঠে?'

'ওমা, শোন নি? তিনি তো আজ বাপের বাড়ি চলে গেছে। তেনার বাপের বাড়াবাড়ি।'

মনে হইল ইহা ঈশ্বরেরই যোগাযোগ।

কয়দিনে যেন ভগবানের উপরই আস্থা হারাইয়া বসিয়াছিলাম, দেবদেবী কেহ কোথাও নাই—থাকিলেও তাঁহারা অত্যাচারী কুচক্রীদের ভয় করিয়া চলেন—এমনিই একটা ধারণা হইতেছিল।

আজও, এখনও—একবার মনে হইতে লাগিল ভগবান বুঝি এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে বুঝি দুর্ভাগ্যের দুর্গতির অবসান হইল—বোধ করি প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা পূর্ণ হইল—যদিচ এমন যে কী পাপ করিয়াছি অনেক করিয়াও তাহা ভাবিয়া পাইলাম না—যাহা হউক, কিন্তু সেই সামান্য আশ্বাসটুকুও বেশীক্ষণ রাখিতে পারিতেছিলাম না, পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল—এও বোধ করি অদৃষ্টের একটা বড় রকমের পরিহাস—একবার একটু আশার আলো দেখাইয়া আরও বড় রকমের সর্বনাশের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। আরও অনেক অপমান অনেক লাঞ্ছনা আছে কপালে—তাহারই একটা নিমিত্ত আসিয়া দেখা দিয়াছে মুক্তির উপায়ের বেশ ধরিয়া।

এও মনে হইল দুই-একবার—কালিদাসীটা ওদের ঘুষ খায় নাই তো?—পালাইতে চেষ্টা করিতেছি—এটা প্রমাণ হইয়া যাইবে, অথচ পালানোও যাইবে না, একেবারে শেষ মুহূর্তে সকলে ঘিরিয়া ফেলিয়া মারিবে?

কিন্তু না! তেমন তো মনে হয় না। মানুষটাকে পূর্বেও দেখিয়াছি, ইহাদের মতো পিশাচ নয়, দয়া-মায়া আছে। হয়ত উহার চেষ্টা আন্তরিকই—তবে আমার অদৃষ্টে নির্যাতন যদি এখনও শেষ হইয়া না থাকে তবে সে আর কতটুকু কী করিতে পারিবে?

এই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আরও যে কতক্ষণ কাটিল তাহা জানি না। আমার তো মনে হইল কয়েক যুগ কাটিয়া গেল। রাত্রি যে এত দীর্ঘ হয়, সময় যে এত মন্থর গতিতে চলে তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও এমন করিয়া বুঝি নাই।

অবশেষে এক সময়ে সেই নিদারুণ, জীবনের দীর্ঘতম প্রতীক্ষার অবসান ঘটিল, দরজায় সামান্য একটু 'খুট্' করিয়া শব্দ উঠিল। খুবই সামান্য শব্দ, অন্য সময় হইলে কানেও যাইত না, নিতান্ত সেইদিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া কান পাতিয়া ছিলাম বলিয়াই শুনিতে পাইলাম। তবু তখনই ছেলেকে কোলে তুলি নাই। আশায় নহে, বরং আশঙ্কাতেই বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু দেখিলাম—নিঃশব্দে কপাট খুলিয়া কালিদাসী ঘরে ঢুকিল, চাপা গলায়—প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে, ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই বলিল, 'কৈ, তৈরী হও নি?'

সে কথার আর কোন মৌখিক উত্তর দিলাম না, একেবারে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইলাম।

তখনও ফরসা হয় নাই—রাত্রির অন্ধকার একটু হাল্‌কা হইয়াছে, এই মাত্র। কালিদাসীকেও ভাল করিয়া ঠাওর হইল না, শুধু তাহার কাপড়টা দেখিয়া আর গলার আওয়াজে চিনিলাম। সেই সাদা কাপড়টা লক্ষ্য করিয়াই নিঃশব্দে দ্রুত নামিয়া আসিলাম দাওয়ার সিঁড়ি বাহিয়া উঠানে, সেখান হইতে বাগানে পড়িয়া পূর্বদিকে নিকিরীদের উঠানের মধ্য দিয়া কালিদাসীর পিছু পিছু হাঁটিতে লাগিলাম। দুইটা ভয় ছিল—

ছেলেটা না ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়, অথবা রাস্তার কোন কুকুর না ডাকিয়া ওঠে বা তাড়া করে।...কিন্তু মনে হয় ভগবান মুখ তুলিয়াই চাহিয়াছেন এতদিনে, কোন গোলমালই হইল না। একসময় আমবা নিরাপদে বড় রাস্তায় আসিয়া পেঁাছিলাম।

নীলুদের পাল্‌কি প্রস্তুতই ছিল। নীলুও পাল্‌কির পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া—আব্‌ছা আলোতেই চিনিতে পারিলাম। কোন কথাবার্তা হইল না, সে আমাকে দেখিয়াই নীরবে পাল্‌কির দরজা খুলিয়া দিল, আমি ছেলেটাকে কালিদাসীর কাছে দিয়া পাল্‌কিতে উঠিয়া বসিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে কোলে শোয়াইয়া লইলাম। কালিদাসী তৎক্ষণাৎ আবার নিজের বাড়ির পথ ধরিল, বৃথা কোন কথা বলার কি বিদায় লইবার চেষ্টা করিল না। নীলুর ইঙ্গিতে বেয়ারারাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌কি তুলিয়া ছুটিতে শুরু করিল। বোধহয় বেয়ারাদের সাবধান করাই ছিল। তাহারা পাল্‌কি বওয়ার সময়ও, কোনরূপ শব্দ করিয়া অভ্যাসমতো ক্লান্তি অপনোদনের চেষ্টা করিল না।

একদিন সমাদরে না হউক—সাড়ম্বরেই এ বাড়িতে আসিয়াছিলাম, এ বাড়ির সুন্দরী নববধূরূপে, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনেক, অনেক স্বপ্ন বুকে করিয়া—আজ চোরের মতো রাত্রির অন্ধকারে এই শ্বশুরঘর ত্যাগ করিতে হইল, বিপুল মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া—সম্ভবত চিরদিনের মতোই। আমি তো গেলামই, না জানি এই দুইটি উপকারী মানুষ—নীলু ও কালিদাসীর আরও কী অনিষ্ট করিয়া গেলাম !

॥ ৬ ॥

সেই শেষ রাত্রেই একটা ট্রেন ছিল—কলিকাতায় যখন আসিয়া পেঁাছিলাম তখন সকাল হইয়াছে মাত্র, ভাল করিয়া শহরের ঘুম ভাঙ্গে নাই। নীলু ট্রেনের হিসাব ধরিয়াই সময় ঠিক করিয়াছিল। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমার পূজনীয়া শাশুড়ি ঠাকরুনের নাকি অন্যদিনের অপেক্ষা অনেক আগেই পগার-ধারে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই স্টেশনে আসিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা গাড়ি পাওয়া গিয়াছিল।

ট্রেনে সারাটা পথই নীলু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—আমার সহিত একটাও কথা বলে নাই। বোধহয় লজ্জাতেই—জানালা দিয়া প্রাণপণে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। আমার তো সঙ্কোচ বোধ করারই কথা—বিশেষ আজ পর্যন্ত কোন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলি নাই। আমিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আর কথা বলার মতো অবস্থাও ছিল না তখন, যতই প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করি ততই অবাধ্য উত্তপ্ত অশ্রু বাহির হইয়া আসে বার বার।

একেবারে কলিকাতায় নামিয়া প্রথম শব্দ উচ্চারণ করিল নীলু, প্রশ্ন করিল, 'তারপর ? এখন কোথায় পেঁাছে দেব আপনাকে ?'

আমি ঠিকানাটা দিয়া বলিলাম, 'আপনাকে বাড়িতে যেতে হবে না, গলির মোড়ে নামিয়ে দিলেই হবে, মিছিমিছি আর এর মধ্যে আপনাকে টানতে চাই না। এমনিই তো বোধ হয় এর জন্যে আপনাকে অনেক ভুগতে হবে।'

'তা হোক। আমার জন্য ভাববেন না বৌ-ঠাকরুন।...দুটো প্রাণ রক্ষা পেয়েছে

সেইটেই বড় কথা—তার জন্যে যদি কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তো হাসিমুখেই করব। আর আমার কিছু করতেও পারবে না কেউ। মাকে বলেই এসেছি—কোন *মিথ্যে দুর্নাম তাঁরা বিশ্বাস করবেন না।* তবে তাহলেও, আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ি অবধি যেতে চাই না, কারণ তাতে হয়ত আপনিই আরও বিব্রত হবেন, ছত্রিশ রকমের কথা উঠবে।'

ঘোড়ার গাড়িটা আমাদের গলির মুখে দাঁড় করাইয়া আর একবার শুধু প্রশ্ন করিল, 'তাহলে আমি যাই?'

'যান। ভগবান আপনার ভাল করুন—আর কি বলব!'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আর একটিবার কথা কহিল নীলু, 'টাকা-পয়সা কিছু দরকার আছে?'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িলাম, 'টাকা-পয়সায় কি হবে, তবে আমার কাছে কিছু নেই,—গাড়ি ভাড়াটা—'

'এই গাড়ি নিয়েই তো আমি চলে যাচ্ছি বৌ-ঠাকরুন—ভাড়া দেওয়ার তো এখন দরকারই হচ্ছে না।'

সেই নীলুর সহিত শেষ দেখা। আর তাহার কোন খবরও পাই নাই। বাঁচিয়া আছে কিনা তাহাও জানি না। তবে তাহার পর হইতে বহুদিন পর্যন্ত, যখনই মনে পড়িয়াছে কথাটা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছি—'আমার যা করবার করো, ওদের দু'জনে যে এতটা করল—এর পুরস্কার যেন ওরা পায়, ওদের যেন ভাল হয়।'

কে জানে ভগবান অভাগিনীর এ প্রার্থনাটুকু শুনিয়াছিলেন কিনা!

বাপের বাড়িতে ঢুকিতেই প্রথম দেখা হইয়া গেল বাবার সঙ্গেই।

দেখিলাম ঘরের সামনের বারান্দায় একটা জলচৌকির উপর বসিয়া আছেন, বোধ করি পুত্রবধূর কোন আসন্ন সেবার অপেক্ষায়।

বাবা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, ব্যস্ত হইবেন এইটাই আশা করিয়াছিলাম—এমন কঠিন হইয়া উঠিবেন, তাহা ভাবি নাই।

দেখিলাম চোখের নিমেষে তাঁহার মুখখানা ভ্রূকুটি-কুটিল ও ভয়ংকর হইয়া উঠিল, দৃষ্টিতে যে ঘৃণা ও ক্রোধ ফুটিয়া উঠিল তাহা আর কখনও তাঁহার চোখে দেখি নাই। বরাবরই একটা উদাসীন নিস্পৃহভাব বজায় রাখিয়া চলেন, ক্রুদ্ধ হইলেও সে ক্রোধ তাঁহার ভঙ্গীতে বা বাক্যে এমন রূঢ়ভাবে কখনও প্রকাশ পায় না।

চরম বিপদে পড়িয়া একটু আশ্রয় ও আশ্বাসের জন্য যাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি, তাহার এই কঠোর মুখভাব দেখিয়া হঠাৎ কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। গত দুই-দিনের উপবাস ও প্রহারের ফলেও আমাকে এতটা দুর্বল করিতে পারে নাই, এখন যেন মনে হইল পা দু'টা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মনে হইল পায়ের নিচের মাটি সরিয়া যাইতেছে—মাথাও ঘুরিতে শুরু হইল। 'বাবা' বলিয়া একবার অস্ফুট স্বরে ডাকিয়া সেইখানে সেই উঠানেই বসিয়া পড়িলাম।

এবার বাবা কথা কহিলেন।

বলিলেন, 'তুমি কে, তোমাকে তো আমি চিনি না। কী মনে ক'রে এসেছ এখানে? …তোমার মতো একটা মেয়ে আমার ছিল বটে, নারায়ণ তাকে নিয়েছেন। আর কোন সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার মনে পড়ছে না!'

ইহার পর কিছুক্ষণ আমার যেন বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কী বলিব, কেমন করিয়া কথা বলিব—সর্বোপরি কাহাকে বলিব! এই কি আমার পিতা! জন্মদাতা, স্নেহময় জনক! প্রাণভয়ে, নির্যাতন সহিতে না পারিয়া একমাত্র সন্তান এই গুঁড়াটুকু লইয়া আশ্রয়ের জন্য ইঁহার নিকটই আসিয়াছি!

তবে আমাকে কিছু বলিতে হইল না। তিনিই বলিলেন, 'তোমার জন্যে আমাকে যে কথা শুনতে হল—আমার জীবনে—আমাদের বংশের কেউ কখনও শোনে নি। আমাদের গুরুবংশ, সাধকের বংশ—মহাপুরুষের আশ্রিত আমরা। ছেলে-মেয়েদের চিরকাল ধর্মপথে থাকারই উপদেশ দিয়ে এসেছি! নিশ্চয়ই কোন পাপ ছিল আমার, কোন ত্রুটি—তাই এই লাঞ্ছনা সইতে হল!…তোমার সতীসাধ্বী মা স্বর্গে গিয়ে বেঁচে গেলেন—আমার অদৃষ্টে এই অপমান ছিল বলেই ভগবান নেন নি।…ছি-ছি-ছি! ধিক! এও আমাকে শুনতে হল যে, আমার মেয়ের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, সদ্যোবিধবা মেয়ে তার ভাসুরকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে—এমনই শিক্ষা দিয়েছি আমি! তাঁরা লিখেছেন যে, ভাল চাই তো আমি যেন মেয়েকে নিয়ে আসি।…আমি তার জবাব দিই নি এই জন্যে যে, আমি এইটুকু আশা করেছিলুম—আমার মেয়ে এর পর আত্মহত্যাই করবে, পোড়ামুখ আর ভদ্র-সমাজে দেখাবে না।'

এবার আমিও কঠিন হইয়া উঠিলাম। জন্মাবধি এই স্বার্থপর লোকটার অবিচার সহিয়া আসিয়াছি, ইহার প্রকৃতিও দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার নিকট কাতর কণ্ঠে করুণা ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। করিলেও তো ফল হইবে না, মিছামিছি ছোট হই কেন?

আমি জবাব দিলাম, 'আপনি মেয়েকে তাহলে এমনভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ করেছেন যে, আপনার এই বিশ্বাস হয়ে গেল যে—আপনার আত্মজার কথা থেকে কতকগুলো অশিক্ষিত মূর্খ পর-লোকের কথাই বিশ্বাসযোগ্য! এ আপনারই উপযুক্ত বটে!…আপনার একবার একথাটা মনে হল না যে, আমারও কিছু বলার থাকতে পারে, আমার কথাটাও একবার শোনা দরকার! খুব বড় অপরাধী আসামীদেরও জজেরা তাদের কৈফিয়ৎ দেবার অবকাশ দেন, তারপর বিচার করেন। তারা আমার এই বাচ্ছা-টুকুকে বিষয়ে বঞ্চিত করার ষড় করেছিল, তাতে রাজী হই নি, না-দাবীনামার দলিলে সই করি নি বলে এত দুর্নাম দেওয়া, এত লাঞ্ছনা। মার খেয়ে একটা দিন-রাত উঠতে পারি নি, দু'দিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে দেয় নি—চাবি দিয়ে রেখেছিল। জানেন এসব কথা? শেষ পর্যন্ত গলা টিপে খুন ক'রে দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে—এই ঠিক করেছিল। আজ পালাতে না পারলে আর বেঁচে আসতে হত না।'

তিক্ততর কণ্ঠে উত্তর আসিল, 'ভালই হত, এ জীবন রাখার চেয়ে সে ঢের ভাল হত। তারা বিষয় চেয়েছিল, সে বিষয় তাদের ছেড়ে দিয়ে সম্মানটুকু নিয়ে চলে আসতে পারতে। তাহলে বিধবা মেয়েকে মাথায় ক'রে রাখতুম।'

'কার বিষয় ছাড়ব বাবা? এই নাবালকের! সে যখন বড় হয়ে আমাকে বলত কেন

ছেড়ে দিলে, কৈফিয়ৎ তলব করত? কী জবাব দিতুম তাকে! আর এত কাণ্ডের পরও আপনারা আনলেন না, খবর নিলেন না—তখন কী ভরসায় আমি সব ছেড়ে দিয়ে আসব?'

'এখন কার ভরসায় এলে! এতই যদি ভরসার অভাব—ঐ মুখ দেখাতে এখন এলে কেন?…বলছ তারা কুলুপ দিয়ে রেখেছিল মারবে বলে—এখন এলে কীভাবে তাহলে, কার সঙ্গে?'

'তাদের দয়া হয় নি। ছোট জাত ঝি, তার দেহে দয়া-মায়া আছে—সে লুকিয়ে চাবি এনে খুলে দিয়েছে, সে-ই বলে দিয়েছিল—পাড়ার একটি তিলিদের ছেলে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল!'

'সে কোথায়?'

'সে চলে গেছে। তাকে আমিই যেতে বলেছি। তাকে আর কেন জড়াই!'

'ঠিকই তো! তার কাজ সারা হয়ে গেছে, আর কী দরকার! তুমি যেতে বলো নি, সে-ই চলে গেছে। নিজের লালসা চরিতার্থ ক'রে ফেলে দিয়ে গেছে। বাঃ, বেশ! এই মেয়ে আমি জন্ম দিয়েছি, আমার সাধ্বী স্ত্রী পেটে ধরেছেন! ধিক!…তোমার ভাসুর কিছু মিথ্যা বলেন নি! তুমি তো নিজে মুখেই স্বীকার করলে—তোমার চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েছে। একটা কুটনী মেয়েছেলের সহায়তায় পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছ—! তোমার জাতধর্ম সবই গেছে। আর কোন ভদ্রঘরেই তোমার ঠাঁই হবে না। আমার ধর্মের ঘর, এখানে পাপের জায়গা নেই। তুমি দূর হও, যে পথে নেমেছ—সেই পথেই ক'রে খাও গে। না হয় মা গঙ্গায় জলের অভাব নেই!—'

শেষ ফতোয়া জারী করিয়া আমার ধার্মিক পুণ্যবান সাধক পিতাঠাকুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। আমার ভাই ও ভ্রাতৃবধূ দুইজনেই কথা বলার আওয়াজ পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও নীরব হইয়া রহিল। কাহারও সাহস হইল না যে, আমাকে ডাকিয়া বসায়, কি অন্তত একটু জল খাইয়া যাইতে বলে। একটা কি দু'টা টাকা পর্যন্ত হাতে দিবার কথা কাহারও মনে পড়িল না।

অগত্যা উপবাসে নির্যাতনে দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত দেহটাকে টানিয়া আবারও বাহিরে আসিতে হইল।

এই বয়সেই পিতৃকুল শ্বশুরকুল—দুই কুল ঘুচিয়া গেল।

রূপসী যুবতী মেয়ে নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায় ছেলে কোলে করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

[উত্তরাংশ : বর্তমান লেখকের ভাষায়]

॥ ৭ ॥

মানুষ যে এত অসহায় বোধ করতে পারে, এমন বিহ্বল দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে কখনও—এর আগে পর্যন্ত সে সম্বন্ধে হেমন্তর কোন ধারণাই ছিল না। বাপের বাড়ি থেকে, আজন্ম পরিচিত নিরাপদ আশ্রয় থেকে যখন বেরিয়ে এল—অন্ধের মতো হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে—তখন সুন্ধমাত্র একটা চলার সংস্কারই তার পা দু'টোকে চালিয়েছে, সে যে চলছে তা সে বুঝতেও পারে নি। পায়ে কোন জোর ছিল না, বিন্দুমাত্র জোর ছিল না মন বা মস্তিষ্কে—যা সেই পা দু'টোকে টেনে নিয়ে যাবে। দৃষ্টি যে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে সে চোখের জলে নয়—চারিদিক থেকে অদৃষ্টের এই প্রতিকারহীন মর্মান্তিক মার খাওয়ার ফলে চোখে আর জল ছিল না—চোখে যে দেখতে পাচ্ছিল না সেও এই বিহ্বলতারই ফল।

কী যে হল সেইটেই যেন মাথাতে ঢুকছিল না, কী যে হবে সে প্রশ্ন তো অবান্তর। তা করারও শক্তি নেই, ভেবে দেখে উত্তর দেওয়ারও না।

বাইরে তখন রোদ উঠে গেছে, যদিও সে রোদ তখনও আশপাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশেই আটকে আছে—নিচের দিকে নামে নি। তবে শহর জাগতে শুরু করেছে, বেশ কিছু লোক চলাফেরা শুরু করেছে পথে-ঘাটে। তার মধ্যে দু'একজন দেখছেও চেয়ে চেয়ে।

সম্বিৎ ফিরল তাদের এই কৌতূহলী দৃষ্টির আঘাতেই।

এ পাড়া পরিচিত। এখানেই জন্মেছে, এখানেই মানুষ হয়েছে। অনেকেই চেনে তাকে এ পাড়ায়। এমন বেশীদিন শ্বশুরবাড়ি ছিল না যে, তার মুখ ভুলে যাবে সকলে। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেই হাজার প্রশ্ন, হাজার জবাবদিহি। অপমান ও লজ্জা—নিজের কাছেই যথেষ্ট। আর নতুন ক'রে তা বাড়িয়ে দরকার নেই। এ পোড়ামুখ নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে—দ্রুত, বেশী লোক জাগবার বা পথ-চলা শুরু করার আগেই।

কঠিন শাসনে স্নায়ুকে সক্রিয় ক'রে তোলে। মনের মধ্যে যুক্তির চেহারাটা নতুন ক'রে মাথা তোলার চেষ্টা করে। তার ফলে অবসন্ন অবশ পা দু'টো আবার চলতে শুরু করে।

অন্য কোথাও—যেখানে হোক, যেমন ক'রেই হোক। কী হবে সে পরের কথা—আগে শুধু এ পাড়া থেকে চলে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তিতে সীমাহীন লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাবার কথা মনে রেখে যখন চলছিল তখন শরীরের কথা ভাবে নি একবারও। যন্ত্রের মতোই হেঁটে গেছে শুধু। কিন্তু শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে—কোথায় এসেছে সে সম্বন্ধে সচেতন

হতেই আর এক পা-ও চলতে পারল না। যখনই মনে হল বাপের বাড়ির পাড়া থেকে বহুদূরে চলে এসেছে—তখনই সমস্ত শরীর যেন নিমেষে ভেঙ্গে পড়ল। মাতালের মতো টাউরি খেতে খেতে সামনের একটা রকে বসে পড়ল।

ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গেছে অনেকক্ষণ—বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির সময়ই। কিন্তু কে জানে কেন—ঐটুকু শিশু এই চরম বিপদের কোন আভাস পেয়েছে কিনা তার মতো ক'রে—কোন কান্নাকাটিই করে নি। অচেনা জায়গা, চারিদিকে অপরিচিতের মুখ দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে, ফ্যালকামুখী হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে শুধু।

তবু—এভাবে বেশীক্ষণ থাকবে না। ক্ষিদে পাবেই, পেয়েছেও নিশ্চয়। কখন খেয়েছে ওখানে, কী খেয়েছে, কতটুকু খেয়েছে হেমন্ত তা জানে না, তবু যতই খেয়ে থাক, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই! এখনই খেতে চাইবে, না পেলে কাঁদবে। সুতরাং যা হোক একটা কিছু করতেই হবে, যে কোন একটা উপায়।

অগত্যা আবারও, মরা ঘোড়াকে চাবুক মারার মতো ক'রে শরীরটাকে ঠেলে তুলতে হল। এতক্ষণ ধরে ছেলেকে কোলে রাখার ফলে হাতটাও অবশ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। ছেলেকে নামিয়ে দিতে চাইল—একটু হেঁটে গেলে ভাল হয়, পারবেও হাঁটতে—কিন্তু সে চেষ্টা মাত্রেই ছেলেটা যেন সভয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল সজোরে, কিছুতেই কোল থেকে নামল না।

অগত্যা সেইভাবেই এগোতে হল আবার।

এগোনো মানে চলা। যার কোন গন্তব্যস্থান নেই, যার পথের কোন লক্ষ্য স্থির হয় নি—তার আর এগোনো কি!

কী করবে তাও সে জানে না।

কোথাও কোন কাজ বা চাকরি যোগাড় করার চেষ্টা করবে?

কী কাজই বা করবে, কি কাজ চাইবে কার কাছে? কে-ই বা দেবে, কি ভরসায় দেবে!

এমনি সহস্র প্রশ্ন ওঠে মনের মধ্যে, যার কোন উত্তরই মেলে না কোথাও থেকে।

রান্নার কাজ করতে পারে। আশৈশব মায়ের কাছে থেকে অনেক ভাল রান্না শিখেছে—যে-সব খাবার কি তরকারির কথা ওসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও শোনে নি পর্যন্ত। ঝিয়ের কাজ করতেও আপত্তি নেই তার। ক' বছর শ্বশুরবাড়ি থেকে ক্ষার কাচা, ধানভানা, ধানসেদ্ধ, উঠোন-ঘর নিকনো, বাসন মাজা সব কাজেই দক্ষতা এসেছে। কিন্তু আসল কথা কাজ পাওয়া। একটা ছেলেসুদ্ধ এই বয়সে কে কাজ দেবে! আর কোন পরিচয়ই তো দিতে পারবে না।

অথচ আর সময়ও নেই। দ্বিধা-সঙ্কোচের অবকাশ নেই আর।

মূঢ়ের মতো অন্ধের মতো আবার চারদিকে তাকায় হেমন্ত।

সামনেই চোখে পড়ে এক বাড়ির রকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। খালি গা—বুকে যজ্ঞোপবীত পড়ে আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। বেশ সম্ভ্রান্ত ও সৌম্য চেহারা—তার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

আর কিছু ভাবল না, হঠাৎ মনে হল এ ঈশ্বরেরই নির্দেশ, ওকে আশ্রয় দেবেন বলেই

এঁকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন।

সে অনেকখানি অকারণ নির্ভরে এগিয়ে গেল।

কিন্তু যে জীবনে কখনও এ ধরনের প্রার্থনা করে নি কারও কাছে, করার প্রয়োজন হয় নি—আর কাউকে এ ধরনের করুণা ভিক্ষা করতে শোনেও নি—তার পক্ষে এ কথা পাড়াই দুঃসাধ্য। কি বলতে হবে, কেমন ক'রে বলতে হবে তা জানে না, একটু ভেবে দেখবারও সময় নেই। সে আর একটু কাছে গিয়ে বলে ফেলল, 'দেখুন শ্বশুরবাড়ির যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছি। এখানে কিন্তু চেনা লোক কেউ নেই। আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে—এই গুঁড়োটুকুকে নিয়ে বিধবা হয়েছি। যদি দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন—যা করতে বলবেন তাই করব। রান্না বাসন মাজা, যা বলবেন। আমি মাইনেও চাই না—শুধু যদি একটু আশ্রয় দেন আর দু'টি খেতে দেন—'

কথা শেষ করতে পারল না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কদর্য মুখভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলায় বাকী কথাগুলো যেন আটকে গেল। অমন প্রশান্ত সুদর্শন মুখ যে এমন কদাকার ও হিংস্র হয়ে উঠবে তা একটু আগে ভাবতেও পারা যায় নি। বৃদ্ধ একটা অদ্ভুত গলার স্বর টেনে এনে চোখদু'টোর কুৎসিত ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'উঁঃ! তার কমে আর নেশা জমবে কেন! আমাকে কি একেবারে ভূষণোর বাঙাল পেয়েছ—যে তোমার ঐ কথা বিশ্বাস করব! যার সঙ্গে রস ক'রে বেরিয়ে এসেছিলে তাকে আটকে রাখতে পারলে না? ক'দ্দিন ঘর করেছিলে? এ বাছুরটিও কি তার? না, বাছুর সুদ্দুই বার ক'রে এনেছিলে? তাই দু'দিনেই শখ মিটে গেল, ফেলে গঙ্গাস্নান ক'রে দেশে ফিরে গেছে?'

না, চোখে আর জল নেই, কোন আঘাতেই আর চোখে জল আসে না। অনুভূতিটাই যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আঘাতের তীব্রতা বোধ হয় না—যতটা হওয়া উচিত।

তবু চোখ-মুখ জ্বালা ক'রে উঠল আজও। বলল 'কী বলছেন এসব! আমি আপনার মেয়ের মতো—'

'ইঁঃ! মেয়ের মতো! আমার মেয়ে হলে, ভদ্দরলোকের ঘরে জন্মালে, এ কালামুখ আর দেখাতে না। তার আগে গলায় দড়ি দিতে, কি গঙ্গায় গিয়ে ডুবতে।…লজ্জা-ঘেন্না থাকে তো এ পাপ না বাড়িয়ে সব সুদ্দু গঙ্গায় গিয়ে গা-ঢালা দাও। পাপের মূলসুদ্দু নষ্ট হওয়াই ভাল। বিষের চারাগাছকেও বিশ্বাস নেই।—যাও যাও, আর কথা বাড়িও না। বেশী ন্যাকরা করলে কনেস্টবল ডেকে ধরিয়ে দোব।'

কথা আর বাড়াল না হেমন্ত।

বাড়ানোর কিছু নেইও।

সুস্পষ্ট নির্দেশ—বাবারও, বাবার বয়িসী এই বৃদ্ধেরও।

গঙ্গায় গিয়ে গা-ঢালা দাও। গঙ্গার জল তো আর ফুরোয় নি।

তাই যাবে সে। এ জীবন আর রেখে লাভ নেই। মা গঙ্গার কোলে সব জ্বালার শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।

গঙ্গা কোন্ দিকে—আবছা ধারণা একটা ছিল।

সেই দিকে, পশ্চিম দিকে পা বাড়াল আবার।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গঙ্গার ধারে এসে পেঁছিল।

বোধহয় সামনেই এটা নিমতলার ঘাট। বাতাসে মড়া-পোড়ার গন্ধ। কিন্তু কোন্ ঘাট জেনেই বা লাভ কি? ওর কাছে সবই সমান। জল থাকলেই হল।

আন্দাজে আন্দাজে মেয়েদের ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েদের ভীড় দেখে বুঝল মেয়েদের ঘাট এটা। বহুকাল আগে এক-আধবার মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে এসেছে—সে কথা কিছুই প্রায় মনে নেই। গাড়ি ক'রে এসেছে, গাড়ি যেখানে থেমেছে সেইখানেই নেমে গেছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখবার দরকার হয় নি।

ঘাটে ঢুকল, কিন্তু জলে নামা হল না।

অথচ—এই সময়ই নামা সুবিধে—সেটা না বোঝার কথা নয়।

বহু মেয়েছেলে চান করছে—তার মধ্যে কে কতদূর এগিয়ে গেল, কে আর উঠল না, অত লক্ষ্যও করবে না কেউ।

সব বুঝেও শেষ মুহূর্তে কেমন একটা ভয়, ইচ্ছাতুর যুক্তি কতকগুলো—যা নিজের মনের কাছেই ওজর বলে মনে হচ্ছে।...

যদি না ঠিক ডুবতে পারে! ডোবার চেষ্টা করলেও ডোবা যায় না অনেক সময়। আপনিই ভেসে ওঠে। সেই জন্যে ভরা কলসী গলায় বেঁধে ডোবে মেয়েরা, কিংবা ইট বা পাথর।

যদি ডুবে মরতে গিয়ে ডোবা না হয়—সে বড় কেলেঙ্কারি। লোক-জানাজানি, হৈ-চৈ, থানা-পুলিশ।

সে শুনেছে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে পুলিশে ধরে, সাজা হয়। ভেসে না উঠলেও—কেউ যদি দেখে ফেলে? সে ডুবে মরার চেষ্টা করছে কেউ যদি লক্ষ্য করে?

দরকার নেই। তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। আর একটু নির্জন হোক।

আশা বুঝি শেষ মুহূর্তেও যেতে চায় না।

নিজের এই মনকে-আঁখিঠারাটুকু নিজের কাছেও ধরা পড়ে। লজ্জিত হয়। তবু সেই ওজরটুকু আঁকড়ে ধরেই সময় নেয় খানিকটা। ঘাট জনহীন হবার অপেক্ষায় ঘাটেরই একটা ভিজে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে।...

অল্প বয়স, জীবনের সবটাই এখনও সামনে পড়ে আছে।

সম্ভোগের অনেক সম্ভাবনাই বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেছে এটা ঠিক—তবু শুধু বেঁচে থাকারও একটা আনন্দ আছে বৈকি!

যে দুঃখে মেয়েছেলে—বা মানুষ—আত্মহত্যা করে, সে দুঃখ এটা নয়। স্বামীর সঙ্গে এমন ভালবাসার সম্পর্ক হয় নি যে, সে বিরহে বিচ্ছেদে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করবে।

আঘাত যা পেয়েছে সে শুধু অবিচারের আঘাত, অন্যায়ের আঘাত। তাতে মন ক্ষুব্ধ হয়, রুষ্ট হয়। প্রতিশোধের কথা ভাবে। সে অন্যায় অবিচার—অকারণ নির্যাতন মেনে নিয়ে নিঃশব্দে মরে যেতে চায় না।

তাছাড়া এই ছেলেটা। এ একটা জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। কঠিনতম স্নেহের বন্ধন। অবলম্বন, আশা।

এর জন্যেই আরও বাঁচতে ইচ্ছে হয়।

একে বড় করবে, মানুষ করবে, সুখী হবে এ—মনের সমস্ত কামনা আকাঙ্ক্ষা এখন এই একটি বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

একে সুদ্ধ নষ্ট করবার—এই জীবন মুকুলটিকে অকালে ছিঁড়ে ফেলার কী অধিকার আছে তার? সে-ই নিয়ে এসেছে। এর চেয়ে সেখানে রেখে এলে হয়ত তারা প্রাণে মারত না, হয়ত নিজেদের বংশের ছেলেকে বাঁচিয়েই রাখত শেষ অবধি।

একে রেখে যাবে নাকি?

এই দুধের শিশুকে দেখে কি কারও দয়া হবে না? একটু আশ্রয় দেবে না কেউ?

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ভিখিরীরা এই সব ছেলেদের নিয়ে যায়—কানা খোঁড়া ক'রে দেয় ইচ্ছে ক'রে। মাগো, সে দুর্গতির কথা যে ভাবাই যায় না! তার চেয়ে মেরে ফেলা ভাল। আত্মহত্যা করলে নাকি নরকে যায় মানুষ, তবু দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারবে তো!...

এলোমেলো চিন্তার শেষ নেই।

বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল। চারিদিক লক্ষ্য করার চেষ্টা করল, মনটা কষ্টকর দুশ্চিন্তা থেকে যদি সরিয়ে আনা যায়।

কত মেয়ে স্নান করছে। কেউ নামছে, কেউ স্নান সেরে উঠে যাচ্ছে। কেউ বা জলে দাঁড়িয়েই আহ্নিক সেরে নিচ্ছে। ওর মধ্যেই আবার দু'-তিনজনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কোথাও, কোমর বা বুক পর্যন্ত জলে নেমে—দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হিসেবে অকারণেই কুল-কুচো করছে খানিকটা পর পর।

এরা সকলেই কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত। তার মতো এমন দুর্ভাগিনী বোধ হয় কেউ নেই এদের মধ্যে। ভগবান সমস্ত দুর্দশা ও দুঃখ শুধু বুঝি তার জন্যেই রেখে দিয়েছিলেন, অদৃষ্টের সমস্ত ষড়যন্ত্র শুধু এই অনাথা অবীরা মেয়েছেলেটির জন্যেই।

ভাবতে ভাবতে আপনিই এক সময় যেন বুক চিরে একটা হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, 'মা মাগো!'

সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে উঠল, কে কি ভাববে, কারও কানে গেল কি না! ছি ছি! কেউ যদি এখনই প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে বাছা তোমার?

নিজে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চারিদিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল, এর ভেতর—সে এতক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল বলে দেখতে পায় নি—একটি মহিলা এসে তার খুব কাছে দাঁড়িয়েছেন এবং একদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছেন।

কতক্ষণ ধরে এমন দেখছেন কে জানে, কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা সে টেরও পায় নি—তবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীতে মনে হল অনেকক্ষণই এসেছেন।

এই অযথা ও অভদ্র কৌতূহলে বিরক্ত হবারই কথা, বিরক্ত বোধ ক'রেও ছিল। সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন দিশাহারা হয়ে বাঁচবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে, নিজের চিন্তাতেই ক্লিষ্ট ও উত্ত্যক্ত থাকে তখন অপরিচিত লোকের গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতা অসহ্য মনে হয়। কিন্তু, ভুরু কুঁচকে মুখটা ফিরিয়ে নিতে গিয়েও ফেরাতে পারল না, চোখ দুটো কেমন যেন আটকে গেল। দেখল কৌতূহল বা কৌতুক নয়—মহিলার সুন্দর দু'টি চোখ থেকে সহানুভূতি ও আন্তরিকতাই যেন ঝরে পড়ছে।

এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল।

মধ্যবয়সী মহিলা—বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে—খুবই রূপসী ছিলেন নিশ্চয় এককালে, তবে এখন বয়সের সঙ্গে শরীর একটু ভারী হয়ে পড়ায় তত জৌলুস আর নেই। তবে মোটা নন, কুরূপা তো ননই। স্থিরযৌবনা বলা চলে অনায়াসে। পরনে চওড়া পাড় সাদা গরদের শাড়ি, গায়ে এক-গা গহনা—ধনী-গৃহিণী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার মহিলা কথা বললেন, 'কি হয়েছে ভাই? অমন ক'রে বসে আছ কেন?··· আহা মরে যাই, মরে যাই—বাচ্ছাটার মুখটা শুকিয়ে গেছে যে! কোন বিপদ হয়েছে—? বলতে নেই—কেউ মারা-টারা যায় নি তো?'

উত্তর দেবার চেষ্টা করল হেমন্ত, কিন্তু সে চেষ্টায় ঠোঁট দুটোই কাঁপল শুধু, গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। যে চোখের জল চিরদিনের মতো শুকিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল অন্তরে অশ্রুর উৎস পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে—সহসা দু' চোখ জ্বালা ক'রে সেই জলই দু' চোখের কূল ছাপিয়ে ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়ল।

এতেই বোধ করি অনেকখানি উত্তর পেয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। তিনি ওর পাশে কাদামাখা সিঁড়ির ধাপটাতেই বসে পড়লেন। বোধহয় কোন দাসী বা আশ্রিতা কেউ সঙ্গে ছিল, সে ব্যস্ত হয়ে কি বলতে গেল—বোধহয় দামী শাড়ির পরিণামের কথাটাই—ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত ক'রে সরে যেতে বলে একেবারে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, 'আহা বাছা রে!··· এমন ক'রে বসে আছিস—মরবার মতলব এঁটেছিলি বুঝি? ক'দিন খাস নি?···এমন ফুলের মতো সুন্দর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।···কি হয়েছে বল দিকি? কপাল তো এই বয়সেই পুড়ে গেছে দেখছি, নইলে ভাবতুম বরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ডুবে মরতে এইছিস!···কি হয়েছে খুলে বল আমাকে। আমি তোর বড় বোনের মতো—আমার কাছে লজ্জা করিস নি।'

যেটুকু বাঁধ তখনও ছিল—লজ্জার সংকোচের সম্ভ্রমবোধের—এই সহানুভূতি ও স্নেহের বন্যায় তা ভেসে তলিয়ে গেল। হেমন্ত ওঁর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল।

মহিলা বাধা দিলেন না, বৃথা সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করলেন না। খানিকটা পরে আবেগের প্রাথমিক প্রবণতা কমে এসেছে বুঝে সস্নেহে সযত্নে ওর মুখটা তুলে ধরে আস্তে আস্তে বললেন, 'চারদিকে ভিড় জমে গেছে ভাই, এখনই নানানখানা কথার ছিষ্টি হবে; চ' ভাই একটু কষ্ট ক'রে উঠে আমার বাড়ি চ'—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এই কাছেই বাড়ি, যেতে যেতে সব শুনব। কিংবা বাড়ি পৌঁছেই সব বলিস ঠাণ্ডা হয়ে।'

'বাড়ি' শব্দটা শুনে উঠতে গিয়েও একবার একটু ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকাল হেমন্ত ওঁর মুখের দিকে।

চোখের পলকে সে তাকানোর অর্থ বুঝে নিয়ে মহিলা হেসে বললেন, 'ভাবছিস যে, আমি ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন বিপদে যদি ফেলি?···তা মরতেই তো যাচ্ছিলি, মরার বাড়া আর গাল কি?'

'মরার বাড়াও আছে বৈকি দিদি মেয়েদের। আপনিও তো মেয়েছেলে, জানেনই

তো।···আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বামুনের মেয়ে—আমার কাছে প্রাণের চেয়ে ইজ্জতের দাম বেশী। সেই বাঁচাতেই আজ এখানে মরতে এসেছিলুম।'

মহিলা স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিক চেয়ে বললেন, 'ইজ্জৎ যে বাঁচাতে চায়—কারও সাধ্য নেই তার সে ইজ্জৎ নষ্ট করে। আর কিছু না হোক মরা তো রইলই। সেটা তো হাতের পাঁচ!'

আর কথা বাড়াল না হেমন্ত। সত্যিই চারিদিকে তখন কৌতূহলী স্নানার্থীদের ভিড় জমে গেছে। তা ছাড়াও, এঁকে অবিশ্বাস করার জন্য একটু লজ্জিতও হল মনে মনে। এঁর দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে তা মনে হয়ও নি, এখনও হল না। এক মুহূর্তের জন্য সামান্য যে দ্বিধাটুকু দেখা দিয়েছিল সে নিতান্তই সংস্কারবশে—তার মূলে কোন সত্যকার যুক্তি ছিল না।

ঘাটের বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, বড় জুড়ি গাড়ি।

সহিস দোর খুলে দিতে আগে হেমন্তকে উঠিয়ে নিজে তার পাশে উঠে বসলেন। সঙ্গের মেয়েছেলেটিও উঠতে যাচ্ছিল, তাকে বললেন, 'তুমি আজ একটু কষ্ট ক'রে হেঁটেই এসো চারুদি, এর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলতে চাই।'

চারু খুশী হল না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু বলতেও পারল না কিছু। পরে জেনেছিল হেমন্ত, সে ওপরতলার অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থেকে ফাই-ফরমাস খাটা, তেল-মাখানো, বাতাস করার ঝি। উনি বয়স হিসেবে সব দাসীদেরই কাউকে দিদি কাউকে মাসী বলেন।

চারু বেজার মুখে ভিজে কাপড়ের পুঁটুলিটা সামনের সীটের গদীতে আলতো ফেলে দিয়ে হন হন ক'রে এগিয়ে গেল।

মুচকি হেসে ভদ্রমহিলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোচম্যানকে ডেকে বললেন, 'আনন্দময়ী তলায় একবার একটু রেখো তো সওয়ার সিং, একটু পেসাদ চেয়ে নোব।'

তারপর হেমন্তর দিকে ফিরে বললেন, 'দুধের বাচ্ছা ক্ষিদেতে নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। পুজুরী আমার চেনা, খুব ভালবাসে, খাতিরও করে। চাইলেই এক মুঠো মোণ্ডা তুলে দেবে'খন—পেসাদ। ছেলেটাকেও খাওয়া, নিজেও দুটো মুখে দে। মায়ের পেসাদে দুর্গতির নাশ করে—বিপদ-আপদ কাটিয়ে দেয়।'

॥ ৮ ॥

'তারপর?' গাড়ি ছাড়তে সুস্থির হয়ে বসে মহিলা বললেন, 'এবার বল দিকি তোর বিত্তান্ত! শুনি সব!'

বলল হেমন্ত।

সবই বলল।

যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বললেও কিছুই গোপন করল না। বাবার কথা, বাপের বাড়ির কথা, শ্বশুরবাড়ি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, শাশুড়ি জা ভাসুরদের লোভের বীভৎস চেহারা, অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ—কালিদাসী ও নীলুর দয়ায় প্রাণ রক্ষা—শেষ পর্যন্ত

বাপের বাড়িতে বাবার ধর্মপরায়ণতা—সব।

নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল হেমন্ত। পাশে বসে থাকার জন্যেই হোক, অথবা এই লজ্জাকর কাহিনী বিবৃত করার সঙ্কোচেই হোক, এতক্ষণ মুখ তুলে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে চাইতে পারে নি। বলা শেষ হলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যে, দর-বিগলিত অশ্রু তাঁর কপোল-কণ্ঠ বেয়ে তাঁর বুকের কাছের শাড়ি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে। এমন নীরব হয়ে বসে যে এতক্ষণ শুনেছেন ওর কথা—সে তাঁর কোন কথা বলার শক্তি ছিল না বলেই।

হেমন্ত চুপ করলে গাঢ়, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কি লগ্নেই জন্ম নিয়েছিলি বোন! ষেটেরা পুজোর দিন ললাটের লেখন লিখতে এসে মুখপোড়া বিধেতা-পুরুষের বুঝি দুঃখু ছাড়া কোন সুখের কথা মনে পড়ে নি। ঝাঁটা মারতে হয় অমন বিধেতার মাথায়!'

ততক্ষণে গাড়ি পেঁছে গেছে ওঁদের বাড়িতে।

আগেই পেঁছিত, মধ্যে আনন্দময়ীতলায় খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল বলেই এতটা সময় লেগেছে।

ওখান থেকে প্রসাদ চেয়ে নিয়ে, ওদেরই বলে জল আনিয়ে হেমন্তদের জোর ক'রে খাইয়েছেন উনি। ভাবগতিক দেখে মনে হল এখানে মোটা রকমের দান-ধ্যানের বরাদ্দ আছে—পুজারীরা সকলে শশব্যস্ত ওঁর ফরমাশ খাটার জন্যে।

বাড়ি পেঁছে গাড়ি থেকে নেমে হেমন্ত একটু অবাকই হয়ে গেল।

মহিলা যে ধনী—সেটা ওঁর বেশভূষা গাড়ি-জুড়ি কোচম্যান সইসের পোশাক-উর্দি দেখেই বোঝা গিয়েছিল—তবু ঠিক এতটা যে ধনী তা বাড়ি পেঁছবার আগে বুঝতে পারে নি হেমন্ত। আগাগোড়া মার্বেল পাথরের মেঝে, প্রত্যেক ঘরে বড় বড় আয়না আর দামী বিলিতি ঝাড় ঝুলছে। তেমনি নানা আকারের—বড়ই বেশী—তেলে-আঁকা ছবি, শ্বেত পাথরের মূর্তি—সায়েবী ধরনের চেহারা বলেই মনে হল হেমন্তর। বড় বেশী নিরাবরণ।...আর ঘড়ি যে কত এবং কত রকমের—তার তো ইয়ত্তাই নেই।

বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে কাউকেও দেখা গেল না। শুধুই যেন দাসী-চাকরের মেলা।

কিন্তু বাড়ির পুরুষরাই বা কৈ? আর সব অন্য আত্মীয়-স্বজন?

ঘরের পর ঘর পেরিয়ে কারুকার্য-করা রেলিং ধরে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই সামনে যে ঘরখানা চোখে পড়ল সেটা প্রকাণ্ড। নিচের বড় দু'খানা ঘরের ওপর এই একখানা ঘর। এর আসবাব আরও দামী, তবে যেন কেমন কেমন। এটা যেন ওর মনে হল—মার মুখে শোনা জমিদারদের জলসাঘর বা নাচঘরের মতো। ঘরের মাঝখানে বিস্তৃত পুরু গদির ওপর দামী জাজিম পাতা, তার ওপর নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র সাজানো। সব চেনেও না হেমন্ত, শুধু হার্মোনিয়াম আর ডুগি-তবলাটা পরিচিত।

একবার একটা কি খটকা লাগল ওর।

মহিলার দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল—এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, মহিলার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতেও এয়োতির কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না—শুধু সোনার বাহার।

আরও লক্ষ্য পড়ল—গরদের শাড়িরও পাড় চওড়া বটে, কিন্তু লাল পাড় নয়। কালো পাড়।

এটা খুবই অস্বাভাবিক, অনভ্যস্ত দৃশ্য। যা দেখতে অভ্যস্ত, যা দেখে এসেছে এতকাল, তার সঙ্গে মেলে না। মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত, ভবিষ্যতের চিন্তায় অবসন্ন না থাকলে আগেই নজরে পড়ত।

দুই আর দুইয়ে যোগ দিয়ে চার-এ পেঁছিতে খুব দেরি হল না।

এসব মেয়েছেলে সে দেখে নি কখনও তার এই একান্ত সীমিত জীবনে। এ ধরনের বাড়ি সম্বন্ধেও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—তবু কিছু কিছু উড়ো কথা শুনেছে বৈকি, এর-ওর-তার মুখে। ছেলেবেলায় অনেকে এসেছেন, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী। মার সঙ্গে গল্প করার সময় টুকরো টুকরো কথা বলে গেছেন তাঁরা—সব আজ আর মনে নেই—তবু সেই সব জড়িয়ে একটা ধারণা হয়ে গেছে। সুতরাং মেয়েছেলেটি যে কি—তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

এই গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল তার মানসিক অবস্থার। মৃত্যুর দ্বার থেকে, সর্বসমাপ্তির সীমারেখা থেকে ফিরে এসেছে বলতে গেলে। আবার একটু একটু ক'রে আশা ও আশ্বাসের প্রাসাদ রচিত হয়েছিল মনের দিগন্তে। দিকদিশাহীন অকূল অন্ধকারে জীবনের ভূমিপ্রান্ত একটুখানি যেন চোখে পড়েছিল কোথায়।

অকস্মাৎ এই একটা আঘাতে, মেয়েছেলেটির পরিচয় অনুমান করার পর, সব আশা যেন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে। সেই অস্পষ্ট আশ্বাসের ভূমিপ্রান্তটুকুও আর চোখে পড়ে না—নিরন্ধ্র আঁধারের সমুদ্রেই তলিয়ে যায় চোখের নিমেষে।

আবারও একটা মেরুদণ্ড-হিমকরা অবসন্ন ভাব বোধ হয়। পা-দুটো ভেঙে আসে। ভেঙে আসে, কিন্তু ভেঙে পড়তে দেয় না সে।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, 'আমি যাই দিদি, কিছু মনে করবেন না।'

প্রসন্ন কোমল মুখে বিস্ময়ের ভ্রূকুটি দেখা দেয়। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলা—বোধ করি ওর মনোভাব অনুমান ক'রেই প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?'

'না, আপনাদের জল খেতে পারব না। আমি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরের বৌ। বিধবা।'

ক্রুদ্ধ হবারই কথা, কিন্তু মহিলার আশ্চর্য সংযম, কোন অপমান বা উষ্মা তাঁর মুখে ফুটল না। শান্তকণ্ঠেই বললেন, 'আমাদের জল খাবে কেন ভাই, নলে সরকারী জল আসছে, কারুরই নিজস্ব জল নয়। আমাদের ছোঁয়া-ন্যাপা কিছুই খেতে বলছি না—অবিশ্যি ভাল বামুনের ঘরের বামুন-ঠাকুরই রাঁধে, বাঁকড়োর বাড়ি, ঘোষাল বামুন ওরা, জানাশুনো, এক-আধ ঘর শিষ্যি-যজমানও আছে, নেহাৎ বড় সংসার, অভাবে পড়েই এই কাজ করতে এসেছে—চিঠিপত্তর আসে-যায়, ওদের জ্ঞাতগুষ্টি আসে—ভাল বামুন এতে কোন দু'কথা নেই, দেখি তো কত সব সাদা সুতো গলায় ধোপা-কাওরার ছেলে বামুন বলে চালিয়ে দিচ্ছে—বড় বড় বামুন-বাড়ি হাঁড়িতে কাটি ঘুঁটছে—এ সে বামুন নয়। তা হোক, তাও খেতে বলছি না। সাজ-সরঞ্জাম সব আনিয়ে দিচ্ছি, নতুন বোগ্নো

তোলা-উনুন চাল-ডাল, শুধু কাপড় দিচ্ছি, চান ক'রে নিজে দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খাও, ছেলেটাকে খাওয়াও। চাও তো দারোয়ানকে দিয়ে এক ঘড়া গঙ্গাজলও আনিয়ে দিতে পারি, ও-ও মিশির বামুন, আমাদের ছোঁয়া কি মাছ-মাংস কিছু খায় না—নিজে হাত-পুড়িয়ে রেঁধে খায়।'

একটু চুপ ক'রে থাকে হেমন্ত। লোভ বড় বেশী। বাঁচবার লোভ। বাঁচবার সম্ভাবনা। এই একমাত্র এখন পথ বাঁচার—এর আশ্রয়।

তা ছাড়াও, মানুষটা এতই ভাল, বলতে গেলে মৃত্যুর মুখ থেকেই ফিরিয়ে এনে জীবনের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। এর মনে ব্যথা দেওয়ার মতো অকৃতজ্ঞতাও বোধ হয় আর নেই।

তবু, শেষ পর্যন্ত সংস্কারেরই জয় হয়। আস্তে আস্তে বলে, 'কিন্তু সেও তো আপনাদের—আপনারই অন্ন খাওয়া হবে। অন্নপাপ মহাপাপ। আমার ছেলে মানুষ হবে না পাপের অন্ন খেলে।'

'না-খেলে মানুষ হবে? আগে বাঁচলে তবে তো মানুষ হবার কথা! বাঁচবে কি ক'রে? বাঁচাবেই বা কার অন্নে? চাকরি করতে গেলে কেউ চাকরি দেবে? এই আগুনের খাপ্‌রা চেহারা?—দেখলে তো সকালে। ভিক্ষে ক'রে খাবে? সে কী অন্ন, কে দিচ্ছে বেছে যাচিয়ে নিতে পারবে—কার অন্নে কি পাপ আছে, কতটা আছে? আমরাই তো ভিক্ষে দিই। সে অন্নে যদি পাপ না থাকে এ অন্নেই বা থাকবে কেন?…ইজ্জতের কথা বলছিলে—এই ডবকা বয়েস—এমন পথে পথে ঘুরে বেড়ালে ইজ্জত থাকবে?…কে কোথায় হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে—কিংবা কী মন্তর দিয়ে ফুসলে নিয়ে গিয়ে কার কাছে বেচে দেবে, সে তুই বুঝে নিজেকে বাঁচাতে পারবি? যে-আমাদের ওপর আজ এত ঘেন্না শেষ পর্যন্ত সেই পথেই আসতে হবে হয়ত।'

আবারও ভেঙে পড়ে হেমন্ত, সেইখানে সিঁড়ির মুখটাতেই বসে পড়ে বলে, 'আমি কি করব তাহলে দিদি, কি করা উচিত—কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'শোন্, আগে প্রাণটা—প্রাণ থাকলে তবে ধম্ম। পাপ-পুণ্যি সব কিছু। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আত্ম রেখে ধম্ম তবে পিতৃলোকের কম্ম—এসব তো শাস্তরেরই কথা। নিজেকে বাঁচা, ছেলেটাকে বাঁচা—পাপ-পুণ্যির হিসেব করার ঢের সময় পাবি। আমি মুখ্যুমানুষ, আমি যা বুঝি—পাপের অন্ন একে বলে না। যদি পাপ ক'রে থাকি সে আমি করেছি। তুই পরের সাহায্য নিয়ে খাচ্ছিস—সে পাপ তোকে পর্শ করবে কেন? আর তাই যদি মনে করিস—এটাকে ধার বলেই নে, পরে, ছেলে বড় হলে রোজগার করলে, কি তোরই যদি কোন ভদ্দরমতো রোজগারের পথ হয়—কড়াক্রান্তিতে শোধ দিস, না হয় কিছু বেশীই দিস—আমি হাত পেতে নোব। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করার সময় সে মহাজন কি ক'রে টাকা পেয়েছে—একথা কেউ জিগ্যেস করে না। আপদকালে বাছ-বিচের করা যায় না। আর বিপদে না পড়লে কে টাকা ধার করতে যায় বল্—?'

আর পারল না হেমন্ত।

আর সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

এই যে পাপের অন্ন—এ তো একটা ধারণা মাত্র।

এ সবই শোনা কথা। নানা লোকের নানা কথা শোনার ফলে একটা আবছা, অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে।

তার চেয়ে ক্ষুধা অনেক বেশী সত্য ও বাস্তব।

বেঁচে থাকার প্রশ্ন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

যা বলছে এই মেয়েছেলেটি তার একটি কথাও মিথ্যা নয়। এখান থেকে এখন বেরোলে—হয় ইজ্জত বিক্রী করা, না হয় গঙ্গার জল—এছাড়া আর কোন পথ নেই। কোন আশ্রয় নেই।

আস্তে আস্তে বলে সে, 'যা ভাল হয় তাই করো দিদি। আমি ভাবতে পারছি না।··· আর জন্মে সত্যিই তুমি আমার দিদি ছিলে, নইলে এতটা বেইমানী, এতটা অপমান করার পরও তুমি আমাকে এমনভাবে টানতে না।'

তারপর বলে, 'ও তুমি তোমার বামুন ঠাকুরকেই বলো, এক মুঠো ভাত ফুটিয়ে দিক—'

'না রে। অত নোল দিস নি। আমাদের ও আঁশের হেঁসেলে ছিষ্টি একাছত্তর হয়ে আছে। আলাদাই বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি সব, রেঁধে খা। যদি এর পর সব দেখে-শুনে প্রিবিত্তি হয়—আমাদের ওখানে খাস তখন। বরং এখন একটু শরবৎ ক'রে দিক হরিদি, মুখে দে—ছেলেটাকে একটু দুধ খাওয়া। নেয়ে-ধুয়ে সুস্থির হয়ে বোস।'

॥ ৯ ॥

ধীরে ধীরে সব পরিচয়ই পায় হেমন্ত।

পরিচয় নিজেই দেন মহিলা।

'আমার ভাল নাম একটা আছে বৈকি! রসো, মনে করি—হ্যাঁ—মনে পড়েছে, সুকুমারী। আমার জম্মদাতা ঐ নাম দেছল। তা ও নাম ঘোড়ার ডিম আমার মনেও থাকে না, কেউ জানেও না। মা ডাকত গোপালী বলে—সেই নামেই এ টহরনে আমাকে জানে সবাই।'

আরও বলেছিলেন, 'না ভাই, কেউ ফুসলে বার ক'রে আনে নি, কিংবা স্বেচ্ছায় কুলের বার হয়েও আসি নি। আমি এই ঘরেরই মেয়ে। আমার মা-দিদিমা সব এই লাইনের। তবে হ্যাঁ, উরি মধ্যে আমরা ভদ্দরভাবে কাটিয়েছি চিরকাল। আমি তো বামুনেরই জম্মিত—সেদিক দিয়ে বামুনের মেয়েই বলতে পারিস। আমার মার বাবা ছিলেন কোন এক খোট্টা দেশের রাজা। দিন-কতকের জন্যে কলকাতায় ফুর্তি করতে এসে দিদ্‌মাকে চোখে লেগে গিয়েছিল। এমনিও দিদ্‌মা নামকরা গাইয়ে ছেলেন, খুব রোজগার ছেল সেকালে। এই যে এত সব আসবাবপত্তর দেখছিস—এত বোলবোলাও—এ যেন ভাবিস নি সব আমার বাবুর পয়সায়। আমার বলতে নেই—তোর গুরুজনের আশীর্বাদে নিজেরই ঢের পয়সা আছে। এ গাড়িঘোড়া সমস্ত আমার—নিজস্ব। ঐ ওয়েলার জুড়িঘোড়া নিজে গিয়ে কিনেছি—দেড় হাজার টাকা দিয়ে।

'হ্যাঁ, এ কাজ না করলেও চলে। তবে কি জানিস, এছাড়া তো জানি না কিছু, এ-ই আমাদের জীবন। বসেই বা থাকব কেন, আর, কি নিয়েই বা জীবনটা কাটবে! কেউ তো আমাকে বে ক'রে ঘরের লক্ষ্মী করবে না। এ বরং ভাল ভাল ভদ্দরলোক আসে—পাঁচটা বড়লোক, নামকরা লোক—একরকম সৎসঙ্গেই থাকি। আমার এখেনে মদ-খাওয়া হুল্লোড় করা এসব চলে না, একেবারে বারণ। ফুর্তি বলতে গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে—যা পারো করো। আমাদের ইনিও মদ-ফদ খায় না। আমিও গাইতে পারি, তবে সে নামমাত্তর, বাবুর বন্ধু-বান্ধব ইয়ারদের মধ্যে অনেক গাইয়ে আছে, পয়সা দিয়েও নিয়ে আসে ওস্তাদ গাইয়ে, বাইজী। এছাড়া কিছু নয়। আর বারো বছর বয়সে এক বুড়ো জমিদার ধরেছিল, সে-ই প্রথম ধম্ম নষ্ট করে—তবে সেও বামুন, পাবনার উদিকে কোথাকার জমিদার—কী সিংহী যেন নাম, তবে বামুন, ওদের বারেন্দর বামুন বলে—সিংহী বামুন হয় তার আগে জানতুম না। তা সে ধর ষোল বছর বয়সেই চুকে-বুকে গেছে। তারপর থেকেই এই এঁর কাছে—আজ চোদ্দ-পনেরো বছর একভাবে আছি বর-বৌয়ের মতো। কেউ বলতে পারবে না আমি কোনদিন এদিক-ওদিক চুলবুল করেছি, কি অন্য দিষ্টিতে কোন পরপুরুষের দিকে তাকিয়েছি কোনদিন। আর ইনিও—ঘরের বৌ আর আমি, এছাড়া অন্য সব মেয়েছেলেকে মা বলে জানেন।'

'তা তোমার ছেলেপুলে হয় নি দিদি?'

'ওমা, হয় নি কে বললে, ষাট ষাট!...একটা মেয়ে হয়ে মরে গেছল, তারপর এই ছেলে। তা সে আমার বলাও ভুল, পাঁচ বছরের হতেই তাকে নিয়ে গেছে বাবু, কোথায় কোন সায়েবদের ইস্কুল আছে কোন পাহাড়ের ওপর, সেইখেনে ভর্তি ক'রে দিয়েছে। নাড়াঘাঁটা নাওয়ানো ধোওয়ানো তো দূরের কথা, একটু চোখে দেখতে পজ্জন্ত পাই না ভাই। এঁর এক কথা, ছেলেকে যদি মানুষ করতে চাও, আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে চাও—এখেনে এ পাড়ায় আনা চলবে না। শীতকালে দেড়মাস-দু'মাস বন্ধ থাকে ওদের ইস্কুল, সেই সময় কাশীতে নিয়ে আসা হয়, ওঁর বাড়ি আছে হাউজ-কাটরায়, এই ছেলের জন্যেই কেনা—আমিও সে সময় সেখেনে গিয়ে থাকি। ব্যস, ছুটিও ফুরোবে—ছেলেও চলে যাবে সেই পাহাড়ে। বলব কি ভাই, এই যে দেখা হবে—ছেলে প্রেথম প্রেথম দু'-তিন দিন লজ্জা লজ্জা করবে, আড়ষ্ট হয়ে থাকবে—যেন পরের ছেলে। তা কি করব, মনের দুঃখু মনেই চেপে রাখি, বলি ছেলে যদি মানুষ হয়, পাঁচজনের একজন হয়ে ওঠে—সে কত বড় ভাগ্যের কথা। এসবের গন্ধ যাতে না থাকে সেই ভাল। আমার একটু কষ্ট হয়—কী আর হবে! ছেলেমেয়ের জন্যে মা-বাপকে অনেক ত্যাগ করতে হয়।'

তারপর একটু থেমে অপ্রতিভের মতো হেসে বলে, 'সেই জন্যেই তো আরও তোর ছেলেকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নি। ঐ বয়সে কতকটা ঐ রকম দেখতে ছিল। তবে সে আরও ফরসা, সায়েবের মতো রং তার।'

গোপালীর এখন যিনি বাবু—এখন আর তখনই বা কি, ওর চোখে এই একমাত্র বাবু, এঁকেই ভালবেসেছে সে, স্বামীর মতো দেখে; ছোটবেলার সে বৃদ্ধকে কোনমতে সহ্য করেছে, এ পথের এ-ই দস্তুর, এ-ই ওদের জীবন—এই রকম একটা ধারণা নিয়েই; ইনি মারোয়াড়ী, ধন্নুবাবু নাম। ধন্নুলাল আগরওয়ালা না কি যেন। অনেক রকম ব্যবসা

আছে এঁদের, এমনি ওকালতি পাসও করেছেন—আদালতেও যান। একটু-আধটু যা দেখেছে হেমন্ত, কথাবার্তা যা কানে গেছে তাতেই বুঝেছে খুবই উচ্চশিক্ষিত লোক।

আরও কিছুদিন কাটবার পর আরও বুঝল হেমন্ত—ধন্নুবাবু মানুষটিও ভাল, যাকে যথার্থ ভদ্রলোক বলে। এই যে এখানের এই বন্ধন—এর সঙ্গে চরিত্রহীনতার তত সম্পর্ক নেই, এটাকে কতকটা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে, নিজের পদবী ও অবস্থার প্রতি কর্তব্য হিসেবেই পালন করছেন। ধনী ব্যক্তিদের, তাঁর মতো ঐশ্বর্য-শালী ব্যক্তিদের এটা নাকি প্রয়োজন। রক্ষিতা না থাকলে অবস্থানুযায়ী প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না।...

দিন মন্দ কাটছে না, আরামে আলস্যে। অনেকদিন—অনেকদিন কেন, কোনদিনই এমন স্বাচ্ছন্দ্য পায় নি সে। বাপের বাড়িতে অন্নের অভাব ছিল না, তাই বলে খুব সচ্ছল-তাও ছিল না। শ্বশুরবাড়ির দিনগুলো তো দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। সমস্ত রকম শারীরিক কষ্ট ও লাঞ্ছনার সঙ্গে অবিরাম অপমান ও গালিগালাজ সইতে হয়েছে। আহার তো প্রাণধারণের মতো শুধু। আজ সে-সব কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তবু হেমন্তর মনে মনে কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

এমনি পরের গলগ্রহ ও করুণার ভিখারী হয়েই জীবন কাটাতে হবে নাকি? এমনি নিষ্ক্রিয়ভাবে?

এখানে থাকলে ছেলেই কি তার মানুষ হবে?

গোপালী বলছে বটে যে, সামনের শীতকালে যখন সে থাকবে না—সরকার মশাইকে বলে যাবে তার ছেলেকে একটা ভাল ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবার জন্যে। কিন্তু যে পরিবেশে সে তার ছেলেকে এখানে রাখতে ভরসা পায় না, সেই পরিবেশে কি হেমন্তর ছেলেই মানুষ হবে?

আর এমনভাবে কতদিনই বা কাটবে?

একজনের বদান্যতার ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা কি উচিত?

গোপালী করছে ঢের। আশ্রিতা কি করুণাপ্রার্থিণীর মতো ব্যবহার করে না কোনদিন, এক মুহূর্তের জন্যেও। নিজের বোনের মতো, সখীর মতোই দেখে। আত্মীয়ের মতো মর্যাদাতেই রেখেছে।

তবে এ বাড়ির দাস-দাসী বা অপর আশ্রিতারা এ ব্যবস্থায় কেউ খুশী নয়—সেটা খুব স্পষ্ট। 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছে', 'পথের ভিখিরী এসে বসেছেন রাজরাণী হয়ে'—এ ভাব তাদের মুখের ভঙ্গীতে চোখের চাহনিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না হেমন্তর।

এ মনোভাব স্বাভাবিকও।

এই বিশ্বিষ্টার দল যে সুযোগ মতো একদিন ছোবল মারবে, অন্তত মারার চেষ্টা করবে—সেটুকু না বোঝার মতো নির্বোধ নয় হেমন্ত।

লাগানি-ভাঙানিতে যে কতটা অনিষ্ট হয়—মানুষ যে কত সহজে পরের নিন্দায় বিশ্বাস করে—এ সম্বন্ধে এই বয়সেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

সুতরাং উচিত হচ্ছে মানে-মানে সরে পড়া।

আর তার আগে নিজের কোন একটা উপার্জনের ব্যবস্থা করা।

তবে সে ব্যবস্থা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। কোন সহায়-সম্বলই নেই তার, জানেও

না কিছু।

তাই গোপালীকেই ধরে সে। দু'-একদিন অন্তরই বলে, 'জামাইবাবুকে একটু বলুন না দিদি, ওঁদের অনেক জানাশুনো, বুদ্ধিও বেশী, ওঁরা চেষ্টা করলেই একটা মতলব বাতলাতে পারবেন।'

প্রথম প্রথম গোপালী এ ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারে নি।

বলেছে 'কেন লা, এখানে কি তোর পেছনে শোঁপোকা লাগছে? বিদেয় হবার এত তাড়া কেন?'

কেন যে তাড়া—দু'-একদিন যেতে তাও খুলে বলতে হয়েছে হেমন্তকে। এ যে মানুষ—এর কাছে সংকোচ ক'রে লাভ নেই। আর ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝিয়ে দিলে যথেষ্ট চাড়ও হবে না।

কারণটা শুনে গোপালীও সায় দিয়েছে।

মেয়েছেলেটির সহজবুদ্ধি অত্যন্ত ধারালো, ক্ষুরের মতোই শান দেওয়া মনে হয়। তেমনি তীক্ষ্ণ ওর সাংসারিক জ্ঞানও। সে বলেছে, 'তা ঠিক। মানুষের মন না মতি। কে কী বলবে, তোকে হয়ত বিষ নজরে দেখব। তখন একটা তুচ্ছ ছুতোনাতা ক'রে তাড়ানো আর এমন কি কঠিন কাজ!...'

তারপর একটু ভেবে বলেছে, 'আচ্ছা দেখি! বলি ওঁকে।...বলেছি এক-আধবার, একেবারে যে বলি নি তা নয়। তবে তেমন আড়-হয়ে-পড়া গোছের ভাবে বলি নি। তাই উনিও গা করেন নি তত। এবার ফেচাখেউ ক'রে পেছনে লাগতে হবে আর কি। তবে পারলে উনিই পারবেন—এটা ঠিক। ও যা মনিষ্যি—লাট-বেলাট থেকে শুরু ক'রে কে নেই ওঁর হাতের মুঠোয়!'

'বাবু' বা মালিকের গর্বে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গোপালীর—বলতে বলতে।

গোপালীকে আশঙ্কার কারণটা খুলে বলতেই কাজ হল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে ধন্নুবাবুকে চেপে ধরল, 'তোমার ও এস্তোক বাক্যি অনেক শুনেছি, এখন তারকের মার একটা কি গতি করবে তাই বলো!'

ধন্নুবাবু হেসে বললেন, 'গতি মানে কি? মরবার আগেই গতি?'

'ছি ছি! কী যে বলো। তোমার মুখে আটকায় না কিছু। ষাট ষাট, এর মধ্যে মরবেই বা কেন?...তা নয়, সত্যিই এমনভাবে পরের বাড়ি বসে খেতে ওর লজ্জা হয় তো। ভদ্দরলোকের মেয়ে, যতই হোক এ একরকম ভিক্ষের ভাত খাওয়া বৈ তো নয়। এর আর ভাষ্যি কি! আজ যদি তাড়িয়ে দিই, কাল তো আবার সেই রাস্তায় দাঁড়ানো।... এ লাইনে আসবে না ও, মরে গেলেও। আর সে আমি বলবও না আসতে। ছেলেটা বেঁচে থাক বড় হোক, মানুষ হোক—ওর ভাবনা কি? আবার নতুন ক'রে সংসার গড়বে, আবার ভদ্দরভাবে নিজেদের সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই ক'টি বছর যাতে কোন গতিকে নিজেব খাটুনির রোজগারে কাদায়-গুণ-টেনে কাটাতে পারে—সেই ব্যবস্থাটা ক'রে দাও তুমি।'

ধন্নুবাবু চিন্তিত মুখে বলেন, 'কী-ই বা উপায় করব বলো দিকি, আমি তো কিছু

ভেবে পাচ্ছি না। মেয়েদের রোজগারের পথ তো গোনাগাঁথা, একটু লেখাপড়া জানলে মাস্টারী করতে পারত, এখন নতুন মেয়ে-ইস্কুল হচ্ছে এদিকে-ওদিকে—মাস্টারনী পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তেমন তো কিছুই জানে না, তুমি বলছ বাংলা জানে সামান্য, তাও বাড়িতে পড়েছে—ইস্কুলে যায় নি কখনও। কী কাজ করবে ও বলো, আমিই বা কাকে কী বলব? দপ্তরে তো চাকরি করতে যেতে পারবে না। ন চ বিদ্যা উনুনে ফুঁ—না কি তোমরা বলো না?—এক রাঁধুনী হয়ে থাকতে পারে কারও বাড়ি। কিন্তু তাতে আর কত আয় হবে? তাতে কি ছেলে মানুষ করতে পারবে? আর—তাছাড়াও এই বয়স, ঐ রূপ—কে কাজ দেবে বলো ভরসা ক'রে? যাদের বাড়ি সোমত্থ ছেলে আছে তারা তো দেবেই না। শুধু বুড়োবুড়ি থাকে এমন জায়গায় হয়ত কাজ মিলতে পারে, তা সেও—সেই বুড়োই হয়ত টানাটানি করবে শেষ পর্যন্ত।'

'যাও! তোমার যা কথা! সবাই তোমার মতো কিনা!…তা ওসব আমি জানিনে বাপু, যা হয় একটা ভেবে-চিন্তে পথ বার করো। তবে নইলে আর মাথা কি! এত যে বুদ্ধির বড়াই করো—সে বুদ্ধির খেলাটা একবার দেখিয়ে দাও দিকি!'

''আমি বুদ্ধির বড়াই করি? কোন্ দিন কার কাছে করলুম গো? তোমার কাছে তো নয়ই। তোমার কাছে চিরদিনই আমি বোকা। কোনদিন গুমর করতে শুনেছ?'

'করো আর না করো, মনে মনে তো গোমর রাখো!'

গোপালী হাসতে হাসতে বাবুর জন্যে তামাক আনতে যায়।

দাসী-চাকর যতই থাক—এটি সে নিজে গিয়ে ধরিয়ে তৈরী ক'রে নিয়ে আসে। ওঁর খাবার কি জল কি তামাক আর কারও হাত দিয়ে আনায় না কখনও।

দিন দুই পরেই ধন্নুবাবু একটা প্রস্তাব দিলেন।

ওঁর এক বন্ধু ডাঃ বদরীনাথ দাস—বিখ্যাত মেয়েদের ডাক্তার। তাঁকে বলতে তিনিই জানিয়েছেন কথাটা।

আজকাল অল্প লেখাপড়া-জানা মেয়েদের জন্যে—বিশেষ এমনি অনাথা অবীরা ভদ্রঘরের মেয়েরা যাতে বাসনমাজা ভিক্ষে করা বা কুপথে উপার্জন করা ছাড়াও ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারে—সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে—কোম্পানী নাকি ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যারা প্রসব করায়, দাই—সবই অশিক্ষিতা ও ছোটজাতের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ে তো কথাই নেই—বেশির ভাগই হাড়ি বা ডোমের মেয়েরা এই কাজ করে। তারা না জানে একবর্ণ লেখাপড়া, আর না আছে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা সতর্কতা। পরিচ্ছন্নতা-বোধ তো নেই-ই।

সেই কারণেই খাস সরকারের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল কলেজের আওতার মধ্যেই এটা শেখানো হচ্ছে। আঠারো মাস পড়তে হবে, তারপর পরীক্ষা। পাশ করতে পারলে সরকার থেকে অভিজ্ঞানপত্র বা সার্টিফিকেট পাবে। তখন নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসাই করুক বা কোন হাসপাতালে চাকরি করুক—পাশ করা ডাক্তারদের মতো বুক ফুলিয়ে টাকা আদায় করতে পারবে!

অনেক সময় হাসপাতাল থেকেও লোক এই ধাত্রী চাইতে আসে, সে ব্যবস্থাও করা

যায় প্রথম প্রথম, তবে তাতে যা পাবে তার তিন ভাগের এক ভাগ হাসপাতালে কেটে নেবে। অবশ্য তাতেও খুব কম হবে না। উপরিটা বকশিশটা তো রইলই। আর স্বাধীনভাবে 'সাইন-বোর্ড' ঝুলিয়েও বসতে পারে, একটা ফী ধার্য ক'রে। প্রসব করানোর আলাদা। এখনকার দিনের লেখাপড়া-জানা লোকরা বড় একটা কেউ হাতুড়ে দাই ডাকতে চায় না—সবাই পাশ-করা মেয়ে খোঁজে।

গোপালী উৎসাহের সঙ্গেই বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

সে আশা করেছিল হেমন্তও উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

এর যে অন্য কোন দিকও থাকতে পারে তা সে ভাবে নি।

হেমন্ত সব শুনে যেন কাঠ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ শুষ্কমুখে চুপ ক'রে বসে থেকে বলল, 'বামুনের মেয়ে হয়ে শেষে দাইয়ের কাজ করব, সত্তিক জাতের রক্ত-পুঁজ ঘাটব?'

গোপালী রাগ করল না। সে যে আহত বা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাও দেখাল না।

তবে তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। বললে, 'তাহলে কী করবে? কী ক'রে খাবে আর খাওয়াবে ছেলেকে? আমাদের এখানে আমাদের হাততোলাতেও থাকবে না, কোন একটা বৃত্তিও শিখবে না, তবে পয়সাটা কোথা থেকে আসবে, শুনি?'

কাটা-কাটা কথা গোপালীর।

'এখন লেখাপড়ার চল হয়েছে বটে, মাস্টারী ক'রেও খাওয়া যায়—কিন্তু সে নিজে আগে লেখাপড়া শিখে পাশ ক'রে মাস্টারী করার মতো তৈরী হতে হতে অন্তত সাত-আটটি বছর যার নাম—ধরে রেখে দাও। নিদেন খুব যদি চেষ্টা করো চার-পাঁচ বছর তো বটেই। সে সময়টা খাবে কি, ছেলেকে মানুষ করবে কি ক'রে? খাওয়াবে কি? এ দেড় বছরের ব্যাপার—কোনমতে কেটে যাবে।'

'এই দেড় বছর ছেলে থাকবে কোথায়?' আরও কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থেকে প্রশ্ন করে হেমন্ত।

'আমার কাছে থাকবে। ভাল ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দোব। নইলে বাড়িতেও পড়াতে পারি। বামুনে রান্না করবে, বামুনে খাওয়াবে। হরিদি আছে, ভাল বামুনের মেয়ে। ভয় নেই—জাত মারব না ওর। আর ও তো বালক—এখনও পৈতে হয় নি, ওর এখন জাতই বা কি?'

'তুমি যখন থাকবে না—কাশীতে ছেলের কাছে যাবে—তখন?'

'ওকে নিয়ে যাব। এই একবারই তো, তোর দেড় বছরের মধ্যে তো দু'বার হবে না। সেও হরিদিই সঙ্গে যায়, সে-ই রান্না করে সেখানে।'

তবু মন স্থির করতে পারে না হেমন্ত। বলে, 'রান্নার কাজ-টাজ হয় না?'

'সে তো তোকে আগেই বলেছি', এবার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে গোপালী, 'কে রাখবে তোকে—এই বয়েস, এই রূপ? তুই-ই কি মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে থাকতে পারবি? আর রান্নার কাজে কত রোজগার করবি? খাওয়া-পরা আর তিন, বড়জোর চার টাকা মাইনে। তাতে ছেলের খরচ চলবে?'

অগত্যা রাজী হতেই হয়।

সত্যিই যদি স্বাবলম্বী হতে হয়, যদি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়, এ সুযোগ

ছাড়া ঠিক নয়।

পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করার কত সুখ তাও জানে বৈকি!

হেমন্তর বাপের বাড়ির পাশে এক কায়েত জমিদারের বাড়িতে রাঁধুনী ছিল স্বর্ণ বলে, তারও কোলে একটা ছেলে। ছেলেটার অসুখ করলেও সারা দিনে একবার খবর নিতে পারত না, ফেলা ভাত দুটো খাওয়া, তার ওপর বাবুর ছেলেদের হাতে যখন-তখন কারণে-অকারণে চোরের মার—এইভাবেই মানুষ হত ছেলেটা। অথচ ঐ ছেলেটা খেত বলে তাঁরা মাইনে দিতেন না এক পয়সাও। ওর তারকের যদি ঐ অবস্থা হয়! বাপ রে! মনে পড়তেই শিউরে ওঠে হেমন্ত।

আবারও সেই একই কথা বলতে হয়, 'যা ভাল বোঝ করো দিদি, আমি আর কি জানি, কতটুকুই বা বুঝি!'

॥ ১০ ॥

প্রথমটা মনে হয়েছিল পারবে না।

পাঁচ-সাত দিন পরে এমন অসহ্য লাগত যে, মনে হত ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও এখান থেকে। যা হোক ক'রে খাবে, নিদেন ভিক্ষে ক'রেও। কিংবা গঙ্গায় ডোবাও ঢের ভাল এর চেয়ে। ছেলেটাকে তো রেখেইছে গোপালী, সে কিছু আর ফেলে দেবে না—মানুষ করবেই, যেমন ক'রে হোক।

ক্রমশ ক্রমশ একটু একটু ক'রে সয়ে এল।

পরিচয়ও হতে লাগল দু-একজনের সঙ্গে—তা থেকে সখ্য।

নতুন জগৎ, নতুন কর্মক্ষেত্রেরও একটা নেশা আছে, ক্রমশ সে নেশাও পেয়ে বসতে লাগল।

অবশ্য প্রথমেই, ওরা যাকে জাত-ধর্ম বলে, তা খোয়াতে হল।

হোস্টেলে থাকা, ছত্রিশ জাতের মধ্যে। বামুনের মেয়ে একজন রান্না করে ঠিকই, মাছ-মাংসও খায় না হেমন্ত—তবে ছোঁওয়ানেপার কোন বাছ-বিচার রাখা যায় না। হরেক ধরনের হরেক জাতের মেয়ে আছে—ক্রীশ্চান য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—সব রকম। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যে—এডিথ এমিলি নাম—বড় ভাল মেয়ে। তার সঙ্গে গোড়া থেকেই খুব ভাব হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে, তবে বোঝে সব কথাই। অবশ্য তাদের আলাদা 'কিচেন' বা রান্নাঘর, আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা, মুসলমান 'বয়' বা বাবুর্চি রান্না করে। ক্রীশ্চান মেয়েটি কিন্তু ওদের সঙ্গেই খায়। একটু আলাদা বসে, এই যা।

খাওয়া ছাড়াও, কাপড়-ছাড়া বা স্নান ক'রে শুদ্ধ হওয়া এসব মানা যায় না। ডিউটি পড়ে যখন-তখন, তার সঙ্গে ক্লাস আছে, মধ্যে হয়ত কুড়ি মিনিট আধঘণ্টার বেশি খাওয়ারই সময় মেলে না। কাজ করতে করতেই খেতে আসতে হয়—খেয়েই ছোট আবার। এমনও হয়েছে, খেতে বসেছে—ডোলিভারী কেসে ডাক পড়ল, খাওয়া ফেলেই ছুটতে হল। তখন কাপড় ছাড়তে গেলে আর সময়ে পৌঁছানো যায় না, সে জন্যে

তৈরীই থাকতে হয় সর্বদা। তাকে এখনই কেউ প্রসব করাতে দেবে না, কিন্তু নিয়ম আছে, এতগুলো ডেলিভারী কেস না দেখলে পরীক্ষাই দিতে দেবে না। তাই সর্বদা, খাওয়ার সময়ও ডিউটির পোশাক ছাড়তে ভরসা হয় না।

ইডেন হাসপাতালে ওদের শিক্ষার ব্যবস্থা। এখানকার আইন খুব কড়া। বড় বড় ডাক্তার আসেন এখানে—কিন্তু তাঁদের জন্যেও নয়, মেম 'সিস্টার' আছেন, এঁরা সন্ন্যাসিনী, মানুষের সেবাব্রত নিয়ে সাতসমুদ্র পেরিয়ে এখানে এসেছেন, পয়সার জন্যে কাজ করেন না, বিনা বেতনে সেবা করেন। নিজের নিজের গুরুস্থানের বা সম্প্রদায়ের মঠ থেকেই বেশির ভাগ খরচা দেয় এঁদের—সুতরাং ফাঁকি কাকে বলে তাই জানেন না। নিজেরাও যেমন ফাঁকি দেন না, অপরের ফাঁকিও সহ্য করেন না। রাত্রে নার্স বা শুশ্রূষাকারিণীরা ঘুমোয় কিনা দেখার জন্যে এঁদের যিনি প্রধানা—'নাইট সুপার', খালি পায়ে, অনেক সময় মোজার ওপর কাপড়ের জুতো পরে—অন্ধকারে ভূতের মতো ঘুরে বেড়ান, অনেক সময় কালো পোশাক পরেও—ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায়। যদি কাউকে ঘুমোতে দেখেন, কি ঢুলতে—তাহলে সেই মুহূর্তেই তার চাকরি খতম, শিক্ষার্থিণী হলে সেইখানেই শিক্ষার শেষ।

হেমন্তর রাতজাগা একেবারে অভ্যাস ছিল না। ওর বিষম ঘুম পায়। ওকে বার বার বাঁচিয়ে দেয় ঐ এডিথ মেয়েটিই। এডিথ যেদিন না থাকে—সুশীলা। এডিথ সারারাত জেগে বাইবেল পড়ে। একই টেবিলের সামনাসামনি বসে ওরা, হেমন্ত টেবিলে কনুই দিয়ে দু'হাতে মাথা রেখে বসে বসে ঘুমিয়ে নেয়। সে বসে দরজার দিকে পিছন ফিরে, সেদিকে মুখ ক'রে বসে থাকে এডিথ। খাতায় রুলটানার একটা কাঠের রুল আছে, সেইটে সে হেমন্তর কনুইয়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখে। দরজার বাইরে নাইট সুপারের পোশাকের মৃদু খসখসানি শুনলেই সে রুলটাতে সামান্য একটুখানি ঠেলা দেয়। তাতেই সজাগ হয়ে ওঠে হেমন্ত, সামনের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন মেলাতে থাকে। কোন কোন দিন এডিথের দেখাদেখি একটা গীতা এনে রাখে—রুলের স্পর্শ পেলেই গীতায় মনোযোগ দেয়।

এডিথের সঙ্গে সর্বদিন ডিউটি পড়ে না। সেই দিনগুলোতেই খুব কষ্ট হয়। জোর ক'রে চোখের পাতা টেনে ধরে, আঙুল দিয়ে চোখ রগড়ায়—ঘুম তাড়াবার যতগুলো পদ্ধতি জানা আছে সবগুলোই প্রয়োগ করে। তাতেও যখন হয় না—কলে গিয়ে চোখে জল দিয়ে আসে।

কেবল সুশীলা থাকলে এসব কিছুই করতে হয় না। এতরকম মজার গল্প জানে সে—তাদের পাড়াগাঁয়ের স্থূল রসিকতা ও উদ্ভট গল্প—সে সব ফেঁদে বসলে ঘুম ছুটে পালায়। আর চুপি চুপি গল্প বলারও আশ্চর্য দক্ষতা তার, অত যে অবিশ্রাম বকে—তিন-চার হাত দূরেও রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, কিছু শুনতে পায় না তারা। বিপদ হয় হেমন্তরই—হাসির শব্দ না ওঠে সে জন্যে মুখে কাপড় গুঁজে দিতে হয় এক একসময়। হেমন্তর মনে হয় শব্দক্ষেপণেরই একটা প্রায়-অলৌকিক ক্ষমতা আছে সুশীলার, যাকে বলতে চায় কেবলমাত্র তার কানেই পৌঁছায়—বাতাসে পরিব্যাপ্ত বা তরঙ্গিত হয় না।

এ-হেন মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্য হতে বাধ্য। যদিচ হেমন্তর নীতিবোধের নিরিখে তা হবার কথা নয়, তার শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারে বাধবারই কথা। সুশীলার সঙ্গে আলাপ হবার পর ওর ইতিহাস যখন জানা গেছে—সুশীলা কোনদিনই গোপন করার চেষ্টা করে নি, এটা মানতেই হবে—তখন সে আলাপ এমনই প্রগাঢ় সখ্যে পরিণত হয়েছে যে, হেমন্তর পক্ষে আর কোন ব্যবধান বজায় রাখা সম্ভব নয়। বরং মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে যে, এই অতিমাত্রায় ফূর্তিবাজ হাসি-খুশী সরল মেয়েটি এখানে না থাকলে এই 'বনবাস' সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠত। এডিথ খুবই ভাল লোক, ওকে ভালও বাসে, কিন্তু সে ঠিক বন্ধু নয়, ওদের থাকের মানুষও নয়। সে ইংরেজী লেখাপড়া জানে, আগে এখানে এসেছে, ডাক্তারী বইও অনেক পড়েছে সে। সব বিষয়েই ওদের থেকে অগ্রসর। ধাত্রীবিদ্যার সঙ্গে শুশ্রূষাবিদ্যাও শিখছে সে—সে এখান থেকে বেরোলে অনেক ভাল চাকরি পাবে। আর সে চাকরিও নাকি একরকম ঠিক করাই আছে।

সুশীলার অদ্ভুত ক্ষমতা এ বিষয়ে। সে একদিনেই যে-কোন লোকের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। একেবারেই পাড়াগেঁয়ে 'আবর' মেয়ে যাকে বলে, মামার বাড়ি মানুষ হয়েছিল—দাদামশাই সামান্য একটু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, এই যা তফাৎ অপর গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে। নইলে অন্য কোনদিকেই সে শহুরে নয়—শহুরে হবার চেষ্টাও করে না। ওর সঙ্গে কথা কইলে এখনও যেন পানাপুকুরের গন্ধ পাওয়া যায়।

হেমন্তর শ্বশুরবাড়ির থেকেও অজ পাড়াগাঁ ওদের দেশ। কিন্তু হয়ত সেই জন্যেই —বুনো বলেই—মেয়েটা বড় ভাল। ভারী সরলও। পরিচয় ও আলাপ হওয়ার তিন-চার দিনের মধ্যেই গলগল ক'রে নিজের সমস্ত ইতিহাস খুলে বলেছে সে। কায়স্থের মেয়ে—বাল্যে পিতৃহীন—মামারাই মানুষ করেছেন। তাঁদের অবস্থা ভাল নয়, সামান্য জমিজমা সম্বল ক'রে সবাই বসে খেতেন—বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আয়ও নাম-মাত্রে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বেশী খরচ ক'রে বিয়ে দিতে পারেন নি। এগারো বছরের মেয়েকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের এক দোজবরের হাতে ধরে দিয়েছেন।

অথচ, হয়ত একটু চেষ্টা করলে ভাল পাত্র পাওয়া যেত। শ্যামবর্ণের মধ্যেও ওর চেহারায় ভারী একটা মিষ্টতা ছিল। মুখটি বড় সুকুমার, কচি কচি ভাব—আর সবচেয়ে সুন্দর তার চোখ দুটি। প্রতিমার মতো টানা চোখ, কিন্তু ভাবালু বা ঢুলু-ঢুলু নয়—সে চোখের তারা দুটি সর্বদা যেন কী এক কৌতুকে নাচছে—এমনই চপল ও উজ্জ্বল। ওর চোখের দিকে চাইলে মনে হয় পৃথিবীতে শোক দুঃখ দুর্দশা অবিচার কিছু নেই—আছে শুধু অফুরন্ত মজা।

এই কারণেই শ্বশুরবাড়িতে—যৌবন-লক্ষণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রতি মনোযোগ দেবার লোক প্রচুর জুটে গেছে। আর তার ফলেই—সহজ ও স্বাভাবিক যা তাই হয়েছে, একদা এক মামাতো দেওরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে সে। স্বামীকে তার তখন অতি বৃদ্ধ মনে হত—পাশে শুতে ভয়-ভয় করত। সে জায়গায় কুড়ি-বাইশ বছরের দেওরকে অনেক বেশী আপন, অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে।

সে ছেলেটি অবশ্য অবিচার করে নি, কলকাতায় এনে স্ত্রীর মতোই রেখেছিল, স্ত্রী পরিচয়েই। ভদ্রপল্লীতেই ঘর ভাড়া করেছিল—এমনি কোন অসৎ ছাপ পড়তে দেয় নি

তার মনে।

বছর চারেক এইভাবেই ঘর করেছিল ওরা, একটা বাচ্ছাও হয়েছিল, কিন্তু সুশীলারই ভাগ্যক্রমে বাঁচে নি। এর মধ্যে অশান্তি অনেক হয়েছে, ওর সেই দেওর বা স্বামী যা-ই বলো—তার ওপর চাপও বড় কম আসে নি। সুশীলার মামাশ্বশুর ও শাশুড়ী তখনও বেঁচে—তাঁরা ছেলেকে ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে বিয়ে-থা দিয়ে থিতু করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বৈকি। কিন্তু এত কাণ্ডেও অমৃত ওকে ত্যাগ করে নি, দীর্ঘকাল বীরের মতো সমস্ত আঘাত-সংঘাত সহ্য করেছে। সে রেলির বাড়ি ভাল চাকরি করত, টাকা পঁয়ত্রিশের মতো মাইনে পেত—সংসার ভালভাবেই চলবার কথা, চলতও। অভাব-অভিযোগ ছিল না বলেই ওদের দু'জনের মধ্যে কোন অশান্তি ছিল না।

কিন্তু সহ্যশক্তিরও সীমা আছে। মা-বাবা বুড়ো হচ্ছেন, তাঁরা চোখের জল ফেলেন, মাথা কোটেন পায়ের গোড়ায়—আত্মীয়-স্বজনরা নিয়ত ধিক্কার দেয়, নানারকম সদুপদেশ দেয়। প্রত্যহ কেউ না-কেউ আপিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে—অনুরোধ-উপরোধ, অভিযোগ-অনুযোগ ও উপদেশ-দৃষ্টান্তে জীবন দুর্বিষহ ক'রে তোলে।

শেষ পর্যন্ত অমৃতকে হার মানতেই হল। ওর অবস্থা দেখে সুশীলাও বন্ধন খুলে দিল স্বেচ্ছায়। বলতে গেলে মিষ্ট সম্পর্কের মধ্যেই বিদায় নেওয়ার পালা চুকল। তবে অমৃত একেবারে ওকে পথে বসিয়েও যায় নি। বাবাকে বলে-কয়ে তাঁর কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা আদায় ক'রে ওকে দিয়ে গেছে, এ ছাড়া একেবারে আপিস থেকেই মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে মনিঅর্ডার আসবে এ ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছে।

সুশীলা অমৃতকে সত্যিই ভালবাসত। সে তখনও তাকে কোন দোষ দেয় নি—এখনও দেয় না। বরং বলে, 'ভালই হয়েছে ভাই, যা কষ্ট পাচ্ছিল, যা লাঞ্ছনা—সে চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না। আর সত্যিই তো—একবার একটা ভুল ক'রে ফেলেছে—তাই বলে কি আর সারাজীবন মা-ভাই-বোন-বাপকে ফেলে, আত্মীয়-স্বজন থেকে বঞ্চিত হয়ে একঘরে হয়ে থাকবে? অবিদ্যে নিয়ে তো আর সারা জীবন কাটে না—বৌ ছেলেমেয়ে এগুনো চাই বই কি! শখ মিটে গেলেই তো লোকে ফেলে চলে যায়। সে তো যায় নি ভাই, যতক্ষণে আমি যাও বলেছি ততক্ষণে গেছে। না, সে অমানুষের মতো কোন কাজ করে নি, তাকে আমি এক তিলও দোষ দিই না।'

সে নিজের জন্যেও ভাবে নি তত, মানে খাওয়া-পরার জন্যে ভাবে নি, দশ টাকা আয় একটা পেটের পক্ষে যথেষ্ট—শুধু ওর যেটা ভাবনা হয়েছিল—একা এই শহরে থাকবে কি ক'রে! দেখবে কে! কোন কোন হিতৈষী উপদেশ দিয়েছিলেন কাশী বা বৃন্দাবন কি ঐ রকম কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করতে। কিন্তু সে ওর সাহসে কুলোয় নি। ইতিমধ্যে, অনেকের মুখে অনেক গল্প শুনেছে সে, ঐ সব 'তীর্থস্থানে' নাকি যেমন দেবতারাও আছেন তেমনি বদ লোক গুণ্ডা-বদমায়েশও আছে। বরং তারাই বেশী। দেবতাদের দেখা যায় না—এরা প্রত্যক্ষ। এদের পাল্লায় পড়লে ইহকাল পরকাল কিছুই থাকবে না।

আকাশ-পাতাল ভাবছে, এমন সময় ভগবানই অপ্রত্যাশিতভাবে একজন দেখবার লোক এনে দিলেন।

সহসা একদিন হাঁটু পর্যন্ত এক-পা ধুলো ও হাতে ক্যাম্বিশের ব্যাগ নিয়ে, ময়লা জিনের কোট গায়ে ওর স্বামী মুরারি এসে হাজির হল। অনেক খুঁজে খুঁজে নাকি এসেছে, অনেক কষ্টে বর্তমান ঠিকানা যোগাড় ক'রে। সে একাও নয়—সঙ্গে বছর দুয়েকের একটি শিশু—সতাতো ভাগ্নে। বাড়িতে এক সৎশাশুড়ী ছিলেন, তিনিই এতদিন মুরারিকে ভাত-জল দিতেন, তিনি হঠাৎ গত হয়েছেন—এখন দেখবার কেউ নেই। মুরারির শরীর খারাপ, ম্যালেরিয়ায় ভুগে দেহ একেবারেই ফোঁপরা হয়ে গেছে, নিজে হাতে রেঁধে খাবে সে ক্ষমতা নেই। বিশেষ এই দুধের ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে আরও বিপদ। মাত্র বছরখানেক আগে সতাতো বোন মারা গেছে, ছেলেটাকে দিদিমার কাছে ফেলে দিয়ে সে ভগ্নীপতি গিয়ে আবার বিয়ে করেছে তিন মাসের মধ্যে। এদিকে যার ভরসায় রেখে গেছে—তিনিও সরে পড়লেন।

তাই একরকম অনন্যোপায় হয়েই মুরারি খোঁজখবর ক'রে চলে এসেছে। বললে, 'বড়বৌ, আমি বুড়ো মানুষ, আমার কেউ নেই আর, তুমি যদি না দ্যাখো তো বেঘোরে মরতে হবে আমাকে।'

সুশীলা তো অবাক! প্রথমে ওর বিশ্বাসই হতে চায় নি কথাটা, মনে হয়েছিল ভুল শুনছে, কিংবা তামাশা—তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে যখন বুঝল তামাশা নয়—ভুলও বোঝে নি, তখন বলে উঠেছিল, 'ওমা, আমার হাতে খাবে কি, আমার তো জাত গেছে!'

'আমার আব জাত আর ফাত!' উত্তর দিয়েছিল মুরারি, 'বাঁচলে তো জাতের চিন্তে! না খেয়ে মরেই যদি গেলুম জাত রেখে কী করব? তা ছাড়া তুমি আমার বিয়ে-করা বৌ, আমারই অন্যায় হয়েছিল বুড়ো বয়সে কচি মেয়ে বিয়ে করা—সেই জন্যেই তোমাকে চলে আসতে হয়েছে, তোমার এতে কিছু দোষ নেই। আর ধম্ম দিয়েছ তো বেজাত-কুজাতে নয়, আমারই ভায়ের কাছে—তাতে ভাত অশুদ্ধ হয় না। দোহাই বড় বৌ, তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে তাড়িয়ে দিও না, আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে একটু ঠাঁই দাও, আমি এই শেষ অবস্থায় আর কোথা যাব?'

সেই থেকে দুটি প্রাণীই ওর ঘাড়ে চেপেছে। দেশে গিয়ে থাকলে তবু একরকম ক'রে চলে যেত বোধ হয়, কিন্তু দেশে গিয়ে থাকা সুশীলার পক্ষে আর সম্ভব নয়, অসম্ভব ঘোঁট হবে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষ থাকবে না। মুরারির শরীরেরও এখন অবস্থা নয় যে, ছুটোছুটি ক'রে কলকাতা আর দেশ করবে বার বার, দু-চার টাকা খাজনা কি ফসলপত্র আদায় করবে। না গেলে কেউ বাড়ি বয়ে এক পয়সা দিয়ে যাবে না। আবার ইতিমধ্যেই, কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কাছেই এসে আছে, একথাটাও কি ক'রে দেশে রটে গেছে—সেখানে মুরারির যাওয়াও এখন কঠিন। অপমানের শেষ থাকবে না।

ফলে এখন সুশীলাকেই উপার্জনের চেষ্টা দেখতে হয়েছে। অমৃত যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল—আর সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তার ওপর ভরসা ক'রেই সুশীলা এখানে ভর্তি হয়েছে, সেখানেও সংসার চালাচ্ছে। উপরন্তু বরকে রেঁধে দেবার জন্যে দু'টাকা মাইনে দিয়ে একটা ঠিকে রাঁধুনীও রাখতে হয়েছে।

সুশীলা হেসে বলে, 'আমি কমলিকে ছাড়লে কি হবে, কমলি ছোড়তা নেহি!...দ্যাখ

দিকি, বর ছেড়ে পরের সঙ্গে বেরিয়ে এলুম খান্‌কী খাতায় নাম লিখিয়ে—তাতেও রেহাই নেই, সেই বরই পিছু পিছু এসে জুটল! আবার দ্যাখ, বরেরাই বৌকে খাওয়ায়, চিরকাল শুনে আসছি—বৌয়ের জন্যে হন্যে হয়ে রোজগার করতে ছোটে—আমার কপালে আমাকেই রোজগারের চেষ্টা করতে হচ্ছে, সত্তিক-জাতের রক্তপুঁজ ঘাঁটা কাজ—কী সমাচার, না বুড়ো বরকে খাওয়াতে হবে! একেই বলে কপাল! আমার অদেষ্টে সব বিপুরীত।'

বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে সুশীলা।

আবার বলে, 'ভাগ্নেটাও হয়েছে তেমনি! কে জানে বুড়োটা শিখিয়ে দিয়েছে কিনা, আমি গেলেই মা-মা ক'রে এসে জড়িয়ে ধরবে, আসবার সময় আঁচল ধরে আটকে রাখার চেষ্টা করবে, কান্না জুড়ে দেবে। যত মনে করি মায়ায় জড়াবো না, ততই ছোঁড়াটা শক্ত ক'রে গেরোয় পাক দেয়।'

॥ ১১ ॥

বিপদ এখানেও কম নয়। সর্বনাশের ফাঁদ পাতা চারিদিকেই।

ডাক্তার আছেন, ছাত্র শিক্ষার্থীরা আছে। তাদের মধ্যে সুপুরুষ মিষ্টভাষীর সংখ্যা কম নয়। এই সুরূপা মেয়েটির দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, অন্তরে লালসা জাগ্রত হবে—এও স্বাভাবিক। হেমন্ত প্রাণপণে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে, একমনে ছেলের নাম জপ করে। ছেলেকে মানুষ করতে হবে, দশের একজন করতে হবে; ছেলের চিন্তাই বর্মের মতো কাজ করে।

তবে তাতেও ফল ভাল হয় না। ছাত্ররা অত নয়, চিকিৎসকরা বিশ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁদের লোলুপতা ও আক্রোশ দুই-ই বেড়ে যায়। এক-একজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে নানারকম অনিষ্ট করার চেষ্টা করেন। তাঁদের পক্ষে সেটা খুব কঠিনও নয়।

বাঁচিয়ে দেন বদরী দাস। ধন্নুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু—এই হিসেবেই তিনি হেমন্তর ওপর নজর রেখে ছিলেন। তিনি এখানের হালচাল জানেন, কোন্ ডাক্তারের কি স্বভাব এবং কে কোথা দিয়ে কি কামড় দিতে পারে, তাও তাঁর জানা আছে। হেমন্তকে দেখে যে অনেকেই লুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে এও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সহকর্মীদের চোখের পাতা পড়া দেখেই তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন। সেই কারণেই ওঁর পক্ষে ওকে বাঁচানোও সহজ, বিপদ কোন্‌দিক থেকে আসতে পারে, কী পথ ধরে, তা বুঝে আগেই তিনি তার প্রতিবিধান করতেন। আঘাত মধ্যপথেই প্রতিহত হয়ে ফিরে যেত।

সত্যি, পরবর্তীকালে যতই ভেবেছে হেমন্ত, ততই বদরী দাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে, চোখে জল এসেছে বার বার। দেবতার মতো মানুষ ছিলেন তিনি, অন্তত হেমন্তর কাছে। ওকে 'মা হেমন্ত' বা 'হেমন্ত মেয়ে' বলে সম্বোধন করতেন, সেটা কথার কথা নয়, মৌখিক সৌজন্য-সম্ভাষণ নয়—সম্পর্কটা তাঁর কাছে আন্তরিক ও সত্য হয়ে উঠেছিল। তিনি চিরদিন সে সম্বোধনের মর্যাদাও দিয়ে গেছেন।

শুধু যে হেমন্তকেই বাঁচিয়ে গেছেন বার বার তাই নয়,—হেমন্তর জন্যে, ওর

অনুরোধে আরও অনেককে

সব চেয়ে সুশীলা।

হেমন্ত গিয়ে বদরীবাবুকে না ধরলে তার তীরে এসে তরী ডুবত।

ওদের শিক্ষাপর্বের একটা সময়—শেষের দিকে, সেপ্‌টিক ওআর্ডে ডিউটি দেবার কথা। দিতেও হত প্রত্যেককেই।

সেটা তখন একটেরে ছিল একেবারে, চারিদিকে বড় বড় ঝাউ গাছে ঘেরা, ভয়ংকর রকমের নির্জন। রোগীও খুব বেশী একটা থাকত না; জমাদারনীদের থাকার কথা, তারাও ভূতের ভয়ে সরে পড়ত। না হ'লেও নিচে তাদের আস্তানা ছিল আলাদা, নার্স বা সিস্টাররা এসে না ডাকলে তারা কেউ স্বেচ্ছায় আসত না। এখানের আবহাওয়া দূষিত বলেই অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হত—বাইরের লোকজনের যখন-তখন আসা নিষিদ্ধ ছিল, পাছে আরও বিষ ছড়ায়। রোগিণী মারা গেলেও তাকে ড্রেস করিয়ে চাকাওলা গাড়িতে ক'রে নার্সদেরই এনে বাইরে পেঁছে দিতে হত। সেখান থেকে মর্গে নিয়ে যেত ডোমেরা।

এই ডিউটিটাই ছিল ভয়াবহ সকলের কাছে। বিশেষ, একাধিক রোগী থাকলে তবু একরকম, একটি রোগী থাকলে বেশী আতঙ্কের কারণ হয়। বহু লোক মরেছে এখানে—স্বভাবতই, তখন কোন কারণে সেপ্‌টিক হয়ে গেলে বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠত, এখনকার মতো ওষুধপত্র তখন বেরোয় নি—এই বহুলোকের মৃত্যুর ইতিহাস আর নির্জনতার দরুনই অনেক ভূতের গল্প গড়ে উঠেছিল এবং তখনও উঠছিল। এমন কি—অত শান্ত ও সাহসী এডিথেরও এখানে ডিউটি পড়ার সময় মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, হাতে ক'রে ক্রশটা চেপে ধরে বসে থাকত সে, সামনের বাইবেলে আর একটা হাত রেখে।

হেমন্তর ভাগ্যক্রমে ওর যখন ডিউটি পড়ে, তখন দু-তিনটি 'পেশেণ্ট' ছিল। তাদের মধ্যে একজনের ঘোরতর বিকার। বিষম চিৎকার করত দিনরাত—তাই ঘুমের কোন উপায়ও ছিল না। ঘুম পেতও না অত। আর ব্যস্ত থাকত বলেই—ভয় অত বুঝতেও পারে নি।

কিন্তু সুশীলা বেচারীরই অদৃষ্ট মন্দ। তার যখন ডিউটি পড়ল তখন একটিমাত্র রোগিণী, মৃত শিশু প্রসব করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীভাবে রক্ত বিষিয়ে গেছে। পূর্ণ উন্মাদের মতো অবস্থা। প্রবল জ্বর, দিনরাত 'গা জ্বলে গেল,' 'গা জ্বলে গেল' করছে। সেজন্যে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে অচৈতন্য ক'রে রাখা হয়েছে। এ পেশেণ্টের পাশে বসে থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর দেখা ও সময় মতো মুখ ফাঁক ক'রে ওষুধ খাওয়ানো। তাও রাত্রে দেবার মতো ওষুধ বিশেষ ছিল না। শুধু বলা ছিল যে, যদি ঘুম ভেঙে যায়, আবার চেঁচামেচি শুরু করে তো জোর ক'রে ঐ ঘুমের-ওষুধ-মিশানো মিক্‌স্‌চারটাই আর খানিকটা খাইয়ে দেবে।

সুশীলা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের বৌ।

এতদিন শহরে থাকা সত্ত্বেও তার গ্রাম্য অভ্যাস ও বিশ্বাস কিছুমাত্র কাটে নি। সে ভূত পেত্নী শাঁকচুন্নী বেহ্মদত্যি সব বিশ্বাস করত। এই জনপ্রাণীহীন দোতলা বাড়ির ওপরতলায় সে একা—সঙ্গী বলতে এক মুমূর্ষু অচেতন রোগী। এই অবস্থায়—মৃদু

আলোয়, রাত জেগে বসে থাকলে এতদিনের সব জনশ্রুতি মনে পড়বে—এ আর আশ্চর্য কি ? প্রথম-রাতটা তবু একরকম ক'রে কাটল, রাত যত গভীর হয়—তত আর কাটতে চায় না। কেবলই মনে হয়, জমাদারনীর মুখে শোনা গল্পের সেই সাদা কাপড় পরা পেত্নীটা—যে নাকি প্রত্যহ রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়—সে এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে, ওর ঘাড়ে আর গালে তার নিঃশ্বাস লাগছে।

শেষে আর থাকতে না পেরে, কতকটা শব্দ করার জন্যেই, কোথা থেকে এক গাছা ঝ্যাঁটা সংগ্রহ ক'রে এনে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ঝাউগাছকেই সপাৎ সপাৎ ক'রে পিটতে শুরু ক'রে দিলে, আর আপন মনে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে গালাগাল দিতে লাগল, 'হারামজাদী পেত্নী, তুই আর ভয় দেখাবার মানুষ পেলি না! বলি আমি তোর কী করেছি লা, আবাগী সব্বনাশী শতেকক্ষোয়ারী!...যে মিছিমিছি আমার পেছনে লাগতে এয়েছ!...আমাকে তুমি চেন নি এখনও, এই খ্যাংরা মেরে যদি এখান থেকে তোমাকে তাড়াতে না পারি তো আমার নামই নেই, আমার জন্ম মিথ্যে!' ইত্যাদি।

ঠিপ সেই মুহূর্তে পেছন থেকে এক সিস্টার এসে পড়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে শুধোলেন, 'হোয়াট্স্ দ্যাট—সুশীলা ? ওটা টুমি কি করিটেছ ?'

অপ্রতিভ হল বৈকি! প্রথমটা লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল, কিন্তু সে ঐ কয়েক মুহূর্তই। ভয়ই পাক আর অপ্রস্তুতই হোক—ওর উপস্থিত-বুদ্ধি ওকে ত্যাগ করে নি। আর দুষ্টবুদ্ধি ও কৌতুকবোধ তো সহজাত। সে সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে ফিসফিস গলায় বলল, 'সাপ সিস্টার! স্নেক না কি যেন বলো তোমরা!'

'স্নেক! মাই গড্! কি বলিটেছ টুমি ?'

'হ্যাঁ সিস্টার। তবে আর বলছি কি! এমনি সাপ নয়, তক্ষক! তক্ষক জান না ? এত্ত বড় বড়, ছোট গো-হাড়গেলের মতো দেখতে—টিকটিকির ধরন আর কি, চার পায়ে হাঁটে। মধ্যে মধ্যে আওয়াজ করে, 'তোক্খোক্', 'তোক্খোক্'। শোন নি কখনও ?'

'লিজার্ড বলো! এরকম স্নেক হয় নাকি ?' সিস্টারের ভূতের ভয় নেই—কিন্তু সাপের ভয় আছে বিলক্ষণ ; তার মুখ শুকিয়ে গেছে, 'পয়জনাস ? বিষ আছে ?'

'এমনি বিষ আছে কিনা জানি নে সিস্টার দিদি, তবে ঝপাৎ ক'রে লাফিয়ে পড়ে চোখ খুব্লে নেয় লোকের। ছেলে-পুলে পেলে তো আর রক্ষে নেই।'

'মাই গড্!' আবারও ঈশ্বর স্মরণ করে সিস্টার, 'এখানে ? ডেকেছ টুমি ?'

'না, মানে ঠিক চোখে দেখি নি', একটু ঢোঁক গেলে সুশীলা, 'শব্দ পেয়েছি। আওয়াজ করছিল, 'তোক্খোক', 'তোক্খোক্'! তক্ষক খুব ভয়ানক সাপ—তুমি মহাভারত পড় নি, আমাদের ধম্মের বই—তোমাদের যেমন বাইবেল আর কি—তাতে পজ্জন্ত তক্ষকের কথা লেখা আছে। বই শুরুই তক্ষক দিয়ে!'

বলতে বলতে আবার বেশ জোর পায় যেন।

সিস্টার নিজে গিয়ে লণ্ঠনের আলো ফেলে সেদিকের গাছগুলো দেখলেন, তারপর সেদিকের সব জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'কাল মর্নিংএ আমি সার্চ করাবো। ভেরী ডেঞ্জারাস! টুমি খুব সাবঢানে ঠেকো। গুড্ গার্ল!'

সেদিনটা তো দুর্গা বলে কেটে গেল। পরের দিন সকালে তক্ষকের খোঁজে খুব

শোরগোল হল। বলা বাহুল্য—যা নেই, তা পাওয়া যাবে কি ক'রে?

কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি আর কাটে না।

তক্ষকের দোহাই দিয়ে সুশীলা আর-একটি সঙ্গিনী প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তা দেওয়া যায় নি। নিদেন একটা জমাদারনী ওপরে থাকার কথাও বলেছিল, কেউ রাজী হয় নি।

রাত দশটা, এগারোটা, বারোটা।

সাদা কাপড়-পরা পেত্নীর বেরোবার কথা এই সময়টায়।

সে নাকি সত্যিই বেরোয়, জমাদারনী একা নয়, আরও অনেকেই দেখেছে। মা কালীর কসম খেয়ে বলেছে সে।

সেই সময়ই হয়ে এল।

আর থাকতে পারে না সুশীলা। দরজার দিকে সামনে ফিরে বসেছে—যাতে পেত্নী এলে দেখা যায়। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, সব সময় ওনারা নাকি দৃষ্টিগোচর হন না।

এলোকেশী বলে একটি মেয়ে একখানা গল্পের বই যোগাড় ক'রে দিয়েছে, 'রহমতুন্নেচ্ছা বিবির কেচ্ছা' নাম—বলেছে, 'ভারী মজার বই, বসে বসে পড়িস, রাত কোথা দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবি না।'

কিন্তু সে মজাদার কেচ্ছাতেও মন বসছে না।

রোগিণীর আজ বিকারের ভাব খুব বেড়েছিল, ডাক্তার নিজে এসে খুব কড়া ব্রোমাইড মিক্স্চার খাইয়ে গেছেন, সে অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে। জ্বর খুব বেশী, মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করার কথা—বরফ নেই, বরফ নাকি রাত্রে আসে নি। সারা সন্ধ্যা 'গা জ্বলে গেল' 'গা জ্বলে গেল' করেছে—রক্তে বিষ ছড়িয়ে পড়লে নাকি এমনি হয়। সিস্টার একবার এসে নিজেই ঠাণ্ডা জলে গা মুছিয়ে দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, 'জলপটি দাও, জ্বর কমে এলে সরিয়ে নিও।'

দরজার দিকে ফিরে বসেই বাতাস করছিল আর সভয়ে দেখছিল চেয়ে চেয়ে। রাত বারোটার পর জ্বর কমে গেছে মনে হতে পাখা রেখে টেবিলে আলোর কাছে এসে বসেছিল। বইখানা খুলে পড়বারও চেষ্টা করেছিল খানিক—কিন্তু ভয় ও বই সত্ত্বেও এক সময় কখন চোখদুটি তন্দ্রায় বুজে এসেছে তা টেরও পায় নি।

বোধহয় দশ-পনেরো মিনিটও হবে না।

বাথরুমে দুম্ ক'রে একটা শব্দ হতেই চোখ চেয়ে দেখে রোগিণী কখন উঠে বাথরুমে চলে গেছে, বিকারের ঘোরেও জল কোন্‌দিকে পাবে সে-জ্ঞান টনটনে—বোধ করি গায়ের জ্বালা সইতে না পেরে গায়ে জল ঢালতেই গেছে—কিন্তু দুর্বল শরীরে টাল সামলাতে পারে নি, পড়ে গেছে। সুশীলা পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে গিয়ে তোলবার জন্যে টানাটানি করছে—পেছনে মৃদু খসখস শব্দ হতে আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠে ফিরে দেখে পিছনে শাণিত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাইট-সুপার!

কৈফিয়ৎ একটা ছিল বৈকি।

রোগিণী বিকারের ঘোরে উঠে চলে এসেছে—ও ধরে রাখতে পারে নি—ইত্যাদি।

কিন্তু তাতে কোন কাজই হত না। কারণ, রোগিণী সেই পড়ে যাওয়ার জন্যেই হোক বা স্বাভাবিক কারণেই হোক, সেই রাত্রেই মারা গেল। সেজন্যে মূলত দায়ী করা হল সুশীলাকেই।

ওকে বার ক'রে দেওয়া সুনিশ্চিত—ক'রে দেওয়াও হত যদি না হেমন্ত ওর হয়ে গিয়ে বদরীবাবুর কাছে কেঁদে পড়ত।

বদরীবাবু প্রথমটা এর ভেতর নাক গলাতে রাজী হন নি। বলেছিলেন, 'এটা একটা হেনাস ক্রাইম হেমন্ত, মুমূর্ষু রোগীর পাশে বসে ঘুমিয়ে পড়া। এ-লোককে লাইসেন্স দিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক? তার ওপর সিস্টাররা এসব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট্—আমি বললেও সম্ভবত তারা শুনবে না। মিছিমিছি আমিই ছোট হবো।'

কিন্তু হেমন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরল। বলল, 'এ-রুগী যে মারা যাবে আপনারা তো জানতেনই, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। মিছিমিছি তার জন্যে আর একটা প্রাণ নষ্ট করবেন?…ও পাস করতে না পারলে ওকে বাসন মেজে ঝিয়ের কাজ ক'রে স্বামীকে ভাগ্নেকে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া ঐ হানাবাড়ি, একটা অজ্ঞান রুগীর পাশে চুপ ক'রে বসে থাকা—সেটাও একটু চিন্তা করুন। আপনাদেরই উচিত অন্তত দু'জন লোক থাকার ব্যবস্থা করা।'

বদরীবাবুও সেটা বুঝলেন হয়ত। যাই হোক, তাঁর কথাতেই কাজ হল। উনি যুক্তি দেখালেন—সিস্টার যখন সুশীলাকে ঘুমোতে দেখেন নি, সামনে টেবিলে একটা বইও খোলা ছিল এও মানছেন, তখন ওর কথা যে সবটাই মিথ্যে এটা ধরে নেবেন কোন্ বিচারে?…মিথ্যে যে বলেছে এটা প্রমাণ করতে না পারলে একটা কেরিয়ার এভাবে নষ্ট করা কি উচিত?

এই যুক্তিতেই সুশীলা বেঁচে গেল সে-যাত্রা। অবশ্য অপর কেউ এ-যুক্তি দিলে কি ফল হত তা বলা যায় না, বদরীবাবুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপরিসীম—নিজের বিশেষ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তর্কাতীত—সুতরাং তাঁর কথার ওপর মেম সিস্টাররাও কথা বলতে সাহস করলেন না।

॥ ১২ ॥

এই দেড় বছর একমাত্র চিন্তা ছিল কী ক'রে পাস করবে, স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে শুরু করবে—পরের অনুগ্রহে ভিক্ষান্নে দিন কাটাতে হবে না।

কিন্তু শিক্ষার পর্ব শেষ ক'রে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোবার পর দেখল আসল চিন্তার এই সবে শুরু—শেষ নয়। দুস্তর বৈতরণী তার সামনে—পিছনে যেটা পেরিয়ে এসেছে সেটা এ-তুলনায় একটা সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী বা খাল ছাড়া আর কিছু নয়।

পাস সে ভালভাবেই করেছে। যে সাহেব সই ক'রে অভিজ্ঞানপত্র তার হাতে দিয়েছেন, লোকে বলে সুধমাত্র তার নাম করলেই গর্ভিণীর সুপ্রসব হয়। তিনিই মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন ওদের। বদরীবাবুও উপস্থিত ছিলেন, তবে সাহেবই আসল। সাধারণত কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়—এডিথ ওকে তার একটা আভাস দিয়েছিল,

সেজন্য হেমন্ত তৈরীই ছিল খানিকটা। সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন, 'ধরো তোমাকে এক বড়লোকের বাড়ির বৌকে প্রসব করানোর জন্যে এনগেজ করা হয়েছে, তার গর্ভবেদনা উপস্থিত, তাঁরা পাল্‌কী পাঠিয়েছেন, তুমি যাচ্ছ প্রসব করাতে; পথে যেতে যেতে দেখলে পথের ধারে গাছতলায় একটি ভিখিরি মেয়ে পড়ে ছটফট করছে—প্রসব হতে পারছে না—তুমি কি করবে ?'

হেমন্ত মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি পালকী থামিয়ে আগে ঐ মেয়েটিকেই দেখব, চেষ্টা করব যাতে তার নির্বিঘ্নে ডেলিভারী হয়।'

'সে কি!' সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, 'এ তো খুব ইরেস্‌পন্‌সিবল্‌ কথা হল! তারা তোমায় আগে থাকতে এন্‌গেজ ক'রে রেখেছে, তুমিও কথা দিয়েছ, তোমার ওপর ভরসা ক'রে নিশ্চিন্ত আছে তারা—সেখানেও জীবন-মরণ সমস্যা থাকতে পারে, শেষ মুহূর্তে তাদের এমনভাবে ডোবানো কি উচিত? তারা তখন কোথায় দৌড়বে লোক খুঁজতে!···ভিখিরির প্রাণের দাম ওর থেকে অন্তত বেশী নয়!'

একবার একটু বুক কেঁপেছিল বৈকি হেমন্তর।

তবে কি সে বেফাঁস কিছু বলে ফেলল ?

কিন্তু এখন আর উপায় নেই, হাতের পাশা আর মুখের কথা—ফেললে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

সে দুর্গানাম স্মরণ ক'রে দৃঢ়কণ্ঠেই উত্তর দিল, 'যাদের পয়সা আছে তারা যেকোন মুহূর্তে অন্য লোক ডাকতে পারে, হাসপাতালে এলে ধাত্রীর অভাব হবে না, বড় বড় ডাক্তার ছুটে আসবে—কিন্তু যে ভিখিরি রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে তার কি উপায় আছে বলুন! আমার তো মনে হয়, আমার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য তাকেই দেখা।'

সাহেবের মুখ প্রসন্ন হল এবার। বদরীবাবু প্রকাশ্যেই বললেন, 'বেঁচে থাক্‌ বেটি! আমার মুখ রেখেছিস!'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় সাহেব হ্যান্ডশেক ক'রে বললেন, 'এইটেই মনে রেখো, তোমাকে আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি প্রধানত মানবসেবার জন্যে। পয়সা রোজগারটা গৌণ—সেবাই মুখ্য। কখনও যেন না টাকার কথাটা আগে ওঠে। তেমন ঘটনা জানতে পারলে—টাকার জন্য তুমি কর্তব্যে অবহেলা করেছ এ-অভিযোগ যদি আসে—এ সার্টিফিকেট আমরা নাকচ করতে বাধ্য হবো।'

এ-পর্ব ভালভাবেই শেষ হল। এখন প্রশ্ন, 'এর পর ?'

অবশ্য এই এর পরটারও প্রাথমিক ব্যবস্থা গোপালীই করল। সে বলল, 'এখানে বসা তোর ভাল হবে না। তাছাড়া আমারও অসুবিধে, যখন-তখন লোক আসবে—সে বড় বিদীকিচ্ছিরি ব্যাপার! আমি পয়সার জন্যে দাইকে ঘর ভাড়া দিয়েছি সেও ভাল শোনায় না। আমি অন্যত্তরে বাড়ি ভাড়া ক'রে দিচ্ছি, ঝি রেখে দিচ্ছি—তুই সেখানে গিয়ে সংসার পেতে বোস, নতুন ক'রে স্বাধীনভাবে জীবন শুরু কর।'

হেমন্ত হাসল। বলল, 'খুব স্বাধীন! বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে ঝিয়ের মাইনে পর্যন্ত তো তোমাকেই গুণতে হবে দিদি, আমি স্বাধীনভাবে সংসারটা শুরু করব কি দিয়ে?'

'নে, সে একটু প্রেথম প্রেথম চালিয়ে দিতে হবে বৈকি! ডাক্তারদেরও পাস ক'রে বেরোলে ডাক্তারখানা সাজিয়ে দিতে হয় না? এর পর যখন মোটমোট টাকা ঘরে আসবে, তুই কড়াক্রান্তি আমাকে শোধ ক'রে দিস, আমি হাত পেতে ঠিক নোব। দেখিস!'

'না দিদি, তোমার দেনা শোধ করতে পারবও না, চাইও না। তোমার কাছে দেনদার থাকব চিরকাল সেই আমার ভাল। আর-জন্মে তুমি আমার সত্যিকার দিদি ছিলে, সে আমি বেশ বুঝে নিয়েছি।'

গোপালী ধন্নুবাবুকে বলে পটলডাঙ্গা অঞ্চলে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়ে দিলে। হেমন্ত প্রথমটায় একটু আপত্তি তুলেছিল, বলেছিল, 'একটা ঘরই তো ঢের দিদি—না হয় দুটো ঘর কোথাও নিচের তলায় দেখে দাও না। মিছিমিছি এখনই একগাদা—পঁচিশ টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া করার দরকারটা কি? তাছাড়া অত দূর—এদিকে থাকলে তবু তোমার কাছাকাছি হত—'

'তুই বুঝিস না।' গোপালী বলেছিল, 'পাঁচটা ভাড়াটের মধ্যে থাকলে কারবার চালানো যায় না। এও তো ধর ডাক্তারদের মতোই—পাঁচটা লোক আসবে যাবে, তাদের বসবার জায়গা চাই—ঠাটবাট না থাকলে চলে? পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকলে কেউ ডাকবে না। বলবে, ও তেমনি দাই, কেউ ডাকে না, অন্ন হয় না। যে কাজের যা, ইজ্জতটা আগে। ভড়ং না হলে কারবার চলে?...আর ইদিকে এই হেঁদো দর্জিপাড়া অঞ্চলে এখন তিন-চারজন পাস করা দাই বসে গেছে। শুনেছি, বাবুই বলেছিলেন, পটলডাঙ্গার দিকে বিশেষ কেউ নেই। তুই ওখানেই বোস, আমি দুপুরের দিকে একবার ক'রে গিয়ে দেখে আসব'খন।...না হয় তো, তোর কাজকর্ম না থাকলে, গাড়ি পাঠিয়ে দোব—তুইও এখানে চলে আসতে পারবি।'

ধন্নুবাবু যে বাড়িটি দেখেছিলেন, বড় রাস্তার ওপর, অথচ খুবই ছোট বাড়ি। নিচে দুটো ওপরে দুটো ঘর। নিচের একটা ঘর বাইরের ঘর হিসেবে চলবে, তাতে তিনটে চেয়ার ও একটা টেবিলেরও ব্যবস্থা করা হল, বলা বাহুল্য, ধন্নুবাবুই পাঠিয়ে দিলেন সেগুলো—আর একটা ঘরে ঝি থাকবে। তিনতলায় খাপরার রান্নাঘর একটা আছে, কিন্তু হেমন্ত বললে, সে দোতলার বারান্দাতেই রাঁধবে তোলা উনুনে, একশো বার ওপর-নিচে করতে হবে না তাতে। ঘর তো একটা বেশীই থাকছে—জল-বৃষ্টি হলে উনুন ঘরে নিয়ে গেলেই চলবে। বিশেষ জল একতলায়—তেতলায় রান্না করলে সমস্ত জল টেনে টেনে ওপরে তুলতে হবে।

গোপালী দু'দিন ধরে দুপুরের দিকে নিজে এসে হেমন্তর সংসার গুছিয়ে দিয়ে গেল। বিছানা কিনতে হল না, ওরা যাতে শুচ্ছিল গোপালীর বাড়ি—সেই বিছানাই পাঠিয়ে দিল সে। বাকী সব জিনিস কিনে, চাল ডাল ঘি তেল মশলা চিনি গুড় হাঁড়িতে জালাতে টিনে ভাঁড়ার সাজিয়ে, দুটো তোলা উনুন—কাঠকয়লা ঘুঁটে পর্যন্ত সব গুছিয়ে রেখে গেল। বড়লোকের মেয়ে, অকারণে পাঁচ-সাতটা দাসী-চাকর পোষে—কিন্তু হেমন্ত অবাক হয়ে দেখল—কাজকর্ম কোনটাই অজানা নয় তার। সংসারের সব কাজ জানে, গুছিয়ে করতেও পারে।

ইতিমধ্যে একটা সাইনবোর্ডও লেখানো হয়ে গেছে—সেটা তারাই এসে দরজার পাশে

দেওয়ালের গায়ে সেঁটে দিয়ে গেল। তারপর পুরুতমশাইকে দিয়ে দিন দেখিয়ে গোপালী নিজে সঙ্গে এসে থিতু ক'রে দিয়ে গেল। ঝিও সে-ই একটা জোগাড় ক'রে দিলে। রাতদিনের ঝি-ই একটা দরকার এখানে,—হেমন্ত যখন 'কল'-এ যাবে তখন বাড়িতে থাকবে, লোকজন এলে নাম-ঠিকানা জেনে রাখবে ঃ কী দরকার, কখন আবার আসবে তারা খোঁজ করতে, ঠিকানা কি—সব লিখিয়ে নিয়ে রাখতে পারে এমনি একটি চালাক-চতুর মেয়েছেলে। সেইরকমই পাওয়া গেল একজন, মাইনে একটু বেশীই—খাওয়া, বছরে দু'খানা কাপড়, দু'খানা গামছা—তিন টাকা মাইনে।

'কিন্তু এটুকু দিতেই হবে', গোপালী বলল, 'একেবারে গোবরগণেশ লোক দিয়ে এসব কাজ চলবে না। আর, সেও ধর—কতই বা কম হত—বড়জোর একটা টাকা বাঁচত তাতে!'

ছেলেটাকে এ-বাড়ি পাঠাল না গোপালী, বলল, 'তুই কাজে যাবি, তখন কার কাছে থাকবে? একা ঝিয়ের ভরসায় ছেলে রাখা ঠিক নয়। ছেলেপুলেকে নষ্ট ক'রে দেয় ওরা। তোর পসার জমুক, একেবারে একটা ইস্কুলে ভর্তি ক'রে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা ক'রে দোব। কলকাতা শহরের বাইরে কোথাও।'

এইবার শুরু হল প্রতীক্ষা।

অনেক আশা বুকে নিয়েই শুরু হয়েছিল, অনেক কল্পনা, মুক্তির স্বপ্ন। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে, পরানুগ্রহ থেকে মুক্তি। স্বাধীনভাবে নিজের মতো জীবন-যাপনের স্বপ্ন।

কিন্তু দিনের পর দিন কাটল, সে-স্বপ্ন সফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না কোথাও। আশামুকুলগুলি স্ফুটনোন্মুখ হওয়ার আগেই যেন শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে ঝরে গেল।

মনে হল এখনও তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি। অদৃষ্টদেবতার প্রসন্ন হওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

চকচকে নতুন সাইনবোর্ড ধুলোয় রোদে বিবর্ণ হয়ে উঠল, বাইরের ঘরের চেয়ার-টেবিলের ধুলো মুছতে মুছতে ঝি ক্লান্ত হয়ে পড়ল—কিন্তু কেউই কোন 'কল' দিতে এল না তাকে।

পসার জমলে গোপালীর টাকা শোধ দেবে—এ সংকল্প উপহাস হয়ে দাঁড়াল—কেন না উলটে আরও টাকা হাত পেতে নিতেই হচ্ছে গোপালীর কাছ থেকে। সেইটেই সত্য, রূঢ় বাস্তব।

দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। মাসের পর মাসও। কেউ একবার খোঁজ করতেও এল না।

কাজকর্ম নেই বলে ছেলেটাকে আনিয়ে নিয়েছে। মিছিমিছি পরের কাছে ফেলে রেখে লাভ কি? এখানে একটা গোটা বাড়ির নিঃসঙ্গ নির্জনতা তাকে যেন গিলতে আসে, হোক ছোট বাড়ি, তবু মনে হয় শূন্য বাড়িটা যেন তাকে গ্রাস করতে চাইছে। ঝি অনুযোগ নয়, গঞ্জনা দিতেই শুরু করেছে, 'এমন ধারা চললে আমার মাইনে গুণবে কোত্থেকে! খাবেই বা কি! কাজকম্মের চেষ্টা দ্যাখো, হাত-পা নাড়ো একটু। ঘরের

কোণে চুপ মেরে বসে থাকলেই চলবে ?...পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে গিয়ে একটু দেখা করো না, জানিয়ে বলে এসো না যে, আমি এখানে এইচি, তোমাদের পাড়ার নোক, কাজকম্ম দিয়ে দ্যাখো কেমন করি। তোমাদের ভরসায়ই তো এসে বসা। একটুক খোশামোদ চায় যে মানুষ।'

এতটা পারে না হেমন্ত। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানানো, তার দ্বারা হবে না। হবে যেটা, সেটাই চেষ্টা করে—বদরীবাবুকে গিয়ে ধরে। হাসপাতালের খাতায় নাম-ঠিকানা লেখানোই আছে—কিন্তু সে কেউ চাইতে এলে তবে তো তাঁরা দেবেন।...বদরীবাবু বলা-কওয়াতে দুটো-একটা কাজ পেল তবু—তিন টাকা ক'রে রোজ, তাও একটাকা ওঁরা কেটে নেন। হেমন্ত পায় দু'টাকা হিসেবে। অবশ্যি সে-টাকাও কম নয়—কিন্তু মাসে পঞ্চাশ টাকা যার বে-ওজর খরচা, সে যদি দু-তিন মাস অন্তর দশ-বারো টাকা পায় তো চলে কিসে?

সংসারের পত্তনেই গোপালী হিসেবের খাতা একখানা ধরিয়েছিল, সেটা নিয়মিত রেখেও যাচ্ছিল হেমন্ত। মাস ছয়েক পরে একদিন মিলিয়ে দেখল, গত ছ' মাসে মোট আয় তার একশো টাকাও হয় নি। একটি মাত্র ডাক পেয়েছিল পাড়া থেকে—বাকী সবই হাসপাতালের। অথচ ছ' মাসে খরচা হয়েছে তিনশোর কাছাকাছি, এছাড়া গোপালীর যে আরও কত খরচ হয়েছে তা ঈশ্বর জানেন। এ-টাকাও সবটাই নিতে হয়েছে তার কাছ থেকে। চাইতে হয় নি অবশ্য, মাসের প্রথমেই সে নিজে থেকে কিছু টাকা বালিশের নিচে গুঁজে দিয়ে যায়, বাড়ি ভাড়া সোজাই পাঠিয়ে দেয় বাড়িওলার কাছে। এছাড়া মাসকাবারী জিনিসও, মাঝেমধ্যেই পাঠায়—আন্দাজে আন্দাজে, দরকার পড়বে বুঝে।

খুবই বিবেচনা গোপালীর—হেমন্তর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন আচরণই করে না কখনও, তবু—অথবা বলতে হয় সেইজন্যেই—এই প্রত্যেকটি দান নিতে হেমন্তর মাথা কাটা যায় যেন। যে অনেক করেছে, অনেক দিয়েছে—এমন নিঃশব্দে নিজে থেকে সসম্মানে দিয়েছে, তার যদি কোন দিন বিরক্তি আসে, কোন দিন কোন অবহেলা দেখায় কি খোঁটা দেয়—তাকে কোন দোষ দিতে পারবে না এটা ঠিকই, কিন্তু সে অপমান সেদিন মৃত্যুর অধিক বোধ হবে। সেই ক্লান্তি বা বিরক্তি, এমনকি ঔদাসীন্য বোধ হওয়ার আগে যদি কোনমতে দুটো পেট চলবার মতোও ব্যবস্থা হত! এই পঞ্চাশটা টাকাও উঠত!

এ বাড়ি ছেড়ে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে উঠে যাবার কথাও পেড়েছিল গোপালীর কাছে। আয় যখন হচ্ছে না, খরচা কমানোই উচিত নয় কি? কিন্তু গোপালী উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। বলেছে, 'পাগল হয়েছিস তুই? তাহলে যাও বা আশা আছে, একদিন পসার জমবার—তাও থাকবে না। বাড়ি ভাড়া টানতে না পেরে যাকে একখানা ঘরে উঠে যেতে হয়—তাকে আর কী ভরসায় লোকে ডাকবে? অপদার্থ ভাববে না? আর তাতে তোর ক'টা টাকারই বা সুসার হবে? বড়জোর পনেরোটা টাকা? বাড়ি ভাড়া ছাড়া আর কোন্ খরচাটা বাঁচাতে পারবি তুই? অথচ ওতে যে ইজ্জতটা যাবে তার দাম পনেরো টাকার ঢের বেশী।'

এর ওপর কোন কথা কইতে পারে না হেমন্ত।

গোপালীর প্রবল মতামতের সামনে চুপ ক'রে যেতে হয়।

এটাও মুখ ফুটে বলতে পারে না যে, তার আর ইজ্জতটা আছে কোথায়? পরের হাততোলায় যাকে জীবনধারণ করতে হয়—ইজ্জতের প্রশ্ন তার কাছে বিদ্রূপের মতোই মনে হবে। ভিখিরির আবার মান-ইজ্জত!

বলতে পারে না, কারণ গোপালীকে একথা শোনানোও এক রকমের অকৃতজ্ঞতা। গোপালী মর্মাহত হবে। যে আত্মীয়ের মতো দেখে, আত্মীয়েরও বেশী—তার স্নেহোপহারকে ভিক্ষা মনে করা তাকেই অপমান করা।

কিছুই করা যায় না—রান্না-খাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া।

দুঃসহ কর্মহীনতার আলস্যে দিন কাটানো।

বদরীবাবুকে বার বার বিরক্ত করতে লজ্জা হয়। ভয়ও করে। যদি কোনদিন কোন রূঢ় কথা বলে বসেন? ছি ছি, সে-কথা ভাবাও যায় না।...আর সত্যিই, তাঁর এরকম কত ছাত্রী কত আশ্রিতা আছে, ওরই বা কি এমন বিশেষ দাবী তাঁর স্নেহের ওপর যে, সকলকে ফেলে তিনি ওকেই দেখবেন শুধু?

এর মধ্যে একদিন খবর পেল—গোপালীর ঠিকানায় চিঠি এসেছিল একটা—সুশীলা যশোরের হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সেখানে বিনা ভাড়ায় বাসা পেয়েছে, এখানের সংসার তুলে স্বামী আর ভাগ্নেকে নিয়েই চলে গেছে সে। ওখানে সস্তাগণ্ডা খুব, যা মাইনে পায় তাতেই চলে যাবে একরকম ক'রে। ওখানের লোকগুলিও খুব ভাল—হাসপাতালে যারা আসে, ছাড়া পেয়ে বাড়ি গিয়েও মনে রাখে—কলাটা মুলোটা আমটা কাঁঠালটা কিছু-না-কিছু দিয়েই যায় মাঝে মাঝে, কচু গুড় মাছ—এত আসে যে কিনতে হয় না।

আবারও একটা আশায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে হেমন্ত।

এবার আর লজ্জা বা আশঙ্কার কোন কারণ আছে মনে হয় না, সোজাসুজি বদরীবাবুকে গিয়ে ধরে, 'এমন ক'রে আর ক'দিন চালাব আমি, আর পারছি না। পরের দয়ার ভাত গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। ও কল-ফল-এর আশা ছেড়েই দিয়েছি, আপনি আমাকে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দিন ঐ সুশীলার মতো। বেঁচে যাই তাহলে আমি।'

'চাকরি করবে? করতে চাও সত্যি-সত্যিই? কিন্তু তাতে কি তোমার কুলোবে? যশোরের সদর হাসপাতাল, সরকারী টাকা, তাই তিরিশ টাকা মাইনে হয়েছে, অন্য হাসপাতালে তো তাও পাবে না। তাতে চলবে তোমার? ছেলে মানুষ করবে কেমন ক'রে—কি দিয়ে?'

'সুশীলারও তো তিনটে পেট। তার চলছে কেমন ক'রে?' হেমন্ত জেদ করে।

'শুধু পেট চলাই তো সব নয়। কলা-মুলো আম-কাঠাল খাওয়া যায়, বেচা যায় না।...তোমার তো অনেক আশা, ছেলেকে ভাল ক'রে মানুষ করবে। তার তো খরচ আছে। আচ্ছা, দেখি—'

একটু দমে গেলেও বেশ খানিকটা আশা নিয়েই ফিরল হেমন্ত। গোপালীকেও বলল কথাটা। গোপালী বলল, 'চাকরি করবি? পাড়াগাঁয়ে? থাকতে পারবি গিয়ে? —য়্যাদ্দিন কলকাতায় কাটানোর পর? তাছাড়া শরীর টিঁকবে কেন? ম্যালেরিয়ায়

ভুগে মরবি যে ! তোর যদি বা টেঁকে—বিধবার গতর ভাঙতে চায় না সহজে—ছেলে ? ঐ তো তালপাতার সেপাই, ল্যাকপ্যাক সিং—ওকে যদি বাপের মতো ব্যামোয় ধরে ?'

শিউরে ওঠে হেমন্ত। তবু মুখে জোর দিয়ে বলে, 'সেখানেও তো লোক বাস করছে দিদি—সে-সব জায়গায়—তারা যদি পারে তো আমি পারব না কেন ? আর ছেলে, তাকে তো তুমি বলছ কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে—ইস্কুলেই থাকার ব্যবস্থা হবে।'

'কলকাতায় একা থাকলে ছেলে মানুষ করা শক্ত হবে তা তোকে পষ্টই বলে দিচ্ছি। যদি মানুষ করতে চাস—বাইরে কোথাও দিতে হবে। পাদরী সায়েবদের ইস্কুলে দিলেই ভাল হয়—তা না হলেও অন্য দু-চারটে ভাল ইস্কুলও আছে, কিন্তু তাতে খরচ বেশী পড়বে। সে কি তোর ঐ পাড়াগাঁয়ের চাকরি ক'রে হবে ?'

তবুও হাল ছাড়ে না হেমন্ত। মনে মনে জপ করে—সে আমি যেমন ক'রেই হোক চালাব, নিজে না খেয়ে, একবেলা খেয়েও। তবু সে নিজের রোজগার, স্বাধীনভাবে থাকা।

আশা বা আশঙ্কা যতই থাক, সে-চাকরিও সহজলভ্য হয় না। একমাস দেড়মাস কেটে যায়—কোন খবরই আসে না বদরীবাবুর কাছ থেকে। এর মধ্যে দু'দিন গিয়ে দেখা ক'রে এসেছে হেমন্ত, কিন্তু সেই এক কথাই শুনেছে, 'কৈ, কোথাও তো কোন কাজ খালি দেখছি না, সন্ধানে আছি তো।'

এধারে অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে আসছে। গোপালীর কাশী যাবার সময় এসে গেল, সে চলেও গেল তার তারিখমতো। যাবার সময় হিসেব ক'রে টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু হঠাৎ তারকের অসুখে বাড়তি প্রায় সাত-আট টাকা খরচ হয়ে গেল পনেরো দিনে। খরচ কমাবার আর কোন উপায় না দেখে ঝিকেই ছাড়িয়ে দিলে সে। পাশের বাড়ির একটা ঠিকে ঝিয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে—তিন-চারদিন অন্তর সে ওর বাজারটা ক'রে দেবে, মাসে চার আনা পয়সা দিতে হবে তাকে।

শেষ পর্যন্ত, আরও মাসখানেক পরে বদরীবাবু ডেকে পাঠালেন ওকে।

চাকরি খালি আছে একটা, তারা ওঁদের কাছেই লিখে পাঠিয়েছে—ওঁরা যাকে দেবেন, তাকেই নেবে। কিন্তু হেমন্তর কি সে চাকরি চলবে ?

কি কাজ তাও খুলে বললেন।

চব্বিশ পরগণার এক হাসপাতালে কাজ, সরকারী নয়, ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের হাসপাতাল। সরকার কিছু সাহায্য করেন—এই মাত্র। পঁচিশ টাকা মাইনে, সেক্রেটারীর বাড়িতে একখানা ঘর তিনি দিতে পারেন দরকার হলে, ভাড়া লাগবে না। আর কোন সুবিধে নেই। নিজেকেই রেঁধে খেতে হবে। ডিউটির কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—সকাল-বিকেল তো বটেই—ডাক পড়লে অন্য সময়ও যেতে হবে। আর কাজও, শুধু প্রসূতি দেখা নয়—ওসব হাসপাতালে প্রসব হতে বড় একটা কেউ আসে না—নার্সের কাজও করতে হবে। অপারেশনের সময় যন্ত্রপাতি সাজানো, এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত।

এক অপরিমাণ হতাশা যেন মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে—হিমহিম-মতো।

পঁচিশ টাকা! খাওয়া সে যত কমে হোক সারতে পারে—একবেলা আধপেটা খেলেও মরবে না, ভগবান তাকে সে-স্বাস্থ্য দিয়েছেন—কিন্তু কাপড় আছে, সেমিজ আছে—

চাকরি করতে গেলে ফিটফাট থাকতে হবে—ধোপার খরচটাও ধরতে হবে। সময় থাকলে নিজেই ক্ষারে কাচতে পারে, এখনও তো তাই কেচে নেয়—শ্বশুরবাড়ি থাকতে তো টিন-টিন কেচেছে—কিন্তু যে-রকম ডিউটি শুনছে, সে-সময় পাবে কি? তাছাড়া একবেলাই হোক আর আধপেটাই হোক—এক মুঠো চাল ফোটাতে গেলেও উনুন চাই, কাঠ কয়লা যা হোক কিছু দরকার। সে-সব চালিয়ে কত বাঁচাতে পারবে? ছেলেকে ইস্কুলে রাখতে গেলে মাসে কম ক'রেও দশ-বারো টাকা খরচা, যদি বা তা টানা যায়—সেখান থেকে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখতেও আসতে পারবে না। সে রকম বাড়তি টাকা আর হাতে থাকবে না।

তাছাড়া, অসুখ-বিসুখ আছে। সে-সময় বাড়তি টাকা কোথা থেকে পাবে। সেক্ষেত্রে আবারও সেই গোপালীর কাছেই হাত পাততে হবে। তাই যদি পাতবে তো চাকরি নিয়ে লাভ কি, সেই দূরদেশে—যেখানে ভবিষ্যতেও কোন উন্নতির আশা নেই?

তবু মন স্থির করতে পারে না। অর্থাৎ একেবারে না-ও বলতে পারে না।

শেষে তার 'অধমতারণ' গোপালীকে গিয়েই জানায় কথাটা। কি করবে জিজ্ঞাসা করে।

গোপালী রেগে ওঠে এবার। বলে, 'পোড়ার দশা তোমার, তাই এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। কেন, এতই বিষ হয়ে পড়েছি আমরা? মরণ তোমার! এখনই তো কুলুবে না, তার পর? ছেলে বড় হলে কলেজে ঢুকবে, তোর ডাক্তারি পড়াবার শখ, ধর যদি তাই পড়ে সে—তো একগাদা খরচ বাড়বে। তখন চালাবি কোথা থেকে? ওখানে মাইনে বাড়বে ভাবছিস? এই পঁচিশে ঢুকছিস, হয়ত মরবার কালে দেখবি মাইনে বেড়ে পঁয়তিরিশে দাঁড়িয়েছে। জেলাবোর্ডের কাজ—বছর বছর মনিব বদল হবে, প্রত্যেকের মন যুগিয়ে চলতে হবে—নইলে চাকরিও থাকবে না। যে-চরিত্তিরের জন্যে এত করছিস—সেও তোকে বেচতে হবে।…বেচতেই যদি হয় তো চড়াদামে বেচবি—সে গত্তয় পড়ে মরতে যাবি কেন? ওসব জায়গায় গিয়ে ঢোকা মানে তো কবরে সেঁধুনো—মরতে যাওয়া। ওখানে থেকে অন্য কোথাও চাকরির খোঁজ করতে পারবি—না বাইরের 'কল' পাবি দু-চারটে? চাকরি কলকাতার হাসপাতালে বিনা মাইনেয় করাও ভাল—অন্য দিক দিয়ে দু' পয়সা আসবার আশা থাকে। জানাশুনো হয়—বড়লোকের বাড়ি ডাক পড়তে পারে। ওখানে মরতে যাবি কিসের জন্যে?'

অগত্যা 'না'-ই বলে আসতে হয় বদরীবাবুকে। গোপালী যে একটাও বাজে কথা বলে নি, তা নিজের মনেই বুঝতে পারে হেমন্ত।

বদরীবাবু হাসেন। বলেন, 'আমি জানতুম, মা। ওদের আগেই বলে দিয়েছি যে, ঐ মাইনেতে কেউ যাবে না এখান থেকে।'

॥ ১৩ ॥

একেবারে কেউ আসে না বা খবর নেয় না, এ-কথাটা অবশ্য ঠিক নয়।

পূর্ণ ঘোষ আসেন মধ্যে-মধ্যে। ডাঃ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ, স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ।

বদরীবাবুর মতো অত নাম-করা নন বটে—তবে এঁরও খুব পশার, রোজগার খুব। ডাক্তার মহলে এক-ডাকে চেনে সবাই।

হাসপাতালেই আলাপ। শিক্ষার্থিণী হিসেবে ওঁর কাছেও পাঠ নিতে হয়েছে ক'দিন। বক্তৃতা দিয়েছেন, হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কম নয়—বেশিও হতে পারে। রগের দু'দিকে চুলে পাক ধরেছে, তাহলেও স্বাস্থ্য ভাল, প্রচুর খাটেন এখনও, খাটতে পারেন। শরীর এখনও টসকায়নি কোথাও। দেখতেও খারাপ নন, আর সামান্য একটু ঢ্যাঙা হলে সুপুরুষই বলা চলত।

প্রথম থেকেই হেমন্ত নজরে পড়েছে ওঁর। 'সুনজরে'ই বলে সবাই, কিন্তু হেমন্ত জানে সু-নজর এটা নয়। চোখের চাউনি ও অন্যান্য ভাবভঙ্গী বুঝতে ভুল হয় নি তার। প্রথম দিন থেকেই এর অর্থ সে বুঝেছে। তাই অকারণেই যখন গায়ে-পড়ে আত্মীয়তা করতে আসেন—একটা অস্বস্তি বোধ করে সে।—এবং যতটা সম্ভব শীতল, কঠিন হয়ে থাকে। স্নেহবর্ষণে স্নেহের পাত্রের মনে যে কৃতজ্ঞতা জাগার কথা, তার বিন্দুমাত্র উত্তাপ অনুভব করেন না পূর্ণবাবু।

তবু হাল ছাড়েন না তিনি। এখনও ছাড়েন নি। খোঁজ-খবর নিয়ে পটলডাঙ্গার ঠিকানাও যোগাড় করেছেন, এসেওছেন কয়েকবার। যখনই আসেন ছেলের নাম ক'রে সন্দেশ বা অন্যান্য মিষ্টি, কমলালেবু গুড় এসব নিয়ে আসেন। আমের সময় আম আনতেন। একদিন মাছও এনেছিলেন, সে মাছ নেয় নি হেমন্ত, গাড়ি থেকে নামাতেই দেয় নি। ভ্রূকুটি ক'রে বলেছে, 'এ আনতে গেলেন কেন? আপনি জানেন না আমি বিধবা?'

'না—তা জানি। তবে তোমার ছেলে তো খেতে পারে।'

'সেই জন্যে আপনি এত বড় মাছ এনেছেন? সওয়া সের দেড় সের ওজনের মাছ? তাছাড়া আমি মাছ রাঁধি না। ওসব ঝামেলায় যাই না। ছেলে যখন মাসীর বাড়ি যায়—তখন মাছ খেয়ে আসে। আমার কড়ায় কি উনুনে মাছ চাপে নি এখনও।'

'কিন্তু ছেলেটার স্বাস্থ্যের দিক তো তোমার দেখা দরকার। এ-বয়সে মাছ-মাংস না খেলে শরীর বনবে কি ক'রে? একে তো ঐ রোগা-পাতলা ছেলে—'

'গরীবের ঘরে, ভিখিরির ঘরে আর অত স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে তো চলে না। যার এক পয়সা নিজস্ব আয় নেই, তার ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রেই বা লাভ কি বলুন? রোজ যখন খাওয়াতে পারব না, এক-আধদিনের জন্যে মিছিমিছি আলাদা ব্যবস্থা করতে যাই কেন?'

'তুমি যে আবার—' একটু থেকে ঢোক গিলে পূর্ণবাবু বলেন, 'তুমি যে ঘোড়ার ডিম একেবারে সত্যযুগের মানুষ! সেইজন্যেই তো—। নইলে এ-লাইনের কোন বড় ডাক্তারের সঙ্গে একটু মাখামাখি করলে, মানে আর কি—তাকে অন্য দিকে কোন সুবিধে দিলে কি আর রোজগারের অভাব থাকে? যারা উন্নতি করেছে তাদের সকলকেই এটুকু মেনে নিতে হয়েছে।···ঐ যে দেখছ, পূর্ণিমা, এলোকেশী, সৌদামিনী, হরিমতী—নিজেরা সব বাড়ি-গাড়ি ক'রে ফেলেছে—সকলকারই একটি ক'রে ডাক্তার আঁচলে বাঁধা আছে। বদরীবাবু তো তোমার কাছে দেবতা—তোমাকে উনি মা বলেন, মেয়ে বলেন—ঠিকই,

তোমাকে সেই চোখেই দেখেন হয়ত—তাই বলে ওঁরও কি আর এসব দোষ নেই ? কুসুমের এত বোলবোলাও কিসের ? বড়লোকের বাড়ি ছাড়া যায় না, প্রসব করানোর ফী করেছে পঞ্চাশ টাকা—একটা আপিসের বড়বাবুর মাইনে। তা তোমার তো ওসব—'

আবারও থেমে যান পূর্ণবাবু। ইঙ্গিতপূর্ণ থেমে যাওয়া।

এ-ইঙ্গিত কিসের তা বুঝতে বাকী থাকে না হেমন্তর। এরকম স্পষ্ট ইঙ্গিতের আগেই সে বুঝেছে ওঁর মনোভাব। কণ্ঠস্বরের কসরতে, শব্দপ্রয়োগের কৌশলে, চোখের স্থির অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন পূর্ণবাবু।' 'কোন বড় ডাক্তারটি' কে—সে সম্বন্ধেও সংশয়ের কোন অবকাশ দেন নি।

হেমন্ত কঠিনকণ্ঠে জবাব দেয়, 'না, আমার ওসব চলবে না। এত নিচেই যদি নামব—আমার এ ভাতটা দোষ করছে কি ? সসম্মানেই দিদি রেখেছে আমাকে, আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে চাইতে হয় নি এক পয়সাও।...আর বেশ্যাবৃত্তিই যদি ধরব—তাহলে সোজাসুজিই তো খাতায় নাম লেখাতে পারি, রক্তপুঁজ ঘাঁটতে যাব কেন ?...আয়নায় মুখখানা নজরে পড়ে রোজই—এ-মুখের এ-চেহারার কত দাম উঠতে পারে বাজারে, তাও আন্দাজ করতে পারি বৈকি ! এখনই 'তু'-ক'রে ডাকলে পাঁচ হাজার টাকা সেলামী আর একশো-দেড়শো টাকা মাইনে নিয়ে অনেক বাবু ছুটে আসবে।...আপনি এ-ধরনের কথা আমার কাছে আর কখনও তুলবেন না !'

কিন্তু এই রকম ছোটখাটো প্রত্যাখ্যান বা অপমানে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হবেন—এত পাতলা চামড়া পূর্ণবাবুর নয়। তিনিও অনেক পোড় খেয়ে খেয়ে এত বড় হয়েছেন—গরীবের ছেলে আজ লক্ষপতি হয়েছেন। বাড়ি গাড়ি জুড়ি—ভাড়াটে বাড়ি, অনেক কিছু করেছেন। তিনি জানেন সংসারে সহজে কোন ভাল জিনিস পাওয়া যায় না, তা পেতে গেলে ঠুনকো মান-অপমান-জ্ঞান রাখাও উচিত নয়।

পূর্ণবাবু তার পরেও বহুবার এসেছেন। তেমনিই মিষ্টি ফল বিস্কুট হাতে ক'রে এনেছেন। চা খেতে চেয়েছেন, তার সরঞ্জাম সব নিজে এনে পৌঁছে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন তৈরী করার কৌশল। ওর হাতের রান্না খেতে চান এমন আভাসও দিয়েছেন। আসল কথাটাও পাড়তে দ্বিধা করেন নি। খুব মোলায়েমভাবে, অনেক স্তর আবরণ দিয়ে পেড়েছেন কথাটা। অপরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কোন্ ডাক্তারের কৃপায় কোন্ দাইয়ের কত আয় হচ্ছে, কে ক'খানা বাড়ি করল—তার কিছু সত্য কিছু কল্পিত বিবরণ শুনিয়েছেন সাড়ম্বরে।

ওঁর প্রস্তাবে রাজী হলে যে হেমন্তর কোন অভাব থাকবে না, ছেলে মানুষ হবে, নিজের পায়ের ওপর পা দিয়ে সুখে কাটাতে পারবে, ছেলের আখেরেও উন্নতি হবে, চাই কি ডাক্তারী শিখলে বিলেতে গিয়ে বড় ডাক্তার হয়ে আসতে পারবে—ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল ছবিকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলতে কোন ত্রুটি করেন নি তিনি।

তবে তার আগে কোন সাহায্য করতে তিনি রাজী নন। এতটুকু উপকারও করেন না কখনও। হেমন্ত বহুবার বলেছে—উনি সবিনয়-হাস্যে উত্তর দিয়েছেন, 'আমার কি ক্ষমতা, আমার হাতে উপায় থাকলে কি আর তোমার জন্যে করি না কিছু ? আমি কোন পেশেন্টকেই কারও নাম সাজেস্ট্ করি না, যার যাকে খুশি নেয়।' ইত্যাদি—

হেমন্ত বলে বটে—তবে বলা যে বৃথা তাও জানে। জানে যে, ওঁর করুণা উদ্রেক করতে গিয়ে কোন লাভ হবে না। শিয়াল শকুনি যেমন জীবজন্তুর মৃত্যু টেঁকে বসে থাকে, পূর্ণবাবুও তেমনি ওর চরম দুর্দশাই টাঁক ক'রে আছেন। উনি এটুকু বেশ বুঝে নিয়েছেন যে, নিরুপায় নাচার হয়ে পড়লে তবেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার সম্ভাবনা,—উপকার করলে কৃতজ্ঞতায় প্রেমে পড়বে সে আশা বিশেষ নেই, বিশেষ ডবল কিংবা আরও বেশী বয়সের একটি লোকের সঙ্গে।

হেমন্ত এই কারণেই লোকটাকে দেখতে পারে না।

স্বার্থপর, কামুক লোক। মরতে চলল বলতে গেলে, গঙ্গাপানে পা হয়েছে—তবু এখনও এত লোভ নারীমাংসের ওপর!

কিন্তু অত বড় লোকটাকে—এককালীন শিক্ষক—স্পষ্ট ক'রে 'আমার বাড়ি এসো না' একথাও বলতে পারে না। আকারে-ইঙ্গিতে অনেক অপমান করেছে। উনি তো এমন কিছু বড়লোক নন—বড়লোক যাদের বলা যায় ধনুবাবুর কৃপায় তেমন দু-চারজনকে দেখেছে সে। যাদের জীবিকার জন্যে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়—আর যা-ই হোক তারা ধনীপদবাচ্য নয়। ধনুবাবুর পরিচিত ও অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীভুক্ত সেই অতি-ধনীসমাজের বহু লোকই ওর জন্য লালায়িত, লুব্ধ ; যদি ধরা দিতেই হয় তাদের কাছেই দেবে, বেচতে যদি হয় নিজেকে চড়া দামে বেচবে—এ সব-কথাই কোন না কোন ছলে পূর্ণবাবুকে শুনিয়ে দেয় সে। তিনি যে এসব কথা বুঝতে পারেন না তাও নয়, কিন্তু নির্বিকার থাকেন। হেমন্তর সব অস্ত্রই তাঁর নির্লজ্জতার বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

পূর্ণবাবু জীবনের পাঠশালায় সার্থকতার যে দুটি প্রধান মন্ত্র শিখেছেন তা হল ধৈর্য ও অধ্যবসায়। কোন কারণেই নিরাশ হতে নেই, হাল ছাড়তে নেই। প্রতিকূলতা যত দুর্লঙ্ঘ্যই মনে হোক, নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তা লঙ্ঘন করবার, জয় করবার—এ তিনি ভালই জানেন।

সেই মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ হলও তাঁর।

হঠাৎ কলকাতায় এক ভয়ংকর ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব হল। সাধারণ জ্বর নয়—ম্যালেরিয়ার মতো হয়ে বসে মানুষের রক্ত শোষণ করে না ; ঘরে ঘরে জ্বর, আর ঘরে ঘরে দু-চারজন ক'রে মরতে লাগল। প্লেগের মতো শহর উজাড় হয়ে গেল না ঠিকই—কিন্তু এতেও ত্রাসের সৃষ্টি কম হল না। সকলেরই মুখে এক কথা, শ্মশানে আর জায়গা হচ্ছে না।

এর মধ্যে আগে পড়ল গোপালী। গোপালীর বাড়িসুদ্ধই প্রায়। মুখে জল দেবার কেউ নেই বলে হেমন্ত ছুটে গেল। ছেলেকে নিয়ে যায় নি, ঠিকে ঝি—তাকেই দেখতে বলে গিয়েছিল। সারাদিন ওখানে থেকে সেবা ক'রে পথ্য খাইয়ে রাত্রের ব্যবস্থা ক'রে সন্ধ্যার পর যখন বাড়ি ফিরল তখনই কম্প শুরু হয়ে গেছে। রাত্রে আর জ্ঞান রইল না, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। সকালে ঝি এসে দোর খোলা পায় না—পাশের বাড়ির লোককে বলতে তারা ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে দেখল যে, মা ছেলে দু'জনেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

ওরই মধ্যে কোনমতে চোখ খুলে হেমন্ত বললে, 'দয়া ক'রে তোমরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও আমাদের। ডাঃ বদরী দাসকে খবর দিলে তিনি একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেনই—'

আর কিছু বলতে পারল না। পাড়ার লোক ভয়ে বিশেষ কেউ ঘেঁষ দিল না। ঝিটারই দয়ার শরীর—সে খানিকটা সাবু ক'রে মাথার কাছে রেখে গেল, সেই সঙ্গে এক ঘটি জল।

পাশের বাড়ির ছেলেটি মেডিকেল কলেজে গিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু বদরীবাবুর দেখা পায় নি। তাঁরও নাকি জ্বর হয়েছে, তিনি আসছেন না। দৈবক্রমে, অথবা ওঁরই ভাগ্যক্রমে, পূর্ণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হেমন্তবালা? মিডওয়াইফ? তাদের দু'জনেরই জ্বর? তাই নাকি? ঠিক আছে। খবর দিয়ে ভালই করেছ। মেনি থ্যাংকস্! তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তার একজন শিক্ষক। আমি যাচ্ছি এখনই। দেখছি কি করা যায়!'

দেখলেনও তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলেন না। বড় ডাক্তার ডাকলেন, মোটা টাকা দিয়ে ভাল নার্স রাখলেন। ঔষধ-পথ্যে টেবিল ভরে গেল—যাকে বলে রাজকীয় চিকিৎসা তাই শুরু ক'রে দিলেন। একটি ঝি পাঠাতেও ভুল হ'ল না—দিনরাতের ঝি।

ফলে, যখন জ্ঞান হল হেমন্তর, দেখল পূর্ণবাবু উদ্বিগ্ন মুখে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছেন। সে উদ্বেগ আন্তরিক—তাও বুঝল। এটুকু চেনার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

চোখ চেয়ে আরও দেখল। ছেলের মাথার কাছে নার্স বসে বাতাস করছে। ওষুধের শিশি আর পুরিয়ার বাক্সে একটা টেবিল ভরে গেছে। নতুন টেবিল—এটা ছিল না ওদের। বেদনা আঙুর প্রভৃতি মূল্যবান ফল একরাশ। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে পথ্য তৈরী করছে, ঝি ঘর মুছছে।

চিন্তাশক্তি রোগে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন। তবু—দুর্বল মস্তিষ্কেও ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বেশী দেরি হল না। প্রচুর পয়সা খরচ করেছেন পূর্ণবাবু। এ যে পূর্ণবাবুরই আয়োজন—তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতা, তাও বুঝতে পারল। গোপালীর বাড়িসুদ্ধ জ্বর—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই, ধন্নুবাবুও নাকি সেদিন সকালে জ্বর-গায়েই এসেছিলেন, ওদের দেখেই চলে গেছেন—আর আসতে পারেন নি, অন্তত হেমন্ত যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ আসেন নি, তারাই কে কেমন আছে কে জানে, সবাই সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠেছে কিনা—তাদের পক্ষে এসে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার এত রাজকীয় সমারোহ করা সম্ভব নয়।

আবারও অবসন্ন ও ক্লান্তভাবে চোখ বুজল হেমন্ত।

খাঁচা বড়ই লোভনীয় হয়ে উঠেছে। যে ফাঁদে পড়েছে তা থেকে মুক্তির একটিই পথ খোলা আছে—সে হল এই খাঁচায় ঢোকার পথ। চোখ-কান বুজে একবার ঢুকতে পারলে নিশ্চিন্ত। কিন্তু—

আর কোন 'কিন্তু' নেই, হার তো মেনেইছে—একমাত্র চিন্তা ছেলে। সেটাই বুঝি শেষ অবলম্বন, ওপক্ষের শেষ বাধাও।...

দিন বারো বাদে নার্সকে জোর ক'রেই বিদায় দিল হেমন্ত, কিন্তু ঝি বা রাঁধুনীকে

দিতে পারল না। ছেলেটা, যাকে বলে 'চিঁ-চিঁ' করছে, এত দুর্বল, এতই রোগা হয়ে পড়েছে—উঠে দাঁড়াতে পারে না, চলতে গেলে পা বেঁকে যায়। নিজেরও হাঁটু দুটোয় কোন জোর নেই। এ অবস্থায় নিজে উঠে পথ্য তৈরী করার কথা ভাবাও পাগলামি।

পূর্ণবাবুর দয়ার দান নিতে হয়েছে, হচ্ছেও। এ পাওনা তিনি উশুল করবেনই—এর দাম, ষোল আনার ওপর আঠারো আনা—সুদসমেত।

হেমন্তরও যেন লড়াই করার ক্ষমতা কমে এসেছে। শরীরে শুধু নয়—মনে মনেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটা কথা আজকাল ওর প্রায়ই মনে পড়ছে। ওর মেজ জা গল্প করেছিল, তার ছেলেবেলার গল্প। বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও শ্বশুরবাড়ি আসে নি, সেই সময়কার কথা। ছেলেবেলায় সাঁতার শিখেছিল, খুব ভাল সাঁতার জানে বলে একটা অহঙ্কার ছিল মনে মনে। একবার ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে গেছে মায়ের সঙ্গে, সেটা ভাদ্রমাস, অত খেয়াল ছিল না, পুকুরে সাঁতার কাটা আর নদীতে সাঁতার দেওয়া এক জিনিস নয় তাও জানত না—জলে নেমে সাঁতার কাটার লোভ সামলাতে পারে নি। দু'চার হাত এগোতেই স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল—প্রবল টান, সে টান এড়িয়ে ঘাটে ফেরা তার ক্ষমতার বাইরে। তবু প্রাণের দায়ে প্রথম প্রথম প্রাণপণেই যুঝেছিল, তাতে তীরের দিকে আসতে তো পারলই না, বরং হাত ভেরে গেল, আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভাগ্যে ওর বড় দাদা সঙ্গে ছিলেন—তিনি খানিক পরে ওর অবস্থাটা বুঝতে পেরে এগিয়ে গিয়ে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে আনলেন। কিন্তু তার আগে একটা অদ্ভুত অবস্থা হয়েছিল ওর মেজ জায়ের। সেইটেই তাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল, সেই মনোভাবটা। হাত-পা ভেরে এসেছে ঠিকই—কিন্তু তখনও যে একেবারে লড়তে পারছে না বা খিল ধরে গেছে তা নয়—তবু সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল, এত কাণ্ড ক'রে বাঁচবার চেষ্টা করার দরকার কি? কী লাভ? ডোবাও তো মন্দ নয়, ডুবে গেলেই তো হয়—কোন হাঙ্গামা থাকে না আর। সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়…কোন ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়—জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা নয়—অকারণেই মনে হয়েছিল কথাটা—এত লড়াই করার চেয়ে ডুবে যাওয়াই ভাল, অনেক শান্তি।

তখন বোঝে নি হেমন্ত এ মনোভাবটা, এখন বুঝছে। বার বার মনে পড়ছে, ইচ্ছে ক'রে ডোবার কথাটা। দৈহিক ক্লান্তি যেন মনেও ছড়িয়ে পড়ছে। আর পারছে না সে, আর পারবে না। কী দরকারই বা এত হাঙ্গামা করার—হাল ছেড়ে দিলেই তো হয়। নিশ্চিন্ত হতে পারে সে। এও একরকমের মৃত্যু, ডুবে মরাই—কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? কিসের জন্যে এত কাণ্ড করছে সে?…

আরও কিছুদিন পরে সে যখন পূর্ণবাবুকে ঝি আর রাঁধুনী ছাড়িয়ে দেবার কথা বলল, তখন তিনি কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এর কি খুব দরকার আছে হেমন্ত? মিছিমিছি এত কষ্ট করার? তুমি একটু দয়া করলেই তো আর কাউকে ছাড়াতে হয় না।'

আজ আর জ্বলে উঠল না হেমন্ত, তার দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল না। কথাটা না বোঝারও ভান করল না। পূর্ণবাবু যতক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, হেমন্তও

চোখ নামায় নি বা অন্যদিকে মুখ ফেরায় নি, ওঁর চোখের ওপরই নিজের দৃষ্টি স্থির রেখেছিল—যেন পড়তে চেষ্টা করছিল ওঁর মনের কথাগুলো—বৃথা লজ্জা বা সংকোচ করে নি।

সে যে ওঁর কথা বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে তা গোপন করারও কোন প্রয়োজন বোঝে নি।

পূর্ণবাবুর বলা শেষ হলেও চোখ নামাল না, তেমনি স্থির, বিচিত্র দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল ওঁর চোখের দিকে।

শেষে যেন লজ্জা পেয়ে পূর্ণবাবুকেই চোখ নামাতে হল। আর তাতেই যেন হেমন্তরও সাড় ফিরল মনে। সে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকেই প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আমার ছেলে ?'

কিন্তু এই সামান্য প্রশ্রয়ের আভাসেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বরং পূর্ণবাবুরই।

তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন, 'তার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবো, হোস্টেলে রাখব। ছেলে যখন ছুটিতে বাড়ি আসবে, আমি তখন আসব না—কথা দিচ্ছি, ছেলে কিচ্ছু টের পাবে না। তোমাকে যাতে অন্য কারো কাছেও না লজ্জিত হতে হয়, সে ব্যবস্থাও আমি করব। আমি লুকিয়ে আসব, রাত্রে থাকব না। ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যেই চলে যাব।...বালিগঞ্জে আমার বাগান-বাড়ি আছে—নির্জন জায়গা, তার আশে-পাশে কোন ভদ্র বসতি নেই, তোমার-আমার চেনা লোক কেউ বেরোবে না। দরকার হয় ভাড়াটে গাড়ি পাঠিয়ে 'কল' দেবার নাম ক'রে সেখানে নিয়ে যাব, ভোরে ফিরে আসবে। তোমার ঝি চাকর রাঁধুনীরাও টের পাবে না। ...আমি বলছি, তোমাকে কথা দিচ্ছি—বিশ্বাস ক'রে দ্যাখো। যা বলবে, যে শর্তে বলবে আমি তাতেই রাজী। একটুখানি দয়া করো আমাকে—আমি আর পারছি না। আমি বলছি, শুধু একবার রাজী হও, তোমার কোনদিকে আর কোন ভাবনা থাকবে না।'

বলতে বলতেই আবেগে, উত্তেজনায়—প্রেমের প্রবলতায় যেন স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে যান পূর্ণবাবু, আরও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্তর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরেন, উন্মত্তের মতো প্রবৃত্তি-বিহ্বল কণ্ঠে অর্ধস্ফুট স্বরে বলেন, 'বলো, বলো হেমন্ত, দয়া করবে আমাকে !'

হেমন্ত বাধা দেয় না, হাত দুটো ছাড়াবারও চেষ্টা করে না।

জায়ের কথাটাই মনে পড়ে তার, সেই অদ্ভুত মনোভাবটা।

ডুবে গেলেই বা ক্ষতি কি ?

কী লাভ এত হাঙ্গামায় ? এত কষ্টে বাঁচবার চেষ্টা করারই বা দরকার কী এমন ?

॥ ১৪ ॥

পূর্ণবাবু বলেছিলেন, 'একবার রাজী হও, একটু দয়া করো, তোমার কোন দিকে কোন ভাবনা থাকবে না।'

সত্যিই কোন ভাবনা থাকে না।

অর্থের ভাবনা তো নয়ই।

যেন ভোজবাজীর খেলা দেখে সে বসে বসে। ইন্দ্রজালের জাদু, ভেল্‌কি।

যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়!

আলিবাবার গল্পে পড়া—'সিসেম খোল' সঙ্কেত-মন্ত্রের মতো।

'কল'-এর পর 'কল' আসতে থাকে। শেষে এমন অবস্থা হয়, দিনে-রাতে বিশ্রামের অবসর থাকে না একটু, এক এক সময় চান-খাওয়ারও ফুরসৎ মেলে না। হেমন্ত অবাক হয়ে যায়—কোথায় ছিল এরা, এতকাল কি তার সাইনবোর্ডটা কারও চোখে পড়ে নি? এই তো এ পাড়ারও অনেকে ডাকছে এখন, আগে কেউ ডাকে নি কেন? এ কি তার সঙ্গে ভগবানের শত্রুতা, তাকে ডুবিয়ে মারবেন বলেই এমনভাবে চারিদিকের সব কূল, সব পথ বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন?

কেন অকস্মাৎ এই জনপ্রীতি—তা প্রশ্ন করার দরকার হয় না অবশ্য।

এ সবই পূর্ণবাবুর অনুগ্রহ, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা। তাঁরই ইঙ্গিতে, সুপারিশে—কাজ ভাল হবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে এই আশায়—কোথা কোথা থেকে এসে খুঁজে বার করে হেমন্তবালাকে, পটলডাঙ্গার সুঁড়ি রাস্তার এই সামান্য বাড়িতে। অনেকে এসে ধরে—বিপদের সময় পূর্ণবাবুকে পাওয়া যাবে বলে। নইলে তিনি আসবেন না। সোজা বলে দিয়েছেন নাকি তাঁর বাঁধা মক্কেলদের, অন্য কোন দাইকে ডাকলে তিনি সে প্রসূতির কোন দায়িত্ব নিতে পারবেন না।...এইটুকু বলাই তো যথেষ্ট।

অনেক ভাবনা থেকেই নিশ্চিন্ত হয়।

ছেলে ভর্তি হয় সরকারী ইস্কুলে। কলকাতারই ইস্কুল—কিন্তু এখানে কে দেখবে, এই অজুহাতই যথেষ্ট, হোস্টেলে রাখার। হোস্টেলও ভাল, বড়লোকের ছেলেরা থাকে অনেকে। নিয়মকানুনও নাকি খুব কড়া—ছেলে বকে যাবার সম্ভাবনা নেই।

হেমন্ত মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে আসে, পূর্ণবাবুও যান। ফি শনিবার আনা যায় না, আজকাল কাজের জন্যে নিয়ম ক'রে বাড়ি থাকা সম্ভব হয় না, জরুরী ডাক পড়লে তখনই ছুটতে হয়। কোন রবিবার হাতে কাজ না থাকলে হেমন্ত সকালে গিয়ে নিয়ে আসে, আবার সন্ধ্যার আগে পেঁছে দেয়।...পূর্ণবাবুই সব খরচ দিতেন প্রথম প্রথম, মায় ওখানে প্রাইভেট পড়াবারও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন একটা, সে খরচও দিতেন—বছর-খানেক পরে আর প্রয়োজন রইল না, হেমন্তরই যথেষ্ট উপার্জন হতে লাগল।

গোপালীর ভরসায় যে থাকে নি—তাতে ভালই হয়েছে। সেই জ্বরটার পরেই তার শরীর যেন ভেঙে পড়ল, কিছুতেই সুস্থ হতে পারে না আর। প্রায়ই জ্বর হয়, আহারে রুচি থাকে না, দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষে প্রায় শয্যাশায়ী হবার উপক্রম হতে ধনুবাবু ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাকে মুসৌরী পাহাড়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন। একেবারে বছরের মতো বাড়ি ভাড়া ক'রে সঙ্গে অনেক লোকজন দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। যতদূর পর্যন্ত ট্রেন যায় যাবে—তারপর ডাণ্ডি ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে। খুব নাকি ভাল জায়গা, টানের জায়গা। সাহেবরা থাকে সেখানে, তারাই পাহাড়ের ওপর শহর গড়েছে, জল-হাওয়া আর দৃশ্য খুব ভাল বলে। ধনুবাবু যেতে পারবেন না বলে গোপালী খুঁৎ খুঁৎ করছিল—হেমন্তই বুঝিয়ে রাজী করাল, বলল, 'চলে যাও দিদি, নইলে একেবারেই যদি ছেড়ে যেতে হয় দাদাবাবুকে—তখন?...তার চেয়ে সেরে-সুরে

আগের মানুষ হয়ে এসো, সেই তো ভাল। একটা বছর দখতে দেখতে কেটে যাবে।'

ধন্নুবাবুও অবশ্য শেষ পর্যন্ত কথা দিলেন—অন্তত দু' তিন মাস অন্তর তিনি এক-বার ক'রে যাবেন—তা তাঁর কাজের যত ক্ষতি হোক। বেশীদিন থাকা যাবে না—যেতে-আসতেই তো আটদিন কেটে যাবে—তবু চোখের দেখাটা তো একবার হবে! আগে হেমন্তকেও সঙ্গে যাবার জন্যে খুব চেপে ধরেছিল গোপালী, কিন্তু তারপর নিজেই পেছিয়ে গেল, বললে, 'না, তোর এই নতুন পসারের সময়টা, অত দিন বাইরে থাকা ঠিক হবে না। গেলে ক্ষেতি হবে।'

যাওয়ার আগে এই হঠাৎ সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বার খোলার (হেমন্তর নিজের মনে হয় দুর্ভাগ্যেরই দক্ষিণদ্বার ওটা) খবর পেয়ে গেছে বৈকি গোপালী। তার কাছে কিছুই গোপন ক'রে লাভ নেই, তার মতো উপকারী বন্ধু জীবনে আজ পর্যন্ত পায় নি, বাপ-ভাইয়ের থেকে ঢের বেশী আপন—তাছাড়া টাকার প্রশ্নও উঠল, যাওয়ার আগে বেশী ক'রে থোক টাকা দিয়ে যেতে চেয়েছিল গোপালী—কেন আর সে টাকা নিতে হবে না হেমন্তর, হয়ত আর কখনই হবে না—সেটাও বলা দরকার।

সুতরাং সবই বলতে হল। গোপালী নিঃশব্দে শুনল বসে, কিছুই বলল না; ধিক্কায় দিল না, তিরস্কার করল না। হেমন্তর সেই প্রথমদিককার তেজদর্প 'বামুনাই' স্মরণ করিয়ে শোধ নেবার চেষ্টা করল না। ক্লান্তভাবে হাসল শুধু একবার, বোধহয় অস্বাস্থ্যের জন্যেই ইদানীং বেশী কথা বলতে পারত না। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কী করবি বল, সবই অদৃষ্ট। তোর ভাগ্য তোকে এই পথে আনবে বলেই সব-রকমে বঞ্চিত করেছিল। পূব্বু জন্মের পাপ। নইলে কার আর এমনভাবে সব কূল ঘোচে বল!...যাক গে, তুই মন খারাপ করিস নি, ছেলেটা যদি মানুষ হয়—আবার সব হবে। ভগবান অন্তর্যামী—তিনি সবই জানছেন, তিনি তোকে মাপ করবেন। এও একরকম কষ্ট করাই, ছেলেমেয়ের জন্য কোন কষ্ট করাতেই পিছ্‌পা হলে চলে না, এইটেই মনে কর, মনে কর তার জন্যেই তপিস্যে করছিস!'

সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল হেমন্তর, হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেয় এই পতিতা মেয়েটার। এ-ই যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার বাবার থেকে ঢের বড় সদ্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন এর বাবা, সত্যিকারের মহাশয় ব্যক্তি!

পূর্ণবাবু শিগগিরই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বড় রাস্তার ওপর একটা বাড়ি ঠিক করলেন। এর চেয়ে অনেক বড়। নিচে খান-চারেক, ওপরে তিনখানা ঘর। হেমন্ত আপত্তি করেছিল, 'কী হবে আমার এত বড় বাড়ি নিয়ে? আমি একা মানুষ, বড় বাড়ি খাঁ-খাঁ ক'রে গিলতে আসবে—নয়ত একগাদা ঝি-চাকর রাখতে হবে।' পূর্ণবাবু সে আপত্তি শোনেন নি। বলেছেন, 'কারবার করতে গেলে একটু ঠাট দরকার গো লক্ষ্মী, ভেখ নইলে ভিক্ষে মেলে না। মানুষের নিয়মই এই—বড়লোককেই পয়সা দিতে চায়, তেলামাথায় তেল ঢালে। তোমার অবস্থা ভাল হচ্ছে, সেটা লোককে জানাতে হবে। তবে তারা বুঝবে তুমি ভাল কাজের লোক, সেইজন্যেই তোমাকে বেশী লোক ডাকে। যাকে অনেকে ডাকে, পসার বেশী—তাকেই ডাকতে চায় সবাই। ডাক্তার বলো, উকিল

বলো—সকলের পক্ষেই একথা খাটে।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, 'আর কি জানো, বড় রাস্তায় অনেক লোকজন, সেখানে কার বাড়ি, কে আসছে কখন—অত কেউ খবর রাখে না। হল গাড়িটা একটু দূরে কোথাও দাঁড় করিয়ে রাখতে বললুম—অমুক সময় নিয়ে এসো বললে কোচোয়ান সেই সময়ে আবার গিয়ে নিয়ে আসবে। এ এই একরত্তি রাস্তায়—প্রায় প্রত্যহই আমার গাড়ি আসে—দু'তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে—সকলেরই চোখে পড়ে, নিশ্চয় এ নিয়ে আলোচনাও হয়। তোমারও একটা লজ্জা তো—'

কানের মধ্য দিয়ে শব্দগুলো যেন জ্বলতে জ্বলতে ভেতরে ঢোকে। সে জ্বালা সমস্ত রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই সেদিনই কি একটা বইতে পড়ছিল 'অগ্নিশলাকার মতো কানের মধ্য দিয়া মর্মে প্রবিষ্ট হইল'—আজ কথাটার অর্থ বুঝতে পারল সে। প্রতিনিয়ত এই অপমান, এই লজ্জা, এই অশুচিবোধ সে ভুলে থাকবারই চেষ্টা করে প্রাণপণে—কিন্তু আজও, যখনই নিজের অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, তখনই যেন বিছের কামড়ের মতো জ্বলতে থাকে সারা দেহ। মনে হয় ছুটে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—তাতে, মৃত্যুহিম সমাপ্তিতে ডুবে যদি এ দাহ কিছু কমে।...

বড় বাড়িতে এসে একটা দারোয়ান রেখে দিলেন পূর্ণবাবু। বৃদ্ধ গোছের ভোজপুরী দারোয়ান। আগে অতটা কিছু ভাবে নি, পরে লোকটাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানল, এর আগে সে এক বিখ্যাত বাইজির বাড়ি ছিল, এক-নাগাড়ে তেইশ বছর কাজ করেছে। তিনি, এখন পেশা ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে গেছেন বলেই ওর ছুটি হয়েছে, ওকে পাওয়া গেছে।

লোকটা কথা কম বলে, বিশ্বাসী তো বটেই—নইলে এতদিন এক নাগাড়ে এক জায়গায় থাকতে পারত না—এই জন্যেই সম্ভবত বেছে বেছে ওকে এনেছেন পূর্ণবাবু—কিন্তু এর মধ্যেও যে ইঙ্গিতটা আছে, হেমন্তর নিজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে—সেটা ভাল লাগে না। সেই ভাল না-লাগার ঝাঁজ বাইরেও প্রকাশ পায় পূর্ণবাবু এলে। পূর্ণবাবু কিন্তু রাগ করেন না, একটু হাসেন শুধু। বহুদর্শী চিকিৎসক তিনি, মানব-মনের এই সব বিবর্তনের বিবরণ তাঁর জানা আছে। সময়ে সব সয়ে যাবে, একদা হয়ত তাঁর মনোযোগের অভাব হলেই এই মেয়েটি ঝগড়া করবে—তাও তিনি জানেন।

সত্যিই সময়ে সয়ে যায়ও।

আরও বছর দুই পরে আর তেমন জ্বালা অনুভব করে না অপমানের। তত অসহ অস্বাভাবিকও মনে হয় না পূর্ণবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা। বরং আজকাল যেন পূর্ণবাবুর আসার সময়টায় একটু উৎসুকভাবেই অপেক্ষা করে, না এলে বা অসুখ করলে উৎকণ্ঠাও বোধ করে।

পরিবর্তন সব দিকেই।

এই অকল্পিত বড়মানুষীতে কেমনভাবে একটু একটু ক'রে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা ভেবে আজও মাঝে মাঝে অবাক লাগে বটে—তবু এখন স্বাচ্ছন্দ্যের আরামের অভাব ঘটলে যে বিরক্তি বোধ হয়, অসুবিধা লাগে—সেটাও অস্বীকার করতে পারে না।

বিলাসের আয়োজনও ঢের। একটা দারোয়ান, একটা দিন-রাতের ঝি, একটা ঠাকুর। এ ছাড়াও একটা ঝি রাখা হয়েছে। ওরই মধ্যে ভদ্রগোছের—'কল'এ যাবার সময় ব্যাগ বয়ে সঙ্গে যায়। অর্থাৎ, একজনের সেবার জন্য চারজন দাস-দাসী।

ফলে দু'রকম রান্নার ব্যবস্থা। একটা তার নিজের, ছেলে এলে ছেলেরও। আর বাকী একপ্রস্থ ঠাকুর-চাকরের। হেমন্ত এখনও মাছ-মাংস খায় না। পূর্ণবাবু অনেক অনুরোধ করেছেন—কিন্তু কোথায় যেন একটা অতীত সংস্কারে বাধে, খেতে পারে না। কেবল একাদশীতে নির্জলা উপোসটা ছেড়ে দিয়েছে, দুধ ফল সন্দেশ খায়। ছেলেও যে এক-আধদিন বাড়িতে আসে মাছ-মাংস খেতে চায় না, বলে 'আমি তোমার হেঁসেলে খাব মা। ওখানে তো দু'বেলা ওসব বাঁধা—হয় মাছ, নয় মাংস, নয় ডিম—খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। তোমার হেঁসেলের সুক্তো শাকের ঘণ্ট তো পাইনে সেখানে—এখানে ঐ সবই খাব।'

কে জানে, হয়ত মার চোখের সামনে বসে মাছ খেতে তার লজ্জাই করে আজকাল, হয়ত মায়ের জন্যে কষ্টই হয়।···

এর মধ্যে হঠাৎ, একেবারেই আকস্মিকভাবে একটা বাড়ি কেনা হয়ে গেল।

একদিন উল্টোডাঙ্গায় 'কল' সেরে বেলা চারটে নাগাদ পালকী থেকে এসে নামছে, একটি বুড়ো গোছের লোক এসে নমস্কার ক'রে প্রশ্ন করল, 'মা, বাড়ি কিনবেন একটা? খুব সস্তায় একটা বাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে।'

বাড়ি কেনার কথা কখনও ভাবে নি, স্বপ্নেও চিন্তা করে নি—বাড়ি কেনার মতো অবস্থা তার হয়েছে কিনা এ হিসাব করার কথাও মনে ওঠে নি কখনও। এতকাল যাকে প্রাণপণে শুধু প্রাণ-ধারণের কথাই চিন্তা করতে হয়েছে—সে একথা কল্পনা করবেই বা কেন, তবু আপনা-আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কোথায়? কত বড় বাড়ি? দাম কত?'

'খুব সস্তা মা। এই পাড়াতেই, আমহাউস ইস্ট্রীটের ওপরেই। দোতলা বাড়ি। মোটে সাত হাজার টাকা দাম।···যদি একটু কষ্ট করেন—এই কাছেই তো—এখনই দেখিয়ে দিতে পারি—'

'আপনার বাড়ি?' প্রশ্ন করে হেমন্ত।

'না মা', এতখানি জিভ কেটে—যেন কথাটা খুবই লজ্জার—সে লোকটি উত্তর দিল, 'আমি কোথায় পাব মা, বলে সংসারই চলে না! আমি দালালী করি। সত্যি কথা বলছি, বাড়িটা বিক্রী হলে হাজার করা দশটা টাকা পাবো। বড় কষ্টে পড়েছি মা, আজ তিনমাস এক পয়সাও পাই নি। সাত-সাতটি প্রাণী ঘরে—'

'চলুন দেখে আসি।' হেমন্ত আবার পাল্‌কীতে উঠে বসল। চেনা পালকী-বেহারা—বিবেচনা ক'রে আর দুগণ্ডা কি তিন গণ্ডা পয়সা ধরে দিলেই হবে।

খুবই ছোট বাড়ি, যেমন বাড়িতে ওরা ছিল পটলডাঙ্গায়। নিচে দু'খানা ওপরে দু'খানা খুপরি খুপরি ঘর, উপরন্তু তেতলায় একখানা ছোট্ট ঘর আছে। খুবই পুরনো বাড়ি, মনে হয়। এখনকার এই এগারো ইঞ্চি ইট বেরোবার অনেক আগের তৈরী।

মাটির গাঁথুনি—তবে চওড়া দেওয়াল। এমনি খুব মজবুত আছে এখনও। কিনে আর দু'শো আড়াই-শো টাকা খরচ ক'রে ঝেড়ে মেরামত ক'রে নিতে পারলে অনেকদিন চলবে।

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির ক'রে ফেলল হেমন্ত।

হাজার পাঁচেক টাকা হাতে জমেছে—এই সেদিনই বলছিল পূর্ণবাবুকে—কোম্পানীর কাগজ কিনিয়ে দেবার কথা। চাইলে আরও দু'হাজার টাকা তিনিই দেবেন। বাড়ি ভাড়া, চাকরদের মাইনে সবই তিনি দিচ্ছেন। আগে দৈনিক বাজার খরচের—উটনোর টাকাও দিতেন, হেমন্তই বারণ করেছে, দিতে দেয় না। এই সব খুচরো খরচের টাকা হাত পেতে নিতে এখনও পর্যন্ত লজ্জা করে তার। মনে হয় বাজারের বাঁধা মেয়েমানুষ হয়ে গেছে সে।

সে দালালকে বলল, 'ছ' হাজার দিতে পারি, দেখুন, ওঁদের যদি মত হয় তো জানাবেন।'

লোকটি সন্ধ্যাবেলাই এল আবার। কাকুতি-মিনতি ক'রে সাড়ে ছ' হাজারে দাঁড় করাল। বলল, 'আমি বলছি মা, বিশ্বাস করুন বুড়ো মানুষের কথাটা—সাত হাজার দিলেও সস্তা পড়ে বাড়িটা। এরা খুব নাচার হয়ে পড়েছে তাই—নইলে কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলে আট-ন' হাজার দর পেত অক্লেশে।'

পূর্ণবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

'বাড়ি দেখে দর-দস্তুর ক'রে একেবারে সব ঠিকঠাক! কি সর্বনাশ! তোমার ভেতরে এত আছে!...তা কেনো। আমি আমার য়্যাটর্ণীকে বলে দিতে পারি। ধন্নুবাবুও দেখে দিতে পারেন অবিশ্যি কাগজপত্রগুলো। সার্চ করিয়ে নেওয়া, বায়না দেওয়ার পর—সেও ওঁর মুহুরী করতে পারবে। তাতে খরচা কিছু কমই পড়বে বরং—। কিনবেই যদি, তোমার সেই পুরনো বাড়িটাও বিক্রী আছে কিন্তু!'

'না না, ও বাড়ি আমি কিনব না। অপয়া বাড়ি!' গলায় অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলে হেমন্ত।

'অপয়া বাড়ি!' পূর্ণবাবু অবাক হয়ে যান প্রথমটা, 'সে কি! ঐখান থেকেই তো তোমার উন্নতি শুরু! এত বড় বাড়িতে এলে, বোলবোলাও বাড়ল—।'

বলতে বলতেই বোধহয় মাথায় যায় হেমন্তর এই ঝাঁজের গূঢ়ার্থটা, কথাটা অসমাপ্ত রেখেই থেমে যান। মুখ লাল হয়ে ওঠে তাঁরও।

উনি বুঝেছেন বুঝেই হেমন্তও আর ব্যাখ্যা করে না।

বুদ্ধিমান পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়েন। বলেন, 'কেনো, তবে ও বাড়িতে তোমার যাওয়া হবে না। অতটুকু বাড়ি! তুমি ভাড়া-বাড়িতে ছিলে এতকাল, এখন নিজের বাড়িতে যাচ্ছ—এ কেউ তোমার দলিল হাঁটকে দেখতে যাবে না, বড় বাড়ি থেকে ছোট বাড়িতে উঠে যাচ্ছ এইটেই সবাই জানবে। ওতে ইজ্জৎ থাকবে না। ও বাড়ি মেরামত করিয়ে ভাড়া দিয়ে দাও। ভালই তো, একটা বাঁধা আয় হয়ে থাকল!'

বাড়ি কেনা হলে চেনা মিস্ত্রী ডেকে পূর্ণবাবুই মেরামত করিয়ে দেন। পঁচিশ টাকায় ভাড়াও হয়ে যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার আগে একদিন গৃহপ্রবেশের মতো

একটা অনুষ্ঠান ক'রে এল শুধু, একটু হোম, নারায়ণকে একশো আটটি তুলসী দেওয়া; হেমন্ত কিছুই করতে চায় নি, তার যেন কেমন একটা ভেতরে ভেতরে বদ্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এসব পুজো-আর্চা কল্যাণকর্মে তার আর কোন অধিকার নেই।...সে পতিত হয়ে গেছে। পূর্ণবাবু বলেন—'ফিক্সেশন'—এও একরকম মনের অসুখ।

গোপালীই ধমক-ধামক দিয়ে ভয় দেখিয়ে নিজের পুরুত ডেকে আয়োজন করালে। বললে 'তুই কি ঐসব ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবি নাকি? রাখ দিকি তোর পণ্ডিতি! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এতদিনে, একটু মাথা-গোঁজার মতো জায়গা হল, আপনার—নিজস্ব রোজগারে—ভগবানকে একটু পুজো দিবি নি? যেটের তারক বেঁচে থাক, মানুষ হোক—অবিশ্যি আরও হবে, তাই বলে এ-ই প্রথম, একটু হোম, কি একটু তুলসী না দিলে ঐ গুঁড়োটুকুর অকল্যেণ হবে যে! দ্যাখ, পুরনো বাড়ি কেনা মানেই একজনের মন্দ কপালের ধন ঘরে তোলা। অপরের দুঃসময়, তাকে অভাবে পড়েই বেচতে হচ্ছে। তাদের নিঃশ্বেসের জিনিস—একবার নারায়ণকে না নিয়ে এলে চলে?'

'গুঁড়োটুকুর অকল্যেণ হতে পারে'—একথা শোনার পর আর কিছু বলে নি হেমন্ত, নিজেই সব যোগাড় করেছে।

ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন বলে হেমন্তরও বিশ্বাস হতে আরম্ভ হয়েছে, তখনই আর একবার এক বিপর্যয় ঘটল তার জীবনে।

মনে মনে শেষ যে অহংকারটুকু ছিল—সংস্কারের, বিবেক-বোধের; মন্দকে মন্দ বলে ঘৃণা করার যে শেষ আশ্রয়টুকু ছিল মানবিকতার—সেটুকুও ঘুচিয়ে দিলেন ভগবান।

তাঁর সেই চরম মার এলও অভাবিত পথ ধরে—সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে।

পূর্ণবাবুর স্ত্রীর শরীর খারাপ, হাওয়া বদল করতে যাবেন—অনেকদিন ধরেই কথা চলছিল। যাওয়া হয় নি তাঁরই জেদের জন্যে। পূর্ণবাবু সঙ্গে না গেলে তিনি যাবেন না—তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা, তাতে শরীর থাকে আর যায়।

স্বামী যে একটা দাইয়ের পিছনে রাশি রাশি টাকা ঢালছেন, তাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার মতো—একথা তাঁর কানে না ওঠার কোন কারণ ছিল না। যেখানে বাড়ির কোচমান সইস যায়, বাড়ির চাকর যেখানে বাজার পেঁছে দেয়—সেখানকার খবর কানে না আসাই বরং আশ্চর্য। এরা ছাড়াও বহু হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন সাড়ম্বরে সালংকারে জানিয়ে দিয়ে গেছে সংবাদটা। যেসব পরিচিত লোক দু' বছরের মধ্যে এ বাড়ি মাড়ায় নি—তারাও নিজেরা খবর পাওয়া মাত্র, পুলকিত-চিত্তে গাড়ি-পালকী ভাড়া ক'রে এসে সুসংবাদ শুনিয়ে যাচ্ছে। 'তোমার জীবনের সোনালী দিন ফুরিয়ে এসেছে, সৌভাগ্যের রবি-রশ্মি মেঘে ঢাকছে'—পরিচিত ভাগ্যবতী কোন রমণীকে এ সংবাদ শোনাবার মতো আনন্দ খুব কমই আছে সংসারে।

অবশ্য পূর্ণবাবুও খুব একটা গোপন রাখার চেষ্টা করেন নি। করলে এতটা জানাজানি হত না। তিনি ভেবেছিলেন, 'যাকে অনেক দিয়েছি, গরীবের মেয়েকে রাজরাণী করেছি, শেষ বয়সে আমাকে একটু আনন্দ একটু শান্তি দিতে সে কার্পণ্য

করবে কেন? তার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না এতে। সে যে সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে বসে আছে, ছেলে-মেয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্বামীর পরিচয়, প্রতিপত্তি—সেখানে তো ঐ অভাগিনী কোনদিনই পেঁছিতে পারবে না—তবে আর তাকে ঈর্ষা করবে কেন?' তাছাড়া স্ত্রীলোক-ঘটিত দুর্বলতাও পূর্ণবাবুর এই নতুন নয়—প্রথম তো নয়ই, এতদিনে শরৎশশীর এটা গা-সওয়া হয়ে গেছে, ভেবে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আগের নেশাগুলোর কোনটাই এর মতো দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, এত প্রকাশ্যেও ঘটে নি সেগুলো। এত উম্মত্ততাও প্রকাশ পায় নি এর আগে। বোধকরি সেইজন্যেই ওঁর স্ত্রী এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ঝগড়াঝাঁটি, কান্নাকাটি, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, উপোস ক'রে থাকা—সবই হয়ে গেছে; এবার বোধকরি এই শেষ অবলম্বন হিসেবেই—অসহযোগ ধরেছেন। 'তুমি না গেলে আমি কোথাও যাবো না, মরি সে ঢের ভাল'—পরিষ্কার বলে দিয়েছেন স্বামীকে।

অগত্যা এবার যেতেই হয় পূর্ণবাবুকে। রোজগারের দোহাই দিয়েও আর অব্যাহতি পান না। স্ত্রীর যা অবস্থা, মাস-দুই কোন ভাল জায়গায় না রাখলে চলবে না, ডাক্তার বলে দিয়েছেন বার বার। বৈদ্যনাথে এক মক্কেলের বাড়ি পাওয়া গিয়েছে, পূর্ণবাবু স্ত্রীকে বলেছেন, 'যদি তোমার ভাল লাগে, শরীর ভাল থাকে—ওখানে একখানা বাড়ি কিনেই দেব তোমাকে।' (যার উত্তরে স্ত্রী বলেছেন, 'হ্যাঁ, তা তো দেবেই, আপদ বালাই দূর হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত, ছুকরী মেয়েমানুষকে এনে বাড়িতে পুরবে এবার।')

আপাতত মাস-দুইয়ের জন্যে যাচ্ছেন, দরকার হলে আরও একমাস থাকবেন—তাঁদের বলাই আছে। পূর্ণবাবু অবশ্য অতদিন থাকতে পারবেন না, সঙ্গে গিয়ে দিন পনেরো থেকে চলে আসবেন, আবার শেষের দিকে ক'টা দিন গিয়ে থাকবেন—এই কথা আছে। ডাক্তারের পক্ষে, বিশেষ ওঁর মতো নামকরা ডাক্তার—বেশীদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়—এটুকু শরৎশশীও বোঝেন। এই পনেরো দিন নিয়ে যাওয়াটাই তাঁর যথেষ্ট বিজয় লাভ হল বলে ধরে নিয়ে মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করেন।

যাওয়ার আগে হেমন্তকে বলে গেলেন পূর্ণবাবু 'টাকা-কড়ির দরকার নেই তা জানি—যদি অসুখ-বিসুখ করে কি আর কিছু দরকার হয়—আমি আমার এক ছাত্রকে বলে যাচ্ছি, রোজ কি একদিন অন্তর এসে একটু খোঁজ-খবর নেবে। ছাত্র মানে সেও ডাক্তার, এককালে ছাত্র ছিল—এখন আমার য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে কাজ করছে। নিজের ছেলেকে তো কিছুতেই এদিকে আনতে পারলুম না, তার মাথায় ব্যবসা ঢুকেছে—বলে ডাক্তারীতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে আপনাকে দেখে, এমন পরাধীন কাজ আর নেই—তা সেই-জন্যেই এই ছেলেটাকে তৈরী করছি, যাতে আমার প্র্যাকটিশটা বুঝে নিতে পারে। এতবড় প্র্যাকটিশ—। তা ছোকরাটা ভাল, এদিকে বেশ ন্যাকও আছে। এরই মধ্যে বেশ পসার জমিয়ে নিয়েছে।'

হেমন্ত ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'কী দরকার আবার একজনকে ব্যস্ত করার। ক'দিনে আর কি রাজত্ব উলটে যাবে আমার? অসুখবিসুখ করে ডাক্তার ডাকতে পারব। দিদি আছে—খবর পেলেই ছুটে আসবে। মিছিমিছি আর ওসব হাঙ্গামা করো না।'

'না, না। তুমি বোঝ না। দিনকাল খারাপ। একলা একটা মেয়েছেলে ঝি-

চাকরদের ভরসায় থাকে, কথাটা ভাল না। চাকর-দারোয়ানরাও আস্পদ্দা পেয়ে যায়। একজন কেউ দেখবার লোক আছে মাথার ওপর জানলে তারাও একটু হুঁশিয়ার থাকে।'

'হ্যাঁঃ! পনেরো দিনের তো ব্যাপার! তার মধ্যে কি করবে চাকররা, খুন ক'রে ফেলবে? এটুকু হিম্মৎ রাখি—একটা দুটো লোক আমার কিছু করতে পারবে না।'

পূর্ণবাবু হেসে চোখ টিপে বলেন, 'বলি আমারও তো একটা পাহারা রাখা দরকার গো! কার সঙ্গে কি ক'রে বসবে তার ঠিক কি! যদি আমার কপালে তেঁতুল গোল শেষ পর্যন্ত?'

'মুখে আগুন তোমার। এখনও ঐ চিন্তে! বয়েস যে তিনকুড়ি পেরিয়ে গেল!'

'সেই জন্যেই তো আরও ভয়!' হেসে বললেন পূর্ণবাবু, 'এত কষ্টে অনেক সাধ্য-সাধনায় যা জুটেছে একটা—গেলে কি আর পাব, এই বয়েসে?'

॥ ১৫ ॥

যাওয়ার দিন সকাল বেলাই কমলাক্ষকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে নিজে আর বসতে পারলেন না; হেমন্তকে বার বার সাবধানে থাকার নির্দেশ দিয়ে, কমলাক্ষকে সম্ভবমতো রোজই একবার খবর নিতে বলে, ব্যস্তভাবে তখনই চলে গেলেন।

কমলাক্ষকে বলে গেলেন, 'তুমি বসে দিদির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় ক'রে যাও। আমার আজই যাওয়া—বুঝতে পারছ তো, অনেক কাজ, এর মধ্যে দু'তিনটে রুগীও দেখে যেতে হবে—সন্ধ্যেয় গাড়ি, শীতের দিনে দেখতে দেখতে বেলা চলে যাবে।'

কমলাক্ষকে দেখে অবাক হয়ে গেল হেমন্ত।

ডাক্তারী পাস করেছে, বিয়ে-থাও হয়ে গেছে—বয়সের যা হিসেব পেয়েছে কাল পূর্ণবাবুর কাছ থেকে—কম ক'রে হলেও হেমন্তর সমবয়সী, বড় জোর এক-আধ বছরের ছোট, কিন্তু ওকে দেখে মনে হল ওর কুড়িও পেরোয় নি, মুখখানা এত কচি, ঢলঢল করছে। একেবারেই ছেলেমানুষের মতো। এ কি দেখবে তাকে, খোঁজ-খবর করবে—এইটুকু বাচ্চা ছেলে! পূর্ণবাবু যে 'দিদি' বলে গেছেন তা কিছুমাত্র বেমানান মনে হচ্ছে না। এই শুধু-মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, তাতেই কনে-বৌয়ের মতো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে মুখখানা, ঠাণ্ডার দিনেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, গলার খাঁজও চিক-চিক করতে শুরু হয়েছে।

হেমন্তর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল ওকে দেখে।

বৃথা আর 'আপনি-আজ্ঞে' না ক'রে সোজাসুজিই 'তুমি' বলে সম্বোধন করল। বলল, 'ও কি, বসো—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মনে হচ্ছে যেন ছুটে পালাতে পারলে বাঁচো—এমনি ধারা ভাব?…এত লজ্জা, ডাক্তারী করো কি ক'রে? তার ওপর তোমাদের ডাক্তারী তো মেয়েছেলেদেরই নিয়ে! তবে?'

আরও লজ্জা পেল কমলাক্ষ। কোনমতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'না—তা নয়, মানে—'

'মানে বুঝেছি।' খিলখিল ক'রে হেসে উঠল হেমন্ত, 'তুমি আমার গার্জেনগিরি করবে—না আমাকেই তোমার গার্জেন ক'রে রেখে গেলেন ডাক্তারবাবু নাবালক ছাত্রটির

—সেইটেই বুঝতে পারছি না! আসলে তো দেখছি তোমারই একজন অভিভাবক দরকার।'

'না—আজকে—' কমলাক্ষ আরও যেন তোৎলা হয়ে যায়, 'আজ মানে—শরীরটাই খারাপ হয়েছিল সকালবেলা—'

এতক্ষণে একটা লাগসই কৈফিয়ৎ খুঁজে পেয়ে যেন বেঁচে যায় সে।

হেমন্ত মানুষ চিনে নিয়েছে ততক্ষণে। এর যা অবস্থা, এভাবে কথাবার্তা চালালে হয়ত এক্ষুণি ভিরমি হয়ে পড়বে লজ্জায়। এমনিতেই, এই দুটো কথা বলতেই, এই শেষা-অঘ্রাণেও কামিজের শক্ত কলার ভিজে ন্যাতা হয়ে উঠেছে দেখতে দেখতে।...সে অন্য পথ ধরল এবার। একে একে—নাম-ধাম, ক'টা ভাই-বোন, দেশ কোথায় ইত্যাদি পর পর প্রশ্ন করতে শুরু করল। সাধারণ স্বাভাবিক প্রশ্ন—উত্তর দেওয়া সহজ। কমলাক্ষ তাতেই যেন সুস্থ বোধ করল অনেকটা, সহজভাবেই উত্তর দিতে লাগল।

দেখা গেল ওরাও ব্রাহ্মণ, কমলাক্ষ লাহিড়ী নাম, পাবনার দিকে দেশ—কিন্তু এখানেও তিনপুরুষের বাড়ি, ঠাকুর্দা ক'রে গেছেন। বাবাই দেশে যেতেন মধ্যে মধ্যে, সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন, আর কারও দেশে যাওয়া ঘটে ওঠে না। বছর চারেক হল বিয়ে হয়েছে—ডাক্তারী পড়তে পড়তেই—এই সবে সন্তানসম্ভবা হয়েছে তার বৌ। সেও ছেলে-মানুষ, এখনই মাত্র পনেরো বছর তার বয়স।

কথা বলতে বলতে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল হেমন্ত।'

রূপবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমলাক্ষ নাম সার্থক। তবে হেমন্তর খুব পছন্দসই নয় পুরুষের এ ধরনের রূপ। বড্ডই মেয়েলি মেয়েলি। যাত্রার দলে রাজকন্যা সাজবার মতো। আজকাল তো থিয়েটারও হয়েছে। সবাই লুফে নেবে এ যদি মেয়ে সাজে।...রঙটা গোলাপী ধরনের নয়—হলদের ওপর চড়া। এইটেই ভাল, বিশেষ পুরুষ মানুষের। এমনিতেও গোলাপী রঙ ভাল নয়। শিগগির নষ্ট হয়ে যায়, মেচেতা ধরে। মাকে তো দেখেছে, ওর সেজ জাকেও। অমন রঙ সব—কত অল্প বয়সেই পুড়ে গেছে। ওর যে যায় নি, এইটেই আশ্চর্য।

এর শুধু রঙ নয়—আলাদা আলাদা ক'রে ধরলে চেহারাটা খুবই ভাল। বড় বড় চোখ, একটু টানা—চোখের ভাবটিও বড় সুন্দর, লাজুক লাজুক, কিন্তু তারা দুটো খুব কালো নয় বলেই—একটু বাদামী রঙের হওয়াতে, দৃষ্টিটা খুব গভীর মনে হয়, মনে হয় সমবেদনাপরিপূর্ণ বিশাল হৃদয়েরই দ্যোতক। চুল খুব কোঁকড়া নয়, ঢেউ খেলানো—ঈষৎ-সোনালী বাদামী আভায় গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। বেশ লম্বা-চওড়াও, মুখ বা হাত-পা মেয়েলি ধরনের হলেও দেহের গঠন পুরুষের মতোই, বলিষ্ঠ।

আগে, প্রথম দেখতে যতটা খারাপ লেগেছিল—বয়সের তুলনায় ছেলে-মানুষের মতো দেখতে বলেই—আর মেয়েলি লজ্জার জন্যেও খানিকটা—ভাল করে দেখার পর আর অতটা মনে হল না। বরং আর একটু দেখার পর ভালই লাগল ক্রমশ। এক শ্রেণীর সান্নিধ্য আছে যা মনে আপনিই আনন্দ জাগায়, অকারণ প্রীতি ও স্নেহের সঞ্চার করে, মানুষটাকে কাছে বসিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে—কমলাক্ষর উপস্থিতির মধ্যে সেই

ধরনেরই একটা অজ্ঞাত মাধুর্য, আকর্ষণী শক্তি আছে।

কমলাক্ষরও—বাড়ির কথা, লেখাপড়ার কথা, প্র্যাকটিশের কথা—পূর্ণবাবুর কৃপায় এখনই দিনে আট টাকা, বারো টাকা পর্যন্ত রোজগার হয়—বলতে বলতে লজ্জাটা কেটে গিয়েছিল। শেষের দিকে আর প্রশ্ন করারও প্রয়োজন হচ্ছিল না, হেমন্তর সামান্য সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবেই উৎসাহিত বোধ ক'রে নিজেই গল গল ক'রে বলে যাচ্ছিল। এর মধ্যে গোড়ার দিকে, একটু বসেই যে বলেছিল, 'অনেক কাজ আছে, উঠতে হবে এবার, আজ তো তেমন কোন দরকার নেই এখানে—' সে-কথাও মনে রইল না।

কেবল হেমন্ত যখন জলখাবারের রেকাবি নিয়ে এসে ঢুকল তখনই যেন সমস্ত পুরনো লজ্জা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল, মুখখানা অরুণ-বর্ণ ধারণ করল, একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে কত কি বলে উঠল। লজ্জার প্রাবল্যে কথাবার্তা যে অসংলগ্ন শোনাচ্ছে তাও অত বুঝতে পারল না।

'না, না—মাপ করবেন, এই সকালেই এক-পেট খেয়েছি, আসবার পথে এক জায়গায় গিছলুম কিনা, মানে এই মাস্টার মশাইয়ের বাড়িই—এই তো এখনই বলতে গেলে—লুচি-টুচি, সে একগাদা—' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হেমন্ত বার-দুই যুক্তি প্রয়োগের বৃথা চেষ্টা, ক'রে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ওর একটা হাত ধরে জোর ক'রে চেয়ারে আবার বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাল ছেলের মতো খেয়ে নাও দিকি, সুড় সুড় ক'রে। নইলে খোকাদের মতো ঘাড় ধরে খাইয়ে দোব।…দিদি বলেছ, প্রথম দিন এলে, এতক্ষণ ধরে বকলুম—অমনি শুকনো মুখে ছেড়ে দোব ?… আর রোজই যখন আসতে হবে, এত লজ্জা করলে চলবে কেন ?'

ঝোঁকটা হঠাৎই এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেল সেটা। একটু লজ্জা পেয়েই হাতটা ছেড়ে দিল হেমন্ত।…এতই ছেলেমানুষের মতো দেখতে, কথাবার্তায়ও এত সরল যে, সে যে নিতান্ত স্বল্পপরিচিত বা সদ্যপরিচিত একটা পরপুরুষের গায়ে হাত দিচ্ছে তা একবারও মনে হয় নি হেমন্তর ; এবং এই-মাত্র এক ঘণ্টার পরিচয়েই—মনের মধ্যে এই কিশোরের মতো ছেলেটি সম্বন্ধে এমন একটা স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে যে, সে মুহূর্তে এই আচরণটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। স্বাভাবিক বলেই—এতে কোন অশোভনতা প্রকাশ পেল কিনা তা ভাবার কথাও মনে আসে নি।

শেষের এই লজ্জাবোধটুকু—এ সংকোচ কমলাক্ষ লক্ষ্য করে নি। সে অভিভূত হয়ে গেল। এর পর আর 'খাবার খাবো না' বলতে পারল না, বলার ইচ্ছাও রইল না। মাথা হেঁট ক'রে বসে সবই খেয়ে নিল প্রায়। কিন্তু এইটুকু আন্তরিকতাতেই সে যে কতটা বিচলিত হয়েছে, কতটা কৃতজ্ঞ—তা বিদায় নেবার সময় তার ছলছল চোখের গভীর দৃষ্টিতেই বুঝতে পারল হেমন্ত। মুখে কিছু বলতে পারল না ছেলেটা—কিন্তু বলার প্রয়োজনও ছিল না, অন্তত হেমন্তর কাছে।

'সম্ভব হলে রোজ, নয় তো একদিন অন্তর' খবর নেবার কথা বলে গিয়েছিলেন পূর্ণ ঘোষ, কিন্তু দিন-সাতেক কাটার পর দেখা গেল রোজ তো বটেই—কমলাক্ষ দু'

বেলাই আসছে খবর নিতে। সহস্র কাজ ফেলেই আসছে সে, সহস্র কাজ সেরেও। এক-একদিন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটাতেও এসে হাজির হয়। অধিকাংশ দিনই—'কল্'-এ বাইরে যেতে না হলে—এ সময় শুয়ে পড়ে হেমন্ত, একা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকার কোন কারণ নেই। ফলে এমনও হয়েছে—গোটা বাড়ির আলো নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়ার পর কমলাক্ষ এসে ডেকেছে—তখন আবার নতুন ক'রে আলো জেলে দরজা খুলে দিয়েছে দারোয়ান।

সে-সব দিনে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, অপ্রতিভভাবে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে বিদায় নেয়।...লজ্জা পায়—অথচ না এসেও থাকতে পারে না।

এই রকম ঘটনা যেদিন প্রথম ঘটল সেদিন হেমন্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তা দেখছই তো আলো নিভে গেছে, আমরা শুয়ে পড়েছি—তাহলে আর বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙিয়ে তুললেই বা কেন, বসবে না যদি ?'

'না না। বসব আর কেন ? এখন কি আর বসে গল্প করার সময় ?...এমনিই, জাস্ট কেমন আছেন, কিছু দরকার আছে কিনা—খবর নেওয়া। একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাস্টার মশাই—'

বলতে বলতেই বেরিয়ে গিয়েছিল, যেন হেমন্তর সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

ওর অবসর কম তা হেমন্তও বোঝে। পূর্ণবাবুর বিরাট প্র্যাকটিশ, বাঁধা ঘরই অনেক—সবই কমলাক্ষকে সামলাতে হচ্ছে। এতগুলো পরিবারের মধ্যে কয়েকটা বাড়িতে কিছু না কিছু ঝঞ্ঝাট লেগে থাকবেই—আর এসব 'কেস' একবার গিয়ে দেখেই পাঁচ মিনিটে চলে আসা যায় না। সুতরাং সারতে সারতে রাত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

শুধু বোঝা যায় না—এত রাত্রে আসার কারণটাই। ছেলেটা কি পাগল ? মধ্যে মধ্যে খবর নেবার কথা—প্রত্যহ দু' বেলা খবর নিতে হবে এমন কথা পূর্ণবাবু বলে যান নি নিশ্চয়ই,—হেমন্তর সামনেই বলে গেছেন রোজ না পারলে একদিন অন্তর যেন খবর নেয়—তবে ওর এ কি পাগলামি ! তার ওপর আরও একটা ব্যাপার—দোষই এটা—কিছুতেই শোধরাতে পারা যায় না, বকাঝকা, অনুরোধ-অনুনয় কিছুতেই কিছু হয় না, আসবে অধিকাংশ দিনই কিছু না কিছু নিয়ে। কোনদিন বলে 'এই সিমলেয় গিয়ে পড়েছিলুম, ওখানকার বাঁধা-বটতলার হিঙের কচুরি—গরম গরম ভাজছে দেখে দু'খানা নিয়ে এলুম।' কোনদিন বা বলে, 'তিনকড়ি ময়রার দোকানের সামনে দিয়েই আসছিলুম কিনা—নতুন গুড়ের আদাছানার মোণ্ডা ওদের বিখ্যাত, আপনার কথা মনে পড়ল।...একটু খেয়ে দেখুন না।' কিংবা, 'বকতে পারবেন না কিন্তু খবরদার—হাতি-ঘোড়া কিছু নয়, কাঁসারীপাড়ার সরের দই, আমি বাজি রেখে বলতে পারি কখনও খান নি !'

বেশী কিছু বললে করুণ মুখ ক'রে বলে, 'বড্ড যে আপনার কথা মনে পড়ে যায়, সত্যি। ভাবি কে-ই বা আছে আপনার, এসব খোঁজ ক'রে এনে খাওয়াবে !...তা আপনি অত রাগ করছেন কেন, এতে কিন্তু হবার কি আছে ? ভারি তো ছ' গণ্ডা চার গণ্ডা পয়সার জিনিস !'

সবচেয়ে একদিন এমনি রাত এগারোটার সময় কোথা থেকে কার যেন বিখ্যাত দেদোমোণ্ডা এনে বলে, 'এখনই দুটো খেতে হবে, গরম গরম এনেছি,—কাল সকালে খেলে অর্ধেক স্বাদ চলে যাবে !' হেমন্ত যত বলে রাত্রের খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়েছে, বিধবা মানুষ, রাত্রে বার বার খেতে নেই—বিছানার কাপড়ে তো নয়ই—তার ওপর মুখে পান রয়েছে (ইদানীং পসার বাড়তে পান ধরেছিল, নইলে নাকি নানা রকম বদ গন্ধ গলায় লেগে থাকে—বাড়ি এসে খাওয়া যায় না কিছু, পান মুখে দিয়ে তবে কেস করতে যায়), ততই হাত জোড় করে কমলাক্ষ, কাকুতি-মিনতি করে। বলে, 'পানটা ফেলে দিয়ে একটা কুলকুচো ক'রে নিন, কিচ্ছু হবে না, লক্ষ্মীটি, আমি কত আশা করে আনলুম, এখনও গরম—'

ছেলেটার কচি সুন্দর মুখখানা এমন ম্লান হয়ে আউতে পড়ে, চোখ দুটো এমন ছলছল করে যে, শেষ পর্যন্ত আর 'না' বলা সম্ভব হয় না—মুখের পান ফেলে দিতে হয়।

মাথার দিব্যি দিয়েও দেখেছে হেমন্ত, এ রোগ শোধরাতে পারে নি। বলেছে, 'দিন গে দিব্যি, আমি দাদামশাইয়ের মুখে শুনেছি, খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন ঈশ্বর বাগচি—দিব্যিটা বেলপাতায় লিখে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে আর সে দিব্যি লাগে না। আমি কাল ভোরবেলাই গঙ্গায় চলে যাব !'

পূর্ণবাবু পনেরো দিন বলে গিয়েছিলেন, ঠিক ষোল দিনের দিন সকালেই ফিরে এলেন।

এর পর আর কমলাক্ষর আসবার কোন কারণ নেই, যার দায়িত্ব সে-ই তো স্বয়ং এসে গেছে। আসবে না আর, হেমন্তও তাই ভেবেছিল। সেইজন্যেই—যেদিন পূর্ণবাবু এসে পেঁৗছেই দেখা ক'রে গেলেন—সেদিন পরে কমলাক্ষ এলে তাকে খবরটা দিয়ে—কতকটা সৌজন্যবশতই বলে দিয়েছিল, 'তাই বলে তুমি যেন একেবারে ভুলে যেয়ো না, সুবিধেমতো মধ্যে মধ্যে এসো অবিশ্যি অবিশ্যি।'

কমলাক্ষ একটু অবাকই হয়ে গেল যেন এ কথায়। কিছুক্ষণ সময় লাগল তার হেমন্তর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কথাটা বুঝতে। অর্থাৎ তার যে না আসাও সম্ভব—এ কথাটা হেমন্তর মাথায় গেল কি ক'রে ?

সে বিস্মিত দৃষ্টির অর্থ প্রথমটা হেমন্ত বুঝতে পারে নি। বুঝল ওর পরবর্তী কথায়, 'আমি আসব না, খবর নেব না—একথা আপনার মাথায় ঢুকলই বা কেন ? বা রে, আমি বুঝি শুধু মাস্টার মশাইয়ের হুকুম তামিল করতেই আসছিলুম ?'

হেমন্ত মুখ টিপে হেসে বলল, 'কী জানি ভাই, তাই তো শুনেছিলুম। তিনি থাকবেন না বলেই তো তোমাকে খবর নিতে বলেছিলেন। আমি ভাবছিলুম সেই দায়িত্বর জন্যেই আসো তুমি—কৈ, আগে তো কোনদিন আসো নি !'

'বা রে ! আগে পরিচয়ই ছিল না যে, তা আসব কি !'

বলতে বলতেই হেমন্তর কৌতুকচপল চোখের দিকে চেয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতাটা বুঝতে পারল বোধহয়। নিমেষের মধ্যে সুগৌর সমস্ত মুখখানায়, মায় যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত,

কে যেন মনে হল আলতা ঢেলে দিলে, আর—এটা কমলাক্ষ ছাড়া আর কারও এমন হতে দেখে নি হেমন্ত, আগেও না পরেও না—দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কপাল ভিজে উঠল ঘামে। অপ্রতিভভাবে হেসে মাথা নামিয়ে বলে, 'আপনি এমন করেন না—বড্ড ইয়ে ক'রে দেন লোককে।'

এর পর একটা দিন বোধহয় কোনমতে ধৈর্য ধরে ছিল কমলাক্ষ, বিসদৃশ না দেখায়, কেউ না কিছু ভাবে—বিশেষ হেমন্ত নিজে, এইজন্যেই আসে নি। কিন্তু তার পরদিনই সকালে হাসপাতাল যাবার আগে একবার এসে দেখা করে গেল। তারপর প্রত্যহই। কখনও সকালে, কখনও বিকেলে। রোজ যে দেখা হয় তা নয়—কারণ আজকাল এক-একদিনে দু'তিনটে ক'রে কেস থাকে হেমন্তর, সে-সব দিনে খাওয়ারই সময় পায় না—এমনি সব দিনে দু'তিনবারও এসে ঘুরে যায়। তবে সবই দিনের বেলায়, সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর কোনদিন আসে না। সেটা যে ইচ্ছে ক'রে আসে না—পূর্ণবাবুর থাকবার সময় বলে—তা আগে অত বুঝতেও পারে নি হেমন্ত, লক্ষ্যও করে নি।

কিন্তু একবার পর পর দু'দিন এমনি দেখা হল না। এই দ্বিতীয় দিনে আর বোধহয় ধৈর্য মানল না কমলাক্ষর, আবারও একবার এল, অনেক রাত্রে।

রাত এগারোটা তখন, এরা সবাই শুয়ে পড়েছে, বিশেষ হেমন্ত সেদিন খুবই ক্লান্ত। ভোর ছ'টায় বেরিয়ে রাত ন'টায় ফিরেছে। সারাদিনে একটু জল পর্যন্ত মুখে পড়ে নি, পূর্ণবাবুর সঙ্গেও দেখা হয় নি, তিনি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা ক'রে চলে গেছেন। এই অবস্থায় কাঁচা ঘুম ভাঙায় একটু বিরক্তই হল, ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী ব্যাপার আবার, কোন জরুরী খবর আছে নাকি ?'

কমলাক্ষ সে-বিরক্তিটা বুঝতে পারল বলে মনে হল না। বললে, 'না, জরুরী খবর আর কি থাকবে ! মাস্টার মশাই তো এসেই ছিলেন নিশ্চয়।...এমনিই। দু'দিন দেখা হয় নি, তাই—। সকাল থেকে দু'বার ঘুরে গেছি—'

'তা না-ই বা হল ? এখন আর এত রোজ রোজ দেখা করার দরকারই বা কি ? যার জন্যে খবর নেওয়া সে তো নিজেই আছে এখানে !'

হেমন্তর কণ্ঠস্বর নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝিবা তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে।

এবার আর তার মনোভাব না বোঝার কোন কারণ থাকে না। লজ্জিত হয় কমলাক্ষ, বোধহয় একটু ভয়ও পায়। বলে, 'অতটা বুঝতে পারি নি, মাফ করবেন আমাকে। সত্যিই—খেটেখুটে এসে শুয়েছেন। এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে—! ইস্—অনেক রাত হয়ে গেছে।' পকেট থেকে চেনে বাঁধা ঘড়িটা বার ক'রে দেখে, 'আমি একটা গাধা। এবারের মতো মাফ করুন—এই বারটি, আর কখনও এমন আসব না।...মানে, কী জানেন, দু'দিন দেখি নি বলেই কেমন যেন মনে হতে লাগল, কত কী—আর ঠিক থাকতে পারলুম না।'

এ-কথাগুলো বলে ফেলে বোধ করি আরও লজ্জিত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই বড় বড় ফোঁটায় ঘাম গড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে কপাল বেয়ে, মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—এখন অধিকতর লজ্জা ও অনুতাপে বিবর্ণ হয়ে গেছে—লণ্ঠনের আলোতেই লক্ষ্য করল হেমন্ত—এমন অপ্রতিভ বোধহয় জীবনে আর হয় নি কমলাক্ষ—সে আর দাঁড়াল না। ঘামের

নোনা জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে সম্ভবত—অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে গেল। বোধহয় ভাড়া গাড়িতে এসেছিল, একটু পরেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল রাস্তায় —লোহাবাঁধানো চাকা গড়িয়ে যাওয়ারও।

হাসি পাবারই কথা ছেলেটার রকমসকমে, হাসিই পেয়েছিল। সেইজন্যেই কথাটা মনে ছিল। হাসতে হাসতেই গল্প করল হেমন্ত পূর্ণবাবুর কাছে, 'শুনেছ তোমার ছাত্রর কীর্তি ?'

কিন্তু পূর্ণবাবু সব শুনে যেন চমকে উঠলেন, 'ও এখনও রোজ আসে নাকি ? কৈ, বলো নি তো এর মধ্যে—কোন দিন ?'

'ওমা, এ আবার কি বলব ? বলার মতো কথা, তাই তো জানি না !·· এতদিন রোজ আসত, এখন যদি হঠাৎ আসা বন্ধ ক'রে দেয় আমি কি ভাবব—হয়ত সেইজন্যেই আসে। এতে আর বলার বা খবর দেওয়ার কি আছে ? তাছাড়া তুমি যে জান না তা-ই বা আমি কেমন ক'রে জানব ?'

'না, কৈ, বলে নি তো !' একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন পূর্ণবাবু।

'তা কি জানি ! হয়ত বলা দরকার তা মনে করে নি।'···এবার হেমন্তও যেন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'এ আর বলাবলির মতো কী-ই বা কথা ! এমন আর একটা কাণ্ড ! চেনা-পরিচয় হয়েছে—আসবে না-ই বা কেন ?···নেহাৎ কাল ঐরকম কাণ্ড করল বলেই আজ মনে পড়ল।···বড্ড বোকা বাপু, যাই বলো। কী ক'রে ডাক্তারী পাস করেছিল তাই ভাবি।···পাস করেছিল, না ঐ খোকা-খোকা চেহারা দেখে তোমরা পাস করিয়ে দিয়েছ ?

'না না', পূর্ণবাবু গলায় জোর দিয়ে বলেন, 'এমনি বোকা-বোকা দেখতে, খুব ভাল ছাত্র ছিল। ডাক্তারীটা ভালই জানে। কালে আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে।···আসলে তোমার কাছে এলে সবাই বোকা হয়ে যায়—আমাকে দিয়েই দেখছ না ?'

বলে হাসতে থাকেন পূর্ণবাবু।

হেমন্তও হাসে, বলে, 'হ্যাঁ, তুমি বোকা না ! তোমাকে যে বোকা বলবে, তার চোদ্দ গুষ্টি বোকা। কী ক'রে আমাকে প্যাঁচে ফেললে। কম শয়তানী তোমার। আমি তো তাই বলি, তোমার মাথায় পেরেক সেঁধুলে ইস্‌কুরুপ হয়ে বেরিয়ে আসবে। আমার এক ভাসুরের কথায় তারকের গুষ্টি বলেছিল। তা তোমাকে দেখেই কথাটা বুঝলুম !'

অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় দু'জনে। অন্য খুচরো আলোচনা। পূর্ণবাবুর সংসারের কথা, অশান্তির কথা। হেমন্তরও নানা প্রসঙ্গ। কমলাক্ষর কথা আর কারও মনে থাকে না।

এর পর দু'দিন আর এল না কমলাক্ষ। প্রথম দিন অত খেয়াল করে নি। দ্বিতীয় দিনও না আসাতে হেমন্ত একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। প্রথমেই মনে হল—ছেলেটার অসুখ-বিসুখ করল না তো ?

আর খানিক পরে নিজের উদ্বেগটা দেখে নিজেরই একটু অবাক লাগল। এতদিন জানত যে, কমলাক্ষ আসে নিজের গরজেই, সে-গরজ কি তা নিয়েও মাথা ঘামায় নি

কখনও—কিন্তু আজ বুঝল তার আসাটা ওর ভালই লাগে, বোধ করি প্রত্যাশাও করে।

পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করল রাত্রে, 'তোমার ছাত্রের কী হল গো, আর তো আসছে না! অসুখ-বিসুখ করে নি তো?'

কতকটা অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলেন তিনি, 'না, অসুখ করবে কেন? আজও তো আমার সঙ্গে ঘুরেছে তিন-চার ঘণ্টা। ভালই তো আছে। বোধহয় কাজের চাপ বেশী পড়েছে বলেই সময় পায় নি।'

আর কিছু বলল না হেমন্ত। তাই হবে। কাজের চাপ বেশী পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। পড়ুক, উন্নতিই হোক দিন দিন—এই তো কাম্য।

কিন্তু পূর্ণবাবু চলে যাবাব পর মনটা ঘুরে-ফিরে তার সেই চিন্তাতেই চলে এল আবার। বহু রাত পর্যন্ত ঘুম এল না ওর।

তবে কি রাগ করেছে কমলাক্ষ? দুঃখ পেয়েছে কোন কারণে, হেমন্তের কোন আচবণে?

অভিমান বোধ হয়েছে—সেদিন হেমন্ত একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল বলে? না কি লজ্জাই?

আবার মনে হল, না—তার পরের দিনও তো বেলা তিনটের সময় এসে দেখা ক'রে গেছে!

তবে?

হতে পারে সত্যি খাটুনিটাই খুব বেড়েছে। রাত্রের আগে সময় হয়ে ওঠে না। আর রাত বেশী হয়ে যায় বলেই আর আসতে সাহস হয় না।

নিশ্চয়ই তাই। মনে মনে জোর দিয়ে বলল। পূর্ণবাবুই ঠিক ধরেছেন।

এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল।···

কিন্তু পরের দিন সকালেও যখন কমলাক্ষ এল না—তখন আর অনিশ্চিত কারণের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারল না। কোথায় একটা কি গোলমাল হয়েছে, আর সে গোলমালের কারণও—ওর মনে মনে যেন কে বলল—পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে সঠিক জানা যাবে না। অথচ সেটা না-জানা পর্যন্ত হেমন্তও স্থির হতে পারবে না।

আর এই সঙ্গে পরিষ্কার বুঝল—কোনদিনই আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা করে না সে—ছেলেটার ওপর তার মায়াই পড়ে গেছে। টানটা এখন আর একতরফা নেই। নিজের এই মরুভূমিবৎ জীবনে এই ছেলেটি যে স্নেহ-প্রীতি-মুগ্ধতা নিয়ে এসেছে—এ পাওনা তার জীবনে একেবারেই অভিনব। অননুভূত কল্পনাতীত অভিজ্ঞতা একটা। মরূদ্যানের সঙ্গে তুলনা করলেও ঠিক বলা যায় না, বোঝানো যায় না। একটা তরুণ ছেলের আবেগময় স্নেহ—হয়ত বা শ্রদ্ধাও—তার উজ্জ্বল প্রদীপ্ত উপস্থিতি যে কী এক অকল্পিত আশা ও আশ্বাস নিয়ে আসে, যে বস্তু জীবনে কখনও পায় নি, আর হয়ত কখনও পাবে না, তারই আভাস ও প্রতিশ্রুতি পায় যেন তার সুদ্ধমাত্র হাসি-হাসি মুখে এসে দাঁড়ানোতেই। এ বর্ণনা করা যায় না, নিজের মনেও বিশ্লেষণ করা যায় না, নিজের আবেগে শুধু এর প্রতিধ্বনি জাগে, অন্তরের তারে তার রেশটা ধরা পড়ে।···

বেলা দুটো-তিনটে পর্যন্ত ছটফট ক'রে এবং নিজের বিবেচনা বোধের সঙ্গে বহু

তর্ক-বিতর্ক ক'রে—যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগের পর—শেষে এক সময় মন স্থির ক'রে ফেলল। ঠিকানা লেখাই ছিল কমলাক্ষর বাড়ির। পূর্ণবাবু বৈদ্যনাথ যাওয়ার আগে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন—যদি দরকার পড়ে, কিছু বিপদ-আপদ ঘটে তো খবর দেওয়ার জন্যে, সেই কাগজটা দিয়ে দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিল। বলে দিলে শুধু খবর নিয়ে চলে আসতে—ডাক্তারবাবু কেমন আছেন। আর যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—ঐ যে ছোট ডাক্তারবাবু আসেন প্রায়ই, শিউপূজন তো দেখেছেও তাঁকে—যেন বলে মাইজী বলে দিয়েছেন অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করতে। যদি রাত্রে আসার সুবিধে হয় তাই যেন আসেন, যত রাতই হোক, মাইজী জেগে থাকবেন।

শিউপূজন ফিরে এসে খবর দেবার আগেই কমলাক্ষ পেঁছে গেল। কারণ সে হেঁটে আসবে, নতুনবাজার কোম্পানীর বাগানের কাছ থেকে—কমলাক্ষ এসেছে নিজের গাড়িতে। পূর্ণবাবুরই পুরনো ব্রুহাম এটা, মাস-তিনেক হল কমলাক্ষ কিনেছে। গাড়ি-ঘোড়া সবই তাঁর। পূর্ণবাবু কোথাকার নীলামে এক সাহেবের বিরাট ভিক্টোরিয়া গাড়ি কিনেছেন, তার সঙ্গে মানিয়ে ওয়েলার ঘোড়া—এটার আর দরকার নেই বলে তিনিই একরকম জোর ক'রে কমলাক্ষ দিয়ে কিনিয়েছেন। বলেছেন, 'গাড়ি পোষার মতো আয় তো করেই দিয়েছি, মিছিমিছি কতকাল আর ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়িতে ঘুরবে? নিজের গাড়ি হলে দেখবে আয়ও বাড়বে। আর এ আমার পয়মন্ত গাড়ি।'

কমলাক্ষকে দেখে কিন্তু হেমন্ত শিউরে উঠল।

এই মাত্র দু'দিন আগেও দেখেছে—এর মধ্যে এ কী হয়েছে ওর!

আশ্চর্য, অমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুগৌর মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। মুখখানা শুকিয়ে লম্বা হয়ে গেছে, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। বহুদিন অসুখে ভোগার মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছে।

'ওমা, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! তাই তো ভাবছি—নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে। আমি ঠিক ধরেছি, মন অন্তর্যামী, কেবলই মনে হচ্ছে কোন অসুখ-বিসুখ করেছে—। কী হয়েছে তোমার বলো তো? জ্বর? না অন্য কিছু—আমাশা-টামাশা? যেন মনে হচ্ছে দেহের আদ্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে কিসে, ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো? জ্বরই হয় নি তো—নতুন হিমের সময়, ঘরে ঘরেই শুনছি জ্বর।…কৈ, দেখি—'

বলতে বলতেই উদ্বেগের ব্যাকুলতায় কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই এগিয়ে গিয়ে হাতের উল্টো পিঠে ওর কপাল ও গালের তাপ অনুভব করল, 'না, জ্বর তো নয়, গা তো ঠাণ্ডা! তবে?'

এটা অভাবনীয় শুধু নয়, একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত, এক মুহূর্তের আবেগ-বিহ্বল। অতর্কিত অসতর্কতা।

সেই প্রথম দিন যেমন—আজও তেমনি, কমলাক্ষর গায়ে হাত দেবার এক লহমা আগেও কল্পনায় পর্যন্ত ছিল না, চিন্তাটা। এমন যে করতে পারবে সে নিজে ভাবতেও পারে নি। কিন্তু প্রথম সেদিন থেকে আজ অনেক তফাৎ। অনেক বেশী উদ্বেগ ও আবেগ আজ তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে। সেদিনের সে আচরণে শিশুর প্রতি অভিভাবকস্থানীয়ার কর্তৃত্ব মাত্র ছিল। আজ সে মনোভাবের যেন অনেক বেশী

পরিবর্তন ঘটেছে।

আবারও নিজের মনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল হেমন্ত—যেন কেমন ভয়-ভয়ও করতে লাগল।

কিন্তু নিজের দিকে তাকাবার—মনের ভাবটা ওজন ক'রে দেখবার মতো বেশী সময়ও মিলল না।

তার আগেই আর একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

এই সস্নেহ স্পর্শে, আন্তরিক উৎকণ্ঠাভরা কণ্ঠস্বরে, উদ্বেগাকুল প্রশ্নে—সর্বোপরি হেমন্তের আচরণের অপ্রত্যাশিততায় কমলাক্ষর মাথার মধ্যে যেন এক বিপর্যয় ঘটে গেল। অতবড় ছেলেটার, পাশকরা, প্রায়-প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ল।

'আরে, আরে, এ কি! কী হল কি—দ্যাখো পাগলার কাণ্ড! তুমি না ডাক্তার, তোমার না পসার হয়েছে! বিয়ে করেছ, দুদিন বাদে ছেলের বাপ হবে, তোমার চোখে জল!···এ অবস্থায় কেউ দেখে ফেললে কি বলবে বল তো!'

কিন্তু এ অনুযোগে ফল হল বিপরীত, এবার যেন—যেটুকু আত্মসংযম তখনও ছিল—তার বাঁধ ভাঙল, বুকের জামা ভিজে উঠল সাবালক পুরুষমানুষের চোখের জলে।

ঝোঁকের মাথায় গায়ে হাত দিয়ে ফেলে লজ্জিত হয়েছিল ঠিকই, অনুতপ্ত এবং শঙ্কিতও কিছুটা, কিন্তু সে লজ্জা বা অশোভনতা প্রকাশের আশঙ্কাতেও স্থির হয়ে থাকতে পারল না। এই ছেলেটার নিরতিশয় শুষ্ক ম্লান মুখ দেখে প্রথম থেকেই বিচলিত বোধ করছিল—এখন তার ওপর এই চোখের জলে তার মনের মধ্যেও যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল—সমস্ত দ্বিধা গেল ঘুচে, এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চুপ করো, চুপ করো, লক্ষ্মীটি! ছিঃ! পুরুষ মানুষের অমন ক'রে চোখের জল ফেলতে আছে!···এত বড় একটা পুরুষমানুষ! কাঁদে মেয়েছেলে আর কাঁচছেলে।···কী হয়েছে বলো তো ভাই ঠিক ক'রে—আমার কোন কথায় দুঃখ পেয়েছ?···না কি—আমি তো নিজেরটাই সাতকাহন ভাবছি—অন্য কোন খারাপ খবর-টবর পেয়েছ কোথাও থেকে? মা বাবা বৌ—সবাই ভাল আছে তো?'

আস্তে আস্তে শান্ত হল কমলাক্ষ। প্রাণপণ চেষ্টা করতে হল উদ্গত চোখের জল সামলে নিতে। একটু সময় নিয়ে মাথা নিচু ক'রে বলল, 'আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, বিরক্ত হয়েছেন—শুনে পর্যন্ত কী যে কষ্ট হচ্ছে আমার, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। কতবার—কতবার মনে হয়েছে, আত্মহত্যা করি—তাতে যদি আপনি আমার ওপর দয়া করেন—দয়া ক'রে ক্ষমা করেন!'

হেমন্ত প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর বলে উঠল, 'এই দ্যাখো, পাগলাকে কে ঘাঁটিয়েছে! আমি রাগ করেছি, বিরক্ত হয়েছি—এসব আজগুবি কথা কে বললে তোমাকে? এই সব ভেবে বাড়িতে বসে আছ তুমি! আর আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি কেন আসছ না বলে। কত ভাবছি—অসুখ করেছে কিম্বা আর কোন বিপদ-আপদ হয়েছে—কি আমার ওপরই রাগ ক'রে আসছ না!'

এবার ভাল ক'রে চোখ মুছে তাকাল কমলাক্ষ ওর চোখের দিকে। তার দৃষ্টিতে

একই সঙ্গে আশা ও অবিশ্বাস। আশার অতীত সৌভাগ্য—বিশ্বাস করতে পারছে না, ভুল শুনছে কিনা, অথবা হেমন্ত তামাশা করছে—এই আশঙ্কা।

উৎসুক ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করল—ঠিক প্রশ্নও নয়, যেন কোন তথ্যের পুনরাবৃত্তি—'আপনি সেদিন অত রাত ক'রে এসে ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমার ওপর বিষম রাগ করেছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন, না ?…মাস্টারমশাই সেজন্যে পরশু সকালে খুব বকলেন আমাকে। আপনি নাকি ওঁকেও যাচ্ছেতাই তিরস্কার করেছেন—উনি আপনার পেছনে একটা পাগল লেলিয়ে দিয়েছেন বলে!…সত্যিই, আপনি যা বলেছেন তাও তো মিথ্যে নয়, খুবই অন্যায় হয়েছে কাজটা, আমিও পরে ভেবে দেখেছি, একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো হয়ে গেছে।…সত্যিই তো, পাড়ার লোক তো দুষ্য ভাবতেই পারে, চাকর-বাকররাও এ নিয়ে কত কি বলবে হয়ত! স্যার বললেন তাই, "তুমি এত বড় ছেলে, এতখানি বয়স হয়ে গেল—এসবগুলো তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল না কি ? মাঝখান থেকে আমাকে সুদ্ধ অপ্রস্তুতে ফেললে। কতকগুলো কথা শুনতে হল তোমার জন্যে।"…আপনার কথা বললেন, উনি খুব রেগে গেছেন, খুবই বিরক্ত হয়েছেন তোমার ব্যবহারে, বার বার বলে দিয়েছেন আর যেন কখনও না আসে, আমাকে বারণ ক'রে দিতে বলেছেন।'

বলতে বলতেই চোখদুটো আবার ছলছলিয়ে এল।

তারপর আরও অনুতাপ-গাঢ় কণ্ঠে বললে, 'সেই থেকে যে কী হচ্ছে আমার মনের ভেতরে—তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছে যদি কোনমতে জীবন থেকে ঐ দিনটা বাদ দিতে পারতুম!…কেবলই মনে হচ্ছে তার আগে মরে গেলুম না কেন! তাহলে হয়ত সে-খবর পেলে আপনার মন নরম হত, হয়ত একটু দুঃখ করতেন, দুটো মিষ্টি কথাও বলতেন।…এখনও এই একটু আগে মনে হচ্ছিল বিষ খেয়ে মরে যাই, তাতে যদি আপনার রাগ যায় আমার ওপর থেকে—'

হেমন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই এতক্ষণ কোন কথা বলতে পারে নি। এবার ইঙ্গিতে কমলাক্ষর কথায় বাধা দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'উনি কি বলেছেন, তোমার মাস্টারমশাই, যে আমি সেদিন অত রাত ক'রে আসার জন্যে রাগ করেছি, তাঁকে গালাগাল দিয়েছি—আর আসতে বারণ করেছি তোমাকে ? বলেছেন এই কথা উনি ?'

'হ্যাঁ—। আরও বললেন—' বলতে গিয়েও হঠাৎ একটু থেমে গেল কমলাক্ষ। এতক্ষণে যেন একটা কি সংশয় দেখা দিয়েছে মনে, তারপর বললে, 'কেন, আপনি বলেন নি ওঁকে কিছু ?'

আরও খানিকটা চুপ ক'রে থেকে হেমন্ত বললে, 'না, ঠিক এভাবে বলি নি, তোমার পাগলামি নিয়ে হাসাহাসি করেছি এই মাত্র। রাগ একটুও করি নি—এটা তুমি বিশ্বাস করো। অকারণে—শুধু চক্ষুলজ্জার জন্যে কখনও মিথ্যে বলব না আমি।'

'তবে—উনি কেন বললেন ?' অবাক হয়ে যায় কমলাক্ষ, এব্যাপারের যেন কোন তল পায় না এখনও, পূর্ণবাবুর আচরণ ওর কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হয়, সত্যিই উনি সব বানিয়ে বলেছেন ?—সঙ্গে সঙ্গে, গত দু'দিন যে অকথ্য অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছে, সেকথা মনে পড়ে একটা প্রচণ্ড উষ্মাও মাথা তোলে ভেতরে ভেতরে। চোখের সামনে সব

লাল হয়ে আসে যেন—'উনি মিছে কথা বললেন আমাকে? কিন্তু কেন, এর মানে কি?'

'ছিঃ!' হেমন্ত তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দেয়, 'উনি তোমার শিক্ষক, গুরুজন, তোমাকে ছেলের মতো ভালবাসেন, হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁর সম্বন্ধে এসব কথা চিন্তা করতে নেই। হয়ত উনি ভুল বুঝেছেন, তাও হতে পারে তো! পাড়ার লোক কি ভাববে—কি চাকর-বাকর কি মনে করবে—এসবও হয়ত উনিই ভেবেছেন, বলার সময় কীভাবে বলেছেন, তুমি ভেবেছ আমার জবানীতেই বলেছেন।...তুমি এসব কথা ভুলে যাও। মিছিমিছি এ নিয়ে মাথা ঘামিও না, মন খারাপ ক'রো না।...তুমি যখন খুশি এসো, সময় না পাও রাত্রেই এসো—অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে। কারও কথা তোমার ভাববার দরকার নেই। মাস্টারমশাই বারণ করলে—যদি কোনদিন করেন—শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছে, তবে আমার হয়ে তাঁর কিছু বলার অধিকার নেই। আমি তাঁর কেনা চাকরানী নই, আমার সংসার—আমি নিজের রোজগারে খাই, তিনি যেটুকু সাহায্য করেছিলেন তার সুদসুদ্ধ উশুল হয়ে গেছে—আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই তাঁর সঙ্গে; এ-বাড়িতে কেউ আসবে কি আসবে না—এ-কথা বলার এক্তার শুধু আমারই। তুমি এসো—নিশ্চয়ই আসবে। না এলে ভাবব আমার ওপর রাগ করেছ!'

এতটা না বললেও হত বোধহয়। কিন্তু কথাগুলো বেরিয়ে যাবার আগে সে-কথাটা ভাবার সময় হল না হেমন্তর। মানসিক আবেগের ধর্মই এই—বান ডাকলে সে কতদূর উঠবে, কোথায় গিয়ে থামবে তা কেউ বলতে পারে না।

॥ ১৬ ॥

কমলাক্ষ সেদিন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি ফিরল বটে, কিন্তু হেমন্তর অশান্তি ও দুশ্চিন্তার সীমা রইল না।

এ-চিন্তা তার নিজেকে নিয়েই। নিজের ওপর যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সে। কী ক'রে বসবে, কতদূর কি করতে পারে—সে-কথা আজ আর সে নিজের সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে বলতে পারে না। অথচ, কিছুদিন আগে হলেও—এ ধরনের দুশ্চিন্তা যে কোনদিন তার মনে দেখা দিতে পারে, এর যে কোন কারণ ঘটতে পারে এ কথা বিশ্বাস হত না।

আজ যে সারারাত ঘুম হল না সে দুশ্চিন্তায়, এও তো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

আরও চিন্তা তার কমলাক্ষর জন্যেই।

পূর্ণবাবুর এই মিথ্যা কথার পিছনে যে মনোভাব কাজ করেছে তার পুরো স্বরূপটা এখনও প্রকাশ পায় নি—কতদূর যাবে তাও জানা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বেশ জানে হেমন্ত, কমলাক্ষ যদি এখানে আসা বন্ধ না করে—অন্তত না কমায়—তাহলে শিগগিরই ওঁর প্রচণ্ড বিরূপতার সামনে পড়তে হবে, শত্রু হয়ে উঠবেন উনি।

ভালই হয়েছিল, পূর্ণবাবু হয়ত ভালই করেছিলেন—ওকে এখানে আসতে নিষেধ ক'রে। দুঃখ পাচ্ছিল ঠিকই—কিন্তু অল্পবয়সের এ দুঃখ দু'দিনেই ভুলে যেত—নিজের নিরাপদ জীবনবৃত্তে আবর্তিত হত আবার, নিজস্ব জগতে সুখে বাস করত। পূর্ণবাবুর প্রীতিভাজন হয়ে থাকলে আরও উন্নতি হত দিন দিন।

ভাল দু'জনেরই হত। হেমন্তও নিজের মতো নিজের কাজ নিয়ে থাকত—কোন অশান্তি বা আশঙ্কা ভোগ করতে হত না।···খুবই ভুল করল হয়ত কমলাক্ষর ভুল ধারণা ভেঙে দিতে গিয়ে। সবচেয়ে ভুল, এইভাবে ডেকে পাঠানোটাই। অকারণেই এসেছিল—পরের গরজে—গরজ ফুরোলে চলে যাবে, এইটেই সঙ্গত। দু'দিনের পরিচয় দু'দিনেই ভুলে যেত। মিছিমিছি সাধ ক'রে এই অশান্তি ডেকে আনার কোন দরকার ছিল না।

ভাল হবে না, এতে ওর ভাল হবে না—তা ওর অন্তর্যামীই বলছেন। সাবধান ক'রে দিচ্ছেন বার বার। অনেক দুঃখের পর, অনেক নৈরাশ্যের কুয়াশা কাটিয়ে ওর দিশাহারা নোঙর-ছেঁড়া ভাগ্যের নৌকো এতদিনে একটু কূলের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে—আবার ইচ্ছে ক'রে বুঝি অকূলের দিকে সে নৌকোর মুখ ফেরাল সে।

অনেক ভাবল। পূর্ণবাবু এসে ওর শুকনো মুখের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। হেমন্ত বাজে ওজর দিয়ে কাটিয়ে দিল, শেষে বলল মাথা ধরেছে।

পূর্ণবাবুকে বলা গেল না কমলাক্ষর কথাটা, কেন বলতে পারল না, সেও সারাক্ষণ একটা অশান্তি, বলবে কি বলবে না—মনে মনে এই চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া, বললেও কীভাবে বলবে তাই নিয়ে তোলাপাড়া, তার মধ্যেই নিজেকে ভ্রূকুটি ক'রে প্রশ্ন—কেন গোপন করতে চাইছে—কেন বা সংবাদটায় মিথ্যের প্রলেপ দিয়ে সুসহ ক'রে তুলতে চাইছে—তবে কি কোন অন্যায় আছে এর মধ্যে ?—

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হল না। 'সন্ধ্যাটা বৃথা গেল।' এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে পূর্ণবাবু সকাল সকাল চলে গেলেন।···

তারপরও দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে ভাবল।

এখনও হয়ত সময় আছে নিবৃত্ত হওয়ার। কিছুই না, এমন কোন বন্ধন নয়। ওর মনের দিক থেকে কোন খারাপ আকর্ষণ কিছু নয়—দোষের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেমানুষ, ভাল লেগেছে—এমনিই একটা ঝোঁক এসেছে তাই ছুটে ছুটে আসে, আবার দু'দিন পরেই হয়ত এ ঝোঁক কেটে যাবে। তার জন্যে মিছিমিছি—দু'জনেরই উপকারী অভিভাবকস্থানীয় একটা লোককে ক্ষুব্ধ—হয়ত বা বিদ্বিষ্টও করবার দরকার কি ? এক কথাতেই এ অশান্তির শেষ ক'রে দেওয়া যায়। ডেকে পাশে বসিয়ে মিষ্টি কথায় বললেই হল, 'আগে বলি নি, এখন বলছি—তোমার আমার ভালর জন্যেই বলছি—তুমি আর এসো না ভাই, লক্ষ্মীটি! যদি কখনও আসা দরকার মনে করো, কিম্বা আমারই কোন বিপদ-আপদ ঘটে—খবর দিই, সে আলাদা কথা—নইলে মিছিমিছি তোমার মাস্টারমশাই যখন পছন্দ করছেন না, আর এসে দরকার নেই! লক্ষ্মীছেলে, কিছু মনে ক'রো না।'

বলা যায় বৈকি, এখনই বলা যায়। আর তাতে ওরও দুঃখটা অত দুঃসহ বোধ হবে না।

কিন্তু হতাশভাবেই স্বীকার করল সে, নিজের মনের কাছে—একথা সে বলতে পারবে না। অর্থাৎ বলতে চায় না। ঐ ছেলেটার আসার গরজ তার যতখানি—ওর তা থেকে কিছুমাত্র কম নয়। তার ঐ উৎসাহপ্রদীপ্ত উপস্থিতি ওর অন্ধকার জীবনে—

এতদিনের অপরিসীম দুঃখ ও ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মনে—যেন ক্ষণকালের জন্যে আশা ও আনন্দের একটা আলো নিয়ে আসে, রুদ্ধ জীবনে আনে এক চপল সুগন্ধবহ দক্ষিণা বাতাস। শুধু এই—আর কিছু নয়। তবু সেটা এতই দুর্লভ ওর এতদিনের জীবনে যে, এটুকুও হারাতে রাজী নয় সে। ঐ তরুণের মুগ্ধ চোখের চাহনিতে নেশা লেগেছে ওর, যে নেশার ঘোরে নিজের মূল্যের একটা অস্পষ্ট আভাস পায়—এখনও স্বপ্নের আমেজ লাগে কল্পনায়। এই ক'দিনে সে নেশা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ছাড়া হয়ত অসম্ভব নয়—ছাড়তে ইচ্ছে করে না! কেনই বা ছাড়বে, এইটুকুতে আর কি ক্ষতি, এই কথাই মনে মনে প্রশ্ন করছে শুধু বার বার।

তবু—কমলাক্ষকে ডেকে পাঠানোর কথা বা তার আসবার কথা পূর্ণবাবুকে বলতে পারল না। সেদিনও না, পরের দিনও না।

নিজেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করত, কমলাক্ষর প্রসঙ্গ উঠলে সে কেমন সুকৌশলে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পাছে পূর্ণবাবু কোনদিন সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে বসেন, 'সে ছোকরা এখনও আসে নাকি এখানে?' প্রশ্ন করলে একেবারে খাড়া মিথ্যে কথাটা বলা যাবে না। বলা উচিত নয়। মিথ্যা বলতে হয় সত্যের একটা আড়াল রেখে। নির্ভেজাল মিথ্যে—বিপজ্জনক তো বটেই—অপমানকরও। ধরা না পড়লেও অপমান, নিজের আত্মসম্মানের কাছে।

কমলাক্ষ নিয়মিতভাবে আসতে শুরু করল আবার।

অবশ্য সব দিন যে দেখা হত, তা নয়—কারণ তার অবসরের সঙ্গে ওর অবসর মিলত না অনেক সময়। দু'জনেরই সময় এক রকম পরের কাছে বাঁধা। তেমন দিনে দু'বার—কোনদিন বা তিনবারও আসত খোঁজ করতে। তবে যখনই আসুক, সন্ধ্যাবেলায় কখনও আসত না। রাতে সাড়ে ন'টার আগে নয়। অর্থাৎ পূর্ণবাবুর থাকার সময়টা—সাধারণত সাড়ে ছ'টা সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত থাকেন তিনি, অবশ্য হেমন্ত বাড়ি থাকলে—পরিহার ক'রে চলত। তেমনি রাত দশটার পরও আর কোনদিন আসে নি। হেমন্ত তা লক্ষ্য ক'রে দু-একদিন বলেওছে, 'ছেলের রাগ এখনও যায় নি দেখছি! কী বলেছিলুম একটু—তাই আর কোনদিন বেশী রাতে এসো না, না—?…অন্তত একদিন এসো অমনি দমকা—রাত এগারটা-বারটায়—তবে বুঝব যে, তুমি কিছু মনে করো নি।'

কমলাক্ষ জিভ কেটে বলেছে, 'না না, ছিঃ! কি বলছেন! রাগ নয়!…এত দিনে একটু জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, তাই বলুন। সত্যি ওরকম আসা উচিত নয়। মাস্টারমশাই ঠিকই বলেছেন কিন্তু কথাটা—অমন অসময়ে এলে সকলের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগবে। খুবই অন্যায় হয়েছিল।'

একটা কথা হেমন্ত লক্ষ্য করছিল এরই মধ্যেই—সে যে এইভাবে আসে—নিয়মিত প্রায়—তা কমলাক্ষও পূর্ণবাবুকে বলে নি। হেমন্ত জিজ্ঞাসা করে নি, তবে এটা ঠিক জানে যে, পূর্ণবাবু টের পেলে সে প্রসঙ্গ তুলতেন নিশ্চয়ই, বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। অন্য কোন পথ ধরতেন কমলাক্ষর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করবার।…এটাও খারাপ লাগে

হেমন্তর। কেন লাগে তা সে স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারবে না কাউকে—মনে মনে কেমন যেন একটু শঙ্কাও বোধ করে—অজানা, অবর্ণনীয় একটা সামান্য আশঙ্কা। নিজের ভবিষ্যৎ, ঐ ছেলেটার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। অত সরল, অত উজ্জ্বল, নিষ্পাপ এক তরুণের এই আপাত-অকারণ মিথ্যাকরণটাই খারাপ লাগে। সে-ই-কি এ জন্যে দায়ী—হেমন্তই? ওর মধ্যেই কি এক অশুভ সর্বনাশের বীজ আছে বাসা বেঁধে, ওর সংস্পর্শে যে আসবে তারই ছোঁয়া লাগবে সে পাপের? ওর শাশুড়ি ওকে ডাইনী বলতেন, পিশাচী বলতেন—ও-ই নাকি তাঁর ছেলেকে চুষে খেয়েছে—কে জানে তার কতটা সত্যি, কিছু সত্যি আছে কিনা!

পূর্ণবাবুর বাগানবাড়ি বহু দূরে। বালিগঞ্জ নাম—কিন্তু বালিগঞ্জ বলতে যা বোঝায় তার একেবারে একপ্রান্তে, মনোহরপুকুরের রাস্তা দিয়ে গিয়ে সেই এক রেল লাইনের ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নিবান্দা অর্থাৎ নির্বান্ধব পুরী যাকে বলে। আশেপাশে অনেক দূরে দূরে দু-এক ঘর লোকের বসতি, তার মধ্যে পাকা বাড়ি নেই বললেই হয়—ছাদে উঠলে বহু দূর-দূরে এক-আধখানা কোঠাবাড়ি নজরে পড়ে। তাও উত্তর-পূব দিকে যা কয়েকটা—কাঁকুলিয়া না কি বলে গ্রাম একটা—সেখানেই যা দু-এক ঘর ভদ্র গৃহস্থের বাস। দক্ষিণে নতুন যে রেল লাইন পাতা হচ্ছে কালিঘাটের দিকে—তার ওপারেও নাকি ভদ্রলোকের বসতি আছে সব, ঢাকুরে, গড়ে—সব গ্রাম, কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় না, সেখানকার বাড়িঘরও দেখা যায় না এখান থেকে।

এত দূরে—এই বলতে গেলে গভীর অরণ্যের মধ্যে—জমি কেনার মানে কি জিজ্ঞাসা করলে পূর্ণবাবু হাসেন। বলেন, 'হবে। দেখো এককালে এই দিকেই শহর সরে আসবে। তখন এর চার পাশে বড়বড় অট্টালিকা উঠবে—এই পাঁচ বিঘে জমি কিনেছি পাঁচ শ' টাকায়—যদি বেঁচে থাকো, এই জমির দাম একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠবে। ভাবছ গালগল্প—আমি বলছি, তুমিই দেখে যাবে সে দাম।'

'কিন্তু এখন এখানে থাকো কি ক'রে?' প্রশ্ন করেছিল হেমন্ত।

পাড়াগাঁয়েই তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, কিন্তু সে এরকম বিজন বন নয়। আশেপাশে অনেকের বাড়ি, লোকজনের কথাবার্তা, এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে বসে যে কথা হচ্ছে, তা স্পষ্ট না শোনা যাক, গলার আওয়াজ একটা পাওয়া যেত, রাত্রেও একা পুকুরঘাটে যেতে ভয় করত না। এখানে দোতলাতেও ঘর থেকে বারান্দায় বেরুনো যায় না, গা ছমছম করে। চারিদিকে—যাকে কেতাবে বলে সূচীভেদ্য-অন্ধকার, তার মধ্যে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে দপদপ ক'রে—ছেলেবেলায় শোনা আলেয়াভূতের গল্প মনে পড়ে যায়। শব্দের মধ্যে সন্ধ্যার আগে থেকেই শিয়াল ডাকতে আরম্ভ করে, একসঙ্গে যে কতগুলো ডাকে, চারদিক থেকে—তার সীমাসংখ্যা নেই, এক-একদিন তাদের এই বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে পর্যন্ত চলে আসে শিয়ালের পাল। আর অবিরাম ঝিঁঝি-পোকা ডাকার শব্দ। সবসুদ্ধ জড়িয়ে যেন ভুতুড়ে ব্যাপার মনে হয়। প্রথম যেদিন এখানে আসে—ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল সারারাত—চোখে-পাতায় এক করতে পারে নি।

তবু পূর্ণবাবুর এখানে দুটো দারোয়ান আছে, একটা ভাঙাচোরা বন্দুকও নাকি

আছে 'তাদের, বাগানেরই একপাশে একখানা ঘরে মালীরা থাকে সপরিবারে, মজুররাও থাকে কেউ কেউ। সেকথা বলেওছেন পূর্ণবাবু, 'সারারাত দু'জনে পালা ক'রে ঘুরছে দরোয়ানরা—বাড়ির চারদিকে, কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও'—তাতেও ঘুম আসে নি চোখে। ওর ভয়ের জন্যে তেলের লণ্ঠনের বদলে—হেমন্ত যেদিন আসে—ঝাড়-বাতিদানে দশ-বারোটা ক'রে মোমবাতি জেবলে দিতে বলেন, ঘরে, দালানে—কিন্তু তাতে বাইরের অন্ধকারটা যেন আরও বেশী বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। ক'বছর কলকাতায় থেকেই বোধহয় অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে—পূর্ণবাবু ঠিকই বলেন। অথচ উপায় বা কি ?

এই কারণেই হেমন্ত আসতে চায় না এখানে। নেহাৎ পূর্ণবাবুর অনুনয়-অনুরোধ পীড়াপীড়িতে এক-আধবার রাজী হতে হয়—তবে সেই আসার দিনটাকে যতদূর সম্ভব নানা ওজরে টেনে নিয়ে যায়, বিলম্বিত করে। দু'মাস তিন মাস—সম্ভব হলে চার মাসের ব্যবধান ক'রে আনে দুটো অবস্থিতির মধ্যে। এলেও 'কেস'-এর অজুহাত দেখিয়েই এক রাত্রির বেশি থাকে না কখনও। বিকেলে আসে, সকালবেলাই গাড়ি ডাকিয়ে ফিরে যায়।

এবার চৈত্রমাসের প্রথমে কিন্তু পূর্ণবাবু চেপে ধরলেন, টানা তিন-চারটে দিন গিয়ে থাকতেই হবে। ওঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই দার্জিলিং যাচ্ছে—একেবারেই ফাঁকা এখানকার সংসার, পূর্ণবাবুর আদৌ ভাল লাগছে না। হেমন্ত চলুক, এখানে রটনা ক'রে দিলেই হবে যে, বাইরের রাজবাড়ি থেকে—হেতমপুর, দীঘাপতিয়া, পুঁটিয়া কিংবা আরও দূরের কোন রাজবাড়ির নাম করলেই হবে—ডাক এসেছে, যেতে-আসতেই তো দু'দিন-আড়াই দিন। কাজেই চার দিন কাটিয়ে এলেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। চাই কি, আরও দু-এক দিন বেশিও থেকে আসতে পারে। বললেই হবে যে, তারা মোটা টাকা দিতে চেয়েছে—ক'দিনের মতো ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

পূর্ণবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে চোখ টিপে বললেন, 'সে টাকা—দু'শো আড়াইশো যা বলো, আমিই তোমাকে দিয়ে দেব। খুব একটা মিছে কথাও বলা হবে না।'

তবু নানারকম টালবাহানা ক'রে আরও ক'টা দিন কাটাল হেমন্ত।

শুধু ওখানে থাকতেই যে আপত্তি তা নয়, এখান থেকে যেতেও অনিচ্ছা। বরং এটাই বেশী। কেন অনিচ্ছা তা নিজেও ভাবতে সাহস করে না আজকাল। তবু—মনের অবচেতনেই একটা হিম হতাশার সঙ্গে বোধ করে যে—সে কারণটাও ওর অজ্ঞাত নয়। এখানের আকর্ষণ কিসের তা জানে সে। সে যে আজকাল প্রতিদিনই প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমলাক্ষর আসবার সময়টির জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে, এবং তার আসার কোন নির্ধারিত সময় নেই বলেই অস্থির ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সারাটা ক্ষণ—এ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তবু যেতেই হয়। না যাওয়ার কোন প্রবল যুক্তি দেখাতে পারে না। নতুন কী এক কলের গান বেরিয়েছে, সেই কল একটা কিনেছেন পূর্ণবাবু ওখানের জন্যে। সেই সঙ্গে গোল চওড়া বালার মতো কতকগুলো—তাকে নাকি রেকর্ড বলে, সেই বালাগুলো পরিয়ে কল চালিয়ে দিলে আপনিই গান হয়। তাতে সময় কেটে যাবে বেশ,

সন্ধ্যেবেলা বসে কেবল শিয়াল আর ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে হবে না। এছাড়া একটি উড়ে বামুনকেও বলে রেখেছেন, ওঁদের সঙ্গে যাবে—যাতে হেমন্তকে গিয়ে দু'বেলা রাঁধতে বসতে না হয়। তাতে লোকও একজন বাড়বে। এখান থেকে ওর বাইরের ঝিকেও চাই-কি নিয়ে যেতে পারবে হেমন্ত, কাজেই অতটা নির্জন আর মনে হবে না। দুপুরবেলা একবার ক'রে পূর্ণবাবু কলকাতা আসবেন যা—তা তখন তো আর ভয়েরও কোন কারণ নেই, তিনি দ্রুত এখানের কাজ সেরে বিকেলের মধ্যেই পেঁছে যাবেন প্রত্যহ—সে প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সময়ও আর নেই, চৈত্র-সংক্রান্তি পোয়াতে, স্ত্রী হয়ত আগের দিনই এসে পড়বেন, কি তার আগের দিন।

সুতরাং চৈত্রের শেষদিকে, একসময়ে, চার দিনের জন্যে বাগান-বাড়িতে যেতেই হল।

এমনিই যথেষ্ট অনিচ্ছা ছিল, যাওয়ার আগে আর একটা ব্যাপারে আরও মন খারাপ হয়ে গেল হেমন্তর। কোথায় যাচ্ছে তা সঠিক কাউকেই বলা হল না— ভয় ছেলেকেই বেশী—সেই জন্যেই ঝি-চাকরদের কাছেও গোপন করা; ওর বাইরের ঝি, যে 'কেস' করতে যাবার সময় সঙ্গে যায়, খুব বিশ্বাসী আর স্বল্পভাষী, তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোবে না।

কেবল কমলাক্ষকে মিথ্যা কথা বলতে মন সরল না। বিশেষ তার কাছে আর গোপন করার দরকার কী? সে কি আর জানে না পূর্ণবাবুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা! তাই সেদিন সকালে সে আসতে চুপিচুপি জানিয়ে দিল ও কোথায় যাচ্ছে এবং ক'দিন এখানে অনুপস্থিত থাকবে।

খবরটা শুনে তার মন খারাপ হবে, মুষড়ে পড়বে—এইটেই ভেবেছিল, কিন্তু কমলাক্ষ অকস্মাৎ যেন একেবারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। দেখতে দেখতে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল তার। অমন কোমল গভীর দৃষ্টি উগ্র হয়ে উঠল, এমনিই তো গরমের সময়, তার ওপর সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলেই সে ঘেমে ওঠে—এখন আরও বেশী, মোটা ধারায় জল ঢালার মতো ঘাম গড়িয়ে পড়তে শুরু হল গাল বেয়ে, গলা বেয়ে কানের পাশ দিয়ে, আর একটা জিনিস হল—যা আগে কখনও দেখে নি হেমন্ত—কপালের শিরাগুলো নীল দড়ির মতো হয়ে ফুটে উঠল রগের দু'পাশে।

সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, আপনি ওর বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকবেন কি!···ছিঃ ছিঃ! হতেই পারে না তা। একথা আপনি ভাবতে পারলেন কি ক'রে? কক্খনও যাবেন না—কিছুতে না। দ্যাট ওল্ড স্কাউন্ড্রেল! ব্যাস্টার্ড! বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনও এ সব বজ্জাতি গেল না!···আপনি যেতে পারবেন না ওখানে, বলে দিচ্ছি। যাক্ তো কেমন নিয়ে যেতে পারে!···আই'ল মার্ডার হিম! চাবুকপেটা করব, মাস্টার বলে মানব না! রাস্কেল কমনেকার!'

হেমন্ত তো অবাক। এরকম চেহারা কখনও দেখে নি কমলাক্ষর, কখনও কল্পনা করে নি দেখবে বলে। সে দস্তুরমতো থতমত খেয়ে গেল এই প্রচণ্ড উষ্মা দেখে। বাগানবাড়ি যে মধ্যে মধ্যে যায়, তা অবশ্য কখনও পরিষ্কার ক'রে বলে নি ওকে—তবে এটা তো ধরে নেওয়াই উচিত। যখন এতটা নামতে পেরেছে, তখন ওটাই বা পারবে না

কেন ? যে সম্পর্কটা এখানে আছে, তার বেশী আর ওখানে কি হতে পারবে—যার জন্যে এতটা বিচলিত জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল কমলাক্ষ।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে একটু সময় লাগল, তারপরই ব্যাকুলভাবে ওর মুখের ওপর হাতচাপা দিল হেমন্ত, 'চুপ চুপ, এই দেখ পাগল কোথাকার—চেঁচায় ! পাড়াসুদ্ধ লোককে না জানালে চলছে না ? এই জন্যে বুঝি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে বললুম !'

কমলাক্ষ যেন সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছিল সেদিন। সে হেমন্তর হাতখানা দু'হাতে ধরে প্রথমটা মুখের ওপরই চেপে রাখল কিছুক্ষণ—তারপর গালে কপালে চোখে বুলিয়ে চেপে চেপে ধরে—শেষে উন্মাদের মতো বিভ্রান্তের মতো সেই হাতের তালুতেই চুমো খেতে লাগল।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত—এত দ্রুত ও অতর্কিতে ঘটল, তরুণ বলিষ্ঠ হাতের সবল স্পর্শে ও সেই উন্মত্ত চুম্বনে এমনই বিহ্বল ক'রে দিল কিছুক্ষণের জন্য যে—কী হচ্ছে সেটাই বেশ কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারল না হেমন্ত।

তারপরই এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ আবার কী ? এ কি অসভ্যতা ? তোমার সাহস তো কম নয় !…এই জন্যে মাস্টারমশাই এত খারাপ !'

বেশ শাসনের সুরে, তিরস্কারের সুরেই বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা নিজের কানেই কেমন দুর্বল ও মিথ্যা মনে হল—আত্মবিশ্বাস-শূন্য। গলার আওয়াজে যে কিছুমাত্র তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেল না, বরং এক ধরনের উত্তেজনায় ও উৎসুক প্রত্যাশায় কেঁপেই গেল বলার সময়, তাও বুঝতে পারল।

কমলাক্ষর কিন্তু এত লক্ষ্য করার অবস্থা নয়। সত্যি-সত্যিই ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল সে, 'কেন, কেন আপনি ও কথাটা শোনালেন আমাকে !…সামান্য ক'টা টাকার জন্যে আপনি—আপনার মতো—ওঃ, আমি যে ভাবতেই পারি না! এর চেয়ে, এর চেয়ে—'

কথা শেষ করতে পারল না। আবেগে কান্নায় গলা চেপে এল, কী বলবে কী বলতে চায় তাও হয়ত ঠিক মাথার মধ্যে স্পষ্ট নয় তখন—চিন্তা-ভাবনা সব গোলমাল হয়ে গেছে, মনোভাব প্রকাশের মতো শব্দ বা ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না। সে যেমন অকস্মাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ; অকস্মাৎ সম্বিৎ, শোভনতা ও হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিল, তেমনিই অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

কমলাক্ষকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে ঝি ছুটে ওপরে এসেছিল, এখন তাকে ঐভাবে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যেতে দেখে সে বললে, 'কী হয়েছে গা দিদিমণি, ঐ দাদা এমন করে বেইরে গেল ?'

হেমন্তরও যেন সেই মুহূর্তে কথা যোগাচ্ছে না মুখে, উপস্থিত-বুদ্ধি এক প্রবল দুর্যোগে যেন ঘুলিয়ে উঠেছে, মিথ্যা কথা একটাও খুঁজে পাচ্ছে না। কোনমতে ঢোক গিলে গিলে বললে—বলতে বলতেই সামলে নিতে হচ্ছে নিজেকে, গলাটা স্বাভাবিক করতে হচ্ছে—'ও কিছু না, মানে—ইয়ে—বাড়িতে অযথা রাগারাগি করেছে বোয়ের সঙ্গে, সেই জন্যে—ইয়ে—আমার কাছেও বকুনি খেয়েছে—তাই !'

'ওমা, তাই বলে অতবড় বেটাছেলেটার চোখে জল! ও আবার কেমনতারা পুরুষ মানুষ!'

॥ ১৭ ॥

আজকের এই সকালটাই শুধু বিষিয়ে গেল না কমলাক্ষ—শুধু আজকের দিনটাও না—এরপর আসন্ন প্রমোদবাসের চিন্তাও অসহ্য বোধ হতে লাগল। মনটা ভারী অবসন্ন হয়ে উঠেছে, কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের সম্বন্ধেই সবচেয়ে বিতৃষ্ণা যেন। নিজের মনের যে রূপটা দেখতে পেয়েছে, তাতে মাথাকুটে মরতে চাওয়াই উচিত। এরপর সেই জনহীন পল্লীর নির্বান্ধব-পুরীতে একমাত্র পূর্ণবাবুকে অবলম্বন ক'রে, একমাত্র তাঁর সাহচর্যেই চারদিন একান্তবাসের কথা কল্পনা করতেই যেন মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

অথচ যেতেই হবে। এতদিন টালবাহানা ক'রে শেষ অবধি কথা দিয়েছে, এত আয়োজন পূর্ণবাবুর, আজ আর যাব না বলা যায় না। না যাওয়ার কোন ভদ্রমতো কারণও দেখানো যাবে না। যেতে হবে, চারদিন থাকতেও হবে—সবচেয়ে বড় কথা—হাসতে হবে, হাসাতে হবে। আনন্দ করতেই নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, অনেকদিনের সাধ তাঁর—ক'দিন নিরিবিলিতে হেমন্তকে নিয়ে সুখবাস করবেন, আনন্দ করবেন।...

দুপুরের দিকে গাড়ি আসবে, যেতেও ঘণ্টা দেড়েক লাগবে অন্তত—ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়ি—এইটুকু সময় হাতে আছে। প্রাণপণে সাধনার মতো ক'রে চেষ্টা করতে লাগল হেমন্ত—এই সময়ের মধ্যে, মন যদি নাও হয়, মুখভাবকে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে।

ওর বিশ্বাস, অপরাহ্নের দিকে যখন বাগানবাড়িতে গিয়ে পেঁছিল, তখন সে সাধনায় ও সিদ্ধিলাভ করেছে। ওর সহজ স্বরূপে ফিরে এসেছে ও। কিন্তু পূর্ণবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সন্ধ্যা নাগাদ সব হাসিখুশি-গল্প একতরফাই হচ্ছে দেখে তিনি এক সময় অনুযোগ করলেন, 'অমন মুখভার ক'রে আছ কেন? গোমড়া মুখ ক'রে?... বর্ষার মুড়ির মতো মিইয়ে যাচ্ছ যে! এতই খারাপ লাগছে আমাকে?'

হেমন্ত ভ্রূকুটি ক'রে জবাব দিল, 'তোমার সঙ্গে তো নিত্যই দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, ছেড়েও তো দিচ্ছ না কিছু! খারাপ লাগলে তো কবেই জানতে পারতে।...এখানে আমার ভাল লাগে না—জানই তো! জেনেশুনেই তো এনেছ!'

'কেন যে ভাল লাগে না তা জানি না।' অপ্রসন্নমুখে বলেন পূর্ণবাবু, 'নির্জন, ভয় করে, একা-একা থাকতে হয়—যত যুক্তি ছিল তোমার না-আসার—সবই তো কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি, তবুও অত ব্যাজার মুখ কেন? তাহলেই বলতে হয় যে, আমাকেই আসলে পছন্দ নয়।'

'তোমাকে যে খুব পছন্দ, এমন কথা কি কখনও বলেছি?' শাণিত হয়ে ওঠে হেমন্তর কণ্ঠ, বহুদিনের জ্বালা যেন গলা দিয়ে উপচে উঠতে চায়, 'না, সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করেছ? পছন্দ আছে জেনে তবে গায়ে হাত দিয়েছ? তোমার দরকার তুমি সেইটেই ভেবেছ, আমার মতামত, ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা কখনও ভেবেছ কি?'

চুপ ক'রে থাকেন পূর্ণবাবু। হেমন্তই আবার বলে, 'মানুষের মনের গতিক কি সবদিন সমান থাকে? তোমার যখন হাসবার ইচ্ছে হবে তখন আমার না-ও হতে পারে।

তোমার মন যুগিয়ে চলতে হবে—এমন কড়ার কখনও করেছি কি ?'

এ কঠিন আঘাতও নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। শুধু মুখটা যে লাল হয়ে ওঠে, আর দৃষ্টি কঠিন—তাইতেই বোঝা যায় আঘাত যথাস্থানে ঠিকমতোই বেজেছে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন পূর্ণবাবু, তারপর সহসাই প্রশ্ন করেন, 'কমলাক্ষ আর আসে তোমার ওখানে ?'

কঠিন প্রশ্ন। সুকঠিন উত্তর দেওয়াও। চুপ ক'রে থাকা বিপজ্জনক।

বহুদিন এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল সে, তখন করেন নি পূর্ণবাবু। আজ এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিক এই আলোচনার সূত্র টেনে প্রশ্নটা করাতে কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হল বৈকি ! কতদূর কি ভাবছেন লোকটি, কিসের সঙ্গে কি মেলাচ্ছেন বলা শক্ত, এ উত্তরের ওপর হয়ত অনেকখানি নির্ভর করছে ; বহুদূর-প্রসারী বহু-বিস্তৃত চিন্তার হয়ত এই শুরু। যা শুনবেন তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা করবেন।

তবু মিথ্যা কথাও বলা গেল না। বলা উচিত নয়।

বহুলোক যে কথা জানে সে কথা সরাসরি গোপন করতে যাওয়ার মতো মূর্খতা নেই। বাড়িতে আসে, ঠাকুর চাকর দারোয়ান সবাই জানে, এরপর যদি তাদের কারও কাছ থেকে শোনেন ?

উদাসীনভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, 'মধ্যে মধ্যে আসে।'

'আসে ! কৈ, বলো নি তো ?'

পূর্ণবাবু চমকে সোজা হয়ে বসেন, কি ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন, সে রকম কিছু নয়—তবু কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্নতা একেবারে গোপন করতে পারেন না।

হেমন্তর যে কয়েক-মুহূর্ত বিলম্ব হল উত্তর দিতে—এর কোন বিশেষ অর্থ করার চেষ্টা করছেন কিনা, করলেন কিনা—কে জানে !

হেমন্ত উত্তর দিল, 'তুমি তো জিজ্ঞাসাও করো নি এর ভেতর কোনদিন ! অত আমার মনেও ছিল না। তাছাড়া আমি ভেবেছি তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই তুমি শোন—'

তারপর একটু থেমে কথাটা আরও লঘু করার জন্যে বলে, 'বোধহয় তুমি খুব বকেছিলে রাত করে আসবার জন্যে—সেই ভয়েই তোমাকে জানায় নি। অনেকদিন আসে নি তারপর, এখনও এক-আধদিন যা আসে সকাল ছাড়া আর আসে না, ঐ কলেজ যাবার আগে।...খুব ভয় করে তোমাকে !'

এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করলেন না পূর্ণবাবু। জোর ক'রেই যেন অন্য কথা পাড়লেন।

হেমন্তও আর অকারণে নিজে থেকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল না। বরং সহজ ও স্বাভাবিক হবারই চেষ্টা করতে লাগল। কিছু পূর্বের মনোমালিন্যটা মিটিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর সে। হিসেব ক'রে ক'রে, পূর্ণবাবুর মন কোন কুটিল গলিপথে বিচরণ করে—এতদিনে যতটা জেনেছে—সেই পথেই অগ্রসর হতে লাগল, হাসি-খুশি রসিকতায়। ওঁর পছন্দমতো আচরণে ওঁকে খুশি করারই চেষ্টা করতে লাগল।

তবু অস্বস্তি একটা থেকেই গেল মনের মধ্যে।

যদি এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতেন, যদি কোন বাঁকা মন্তব্য করতেন—রাগ করতেন খানিকটা তো, নিশ্চিন্ত হত হেমন্ত।

এই লোকটি অতি সামান্য অবস্থা থেকে অনেক বড় হয়েছেন শুধু বিদ্যা বা প্রতিভায় নয়—বুদ্ধিকৌশলেই বেশী। এঁর মুখেই শুনেছে হেমন্ত, দূর সম্পর্কের কে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পড়াশুনো করেছেন ছেলেবেলায়—সে বাড়ির অন্য ছেলেরা তাদেরই আশ্রিত একটা ছেলে তাদের চেয়ে ভাল পড়াশুনো করছে এটাকে এক রকমের ধৃষ্টতা মনে ক'রে—কি পরিমাণ ওঁকে অপদস্থ ও বিপন্ন করবার চেষ্টা করত দিন-রাত। শুধু নিজের কূটবুদ্ধিকে সদাসতর্ক ও সদাজাগ্রত রেখেই সেখানে বাস করতে পেরেছেন ক'টা বছর। চারিদিকে দৃষ্টি রাখতে হত, সকলের মনের গতি লক্ষ্য করতে হত—কে কোথা দিয়ে তাঁকে বিপন্ন কি অপদস্থ করার চেষ্টা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে হ'ত কোন কৌশলে সে আঘাত প্রতিহত করতে হবে, ষড়যন্ত্র বানচাল করতে হবে।

এইভাবেই, পরবর্তী কালেও, পরভৃৎ পরান্নভোজীর জীবন যাপন করতে হয়েছে—এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়িতে—সর্বত্রই এইভাবে লড়াই ক'রে যেতে হয়েছে ঈর্ষা ও নীচতার সঙ্গে। তার ফলে পূর্ণবাবুর মনের গতিটাও সর্বদা কুটিল পথের জটিল চিন্তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। কোন জিনিস সহজ সরল অর্থে গ্রহণ করার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ঘটনার আপাত-চিত্রের পিছনে কি আছে—সর্বদা সেইটে দেখার ও ভাবার চেষ্টা করেন।

ভয় ঐ ছেলেটার জন্যেই, হেমন্তর আর কি অনিষ্ট করবেন উনি? যদি এখন সংস্রব ত্যাগ করেন তো সে বেঁচে যায়। যে পসার হয়েছে তা এখন আর সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না, নিজেকেও সেই সঙ্গে হেয় না ক'রে। তার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না আর—এটা নিশ্চিত, অবশ্য ভগবান যদি না মারেন, দেহটা যদি ভেঙে না যায়।

কমলাক্ষর কিন্তু অনেক অনিষ্ট করতে পারেন, অনেক শত্রুতা।

এই উন্নতির মুখ এখন ওর।...

এখনও যদি সুবুদ্ধি হয়, যদি আসা বন্ধ করে তো ভাল।

সেই কথাই বলবে ও কমলাক্ষকে—মনে মনে বার বার সংকল্প করে। আর না। বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে, সংসার সম্পূর্ণ ওর ওপরই নির্ভর করছে—নিজের আখেরটা দেখতে হবে তো।...

কী লাভই বা এভাবে এসে! শুধু শুধু দুটো লোকেরই মনে অশান্তি বাড়ানো—ভবিষ্যতের অনেক অশান্তির কারণ সৃষ্টি করা।

না, এবার বন্ধ করতেই হবে এই দেখাশুনো। ভাল নয় এটা, কারও পক্ষেই ভাল না।

বিশেষ সেদিন ওর মনের যে চেহারাটা, যে নগ্ন বুভুক্ষা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—তার পর আর কোনমতেই ওকে আসতে দেওয়া বা নিভৃতে দেখা করা উচিত নয়।

সেই কথা বুঝিয়ে বলে ওকে নিবৃত্ত করতে হবে।

দরকার হয় জোর করতে হবে।...

বার বার প্রতিজ্ঞা করে, বার বার নিজেকেই শাসায়—আর প্রাণপণে পূর্ণবাবুকে খুশী করাবার, ভোলাবার চেষ্টা করে। কেন যে এত বার বার সংকল্প করতে হয়, এত

ক'রে বলতে হয় নিজেকে—সেইটেই শুধু ভেবে দেখে না। ভাবতে সাহস হয় না বোধ হয়।

এখান থেকে পূর্ণবাবু রওনা দেন সকাল আটটা নাগাদ, ফেরেন অপরাহ্নে—চারটে সাড়ে চারটেয়। দুপুরে নিজের বাড়িতেই খাওয়া সারেন। একদিন অবশ্য বেলা একটাতেই ফিরে এসেছিলেন—বাকী সব দিনই মধ্যের এই সময়টা হেমন্তর নিজস্ব। একটু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে, ভাবতে পারে নিজের কথা, নিজের ভবিষ্যৎ।

এই সময়টা আর মুখোশ পরে থাকতে হয় না—লক্ষ্য রাখতে হয় না তার মুখ দেখে পূর্ণবাবু কি অনুমান করার চেষ্টা করছেন। এইটুকুই তার অবসর—অবকাশও।

চার দিনের দিন, দুপুরের দিকে বাগানে বেরিয়ে পড়েছিল একটু। শেষা-প্রভাত যাকে বলে—বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটায়।

পরের দিন সকালে চলে যাওয়ার কথা। আর হয়ত দীর্ঘদিন আসা হবে না। এমন-ভাবে তো নয়ই। এর আগেও যা এসেছে—রাত্রে রাত্রেই, বাগানটাও ভাল ক'রে ঘুরে দেখা হয় নি। একদিন দুপুরে এসেছিল। এইখানে কাছাকাছি সানি পার্কে একটা কেস ছিল—দু'জনেরই কেস—সেরে, পূর্ণবাবু পীড়াপীড়ি ক'রে নিজের গাড়িতে ক'রে এনেছিলেন। কিন্তু সেও—তখন এত ক্লান্ত, ঘুরে ঘুরে বাগান দেখার অবস্থা ছিল না।

এই গত তিন দিন যা একটু-আধটু ঘুরেছে, সকালের দিকে। দু'দিন পুকুরে স্নানও করেছে, ভরসা ক'রে পূর্ণবাবুর নিষেধ না শুনে। তাঁর কেবলই ভয় ডুবে যাবে হেমন্ত। ও যে সাঁতার জানে, সে তথ্যটা আমলে আনেন নি বিশেষ, বলেছেন, 'কতদিন সাঁতার কাটো নি, হয়ত ডুবে যাবে, পারবে না। এ পুকুরের জলটাও ভারী, ব্যবহার তো হয় না বিশেষ। অত গোঁয়ার্তুমি করতে যেয়ো না।'

প্রথম দিন সে জন্যে বাড়িতেই নেয়েছে, তোলা জলে। তারপর আর লোভ সামলাতে পারে নি। নেমেছে, সাঁতারও কেটেছে। একটু একটু ক'রে ভয় ভাঙতে, হাত-পায়ের খিল ছাড়তে এপার-ওপারও করেছে দু তিনবার।

তবু বাগানটা পুরো দেখা হয় নি। বিরাট বাগান, পাঁচ বিঘের ওপর জমি, ছ' বিঘের কাছাকাছি।...আম-জাম-কাঁঠাল-জামরুল-আমড়া-গোলাপজাম—এদিকে নারকেল-সুপুরি—সব রকম জানা গাছই আছে। এ ছাড়া দেশী-বিদেশী ফুল—চাঁপা বকুল কামিনী কাঁটালি-চাপা থেকে শুরু ক'রে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফেলারা পর্যন্ত। বড় বড় গাছই বেশী। ফলে বাগানটা কেমন যেন ঝুপসি ঝুপসি—ছায়াঘন অন্ধকার হয়ে থাকে বেশির ভাগ সময়ই। সকালের দিকে—এই শেষ-বসন্তের সকালেও গা ছমছম করে।

সেই জন্যেই আজ, এই দুপুরে বেরিয়ে পড়েছে, স্নান পুজো সেরে। অনেক বেলা ক'রে খাবে—ঠাকুরকে বলে দিয়েছে। পূর্ণবাবু যদি আসেন দেড়টার মধ্যে এসে পড়বেন, সেই সময়টা পর্যন্ত দেখে খেতে বসবে।...ঘুরতে ঘুরতে, এই প্রথম আজ ভরসা ক'রে পুকুরটা ঘুরে পুব-দক্ষিণ দিকে—নিবিড় ছায়ার মধ্যে ঢুকল সে।...বাঁদিকে, উত্তর-পুব দিকটায় কাঁকুলিয়া বলে গ্রাম, এখানে কিছু বসতি আছে—ভদ্র বসতি নয়—সে অনেক দূরে দূরে! কিছু বস্তিও আছে। কিন্তু এই দক্ষিণ দিকটায় শুধুই বাঁশবন, বড় বড়

তেঁতুল আর অশ্বত্থ গাছ। রেল লাইনটুকু যা ফাঁকা। তার ওপারে এপারে ঠাসা জঙ্গল। ঘর নাকি আছে কিছু কিছু—গোলপাতায় ছাওয়া মাটির ঘর, ওদের ঝিয়ের ননদ নাকি এই দিকেই থাকে—কিন্তু সে-সব ঘর এখান থেকে দেখা যায় না।…

চৈত্রের রৌদ্র-প্রখর মধ্যাহ্ন। মাঝে মাঝে সর সর শব্দে গাছের শাখা-প্রশাখা পত্রপল্লব আলোড়িত আন্দোলিত ক'রে উষ্ণ দক্ষিণা বাতাস বইছে; অনাকি মাছি যেন ডেলা পাকিয়ে কতকগুলো ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে মুখের সামনে; সামনে আধো-আলো আধো-ছায়া জড়াজড়ি-করা গাছের তলায় এই শূন্য স্থানটুকুতে; কত কি নাম-না-জানা পাখি ডাকছে, জানার মধ্যে ঘুঘুই বেশী—দূরে কোন্ গাছ থেকে একটা কোকিল ডেকে যাচ্ছে একঘেয়ে-ভাবে, অবিরাম; ভোরে এই দিক থেকে শ্যামা পাখি না দোয়েল—শিস দিচ্ছিল, এখন আর তার সাড়া নেই; আজ হাটবার—সকাল থেকে গোড়ের দিকে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ ক'রে গরুর গাড়ির দল চলেছে সব্জী নিয়ে—তার একটানা শব্দটা অবশ্য বাড়ি থেকে যত স্পষ্ট এখান থেকে তত নয়, এখান থেকে বরং ভালই লাগছে; মধ্যে মধ্যে এক-এক ঝলক বাতাস বইছে—মলয় বাতাসের মৃদু মাধুর্য তাতে নেই। আছে উষ্ণ অনার্দ্রতা, তাতে গরম বোধ হচ্ছে, কিন্তু অসহ্য কিছু নয়; ঘাম নেই, এতক্ষণে কপালে, চুলের কোলে কোলে ও ঘাড়ে, ভিজে এলো চুলের আড়ালে একটুখানি দেখা দিয়েছে মাত্র।…সব জড়িয়ে খুব—খুব মিষ্টি লাগছে। সমস্ত পরিবেশটাই যেন স্বপ্ন-মাখানো। ঝিলমিলে ছায়ায় রৌদ্রে, আকাশের ধূসর প্রখরতায়, এক-এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসে, ফুলের মিশ্রিত সুবাসে—তার মধ্যে চাঁপার গন্ধটাই উগ্র—সব মিলেই এই স্বপ্নের আবহাওয়া।

বেশ লাগছে হেমন্তর। অনেক দিন পরে ভাল লাগছে।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় আবছা আবছা মনে হচ্ছে জীবনটা মন্দ নয়, শুধু বেঁচে থাকাতেই আনন্দ আছে; সুখের সম্ভাবনাও হয়ত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি ওর জীবন থেকে। কেন মনে হচ্ছে তা জানে না। স্বপ্নে, বিশেষ এই ধরনের দিবাস্বপ্নে যুক্তিতর্কের অবতারণা করলে, সেটা আর স্বপ্ন থাকে না, বাস্তবে এসব সম্ভাবনার কোন স্থান নেই—কিন্তু আজ এই সামান্য সময়টুকু বাস্তব ভুলে থাকলে দোষ কি? আজ একটু স্বপ্নই দেখতে চায় সে—বাস্তব, যুক্তি, ওসব থাক না!…

স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে, চারিদিকের এই পরিবেশ আবহাওয়া যেন স্পর্শ করতে করতে এগিয়ে চলে। সেইভাবেই গাছের ছায়ায় ছায়ায় কখন পাঁচিলের ধারে এসে পড়েছে তাও জানে না, একেবারে চমক ভাঙল একটা কি খস্ ক'রে কোথায় পড়বার শব্দে। ভয় পেয়ে চমকে উঠে দেখে পাঁচিলের ওপার, জঙ্গলের দিক থেকে একটা কার কামিজ পড়ল।

চিৎকার ক'রেই উঠত—অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাত—কিন্তু সেই চকিতের মধ্যেই মনে হল এই কামিজটা তার বিশেষ পরিচিত। মুখে হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠার বেগটা সামলাল বটে—কিন্তু চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। মনে হল সে ভুল দেখছে। এতক্ষণে নিজের অজ্ঞাতসারেই কমলাক্ষর কথা ভাবতে শুরু করেছিল—বোধহয় সেই কারণেই, মনের ঐকান্তিক চিন্তারই ফলে, বইয়ে পড়া মরীচিকার মতো—কল্পনায় জামাটা দেখছে সে। চিন্তা কল্পনাটা এতই একাগ্র যে, মনে হচ্ছে সত্যিই দেখছে।…নইলে এখানে ও জামা আসবে কি ক'রে? আর শুধু জামাটাই?

এর মধ্যেই এমনও মনে হল, আতঙ্কে হিম হয়ে গেল বুকের মধ্যটা—মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—ওদের মালী যা বলে—কোন 'অন্যি দেবতা'র কাজ নয় তো ?

মালী বার বারই বলে, 'এ বাগানে অন্যি দেবতারা আছেন মা, আমি বলছি—বিশ্বেস করুন। মাঝে মাঝেই নানান রকম কাণ্ড করে যান তেনারা।'

এ সমস্ত সম্ভাবনা-ভাবনাই খেলে গেল কয়েক লহমার মধ্যে—বার কয়েক চোখের পলক পড়তে যতটুকু সময় লাগে। এই শেষের কথাটা ভেবে আবারও পালাতে যাবে—এর মধ্যে দেখতে পেল পাঁচিলের ওপর দুটি হাত—সুঠাম সুগৌর—তার একটা আঙুলে বিশেষ পরিচিত একটা চুনির আংটি।

আবারও সেই স্তম্ভিত অবস্থা, পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছে যেন, পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে।

আবারও সেই নিজের দৃষ্টিকে অনুভূতিকে অবিশ্বাস।

এবার আরও বেশী, মনে হচ্ছে এত ভুল দেখছে যখন, মাথাই খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। অতিরিক্ত কমলাক্ষর চিন্তা থেকেই এই কাণ্ড হয়েছে নিশ্চয়।

তবে বেশীক্ষণ লাগল না। একটু পরেই মানুষটাকেও দেখা গেল। চোখের ভুল নয়, স্বপ্ন বা মরীচিকাও নয়—কমলাক্ষই। পাঁচিল ডিঙোবার সুবিধার জন্যে আগে কামিজটা ফেলে দিয়েছিল, শুধু ফতুয়াটাই গায়ে আছে, মালকোঁচা দেওয়া ধুতি—সেই অবস্থায় পাঁচিল ডিঙিয়ে ধুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ল এপারে।

তারপর ভূত দেখার অবস্থা তারও। ভূত না মরীচিকা, মতিভ্রম? স্বপ্ন, চোখের ভুল ?

যার জন্যে এত কাণ্ড, যাকে কেন্দ্র ক'রেই গত তিন দিন সমস্ত চিন্তা, যাকে দেখার উদগ্র বাসনায় এমন ক'রে ছুটে এসেছে—লজ্জা মান ভয় ভবিষ্যৎ সব বিসর্জন দিয়ে—এত সহজে ঠিক সামনেই তার দেখা পাবে এ ভাবতেও পারে নি। ভাবা যায় না এমন যোগাযোগ, বিশ্বাস হয় না।

দু'জনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিস্ময়ের ধাক্কা দু'জনকে জড়ীভূত অনড় ক'রে দিয়েছে, শুধু স্নায়ুতে নয়, মনেও। ধারণা-শক্তিটাই কাজ করছে না কারও।

তার মধ্যে দু'জনেই দেখছে। অবিশ্বাসের মধ্যেও চোখ তার কাজ ক'রে যাচ্ছে—কি দেখছে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখছে মাথায়। একজন দেখছে সদ্যস্নাতা, সিক্ত-আলুলায়িতকুন্তলা দেবীমূর্তি; আরাধনা-স্নিগ্ধ মুখ, চোখে স্বপ্নালস দৃষ্টি—ওর দিবারাত্রির কল্পনায় দেখা রূপ মূর্তিপরিগ্রহ করেছে যেন, ঈশ্বর যেন দয়া ক'রেই এতদিনে অনন্যমনা একাগ্র সাধনার পুরস্কার দিয়েছেন—সেই স্বপ্নের ধনকে মূর্ত ক'রে পাঠিয়েছেন ওর সামনে।

আর একজন ব্যথিত নেত্রে দেখছে তার দুর্ভাগ্য আরও একজনকে কী অমোঘ সর্বনাশের আকর্ষণে টানছে, নিদারুণ নিপাতের দিকে। ক'দিনই বোধহয় ঘুম হয় নি কমলাক্ষর, খায়ও নি ভাল ক'রে। মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে ; চোখের চাহনি উদভ্রান্ত, লোহিতাভ। প্রখর রোদে আর পরিশ্রমে—বোধ হয় অনেক দূর থেকেই হাঁটছে, হয়ত দু'তিন ঘণ্টা ধরেই, কখন থেকে ঘুরছে হয়ত ঠিক স্থানটি বেছে নেওয়ার

জন্যে—সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, ঘামে সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে সদ্য স্নান ক'রে উঠে এসেছে কোথাও থেকে—ফতুয়া ধুতি গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে; চুল রুক্ষ উসকো-খুসকো, বোধহয় সকালে মাথা আঁচড়ানোর কথাও মনে পড়ে নি—অবিন্যস্ত চুলের কিছু কপালে জড়িয়ে গেছে, কোনটার বা প্রান্তে শিশির-বিন্দুর মতো ঘাম জমে আছে—সব জড়িয়ে পাগলের মতোই অবস্থা।

প্রথম সম্বিৎ ফিরল হেমন্তরই।

সে কঠিন কণ্ঠেই প্রশ্ন করতে গেল, 'এ—এ সব কি? কী ব্যাপার এ সব তো বুঝছি না!' কিন্তু ঠিক উচ্চারণের সময় গলা কেঁপে গেল, ইচ্ছানুরূপ কাঠিন্য ফুটল না।

কথা বলল—বলতে পারল—এবার কমলাক্ষও, হেমন্তর কণ্ঠস্বরেই যেন পাথরে প্রাণ ফিরে এল, একটু এগিয়ে খানিকটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলল, 'তুমি—আমি—আমাকে মাপ করো—ক'দিন যে আমার কী কেটেছে তা তুমি কোনদিন ভাবতেও পারবে না—দিনরাত ছটফট করেছি, যেন কাঁটার ওপর কাটিয়েছি সর্বক্ষণ, শুধু তোমার কথা ভেবেছি। কেবলই মনে হয়েছে তোমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে, জোর ক'রে ধরে রেখেছে—তুমি ইচ্ছেসুখে আছ এ হতেই পারে না—কী যে হত তখন, যখন মনে হত এই দানবের পুরীতে তুমি একা—মাথায় যেন খুন চড়ে যেত, ইচ্ছে হত ঐ লোকটাকে খুন ক'রে নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিই!'...

হেমন্ত ওকে বাধা দিয়ে কি বলতে গেল, বোধহয় বলতে গেল, 'এই, এখন তুমি চলে যাও, কে দেখে ফেলবে কোথা থেকে! ডাক্তারবাবুর আসবার কথা আছে দুপুরবেলা—যে-কোন সময় এসে পড়তে পারেন—যেমন এসেছ যেভাবে, সেইভাবেই চলে যাও লক্ষ্মীটি, আর এই তো আজই শেষ দিন—কাল সকালেই তো—' বললও বুঝি, কিন্তু ওরও হয়ত গলা দিয়ে স্পষ্ট কথাগুলো বেরোল না, কথার সঙ্গে কথা জড়িয়ে গেল, উদ্বেগে উত্তেজনায়—এবং হ্যাঁ, আর অস্বীকার করার উপায় নেই—এই ছেলেটার প্রতি প্রেমেও।

কমলাক্ষরও সে-সব কথা শোনার ধৈর্য রইল না—সে আরও এক পা এগিয়ে এসে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে, তেমনি পাগলের মতো বলে চলল, 'কাল সারাদিন ঘুরেছি এখানে—কেউ দেখতে পেলে চোর ভাবত। পুলিশে দেখলে ধরে নিয়ে যেত,—তোমাকে দেখতে পাই নি, ভেতরে আসতেও সাহস হয় নি তোমার জন্যেই, শুধুই ঘুরেছি তাই। রাত্রে যখন ঐ ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে, মনে হয়েছে—যাক সে-কথা—তখন নিজের গায়ের চামড়ায় চিমটি কেটেছি নিজেই—এই দ্যাখো সে দাগ। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ছুটে চলে গেছি, অনেকদূর গিয়ে গাড়ি পেয়েছি—তারাও আমার অবস্থা দেখে নিতে চায় নি প্রথমটায়, পাগল ভেবেছে কিংবা মাতাল—'

হেমন্তর এদিকে কান নেই। সে কত কি ভাবছে, দ্রুত ভাবছে, চেষ্টা করছে প্রকৃতিস্থ হবার জন্যে, বুদ্ধির দোরে মাথা খুঁড়ছে—কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তারও।...বুকে যেন কিসের দাপাদাপি, দেহের ভেতরে রক্তও যেন মাতাল পাগল হয়ে উঠেছে; এই আতপ্ত দক্ষিণা বাতাস, অনেকরকম ফুলের মিলিত উগ্র সুবাস;

এই লোকটির পরিচিত আকাঙ্ক্ষিত দেহগন্ধ,—সব মিলিয়ে যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো তারও কাণ্ডজ্ঞান বিবেচনা সংস্কার সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—

কানে গেল, কমলাক্ষ তখনও আবোল-তাবোল কত কি বলে যাচ্ছে, কি বলছে সে-ই কি জানে ?—'আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছি, কেউ জানে না, হাঁটতে হাঁটতে এসেছি—আজ দেখা করবই। দেখবই তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা, তুমি রাগ করো, তিরস্কার করো সব সইব—তুমি আমাকে লাথি মারো কিছু বলব না—তোমাকে দেখেছি, এই আমার যথেষ্ট—'

হেমন্ত প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার—প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করে একবার ; দু'হাতে ওর গালটা ধরে আদরের ভঙ্গীতেই বলতে যায়, 'দেখা তো হয়েছে, লক্ষ্মীটি, আর বিপদ বাড়িও না, তুমি এবার যাও, কাল সক্কালবেলাই আমি ফিরে যাব, তখন যেয়ো ওখানে।…চলো। আমি তোমাকে জামাটা এগিয়ে দিই পাঁচিলের ওপারে—'

কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলে এতে। যেটুকু জ্ঞান তখনও ছিল কমলাক্ষর, দয়িতার এই সস্নেহ স্পর্শে সেটুকুও লোপ পায়, অকস্মাৎ সজোরে সবলে ওকে জড়িয়ে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে পাগলের মতো ওর মুখের ওপর নিজের মুখটা ঘষতে ঘষতে বিকৃত অস্ফুট স্বরে অর্ধ-উচ্চারিত শব্দে বলে, 'না, না, আর আমি পারছি না। পারব না—কোথাও যাব না আমি তোমাকে ছেড়ে—কোথাও না—'

হেমন্তরও আর সাধ্য ছিল না নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার—ইচ্ছাও না। অনেকদিন যুঝেছে সে এই নিয়তির সঙ্গে, সেও আর পারছে না, পারবে না।

জীবনে এই প্রথম প্রেমের স্বাদ পেয়েছে সে, কোন পুরুষ যে কোন মেয়েকে এমন পুজো করার মতো ভালবাসতে পারে তা ওর ধারণার অতীত, সমস্ত অন্তর সমস্ত দেহ কাঁপছে সেই আস্বাদনে। মূর্ছাতুর হয়ে উঠেছে সমস্ত স্নায়ু, অনুভূতি। সে মূর্ছিতের মতোই সেই একান্ত ঈপ্সিত বক্ষের মধ্যে এলিয়ে পড়ল, বহু দিনের তৃষিত ওষ্ঠ দু'টি প্রিয়তমের কঠিন উত্তপ্ত তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠবন্ধনে সঁপে দিয়ে সে যেন নিশ্চিন্ত হল।…

আর কিছু করার নেই তার, আর কিছু ভাববে না সে।

এই মুহূর্তেরই জয় হোক এই মুহূর্তে। তার ভাষা বাক্য, চিন্তা ইচ্ছা সব কিছু একাকার স্তব্ধ জড় হয়ে গেছে—কিছু ভাববার, বাধা দেবার, নিজের ইচ্ছায় চালিত হওয়ার ক্ষমতা নেই আর।

॥ ১৮ ॥

ভয় তারককেই বেশী। ও যে কতটা জানে, কতকটা বুঝেছে—সেইটেই ধরতে পারে না হেমন্ত। বিশেষ কমলাক্ষর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর থেকে আরও যেন ভয়টা বেড়েছে। ওর অপরাধী মন কেবলই ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তার মনটা বোঝার চেষ্টা করে। কমলাক্ষকে সামলানো শক্ত। দুর্বার সে, তবু হেমন্ত কঠিন হয়ে থেকে তাকে রাজী করিয়েছে—তারক যখন থাকবে, যে ক'দিন—সে-ক'দিন সে আসবে না। এসে পড়লেও অত্যন্ত সংযত সহজভাবে কুশল প্রশ্ন ক'রেই চলে যাবে।

তবু হেমন্তর কেবলই মনে হয়—ছেলে অনেক কিছুই বোঝে, বুঝছে। যা দেখছে

না—তাও অনুমান ক'রে নিচ্ছে।

তারক যে সাধারণ ছেলের মতো নয়, ভয়টা সেইখানেই। দারিদ্র্যে, সংসারের কদর্য নগ্ন রূপ দেখে দেখে, নানান আশ্রয়, নানান মানুষের মধ্যে থেকে বয়সের অনুপাতে অনেক যেন বেড়ে গেছে ছেলেটা, মনে মনে প্রবীণ হয়ে উঠেছে।

তবু, সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাটা কতদূর, পূর্ণবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা কী রকমের—তাও জানে কিনা, বুঝতে পারে না হেমন্ত।

প্রশ্নও করতে পারে না, পারে না বলেই আরও অস্বস্তি। কেবলই ওর অনুমানটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে, আর মনে মনে সংকুচিত হয়।

অবশ্য পূর্ণবাবুর আসাটা সয়ে গেছে ওর। মেনেই নিয়েছে কতকটা। অভিভাবক হিসেবে বা উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষীরূপেই হয়ত। যা-ই ভাবুক, তিনি যে এ সংসারের একজন কর্তৃস্থানীয়—তা আর মেনে না নিয়ে উপায়ও নেই।

কিন্তু কমলাক্ষ ? তার সম্বন্ধে কি ধারণা ওর ? নিজেকে বার বার প্রশ্ন করে আর সংশয়ে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়।

এ সংশয়ের কারণও ছিল।

খুবই শান্ত আর চাপা ছেলে তারক। সেই জন্যে তার সামান্য অস্বাভাবিক আচরণও চোখে পড়ে।

বাগানবাড়ি থেকে ফেরার প্রায় দশদিন পরে একটা শনিবার তারক বাড়ি এল। তখন কিছু লক্ষ্য করে নি হেমন্ত, খানিক পরে দেখল কেমন যেন একটু অবাক হয়ে হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে।

কেমন খটকা লাগল একটা। প্রশ্ন করল, 'কী দেখছিস রে খোকা, আমার মুখের দিকে চেয়ে অমন ক'রে ? কিছু লেগে-টেগে আছে ?'

হঠাৎ যেন খুব লজ্জা পেল, মায়ের কোলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মুখ লুকোল।

'ও কি রে! এই পাগলা! এতে আবার এত লজ্জার কি হল!...কী ব্যাপার বল্ তো ?'

জোর ক'রে মুখটা তুলে ধরল সে ছেলের।

অনেক ইতস্ততঃ ক'রে আস্তে আস্তে বলল, 'অনেক—অনেকদিন পরে তোমাকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। ভারী ভাল লাগছে তাই।...তোমাকে খুব সুন্দরও দেখাচ্ছে!'

'দূর পাগল!'...রাঙা হয়ে ওঠে হেমন্তও, 'ছাই সুন্দর দেখাচ্ছে! সুন্দরের কি বুঝিস তুই ?...কোনদিন আমার দিকে ভাল ক'রে তাকাস না, তাই যেদিন তাকাস—নতুন লাগে। আমি যা তা-ই আছি।'

বলে, কিন্তু গলায় তেমন জোর পায় না।

কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হতে পারে না, গলা কেঁপে কেঁপে যায়, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও।

কারণ তার বুকের মধ্যে কাঁপছে তখন। কী দেখছে ছেলে কে জানে, কতটা দেখছে।...এমনিই দেখে নাকি সে ?

ও যে ভেবে বসে আছে, ধরে নিয়েছে যে, তার নতুন প্রেমের বন্যায় পরিতৃপ্তির সমস্ত

চিহ্ন সে মুখ থেকে, আচরণ থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে—কোন আবেগের আনন্দের লেশমাত্র নেই কথায়-বার্তায়, মুখের ভাবে—অন্য দিনের মতোই সহজ ও সাধারণ হয়ে উঠেছে আবার !

অথচ এ ছেলেটা দেখামাত্র বুঝতে পেরেছে, ওর মধ্যে কী একটা বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেছে—বিবেক-বিবেচনা, শঙ্কা, লোকলজ্জা, ভবিষ্যতের চিন্তা, সব যেন বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে, প্রবৃত্তির স্রোতে, সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে, ভেসে চলেছে।

তবে কি সে চিহ্ন মুছে ফেলা যায় নি ?...

ওর এ জীবনে এই প্রথম দৈহিক আনন্দের স্বাদ পেয়েছে বলতে গেলে, ভালবাসা বা প্রেম কি, উদ্দাম আবেগ কাকে বলে বুঝতে পেরেছে ; এই প্রথম যে জীবনকে অনুভব করছে, উপভোগ করছে, সেই জন্যেই কি সে আনন্দ স্নায়ুতে শিরাতে দৃষ্টিতে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, এমন চঞ্চল চটুল উন্মত্ত ক'রে তুলছে তাকে যে—এই কচি বালকটাও দেখা মাত্র তা বুঝতে পেরেছে ?

আরও বুক কাঁপে ওর পূর্ণবাবুর কথা ভেবেও।

এ ছেলেটা যা এত সহজে দেখতে পেল—তিনি কি তা পাবেন না ?

ভয় নিজের জন্যে নয়—এ আনন্দ এ তৃপ্তি গোপন রাখতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় কোন চারতলা বাড়ির ছাদে উঠে চেঁচিয়ে সকলকে বলে, 'আমি ভালবাসা পেয়েছি, আমাকে একটি সুন্দর কৃতবিদ্য তরুণ ছেলে প্রাণ দিয়ে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছে—আমারও যে কিছু মূল্য আছে এ সংসারে, আমাকে পেয়েও যে কেউ এমন সুখী হয় তা তার চোখের দিকে চেয়ে জেনেছি।'

কিন্তু বলতে পারে না—কাউকেই বলতে পারে না, বরং ঢেকে রাখতে হয়, মুখোশ পরতে হয়—কমলাক্ষর কথা ভেবেই। পূর্ণবাবু তার সহায় থাকলে অনেক উন্নতি করতে পারবে। তেমনি অনিষ্ট করার শক্তিও তাঁর অসাধারণ।

তবে তারকের জন্যেই বেশী ভয় ওর।

সেদিনের পর থেকে কেবলই লক্ষ্য করে ছেলেকে, লক্ষ্য করে সে কিছু বুঝতে পারছে কিনা।

কিন্তু তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না আর। সেই প্রথম দিনের সে হঠাৎ বিস্ময় প্রকাশের পর থেকে যেন তার মুখে কুলুপ পড়ে গেছে, প্রশান্তি স্বাভাবিকতার মুখোশ পরেছে সে। তার মাও আর সে মুখোশ সরাতে পারে না, পারে না মনের তলায় গিয়ে পৌঁছতে।...একথা-সেকথায় ঐ বর্ম ভেদ করার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে কথার ছলে কথা বের করতে, পারে না। ঐটুকু ছেলে, বারো-তেরো বছরের—কিন্তু কী সহজেই না কথাগুলো এড়িয়ে যায়, তার সরল সহজ উত্তরের ব্যূহ ভেদ ক'রে মনের গভীরে পৌঁছনো যায় না কিছুতেই।

কখনও কখনও মনে হয়—কেন যে মনে হয় তা বলতে পারবে না ঠিক—সবই জানে, সব বুঝেছে তারক। বুঝে জেনেই মাকে ক্ষমা করেছে সে। হয়ত—তার যা পরিণত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা—সব দিক ভেবে বিচার ক'রেই ক্ষমা করেছে। উষ্মা বা বিরক্তি বোধ হলে মার হয়েই যুক্তি প্রয়োগ করে, তার হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়। ভাবে, অনেক দুঃখ পেয়েছে

অভাগিনী, অনেক জ্বালায় জ্বলেছে, অনন্যোপায় হয়েই এই পথে নামতে হয়েছে তাকে। ...আর, আর—যে একবার পাপের পথে, অন্যায়ের পথে নামে তার আরও গভীর পাঁকে নামতে বাধা কি? নামার পথ তো সোজা, আপনিই নামে মানুষ, অনায়াসে নামে—অনেক সময় অনিচ্ছাতেও নামে। আর এ জীবনে সুখী হবার অধিকার, জীবনকে ভোগ করার অধিকার তো সকলেরই আছে—তার মায়েরই বা থাকবে না কেন? যদি এতদিন পরে বেচারী দুটো দিনের জন্যে সুখের মুখ দেখেই থাকে তো দেখুক—ছেলে হয়ে সে অন্তত এ জন্যে মায়ের বিচারক হয়ে বসবে না।

কে জানে সত্যিই তারক এই রকম ভাবে কিনা।

হয়ত নিজের সংশয় ও দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবারই উপায় এটা, সাময়িক সান্ত্বনা। নিজের সুবিধের জন্যেই এই মনোভাব আরোপ করে ছেলের ওপর, কিংবা বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ!

কমলাক্ষ আজকাল প্রায়ই গভীর রাত্রে আসে। সাড়ে দশটার পর—যখন কোন কারণেই পূর্ণবাবুর থাকার সম্ভাবনা নেই। রাত্রে থেকেও যায় এক-একদিন। যে সব দিন কোন লাগসই কারণ—কৈফিয়ৎ দিয়ে আসতে পারে বাড়িতে।

চাকর-বাকরদের কাছে আড়াল রাখতে পারে নি হেমন্ত, তাদের বিশ্বাস করতেই হয়েছে। প্রথম প্রথম যেন লজ্জায় মাথা কাটা যেত, দারোয়ান ঝিয়ের সামনে দাঁড়াতে পারত না, তাদের চোখে চোখ পড়ার সম্ভাবনা সযত্নে এড়িয়ে যেত। তারপর সব সয়ে গেছে। আগে আগে হেমন্ত অবাক হয়ে ভাবত—যে সব মেয়েরা এ পথে এসেছে, তারা কেমন ক'রে মাথা উঁচু ক'রে বেড়ায়, কেমন ক'রে সহজ স্বাভাবিকভাবে মেশে লোকের সঙ্গে! প্রথম প্রথম নিজের দিকে চেয়েও অবাক লাগত। এখন বুঝতে পারে এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় এটা, লজ্জার প্রথম বাঁধটা লঙ্ঘন করতে পারলে, চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে, আর তেমন অসহ্য মনে হয় না।

এখন তাই দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর—সকলেই জেনে গেছে। তারা বরং কমলাক্ষকেই বেশী খাতির করে, ভালবাসে। সুন্দর চেহারার জন্যেও বটে, মিষ্টি ব্যবহারেও বটে। টাকাকড়িতেও মুক্তহস্ত সে। এই বয়সেই ভাল রোজগার করছে, অর্থ সম্বন্ধে কোন কৃপণতা নেই তার। দারোয়ান দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে আজকাল—কমলাক্ষ রাত্রে নিজের গাড়িতে আসে না, ওর মতো সরল ছেলেও এসবগুলো শিখে গেছে কেমন আপনা থেকেই, কোচম্যান জানলে বাড়ির লোকদেরও জানতে দেরি হবে না—তাই সইস কোচম্যানের সারাদিন খাটুনির অজুহাতে তাদের ছেড়ে দিয়ে ভাড়াটে গাড়িতে আসে, কাছাকাছি কোন রোগী থাকলে কাজ সেরে হেঁটেই আসে—ওর সামান্য পায়ের আওয়াজ পেলেই দারোয়ান দোর খুলে দিয়ে হেসে সেলাম করে, অর্থাৎ 'চলে আসুন। কোন ভয় নেই।'

যেদিন হেমন্ত না থাকে, সেদিন দূরে থেকেই হাতের ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দেয়—পাখী নেই। একদিন হঠাৎ, কি কারণে তারক বে-বারেই এসে গিয়েছিল—কি একটা বিশেষ ছুটিতে হেডমাস্টার রসময়বাবু নিজের গাড়িতে ক'রে এনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—

সেদিন দারোয়ান ছুটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সংবাদটা জানিয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে এল, 'আজ বাড়ি যান ডাক্তারদাদাবাবু, খোকাবাবু এসে গেছেন।'

সুতরাং এসব দিক থেকে আর কোন অসুবিধা নেই।

কমলাক্ষ এসেই শুয়ে পড়ে সটান। কোন কোনদিন হেমন্তর কোলে মাথা দিয়েই শুয়ে পড়ে। তবে বেশীক্ষণ না, হেমন্তর সেবা খাবার দারুণ লোভ ওর। কোলে শুয়ে থাকলে সেও আটকে থাকে—এটা যেদিন থেকে বুঝেছে, সেদিন থেকেই আর কোলে মাথা দিয়ে শোয় না বেশীক্ষণ। হেমন্ত হাসে অত বড় লোকটার ছেলেমানুষী দেখে। সে ওর মোজা খুলে দেবে! (কী ভাগ্যি জুতোটা পরে ঘরে আসে না!—সেও হেমন্ত বারণ করেছে বলে) কামিজ ছাড়িয়ে নেবে, ফতুয়া খুলবে, আলনায় মেলে দিয়ে আসবে—আঁচল দিয়ে কপাল গলা বুকের ঘাম মুছিয়ে নিয়ে মাথায় বাতাস করবে—কমলাক্ষ খোকা-ছেলের মতো চুপ ক'রে পড়ে সেই সেবা নেবে। এর তুল্য সুখ নাকি ওর কিছুতে নেই। বলে, 'তোমার ঐ হাত দুটোতে যে কী জাদু আছে তা তুমি জানো না। এমন সেবাও কেউ করতে পারে না, কারও সেবা এত ভালও লাগে না।'

অনেকবারই ঠোঁটের ডগায় আসে প্রশ্নটা, 'কেন, তোমার বৌ? তার তো আরও নরম কচি হাত!'

কিন্তু করতে পারে না। বাড়ির কথা তুলতে চায় না সে, বিশেষ বৌয়ের কথা।

এখনও বিবেকে বাধে। অপরাধী বিবেক এখনও লজ্জা পায়।

পাপ এক রকম, হয়ত এটা পাপ না-ও হতে পারে। অন্যায়টা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। একটা কচি মেয়ের বুকের জিনিস কেড়ে নেওয়া, তাকে বঞ্চিত করা। এখনও ভাবলে খুব খারাপ লাগে, নিজের ওপরই ঘেন্না হয়।...কেবলই মনে হয় আমাকে কেউ যদি এভাবে বঞ্চিত করত! বিশেষ এমন স্বামী যার, তার না জানি কী কষ্টই হবে—একথা জানতে পারলে। আর জানতেও কি পারছে না, ঠিকই পারছে। স্ত্রীর চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় এ ব্যাপারে? স্ত্রীই বা কেন—কোন মেয়েছেলেরই চোখ এড়াবে না।

তাছাড়াও, দেখেছে—বৌয়ের প্রসঙ্গ তুললে মুখটা কেমন যেন হয়ে যায় কমলাক্ষর। স্বল্প দু-তিন মুহূর্তের জন্যে হলেও সেটা দেখা যায়, একটা দৈহিক খোঁচা খেলে যেমন চমকে ওঠে, মুখটা বিকৃত হয় তেমনই। অবশ্য তারপরই হেমন্তকে বুকে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে চুম্বনে পাগল ক'রে দেয়, তবে সে বুঝতে পারে যে, এটা ভোলারই চেষ্টা, পাগলই হয়ে উঠে ভুলতে চায়। কামনায় উচ্ছ্বাসে পীড়িত বিবেককে ভাসিয়ে দিতে চায়।

শ্রাবণের শেষের দিকে একদিন কমলাক্ষ এমনি ওর কোলে শুয়ে পড়ে বলল, 'তোমার বাড়িটা বেচবে? ঐ ছোট বাড়িটা—যেটা কিনেছ?'

'কেন, বাড়ি বেচতে যাব কোন দুঃখে?' মুখঝামটা দিয়ে ওঠে হেমন্ত, 'খেতে পাচ্ছি না?'

'দুঃখে কেন, সুখেই না হয় বেচলে। কত দিয়ে কিনেছিলে, সাড়ে ছয় না?... খরচ হয়েছে, রেজেস্ট্রী উকিল মেরামত-টেরামত নিয়ে আর এক হাজার হোক।...আমি

যদি বারো হাজার দিই ?'

'সে আবার কি ? তুমিই বা অমন দেবে কেন, আর আমিই বা নোব কেন ?'

'হুঁ হুঁ, বাবা। আছে আছে, অর্থ আছে।...আমি কি আর দোব, আমার এক মক্কেল দেবে। রেঙ্গুন থেকে এসেছে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে—অনেক টাকা এনেছে সঙ্গে। এখানে একটা বাড়ি কিনে রেখে যেতে চায়।...খুব জরুরী, দেরি করার সময় নেই। আমাকে বলছিল, হঠাৎই মনে পড়ে গেল তোমার ঐ পচা বাড়িটার কথা। বলে দিলুম—হ্যাঁ আছে, পুরনো বাড়ি, ছোট্ট। তবে সারিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভাল ভাড়াটেও আছে। বারো হাজার টাকা দাম চায়—বাজার দর হিসেবে হয়ত একটু বেশীই চাইছে—তবে দ্যাখো, সে তোমার গরজ।...তা রাজী হয়ে গেল এক কথায়।'

তারপর ওর মুখের ওপর ঝুঁকে-পড়া মুখখানার দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে চেয়ে বলে—'কী, দ্যাখো—বলে অন্যায় করলুম না তো ?...অবশ্য ফেরার পথ আছে বৈকি, বললেই হবে বিক্রী হয়ে গেছে।'

'না না—অন্যায় কি ! অত লাভ পেলে বেচব না কেন ? এর ভেতর আরও কিছু টাকা জমেছে হাতে, এটা যদি এসে যায়—সব মিলিয়ে একটা বড় বাড়ি কিনব।

'আছে, তাও আছে। আজ বাবা আমি একেবারে আলাদীনের পিদীম, যা চাইবে তাই দোব। ঠিক চোদ্দ হাজারেই একখানা বাড়ি বিক্রী আছে বেনেটোলা লেনের মধ্যে, তিনতলা বাড়ি—একতলা দোতলায় তিনখানা ক'রে ঘর, তিনতলায় একখানা। এ ছাড়াও রান্না-ভাঁড়ার আলাদা। সব ঠিক ক'রে এসেছি। তবে বাড়তি দু'হাজার আড়াই হাজার যা লাগে— টাকাটা আমিই দোব, তোমার পুঁজিতে হাত দিতে দোব না।'

'খবরদার !' কঠিনকণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে হেমন্ত, 'ওকথা মুখে আনলে সম্পর্ক এখানেই শেষ। একটা পয়সাও দিতে এসো না কোনদিন। তোমার কাছ থেকে হাত পেতে পয়সা নেবার আগে নিজের হাত কেটে ফেলব। যা করেছি করেছি—তাই বলে বাজারের মেয়েমানুষ ভেবে টাকা দিতে আসবে—তা সইতে পারব না।'

'আরে, ছি ছি !—কী যে বলো সব !' মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে উলটো দিক থেকে ওকে বুকের ওপর টেনে নেয় কমলাক্ষ, 'অত রাগারাগি করছ কেন ?...আচ্ছা, আচ্ছা, দোব না টাকা, ভয় নেই।...বাবা ! যা মেজাজ ক'রে উঠলে, বুক কেঁপে গিছল ! তোমার যা মর্জি, তাই হবে।...মোদ্দা, আলাদীনের পিদীম পেয়েছিলে আজ, কাজে লাগালে ভালই করতে !'

কমলাক্ষর বুকের চুলের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে ওর দেহের অতি প্রিয় আঘ্রাণ নিতে নিতে হেমন্ত বলে চুপিচুপি, 'তাহলে আমি চলে যাই, ছেড়ে দাও—দানোর সঙ্গে ঘর করতে পারব না।'

'দানো ? সে আবার কি ?' অবাক হয়ে যায় কমলাক্ষ।

'দানো নয় তো কি ! আমাকে ওবাড়ির হরিদি আরব্য-উপন্যাস পাঠিয়েছিল—বটতলার কোন এক দোকান থেকে চেয়ে এনে দিয়েছিল এক আনা ভাড়ায়, আমি জানি—আলাদীনের পিদীম ঘষলেই দানো আসত, সেই দানোকে যা হুকুম করত আলাদীন, সে তাই যোগাত ! দানো—দৈত্য যা বলো !'

হা-হা করে হেসে ওঠে কমলাক্ষ, আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে বলে, 'দানোই যদি হই অত সহজে ছেড়ে দোব কেন—না দাত্যি-দানোর হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়াই অত সোজা। ধরে এবার সিন্দুকে পুরে রাখব—সেই রাজকন্যের মতো, জব্দ হয়ে যাবে। আর কোথাও কারও কাছে যেতে পারবে না কোনদিন!'

যেতে তো চায় না—থাকতেই তো চায়। এই বুকের মধ্যে এমনি লুকিয়ে থাকতে চায় যুগ-যুগান্ত।

॥ ১৯ ॥

রের দিন পূর্ণবাবুকে কথাটা বলতে তিনি চমকে উঠলেন।

'বাড়ি বিক্রী করে দেবে! সে কি! কেন? ভাড়া তো পাচ্ছ!'

'তা হোক। মোটা লাভ পাচ্ছি, বেচব না কেন?'

'মোটা লাভ? সে আবার কি! কে দিচ্ছে এত লাভ তোমাকে? কত দাম পাচ্ছ?'

তারপর সব শুনে, কেমন এক রকম শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'তাই নাকি! কমল কি আজকাল বাড়ির দালালি ধরল নাকি?…তা ভাল। কই, এরকম লাভের প্রস্তাব তো আমাদের কাছে আসে না কখনও! বাড়ি তো আমাদেরও এক-আধখানা আছে!'

হেমন্ত কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো ক'রেই বলে, 'তেলো-মাথায় তেল ঢালে নি ভালই করেছে। কেন, গরীব মানুষ আমি দুটো পয়সা পাচ্ছি, তাতে কি তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'না, তা নয়।' অন্যমনস্কভাবে বলতে বলতে অতর্কিতে অন্য প্রশ্ন করলেন, 'তা কমল তোমাকে এ খবর দিলে কখন?'

প্রশ্নটা যে হঠাৎ এই পথে যাবে তা ভাবে নি হেমন্ত, একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু ইতস্ততঃ করলেও চলবে না, এ লোকটির শুধু চোখই নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ন সজাগ হয়ে আছে ওর দ্বিধা বা সঙ্কোচ লক্ষ্য করার জন্যে। সে বলে ফেলল, 'কখন বললে?…আজ সকালেই তো!'

'আজ সকালে তোমার পাথুরেঘাটার কেস ছিল না?'

আরও তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে পূর্ণবাবুর দৃষ্টি।

উত্তর দিতে গিয়ে আরও কি ফাঁদে পড়বে কে জানে, তাই হেমন্ত অন্য পথ ধরল, সেও কড়াগলায় বললে, 'আমার কোথায় কোন্ দিন কি কেস থাকে—তোমার যে দেখছি সব মুখস্থ! কেন বলো দিকি, আমার পেছনে এমন গোয়েন্দাগিরি ধরেছ! এত ঝকমারি কিসের আমার যে, চোপর-দিনের হিসেব তোমাকে দিতে হবে!'

বলে রাগ ক'রে উঠে চলে গেল।

বেঁচেও গেল দৈবক্রমেই।

ঠিক সেই সময় এ পাড়া থেকেই একটা ডাক এসে গেল, একটি মেয়ের অসময়ে প্রসব-ব্যথা উঠেছে—এখনই একবার যেতে হবে। সুতরাং পূর্ণবাবুরও আর কোন প্রশ্ন করার অবসর মিলল না, হেমন্তকে কৃত্রিম বিরক্তির মধ্যে আত্মরক্ষা করতে হল না।

তবু, খুব শিক্ষা হয়ে গেল এবার, মনে মনে বললে সে বার বার, কমলাক্ষর কোন

কথা এখানে বলার আগে দু'জনে ঠিক ক'রে নিতে হবে—কখন সে এসেছিল, দরকার হলে সে সময়টা কি বলবে পূর্ণবাবুর কাছে। দু'জনে দু'রকম না হয়ে যায়।

রাত্রে কমলাক্ষকে কথাটা বলতে সে জিভ কাটল। বলল, 'খুব বেঁচে গেছ কিন্তু। আমাকে আজ সকালবেলাই একবার কলেজে যেতে হয়েছিল, খুব শক্ত একটা অপারেশন ছিল। বদরীবাবুর কেস, উনি আমাকেও থাকতে বলেছিলেন। সে-কথা পূর্ণবাবুও জানেন। সেই জন্যেই বোধ হয়—কখন আসি সেটা আঁচ করতে চান।···আবার যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলো, বেলা এগারটায় এসেছিলুম। তুমি তো বলেছ দশটার মধ্যে ফিরে এসেছিলে—আমিও ওখান থেকে বেলা দশটা নাগাদ বেরিয়েছি। দারোয়ানকেও সেইভাবে শিখিয়ে রেখো—। বলা যায় না, উনি ওদের কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

কিন্তু এবিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না পূর্ণবাবু, সেদিনও না, তার পরের দিনও না। লজ্জার মাথা খেয়ে ঝি-চাকরকেও জিজ্ঞাসা ক'রে দেখল, তাদের কাছেও কিছু জানতে চান নি।

কতকটা নিশ্চিন্ত হল দু'জনেই।

কমলাক্ষর খদ্দেরের তাড়াহুড়ো ছিল। সার্চ করানোর বৃথা হাঙ্গামা না ক'রে তিনি ওর কথার ওপরই বিশ্বাস ক'রে বাড়িটা কিনে নিলেন একেবারে। বারো হাজার টাকাই দিলেন। অন্য যে বাড়িটার কথা বলেছিল কমলাক্ষ, হেমন্তর তরফ থেকে বায়না ক'রে কাগজপত্র নিয়ে ধনুবাবুর মুহুরীকে জিম্মা ক'রে দিলে। ভাদ্রমাস পড়ে গেল, আশ্বিনের আগে রেজেস্ট্রী হবে না, সুতরাং অত তাড়া কি?

পূর্ণবাবু শুনলেন সব, কোন মন্তব্য করলেন না আর। কমলাক্ষ আসছে যাচ্ছে, হেমন্তকে রেজেস্ট্রী আপিসে নিয়ে যাচ্ছে, সবই শুনলেন। প্রকাশ্যেই আসছে সে, দিনের বেলায়, সে আসার সময়টাও তাই বলতে বাধা নেই। হেমন্তের পীড়াপীড়িতেই রাত্রে আসাটা দু-একদিন বন্ধ করল কমলাক্ষ। পূর্ণবাবু সেদিন ঠিক গোয়েন্দাগিরি করেন নি পাথুরেঘাটার কেস-এর ব্যাপারে, পরে শুনেছিল হেমন্ত। তারাই ওঁকে খবর দিয়েছিল, নির্বিঘ্নে ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার খবর। স্বাভাবিকভাবেই। তবে সন্দেহ হলে যে গোয়েন্দাগিরি করবেন না—এতটা নিশ্চিন্ত হওয়ারও কোন কারণ নেই। সাবধানে থাকাই ভাল।

কিন্তু কমলাক্ষ দুর্বার, অধীর। কোনমতে দুটো-একটা দিন ধৈর্য ধরে থাকলেও—বেশী দিন সামলাতে পারল না নিজেকে।

সমস্ত বিপদের আশংকা, হেমন্তর ব্যাকুল সতর্কবাণী উড়িয়ে দিয়ে জোর ক'রে বুকে টেনে নেয় তাকে। যেন সর্বনাশের সম্ভাবনাগুলো নিজের প্রেমের প্রবলতায় উড়িয়ে ভাসিয়ে দিতে চায়।

শুধু এইটে করে—দু-একদিন, আগে থাকতে বলে-কয়ে রেখে, খুব গভীর রাত্রে আসে। সাড়ে এগারোটা বারোটায়। তবে সে দিনগুলোয় আর রাত্রে ফেরে না, ভোরবেলা উঠে চলে যায়।

তবে, দেখা গেল পূর্ণবাবুর কাছে ওরা শিশু। তাঁর পরিণত বুদ্ধির সঙ্গে ওদের

তর্ণ ব্নিধ পাল্লা দিতে পারল না। অতি প্রাতন ফাঁদেই একদিন ধরা পড়ল আসামীরা।

হঠাৎ শোনা গেল প্র্ণবাব্ মাদ্রাজ যাচ্ছেন, সেখানে কি ডাক্তারি পরীক্ষা নিতে। কমলাক্ষ আগেই শ্নে এসেছে হাসপাতালে যে, ওঁকে যেতে হবে। কবে রওনা হবেন তাও সেখান থেকেই শ্নেছে। দ্-তিন দিন আগেই যাচ্ছেন—কারণ, ওদিকের কোন্ নদীতে বন্যা হয়েছে—গাড়ি যাওয়ার অস্বিধা হচ্ছে, উনি জাহাজে যাবেন।

সকলেই বারণ করল, হেমন্তও—প্র্ণবাব্ হেসে উড়িয়ে দিলেন। হেমন্তর উদ্বেগটাও আন্তরিক। এই লোকটি সম্বন্ধে অদ্ভুত মনোভাব তার—ঘৃণা কি বিদ্বেষ আনতে পারে না সম্পূর্ণ, আবার শ্রদ্ধাও রাখতে পারে না। ভাল তো বাসতে পারেই না।...

যেদিন যাওয়ার কথা, আগের দিন টিকিট পর্যন্ত দেখিয়ে গেলেন প্র্ণবাব্ কথার ছলে, বার বার সাবধানে থাকার নির্দেশ দিলেন। কমলাক্ষ তো আসেই—তব্ ওঁর সইসকেও যে রোজ খবর নিতে বলেছেন তাও জানালেন। আর কিছ্ চাই কিনা প্রশ্ন করলেন, তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন বেলা দশটায় জাহাজ ছাড়বে—স্তরাং আর দেখা হবে না, সেইভাবেই বলে-কয়ে গেলেন।

ম্ক্তি ঠিকই—এ ক'দিন প্র্ণ অবকাশ—তব্ কমলাক্ষ কখন আসবে তার কিছ্ ঠিক করা ছিল না। হেমন্তর ধারণা যেমন রাত্রে আসে তাই আসবে, হয়ত কিছ্ আগে—সন্ধ্যার পরই এসে যাবে। কমলাক্ষও কিছ্ ভেবে রাখে নি বিশেষ ক'রে—সন্ধ্যার পরটা যাতে নিজস্ব ক'রে পায় সেইভাবেই কাজ করেছিল। হঠাৎ বেলা একটা নাগাদ আবিষ্কার করল—সামনের ঘণ্টাতিনেক, মানে বেলা চারটে পর্যন্ত হাতে কোন কাজ নেই, অখণ্ড অবসর।

বাড়িই ফিরছিল, যেতে যেতে কি মনে হল গাড়ি ঘ্রিয়ে এদিকে চলে এল। তাও সন্দেহ ছিল হেমন্ত বাড়ি থাকবে কিনা। দারোয়ান যখন হাসিম্খে সেলাম ক'রে জানাল দিদিবাব্ আছেন, বোধ হয় বিশ্রাম করছেন—তখন ঝাঁ ক'রে পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে তার হাতে দিয়ে পান খেতে বলে—পা টিপে-টিপে সটান ওপরে উঠে গেল।

হেমন্ত ঘ্মোচ্ছিল। নিঃশব্দে ভেজানো দরজা খ্লে কমলাক্ষ কখন ঘরে ঢ্কেছে তা টেরও পায় নি, একেবারে বিছানার পাশে এসে শ্য়ে পড়তে চমকে ঘ্ম ভেঙে গেল তার। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে খ্শীই হল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্রথমে পাখা নিয়ে খানিকক্ষণ বাতাস করল, তারপর যথারীতি মোজা-জামা খ্লতে বসল।

খ্নস্টি ক'রে এই সময়টায় কাঠ হয়ে পড়ে থাকে কমলাক্ষ, অতবড় মান্ষটাকে সরিয়ে জামা খ্লে নিতে কষ্ট হয় হেমন্তর—হাঁপায়, সেইটে উপভোগ করে। আজও সেই পর্ব চলছে—নিঃশব্দে দরজার কাছে আরও একটি মান্ষের আবির্ভাব ঘটল—

প্র্ণবাব্।

এমন দ্প্রে কেউ কোথাও নেই দেখে দারোয়ান—সদ্য একটা গোটা টাকা বকশিশ

পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় কমলাক্ষর জন্যেই—নিজেই মন-তোলা ক'রে বরফ আনতে গেছে। এই পচা গরমে গলদঘর্ম হয়ে এসেছে লোকটা, হাতের কাছে না চাইতে ঠাণ্ডা জল পেলে আরও খুশী হবে, সেই সঙ্গে দিদিবাবুও—এই আশাতেই। এই রাস্তার ওপরই তিনটে বাড়ির পরে পানের দোকান, যেতে আসতে বরফ নিতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী লাগার কথা নয়, এর মধ্যে আর কি হবে? ওপরে দিদিবাবুর ঘরে তো ওরা জাগাই আছে, নিচেও ভাঁড়ার ঘরে চাবি দেওয়া, তাছাড়া সামনেই ঝি আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছে, এঁটো বাসন রান্নাঘরে থাকে—সেখানে ঠাকুর শুয়ে—চুরি হবার সম্ভাবনা নেই।

সবই হিসেব করেছে সে, পূর্ণবাবুকে ছাড়া।

পূর্ণবাবু কিছুদিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন—হেমন্ত বা কমলাক্ষ চাকর-দারোয়ানদের হাত করেছে, তাই তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে মিছিমিছি খেলো হতে চান নি। তার চেয়ে নিজেই একটু কষ্ট করবেন সেই ভাল। নিজের গাড়িও নয়, ঘণ্টা হিসেবে একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এ-বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা গাছতলায় অপেক্ষা করছেন বেলা এগারোটা থেকে। তিনি জানেন, সকালে একবার ক'রে হাসপাতালে যায় কমলাক্ষ, তারপর নিজের রুগী দেখতে বেরোয়। কোন-কোনদিন হাসপাতালেই এগারোটা বেজে যায়। যাই হোক, একেবারে সকালে না আসতে পারলে এগারোটার আগে আর পারবে না। সকালে সবাই কর্মব্যস্ত থাকে, কমলাক্ষরও তাড়া—বিশ্রম্ভালাপের সময় সেটা নয়। তাঁর অনুপস্থিতিরই যদি সুযোগ নিতে চায় তো—নিভৃত অবসর খুঁজবে। সন্ধ্যা তো আছেই, সে অন্য ব্যবস্থা—এখন এই বেলা চারটে পর্যন্ত একটু দেখে যাবেন এই সংকল্প ক'রেই গাড়ি ঠিক করেছেন।

মাদ্রাজ যাওয়ার ব্যাপারটাও সাজানো। আসলে এ যাত্রা যেতে পারবেন না, সেই কথাই লিখে দিয়েছেন তাদের—জাহাজের টিকিট আজই গোপনে ফেরৎ দিয়েছেন। কিছু টাকা দণ্ড গেছে, তা যাক। এর একটা এসপার-ওসপার দেখতে চান তিনি।

এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢোকার ইচ্ছা ছিল না তাঁর, আর একটু সময় দেবেন ওদের এই রকমই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুটো কারণে তাড়া করতে হল। ভাদ্রের নির্মেঘ দুপুর—অসহ্য গুমোট। তায় গাড়ির দু' পাশের পাখিগুলো তোলা—বসে বসে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। শৌখিন জাপানী হাতপাখার হাওয়ায় সানাচ্ছিল না। একনাগাড়ে পাখা চালাতেও পারেন না, হাত ব্যথা করে। তার ওপর যখন দেখলেন দারোয়ান দরজা ভেজিয়ে ওদিকে চলে গেল—তখন আর এ সুযোগ নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। কে জানে, তিনি গেলে দারোয়ান বাধা দিতে পারত না ঠিকই—কোন কৌশলে সতর্ক ক'রে দিত হয়ত। পূর্বনির্দিষ্ট কোন সংকেত করত। তার চেয়ে এই ভাল।...

এখানে এসে বুঝলেন—তাঁর আন্দাজই ঠিক ছিল, আর একটু পরে এলেই ভাল হত, প্রণয়নাট্যের চরমদৃশ্যে পৌঁছতে পারতেন একেবারে। তবে তাতেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। যা দেখলেন এ-ই যথেষ্ট। বাকীটা আন্দাজ ক'রে নিতে কোন অসুবিধে নেই। ঠিক হাতে-নাতে ধরা যাকে বলে—তা হয়ত হল না—তবে তিনি তো আর মকদ্দমা করতে যাচ্ছেন না, আইনত কিছু করার শক্তিও তাঁর নেই—তখন অত প্রত্যক্ষ-

প্রমাণেই বা কি লাভ ?

পূর্ণবাবু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক এই প্রণয়লীলা দেখলেন।

কমলাক্ষ তো চোখ বুজেই আছে, হেমন্তও তখন তার কামিজ খোলা শেষ ক'রে ভেতরের মেরজাইটা খোলার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে—দরজার দিকে চাইবারও অবসর পায় নি। পূর্ণবাবু আরও কিছুক্ষণ এইভাবে থাকলেও কেউ টের পেত না, তবে তাঁরই আর সম্ভব হল না এ দৃশ্য সহ্য করা। তিনিই কথা বলে উঠে এদের সচেতন ক'রে দিলেন।

একরকমের অতি-শীতলকণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের বিশেষ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটালুম মনে হচ্ছে !'

ধড়মড় ক'রে উঠে বসল কমলাক্ষ। দিনেদুপুরে ভূত দেখার অবস্থা তার। হেমন্তরও মুখ সাদা হয়ে গেল দেখতে দেখতে—কারও মুখেই কথা সরল না।

পূর্ণবাবুই যেন কৈফিয়ৎ দিলেন একটা, 'আমার যাওয়া হল না—এইটেই বলতে এসেছিলুম। তা তুমি তো দেখছি ব্যস্তই আছ। আমি না থাকলেই সুবিধে হত বোধ হয়। দুটো দিন মুখ বদলাতে।'

ঈর্ষা, বিদ্বেষ—এবং প্রচণ্ড ক্রোধ—ভেতরে ভেতরে রক্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর, সেটা আড়ে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারল হেমন্ত। তবু এই আপাত-শান্ত ভাবটা কেমন ক'রে বজায় রাখছেন—এই দুঃসহ দাহের মধ্যেও, সেটাই ভেবে অবাক না হয়ে পারল না। একান্ত লজ্জার ও আশঙ্কার ভেতরেই মনে মনে তারিফ করল সে। লোকটা জীবনের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

কমলাক্ষ এ ধরনের কোন অবস্থায় পড়ে নি কখনও, হেমন্তর মতো বিচিত্র অভিজ্ঞতাও নেই জীবনের। সে মাথা হেঁট ক'রে বসে ঘামাতে লাগল।

অগত্যা কথা কইতে হল হেমন্তকেই। সেও খুব একটা জোর পেল না কথায়, আমতা আমতা ক'রে বলল, 'না, এই—মানে গরমে ঘেমে খুব কষ্ট হয়েছে কিনা—নেতিয়ে পড়েছে একেবারে—'

'তা, তাতে এই নিচের ফরাসেও বসা চলত, এখানে শুয়ে পড়লেও ক্ষতি ছিল না।··· বাইরের হাসপাতালে-ঘোরা কাপড়ে খাটে শোবার খুব একটা দরকার ছিল কি ?···আমি অবিশ্যি এ সমাদর পাব না তা জানি। আশাও করি না, অল্প বয়স যৌবনকালের অনেক পাওনা, এ বয়সে সে লোভ করাও মুখ্খুমি—তা ভালই, তবে যার বিয়ে হয়েছে, সবে একটি সন্তান হয়েছে, তার মাথা না খাওয়াই ভাল। তুমিও একটা ছেলে নিয়ে ঘর করো।···আর এই ওর উন্নতির সময়, উঠতি বয়স, খাটবে, কাজের দিকে মন দেবে—সে-ই ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত—আমোদ-ফূর্তির জন্যে তো পড়েই রইল সারা জীবন।···দিন কিনে নাও আগে—এখন থেকে জীবনটা বরবাদ ক'রে দিও না। আচ্ছা আজ আসি।··· মাদ্রাজ আর যাচ্ছি না, বলে দিয়েছি তাদের···'

আর দাঁড়ালেন না পূর্ণবাবু। যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনিই চলে গেলেন। দরজার কাছেই দারোয়ানের সঙ্গে দেখা—বরফ আর লেমোনেড নিয়ে ফিরছে—সে এমনই

হতভম্ব হয়ে গেল যে, একটা সেলাম করার কথাও মনে রইল না তার। বিস্ময়ে ও নানা জানা-অজানা আশঙ্কায় মুখটা যে ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ না গাড়িতে গিয়ে উঠলেন পূর্ণবাবু তা আর বুজল না।

অবস্থা হেমন্তরও অনেকটা ঐরকম। তার অভিভূত অবস্থা বাইরে ওভাবে প্রকাশ না পেলেও ভেতরে ভেতরে সেও ঐরকমই আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

পূর্ণবাবু যদি কঠোর ভর্ৎসনা করতেন, রাগারাগি চেঁচামেচি করতেন তাহলে হেমন্ত তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। সেও যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ওঁর এই ঘটনাটাকে এমন শান্ত নিরুত্তাপভাবে গ্রহণ করাতে। যে ঝগড়ার কথা একটিও তুলল না, তার প্রতি কোন অবিচার হয়েছে, এরা অন্যায় করেছে এমন একটি অনুযোগও করল না—তাকে কড়া কথা শোনানো যায় কী ক'রে?···

কমলাক্ষ তো সেই যে মাথা নিচু ক'রে বসে ছিল—তেমনিই বসে রইল, মাথা তুলে হেমন্তর দিকেও তাকাতে পারল না একবার। ছেলেমানুষ, লজ্জা ঝেড়ে ফেলার শিক্ষা এখনও পায় নি—মনে হল লজ্জায় ও ভয়ে পাথর হয়ে গেছে সে। কপালের ঘাম অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল—হাত তুলে সেটাও মুছতে পারল না।···

অনেকক্ষণ এই অভিভূতভাবে বসে রইল সে। দারোয়ান বরফ-লেমোনেড দিয়ে যেতে কৃতজ্ঞভাবে সেটাই শুধু যা একচুমুকে খেয়ে নিয়েছিল এর মধ্যে—ঐ যা প্রাণ-লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল একবার। এই গরমে এত ঘামের মধ্যে বরফ খাওয়া ঠিক হচ্ছে না বুঝেও হেমন্ত কোন বাধা দিতে পারল না, ওর প্রয়োজন বুঝে কি বলতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল।

তার পরও কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পর, আস্তে আস্তে উঠে একসময় মোজাই আর কামিজটা টেনে গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কমলাক্ষ। যাওয়ার আগে হেমন্তর সঙ্গেও একটা কথা বলতে পারল না—সাধারণ বিদায়-সম্ভাষণও না। 'আজ আসি', কি 'এখন আসি' এটুকুও না।

মনে হল শুধু পূর্ণবাবু নন, হেমন্তর কাছেও নিজেকে অপরাধী বোধ করছে সে।

চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হেমন্ত আবিষ্কার করল যে, মোজাটা ফেলে শুধুই জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেছে সে। অন্য দিন হেমন্তই যাওয়ার আগে মোজা পরিয়ে দেয়—আজ দু'জনের কারুরই সে খেয়াল হয় নি।

॥ ২০ ॥

কমলাক্ষ পরের দিন তো এলই না, তার পরের দিনও না। পর পর পাঁচটা দিন কেটে গেল—না পেল হেমন্ত তার দেখা, না পেল কোন খবর।

পূর্ণবাবু সেই একটা দিনই আসেন নি, তার পর দিন থেকেই নিয়মিত আসছেন। তবে কে জানে কেন, হেমন্তর কঠিন মুখভাব দেখেই বোধ হয়—কোন ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করেন না। একটুখানি বসেন, কুশলপ্রশ্ন করেন, এক পেয়ালা চা খান, আধ-ঘণ্টাটাক থেকে চলে যান। এখানের বাতাসেই যেন তাঁর প্রতি অনাদর, উপেক্ষার ভাব, অন্তত তাই মনে হয়। আসা-যাওয়ার সময় দারোয়ান শুধু গম্ভীরভাবে একবার উঠে

দাঁড়ায়, ঝি-ঠাকুর কেউ কোন সম্ভাষণ করে না। এই নীরব অবহেলায় পূর্ণবাবু ক্রুদ্ধ হন মনে মনে, কিন্তু এ নিয়ে রাগারাগি করতে পারেন না। এসব ভৃত্যবর্গ তিনিই নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু এরা আইনত হেমন্তরই লোক, বিশেষ সে-ই এখন এদের সম্পূর্ণ খরচ চালায়, পূর্ণবাবুর কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় না। পূর্ণবাবু মধ্যে মধ্যে উপহার হিসেবে দু-একশ' টাকা জোর ক'রে দিয়ে যান—কি ওর পোস্ট আপিসের হিসেবে জমা ক'রে দেন, সেটা অতিরিক্ত, হেমন্তর কোন প্রয়োজন নেই, সহজে নিতে চায়ও না।

সুতরাং জোর নেই এদের কারও ওপর, ভয় দেখাবার উপায় নেই। বিরক্ত হন, সে বিরক্তিটা প্রকাশ করতে না পেরে আরও ক্রূর হয়ে ওঠেন।

এ অবহেলার কারণটা বুঝেই আরও বিরক্তি তাঁর। এরা কমলাক্ষের ভক্ত, তাকেই পছন্দ করে। সেদিন ছিঁচকে চোরের মতো কোথাও লুকিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে থেকে, চুপি চুপি এসে তাকে ও তাদের মনিবকে অপদস্থ করার খবরটা নিশ্চয় অজ্ঞাত নেই কারও—সেই কারণেই এই বিতৃষ্ণা। নীরব ধিক্কারে ওরা তাঁকে অসম্মান করতে চায়—শোধ তুলতে চায় কমলাক্ষর অপমানের।

এ অবস্থায় পূর্ণবাবুর কাছে কমলাক্ষর খবর জানতে চাওয়া যায় না। সে যে আসছে না—একথাও গায়ে প'ড়ে বলতে চায় না হেমন্ত। আসবে না-ই বা কেন? পূর্ণবাবুর কি অধিকার আছে তার আসা বন্ধ করার?···অকথিত যুক্তিরও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, 'ঠাকুরঘরে কে না আমি তো কলা খাই নি' এই গোছের কৈফিয়ৎ হয়ে পড়বে। তাই মুখ বুজে সহ্য করা ও মনে মনে ছটফট করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

পাঁচ দিনের দিন কমলাক্ষরই সইস এল খবর নিয়ে।

বাবুর তরশু দিন থেকেই খুব জ্বর—বুকে নাকি সর্দি বসেছে। পাড়ার ডাক্তার দেখছিলেন, বড় ডাক্তারবাবু, মানে পূর্ণবাবু খবর পেয়ে আজ এসেছেন, তিনিই দেখে ওষুধ দিচ্ছেন। ওকে পুলটিশ লাগাতে বলেছেন। আর এর মধ্যেই দু'বার এসে দেখে গেছেন, বলেছেন কোন ভয় নেই—রাত্রেও আবার আসবেন, দরকার হয় রাত্রে থেকেই যাবেন। নিজে মিক্‌স্‌চার তৈরী করিয়ে এনে বসে থেকে খাইয়ে গেছেন। খুবই করছেন—নিজের ছেলের মতো।

বাবু ওরই মধ্যে একফাঁকে রামখেলাওনকে ডেকে চুপি চুপি বলেছেন—এই খবরটা এখানের মাইজীকে দিয়ে যেতে। বলেছেন, 'মাইজী নিশ্চয় খুব ভাবছেন, তাঁকে বলে আয় যে কোন ভয় নেই, একটু ভাল হয়ে উঠলেই গিয়ে দেখা করব।···বলিস যে, বড় ডাক্তারবাবু খুবই করছেন আর ঠিক সময়ে যখন ধরা পড়েছে শিগ্‌গিরই আরাম হয়ে উঠবে। তবে এই তো অবস্থা—খবর-টবর যদি ঠিকমতো পাঠাতে না পারি—খুব যেন না ভাবেন তিনি।'

আর বলতে পারেন নি, এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে গিছলেন নাকি। খুব কষ্ট হচ্ছিল কথা বলতে।···

হেমন্তর বুকের মধ্যটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। বুকে সর্দি বসা মানে নিমোনিয়া।

সেদিনের সেই বরফ-জল।

ইস্! যদি মায়া না ক'রে বাধা দিত, গেলাসটা কেড়ে নিত!

সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ব্যাকুলভাবে একেবারে রামখেলাওনের হাত দুটো চেপে ধরে বললে, 'বাবু কিছু বলতে পারুন আর না পারুন, তুমি এসে একটু খবরটা দিয়ে যেও বাবা, লক্ষ্মীটি! আমি তোমাকে বকশিশ দেব।'

জিভ কেটে রামখেলাওন বলল, 'ছি-ছি। বকশিশের কথা কি বলছেন মাইজী, এ তো হামারও কাজ। এ বাবু মনিব না আছেন, বড়া ভাইয়ার মতো, এঁর বিমারীতে হামাদের হাত-পাও ভি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েসে। হাপনি খুব চুপ থাকুন মাইজী, হামি দুনো বেলা খবর পেঁছিাইয়ে দিব। বাবু হাপনাকে কত পিয়ার করেন সো কি হামি-লোক জানছি না?···নিজের বহিনের মতো দেখেন।'

সইস চলে গেল—কিন্তু হেমন্তর ঠিক কণ্টকশয্যার অবস্থা। বসতে পারে না শুতে পারে না, খাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না।

অসুখ করে অবশ্য—সব বয়সেই করে। বুকে সর্দি বসাটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। প্রথমেই ধরা পড়েছে—ভয়ের কারণও কম হবারই কথা। তবু—বুকের মধ্যে একটা অসহায় হতাশ ভাব বোধ করে সে, অকারণেই চোখে জল এসে যায়। অমঙ্গলের ভয়ে যত সামলাবার চেষ্টা করে ততই উপচে পড়ে তা। কেবলই মনে পড়ে যায় শাশুড়ির কথাটা। ডাইনী-ফাইনী নয়, বাজে কথা—ওর জন্মক্ষণেই বিধাতার কি অভিসম্পাত আছে, ওর সুখের বাসা বার বার পুড়বে, যাকে অবলম্বন করতে যাবে তাকেই হারাবে।···

ঠাকুরের ছবির সামনে মাথা খুঁড়তে লাগল বার বার—'ঠাকুর ওকে ভাল ক'রে দাও, আমি কাছে চাই না, দেখতেও চাই না, আর ওকে আসতেও দোব না কোনদিন—শুধু ও ভাল হয়ে উঠুক, হে ঠাকুর।'

আরও—পূর্ণবাবুর এত স্নেহ এত উদারতা—এটাও কেমন ভাল লাগে না।

মানুষটাকে এতদিন কয়েক বছরই দেখছে—অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ লোক, যে কোন অনিষ্ট করেছে বলে মনে করেন একবার—সে লোককে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন না, দীর্ঘদিন কেটে গেলেও সেকথা ভোলেন না—সুযোগের অপেক্ষা করেন শুধু প্রতিশোধ নেবার। বহু বছর অপেক্ষা করতে হলেও ধৈর্য ধরে থাকেন, ভুলে যান না কখনই। ···এ ওঁর মুখেই অন্য লোক অন্য ঘটনাপ্রসঙ্গে বহুদিন শুনেছে হেমন্ত, কেমন ক'রে কাকে কতদিন পরে জব্দ করেছেন—সেই বিবরণ নিজেই দিয়েছেন পূর্ণবাবু।

সেই লোক, শুধু ছাত্র বলে—ভাল ছাত্র হলেও—ওঁর মতে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা যে করেছে, তাকে ক্ষমা ক'রে তার নিরাময়ের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—এ যেন বিশ্বাস হয় না কিছুতেই।

একবার মনে হল বদরীবাবুর কাছে ছুটে যায়, কে খুব ভাল ডাক্তার আছেন কোথায় তিনি বলতে পারবেন—রসিকবাবুর খুব নাম হয়েছে আজকাল—ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে বলে। বদরীবাবুরও ছাত্র কমলাক্ষ—বিশ্বস্ত প্রিয় ছাত্র, তিনি শুনলে এখনই একটা ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, কী বলবে তাঁকে? কেন পূর্ণবাবুকে বিশ্বাস বা ভরসা করতে পারছে না—কী জবাব দেবে?

শুধু ওর লজ্জার কথা হলেও ইতস্ততঃ করত না, এ বিপদে মান-অপমান কিছুই মানত না সে—এর মধ্যে যে কমলাক্ষরও লজ্জা, অপমানের প্রশ্ন জড়িত আছে। এসব কথা শুনলে বদরীবাবু কমলাক্ষকে কি চোখে দেখবেন? তিনি শুনেছেন জানলে কমলাক্ষও যদি রাগ করে?

কিছুই করা হয় না তাই।

শুধু ছটফট করে আর ঠাকুরের সামনে মাথা খোঁড়ে মাটিতে। 'ওকে ভাল ক'রে দাও ঠাকুর, আর কখনও কাছে আসতে দোব না। ওর মুখ দেখব না, এ মুখ দেখাব না।'

সইস পরের দিন আসে শুকনো মুখে। খবর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, 'নেহি মাইজী, কুছ্ আচ্ছা খবর নেহি আছে। তবিয়ৎ উনকা বহুৎ খারাব! মাইজী, হামার তো আচ্ছা লাগছে না, হাপনি একবার গিয়ে দেখিয়ে আসেন।'

'সে কি! কী বলছ রামখেলাওন! এ কী সর্বনাশের কথা বলছ তুমি!'

আর্তনাদের মতো স্বর বেরোয় হেমন্তর গলা দিয়ে।

দেখতে দেখতে দুই চোখে তার জল ছাপিয়ে উঠে ঝরে পড়ে।

দু'হাতে কপালে চাপড়াতে থাকে সে।

রামখেলাওনও কাপড়ের খুঁটে চোখ মোছে। বলে, 'হাঁ মাইজী, হামার তো ভাল লাগছে না কুচ্ছু। কথা ভি বোলছেন না, ডাকলে সাড়া ভি দিচ্ছেন না…বড়া ডাক্তারবাবু অনেক করছেন কোশিস—কুচ্ছু কাম হচ্ছে না।'

যাওয়ার কথা হেমন্তও ভাবছে বৈকি! অসুখ শুনে পর্যন্তই ছটফট করছে যাওয়ার জন্যে। কে দেখছে, কে সেবা করছে কে জানে! হয়ত সেবাই হচ্ছে না। এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা তার, শুধু ধাত্রী-বিদ্যাই নয়, সেবার বিদ্যাও শিখেছে—সে যেতে পারলে অনেক কিছুই করতে পারত। পূর্ণবাবুকেও চোখে চোখে রাখতে পারত—কী করছেন না করছেন।

কিন্তু তারা যদি ঢুকতে না দেয়? যদি অনধিকারচর্চা ভাবে, অপমান করে?

কী শুনেছে তারা ওর সম্বন্ধে কে জানে! এতদিনেব এই উন্মত্ত প্রণয় যে তাদের কাছে চাপা আছে তা সম্ভব নয়। কমলাক্ষ তার উদ্দাম আবেগ চেপে রাখতে পারে নি নিশ্চয়ই, তার স্বভাবেই এ ধরনের সতর্কতা নেই। মুখ-চোখের ভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে সব কথা। বিশেষ দীর্ঘ রাত্রে বাড়ি আসছে, সপ্তাহে দু-তিন দিনই সারারাত বাইরে কাটিয়ে আসছে—এর অর্থ কারও না বোঝার কথা নয়। মা ও স্ত্রী তো বিশেষ ক'রে বুঝবেই। যাদের সর্বনাশ হয় তারা ঠিক বুঝতে পারে। আভাসে-ইঙ্গিতে চোখের পল্লব ফেলায় টের পায় তারা।

তাছাড়াও, এসব কথা বাতাসের আগে ছোটে।

কতলোক গরজ ক'রে জানিয়ে এসেছে হয়ত। হয়ত পূর্ণবাবুই শুনিয়েছেন এর ভেতর। সইস কোচম্যান কত লোকেই তো জানে। আজ যদি হেমন্ত সে বাড়িতে

'অবিদ্যে', 'পিশাচী', 'ডাইনী' প্রভৃতি এক্ষেত্রে-স্বাভাবিক অভিধায় পরিচিত হয়ে থাকে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কাউকে দোষ দিতেও পারবে না সে।...কমলাক্ষের জন্যে সে-সব অপমানও সে সইতে রাজী আছে—যদি তাকে সেবা করার সুযোগ পায়। কিন্তু সে আশা যে নেই—তা নিজের মনেই বুঝতে পারছে।...

পরের দিন রামখেলাওন আর এল না।

এ না আসার একটাই অর্থ হয়। আরও বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিংবা, কিংবা—

সারা সকাল ঘর-বার একতলা-দোতলা ক'রে বেলা দশটা নাগাদ আর থাকতে পারলে না হেমন্ত, দারোয়ানকে ডেকে বলল, 'তুমি একবারটি যাও শিউপূজন, কোথাও থেকে কারও কাছ থেকে খবরটা নিয়ে এসো—যেমন ক'রে হোক। পরিচয় দিও না, কোথা থেকে যাচ্ছ বলো না, তাহলে হয়ত মন্দ কিছু বলতে পারে। এমনিই—। তোমাকে কি চিনতে পারবে ? একদিন গিয়েছিলে, সেও তো বাবুর সঙ্গেই দেখা হয়েছে শুধু।... কী জানি কি করবে, আমি আর ভাবতেও পারছি না কিছু। যা হয় করো, যা ভাল বোঝো—শুধু খবরটা—'

বলতে বলতেই কেঁদে ফেলে।

'আমি এখনই যাচ্ছি দিদিবাবু', শিউপূজন ব্যস্তভাবে বলে, তারও মুখ শুকিয়ে গেছে ক'দিনে, 'ছুটেই যাচ্ছি। সে আমি ঠিক খবর বার ক'রে নেব।—রামজী ভগবান ভালই করবেন, আপনি ব্যস্ত হবে না, অত উপকারী লোক—তার কখনও অনিষ্ট হয় ?'

এইটুকুই যেন অনেকখানি আশ্বাস। অশিক্ষিত ভৃত্যশ্রেণীর লোক তার মুখের দুটো ফাঁকা সান্ত্বনা—তাকেই যেন ঈশ্বরের অভয় বলে মনে হয়। সেইটেকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে।

সে আশ্বাস যেতেও দেরি হয় না অবশ্য। এগারোটা, বারোটা, একটা বেজে যায়, শিউপূজন ফেরে না।

তখন পাগলের মতো একবস্ত্রে নিজেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে।

ঝি এসে ধরে, 'কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি, তুমি কি পাগল হয়েছ ? এমনভাবে একা একা কোথায় যাবে ? চাদরটা পর্যন্ত নাও নি—। যেতে হয় আমিও যাই চলো।'

'তবে তুইও আয়, যেমন আছিস তেমনি আয়। চাদরে আমার দরকার নেই, লাজ-লজ্জা মান-অপমানের কথা ভাববার ঢের সময় পাবো।—একটা গাড়ি ডাক বরং—না না, ঐ হ্যারিসন রোডের মোড়েই পাবো—'

'রসো। বলি গাড়ি চড়লে পয়সা তো লাগবে, এক মিনিট সবুর করো—'

ঝি ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢোকে, পয়সা আর চাদরের জন্যে, আর ঠিক সেই সময়েই নজরে পড়ে—শিউপূজন ফিরছে—ভিজে কাপড়ে।

কাপড়-জামা সব সপ-সপ করছে ভিজে, সদ্য সবসুদ্ধ বোধহয় কোথাও ডুবে চান ক'রে এসেছে—বোধহয় গঙ্গাতেই—

পাথর হয়ে গেল হেমন্ত। সব আকুলতা যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল ওর।

এই স্নান ক'রে আসার অর্থ—নিজের মনের মধ্যে বারংবার অস্বীকার করার চেষ্টা সত্ত্বেও—অনুমান করতে পারে সে।

সর্বনাশ যা হবার হয়েই গেছে, কিছুই বাকী নেই আর।

শিউপূজন ওকে দেখেই হাহাকার করে কেঁদে উঠল, 'দিদিবাবু—রামজী দয়া করলেন নাই, ও হো হো—'

আর কিছু শুনতে পারল না হেমন্ত, আর কিছু মাথাতেও গেল না।

সব শূন্য, সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গভীর শান্তি, গভীরতর সুষুপ্তি।

কোথাও কেউ কি পড়ল দড়াম ক'রে? শব্দ হল যে?—কোথায় বহুদূরে যেন কারা হৈ-হৈ ক'রে উঠল, 'দ্যাখ দ্যাখ—ধর ধর'—এই ধরনের শব্দ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল কারা—চারিদিকে চেঁচামেচি—তারপরই সব শান্ত, নিস্তব্ধ।

হেমন্তর জ্ঞান হল সন্ধ্যার একটু আগে।

চোখ চেয়ে ও প্রথমটায় যেন কিছুই দেখতে পেল না। তারপর একটু একটু ক'রে চোখে পড়ল সব।

এ আবার কি? সবাই মিলে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কেন ওর মুখের ওপর?

ডাক্তার কৈলাসবাবু কেন এখানে?

ওঁকে কে ডাকল, কার জন্যে এলেন উনি? এ পাড়ার মধ্যে বড় ডাক্তার, অনেক ফি, দু'টাকা বোধহয়—কিংবা চার টাকা।

ভ্রূ কুঁচকে তাড়াতাড়ি হাত তুলে অভ্যাসমতো মাথার কাপড়টা টেনে দিতে গেল, পারল না। হাতের পালকাতে অসহ্য ব্যথা, হাত নাড়া যাচ্ছে না।

কৈলাসবাবু বললেন, 'গুড, সেন্স্ ফিরেছে। এনটায়ার সেন্স্ই। হাত নাড়তে যাচ্ছিল, মানে মাথায় কাপড়টা টানতে চাইছে।—লজ্জা যখন এসেছে তখন পুরো জ্ঞানটাই ফিরেছে। আর ভয় নেই।—আমি চলি এখন। এখানে তোমরা কে থাকবে? আপনার লোক কেউ নেই?—ইনি তো নার্স না মিডওয়াইফ, কলেজে খবর দিয়ে একজন ভাল নার্স কাউকে আনিয়ে নিলে ভাল হয়।—এনি হাউ, তোমরাই বুঝে নাও। এই মিক্স্চার, মানে শিশির ওষুধটা চলবে তিন ঘণ্টা অন্তর। আর একটু জ্ঞান ফিরলে দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে পাশ ফিরিয়ে—এই এমব্রোকেশ্যন মানে মালিশটা রইল—মালিশ ক'রে দিও মাজায়, পিঠে, হাতের পালকায়, কনুইয়ে। মালিশ গরম গরম করতে হবে না, মালিশ হয়ে গেলে আবার সেমিজ কি জামা পরিয়ে—কী পরেন তা তো জানি না, সেমিজই তো দেখছি—একটু সেঁক ক'রো কেউ। আগুনে ধরে কাপড় তাতাতে পারো কিংবা লণ্ঠনের মাথায় রেখে—ফ্ল্যানেল হলে ভাল হয়, না পেলে সুতীর কাপড়ই গরম ক'রে ক'রে সেঁক দিও—'

কৈলাসবাবু উঠে পড়লেন।

এইবার পরিষ্কার সব মনে পড়ছে।

দারোয়ান চান ক'রে ভিজে কাপড়ে আসছিল—চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল—তারপর আর কিছু মনে নেই।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেই রাস্তার ওপরই—ফুটপাথে, তাতেই বোধহয়

সর্বাঙ্গে এই অসহ্য ব্যথা।

এইবার আরও মনে পড়ল।

সর্বনাশের কথাটা। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। ওকে ভালবাসবার, ওর জন্য চিন্তা করবার, ওকে দেখাশুনো করবার কেউ আর রইল না। সমস্ত বিবেক বিবেচনা ত্যাগ ক'রে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মত্তের মতো ভালবাসবার যে একটি মাত্র লোক পেয়েছিল জীবনে, মাত্র এই কয়েক মাস—সে আর নেই।

আর কোনদিন তাকে দেখতে পাবে না, চিরকালের মতোই চোখের সামনে থেকে মুছে গেল সে। আর কেউ অমন আবেগগাঢ় আলিঙ্গনে পিষ্ট করবে না কোনদিন, পাগলের মতো সর্বাঙ্গে চুমু খাবে না। অবোধের মতো সরল শিশুর মতো উৎসাহে উজ্জ্বল, আনন্দে উচ্ছল—বিন্দুমাত্র-প্রত্যাখ্যানে-আউতে-পড়া সে সুন্দর মুখ আর কখনও চোখে পড়বে না, শুনতে পাবে না সেই স্তুতি করার মতো রূপ ও গুণের প্রশংসা—কেউ তার জন্যে, শুধুমাত্র তাকে চোখের দেখা দেখার জন্যে তিনক্রোশ রাস্তা হেঁটে গিয়ে পাঁচিল ডিঙোবে না কোনদিন। সব শেষ, সব শেষ।

কে জানত সেদিন যে, সেই লজ্জায় অনুশোচনায়—ওর অপমান ও সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হবার জন্যেই অনুশোচনা—ম্লানমুখে যে চলে গেল সেদিন, যাওয়ার আগে একটা বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত ক'রে যেতে পারল না, সেদিনের সেই বিবর্ণ স্বেদাক্ত মুখে অপরাধীর মতো পালিয়ে যাওয়াই শেষ-যাওয়া। যদি আর একবারও অন্তত দেখা হত, অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে সেদিনের সব লজ্জার আঘাত মুছে নিতে পারত—আর একটিবার অন্তত সে ফুলের মতো কোমল নির্মল মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারত—তাহলেও বোধহয় এত ব্যথা বোধ করত না।…

আশ্চর্য! তবু মৃত্যু তো হল না!

স্বামীকে খেয়েছে, কমলাক্ষকে খেল—আরও কী আছে অদৃষ্টে! আরও কত আঘাত দেবার জন্যে বাঁচিয়ে রাখছেন ভগবান?

ভাবতে ভাবতেই ডুকরে কেঁদে উঠল হেমন্ত চিৎকার ক'রে।

'চুপ করো, চুপ করো দিদিমণি। এই শরীল তোমার। তিনি আজ বেঁচে থাকলে, এই যে পড়ে গেছ, ভির্মি গেছ—পাগল হয়ে উঠত। তার মুখ মনে ক'রে থির হও একটু—'

দারোয়ান দরজার কাছ থেকে বলল, 'ওবাড়ির বড়দিদিবাবুকে খবর দিয়ে এসেছি চারুর মা, তিনি আর ওবাড়ির বাবু এসে পড়বেন এখুনি—'

এই অবস্থা দেখে ঝি দারোয়ান ঠাকুর—ওরাই নিশ্চয় নিজেদের বুদ্ধিতে খবর দিয়েছে। স্বাভাবিক সেটা। তাকেই জানে ওরা, গোপালীকে—দুঃখে-সুখে সে-ই একমাত্র আপনজন। সুতরাং এ বিপদে দিশেহারা হয়ে তাকে খবর দেবার কথাই আগে মনে পড়েছে। এটুকু ওরা বুঝেছে যে, পূর্ণবাবুকে এখন এই অবস্থায় ডাকা উচিত হবে না; কমলাক্ষের শোকে মূর্ছা গেছে হেমন্ত, এখনও জ্ঞান হচ্ছে না…এ সংবাদ তাঁর পক্ষে রুচিকর হবে না, সম্ভবত হেমন্তরও সহ্য হবে না এ সময় তাঁর সঙ্গ।

তার মানে—লজ্জা অপমানের যেটুকু বাকী ছিল—সেটুকুও আজ পাওয়া হয়ে গেল। কমলাক্ষের ব্যাপারটা এতদিন গোপালীরা জানত না। কোথাও কারও মুখে গুজব

শ্বনলেও এতটা নিশ্চয় শোনে নি—এবার আর কিছ্বই জানতে শ্বনতে বাকী থাকবে না। গোপালী শোধ তুলবে না প্রথমদিককার সে অপমানের—তেমন মান্বষই নয় সে—কিন্তু হেমন্ত ম্বখ দেখাবে কি ক'রে? সে কিছ্ব বলবে না বলেই তো আরও লজ্জা ওর।

তব্ব মনে হল—সেও আর পারছে না এ দ্বঃসহ শোকের কথা কাউকে না জানালে, এ স্বদ্বর্লভ প্রেমের কথাও—সে আর থাকতে পারবে না। গোপালীর মতো মান্বষ, যে স্নেহ করে, যার ব্বক প্বথিবীর তাবৎ মান্বষের প্রতি সহান্বভূতি ও ভালোবাসায় প্বর্ণ—তেমনি একজনকে না পেলে তার কাছে দ্বঃখের বোঝা উজাড় করতে না পারলে ব্বকটা ফেটে যাবে ওর।

গোপালীর কাছে হার মানতেও স্বখ।

॥ ২১ ॥

ক্রমে ক্রমে সবই শোনা গেল। প্বর্ণবাব্ব কিছ্বদিন আসেন নি বটে, তিনি পাকা লোক, প্রাথমিক শোকের প্রবল আঘাত সামলাবার সময় দিতে হয় এটা তিনি জানেন—তব্ব খবরগ্বলো জানার অস্ববিধা হল না। গোপালীর বহ্ব পরিচিত লোক চারিধারে, সে-ই খবর যোগাড় করল।

কমলাক্ষের অস্বখের খবর পেয়েই ছ্বটে এসেছিলেন প্বর্ণবাব্ব। তার পর থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর ওর বিছানার পাশ থেকে নড়েন নি।

নিজেই ওষ্বধ দিয়েছেন, ব্বকে সেঁক দেবার ব্যবস্থা করেছেন, নিজে হাতে মসনের প্বলটিশ বসিয়েছেন, মিক্‌স্‌চার তৈরী করিয়ে এনে বসে থেকে খাইয়েছেন ঘড়ি ধরে, জ্বর দেখেছেন, বাতাস করেছেন। ওঁর মতো বয়স্ক লোক কোন ছাত্রর জন্যে এরকম অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে, সেবা করে—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কমলাক্ষ বাঁচে নি—সে তার ভাগ্য।

তার পরও অনেক করেছেন। প্রায়-বালিকা স্ত্রী এবং মায়ের কথা চিন্তা ক'রেই আরও দ্রুত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়েছেন; যাদের ব্বকে শেলের মতো বেজেছে, মর্মান্তিক আঘাত লেগেছে যাদের—যাদের জীবন মর্ভূমি হয়ে গেল এই একটি লোকের ম্বত্যুতে—তাদের চোখের সামনে থেকে ম্বতদেহটা যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া যায় ততই মঙ্গল, এই ভেবেই তিনি প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন, বেলা ন'টায় যে মারা গেছে তার শব সাড়ে দশটার মধ্যে রওনা করিয়ে দিয়েছেন এবং সাড়ে এগারোটায় সেটা চিতায় তোলার ব্যবস্থা করেছেন। নিজের পাড়া থেকে ব্রাহ্মণের ছেলে আনিয়েছিলেন তিনি, তাদের প্রচুর টাকা দিয়েছেন—শ্মশানে খাওয়ার জন্যে এবং গাড়ি ভাড়া ক'রে ফেরার জন্যে।

তিনি যে মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। কিন্তু কমলাক্ষর পরিবারের লোকেরা এতে খ্বশী নয়। ওর ছোটভাই ছেলেমান্বষ—এরা স্ত্রীলোক, তাও একজন সদ্যবিধবা নাবালিকা, তার মাত্র পনেরো-ষোল বছর। তারা এই আকস্মিক আঘাতে শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিছ্ব ভাবার কি সিদ্ধান্ত নেবার—অথবা কোন কাজে বাধা দেবার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। বিশেষ প্বর্ণবাব্বর মতো লোক যেখানে অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে সব করাচ্ছেন, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে, সেখানে কে

কি বলবে? পাড়ার দু'চারজন খবর পেয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরও কারও কিছু বলার কথা মনে থাকে নি। বরং তাঁরা এতখানি আন্তরিকতায় অভিভূত ও কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন।

আপত্তি ও অসন্তোষ উঠেছে পরে।

এই শহরেরই উপকণ্ঠে ওদের অনেক আত্মীয় আছে। সাঁতরাগাছি বরানগরে কাকা-জ্যাঠারা থাকেন। খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই এক পাল। রাবণের বংশ ওদের, তার মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছ'জন কমলাক্ষর থেকে বয়সে বড়, ভাল কাজ করে সবাই। রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী লোক তারা। শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর গোঁসাইবাবুদের কুটুম। তিনি অসুখের খবর পেয়েছিলেন বটে—পূর্ণবাবুই নাকি দিয়েছিলেন—কিন্তু সে যে এত গুরুতর অসুখ তা বলেন নি। জ্বর, বুকে একটু 'প্যাচ'-মতো হয়েছে, এইটুকুই বলেছিলেন। ওর শ্বশুর অবিনাশবাবু নিজে সেদিন অসুস্থ ছিলেন, তাই তখনই আসতে পারেন নি। পরের দিন আপিসে এসেই ছুটি ক'রে বেরিয়েছেন—কিন্তু ততক্ষণে মৃতদেহটা সুদ্ধ পাচার হয়ে গেছে। ছুটে শ্মশানে গিয়ে দেখেছেন চিতা জ্বলে গেছে তার আগেই। বারো বছরের ছোটভাই, সে কিছুই বোঝে নি, তাকে যা করতে বলেছেন এঁরা, সে তাই করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কমলাক্ষর বোনের শ্বশুরবাড়ি গোয়াড়িতে একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখা হয় নি।

এঁরা সকলেই নানা কথা বলতে লাগলেন। নানারকম কানাঘুষো উঠল। শেষ পর্যন্ত কানাঘুষোতেও সীমাবদ্ধ রইল না সন্দেহটা। অভিযোগ বেশ স্পষ্ট আকার ধারণ করল। হেমন্তর কথাও উঠল। পাঁক ঘুলনোর শেষ রইল না, কদর্যতা তার নগ্নতম রূপ নিয়ে দেখা দিল। দুর্নাম কেমন ক'রে কোথা দিয়ে ঠিক পেঁছে যায়—যেন বাতাসে ভর দিয়ে হাঁটে, দেখে অবাক হয়ে গেল সে।···রটনাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল, পূর্ণবাবুর রক্ষিতার সঙ্গে কমলাক্ষর প্রেম হয়েছিল, তার ফলে অবৈধ সম্পর্ক, সেই আক্রোশেই তিনি বিষ দিয়ে মেরেছেন কমলাক্ষকে।

কে জানে আগেও কোথাও কিছু খাইয়েছেন কিনা, তার ফলেই হয়ত এই অসুখ।

সরল বিনত ছেলে কমলাক্ষ। তার পক্ষে মাস্টার মশাইকে সন্দেহ করা কল্পনাতীত। অসুখ হওয়ার পরে চিকিৎসক সেজে এসে ওষুধের নাম ক'রে বিষ দেওয়া তো আরও সোজা। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ শেষ ক'রে তবে বিছানার পাশ ছেড়েছেন। শুধু তাই নয়—সবচেয়ে যেটা বড় প্রমাণ হতে পারত ওঁর বিরুদ্ধে, সর্বাগ্রে সেইটেই নষ্ট করিয়েছেন—রোগীর বিষজর্জর মৃতদেহটা।

একটা কথা আর একটাকে টেনে আনে, যেমন এক পাপ ঢাকতে শতেক পাপ করে মানুষ।

এখন শোনা যাচ্ছে কমলাক্ষর অসুখের খবর পূর্ণবাবুকে কেউ দেয় নি। সেক্ষেত্রে উনি খবর পেলেন কেমন ক'রে?

উনি ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ হতে পারেন—এসব সাধারণ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী এখনও পর্যন্ত ওঁর মনে থাকার কথা নয়। কোন বড় ডাক্তার বা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক—যাঁরা বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত—এ কাজ করেন না। এটাকে তাঁরা ধৃষ্টতা বা

অনধিকার চর্চা বলে মনে করেন।

বিশেষ যখন ডাক্তারের অভাব নেই, কমলাক্ষর অসুখ হয়েছে শুনলে কলেজের বহু ডাক্তারই ছুটে আসতেন, সবাই ওকে স্নেহ করেন। কাউকেই একটি কথা বলেন নি পূর্ণবাবু। ওষুধ কি দিয়েছেন কেউ জানে না। মিক্‌স্‌চার ও পুরিয়া নিজে হাতে তৈরী ক'রে এনেছেন মেডিকেল কলেজের ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে। অতবড় প্রবীণ ডাক্তার ও অধ্যাপক কি ওষুধ নিচ্ছেন, কার জন্যে, তা নিয়ে সেখানে কেউ মাথা ঘামায় নি।

সবচেয়ে অমার্জনীয়—এই তাড়াহুড়ো ক'রে দাহ করানোটা। যেখানে আশেপাশেই হাটের ফিরিঙ্গি আত্মীয়—সেখানে কেউ একটা খবর পেল না, কেউ জানল না, ভিন্ন পাড়ার অনাত্মীয় লোক এসে নিয়ে গেল—অনাথ ভিখিরীর মতো শ্মশানে গেল সর্বজন-প্রিয় আত্মীয়দের বুকের মণি ছেলেটা—শ্বশুর-শালা-কাকাদের পর্যন্ত জানানো হল না, এটা রীতিমতো সন্দেহজনক বৈকি!

অভিযোগটা ক্রমেই যখন বেশ স্পষ্ট ও সরব হয়ে উঠল, তখন কেউ সেটা পুলিশের গোচর ক'রে থাকবেন। কারণ, থানা থেকে লোক এসেছিল পূর্ণবাবুর বাড়ি—একদিন নয় দু'দিন, এটা সবাই জানে। পুলিশ মেডিকেল কলেজেও গিয়েছিল, আউটডোর ডিস্‌পেন্‌সারীর যে ভারপ্রাপ্ত কম্পাউন্ডার তাকেও নাকি থানায় যেতে হয়েছিল। একরাত হাজতেও ছিল সে।

জেল না হোক চাকরিটা যেত, কিন্তু তাতে পূর্ণবাবুও রেহাই পান না, সেই জন্যেই বেঁচে গেল লোকটি। পূর্ণবাবু বৃথাই এতদিন কলকাতায় ডাক্তারি করেন নি, তাঁর নিজের বিভাগে যথেষ্ট নামডাক, বদরীবাবুর পরেই তাঁর প্র্যাকটিশ। তাছাড়াও, বর্তমান লাটসাহেবের স্ত্রীর কী একটা জরায়ুঘটিত অসুখ হঠাৎ বেড়ে উঠতে—সে সময় কোন সাহেবডাক্তার কলকাতায় ছিলেন না, বদরীবাবুও বোম্বেতে গিয়েছিলেন পরীক্ষা নিতে—পূর্ণবাবুকেই ডাকতে হয়েছিল, আর পূর্ণবাবু নাকি ভালও করেছিলেন লাটপত্নীকে।

সেই খাতিরটা কাজে লাগল এবার। লাটসাহেবের ভ্রূকুটিতে সাহেব পুলিশ কমিশনার সমস্ত রকম 'এনকোয়ারি' বন্ধ করে দিলেন, সব মামলাটাই ধামাচাপা পড়ে গেল। একটি পুত্রহারা বিধবা ও একটি স্বামীহারা বালিকার কান্না লাটপ্রাসাদ পর্যন্ত পেঁছল না। পূর্ণবাবু সেখানে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

এসব ঘটনার—অভিযোগ, অনুসন্ধান ও তার অকালমৃত্যুর পালা শেষ হতে হতে বেশ কিছুদিন কাটল। এ খবর হেমন্ত এক দিনেও পায় নি, দফায় দফায় পেয়েছে। তার আগেই পূর্ণবাবু একদিন এসেছিলেন, কমলাক্ষর মৃত্যুর দিন দশ-বারো পরে। বোধহয় শ্রাদ্ধর পরের দিন।

এইখানেই পূর্ণবাবুর একটু হিসেবে ভুল হয়ে গিছল বোধহয়।

ব্রাহ্মণের মেয়ে হেমন্ত, ব্রাহ্মণ কমলাক্ষর অশৌচান্তের দিন কবে, কবে শ্রাদ্ধ—এ তো তার জানাই। সেদিন সারাদিন খায় নি, সারাদিনই কেঁদেছে। গোপালী এসেছিল, সেও শান্ত করতে পারে নি, খাওয়াতে পারে নি কিছু। নিয়ে যেতে চেয়েছিল সঙ্গে, তাতেও রাজী হয় নি। নিভৃতে কাঁদতেই চায় সে, চায় চোখের জলে তর্পণ করতে

মৃতের উদ্দেশে—চায় প্রায়শ্চিত্ত করতে। কেউ কিছু বলুক না বলুক, হেমন্ত নিজের মনে বুঝেছে, তাকে ভালবেসেই প্রাণ হারিয়েছে কমলাক্ষ, তার জন্যেই।

ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই এসেছেন পূর্ণবাবু।

শীর্ণ শুষ্ক মুখ, রোদনারক্ত চোখ দেখে পূর্ণবাবুর বুকেও দাহ দেখা দিয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু হেমন্তর শরীরে প্রতি লোমকূপে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে, সোজা নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'যাও! বেরিয়ে যাও বলছি!...যদি এখনও মান-অপমানের জ্ঞান কিছু থাকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও!...নিকাল যাও! নইলে দারোয়ান ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াব!'

পূর্ণবাবু বোধকরি ঝড়-তুফানের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, ঠিক এ বজ্রপাত আশঙ্কা করেন নি। প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেন, তারপর—ঝি-চাকরদের সামনে লজ্জা ও অপমান ঢাকতে, যেন এটাকে তামাশা বলে নিয়েছেন এইভাবে—হাসি-হাসি মুখে আমতা আমতা ক'রে কি বলতে গেলেন; ঠিক শোনে নি হেমন্ত, তবে তার মনে হয়েছিল পরে, বলেছিলেন—'না, মানে খুব ব্যস্ত ছিলুম বলেই ক'দিন—' ইত্যাদি। যেন ক'দিন না আসাতেই হেমন্তর রাগ হয়েছে।

কিন্তু হেমন্ত এবার সংহারমূর্তি ধারণ করল বলতে গেলে, চিৎকার ক'রে উঠল, 'বেরোও, বোরোও বলছি, আভি নিকালো! বেহায়া, বেইমান! লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে দাঁত বার করতে এসেছ এখানে! আশ্চর্য, তোমার রক্তে কি কোথাও এতটুকু মনুষ্যত্ব নেই? এর পরেও তুমি আসতে পারলে এখানে? কোন্ বাপে জন্ম দিয়েছিল তোমাকে—তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে? একটা বাপে দিয়েছিল বলে তো মনে হয় না, হাড়িচাঁড়ালের জন্ম তোমার!'

পূর্ণবাবুর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল এবার। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে, পাগলকে থামাবার মতো ক'রে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এই, কী হচ্ছে কি—বাপ তোলা—'

'চোপ! চোপ রও বলছি! রাক্ষস খুনে কোথাকার! একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন ক'রে সেই রক্তমাখা হাতে হাজির হয়েছ এসে—পীরিত করতে! যাও বলছি। এই শিউপূজন—এই লোকটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দাও বাড়ি থেকে, আর কখনও ঢুকতে দিও না।'

পূর্ণবাবু এবার ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। এতদিনের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার মুখোশ খসে পড়ল তাঁর। কুৎসিত একটা ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'অ! রসের নাগর মরেছে বলে একেবারে বুক ভেঙে গেছে, না?.. আমি বেইমান! তুই কি? খান্‌কি, খান্‌কির ঝাড়! আমার দেওয়া বিছানায় বসে তাকে নিয়ে সোহাগ করতে লজ্জা করে নি? তখন এত লজ্জা-সরমের জ্ঞান ছিল কোথায়?'

'আমার লজ্জা-সরম হবে কেন?' সদম্ভে জবাব দেয় হেমন্ত, 'আমি তো উচিত কাজই করেছি! যে পথে এনেছ, সে পথের এ-ই তো স্বাভাবিক পরিণাম! বেইমানীটাই পরিণাম! বেইমানীটাই বা কিসের?...তোমার সঙ্গে আমার দোকানদানি সম্পর্ক—কেনাবেচা। যা দিয়েছ তার দুনো উশুল হয়ে গেছে। বিকিয়ে তো দিই নি নিজেকে, কেনা বাঁদী নই কিছু। মন্তরপড়া পরিবারও নয়। তোমারই তো বোঝা উচিত ছিল,

উচিত ছিল হিসেব ঠিক রাখা—এ পথে যে এসেছে একবার, নামতে শুরু করেছে—সে আর থামবে কেন?···ইজ্জৎ ধর্ম সবই যখন গেছে, তখন বুড়োকে নিয়েই খুশী থাকব কিসের জন্যে? তুমি তোমার সুখ দেখবে—আমি দেখতে জানি না!'

বলতে বলতে হাঁপিয়ে যায় যেন। উপবাসে, ক'দিনের অবিরাম কান্নায়, আর বিলাপে শরীর ভেঙ্গে এসেছে। একটু চুপ ক'রে থেকে, দু'হাতে বুক চেপে ধরে বলে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলাতেই পাপ হল আমার, চান ক'রে প্রাচিত্তির করতে হবে। তুমি বিদেয় হও, ঝিকে গোবর-জল ছড়া দিতে বলি—।'

পূর্ণবাবুর মুখ পৈশাচিক ক্রূরতার মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে উঠল, বোধহয় অতিরিক্ত ক্রোধেই। কিন্তু তিনি আর দাঁড়াতে সাহস করলেন না, কোনরকম বাক-বিতণ্ডা করতেও না। কোনদিকে চাইতেও পারলেন না, আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

॥ ২২ ॥

পূর্ণবাবু এতটা অপমান লাঞ্ছনা সহজে হজম করবেন, তা মনে করে নি হেমন্ত।

যা করেছে তার জন্যে অনুতপ্ত নয়, তবু নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু চিন্তিত ছিল বৈকি! এটা ঠিক যে, অন্নটা পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারবেন না আর, তবে চেষ্টা করলে কিছুটা ক্ষতি করতে পারবেন হয়ত।

কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। বোধহয় এইসব নানারকম জনশ্রুতি ওঠাতে ও থানা-পুলিশে টানাটানি হওয়াতে—তিনিও একটু দমে গিয়ে থাকবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কমে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সর্বোপরি, হেমন্তর নাম ক'রে অপপ্রচার করাও বিপজ্জনক—তাতে অপরাধটাই সমর্থিত হবে।

ফলে হেমন্তর পসার কমল তো নাই-ই, বরং নামডাক বাড়তেই লাগল ক্রমশ। স্পষ্টবক্তা লোক—মক্কেলকে সমীহ ক'রে, তোষামোদ ক'রে কথাগুলো গুড়ে ঢেকে দিতে চেষ্টা করে না—সোজা কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে মুখের ওপর। এতে কেউ কেউ চটে ঠিকই—খুশী হয় বেশির ভাগ। বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করে। তাতে পসার বেড়েই যায় আরও, একজনের মুখ থেকে সুখ্যাতি শুনে আর একজন ছুটে আসে।

আরও কারণ সুনামের—অত্যন্ত কাজের লোক।

কাজ করে নিখুঁত, নিপুণভাবে, দ্রুতও। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাকি মেমরাও পেরে ওঠে না। ডাক্তার মহলেও 'এফিসিয়েন্ট' হিসেবে নাম রটে গেছে—শক্ত কোন কেস হলে, কিংবা যেখানে অপারেশন করতে বা ফরসেপ দিতে হবে—সেখানে ডাক্তাররা বিশেষ ক'রে ওর নাম করে দেন।

তাছাড়া, জানাশুনো ব্রাহ্মণের বাড়ি ছাড়া কোথাও কিছু খায় না। সারা দিন থাকতে হলেও হাসিমুখে উপোস ক'রে বসে থাকে। দু'-একটি বাঁধা বাড়িতে নারায়ণ বা প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ আছে—ব্রাহ্মণ রাজবাড়ি আছে ক'টা, যেখানে অন্নভোগ হয়, সেখানেই শুধু দরকার হলে প্রসাদ গ্রহণ করে। এতেও—নিষ্ঠাবতী ও শুদ্ধাচারিণী বলে অনেকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

যে বাড়িটা কমলাক্ষ বায়না করিয়ে গিয়েছিল, সেটা কেনা হয়ে গেছে নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যেই। আগে ভেবেছিল কিনবে না, অপয়াবাড়ি—কিন্তু কমলাক্ষর খুব ইচ্ছা ছিল, সে নিজে উদ্যোগী হয়ে বায়না করিয়েছে, সেই ভেবেই কিনল শেষ পর্যন্ত। তার পরও কিনেছে একটা, এই বাড়িটা।...বাড়িওলা বিক্রী করবেন খবর পাওয়া মাত্র সে দৌড়েছে তাঁর কাছে। সব টাকাটা হাতে ছিল না, গোপালীকে বলে ধন্নুবাবুর কাছে আগের বাড়িটা বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছে। গোপালী বন্ধক রাখতে চায় নি, এমনিই ধার দিতে চেয়েছিল, হেমন্ত রাজী হয় নি। বলেছে, 'মানুষের জীবন—ভাষ্যি কি? দেখলে তো চোখের সামনেই। আমি ম'লে দেনা শোধ করবে কে? চোদ্দটা ওয়ারিশন এসে জুটবে তখন—কিন্তু দেনার দায়িক কেউ হবে না। না ভাই, বন্ধকই থাক, বরং সুদ কিছু ছেড়ে দিও পরে—সে ঢের ভাল।'

এ বাড়ি এতদিন বিষ ছিল, এইখানেই তার অধঃপতন শুরু, লজ্জা ও কলঙ্কের চিহ্ন এ বাড়ির অণু-পরমাণুতে—কিন্তু কমলাক্ষর স্মৃতি একে নতুন মূল্য দান করেছে। মনে হয় তার আত্মা এখানে খোঁজ করতে আসবে ওর, দেখতে না পেলে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যাবে।

এর পর অনেক দিন চলে গেছে।

অনেক ঘটনা ঘটেছে।

তারক এনট্রান্স পাস করেছে সগৌরবে, স্কলারশিপ পেয়ে।

হেমন্তর বরাবরই ইচ্ছা ছিল ছেলে ডাক্তারী পড়ে, শুধু কেমনভাবে পাস করে সে-ই একটা আশঙ্কা ছিল। ঐ রেজাল্ট-এর পর মেডিকেল কলেজে ঢোকার কোন বাধা থাকার কথা নয়, থাকেও নি। তবু হেমন্ত বদরীবাবুকে গিয়ে ধরেছিল, তিনি 'ফ্রী' পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। হেমন্তর দরকার ছিল না—তবে তারক খুশী হবে বলেই বাধা দেয় নি। মার ওপর নির্ভর করতে হবে না বলেই তার আনন্দ। আরও সুবিধে হয়ে গেল—এক বছর পর থেকেই স্টাইপেণ্ড পেতে লাগল, বরাবরই পেয়ে গেল।

তারপর একসময় ডাক্তারীও পাস করল খুব ভালভাবে, সোনার মেডেল পেয়ে। অধ্যাপকরা বললেন, 'তুমি বিলেতে যাও, স্কলারশিপ তো পাবেই, আমরা চেষ্টা করলে সেখানেও সুবিধে ক'রে দিতে পারব একটু-আধটু।...তোমার মতো ছেলেদেরই বিলেত যাওয়া উচিত।...বেশী খরচা লাগবে না, যেটুকু লাগবে তোমার মা অনায়াসে বহন করতে পারবেন।'

তারক রাজী হল না। সবিনয়ে বলল, 'আপনারা মাপ করবেন, মা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন আমার মুখ চেয়ে। সেই মাকে ফেলে আমি স্বর্গে যেতেও রাজী নই। বিলেত আমার মাথায় থাকুক, খুব উন্নতি করব, অনেক টাকা রোজগার করব, এ আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। যত তাড়াতাড়ি পারি মাকে রেহাই দিতে চাই। মাকে আর এ কাজ করতে না হয় বেশীদিন, সে-ই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

খুশী হল হেমন্ত, তৃপ্তি বোধ করল। ছেলে বিলেত গেলে বাধা দিত না এটা ঠিক। বিশেষ বদরীবাবু বলেছিলেন, 'তোমার ছেলের স্বাস্থ্য তো ভাল না, বছর দুই বিলেতে থাকলে শরীরটাও বনে আসবে।' সেটাও মনে ছিল। কিন্তু ছেলেকে বহুদিন দেখতে

পাবে না—এ প্রশ্ন ছাড়া একটা বড় আশঙ্কাও ছিল, যদি মেম বিয়ে ক'রে সেখানেই থেকে যায়, আর যদি না ফেরে? কি আকর্ষণেই বা ফিরবে? এক মা—কিন্তু চিরদিনই বলতে গেলে যে মা-ছাড়া, বাইরে বাইরে মানুষ হয়েছে, তাকে কি মায়ের টান সেখানের টান ছাড়িয়ে টেনে আনতে পারবে?

তৃপ্ত হল, নিশ্চিন্ত হল তাই।

ছেলেকে বলল, 'বেশ একটা ভাল জায়গা বাছ, ভাল ক'রে একটা ডাক্তারখানা সাজিয়ে দিই, প্র্যাকটিশ শুরু কর।

এইবার ছেলের মনের চেহারাটা ধরা পড়ল।

অনেকক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না মা, কাজ নেই এখানে বসে। আমি···আমার কলকাতায় থাকার ইচ্ছে নেই। এদেশেই না। আমি বাইরে চাকরির দরখাস্ত করছি, আমার—আমার ইচ্ছে খুব দূরে কোথাও চলে যাই, যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, তোমার পরিচয় জানবে না।···মা আর ব্যাটা দু'জনে নতুন ক'রে জীবন শুরু করব। তাহলে—তাহলে হয়ত মাঝের ক'টা বছর মুছে ফেলতে পারব, চিরদিনের মতো লজ্জা বইতে হবে না, মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে না।······দোহাই মা, তুমি এখানে থাকতে চেয়ো না, এ রাজ-ঐশ্বর্য থাক, তুমি গরীব ছেলের দুঃখিনী মা—এইভাবেই নতুন ক'রে সংসার শুরু করো।'

এবার হেমন্তর মেঝের দিকে তাকাবার পালা। অনেকক্ষণ পরে অনেক চেষ্টায় উদ্গত অশ্রু দমন ক'রে প্রায় চুপি চুপি বলে, 'যা ভাল বুঝিস তাই কর, তুই যাতে সুখী হোস।···এবার তোর ওপরই সব ছেড়ে দিলুম, যা বলবি তাই করব, যেমন চালাবি তেমনি চলব।···সেই আমার সত্যিকারের সুখ।'

তারক চারিদিকে চাকরির দরখাস্ত পাঠায়, বেশির ভাগই দেশের বাইরে। বোম্বে মাদ্রাজ লাহোরে, করাচীতেও পাঠায়—তবে ভারতের বাইরেই অধিকাংশ—কলম্বো, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন—হংকং পর্যন্ত।

অধ্যাপকরা হেমন্তকে ডাকিয়ে বললেন, 'চাকরিই যদি করবে তারক, এখানেই করুক, আমরা ভাল কাজ যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। সরকারী চাকরি, তার সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিশও করা চলবে। ও রাজী হলে এক কথায় পেয়ে যাবে।···তুমি একটু বুঝিয়ে বলো ওকে। চায় তো এখানেই একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিই—'

হেমন্ত মাথা হেঁট ক'রে জবাব দেয়, 'আমি ওকে অনেক বলেছি, ও কলকাতা কি বাংলাদেশে মোটে থাকতে চায় না। অনেক দুঃখ পেয়েছে ছেলেটা, আমি আর ওর ইচ্ছেয় বাধা দিতে চাই না।'

কিছুদিন পরে একই সঙ্গে জবাব এল সে-সব দরখাস্তর। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা, নিজাম নতুন হাসপাতাল করবেন, সেখানে রেসিডেণ্ট ডাক্তারের চাকরি—দেড়শো টাকা মাইনে। আর একটা এল রেঙ্গুন থেকে—ছ'শো টাকা মাইনে, ফ্রী কোয়ার্টার। প্রাইভেট প্র্যাকটিশও করা চলবে।

তারক লাফিয়ে উঠল, 'এইটেই নিই মা, কী বলো?'

হেমন্ত ঠিক এতটা উৎসাহ প্রকাশ করতে পারল না। শুকনো মুখে বলল, 'বেশী

মাইনে যেমন দেবে, সেখানে তো খরচাও বেশী শুনেছি। তার জন্যে সমুদ্দুর পেরিয়ে মগের মুলুকে যাবার কী দরকার? তুই যা চাস—হায়দ্রাবাদও তো সেদিক দিয়ে ভাল, সেখানের দেড়শো টাকা রেঙ্গুনে আটশো টাকার সমান। সেও তো ঢের দূর, বাঙালীও বিশেষ নেই—পরিচয় জানার ভয় নেই তেমন।'

'তুমি নিজেই বলছ—তেমন ভয় নেই। তার মানে একটু ভয় আছেই। বাঙালী কিছু কিছু আছে বৈকি! দু-চার ঘর থাকাই যথেষ্ট। এখানের সঙ্গে যোগাযোগ থেকেই যাবে একটা, এখানের সবাই জানবে কোথায় আছি। আর রেঙ্গুনটা মগের মুলুক নয়। মগের মুলুক আরাকান। তাও সেখানে কেউ আস্ত মানুষ গিলে খায় না। রেঙ্গুন খুব পরিষ্কার সাজানো শহর—লোকেরা হিন্দুই বলতে গেলে—তোমাদেরই বুদ্ধদেবের পুজো করে। তুমি আর দুমত ক'রো না মা, লক্ষ্মীটি? ওরা যাওয়ার খরচা দেবে, ছ'মাস পরে ছুটি। সেও যাওয়া-আসার ভাড়া দেবে তারা, ফ্যামিলি নিয়ে যাবার জন্যেই—বাসা ঠিক ক'রে তোমাকে নিয়ে যাব। জাহাজে ফার্স্ট ক্লাস কেবিন পাবে, গঙ্গাজল নিয়ে উঠো বরং, গঙ্গাজল আর তোমার ঠাকুরের ছবি—আমি অনেক ক'রে সন্দেশ রসগোল্লা আর ফল নেব সঙ্গে, চারটে দিন কাটিয়েই নিতে পারব। ভয় নেই—বাবুর্চির রান্না খাইয়ে তোমার জাত মারব না।'

হেমন্ত আর কোন প্রতিবাদ করে না। ভাবে ভালই হল হয়ত—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সেখানে থেকে খোঁজখবর করলে হয়ত সৎবংশের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে—এখানে থাকলে কোন্ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকই বা মেয়ে দেবেন তাকে? আর সত্যিই, হায়দ্রাবাদে যদি একজন বাঙালীর সঙ্গেও আলাপ হয়—জ্ঞাতির জ্ঞাতি মারফৎ এখানের খবর যে সেখানে ছড়াবে না তা কেউ বলতে পারে না।

সে পাঁজিপুঁথি খুলে দিন দেখতে বসে। তারক হেসে বলে, 'না মা, হপ্তায় একদিন ক'রে জাহাজ ছাড়ে। তার দিনের সঙ্গে তোমার দিন মেলাতে গেলে ছ'মাস লেগে যাবে। আমার অত সময় নেই। সামনের মাসের পয়লা আমার জয়েনিং ডেট, তার দুটো দিন আগে অন্তত পেঁছিনো দরকার। হাতে মোটে বারোটা দিন সময় আছে মধ্যে, এই পরশু একটা, তার সাতদিন পরে একটা—পরশু হবে না, কাজেই সেই সামনের জাহাজই ধরতে হবে। পাঁজি দেখতে গেলে চলবে না।'

এবার কিন্তু হেমন্ত শক্ত হয়। বলে, 'না বাবা, তাই বলে অশ্লেষা মঘা কি দিকশূলে তোমাকে বেরোতে দিতে হবে নাকি? সে হবে না। তাতে চাকরি থাকে আর যায়। না হয় টেলিগ্রাম ক'রে দিন পিছিয়ে নেবে। বলে সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারে যাওয়া!'

সেই রকম টেলিগ্রামই করতে হয় শেষ পর্যন্ত। যেদিনটা তারক ঠিক ক'রে রেখেছিল সেদিনটায় অনেক নাকি গোলমাল—তেরোস্পর্শ, আরও সব কি কি—সেদিন কোনমতেই যাওয়া নাকি সম্ভব নয়—পরেরটা তবু মন্দের ভাল।

টিকিট কাটা হল। চাঁদনি নিউমার্কেট ঘুরে শেষে হোয়াইটওয়ে লেডল থেকে মনের মতো কাটা-পোশাক কিনে দিল হেমন্ত। অনেক শার্ট, অনেক প্যান্ট, অনেক কোট। টাই, হ্যাট। সে দেশে সায়েব সেজে না গেলে ইজ্জৎ থাকবে না। সোনার বোতাম,

পাথর বসানো টাই-পিন। নতুন পোর্টম্যাণ্টো কিনে তা বোঝাই করা হল। তারক ব্যাকুল হয়ে বার বার নিষেধ করে, এখানে কিন্তু হেমন্ত অটল, কোন কথাই শুনল না তারকের। বলল, 'এ তো আমার কোন পাপের পয়সা নয়, দশ আঙুলে খাটা কড়ি, এ নিতে তোর আপত্তি কি?'

তারক হাসে। বলে, 'তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে মা। লোকে ভাববে আমি সেখানে টাকা রোজগার করতে যাচ্ছি না অনেক আছে বলে বিলোতে যাচ্ছি। তারা শেষ পর্যন্ত হয়ত মাইনেই দিতে চাইবে না।'

আবার বলে, 'তোমার তো ভয়—কোন বর্মী মেয়ে আমাকে দেখে টুপ ক'রে লুফে নেবে, ওদের নাকি বাঙালী ছেলের ওপর খুব লোভ। তুমিই তো বলো—তা এত সেজেগুজে গেলে আরও তো তারা ভুলে যাবে! পেয়ে বসবে একেবারে।'

হেমন্তও হেসে বলে, 'পাওয়াচ্ছি! গিয়ে পড়ে খেংরে নামাব না ঘাড় থেকে! ঝ্যাঁটায় ভূত পালায়, বর্মী-মাগী তো ছার!'

যাত্রার আর পাঁচটি দিন বাকী, জ্বর এল তারকের।

সামান্য সর্দি-জ্বর, তবু হেমন্তর মুখ শুকিয়ে গেল।

'জাহাজ ছাড়ার আর মাঝে চারটি দিন—জ্বল এল কি রে? এ তো বাধা পড়ল দেখতে পাচ্ছি!'

হা-হা ক'রে হাসে তারক, 'তুমি তো দেখছি নিজের ছায়ায় ভূত দেখছ! এ একটু সর্দি-জ্বর হয়েছে, তিন দাগ ফিভার-মিক্‌স্‌চার খেলেই সেরে যাবে। এর চেয়ে ঢের বেশী জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ডিউটি দিতে হয়েছে, সে-সব তো তুমি জানো না। চাকরি করতে যাচ্ছি, সেখানেই কি আর এইরকম একটু-আধটু অসুখে ঘরে বসে থাকা যাবে?'

সে নিজেই একটা প্রেসক্রিপশ্যন ক'রে মিক্‌স্‌চার আনিয়ে নেয়। খায়ও ঘড়ি ধরে নিয়মমতো। তবে সর্দি-জ্বর বলে সাবু খেতে রাজী হয় না কিছুতেই। ভাতই খেতে চাইছিল, হেমন্ত তাড়া দিতে নিরস্ত হল। তাও চিঁড়ে ভেজে দিতে হল, তার সঙ্গে আলুমরিচ।

কিন্তু পরের দিন, তার পরের দিনও জ্বর ছাড়ল না।

এমন কিছু নয়—নিরেনব্বুই থেকে একশোর মধ্যেই থাকে বেশির ভাগ—কখনও-সখনও একশো-একও ওঠে। সর্দিও তেমন নেই, শীত ক'রেও জ্বর আসে না, অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নয়। তবু জ্বরটা ছাড়ছেও না একেবারে। যখন বাড়ে সেই সময়টা শুধু চোখে-মুখে জ্বালার ভাব থাকে, তাতেই বোঝা যায় জ্বর একটু বাড়ছে।

হেমন্ত বলে, 'এখন উপায়?'

'উপায়-টুপায় কিছু ভাবতে হবে না। আমি চলে যাই, ওষুধ নিয়ে উঠছি, পথেই ভাল হয়ে যাবে। সাতদিন লাগে জাহাজে—শুয়ে-বসেই তো থাকা, ওতে আর অসুবিধে কি?'

'তা আর নয়! তার কম আর নেশা জমবে কেন?' ধমক দিয়ে ওঠে ওর মা, 'গায়ে জ্বর নিয়ে ওকে সেই সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে মগের মুলুকে যেতে

দিচ্ছি আমি! ওসব হবে না, টিকিট ফেরৎ দে, তাদের চিঠি লিখে দে, এই ব্যাপার। তাতে চাকরি থাকে ভাল আর না থাকে ভাল। বরাতে থাকে এমন ঢের চাকরি মিলবে। কে জানে, হয়ত এর চেয়ে ভাল চাকরি পাবি বলেই এমন ধারা বাগড়া পড়ছে।'

অনেক বোঝায় তারক, 'নতুন চাকরি, বার বার যাওয়া পিছিয়ে দিলে তারা কি ভাববে? তাছাড়া যে ডাক্তার নিজের অসুখ সারাতে পারে না সে আবার কী রকম ডাক্তার—এ কথা যদি ভাবে তারা?'

'হ্যাঁ, রেখে দে দিকি! ডাক্তার বলে তার আর অসুখ করবে না! তাহলে আর ভাবনা ছিল না। আর ডাক্তার হলেই বুঝি ফুশ্‌মন্তরে অসুখ সারানো যায়?' হেমন্ত দস্তুরমতো ঝেঁজে ওঠে, 'আর—যা ভাবে ভাবুক, তার জন্যে কী আর প্রাণটা খোয়াতে হবে!'

তবু তখনও হেমন্ত অত চিন্তিত হয় নি, দুশ্চিন্তার তেমন কোন বড় কারণ আছে তাও ভাবে নি।

অসুখটাকে গুরুতর কিছু মনে করে নি। এই উপলক্ষে আপাতত যাওয়াটা বন্ধ হল, আর ক'টা দিন ছেলেকে কাছে রাখতে পারবে এই ভেবে বরং মনের অবচেতনে একটু খুশীই হয়েছিল।

কিন্তু দেখতে দেখতে যখন দশ দিন হয়ে গেল, অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না—তখন সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠল সে। পরিবর্তন যে একেবারে হল না তাও নয়, নতুন উপসর্গ দেখা দিল—খুক্‌খুকে কাশি। মিছরি-মরিচ, লবঙ্গপোড়া, শুঁঠ-তালমিছরি মুখে রাখা—যত টোটকা জানা ছিল সবই ক'রে দেখল হেমন্ত। সে কাশি কিছুতেই গেল না।

এর পর আর ছেলের নবলব্ধ জ্ঞানের ওপর ভরসা ক'রে বসে থাকতে পারল না। পাড়ার একজন ডাক্তারকে ডাকল। তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখে-শুনে দু'তিন রকমের ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন—কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল হেমন্তর, তিনি খুব একটা ভরসা পাচ্ছেন না অথবা রোগটা কি তাই ধরতে পারেন নি।

হেমন্ত প্রস্তাব করল বড় ডাক্তার একজন—রসিকবাবু কি পাড়ার কাছাকাছি কৈলাসবাবুকে ডাকার। তারক এই ক'দিনে একটু কাবু হয়েই পড়েছে—আর সেটা অস্বীকার করারও কোন পথ দেখতে পাচ্ছে না, তবু একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেল, 'কেন মা মিছিমিছি এত উতলা হয়ে উঠছ, খামকা পয়সা খরচ করছ এত! টাকাগুলো কি কামড়াচ্ছে? এই একজনকে ডেকেছ তাকে দুটো দিন সময় দাও অন্তত!'

কিন্তু সে আপত্তি টিকল না। হেমন্ত বলল, 'তুই ডাক্তার, তোর কাছে তো কেউ ফী নিচ্ছে না, তবে আর পয়সা খরচটা কিসের? এই তো এঁকে টাকা দিতে গেলাম ইনি জিভ কেটে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। আর বড় ডাক্তার যাঁদের কথা বলছি—তাঁরা তো তোর মাস্টার, তাঁরা তো নেবেনই না।'

অগত্যা চুপ ক'রে রইল তারক। কে জানে তারও বোধহয় এবার একটু ভয় হয়েছে।

সেদিনটাও দেখল হেমন্ত। হয়ত ছেলের কথাটা বুঝেছে, পাড়ার ডাক্তারের ওপর এতটা অবিচার করা ঠিক নয়, মনে হয়েছে তারও।

কিংবা ঠিক কি করবে, কাকে ডাকবে—মন স্থির করতে পারে নি। তখনও তোলাপাড়া চলছিল।

কিন্তু পরের দিন আর চুপ ক'রে থাকা গেল না। কাশির সঙ্গে অল্প অল্প শ্লেষ্মা উঠছিল, সেদিন সকালে যে শ্লেষ্মা উঠল—তাতে পরিষ্কার রক্তের ছিটে। প্রথমবারটা তবু সন্দেহ ছিল, তারকও সেই সঙ্গে সন্দেহটুকুকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ছিল—ইচ্ছে ক'রেই নিজের চোখকে অবিশ্বাস ক'রে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, ওটা ভুলই দেখা হয়েছে—কিন্তু আরও একবার যখন সেই ধরনের গয়ার উঠল, তখন আর কোথাও কোন সান্ত্বনা কি অবলম্বন রইল না। আত্মপ্রবঞ্চনার অবকাশও না। সর্বনাশের কোথাও কিছু বাকী নেই—এটা নিশ্চিত হয়ে গেল।

হেমন্ত চোখের জল চাপতেই—উদ্গত অশ্রু প্রাণপণে দমন ক'রে বাইরে চলে গেল। পাছে সে চোখের জল, সে হতাশা ছেলের চোখে পড়ে, ঠাকুরঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ল আবারও, কিন্তু ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়তে আর প্রবৃত্তি হল না। মাথা এর আগেও ঢের খুঁড়েছে, কোন ফল হয় নি। কমলাক্ষর মৃত্যুর পর এই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হয়েছে তার—ভাগ্যই বলবান, স্বয়ং ঈশ্বরও মানুষের এই ভাগ্যের কাছে অসহায়, হাত-পা বাঁধা তাঁর।

তারক নিজে ডাক্তার, নিজের ভাগ্যলিপি ঐ ক' ফোঁটা রক্তে সেও পরিষ্কার দেখেছে। মার এই তার-সামনে-ভেঙে না-পড়ার চেষ্টাও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু মাকে আশ্বাস দেবারও আর শক্তি নেই তার। দেহে শুধু নয়—মনেও এবার অপরিসীম ক্লান্তি বোধ করছে সে। ক্লান্তভাবেই চোখ বোজে সে তাই।

কেবল মার তাকে ছেলেমানুষ মনে করার ছেলেমানুষী লক্ষ্য ক'রে সামান্য একটু হাসে মনে মনে। করুণ সে হাসির একটা ভঙ্গী মাত্র প্রকাশ পায় তার বিশীর্ণ শুষ্ক মুখের অবসন্ন ওষ্ঠাধরে।

॥ ২৩ ॥

ভাগ্যের কাছে বার বার মার খাওয়ার ফলে এটুকু বেশ বুঝেছে হেমন্ত যে, তার জীবনে ভেঙে পড়ার অবকাশ নেই। যা করতে হবে তাকেই করতে হবে। অকরুণ অদৃষ্টের সঙ্গে সারাজীবন যুদ্ধ করাই তার ভাগ্যলিপি।

তাই সে চোখ মুছে শান্তভাবেই আবার নেমে আসে ঠাকুরঘর থেকে। নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে খোঁজ ক'রে ক'রে রসিকবাবু ডাক্তারের কাছে যায়। কৈলাসবাবুও বড় ডাক্তার, কিন্তু নাকি বড় বেশী ব্যবসাদার। অনেক রোগী দেখেন, সেজন্যে কোন রোগীকেই খুব ভাল ক'রে দেখার সময় পান না। বিশেষ, এক্ষেত্রে রোগী ডাক্তার, চক্ষুলজ্জায় ফীও নিতে পারবেন না, সেহেতু হয়ত মনোযোগও দেবেন না তত। তা ছাড়াও—রসিকবাবুর রোগ নির্ণয় নির্ভুল, একথা অনেকের কাছেই শুনেছে।

রসিকবাবু মন দিয়ে সব শুনলেন, হেমন্ত নিজের পরিচয় দিল, ছেলেরও। দেখা গেল তারককে চেনেন তিনি, ভাল ছাত্র হিসেবে ওর কথা মনে আছে তাঁর। রোগের বিবরণ শুনতে শুনতে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, কোন মন্তব্য করলেন না—শুধু পরের

দিন সকালেই দেখতে যাবেন কথা দিলেন। ওঁর মতো ডাক্তারের পক্ষে এইটেই যথেষ্ট—রোগ কঠিন না বুঝলে এত তাড়াতাড়ি দেখতে যান না।

এলেনও যথাসময়ে—ঠিক ন'টায় এসে পেঁছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে রোগীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন প্রথমটায়, তারপর নাড়ি ধরলেন। চোঙাটাও বার করলেন, কিন্তু তখনই বুকে বসালেন না। ঘুরে বসে প্রশ্ন করলেন, 'এর বাবা কী রোগে কত বছর বয়সে মারা গেছেন—বলতে পারবেন ?'

'পারব বৈকি !' হেমন্ত আনুপূর্বিক অবস্থাটা বর্ণনা করল।

পুরনো ম্যালেরিয়া, দূষিত পিলেলিভার, তা থেকে রক্তহীনতা—কতকটা ক্ষয় রোগের মতো। তার মধ্যেই বলতে গেলে তারকের জন্ম, ওর বাপের প্রায়-মুমূর্ষু অবস্থায়। অপুষ্ট শিশু জন্মেছিল, ভাল কোন খাদ্যও পায় নি মাতৃস্তন্য ছাড়া। সৌভাগ্যক্রমে সেটার অভাব ছিল না, তাই বেঁচেছে। তারপর শৈশব কেটেছে নিদারুণ দুঃখ ও অভাবের মধ্য দিয়ে। কোনমতে জীবনটাই রক্ষা পেয়েছে শুধু, দেহ গড়ে উঠতে পারে নি। পরে সে অবস্থা যখন পার হয়ে এসেছে হেমন্ত, তখন পড়াশুনো শুরু হয়েছে, হোস্টেলেই কেটেছে বছরের মধ্যে দশ মাস সময়। সেখানের খাদ্যও অস্বাস্থ্যকর, যত্ন ক'রে খাওয়াবারও লোক নেই। আসলে যত্ন জিনিসটাই জোটে নি জীবনে।

রসিকবাবু শান্তভাবে বসে শুনলেন সব, তারপর ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলে চোঙাটা বসালেন বুকে, বুক-পিঠ দেখা শেষ হলে আঙুলের ডগাগুলো টিপে দেখলেন, চোখের পাতা সরিয়ে ভেতরের কোলটা।

তারপর উঠে বাইরে এসে হেমন্তকে বললেন, 'আপনি তো সবই বুঝছেন—থাইসিস হয়েছে, যক্ষ্মা যাকে বলে। কবিরাজরা এই ধরনের যক্ষ্মাকে বলেন ক্ষয়কাশ, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে আনে শরীর। পুরাণে বলে চন্দ্রের এই রোগ হয়েছিল প্রথম।...এর কোন ওষুধ, কি চিকিৎসা নেই। ভাল খাওয়া আর ভাল বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া, এই এর যথার্থ চিকিৎসা। ওষুধ দিচ্ছি একটা—যাতে ভাল খাওয়া হজম হয়—তবে তাতেও কতদূর কি হবে বলতে পারি না।'

হেমন্তর চোখ দিয়ে দর দর-ধারে জল পড়তে শুরু হয়েছে বহুক্ষণ ধরেই। এবার নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। তাড়াতাড়ি আঁচল মুখে দিয়ে সামলাল সেটা, পাছে তারকের কানে যায়। তারপর সেইখানে মেঝেয় বসে পড়ে ডাক্তারের পা দুটো চেপে ধরে বলল, 'ডাক্তারবাবু, বহু দুঃখের ধন আমার। জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যেমন ক'রেই হোক বাঁচিয়ে দিন বাছাকে আমার! যা করতে বলবেন, তাই করব।'

বড় ডাক্তার বহু মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেন। দেখতে দেখতে মনেও কড়া পড়ে যায়। মা-বাপের সন্তান-শোক, বিধবা স্ত্রীর হাহাকার—কিছুতেই তেমন দাগ কাটে না আর। রসিকবাবুও এই আকুলতায় বিচলিত হলেন না। শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'যা করতে বলব তা পারবেন না। এক বছর একটা জাহাজ ভাড়া ক'রে সমুদ্রে রাখতে পারবেন—পুরো একটি বছর ? কোথাও নামা চলবে না। জাহাজ কয়লা-জল নেবার জন্যে যদি বা থামে—রোগী নামবে না। দেখুন—পারবেন ? আগেও একজনকে বলেছিলুম, তার লোকবল

অর্থবল দুই-ই ছিল, তারা একটা গোটা জাহাজ ভাড়া ক'রে রুগীকে রেখে দিয়েছিল চোদ্দ মাস, সেরেও গেছে। পারবেন সে ব্যবস্থা করতে?'

বুকের মধ্যেটায় যেন একটা হিম-হিম ভাব বোধ করে হেমন্ত। একটা অন্ধকার হতাশা। এত পয়সা তার নেই। শতাংশের একাংশও নেই বোধহয়। তাছাড়া কে থাকবে রোগীর কাছে? এসব ভাবতে বসাও পাগলামি তার কাছে। এক কমলাক্ষ থাকলে—। থাক তার কথা। কে জানে সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত কিনা!···

ওর মুখ দেখে উত্তরটা অনুমান করেন রসিকবাবু। বলেন, 'পারবেন না তা জানি। সামান্য আয় আপনার, নিজের ওপর সব, কোথা থেকে করবেন? যা পারবেন তাই দেখুন গে—কোন ভাল পাহাড়ে-জায়গায় যান, কিম্বা সমুদ্রের ধারে। পুরীতে অনেকে যাচ্ছে আজকাল। তবে হাওয়া ভাল হলে কি হবে, ওখানের জল ভাল নয়। পাহাড়ই ভাল, উঁচু কোন পাহাড়—দার্জিলিং কি কশৌলি কি সিমলে—যেখানে ভাল বিশুদ্ধ হাওয়া পাবেন, ভাল খাবার হজম হবে, স্নায়ু বিশ্রাম পাবে।···দু-এক জায়গায় স্যানাটোরিয়ামও হয়েছে। সেখানে রাখতে পারেন আরও ভাল, আপনাদের দায়িত্ব কমে যায়, ওসব জায়গায় ডাক্তার একজন সর্বদাই থাকে। তবে তাতেই যে ভাল হয়ে উঠবে ছেলে এমন ভরসা আমি দোব না। জাস্ট একটা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। আচ্ছা নমস্কার!'

পরিষ্কার কাটা কাটা কথা। মিথ্যা আশ্বাস বা আশা দেবার কোন চেষ্টা নেই। তেমনি ফীও নিলেন না ওর কাছ থেকে। বললেন, 'ডাক্তারের কাছ থেকে ফী নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়।'

হেমন্ত অনেক চেষ্টায় কথার শক্তি সংগ্রহ করে। বলতে যায়, 'ক'দিন পরে আর একবার দেখে—একটু মানে—'

কথাটা শেষ করতেও পারে না যেন ভরসা ক'রে।

'দরকার হবে না।···এই ওষুধগুলো খাইয়ে যান যা লিখে দিচ্ছি, আর যত তাড়াতাড়ি পারেন চেঞ্জে নিয়ে যান। ডাক্তারের আর করার কিছু নেই।'

দিশাহারা হয়ে পড়ার কথা, কিন্তু তা হল না।

দিশাহারা হলে চলবে না। সে আর একটা যুদ্ধের জন্যই কোমর বাঁধল।

হাহাকার করার বিলাপ করার ঢের সময় পড়ে রইল, হয়ত বা জীবনভোরই। এখন ছেলের চিকিৎসার কথাই ভাবতে হবে। সেই সময়টাই বরং কম। কে জানে কতটা এগিয়ে গেছে রোগ, সর্বনাশের আর কতটুকু বাকী আছে!

চিন্তারও সময় ছিল না। মন স্থির ক'রেই ফেলল সে।

জাহাজ ভাড়া ক'রে এক বছর সমুদ্রে রাখা সম্ভব নয়, যথাসর্বস্ব বিক্রী ক'রে দিয়েও যদি রাখা যেত তো প্রস্তুত ছিল সে। ঠিক কত খরচ পড়বে তা জানে না—কিন্তু নিজের সহজ বুদ্ধিতেই এটুকু বুঝল যে, ওর এই সামান্য ধুলোগুঁড়ো সম্পত্তির জোরে সে-কথা চিন্তা করাও পাগলামি।

বাকী রইল এখন পাহাড়—কি সমুদ্রের ধার।

পুরীর জল ভাল নয়, ডাক্তারবাবু বলে গেলেন। সমুদ্রের ধারের অন্য শহরেরও

বোধ হয় একই অবস্থা। সুতরাং পাহাড়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পাহাড়ও—যে-সব নাম ক'রে গেলেন রসিকবাবু, তার কোন্‌টা কোথায়, ওর ভাল জানা নেই। দার্জিলিংটা জানে। জানে—মানে নাম শুনেছে। কাছাকাছি এটাও জানে। অনেকেই যায় মধ্যে মধ্যে। গোপালীরা বহুবার গিয়েছে। খরচও কম নাকি যাওয়ার। ওর পক্ষে দার্জিলিং যাওয়াই সহজ, সম্ভব।

সেই মতোই প্রস্তুত হতে লাগল হেমন্ত।

মুশকিল হয়েছে গোপালীরা এখানে নেই। বিপদ যখন আসে, আগে থাকতে আটঘাট বেঁধেই আসে। যারা সহায়সম্বল হতে পারবে—অদৃষ্ট আগে থাকতে তাদেরও বিপন্ন করেন। চিরদিনের বান্ধব ও ভয়ত্রাতা গোপালীরও বোধ হয় শেষ অবস্থা। উদুরী হয়েছে তার। ছেলের চাকরির এইসব কথাবার্তা, যাওয়ার আয়োজন ও এই অসুখ—এর মধ্যে আর যাওয়া হয় নি ওদের বাড়ি, তবে মোটামুটি খবর রাখে। ধনুবাবু বেশ কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসা করার পর ভুবনেশ্বর না কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছেন। সেখানের নাকি জল ভাল, লিভার ভাল হয়।

সুতরাং, বিপদে পড়লেই যার কথা প্রথম মনে হয়—তার কাছে যাওয়া চলবে না।

বদরীবাবুকে সব ব্যাপারে বার বার বিরক্ত করতে সাহস হয় না। বত্রিশ টাকা নাকি ফী করেছেন তিনি আজকাল—একটা সাধারণ কেরানীর এক মাসের মাইনে—তবু রুগীকে গলাধাক্কা দিতে হয়, এত ডাক তাঁর।

না, তাঁর কাছেও যাওয়া চলবে না। পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবুর কাছে গিয়ে পড়লে তিনিই সব করতে পারতেন, সব ব্যবস্থাই—এটা ঠিক, কিন্তু ছেলের জন্যেও তা পারবে না হেমন্ত। অন্তত অন্য সব পথ বেয়ে-চেয়ে দেখে হতাশ হবার আগে নয়।

অনেক ভেবে শেষপর্যন্ত ঝামাপুকুরের কুমার কন্দর্প মিত্রকে গিয়ে ধরল সে।

মাসকতক আগে তাঁদের বাড়ির একটি প্রসূতির জীবনসংকট অবস্থায় প্রায় মাসখানেক নিত্য যেতে হয়েছিল। সেই থেকেই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

কুমার বাহাদুর বিখ্যাত জহুরী। জহুরী বলাও হয়ত ঠিক হবে না। জহরৎ-বিশেষজ্ঞ। বড় বড় জহুরীরা পাথর যাচাই করিয়ে নিয়ে যায়, তিনি যে দাম বলে দেন সেই দাম সকলে মেনে নেয় এক কথায়। এতে তাঁর মোটা টাকা আয়ও হয়। হেমন্তর কাজে তুষ্ট হয়ে কন্দর্পবাবু একটি মূল্যবান চুনি উপহার দিয়েছেন। সেটা তুলে রেখেছিল হেমন্ত—যদি কখনও তারকের বৌ আসে তাকে আংটি গড়িয়ে দেবে বলে।

কন্দর্পবাবু কলকাতার ধনী ও অভিজাত সমাজের মধ্যেও একজন প্রতিষ্ঠিত লোক। জহুরী তিনি সব দিক দিয়েই। কিম্বদন্তী—তাঁর দুটি ক'রে রক্ষিতা রাখার প্রয়োজন হয়—একই সঙ্গে। এছাড়াও 'ছুটো' যাকে বলে তা তো আছেই। রাত দশটায় বেরিয়ে একাধিক স্ত্রীলোকের দরজা ঘুরে বাড়ি ফেরেন কোনদিন রাত তিনটেয়, কোনদিন বা আরও পরে। তারপর পূজা (নিষ্ঠাও আছে ষোল আনা) সেরে আহার ক'রে শুতে যান যখন, তখন প্রায়ই পূর্বাকাশ অরুণাভা ধারণ করে। ওদিকেও—বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে, প্রাতঃকৃত্য স্নান সেরে জলযোগ করেন তিনটেয়, তারপর কাজকর্ম দেখেন চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত—ফলে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা হতে হতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় প্রায়ই।

কিন্তু এসব তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। হেমন্তর অভিযোগ করার কারণ নেই। ওর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই তিনি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছেন। কথায়-বার্তায় আচারে-আচরণে সৌজন্যশিষ্টাচারের এতটুকু অভাব পায় নি কখনও। এমনিও উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক। গান-বাজনার শখ খুব। নিজেও জানেন। শৌখীন থিয়েটারের প্রচণ্ড নেশা। ফরমাশ দিয়ে নতুন নাটক লিখিয়ে নিজেরা বন্ধু-বান্ধব মিলে অভিনয় করেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস কি জীবনযাত্রা কিংবা চরিত্র নিয়ে হেমন্তর মাথা ঘামানোর দরকার কি ?

অনেক ভেবে তাই বিকেলবেলায় কন্দর্পবাবুকে গিয়েই ধরল হেমন্ত। তিনি তখন এক ইহুদী জহুরীর সঙ্গে বসে কতকগুলো পাথর পরীক্ষা করছিলেন। হেমন্ত গিয়ে দাঁড়াতে কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, ও বসতে তবে নিজে বসলেন।

'কী ব্যাপার বলুন তো ? হঠাৎ—?' প্রশ্ন করলেন তারপর।

প্রসঙ্গের সূচনাতেই চোখে জল এসে যায়। প্রাণপণেই সামলে নেয় তবু। দুঃখের কাহিনী শোনানোই যথেষ্ট, তার সঙ্গে চোখের জল ফেলে মানুষটাকে বিব্রত বিরক্ত ক'রে লাভ নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা—বিশেষ ক'রে হেমন্তর বর্তমান প্রয়োজনটা শুনে যেন নিশ্চিন্ত হলেন কন্দর্পবাবু। বললেন, 'এই ! কিছু ভাববেন না আপনি। বর্ধমানের মহারাজা আর চকদীঘির জমিদারবাবু ওখানের মুরুব্বী—আমি এখনই কথাবার্তা বলে ঠিক ক'রে দিচ্ছি—যাতে ভাল ঘর পান, দেখাশুনোরও না কোন ত্রুটি ঘটে। আপনি যত তাড়াতাড়ি যেতে পারেন সেই চেষ্টা দেখুন গে, এদিকের ভার আমার রইল। কবে যাবেন জানালে টিকিট করিয়ে একটা কামরা রিজার্ভ করিয়ে সঙ্গে লোক দোব—আপনাদের সেখানে পেঁছে দিয়ে আসবে। কোন অসুবিধে হবে না।'

দার্জিলিং পেঁছবার, কি সেখানে নেমেও, সত্যিই কোন অসুবিধে হয় নি। যেখানে নামল ওরা—স্যানাটোরিয়ামের লোক ঠেলাচেয়ার নিয়ে উপস্থিত ছিল। সেই রকমই নাকি নির্দেশ ছিল চকদীঘির রাজাবাহাদুরের। সবচেয়ে ভাল ঘরই পেল তারক। হেমন্তর নিজেরও থাকার কোন অসুবিধা না হয়, কন্দর্পবাবুর তদ্বিরে সে ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছিলেন সেখানের কর্তৃপক্ষ।

হেমন্তও যথাসাধ্য কেন—সাধ্যের অতীতই চেষ্টা করল ছেলেকে ভাল ক'রে তোলার। ভাল খাওয়া, দামী ওষুধপত্র কোনটারই ত্রুটি রাখল না। ডাক্তাররা যখন যা বলেন, নির্বিচারে বিনা দ্বিধায় সেই ব্যবস্থা করে—খরচের কথা চিন্তা না ক'রেই। সেবারও কোন অভাব রইল না। নিজে তো আছেই, আরও একটি নার্স রাখিয়ে দিল, যাতে পালা ক'রে দু'জনে কাছে থাকতে পারে।

আপত্তি করে তারকই। বার বার ব্যাকুল হয়ে বলতে যায়, 'এ কী পাগলামি করছ মা বলো তো ! ধনে-প্রাণে মরতে চাও ! কত টাকা আছে তোমার ? কুবেরের ঐশ্বর্য তো নয়। বাঁচাতে আমাকে পারবে না তা তো বুঝতেই পারছ—অপর মা হলে বুঝত

না, কিন্তু তুমি তো জানো সব—মিছিমিছি এমন সর্বস্বান্ত হয়ে লাভ কি ?'

আবার কখনও বলে, 'আমি শুধুই এসেছিলুম তোমার কোলে, জীবনে কখনও এক পয়সা তো আনতে পারলুমই না—সর্বস্বান্ত ক'রে দিয়ে গেলুম মাঝখান থেকে। ভিক্ষে ক'রে খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রে রেখে গেলুম !'

প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হেমন্ত ধমকে ওঠে, 'তুই চুপ করবি, না মাথামুড় খুঁড়ে মরব তোর সামনে ?—আমি গলায় দড়ি দিয়ে তোর সামনে না ঝুললে বুঝি আর শান্তি হচ্ছে না তোর ?'

অগত্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে যায় তারক।···

আর সবই হয়—শুধু বাইরে বেড়ানো হয় না। ডাক্তাররা বলেন, 'ঠাণ্ডার দেশ, ঘরের দোর জানলা তো বন্ধ রাখতেই হয়—বাইরে একটু একটু বেড়াতে না পারলে পিওর এয়ারটা যায় না ফুসফুসে। তার একটা কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন—

তারক বলে 'যাক না দুটো দিন, একটু বল পেলেই—'

'কিন্তু সে বল পেতে হলে আগে ঐ হাওয়াটা দরকার।' ডাক্তার আড়ালে মন্তব্য করেন।

নিজের পায়ে না হেঁটে পাহাড়ে-পথে হাওয়া খাবার উপায়—ঠেলাগাড়ি ক'রে বেরুনো। একরকম জাপানী ঠেলাগাড়ি পাওয়া যায় এদেশে—রিক্‌শা না কি বলে—সামনে দু'জন, পেছনে দু'জন লাগে ঠেলে তুলতে, আরও দু'জন বাড়তি লোক থাকে সঙ্গে, কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার জায়গায় ঠেলবে বলে। ফলে বিকেলে বা সকালে দু'ঘণ্টা বেরনো মানেও অনেকগুলি টাকার খেলা। এছাড়া আছে ডাণ্ডি—ছোট চেয়ার, চারজন বেয়ারা কাঁধে ক'রে নিয়ে যায়। কোনটাতেই খরচ কম নয়। রেসিডেণ্ট ডাক্তার নিজে একজনের সঙ্গে কথা কইয়ে দিতে গেলেন, সে মাসকাবারী একশো টাকার কমে রাজী হল না। টাকা দু'হাতে খরচ করছে ঠিকই, কিন্তু কত আর আছে তার হাতেই বা ? এক উপায় আছে, বাড়ি বাঁধা দেওয়া কি বিক্রী করা, সে-ও কিছু একদিনে হয় না।

অগত্যা ম্লানমুখে নিরস্ত হতে হয়।

কিন্তু বেশীদিন চুপ ক'রে থাকতেও পারে না। প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে লড়তেই তার শক্তি বেড়ে গেছে, কোন কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না।

এতই যখন করছে, এইটুকুই বা বাকী রাখবে কেন ?

এক অসমসাহসিক প্রস্তাব ক'রে বসে শেষপর্যন্ত।

সেক্রেটারীকে গিয়ে বলে, 'আপনাদের ঐ চাকাওলা চেয়ারটা পাওয়া যাবে ? ভোরে বা সন্ধ্যায় ? একটু দিন না ছেড়ে ! ওসময় তো রুগী আনা কি পেঁছে দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না !'

সেক্রেটারী বিস্মিত হয়ে বলেন, 'তা পেতে পারেন, কিন্তু ঠেলবে কে ? আমাদের যারা আছে, তারা বাড়তি কাজের অনেক মজুরী চাইবে—'

'না না, বাইরের লোক কেউ নয়। আমিই ঠেলে নিয়ে যাব।'

সেক্রেটারী ভদ্রলোক অবাক। বেশ কিছুক্ষণ মুখে কথাই সরল না তাঁর। তারপর

বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! পাহাড়ীরাই ঠেলে তুলতে পারে না এই পথ, দুটো লোক হিমসিম খেয়ে যায়, আপনি তুলবেন কি! এমনিই এইটুকু উঠে কার্ট রোড পেঁছিতেই হাপরের মতো হাঁপাতে হয় আমাদের।'

হেমন্ত হাসে, ম্লান হাসি কিন্তু তার মধ্যেই কঠিন সংকল্প ফুটে ওঠে দুই ঠোঁটের ভঙ্গীতে। বলে, 'ছেলের জন্যে মা অসাধ্য সাধন করতে পারে, এ তো আপনাদেরই পুঁথিপত্রে লেখে সবাই! এটা কথার কথা ভাবেন কেন?…পয়সা দেবার ক্ষমতা যখন নেই, তখন নিজের খাটুনিতে সেটা পুষিয়ে দিতে হবে বৈকি!'

তবু অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেন সেক্রেটারী শিশিরবাবু, বোঝাবার চেষ্টা করে তারকও, রাগারাগি করে, কাঠ হয়ে পড়ে থাকে—উঠতে চায় না—শেষ পর্যন্ত কিন্তু সকলকেই হার মানতে হয়। হেমন্ত বলে, 'বেশ, তাহলে আমিও এই দিব্যি গালছি, মুখে এক ফোঁটা জল দোব না আমি, তোর সামনে না খেয়ে মরব। তা হলেই তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে তো?'

এর পর আর হার মানা ছাড়া উপায়ই বা কি!

সত্যিই অসাধ্য সাধন করে হেমন্ত। এতটা যে পারবে তা সে নিজেও ভাবে নি। মনে হয় যেন—কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তিতেই—তার দেহে যাকে বলে মত্ত হস্তীর বল আসে।

খুব ভোরেই ছেলেকে ডিম-রুটি আপেল খাইয়ে, নিজেও একটু দুধ খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম দু-একদিন কার্ট রোডের ওপরে আর উঠতে পারে নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরও ওপরে—মল, দু-চার দিন পরে সেখান থেকে ক্যালকাটা রোড, কোনদিন বা সোজা অকল্যান্ড রোড ধরে বার্চ হিল, কোনদিন জলাপাহাড়ে উঠে যেত।

সেক্রেটারী, য়্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী—ডাক্তার, সকলেই ঘোরতর আপত্তি করতে লাগলেন। বললেন, 'শেষে আপনি নিজেই দেখছি এই রোগ বাধিয়ে বসবেন! এ কী করছেন?'

হেমন্ত জবাব দেয়, 'তাহলে তো বেঁচে যাই ডাক্তারবাবু, এমন ভাগ্য কি আমার হবে? আপনারা একটু ভগবানকে জানান না—যেন আমারও এই কালব্যাধি ধরে। আশীর্বাদ করুন না!'

তারপর বলে, 'এত ভাগ্য ক'রে আসি নি ডাক্তারবাবু। আমার ভবিষ্যৎ আমি বুঝে নিয়েছি। গতজন্মে নিভৃতে বসে শুধু বোধহয় পাপই ক'রে এসেছিলুম—এ জন্মেও অনেক করেছি—তার শাস্তি ভোগ করতে হবে না? এত সহজে অব্যাহতি পেলে ভগবানের খেলাটা জমবে কেন আমাকে নিয়ে?'

কঠিন আত্ম-বিদ্রূপের হাসি হাসে সে বলতে বলতে।

কিন্তু যতই যা করুক—তারকের অবস্থার যে উন্নতি হচ্ছে না, সেটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এমনিই রোগাটে ধরনের সে বরাবর, ওর পিতৃকুলের সকলেই রোগা—সেই মতোই হয়েছিল—এখন সেই সামান্য মেদও নিঃশেষিত হয়ে, মনে হয় যেন হাড়গুলোতেও ক্ষয় ধরেছে। আহার্যের অভাব নেই, খাওয়ার শক্তিটাই চলে গিয়েছে। এতটুকু দুধ

কি একটা ডিম খেয়েই যেন হাঁপিয়ে ওঠে, খেতে পারে না আর। আগে এ নিয়ে যথেষ্ট বকাবকি করত হেমন্ত, এখন বুঝতে পারে যে, সত্যিই ওর কষ্ট হচ্ছে, আর কিছু বলে না।

শেষ যে হয়ে আসছে সেটা তারকও বুঝতে পাবে। কোটরগত গোলকের মধ্যে এ ক'দিন দৃষ্টিটা ছিল জ্বলজ্বলে, ক্রমশ সেটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে আসে, সেই সঙ্গে উদাসীনও। এ চাউনি হেমন্ত চেনে, এমনি দেখেছিল সে স্বামীর চোখেও—মৃত্যুর আগে। এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, আর কিছুতেই কোন আসক্তি, কোন কৌতূহল নেই। শুধু যেন বেঁচে থাকার এই বিড়ম্বনা থেকে ছুটি পেলেই বাঁচে, অবসব চাইছে প্রাণপণে।

অবসন্ন হয়ে আসে হেমন্তর বুকের মধ্যেটাও। কেমন একটা সর্ব-অন্তব-হিম-কবা অবসাদ বোধ করে। এই গত আট-ন' মাস কাল যে ভূতের মতো পরিশ্রম করেছে, নিত্য চেয়ারে ক'রে ঠেলে নিয়ে বেড়িয়েছে, নিচের ভিকটোরিয়া ফল্‌স্‌ থেকে ওপরের বার্চ হিল, বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্‌, জলাপাহাড় পর্যন্ত—রাতের পর রাত জেগেছে তার সঙ্গে—সেই অমানুষিক শ্রমের সমস্ত ক্লান্তি যেন ওকে পেয়ে বসে। একেবারেই ভেঙে পড়ে সে।

এমনিও, চেয়ারে বসেও আর বেরোতে পারে না তারক, তাতেও যেন কষ্ট হয়—শীর্ণ মেদহীন দেহের অস্থি-পঞ্জর নরম গদী-আঁটা চেয়ারে বসেও আরাম পায় না। কোনমতে বিছানায় লেপ-কম্বল মোড়া অবস্থায় পড়ে থাকে।

হঠাৎ এর মধ্যে একদিন যেন খানিকটা সুস্থ বোধ করে। সেটা কার্তিক মাস, কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তার ওপারে গৌরীশংকরের চূড়োটা ঝকঝক করছে রোদে—তারক নিজেই বিছানায় উঠে বসে বললে, 'মা, আমাকে একটু ঐ রোদে বসিয়ে দেবে একটিবার? কতদিন যে রোদ পোয়াই নি, মনেই পড়ে না।'

হেমন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, 'বাইরে যে বড্ড ঠান্ডা রে, পারবি সহ্য করতে?'

ম্লান হাসে তারক। বলে, 'সব সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছি এবার, আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই মা।...যাওয়ার আগে পৃথিবীটা যেন বড্ড ভাল লাগছে, একবার ভাল ক'রে দেখে নিই।...লক্ষ্মীটি মা, একটু বাইরে বসিয়ে দাও কোনমতে!...কতকাল কলকাতা দেখি নি বলো তো! খুব ইচ্ছে করছে—। সম্ভব হবে না তাই, নইলে কলকাতাতেই চলে যেতাম। সেই ভীড়, ঘিঞ্জি গলি, গাড়ি-ঘোড়া—সব যেন টানছে আমাকে, মনে হচ্ছে সে-ই স্বর্গ।'

আর কিছু বলে না হেমন্ত। তার চোখে জলও আসে না আর।

চোখের জলের উৎসই যেন গেছে শুকিয়ে।

লোকজন ডেকে বাইরে যেখানটায় রোদ এসে পড়েছে, সেখানে একটা ইজিচেয়ার পাতিয়ে দেয়, তারপর ঠেলা চেয়ারে তুলে সেইখানে এনে বসিয়ে দেয় ওকে—নিচে পিছনে অনেকগুলো বালিশ দিয়ে। মাথায় টুপি পরিয়ে দু-তিনখানা কম্বল চাপা দিয়ে মুড়ে দেয়।

'এককাপ কফি দিতে বল তো আমায় মা।...যাবার আগে খুব আবদার ক'রে যাচ্ছি,

না ?···আমি নিতেই তো এসেছি, নিয়েই যাই—ষোল আনার ওপর আঠারো আনা ! না না, পালিও না। এখানে ব'সো আমার কাছে। সামনা-সামনি, না—এইখানে, আমার গায়ে হাত রেখে—'

তারপর কেমন একরকমের ইচ্ছাতুর উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সেই দেখার ভঙ্গীতেই বুক কেঁপে ওঠে হেমন্তর, আসন্ন সর্বনাশের আভাস পায় যেন। মনে হয় যেন পরিচিত প্রিয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে এই ভাবে, এই জীবন থেকে।

'বাবা ঘরে চ' এবার, তোর ক্লান্তি লাগছে'—আস্তে বলে হেমন্ত।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে মার মুখের দিকে চায় তারক, কেমন একরকমের বিচিত্র বিদ্রূপের হাসি ওর মুখে, বলে, 'ভয় করছে ? আর ভয় ক'রো না। ভয়ের কারণ আর থাকবে না। আজ খুব সুস্থ বোধ করছি। বরং ক'দিন যেন সব কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছিল, আজ স্পষ্ট পরিষ্কার মনে পড়ছে—ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনটা, সমস্ত ঘটনাগুলো। সেই আমাদের পালিয়ে আসা পর্যন্ত—সব। এমন কি আবছা আবছা যেন ঠাকুমার চেহারাটাও দেখতে পাচ্ছি—'

তারপর একটু থেমে কঙ্কালের মতো তুষার-শীতল হাতখানা মার হাতের ওপর রেখে বলে, 'অনেক দুঃখ পেয়েছ জীবনভোর—আমার জন্যে মরতেও পারো নি—তার ওপর এই শেষ মার খাওয়াটাও আমার হাতেই ঘটলো।···তবে ভয় নেই, যদি কোন একটিও সৎ কাজ ক'রে থাকি, ভগবানকে যদি একদিনের জন্যেও ডেকে থাকি, জন্মান্তরে তোমার কোলেই ফিরে আসব আবার ; সেবার অনেক অনেকদিন বেঁচে থাকব, মা আর বেটা। না, আর কেউ নয়। স্ত্রী নয়, ছেলে নয়, মেয়ে নয়, কেউ নয়। শুধু তুমি, মা আমার!'

তারপর বলে, 'যাবার সময় হয়ে এল, বুঝতেই তো পারছ। আজ এত সুস্থ বোধ করছি—সেইজন্যেই আরো, পিদিম নেভার আগেই জ্বলে ওঠে বেশি ক'রে—শেষবারের মতো—এ সব পিদিমের বেলাতেই খাটে। তাই বলে তুমি যেন ভেঙে প'ড়ো না মা, আত্মহত্যা করতে যেও না। তা হলে মরেও শান্তি পাব না, তার চেয়েও যেটা বড় কথা—তোমার কোলে ফিরে আসতে পারব না।···চিরদিনই সব আঘাত সয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছ—এবারেও, একটু চেষ্টা করলেই দাঁড়াতে পারবে। কাজ ক'রে যেও, কাজের মধ্যেই মানুষের মুক্তি, শান্তি। আমি তোমার বেইমান অকৃতজ্ঞ ছেলে—এই মনে ক'রে আমাকে ভুলে যেও—'

আর সহ্য করতে পারে না হেমন্ত, প্রাণপণ সংযমের বাঁধ ভেঙে হাহাকার বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে—ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে যায় সেখান থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

সেই কান্নায়-ভেঙে-পড়া পালিয়ে-যাওয়া মার গতিপথের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে তারক, মুখে তার ঈষৎ একটু হাসির আভা। করুণ—না তৃপ্তির হাসি, ঠিক বোঝা যায় না।

ছেলের মনের ইচ্ছা বুঝে সেদিনই হেমন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গিয়ে ধরে—ওরা কলকাতা ফিরতে চায়, সম্ভব হবে কি ?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে, 'এখন, এই অবস্থায় ?'

'অবস্থা যে আর ভালো হবে না সে তো বুঝতেই পারছেন রায়মশাই। মিছিমিছি, যে জন্যে এনেছিলুম তা যখন হলোই না—এখানে এই নির্বান্ধব অবস্থায় ফেলে রাখি কেন ? হাড় ক'খানাই তো সার হয়েছে—এই অগঙ্গার দেশে আর না-ই রাখলুম, গঙ্গার তীরেই দেব বরং !'

অপ্রতিভ রায়মশাই তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'কিন্তু শরীরের যা অবস্থা, সেই কথাই বলতে চেয়েছিলুম, এই এতটা পথ, নানারকমের যানবাহনের ধাক্কা কি সামলাতে পারবেন ?···বিছানা থেকে যাকে তোলাই যাচ্ছে না, তাকে কি ক'রে নিয়ে যাবেন ? বলা তো যায় না—বলতে নেই—পথেই যদি—'

'তা হোক। আতান্তরে পড়ি পড়ব, এখানেই বা আতান্তর কম কি ? আপনি যদি দয়া ক'রে একজন লোক সঙ্গে দিতে পারেন—একটি কোন বাঙালীর ছেলে—তাহলে আমি তার যাওয়া-আসা সেকেণ্ড্ ক্লাস গাড়িভাড়া দোব, খাওয়া-দাওয়া সমস্ত খরচা—তা ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক।···দেখুন যদি সেটা কবতে পারেন—একজন লোক সঙ্গে থাকলেই আমি সাহস পাব।'

'দেখি—কথা বলি। কিন্তু—' চিন্তিত মুখেই বলেন রায়মশাই, আরও যা বলতে যাচ্ছিলেন, যা বলা উচিত, তা এই বিধবা একমাত্র পুত্রের জননীকে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারেন না।···

অবশ্য প্রয়োজন হয় না আর বলার।

সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় তারক। কথাও বলে না, কারও দিকে চায়ও না। কিছু খাওয়াতেও পারে না। হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসে, অনেক গরম জলের বোতল রেখে, সেঁক দিয়েও তাকে গরম করা যায় না। কপালে গলায় চটচটে ঘাম। খবর পেয়ে বৃদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে এক পুরিয়া মকরধ্বজ বার করেন জামার পকেট থেকে, নিজে হাতে মধু দিয়ে মেড়ে জোর ক'রে মুখ খুলে জিভে লাগিয়ে দেন। তাতেও কোন কাজ হয় না, শরীরের উত্তাপ ফেরে না আর।

আরও একটু পরে রাত দশটা নাগাদ গলায় ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়। অর্থাৎ সমাপ্তির শুরু।

হেমন্ত এতক্ষণ যন্ত্রের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছিল, ডাক্তার ও নার্সের নির্দেশ মতো তাদের সাহায্য করছিল, এইবার অকস্মাৎ সে যেন স্বাভাবিক ও কর্ম-তৎপর হয়ে উঠল, ঘটনার রশ্মি এতক্ষণ যেন ছিল ভাগ্যের হাতে, এইবার সে সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। ইঙ্গিতে ওষুধ ও সেঁক দেওয়া বন্ধ করল, পুজোর জন্যে কলকাতা থেকে গঙ্গার জল এনেছিল, সেই গঙ্গার জল দৃঢ় ও অকম্পিত হাতে ছেলের মুখে ঢেলে দিয়ে পাশে বসে ছেলের বুকে হাত রেখে অর্ধস্ফুটকণ্ঠে তারক-ব্রহ্ম নাম শোনাতে লাগল। তার সেই মূর্তি দেখে ডাক্তার, রায়মশাই এবং নার্স—যেন ভয় পেয়েই পা-পা ক'রে পিছিয়ে ঘরের বাইরে ঘেরা-বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

তারকের আর চৈতন্য ফিরল না, চোখও খুলল না।

প্রদীপের সঙ্গে সে-ই তুলনা দিয়েছিল সকালবেলা—নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের মতোই জীবন শিখা আস্তে আস্তে নিভে গেল।

ঠিক কখন শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে তা কেউ টেরও পেল না। ডাক্তার যখন নিজে থেকে এসে দেখলেন, তখন আর কিছুই নেই। তাঁদের অনুমান বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে সে, হয়তো রাত তিনটে নাগাদ।

॥ ২৪ ॥

ভেঙে পড়তে নিষেধ ক'রে গিয়েছিল তারক, কিন্তু এতটা স্থৈর্য সম্ভব হয় না। যে যায় সে দায়সারা একটা সান্ত্বনা দিয়ে যেতে পারে অনায়াসে, কিন্তু যাকে থাকতে হয়, যার যায়—সে সেই ফাঁকা কথাটাতে কোন সান্ত্বনা বা অবলম্বন খুঁজে পায় না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তবু একরকম ক'রে ধৈর্য ধরে থাকে হেমন্ত, তার 'কাজ' করতে হবে, শেষ কাজ তার, শেষ সেবা—শেষ খাওয়ানো। সে কর্তব্যে না কোন ত্রুটি ঘটে, কোথাও না কোন খুঁত থেকে যায়,—এইটেই সব সময় মনে ছিল, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া চিত্তবৃত্তিগুলোকে এই এক চিন্তায় বেঁধে রেখেছিল তেরোটা দিন কোনরকমে, কিছুতেই ভেঙে পড়তে দেয় নি। 'শেষ খাওয়ানো' হিসেবেই মনে মনে আয়োজন করেছে—শ্রাদ্ধের দিন তাই সমস্ত কৃত্যই ঠিক-ঠিকভাবে ক'রে গেছে. এমন কি পিণ্ডদান পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেছিল দেশ থেকে কোন জ্ঞাতিকে টাকার লোভ দেখিয়ে এনে তাকে দিয়ে পিণ্ড দেওয়াতে, কেউ বলেছেন, ব্রাহ্মণ সমস্ত সময়ে সব কাজেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কোন ব্রাহ্মণকে দিয়ে করাতে—কিন্তু কোন প্রস্তাবেই রাজী হয় নি হেমন্ত, প্রবল আপত্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। সে থাকতে উট্‌কো পর লোকে শ্রাদ্ধ করবে তার ছেলের? পাগল নাকি! এতকাল যে খাইয়েছে সে-ই খাওয়াবে ছেলেকে, আর সে খাওয়ানোতে কোন ত্রুটিও ঘটতে দেবে না।

দেয়ও নি তা। খুব যত্ন ক'রেই সব আয়োজন করেছে, পুরোহিতের নির্দেশ এতটুকু অমান্য করে নি। দেখে দেখে সেরা জিনিসগুলোই কিনেছে দানের জন্যে। যা যা খেতে ভালবাসত তারক তাই দিয়েই নিজে হাতে পিণ্ডি মেখেছে, উৎসর্গ করেছে অবিচলিত কণ্ঠে মন্ত্র পড়ে। তেমনি সব আহার্যেরই আয়োজন করেছে ব্রাহ্মণ-ভোজনে। তারক তার সঙ্গে তার হাতের নিরামিষ রান্না খেতে ভালবাসত, নিয়মভঙ্গের দিন স্নান ক'রে তেল হলুদ মাছ পুরোহিতকে দিয়ে—নিজে সেই সমস্ত রান্না ক'রে তিনটি ব্রাহ্মণকে খাইয়েছে।

বোধহয় নিজের সহ্যশক্তির ওপর এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয় নি। প্রকৃতি এতখানি অনাচারের শোধ তুলবে বৈকি! শ্রাদ্ধপর্ব চোকা পর্যন্ত একাগ্র সাধনার মতো একমুখো যে চিন্তা ওর স্নায়ুগুলোকে ধরে রেখেছিল, সে বন্ধন আল্‌গা হওয়ামাত্র তারা যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, একেবারে পাগলই.হয়ে উঠল। ওর দাসী-চাকররা এতদিন শোকের অভাব দেখে বিস্মিত বোধ করছিল, আড়ালে যা নিয়ে বলাবলি ও মন্তব্যের শেষ ছিল না—এখন সেই শোকের প্রাবল্যেই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারা বহুদিন ধরে আছে, তাদের মতো খানিকটা ভালও বাসে—তবু নিকট-আত্মীয়, আপনার কেউ নয়—এ

শোকে সান্ত্বনা দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। তাছাড়া এক্ষেত্রে কি করা উচিত সে জ্ঞানও তাদের নেই। সাধারণ মানুষ নিয়ে, নিজেদের আত্মীয়-সমাজ নিয়েই তাদের অভিজ্ঞতা—এই সব-দিক-দিয়েই অসাধারণ অস্বাভাবিক মানুষটাকে সামলাবার মতো কোন ধারণাও তাদের নেই। এতকাল বিপদে-আপদে যাকে সর্বাগ্রে খবর দিয়েছে, ডেকে এনে নিশ্চিন্ত হয়েছে, সে গোপালীও এখানে নেই—জেনেও ছুটে গিয়েছিল—কিন্তু সে এখনও ফেরে নি। তারা একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়ল।

সত্যিই ক'টা দিন যেন একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল হেমন্ত। ঘরের জিনিসপত্র টেনে বাইরে ফেলেছে, বিলিতি কাচের আর কাচকড়ার বাসনগুলো টান মেরে আছড়ে ভেঙেছে; ভালো ভালো কাপড়গুলো—ইদানিং ও কালোপেড়ে শাদা শাড়ি পরছিল—বসে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়েছে, ঢিব ঢিব ক'রে মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়েছে; নিজের দেহ নিজের নখ দিয়ে নরুণ দিয়ে চিরে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত ক'রে তুলেছে; কারণে অকারণে এদের গালাগালি দিয়েছে—ঝি-চাকরদের। বারান্দা থেকে রাস্তার লোককে ডেকেও গালিগালাজ করেছে। অর্থাৎ পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ।

এ অবস্থায় কি করা উচিত, কাকে খবর দেবে, কাকে ডাকবে কিছুই ভেবে পায় না ঝি-চাকরেরা। হাসপাতালেই হয়তো পাঠানো উচিত, কিন্তু কে পাঠায়, কাকে গিয়ে বললে ব্যবস্থা হতে পারে তা তারা জানে না বলেই কিছু করতে পারে না। পাগলা-গারদ আছে একটা শুনেছে তারা—কিন্তু কে অভিভাবক দাঁড়াবে, এখানেই বা কে কি করে, টাকা-কড়ির ব্যবস্থা আছে—তাদের এখন মনিব কে—এসব চিন্তা তাদের বুদ্ধির ও কল্পনার অগোচর। চলে যেতে পারলে বেঁচে যায় তারা—কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় একটা খালি বাড়িতে একটা পাগলকে রেখে পালাতেও যেন মন সরে না। মায়াও পড়ে গেছে এতদিনে। ধন্নুবাবু থাকলে তাঁকে খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত—তিনিও গোপালীকে নিয়ে চুনারে গিয়ে আছেন।

ইতস্ততঃ করতে করতে, ইতিকর্তব্য স্থির করতে করতেই ছ-সাতটা দিন চলে গেল। কিন্তু কিছু একটা যে না করলেই নয় আর। সব চেয়ে বড় সমস্যা কিছুই খাচ্ছে না। চান করানো খাওয়ানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। একদানা ভাত, এমন কি একটু দুধও কেউ খাওয়াতে পারে না, ঘুম তো নেই-ই চোখে। ফলে রাস্তার পাগলীদের মতো চেহারা হয়ে দাঁড়াল, রুক্ষ জটা-পাকানো চুল, কোটরগত চক্ষু, কংকালসার দেহ। তাও ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত।

এও চলছিল তবু, যেদিন বাক্স থেকে দশ টাকার নোটগুলো বার ক'রে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়তে লাগল, নগদ টাকা আধুলি সিকি নর্দমায় ফেলতে শুরু করল—সেদিন আর স্থির থাকা সম্ভব হল না। এতদিন যে দ্বিধা ও সংকোচটা ছিল, তা সত্ত্বেও যার কথা প্রথম থেকেই মনে পড়েছে—দারোয়ান শিউপূজন গিয়ে সেই পূর্ণবাবুকেই খবর দিল।

পূর্ণবাবু এ সব খবরই রাখছিলেন বৈকি!

বয়স হলেও, বৃদ্ধ হয়ে-পড়া যাকে বলে তা তিনি হন নি। এখনও হাসপাতালে যাতায়াত করেন নিয়মিত, রোগীও দেখেন। এ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আগের মতোই

আছে, অক্ষুণ্ণ। তারকের অসুখ হওয়ার খবর তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছেন ; রসিকবাবুকে দেখানো, কন্দর্পবাবুর সহায়তায় দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া—কোন খবরই তাঁর জানতে বাকী ছিল না। স্যানাটোরিয়ামের রেসিডেন্ট ডাক্তার তাঁর ছাত্র—সেখানেই গেছে সংবাদ পেয়ে তাকে চিঠি লিখে নিয়মিত খবরাখবর জানাতে বলেছিলেন। সুতরাং রোগীর 'প্রোগ্রেস'—এক্ষেত্রে অবনতির খবর—দশ-পনেরো দিন অন্তরই পাচ্ছিলেন, মৃত্যুসংবাদও পেতে দেরি হয় নি।

তার পর থেকেই তিনি এখানে আসার জন্য ছটফট করছেন মনে মনে—কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। কমলাক্ষর মৃত্যুর পর যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তার অপমানটা প্রায় ভুলে এলেও হেমন্তর সেই রণরঙ্গিণী মূর্তি ভোলেন নি। আবারও সেই চেহারার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো ভরসা নেই তাঁর।

কিন্তু শিউপূজন যখন গিয়ে এই অবস্থা জানাল তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আজ প্রথম একটা আশ্চর্য সত্যোপলব্ধি হল তাঁর, তাঁর কাছে বিস্ময়কর অন্তত, নিজেকেও দেখতে পেলেন সেই সত্যের আলোয়, হেমন্ত সম্বন্ধে দৈহিক লিপ্সাটা কবে একটু একটু ক'রে অন্তর্হিত হয়েছে—সে স্থানটা অধিকার করেছে একটা সত্যকার ভালবাসা। কামনার পঙ্কে ফুটে উঠেছে নির্মল প্রেমের পদ্ম। আজ একটা পরিচ্ছন্ন প্রীতিবোধ, মেয়েটার জন্যে আন্তরিক উদ্বেগই বোধ করছেন তিনি, অন্য কিছু না।

কিন্তু পূর্ণবাবুর বিস্মিত হবার পালা সেদিন নিজের মানসোপলব্ধিতেই শেষ হয় নি —আরও বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে ছিল তাঁর জন্যে।

লাঞ্ছনা সইতে হবে জেনেই এসেছিলেন। জ্ঞান থাকলেও সইতে হত, এখন তো যা শুনলেন—পরিপূর্ণ পাগলের অবস্থা—হয়তো মারধোরই ক'রে বসবে, হয়তো বা আঁচড়ে-কামড়ে দিতে আসবে—কদর্য গালাগাল তো আছেই। সে-সব সহ্য করার জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন। তবু কতকটা ভয়ে ভয়েই সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—আক্রমণটা কিভাবে, কোন্ চেহারায় আসবে কিছু জানা নেই বলেই ভয়।

সে-সব কিছুই ঘটল না। পূর্ণবাবু যখন পেঁছিলেন, তখন—সকালের প্রচণ্ড উন্মত্ততার প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত—ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে, হয়ত এই উন্মত্ততারও কোন অর্থও খুঁজে পাচ্ছে না, যে শান্তি আশা করেছিল তা না পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে, কিংবা হয়ত কিছু ভাববার কি বুঝে দেখারও ক্ষমতা নেই আর। ঠিক সে সময়টায় তাই সামনের দেওয়ালের দিকে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। এত স্থির যে, হঠাৎ দেখলে আশঙ্কা হয় নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা।

ওর দিকে চেয়ে মমতা ও করুণায় চোখে জল এসে গেল পূর্ণবাবুর। এই কি সেই হেমন্ত, সেই আশ্চর্য সুন্দরী নারী, তাঁর ঈপ্সিতা ও প্রিয়তমা? যার জন্য পরিণত বয়সেও তিনি ঈর্ষায় পাগল হতে বসেছিলেন?…মলিন ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্র, বিপুল চুলের ভার রুক্ষ জট-পাকানো, ধূলি-ধূসর ক্ষত-বিক্ষত দেহ, কোটরগত শুষ্ক চোখ—জবাফুলের মতো রক্তাভ—এর মধ্যে আজ সেই রূপ ও আকর্ষণের কোন চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গাঢ় কণ্ঠে ডাকলেন, 'হেম, হেমন্ত!'

অকস্মাৎ যেন পাথরে প্রাণের আভাস জাগল। চমকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে চাইল

হেমন্ত। যেন ওঁর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কাকে চেনবার চেষ্টা করল, একটু পরে পরিচয়ের আলোও দেখা দিল চোখে। তারপর এই ক'দিনের অবিরাম কান্না-ও-চিৎকারে-ভেঙে-যাওয়া ধরা-ধরা গলায় কতকটা স্বগতোক্তির মতো ক'রে বলল, 'তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদছ? তুমি আমার তারকের জন্যে কাঁদছ?···আঃ, বাঁচলুম! কেউ ছিল না, একজনও কেউ কাঁদবার নেই বাছার জন্যে এ পৃথিবীতে। কেউ নেই—সেই দুঃখটা আমার সবচেয়ে বেশী বেজেছে। আহা—যদি বিয়েটাও হয়ে যেত, তবু একটা বিধবা বৌ থাকত আমার সঙ্গে কাঁদবার জন্যে—'

তারপর, বলতে বলতে যেন আরও খানিকটা সম্বিৎ ফিরে পায় পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে, নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে, হু-হু ক'রে কেঁদে উঠে পূর্ণবাবুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। অশ্রুরুদ্ধ স্খলিতকণ্ঠে বলে, 'তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিলুম, তোমাকে অপমান করেছি, কমলাক্ষর মা-বউয়ের সর্বনাশ করেছি···সেই পাপেই আমার একমাত্র অবলম্বন চলে গেল, একটা ছেলে ছিল, তাও সইল না। তুমি আমাকে মাপ করো। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম—ভালো-মন্দ পাপপুণ্য কোন জ্ঞান ছিল না।'

পূর্ণবাবু সেইখানেই, মেঝের ওপর বসে পড়ে জোর ক'রে ওর মাথাটা তুলে কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলেন, 'ওসব কথা থাক হেম, আমরা দুজনেই সমান পাপী, সমান অপরাধী। আমার কাছে তোমার কোন অন্যায় কোন পাপ হয় নি। তুমি শান্ত হও। ভগবান কাকে কখন কি প্রয়োজনে নেন তা কেউ বলতে পারে না। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে কতকগুলো ফাঁকা সান্ত্বনার কথা বলে কোন লাভ নেই—তুমি কাজ শুরু করো, স্বাভাবিক হও—তোমার কাজের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পাবে একদিন।'

একটা যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগে হেমন্তর দেহমনে, চমকে উঠে বসে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। সেও সেই কথা বলে গিয়েছিল বটে। ঠিক ঠিক!' পরক্ষণেই কেমন যেন অসহায় আর্তকণ্ঠে বলে, 'কিন্তু আমি কি পারব—আবার, আবার ওইসব কাজ করতে! করতে গেলেই যে মনে পড়বে শেষ দিনগুলোর কথা! আমি পারব না গো!'

'কাজ বলতে ওই কাজই বা ভাবছ কেন হেম? কাজ আরও ঢের আছে! করব মনে করলে করার মতো কাজের অভাব হবে না। তুমি এখন ওঠো তো, স্নান করো, পরিষ্কার হও। তারক বেঁচে থাকলে তোমার এ চেহারা দেখে সে কি ভাবত বলো তো? কত কষ্ট হত তার!'

আর কোন প্রতিবাদ করে না হেমন্ত। বরং যেন অবসন্ন ভেঙেপড়া দেহটাকে—যেমন ছড়িয়ে-পড়া কোন জিনিস কুড়িয়ে নেয় মানুষ তেমনি ক'রে—কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এতদিনের অনাহার ও অর্ধাহার, সেই প্রচণ্ড শোকের ক্লান্তি—সব মিলিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেটা উন্মত্ততার মধ্যে বোঝা যায় নি, কিন্তু এখন বোঝা গেল। কলঘরের দিকে যেতে গিয়ে টাউরি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ঝি তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। তারপর সে-ই ধরে নিয়ে গেল, হেমন্ত প্রতিবাদও করল না, বাধাও দিল না।

সেদিন এবং পরের দুটো দিন পূর্ণবাবু ওখানেই রইলেন। অন্য কোন সম্পর্ক সম্ভব নয়—সে-কথা কারও মনেও রইল না, পুরাতন দুই বন্ধুর মতোই শুধু

কাছাকাছি থাকা, সান্ত্বনা ও আশ্বাস আহরণ করা। দুঃসহ এক শোকেরই বুঝি প্রয়োজন ছিল মধ্যের বিপুল তিক্ততা মুছে ফেলার জন্যে, কিংবা তারও বেশী। এমন ক'রে দু'জনের কেউই কাউকে পায় নি কখনো, এত ঘনিষ্ঠ এত অন্তরঙ্গভাবে। পরস্পরের সাহচর্য যে উভয়েরই কাছে এত মধুর ও শান্তিপ্রদ হতে পারে—দু'জনের কারুরই এতদিন সে ধারণা ছিল না।

একটু শান্ত হতে পূর্ণবাবু প্রস্তাব করলেন, 'তুমি দিনকতক একটু ঘুরে এসো হেম, তা নইলে সহজ হতে পারবে না।'

'ঘুরে আসব ? কোথা থেকে ?'

'একটু তীর্থে-টির্থে যাও না !'

'তীর্থে ?'...হ্যাঁ, তাই যাওয়া যায় বটে। কিন্তু একা কোথায় যাব ? কিছুই তো জানি না। তুমি যাবে ?'

'না। আমার শরীর ভাল নয়, বুড়োও তো হয়ে পড়েছি, অত ঘোরাঘুরি সহ্য হবে না। আমি বড়জোর কোন একটা জায়গায় গিয়ে বসে থাকতে পারি। বেশ—আমি বরং কাশী পর্যন্ত যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, সঙ্গে তোমার ঝি চারুর মাকে নাও, আর আমার পুরুতমশাইকে দিই ; তাঁরও বয়স হয়েছে—তবু তিনি এখনও অনেক শক্ত আছেন আমার চেয়ে, তাছাড়া অনেকবার তিনি সেথো হয়ে গিয়েওছেন এসব তীর্থে। মোটামুটি কাশী গয়া বৃন্দাবন হরিদ্বার প্রয়াগ এইগুলো সেরে এসো, যদি ইচ্ছে হয় ওদিকে দ্বারকা পর্যন্তও যেতে পারো। বাকী থাকে এক জগন্নাথ, সেটা একটু উল্টো দিকে পড়ে—তা সে ওদিক থেকে ফিরে এসেও যেতে পারবে।'

হেমন্ত যে খুব উৎসাহিত হয়, তা নয়—তবু আর কোন অবলম্বন, কোন পথ খুঁজে না পেয়েই যেন—রাজী হয় শেষ পর্যন্ত। এবার এই পাগলামি—পূর্ণবাবু বলেন হিস্টিরিয়া—কাটবার পর যেন ভেতরে ভেতরে বড় দুর্বল, অসহায় হয়ে পড়েছে। নিজে থেকে কিছু ভাবা, কি ভেবে-চিন্তে কিছু করার শক্তি নেই। বেশীক্ষণ কিছু যেন ভাবতেও পারে না, মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায়। তার চেয়ে পূর্ণবাবুর মতো হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকস্থানীয় বয়স্ক লোকের ওপর চিন্তার ভারটা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করা ঢের ভালো।...

তীর্থে গিয়ে শোকটা না ভুলুক এই উপকারটাই হয়। নিজেকে যেন ফিরে পায় হেমন্ত, নিজের পূর্ণ পূর্ব-সত্তাকে। আঘাত সহ্য করা, বিপদে অবিচল থাকা—আকস্মিক কোন ঘটনায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে উপায়-নির্ধারণের যে শক্তি নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্যে একটু একটু ক'রে গড়ে উঠেছিল, সেই শক্তিটাই ফিরে আসে। মনের শূন্যতাটা পূর্ণ হয় না—তীর্থ-দেবতারা ছেলের স্থান ভরিয়ে দিতে পারেন না—তবে চিন্তাশক্তিটা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রায় তিনমাস ধরে ঘুরে বেড়ায় হেমন্ত। অনেক পরে ওর হুঁশ হয় টাকার কথাটা—এত খরচ কোথা থেকে হচ্ছে ! তখন পূর্ণবাবুদের পুরোহিত হেরম্ব ভট্চায জানান যে, পূর্ণবাবুই অনেক টাকা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন—খরচের কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রযোজন নেই। আগে হলে প্রতিবাদ করত, নিজের টাকা আনাবার চেষ্টা

করত—কিন্তু কে জানে কেন, এখন এ কথায় একটা যেন স্নেহের পরিচয় পেয়ে নিজেকে অনেকটা নিরাপদও মনে হয়।

অনেক ঘোরে। কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, নাথদ্বার হয়ে দ্বারকা পর্যন্ত। শুধু গয়াটা যায় না, ছেলের সপিণ্ডকরণ হয় নি এখনও—সেটা না সারলে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া যাবে না। আর একবার গয়ায় এসে এ সম্পর্ক চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেবে।

দ্বারকা থেকে এ পথে আর ফেরা হয় না। ওকে ভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসেছে। হেরম্ব ভট্‌চায একটু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন, ঝিয়েরও বাড়ির খবরের জন্য মন উতলা—হেমন্ত একরকম জোর ক'রেই টেনে নিয়ে যায় ওদের। উজ্জয়িনী অবন্তী হয়ে নর্মদা সেরে কাটনী বিলাসপুরের পথে পুরী এসে পৌঁছয়। এইখানেই যাত্রার ইতি করতে হয়। বৈতরণী ও বিরজা দর্শনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এবার সঙ্গীরা যেরকম বেঁকে দাঁড়াল, মনে হল আর দেরি করলে ওকে ফেলেই পালাবে তারা।

কলকাতায় ফিরে কোথায় উঠবে এ কথাটা আগেই ভেবে রেখেছিল। ও বাড়িতে আর নয়। তারকের স্মৃতি ও-বাড়ির অণু-পরমাণুতে জড়ানো। ওখানে গেলেই সেইসব চিন্তা এসে ঘিরে ধরবে ওকে—আবারও হয়তো পাগলামির ভূত চাপবে মাথায়। পূর্ণবাবুকে তাই লিখে দিয়েছিল, 'আমার জন্যে কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে রেখো—ও-বাড়ির কোন জিনিসও আনিও না, এই যে বিছানা আর বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই নিয়েই উঠব, এতেই আমার চলে যাবে।'

পূর্ণবাবু স্টেশনে এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে। হেরম্ব ভট্‌চাযকে সেখান থেকেই বিদায় ক'রে দিয়ে হেমন্ত আর ঝিকে গাড়িতে তুলে নিলেন। আগে মনে হয় নি কথাটা, গাড়ি চলতে শুরু করার পর গঙ্গা পেরিয়ে পরিচিত পুরনো হ্যারিসন রোড না ধরে যখন স্ট্র্যাণ্ড রোডের পথ ধরল তখন মনে পড়ল, গন্তব্যস্থানটা এখনও জানা হয় নি। হেমন্ত প্রশ্ন করল, 'বাড়ি কোথায় ঠিক করলে ?'

'কোথাও এখনও ঠিক করি নি। দুটো-তিনটে দেখে রেখেছি, তুমি নিজে দেখে যেটা পছন্দ হয় ঠিক করো। বালিগঞ্জের দিকে একটা ছোট বাড়ি বিক্রিও আছে খুব সস্তায়—যদি থাকতে চাও, সেও আমি ঠিক ক'রে রেখেছি—চোরবাগানে একটা, ঠনঠনেয় একটা—দেখে পছন্দ ক'রে নিও। এ দুটোই ভাড়া অবিশ্যি—'

'তাহলে আমরা এখন উঠছি কোথায় ?' হেমন্ত একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করে।

'বালিগঞ্জে—আমার ঐ বাগানবাড়িতেই। রান্নার লোক একজন ঠিক ক'রে রেখেছি, গিয়েই হাত পোড়াতে বসতে হবে না। লোকও একটা হল বাড়তি। দারোয়ানরা তো আছেই, তাছাড়াও আমার সরকার এখন ঐখানেই থাকে একটা ঘরে সপরিবারে, তোমার খুব একটা নিবান্দাপুরী বলে মনে হবে না। তুমি এখন নেমে চান-খাওয়া করো, বিকেলে আবার গাড়ি পাঠিয়ে দেব'খন—বাড়িগুলো দেখে এসো। আর, আর যদি ওখানেই থাকতে চাও এখন কিছুদিন—কি কিছু বেশীদিন, কি চিরকালও—স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো, আমার কোন আপত্তি কি অসুবিধে নেই। আমার তো আজকাল আসাই হয় না—তবু বাড়িটা ব্যবহার হবে।'

আবার সেই বাগানবাড়ি !

কমলাক্ষর স্মৃতি—

পরক্ষণেই প্রবল বেগে মাথা নাড়ে—আপন মনেই। জোর ক'রে যেন দৈহিক অর্থেই চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে।

নাঃ, সে-সব চিন্তা আর না। সে-সব অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, পেছনেই পড়ে থাকে।

ছেলে নতুন পথ দেখিয়ে গেছে, কর্মের পথ—কর্মব্যস্ততার মধ্যে মুক্তির পথ—সেই পথেই সে যাবে।

গোবিন্দ যদি দয়া করেন, তাঁর পায়েই মন দেবার চেষ্টা করবে সে।

—প্রথম পর্ব সমাপ্ত—

পূর্ব পুরুষ

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

এতদিনের ভবঘুরে বৃত্তির পর বাগানবাড়ির শান্ত নির্জনতা বড় ভাল লাগে হেমন্তর। একটু যেন বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারে নিজের সঙ্গে—চিন্তাগুলোকে থিতিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে। এতকাল একটু শান্তির জন্যে ছুটে বেড়িয়েছে—একটা তীর্থ থেকে আর একটা তীর্থে—তাতে ফল কি হয়েছে, ছেলের শোক কতটা ভুলতে পেরেছে তা বুঝে মিলিয়ে দেখার অবকাশ পায় নি। সেই অবকাশটাই পেল এখানে এসে।

শান্ত হয়েছে, অনেকটা শান্তি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। চুপ ক'রে নিজেকে নিয়ে থাকতে পারাটাই অনেকখানি শান্তি। কোন কাজ নেই, কাজের তাড়াও নেই। এককালে বাইরের কাজ ছিল, তারপর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে এক বছর প্রায়, তারও পরে এই ছুটোছুটি, এক দেশ থেকে আর এক দেশে।

বহুদিন পরে বোধহয় জীবনে এই প্রথম ছুটি পেল সে, কর্মহীন দায়িত্বহীন পূর্ণ অবকাশ। শোক শূন্যতা তো আছেই, জীবনের একমাত্র অবলম্বন উদ্দেশ্য গেছে হারিয়ে—সে শূন্যতাবোধ ও হাহাকার মনের একটা দিক পাথর ক'রে রেখেছে—স্মৃতিও আছে তার সঙ্গে, সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কত ঘটনা কত মানুষের স্মৃতি ভীড় করে আসে—বিশেষ এই কর্মহীন অবসরে যেন বেশী ক'রে ঘিরে ধরে তারা—কিন্তু এ তো চিরদিনের সঙ্গী হয়ে রইল, এরা তো থাকবেই। এসব সত্ত্বেও এই নির্জনতা, এই নৈষ্কর্ম্য ভাল লাগে। কিছু না করার, না করার কথা ভাববার অধিকার—এও তো একরকমের মুক্তি।

পূর্ণবাবুও তা বোঝেন। তিনি তাই বিকেলের দিকে আসেন, ঘণ্টাখানেক বসে গল্প করেন, কোন দিন বা আরও একটু বেশী থাকেন—তারপর চলে যান। 'কী করবে এখন, কাজকর্ম আরম্ভ করবে কিনা' এ প্রশ্ন তোলেন না। এমন কি, সেই যে বাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল—কেনা বা ভাড়ার—সে কথাটাও মনে করিয়ে দেন না।

এর মধ্যেই একদিন সংবাদ আসে—গোপালীর শেষ সময় উপস্থিত।

ধন্নুবাবু খবর পাঠান, ওকে দেখতে চাইছে সে। হেমন্তর মনের অবস্থা তিনি বুঝতে পারছেন—তবু যদিই সে ক'টা দিন গিয়ে একটু থাকতে পারে তো খুব ভাল হয়, তিনি অনেকটা নিশ্চিত হতে পারেন।

অনিচ্ছাতেও যেতে হয়।

আবার, আর একজন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু দেখার ইচ্ছা নেই। সে যা দুর্ভাগিনী তাকে যে ভালবাসে সে বাঁচবে না, এ তো জানা কথাই—কিন্তু সে কথা ধন্নুবাবুকে বলা যায় না। ওর মনের কথা কেউ বুঝবে না—ভুল বুঝবে, অকৃতজ্ঞ ভাববে।

তাই যেতেও হয়, চুপ ক'রে বসে থাকতেও পারে না। সেবার ভারও তুলে নিতে হয়। শিক্ষিত অভ্যস্ত হাত তার। সেবার কোন ত্রুটিও ঘটে না। তবে বার বার ঐ একটা কথাই মনে হয়, না এলেই ভাল হত। অনেক দিন দেখে নি গোপালীকে, বৎসরাধিক কাল। সেই চেহারার এই হাল হয়েছে—সেই রূপের এই পরিণতি—না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এ চেহারা দেখতে না এলেই ভাল হত—নিজের মনে কেবলই ঐ কথাটা বলে হেমন্ত। এ কাকে দেখতে এল সে! না দেহে না মনে কোথাও ওর পরিচিত সেই গোপালীর অস্তিত্ব নেই; সেই হাসিখুশী পরোপকারী কোমলপ্রাণা অথচ আত্মবিশ্বাসী মেয়েটির। দীর্ঘকাল ভোগার ফলে মাথাতেও কেমন গোলমাল হয়ে গেছে—কখনও চিনতে পারে কখনও পারে না। কী যেন বলতে চায়, কী যেন বলার ছিল—মনে পড়ে না। সবচেয়ে, বারে বারেই তারকের কথা জিজ্ঞাসা করে। কখনও আবার সে কথা মনে পড়ে, প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁরে সে কেমন আছে, খোকা? সেরে উঠেছে বেশ? কোথায় আছে, চাকরি করছে?···বে দিবি না?···আসতে বলিস একবার। কতদিন দেখি নি!'

এই সময়গুলোয়ই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। চোখের জল রোধ করা যায় না। ধন্নুবাবু হয়ত তারকের মৃত্যুর খবর জানান নি ওকে। জানালেও ভুলে গেছে গোপালী। এখন আর নতুন ক'রে জানাতে গিয়ে মৃত্যু-পথযাত্রিণীকে আঘাত দিয়ে লাভ কি! গোপালী তারককে আপন ছেলে না হোক, আপন বোন-পোর মতোই ভালবাসত—তা হেমন্ত জানে।

আরও কষ্ট হয় যখন গোপালীর ছেলে হেমন্তর চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ছেলে, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় সুকান্তি ছেলে, শালের কোঁড়ের মতো সজীব সতেজ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওকে দেখে আর তারকের কথা মনে হয়। আপনা থেকেই যেন বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। এ নিঃশ্বাস পড়া উচিত নয়, অকল্যাণ হবে হয়ত ছেলেটার, নজর লাগছে—গোপালীর ছেলের যদি অমঙ্গল হয় এ নিঃশ্বাসে, তার অপরাধের শেষ থাকবে না—তা বুঝেও সামলাতে পারে না নিজেকে।

সৌভাগ্যক্রমে গোপালী অল্পেই অব্যাহতি দিয়ে যায় ওকে। মাত্র সাত-আটদিন থাকতে হয়েছিল হেমন্তকে, তার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। হঠাৎই শেষ হয়ে গেল একদিন। বেশীদিন বাঁচবে না আর, সবাই জানত, তবু এমন আকস্মিক চলে যাবে কেউ ভাবে নি।

হেমন্ত কাঁদল না। কান্না আর তার ছিল না। ইহজগতের যে ক'টি বন্ধন ছিল, যে ক'টি অবলম্বন, ভগবান একে একে সব ঘুচিয়ে টেনে নিলেন। সবক'টি প্রিয় ব্যক্তি চলে গেল—সে যাদের ভালবাসত, তাকে যারা ভালবাসত—সব। এই বোধহয় তার ললাটলিপি। স্নেহ প্রেম ভালবাসার কোন বন্ধন ভগবান তার রাখবেন না—কে জানে তাঁর কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে এতে!···আবারও শাশুড়ীর সেই কথাটা মনে পড়ে। সত্যিই কি সে পিশাচী, তার নিঃশ্বাসে সবাই শুকিয়ে মরে যায়?

এবারের এই তীর্থযাত্রার মধ্যে বৃন্দাবনে একটা কথা শুনেছিল সে। গোপীনাথের মন্দিরে কথকতা হচ্ছিল, একদিন বিকেলে শুনতে গিয়েছিল। কথক প্রভুপাদ

শ্যামকিশোর গোস্বামী না কে—মনে নেই ঠিক—কথাপ্রসঙ্গে বিষকন্যার কথা বলেছিলেন। সেও কি সেই বিষকন্যা?

কে জানে, তাই যদি হয়—তার কি দোষ! ভগবান তাকে যেমন তৈরী করেছেন, সে তেমনি হয়েছে।...

চারিদিকে যখন সকলে হাহাকার ক'রে কাঁদছে—প্রৌঢ় দুঁদে য়্যাটর্নী ধন্নুবাবু পর্যন্ত আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন—তখন তার মধ্যে শুষ্ক চোখে পাথরের মতো বসে এই কথাগুলোই ভাবছিল সে।

বোধহয় তার আসাটাই অন্যায় হল, চক্ষুলজ্জায় পড়ে না এলেই ভাল হত।

কে জানে, সে না এলে হয়ত আরও দুটো দিন বাঁচত গোপালী—অবুঝের মতো এই কথাটাই মনে হয় বার বার।

কোন অর্থই নেই এ-কথার, তাহলে যতদিন একত্রে ছিল, তখনই ওর নিঃশ্বাসে গোপালী মরতে পারত—এসব জেনেও ব্যথাটা মন থেকে একেবারে দূর করতে পারে না।...

ওর এই শুষ্ক চোখ ও কঠিন মুখভাবের কারণ বুঝতে পারে না অনেকেই। 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর' এই কথাটাই ভাবে কেউ কেউ।

গোপালীর মৃত্যুতে একটা সত্য পরিষ্কার হয়ে যায় ওর কাছে।

কী করবে তা স্থির করতে না পারলেও, কী করবে না সেটা ঠিক ক'রে ফেলে।

নিজের বৃত্তিতে আর ফিরে যাবে না সে। ও-কাজ আর করতে পারবে না।

রোগীর বিছানার পাশে বসলেই ওর তারকের কথা মনে পড়বে, গোপালীর কথা। তাছাড়া এ-কাজ সে নিয়েছিল তারকের জন্যই। সে-ই যখন রইল না, তখন কার জন্যে এই রক্ত-পুঁজ ঘাঁটতে যাবে—যা ওদের দেশে অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়েরা চিরকাল ক'রে এসেছে—ছেলে প্রসব করানোর কুৎসিত দৃশ্য সহ্য করবে বার বার।

এটা করবে না স্থির ক'রে ফেললেও, কী করবে সেটা ঠিক করতে পারে না।

পূর্ণবাবু অবশ্য বলেন, 'কিছু আর না করলেও চলবে তোমার, একটা লোক—চলেই যাবে। বড় বাড়িটাও যদি ভাড়া দাও, দু'খানা ছোট বাড়ির একখানাতে থাকো—তাহলে একশো টাকা না হোক সত্তর-আশি তো পাবেই। টেক্স-খাজনা বাদ দিয়েও যা থাকবে, একটা মানুষের হেসেখেলে চলে যাবে। তখন তো আর এতগুলো লোক রাখারও দরকার হবে না—একটা ঝি থাকলেই চলবে।'

তারপর বলেন, 'আর যদি এখানে না থাকতে চাও, বাড়ি ক'খানাই বেচে দিয়ে টাকাটা কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করো—কিছু, না হয় এক-আধ হাজার পোস্টাপিসে রেখে দিলে, হঠাৎ দরকারের জন্যে—যা সুদ পাবে তাতেই কোন তীর্থে গিয়ে, কাশী কি বৃন্দাবনে বাস করতে পারবে অনায়াসে।

'রক্ষে করো' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে হেমন্ত, 'অমন দুর্গতি যেন আমার কখনও না হয়। যা দেখে এলুম! কাশীতে আট-দশদিন ছিলুম তো, বৃন্দাবনে আরও বেশীদিন—দিন-পনেরো বোধহয়—তাতেই ঐসব বিধবাদের দেখে নিয়েছি। ঐ যারা মাসিক তিন

টাকা চার টাকা আয়ে দিন কাটায়, ওখানে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।...মন পড়ে আছে এইখানে, "পরের মেয়ে বৌ এসে সেখানে রাজত্ব করছে, আমি এখানে একা পড়ে আছি"—এই হিংসেতে জ্বলে-পুড়ে মরছে দিনরাত। যার ছেলেমেয়ে নেই, ভাগ্নে কি ভাশুরপো সাহায্য করে, তারাও জ্বলছে, মন পড়ে আছে সর্বক্ষণ এইখানে, সংসারেতে—কেবল ভাবছে সবাই মিলে তাদের ওপর অবিচার করছে, কিম্বা তারা যেমন গুছিয়ে সংসার করত, এরা কি তা পারছে—এখনকার ঝি-বৌরা? এতটি অপচ করছে—অথচ তাকে দু'টাকা বেশী দিতে বুক ফেটে যায়।...কাশীতে গোপালবাড়ি কি দশাশ্বমেধে কথা শুনতে যায়, বৃন্দাবনে গোপীনাথের মন্দিরে রাধারমণের মন্দিরেও গিয়ে দেখেছি—হয়ত ভাগবত পাঠ হচ্ছে—সেখানে বসে বসে গুজগুজ ক'রে—বেটা-বৌ, নয়ত দেশে যে-সব আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের নিন্দে করছে এতটি। দর্শনে বেরোয়—তা ঐ বেলপাতার ডগা ক'রে শিবের মাথায় একটু জল দিল কি না দিল—আধ পয়সার আনাজ কি এক পহলার শাক নিয়ে কচা-কচি, হাঁ ক'রে খাবারের দোকানের রকমারি মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিঃশ্বেস ফেলে, কেউ বেড়ালের নাম ক'রে মাছ কেনে, কেউ অতটা না করলেও অকারণেই মাছের বাজারে উঁকি মারে—কোন্ মাছ কী দরে কে কিনল, লোককে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে। ওভাবে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবারও বলে, 'তাছাড়া এখন থেকে গিয়ে চুপচাপ বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা—কবে মরব সব জ্বালা জুড়োবে তার দিন গোনা—অথচ মরণের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা—ও আমার ধাতে সইবে না। আরও কতকাল বাঁচতে হবে ঠিক তো নেই, ভগবানের যা রকম-সকম, মনে হয়—আমাকে ভালমতো দগ্ধাবেন বলেই পাঠিয়েছেন—অনেক কালই বাঁচতে হবে হয়তো—এই দীর্ঘকাল চুপচাপ বসে খাওয়া? কোন কাজ হাতে না থাকলে পাগল হয়ে যাব...না, ও হবে না। দেখি, যদি অন্য কোন কাজ খুঁজে না পাই—শেষ পর্যন্ত কোন হাসপাতালেই চাকরি নোব। এ-কাজ যদি করতেই হয়, টাকা নিয়ে আর করব না—পরের দোরে ছুটোছুটিও না। সময় নেই অসময় নেই ডাকলেই ছুটতে হবে, তার জন্যে তিন-চারটে লোক পুষে ঠাট সাজিয়ে বসে থাকা আর নয়।...হাসপাতালে কাজ করি সে একরকম। বাঁধা সময় বাঁধা কাজ। এখানে যদি পাই বিনি মাইনেতেই করব, সেও ভাল।'

কিন্তু অতকিছু করতে হয় না, কর্মক্ষেত্র একটা আপনা থেকেই চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। হঠাৎই।

বাড়ি বিক্রী করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে সেই পুরনো দালালকে একটা খবর দিয়েছিল। কী রকম এখন দর-টর যাচ্ছে খানিকটা জানবার জন্যেই আরও—দালাল কেশববাবু চিঠি পাওয়ামাত্র ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন।

'ছোট বাড়িটা বিক্রী করবেন মা-ঠাকরুন? ঐ নেবুতলার বাড়িটা? খুব ভাল দর পাবেন। আপনি সারিয়ে-সুরিয়ে রঙ করিয়ে এখন বেশ পছন্দসই ক'রে দিয়েছেন তো, খদ্দেরকে দেখালেই পছন্দ করবে।'

'কত দর উঠবে আপনি আশা করেন?'

কেশববাবু এই কাজে বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি অত সহজে ভাঙবার লোক নন। হাত

কচলাতে কচলাতে সবিনয়ে হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আজ্ঞে, আপনি কতটা পেলে খুশী হন ?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মনে মনে হিসেব ক'রে নিল হেমন্ত, বাড়িটা ন' হাজারে কেনা, রেজেস্ট্রী খরচা-টরচা নিয়ে আরও পাঁচশো, মেরামত খরচা, মায় একটা অতিরিক্ত কলঘর ও ছাদে নতুন একটা রান্নাঘর নিয়ে ধরো দেড় হাজারের মতো খরচ হয়েছে, সামান্য দু-একশো বেশিও হতে পারে, মোট এগারো হাজারই ধরা উচিত। ভাড়া পাচ্ছে মাসে আটাশ টাকা ক'রে—ট্যাক্স্, ছোটখাটো মেরামতি প্রভৃতি দিয়েও অনেক পেয়েছে এই দেড় বছরে।

সে দ্রুত সবটা ভেবে নিয়ে কতকটা মরীয়া হয়েই বলল, 'পনেরো দিতে পারবেন ?'

'একটু শক্ত হবে মা-ঠাকরুন।' কেশববাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'খুব বোকা খদ্দের না হলে ও বাড়ির জন্যে অত কেউ দেবে না।···বোকা খদ্দের তো সব সময় মেলে না।···ভাড়া তো ঐ, টাকাটা অন্য কোথাও লগ্নী করলে ঢের বেশী পাবে, কোন ভাল মাড়োয়ারীর গদিতে জমা রাখলে তো কথাই নেই।···আচ্ছা দেখি, কতদূর কি করতে পারি !'

কেশববাবু ফিরে এলেন তিনদিনের মাথাতেই।

বললেন, 'মা, ভাল দাঁও পেয়ে গেছি। ভেতরটা তো দেখাতে পারি নি, সে আপনি গিয়ে না দাঁড়ালে, ধরুন ভাড়াটেরা বাড়ি দেখাবে কেন—বাইরে থেকে দেখিয়েছি, তাতেই চৌদ্দ পর্যন্ত উঠেছে। এতেই ছেড়ে দিন মা-ঠাকরুন, এতও কেউ দেবে না। আরও দু-একটাকে বাজিয়ে দেখেছি। বারোর ওপর উঠতে চায় না কেউ।'

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির ক'রে ফেলে, 'আমি রাজী, আপনি বায়না করান।'

তারপর কেশববাবু চলে গেলে পূর্ণবাবুকে বলে, 'তুমি যে সেই বালিগঞ্জে কি বাড়ির কথা বলেছিলে, সে বিক্রী হয়ে গেছে ?'

'না, এখনও হয় নি। পড়েই আছে।'

'কী রকম বাড়ি, কত বড় ? জমি কতটা ?'

'র'সো, মনে করি। অত কি আমার মুখস্থ আছে ! কেন বলো দিকি, অত তাড়া—?'

'বলোই না তুমি ! তারপর বলছি।'

পূর্ণবাবু ভেবে নিয়ে বলেন, 'দেড় কাঠার ওপর বাড়িটা বলেছিল বোধহয়। দু'খানা ঘর, কল-পাইখানা, চিলে কোঠাটায় কেবল টিনের চাল, সেইখানেই রান্নাঘর, বাইরের দিকে একটু সরু বারান্দা আছে, ভেতরেও আড়াই হাত চওড়া রক। জমি সবসুদ্ধ সাড়ে ছ'কাঠা।'

'কত চাইছে ?'

'বারো হাজারের কমে দেবে না। ছোট হোক, নতুন বাড়ি।'

'তুমি কথা বলো ভদ্দরলোকদের সঙ্গে। আমি কিনব।'

'সে কি ! তারপর ? কী করবে নিয়ে ? ভাড়াটে পাবে না ওখানে। যে বাড়ি করেছিল সে ভাড়া দেবে বলেই করেছিল, কিন্তু অত নির্জন জায়গায় কেউ আসতে চায় না। লোকের বাস বলতে তো মনোহরপুকুর, সেখান থেকে তিরিশ ফুট রাস্তা গেছে, এখনও কাঁচা—তা থেকে আবার কুড়ি না পঁচিশ ফুট পথের ওপর এই জমি। পথ ঐ

যা ম্যাপে দেখানো, হিসেব ক'রে কাটিয়ে নিতে হবে। তাও—বাড়ি ছাড়া জমি যা আছে, রোড-ফ্রণ্টেজ প'চিশ ফুটের বেশি হবে না। আশপাশে কপি-ক্ষেত মটর-ক্ষেত, গরমের দিনে এমনি পড়ে থাকে। শুনছি কারা যেন দাঁওয়ে ঐ সমস্ত ক্ষেতগুলো কিনে নেওয়ার তালে আছে—সবটা কিনে নিজেরা রাস্তা বার ক'রে ফালি ফালি বিক্রি করবে—তবে সে ধরো সুদূরপরাহত, যাকে বলে বিশবাঁও জল।'

'তা হোক, তুমি ঠিক করো। আমি গিয়ে থাকব।'

'তুমি থাকবে? পাগল নাকি! থাকতে পারবে—একা সেই তেপান্তরের মাঠের মধ্যিখানে?'

'কেন, এই তো রয়েছি! এই বা কি এমন সদরবাজার জায়গা?'

'এখানে থাকা আর সেখানে থাকা! এখানে আমার চাকর-দারোয়ান আছে, মালী আছে, সরকারবাবুরা আছে। সেখানে তোমার ঝিকেই রাখতে পারবে না। এক রাত কাটাতে হলেই খসে পড়বে।'

'তা পড়ুক। একাই থাকব না হয়। আমার অত ভয়-ডর নেই আর। গয়না টাকাকড়ি সেখানে কিছু রাখব না যে, ডাকাত পড়বে, নিজেরও সে বয়েস নেই যে, লুটে নিয়ে যাবে। আমি নিজে ঐ বাড়িতে বাস ক'রে যদি পাশের জমিতে বাড়ি তুলতে পারি, তাহলে ভাড়াটেও আসবে—চাই কি বিক্রীও করতে পারব। এখন কেউ নেই তাই, আমি থাকলে তো আর সে-কথা বলতে পারবে না যে, বিজনপুরী, জনমনিষ্যি নেই কোথাও!'

'কী জানি! আমার তো মনে হয় এটা বড় বেশী ঝুঁকি নিচ্ছ!'

'ঝুঁকি আর কি! না হয় ফেলে চলে যেতে হবে, বাড়ি পড়ে থাকবে। আজ না হয়, পাঁচ-সাত বছর পরে তো খদ্দের পাব। আমারও কিছু এমন অবস্থা নয় যে, ঐ ক'টা টাকার জন্যে ডান হাত বন্ধ থাকবে।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'যে অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে প্রায় এক বছর কাটিয়েছি—সে তুমি ভাবতেও পারবে না। লোকালয় থেকে কত নিচে স্যানাটোরিয়াম, চারিদিকে শ্যাওলা-ধরা বড় বড় গাছ আর কালো কালো পাহাড়। দুপুরবেলায়ই ভাল আলো আসত না। কুয়াশায় ঢেকে থাকত মাসের মধ্যে বিশ দিন। কাছাকাছি কোন জনবসতি নেই, দূরে দূরে গুর্খাদের খুপরি-খুপরি ঘর হয়ত এক-আধখানা, তাও তার বাসিন্দারা তো সুপুরি-পচানো মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে দিনরাত।···নিচে একটা ঝরনা, তার কি গর্জন, ভোরে সন্ধ্যায় সে আওয়াজ কানে গেলে বুকের মধ্যে গুরগুর ক'রে উঠত! তার মধ্যে যখন অত কাল কাটিয়েছি, তখন এ বেশ থাকতে পারব।'

'দ্যাখো—যা ভাল বোঝো।'

পূর্ণবাবু আর কিছু বলেন না।···

নেবুতলার বাড়ি বিক্রী হয়ে যায়, বালিগঞ্জের জমি-বাড়িও কেনা হয়।

এই যেন একটা কাজের রাস্তা পেয়ে যায় হেমন্ত। সে কেশববাবু ছাড়াও দু-একজন

দালাল লাগিয়ে দেয়, ভাঙা পুরনো বাড়ি কোথায় সস্তায় আছে কেনার জন্যে। নিজের যে দু'খানা বাড়ি এখনও আছে, তাতে মিস্ত্রি লাগিয়ে নতুন ক'রে রঙ করায়।

ঐ বাড়িটা—কমলাক্ষর স্মৃতি, তারকের স্মৃতিমাখা ঠিকই, কিন্তু সেই জন্যেই বিক্রী করবে সে, মন স্থির ক'রে ফেলে। যারা চলে গেছে তাদের ব্যবহার-করা জিনিস-আসবাব বুকে ক'রে সারাজীবন দগ্ধানোর কোন মানে হয় না। ভুলে যাওয়াই ভাল।

শুধু বাড়ি নয়—ওখানের খাট-বিছানা আলমারি ঝাড় বাতিদান—সব বেচে দেবে সে। দরকার হয় আবার কিনবে—কিন্তু ওসব জিনিস আর সে দেখতে চায় না। পুরনো চাকর-বাকরকেও সরানো দরকার, বড় বেশী সান্ত্বনা দিতে আসে যখন-তখন।

মধ্যে এই ক'মাসের নিষ্ক্রিয়তায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল হেমন্ত—এবার সে প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল। পূর্ণবাবু ঠিক বুড়ো হয়ে না পড়লেও আজকাল আর আগের মতো অত ঘোরাঘুরি করতে পারেন না, নিজের কাজই কমিয়ে দিয়েছেন আগের থেকে। সুতরাং তাঁকে দিয়ে আর বিশেষ সাহায্য হয় না। যা করতে হয় ওকেই করতে হয়।

প্ল্যান-মেকারকে দিয়ে বালিগঞ্জের জমির প্ল্যান করায়, নিজেই বাতলে দেয় কি করতে হবে। জমি কেনার সময় দেখা গেল পঁচিশ নয়, প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ ফুট 'ওপনিং' আছে রাস্তার ওপর। তা থেকে আট ফুট রাস্তার জন্যে ছেড়ে সামনের জমিতে একখানা মাঝারি ও পেছনের সব জমি জুড়ে বড় একখানা—মোট দু'খানা বাড়ির প্ল্যান করায়। লাগোয়া নয়, বিচ্ছিন্ন। যাতে বিক্রী করার সময় অসুবিধা না হয়। প্ল্যান-মেকার পরামর্শ দিয়েছিল, 'লাগোয়া করলে অনেক জমি বেঁচে যাবে আপনার, তেমন বোঝেন চওড়া দেওয়াল করুন—বিক্রীর সময় অর্ধেক দেওয়ালের স্বত্ব লিখে দেবেন, তাহলে আর ঝগড়া-বিবাদের কোন প্রশ্ন থাকবে না।'

'তাহলেও থাকবে। আপনি এখনও মানুষ চেনেন নি। তাছাড়া, মাঝে একটু ফাঁক থাকলে ঘরগুলো হয়তো ছোট করতে হবে, তেমনি চারদিকে ফাঁকা, বাড়ি হিসেবে বেশী দাম উঠবে। যা বলছি আপনি সেইভাবেই করুন।'

প্ল্যান তৈরী হওয়ার পর শোনা গেল ঘুষ ছাড়া নাকি প্ল্যান পাস হয় না। দু'খানা প্ল্যানে একশো টাকার মতো লাগবে।

হেমন্ত ভুরু কুঁচকে বললে, 'ঘুষ? তাই নাকি? আচ্ছা দেখা যাক!'

তারপর নিজেই একদিন খোঁজ ক'রে মিউনিসিপ্যালিটির আপিসে গেল। বয়স হলেও এখনও হেমন্তর চেহারায় যথেষ্ট জেল্লা, আজকাল পুরোপুরি বিধবার বেশ ধরেছে সে—শুভ্র দামী কাঁচির থানধুতি পরনে, গায়ে সাদা চাদর—গিয়ে দাঁড়াতেই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন গলা বেশ চড়িয়েই সে বললে, 'শুনছি আপনাদের এখানে ঘুষ না দিলে নাকি প্ল্যান পাস হয় না, আমি স্বামীপুত্রহীনা মেয়েছেলে—আমার কাছেও কি ঘুষ খাবেন, না—প্ল্যানটা ছেড়ে দেবেন?···পনেরো দিন দেখব, এর মধ্যে যদি প্ল্যান না পাস হয় তো আমি সব খবরের কাগজের আপিসে আপিসে গিয়ে বলে আসব আপনারা ঘুষ চেয়েছিলেন—দিই নি বলে প্ল্যান পাস হয় নি। আমার নামে মানহানির মামলা এনেও কিছু করতে পারবেন না, আমি আদালতে গিয়ে হলপ ক'রে বললে আমার

কথাই হাকিম বিশ্বাস করবেন।'

সে একটা হৈ-চৈ ব্যাপার আপিসে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকলেই একসঙ্গে কথা কইতে চান। কে একজন—বড় গোছের কেউ হবেন—টেবিল ছেড়ে উঠে এসে একটা চেয়ারে হেমন্তকে বসিয়ে তখনই ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্ল্যান আনিয়ে দেখে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান, পনেরো দিন লাগবে না, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই প্ল্যান পেয়ে যাবেন। প্ল্যান ঠিক আছে—কোন গোলমাল হবে না।'

এর পর আরও যা ক'রে বসল হেমন্ত, পূর্ণবাবু সুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। মিস্ত্রিকে ডেকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে ঘুরে ঘুরে ইট-চুন-সুরকি, কাঠ-কাটরা দর-দস্তুর ক'রে বায়না দিয়ে এল এবং বালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে উঠে এসে নিজেই দাঁড়িয়ে ভিত কাটাতে শুরু ক'রে দিল। নতুন বাড়িতে আসার আগে গৃহ-প্রবেশের কোন পুজো-আশ্রা বা হোম-যাগ করল না। নতুন ভিত কাটার আগেও না। মুসলমান মিস্ত্রি পর্যন্ত ওর এই দুঃসাহসে হকচকিয়ে গেল, বললে, 'সে কি—মাটির বুকে কোদাল চালানো—একটু নবরত্ন না কি দেন যেন আপনারা, ঠাকুরের পুজো—সে-সব কিছু করবেন না?'

হেমন্ত কঠিন হাসির সঙ্গে জবাব দিল, 'ওসব অনেক করেছি মিস্ত্রি, তার ফলও দেখলুম। এবার কিছু না ক'রেই দেখতে চাই।'

পূর্ণবাবু অন্য দিকের কথা বললেন, 'ছোটখাটো মেরামত, সে একরকম, তাও তো আগে আগে আমিই করিয়ে দিয়েছি—কিন্তু এ একটা গোটা বাড়ি করানো—এ কি তুমি পেরে উঠবে? মিস্ত্রি-মজুররা ঠকাবে, মালপত্রের দাম জানো না, ওসব ঘুরে ঘুরে দেখে মাল চিনে কিনতে হয় দর-দস্তুর ক'রে—বেশী দাম নেবে হয়ত, নয়ত মালের পরিমাণে ঠকাবে—ও তুমি পারবে কেন? বরং ভাল দেখে একজন ঠিকেদার রাখো, তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ক'রে নাও। সে একটা লোকের ওপর বরং নজর রাখা সহজ।'

'সেও তো কিছুটা মজুরী নেবে, কত সদুরে নেবে, আর কতটা চুরি করবে—তাও তো জানি না। তাতেও তো ঠকতে হবে খানিকটা, অথচ তাতে কাজটাও শিখতে পারব না। তাই যদি হয়—ঠকে আর ঠেকেই না হয় শিখি এবার। ঠকলে এই একবারই ঠকব। এই বাড়িটা করার সময়ই। এটা করতে করতেই কাজটা শিখে নিতে পারব আশা করছি—পরে যখন করাব তখন আর কারও ওপর ভরসা করতে হবে না।'

পূর্ণবাবু কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে হাল ছেড়ে দেন।

এই সব নিয়ে যদি ভুলে থাকতে পারে তো থাক। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই।

তবে, বাড়ির যখন গাঁথুনির কাজ শেষ ক'রে ছাদ পেটানো ও পলেস্তারার কাজ হতে শুরু হল, তখন খরচের খাতায় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে পূর্ণবাবুকেও স্বীকার করতে হয় যে, খুব বেশী একটা কেউ ঠকাতে পারে নি ওকে।

এই বাড়ি উঠছে দেখে পাশেও এক ভদ্রলোক বাড়ি তুলতে শুরু ক'রে দিলেন। মনে হল এদিক দিয়েও হেমন্তর হিসেব ঠিক, এবার এখানে আস্তে আস্তে বসতি শুরু হয়ে যাবে, ওর ভাড়াটে বা ক্রেতার অভাব হবে না।

॥ ২ ॥

কর্মক্ষেত্রে নামার পর দেখা গেল এই ব্যবসা সম্বন্ধে হেমন্তর একটা অতিরিক্ত অনুভূতি আছে—এখন যাকে ইংরেজীতে ষষ্ঠ অনুভূতি বলে। পূর্ণবাবু তো বটেই, আরও অনেককেই মানতে হয় কথাটা। অনেক পাকা ঘুঘু ব্যবসাদার অনভিজ্ঞ অভিভাবকহীনা বিধবা মেয়েছেলে দেখে সোৎসাহে ঠকাতে এসে ঘা খেয়ে ফিরে গেল হার মেনে। অনেক ঘাগী দালাল হিমসিম খেয়ে গেল ওর দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির কাছে।

নারকেলডাঙ্গার তিন কাঠা জমির ওপর অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি—ওপর-নিচে চারখানা ঘর—যেখানে সাড়ে আট হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে—তা না কিনে আহিরীটোলায় সওয়া কাঠা জমির ওপরে বহু পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি আট হাজার টাকায় কেন কেনে তা পূর্ণবাবু পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। তিনি খবরটা শুনে—হেমন্তকে ক'টা ব্যাপারে বেশ লাভ করতে দেখে লুব্ধ হয়ে নিজেই কিনে নিলেন নারকেলডাঙ্গার বাড়িটা। কিন্তু তারপর—ঐ ন' হাজার (কেনার খরচ সুদ্ধ ধরলে ন'য়ের বেশিই হবে বোধ হয়)-এর ওপর আরও হাজারখানেক টাকা খরচ ক'রে দীর্ঘদিন বসে রইলেন, মোট খরচের দশ হাজার টাকাও কেউ দিতে চাইল না। অথচ হেমন্ত আহিরীটোলার বাড়িতে স্রেফ পলেস্তারা লাগিয়ে সামনেটা সামান্য একটু অদল-বদল ক'রে পাইখানাটা ভেঙে নতুন ক'রে তৈরী করিয়ে অনায়াসে বারো হাজার টাকায় বেচে দিল। অর্থাৎ নীট দেড় হাজার টাকা লাভ। সব খরচ-খরচা মায় ওর ছুটোছুটির ঘোড়ার-গাড়ি-ভাড়া ধরেও।

হেমন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় ছ'-সাত হাজার টাকা লাভ ক'রে ফেলল। একটা ব্যাপারে খালি কিছু লোকসান দিতে হয়েছিল, তাও লোকসান এই হিসেবে যে, খরচে আমদানিতে হেরাহেরি, ওর খাটুনির কোন মজুরী পায় নি। বালিগঞ্জের যে বাড়িটা তৈরী করিয়েছিল—আগেই পেছনের জমিতে বাড়ি করেছে, সামনের বাড়ি উঠে গেলে পেছনের অসুবিধাটা স্পষ্ট চোখে পড়বে সকলের এটা বুঝেছিল ও—খরচ-খরচা বাদে শ'সাতেক টাকা লাভে বেচেছে, এখন সামনের অংশে বাড়ি তুলছে। এবং নিশ্চিন্ত আছে—পেছনের বাড়ি যে কিনেছে সে-ই নিজের গরজে খদ্দের খুঁজে আনবে।

তবে বালিগঞ্জে ওর নিজের থাকার সুবিধে হল না। কাজকর্ম বেশির ভাগই উত্তরের দিকে—অতদূর থেকে আসা-যাওয়ার অসুবিধে হয়, আজকাল অনেক মেয়েছেলে ট্রামগাড়িতে চড়ছে, কিন্তু হেমন্ত পারে না, ওর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া যাতায়াত পোষায় না। তাই বাদুড়বাগানে নিচেতলায় ভাড়াটে সুদ্ধ একটা ছোট বাড়ি কিনে উঠে এল আবার। বালিগঞ্জে যে বাড়িটা আগে কিনেছিল—জমির সঙ্গে—সে-বাড়িটা বেচল, না। একখানা ঘর নিজের জন্যে রেখে ভাড়া দিয়ে দিল। ভাল ভাড়াটেই পেল, ঠাকুরবাড়ির কে এক দৌহিত্র ব্যারিস্টার সবে বিলেত থেকে এসেছে, সে একটু নিরিবিলি হালপছন্দর বাড়ি খুঁজছিল, তার পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটা ও বাড়িটা। এক কথায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়াতে নিয়ে নিল সে। খবরটা শুনে পূর্ণবাবু পর্যন্ত হাত তুলে নমস্কার করলেন,

বললেন, 'তোমারই হাতযশ। ঐ সম্পত্তিটা এক বছরের ওপর পড়ে ছিল, নতুন তৈরী হয়ে ইস্তক, কেউ একবার দেখতেও চায় নি। তুমি বাবা ভেল্‌কি লাগিয়ে দিলে।'

পরিচিত মহলে কথাটা একটু একটু ক'রে রাষ্ট্র হয়ে গেল বৈকি!

হেমন্ত আগেও, খাটা কাড়িতে দু' পয়সা করেছিল, কিন্তু এখন ছেলে মরার পর, একেবারে যেন চারহাতে টাকা রোজগার করছে। ভাগ্যে থাকলে নাকি এমনিই হয়—যে-সর্বনাশে নাকি একেবারে ভেঙে পড়ার কথা, তাতেই কারও কারও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ছেলে মরার ফলে তার আসল যা কাজ যদি ছেড়ে না দিত হেমন্ত, তাহলে এ-কারবার এমনভাবে শুরুও করতে পারত না, এমন বরাতও খুলত না।

পরিচিত মহল এখন এ-শহরে ছোট নয়। এত বছর ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ ক'রে গেছে, বহু ভদ্রলোকের বাড়িই যেতে হয়েছে তাকে। কোথাও কোথাও বার বার যেতে হয়েছে। বড় সম্পন্ন পরিবারে বহু বধূ কন্যা থাকে, সে-সব বাড়িতে বছরে চার-পাঁচবার ডাক পড়াটা খুব সাধারণ ঘটনা, স্বাভাবিক। এইসব বাড়িতে বার বার যাতায়াত করার ফলে অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেছে। এই বাড়ি কেনা-বেচার কারবারেও এই রকম প্রাক্তন মক্কেলদের অনেকের সঙ্গে নতুন ক'রে যোগাযোগ হল—এদের মারফৎও বিস্তর খবর আসতে লাগল—মাল ও ক্রেতা উভয়েরই।

সুতরাং ওর উপার্জন-বৃদ্ধি বা অবস্থা ফিরে যাওয়ার সংবাদ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে—ক্রমশ সেটা অতি দূরের আত্মীয়-সমাজে পর্যন্ত পেঁছিবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আর পয়সার গন্ধ পেয়ে সেই সব আত্মীয়-সমাজ নতুন ক'রে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্যে ব্যস্ত হবে—তাতেই বা বিস্মিত হবার কি আছে!

তবে হেমন্ত এটা ভাবে নি। তার অস্তিত্ব—বিশেষ ক'রে তার ঠিকানা তার তথাকথিত আত্মীয়রা সন্ধান করতে পারবে এ-কথাটা একবারও মনে হয় নি তার।

বিশেষ প্রথম যার আগমন ঘটল তার কথা সুদূর কল্পনাতেও মনে আসে নি কখনো।

দাদা। ওর আপন দাদা।

হেমন্ত চিনতেও পারে নি প্রথমটায়। সারাদিন দু' জায়গায় মিস্ত্রি খাটানোর তদারক করা, সুরকি-গোলায় গিয়ে বাজে সুরকি দেওয়ার জন্যে রাগারাগি করা, খালধারে গিয়ে ছাদে পাতবার টালি দর ক'রে বায়না দিয়ে আসা—এইতেই কেটেছে। একেবারে ভোরে স্নান-আহ্নিক সেরে একটু শরবৎ খেয়ে বেরিয়েছে—সমস্ত দিনে আর কিছুই পেটে পড়ে নি। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে আবার স্নান-আহ্নিক সেরে দুটো ভাত খেয়ে নেবে, রাত ন'টা বেজে গেলে আর খাওয়ার উপায় থাকবে না—সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। বামুনঠাকুরকে কিছুই বলে যায় নি, কখন ফিরবে বা কি খাবে—এই ছুটোছুটি শুরু হবার পর আবার একটি ঠাকুর রেখেছে—সে যদি উনুন না জেলে থাকে এখনও, কিংবা মনতোলা ক'রে লুচি-পরোটা কিছু ভেজে রেখে থাকে, তাহলে আর দুটো ভাত জুটবে না অদৃষ্টে. অথচ প্রাণটা টা-টা করছে সারাদিনের উপোসে, ঘোরাঘুরি ও বকাবকিতে—অন্তরাত্মা একান্তভাবে দুটো ভাতই চাইছে, সেজন্যেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত।

কিন্তু যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত উত্ত্যক্ত হেমন্ত গাড়ি থেকে নামতেই চারুর মা এসে খবর দিলে, কে একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছেন, ওর সঙ্গে দেখা করবেন বলে।

'ভদ্রলোক? কী রকম লোক? কী চান? বাড়ির দালাল, না খদ্দের?'

'না, দিদি। দালালবাবুদের মোটামুটি সবাইকে চিনি, তেনারা কেউ নয়! খদ্দের বলেও মনে হল না—মানে শাঁসালো মানুষ কেউ নয়। কাপড়-জামার হাল ভাল না। বামুনসজ্জন হবে—মাথায় টিকি আছে।'

বিরক্ত হয়েই এসেছিল, বিরক্ত মিস্ত্রি থেকে মহাজন সকলের ওপরই প্রায়, এই উৎপাতে আরও বিরক্ত হয়ে উঠল।

'তা কেন এসেছে, কী চায়—তাও জিজ্ঞেসা ক'রে রাখতে পারিস নি? হয়ত শুনব কার কন্যেদায়, কিম্বা পিতৃদায়—কিম্বা জ্ঞাতিরা ঠকিয়ে নিয়েছে যথাসম্বস্ব, খেতে পাচ্ছে না—সাহায্য চাইতে এসেছে। নানান সত্যি-মিথ্যে এক কাঁড়ি কথা বসে বসে শোনো এখন! তাও এক কথায় কথা শেষও করবে না। উঠবেও না—ন্যাকড়ায় আগুন সব—ঘ্যান ঘ্যান ক'রেই যাবে বসে বসে।'

'শুধিয়েছিলুম দিদি, বললে নি। বললে, "তেনার সঙ্গে আমার দরকার আছে বিশেষ। আমি তেনার আপনার লোক"!'

'আপনার লোক! আমার আপনার লোক আর কেউ নেই। এক যম আছে শুধু।'

গজগজ করতে করতেই বাড়ি ঢুকল।

ওপরে উঠে দেখেও চিনতে পারল না।

খোঁচা খোঁচা একমুখ গোঁফদাড়ি, হয়ত দীর্ঘকাল কামানো হয় নি, কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল, তার মধ্যে একটা টিকি ফাঁস দেওয়া—আধ-ময়লা ধুতি আর একটা আধ-ময়লা জিনের কোট।

বুঝল ওর অনুমানই ঠিক, সাহায্য চাইতে এসেছে কোন অছিলায়। ঝি এমনি ঢুকতে দেবে না বা বসতে দেবে না বলে আপনার লোক সেজেছে।

আরও বিরক্ত হয়ে, ভুরু কুঁচকে বেশ কঠিনকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কাকে চান আপনি? কী দরকার?'

লোকটি মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল। ঘরে চেয়ার আছে তাতে বসে নি, চারুর মার পেতে-দেওয়া আসনে আলতোভাবে বসে আছে।

হঠাৎ হেমন্তর এই রুক্ষ রূঢ় প্রশ্নে চমকে মাথা তুলে, ওর কঠিনতর ভ্রূকুটির দিকে চেয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। একটু হাসির চেষ্টা ক'রে বলল, 'আমি—মানে—হিমি, আমাকে চিনতে পারলি না?'

হিমি!

বহু যুগ বহু শতাব্দী আগেকার নাম এটা, যেন জন্মান্তরের। মনে হল এ-জন্মের অপর পার থেকেই নামটা কেউ উচ্চারণ করল।

এ-নাম হেমন্ত নিজেই ভুলে গেছে। ওর মা ডাকতেন এই নামে শুধু। বাবা পুরো নাম উচ্চারণ ক'রে ডাকতেন হেমন্তবালা বলে। বাকী সবাই বলত মেজখুকী।

এবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখে মনে হল—এই মুখ না হোক, এই হাসির ভঙ্গীটা, চোখের বোকা-বোকা পরনির্ভরশীল বিমূঢ় চাউনির ভাবটাও একেবারে ওর অপরিচিত নয়।

তবে পরিচিত হলেও বহুদিনের পরিচয়, জন্মান্তরেরই।

দাদা! সেই দাদার এই হাল হয়েছে!

একবার, এক মুহূর্তের জন্যে স্বাভাবিক স্নেহজনিত উৎকণ্ঠা বোধ করেছিল, একটু সহানুভূতি—কিন্তু সে এক মুহূর্তের বেশি নয়।

'দাদা' শব্দটাও মুখ থেকে বেরোতে যাচ্ছিল—সহজেই, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললে, 'ও, অদ্বৈতবাবু! তা কি মনে ক'রে—এমন অসময়ে?··· আমি বড্ড ব্যস্ত, দেখতেই পাচ্ছ। সারাদিন স্নানাহার হয় নি—খুব ক্লান্তও।···কোন বিশেষ দরকার আছে?'

আর যা-ই হোক, ওর দাদা এই 'অদ্বৈতবাবু'টার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বোধহয়। অদ্বৈত নাম রেখেছিলেন বাবা, অদ্বৈতচরণ বড় ও চন্দ্রশেখর ছোট ছেলের নাম—কিন্তু সে-নাম কেউই ব্যবহার করত না। মা ডাকতেন বাদল বা বাদু বলে—শ্রাবণ মাসে হয়েছিল, ঘোর বর্ষায়—সেই নামটাই বেশী পরিচিত।

ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—এই একটি নাম উচ্চারণের আঘাতে, কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না, এমনিই—অনেকদিন কোন খোঁজ-খবর পাই নি—তাই। এই অঞ্চলে আছিস শুনেছিলুম—অনেক কাণ্ড ক'রে আমাদের এক শিষ্যর কাছ থেকে ঠিকানাটা আজই যোগাড় করেছি—'

বাধা দিয়ে হেমন্ত বলল, 'কেন, এতদিন পরে এত কাণ্ড করার কি দরকার হয়ে পড়ল —হঠাৎ?'

'না—মানে খবর তো পাই নি—'

'খবর রাখার কি চেষ্টা করেছিলে খুব? যেদিন তোমার বাবা আমাকে বাড়ি থেকে ঐভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিন এত টান এত উৎকণ্ঠা কোথায় ছিল? সেদিন তো একটা কথাও বলো নি! এত কি ভয়ের ছিল বাবাকে? তার তো—একটু নড়ে বসলেও যদি এক পয়সা রোজগার হয়—সেটুকু নড়ে বসারও সামর্থ্য নেই। তোমার ওপরই তাঁর নির্ভর। ···আর সে তো বহুকালের কথা হল—এতদিনই বা খবর নেবার দরকার বোঝ নি কেন?'

'না, মানে পাই নি বলেই—' গলদঘর্ম হয়ে ওঠে বাদল, 'চেষ্টা করেছি বৈকি!'

'মিথ্যে কথা! এত কাণ্ড করলে ঠিকই পেতে। আজ যাদের কাছ থেকে পেয়েছ, তাদের কাছেই পেতে। তা তো নয়—খবর পেয়েছ বলেই খবর নাও নি। দাইয়ের কাজ করে একটা মেয়েছেলে—তার খবর নিলে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করলে লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না—তাই।'

'তা—মানে শিষ্য-সেবক নিয়েই তো আমাদের চালানো—'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে এখন এত খবর নেওয়ার চাড় কেন হল অদ্বৈতবাবু, রাতারাতি কি শিষ্য-সেবকরা সব খ্রীষ্টান হয়ে গেল—না তোমাদেরই আর তাদের ওপর নির্ভর করার দরকার রইল না?'

চুপ ক'রে থাকে ওর দাদা, মাথা হেঁট ক'রেই বসে থাকে।

'তা নয়।' হেমন্তর গলা বিলিতী ক্ষুরের মতো শাণিত হয়ে ওঠে, 'এখন শুনেছ অনেক টাকা হয়েছে, সে-কাজও ছেড়ে দিয়েছি, তাই এসেছ। যেদিন বাড়ি থেকে অসহায় বোনটাকে একটা শিশুসুদ্ধ সবাই মিলে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেদিন ভাবো নি যে, এমন দিনও তার আসতে পারে—না? তবে শুনে যাও, সেদিন শেষ অবধি এক বেশ্যার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল—তারই দয়ায় প্রাণ বাঁচানো শুধু নয়—পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, নিজে স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পেরেছি। এর পরও ইচ্ছে হচ্ছে এখানে বসতে? দ্যাখো—গিয়ে আবার প্রাচিত্তির করতে হবে না তো? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো—কথাটা জানার পর আর এখানে বসে থেকো না। পাপ হবে।'

উঠেই দাঁড়ায় অদ্বৈত, তার কপালে তখন রীতিমতো ঘাম দেখা দিয়েছে, এককালে সুগৌর-কান্তি ছিল, তা আর নেই—তবু হেমন্ত লক্ষ্য করল ওর মুখ আগুনবর্ণ ধারণ করেছে।

কিন্তু বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও, একটু থমকে দাঁড়িয়ে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ওঠে, 'শিবুটা মানুষ হল না, নেশাখোর হয়ে গেছে, বাড়িতেও থাকে না সব সময়—বোধহয় চরিত্রেরও ঠিক নেই, বাবা কিছু বলতে গেলে অকথ্য অপমান করে, আমার একার ওপরই সব।···বাবা শয্যাগত, এখন-তখন অবস্থা, শোথ রোগ হয়েছে—টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না—'

'ওসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন? আমার জন্মদাতা এক ব্যক্তি ছিল, ঘোর স্বার্থপর, লোভী ও অকর্মণ্য—তার অত্যাচারে আমার মার অকালমৃত্যু হয়েছিল—আমার কাছে সে লোক বহুকাল মৃত। তোমার বাবা আমার কেউ নয়। সুতরাং, ওসব নাকে-কান্নায় আমার মন গলবে না। যতদূর শুনছি, তোমাদের মধ্যে শিবুরই কিছু মনুষ্যত্ব গড়ে উঠেছে। মানে মানুষই সৎ হয়—মানুষই বদ হয়। তোমাদের মতো বেনে-পুতুলরা কিছুই হতে পারে না।···যাক, তেতেপুড়ে এসেছি, আমাকে আর বকিও না। আর এখনও কষ্ট ক'রে খবর রাখারও চেষ্টা ক'রো না। তোমাদের যে মেজ বোন একজন ছিল, তাকে তোমরাই মেরে ফেলেছ একদিন—এইটে জেনে নিশ্চিন্ত হও। তোমার বাবা তোমার সে মেজ বোনের বিয়ে দেওয়ার আগে একটু উয্যুগ ক'রে খবরও নিতে পারে নি যে, কার হাতে কোথায় দিচ্ছে, বিয়ের পর সে কি অবস্থায় আছে তাও খবর নেওয়া দরকার মনে করে নি। তুমি নিজে দেখে এসেছিলে তার দুর্গতি—তোমার মুখে শুনেও মেয়েকে সেখান থেকে নিয়ে আসার কথা মনে হয় নি তার—শুধু যখন ছোট জাতের মেয়ে একটা ঝিয়ের দয়ায় মৃত্যুর হাত থেকে যমদূতদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে একটা মহাপ্রাণ ছেলের সাহায্যে কোনমতে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছিল—তখন বামনাই দেখিয়ে বংশ দেখিয়ে সোজা দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল, জেনে-শুনে তাকে হয় আত্মহত্যার দিকে, নয়তো খানকিগিরির দিকে ঠেলে দিতে পেরেছিল!···সেই অমানুষ জানোয়ারটার কথা শোনাতে এসেছ আমাকে! তার অসুখ!···টান মেরে রাস্তায় ফেলে দাও নি কেন, জ্যান্তে শ্যাল-কুকুরে টানাটানি ক'রে ছিঁড়ে খেলে তবে তার মহাপাপের প্রাচিত্তির হ'ত।'

তারপর একেবারে দাদার দিকে পেছন ফিরে বললে, 'শুনলে তো আমার মত, এখন সরে পড়ো।'

বলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। ঠাকুর ও ঝিয়ের সকৌতূহল বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অপমানিত বড় ভাই কীভাবে চোখের জল চাপার চেষ্টা করতে করতে মাথা নিচু ক'রে নেমে গেল, তাও ফিরে দেখল না আর।

চারুর মা পুরনো লোক, অনেক দেখেছে—সে অতটা ভয় করে না। সে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, এ তোমার আপন দাদা? মায়ের পেটের ভাই? তাকে এমন নভুতো নছুতো করলে! এতটা বাপু তোমার উচিত হয়নি।'

বলতে বলতেই তার নজরে পড়ল হেমন্তরও দুই চোখে টলটল করছে জল। বহুকাল পরে ওর চোখে আবার জল দেখল চারুর মা। তার শিক্ষা-দীক্ষা কম, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝল, আঘাতটা আহতের থেকে আঘাতকারীকে কম বাজে নি, সে চুপ ক'রে গেল।

কিন্তু হেমন্ত উত্তর দিল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'আমার বাপ-ভাই কেউ কোথাও নেই। সব মরে হেজে গেছে, সপুরী এক গাড়ে গেছে। ওদের মুখ দেখলেও মহাপাপ হয়। ওরাই আমাকে আজ এই পথে ঠেলে দিয়েছে।...উচিত, ঐ লোকটা যেখানে বসেছিল সেখানে গোবর-জল-ছড়া দেওয়া। আমার একটিই আপন লোক ছিল, তোদের ও-বাড়ির দিদি, সেও মরে গেছে, তার সঙ্গেই ইহজগতের আপনার লোক চলে গেছে সবাই। ঐ যে এসেছিল তার চেয়ে তোরা আমার ঢের বেশী আপন।'

বলতে বলতেই আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল—যেন হাঁপাচ্ছে তখন সে—এবং এতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াতেই দুই চোখের বাঁধ ভেঙে আকুল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

॥ ৩ ॥

আত্মীয়-সমাগমের এই শুরু, শেষ নয়।

বাদল এসে চলে যাওয়ার দিন কয়েক পরেই একদিন দুপুরবেলা একটি বৃদ্ধ লোক এসে উপস্থিত। মাথার সব চুল সাদা, ঘোর-কৃষ্ণ বর্ণ। অতি মলিন একটি জীনের কোট পরনে, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

কিছু আগেই লোকটি পাড়ায় এসেছে, এবং খোঁজ-খবর করছে, হেমন্তর রাঁধুনী এসে বলে ছিল। তখন সে বসে বসে মিস্ত্রির হিসেবে 'ঠিক' দিচ্ছিল, অতটা কান করে নি। গত কয়েক দিনে বিস্তর হিসেব জমে গেছে, মিলিয়ে দেখা হয় নি, বিশেষ ছুতোর-মিস্ত্রির হিসেবটা কালই চুকিয়ে দিতে হবে, হপ্তায় হপ্তায় হিসেব ক'রে পাই-পয়সা চুকিয়ে দেয় বলে অনেক সস্তায় হয়, কিছু টাকা কেটে নিলেও ওরা বেশী আপত্তি করে না। সেই দিকেই মনটা ছিল, এখন ঠাকুর এসে খবর দিতে চমকে উঠল, 'মা, সেই যে বুড়োটা পাড়ায় আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল বললুম— ? সে এসে হাজির হয়েছে। দেখা করতে চায়।'

'বুড়ো? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়...? পাড়ায় খবর নিচ্ছিল—কে বললে?'

'খানিক আগে দোকানে গিয়েছিলুম না—তখনই শুনে এসেছি, ঐ গুপ্তদের বাড়িতে

আপনার নাম ক'রে কি সব জিজ্ঞেস করছে, কোন্ বাড়ি, কতদিন এখানে এসেছেন, কে কে থাকে বাড়িতে, কি করেন—এই সব।...আপনাকে যে তখন বললুম এসে?'

'অত কান করি নি তাহলে। কিন্তু, কি দরকার কিছু বলেছে?'

'না তা কিছু বলছে না। আমি তো বললুম তাই। তা শুধু বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে। বলে, ওকে দেখলেই নাকি আপনি চিনতে পারবেন।'

'না, তা হবে না।' বিরক্ত হয়ে ওঠে হেমন্ত, 'বলো গে, কোথা থেকে এসেছে, কি নাম, কি দরকার—তা না হলে মা দেখা করবে না—'

কিন্তু এত কথা বলবার আর অবসর মিলল না।

তার আগেই আগন্তুকটি ভেজানো দরজার সুযোগ নিয়ে সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। সামান্য একটা অনুমতি নেওয়ার জন্যে অযথা বিলম্ব করতে সে রাজী নয়। সিঁড়ির মুখ থেকে একটু এগিয়ে এসে গলা-খ্যাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, 'এই আমি এইছি গো বৌমা। আসা তো হয় না কলকেতায়—এইটুন্ তো পথ, হেঁটেই মেরে দিই—তা ধরো নানা ঝঞ্ঝাট তো—ঐ কেত্তনউলীরা গায় না—"কব কি বিশেষ, আঙিনা বিদেশ"—তা আমাদেরও ধরো তাই—তাই এসেই যখন পড়লুম, বলি—দেখা ক'রেই যাই একবার। ত্যাখন একটা ভুল বোঝাবুঝিতেই—মিছিমিছি তুমি বৌমা ভয় পেয়ে চলে এলে—আমার মা-টাও ছিল তেমনি পাগল—তাই বলে সত্যি-সত্যিই তো আর আমরা থাকতে—তোমার দিদিরা থাকতে—'

আর বলতে হল না।

না বললেও চিনত। বুকের দিক চাপা, পেটের দিক চওড়া—এ গঠন ওর অতি পরিচিত। শ্বশুর-বংশের সকলেরই এই ধারা। কেবল তারকই ছোটবেলা থেকে কলকাতায় ছিল বলে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে পিলে লিভার বাড়ে নি বলেই, রোগা হলেও এমন বিসদৃশ গঠন হয়ে ওঠে নি।

এ বিষ্ণুচরণ, ওর ভাসুর।

বুড়ো হয়েছে, কিন্তু মুখের ভাবে ও ভাষায় সেই বজ্জাতি ষোলআনাই বজায় আছে। চোখের দৃষ্টিতে সেই লুব্ধ ধূর্ততা।

নিমেষে জ্বলে উঠল হেমন্ত। এত ক্রোধ ইদানীং কালের মধ্যে আর কখনও বোধ করে নি ও। দাদা আসতে উত্তেজিত হয়েছিল, বহু দিনের চাপা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, কিন্তু ক্রোধের সঙ্গে এমন অপরিসীম ঘৃণা বোধ করে নি। অথবা, এই ইতর খুনেটাকে দেখে ওর যা মনোভাব হল—তা ক্রোধ বা ঘৃণা—কোন শব্দ দিয়েই বোঝানো যায় না।

সে বিষ্ণুচরণের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে বললে, 'ঠাকুর, ঐ বজ্জাত লোকটাকে ঘাড় ধাকা দিয়ে বার ক'রে দাও এখুনি। সহজে যেতে না চায়—মোড়ের মাথা থেকে কনেস্টেবল ডেকে নিয়ে এসো—বলো গে একটা লোক চুরি করতে এসেছিল তাকে ধরেছি।...আর তুমি খবরদার অমন দরজা খুলে রেখে আমাকে খবর দিতে আসবে না, যত রাজ্যের চোর-জোচ্চোর খুনে-বদমাইশ লোক ঐ ফাঁকই খোঁজে, ঢুকে পড়ে। ফের এ রকম গাফিলি দেখলে তোমার মাইনে কাটব—বলে রাখছি!'

বিষ্ণুচরণ বোধ হয় এই রকম অভ্যর্থনাই আশা ক'রে এসেছিল।

তাই সে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগের মতো অমায়িক কণ্ঠেই বলে উঠল, 'না না, বৌমা—ছি ছি, এসব কি ছেলেমানুষী করছ! অত কিছু করতে হবে না, বললেই যথেষ্ট অপমান করা হল, তার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।...দেখছি ভুলটা তোমার ভাঙে নি পুরোপুরি।...আমি এমনিই খবর নিতে এইছিলুম, কিছুর পিত্যেশী হয়ে আসি নি। বরং—চাও তো এখনও তোমার শ্বশুরের বিষয়ের হিস্যে বুঝিয়ে দিতে পারি। ...অবিশ্যি অর্শায় না আর—আমাদের ছেলে যখন চলে গেছে তখনই তো—তবে ওসব আইনের চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস হল বংশের মর্যোদা!...ব্যস্ত হয়ো না—আমি যেমন এইছিলুম তেমনিই চলে যাচ্ছি, তবে—। ভুল একদিন বুঝতে পারবে—তাও বলে যাচ্ছি—'

ধীরে সুস্থে মুখে একটি অমায়িক হাসির ভাব ফুটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বিষ্ণুচরণ।

বিষ্ণুচরণের আবির্ভাবের পর দরজা খোলা আর বন্ধ রাখার বিষয়ে একটু সতর্ক হতে বাধ্য হল হেমন্ত।

দারোয়ান আর ছিল না, রান্নার লোকও মধ্যে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, নিজেই রান্না করত। এখন বাইরের কাজ বাড়ায়—প্রকৃতপক্ষে একটা ছোটখাটো কনট্রাক্টরের কাজই করতে হচ্ছিল তাকে, বালিগঞ্জের নতুন বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেলেও কোথাও-না-কোথাও মিস্ত্রি খাটানো লেগেই থাকে প্রায়, বাড়ি ফিরেও হিসেব নিয়ে বসতে হয় আবার—রান্না-খাওয়ার সময় থাকে না। সে জন্যেও বটে আর বাইরের বাজার-হাট, পোস্ট-আপিসে যাওয়া এসবের জন্যে পুরুষ একটা দরকার বলেও বটে—সে আবার ঠাকুর রেখেছে। ঠাকুরকেই বলে দিল সে, ভেতরে কেউ এসে গেলে কিংবা বাইরে চলে গেলেই যাতে দরজা বন্ধ হয় সেদিকে কড়া নজর রাখবে; নিজে কোথাও যাবার সময় চারুর মাকে দরজা দিতে বলে যাবে; চেনা লোক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না—কেউ এলে ভেতরে খবর দিতে আসবে যখন, দরজা বন্ধ ক'রে আসবে। তাতে কোন ভদ্রলোক রাগ করেন সে দায়িত্ব হেমন্তর। নাম, কোথা থেকে কি কাজে এসেছেন—ভাল ক'রে জেনে এসে অনুমতি নিয়ে তবে ওপরে আসতে দেবে। ভাড়াটেরা তাদের বাইরের ঘর দিয়ে যাতায়াত করে, সুতরাং এ ব্যবস্থায় তাদের কোন অসুবিধা ঘটবে না।

এই বাড়তি ঝঞ্ঝাটের জন্যে সে এক টাকা ক'রে মাইনে বাড়িয়ে দিল ঠাকুরের।...

তবে তাতেও অব্যাহতি পাওয়া গেল না।

আজকাল বাড়ি দেখতে যাওয়া একটা কাজ হয়েছে, প্রায়ই বেরুতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ হয় না—মানে বাড়ির অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে দামের সামঞ্জস্য হয় না, তবু দেখতেও যেতে হয়। কোন্‌টা পছন্দসই হবে, না দেখে স্থির করা সম্ভব নয়।

একদিন এমনিই একটা বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল দালাল। কাছাকাছি বলে হেঁটেই গিয়েছিল, হেঁটেই ফিরছে—বাড়ির সামনে আসতে একটি ছোকরা এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল।

ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, বিরাট য়্যালবার্ট-টেরিকাটা লক্‌কা লক্‌কা চেহারা, দূর থেকেই দেখেছে হেমন্ত—আলোর খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বার্ডসাই টানছে। ওকে দেখেই সেটা যে ফেলে দিয়েছে তাও লক্ষ্য করেছে—অতর্কিতে ফেলতে হয়েছে বলে চিহ্নটা গোপন করতে পারে নি, এখনও নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কাছে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে সস্তা চুরুটের কড়া গন্ধে মাথা ধরে উঠল।

বিরক্তিই বোধ করার কথা, করলও একটু। এখন উপদ্রব বেশী দিন চললে এ পাড়াও ছেড়ে দিতে হবে—বালিগঞ্জের নতুন বাড়ি এখনও বিক্রী হয় নি, সেখানে গিয়েই উঠতে হবে, পুরনো বাড়িতেও একখানা ঘর আছে—যাতায়াতের খরচ বেশী পড়বে—কিন্তু তার আর উপায় কি?

কয়েক লহমার মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল মাথায়। তবু কে জানে কেন, এই ছোকরার মুখের দিকে চেয়ে কেমন মনে হল—এর মুখটা একেবারে অপরিচিত নয়। কোন একটা পরিচিত প্রিয় মুখের সঙ্গে কোথায় একটা আদল আছে। চড়ানো গাল, কোটরগত চক্ষু—ঈষৎ রক্তাভ—একমাত্র চুলে আধুনিক উৎকট টেরি— সবটাই বখা ছেলের লক্ষণ—রোগা, তার ওপর এই বয়সেই একটু কোলকুঁজো হয়ে পড়েছে—মুখে নানাবিধ অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট, তবু কে জানে কেন, হয়ত চাহনিটা সরল বলেই—মনটা আপনিই কোমল হয়ে এল একটু।

কিন্তু কোমল হলে চলবে না। মনকে শাসন ক'রে কণ্ঠস্বর রুক্ষ করায়।

'কি চাই?'

ছেলেটি বার-দুই মাথা চুলকে বলে ফেলে, 'আমি—মানে আমি শিবু, দিদি!'

শিবু! চন্দ্রশেখর!

ও, তাই কোথায় যেন মুখটা দেখেছে বলে মনে হচ্ছে। মনে পড়া সম্ভব নয়, মার সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য আছে বলেই এই ভাবটা মনে এসেছে।

মনে পড়ল দাদার কথা, 'একেবারেই বিগড়ে গেছে শিবু। নেশাভাঙ করে, বাড়ি আসে না—হয়ত চরিত্রও খারাপ, বাবা কিছু বললে তেড়ে মারতে আসে—।' চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছে কথাগুলো।

মুখে যতদূর সম্ভব বিরক্তি টেনে এনে বলল, 'অ! তা এখানে কি মনে ক'রে? কি চাই?'

এবার হেসে ফেলে শিবু, বলে, 'কি চাই বললেই দেবে? আমি যা চাই তা তো বুঝতেই পারছ। টাকা চাই। কোথাও কিছু জোটে নি, ট্যাঁক গড়ের মাঠ একেবারে। তাই অনেক খুঁজে এইছি। ক'দিন আগেই বাড়িতে পরামর্শ হচ্ছিল কিনা—আমাকে ওরা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না তো—আমি কিন্তু কান খাড়া ক'রে সব শুনে নিইছি—তোমার অনেক টাকা, তোমাকে গিয়ে ধরলে যদি কিছু দাও, কি সব ক'বছরের টেক্‌স খাজনা দেওয়া হয় নি, শীতের কাপড়-জামা নেই—তাই তোমার কাছে আসা। জানি না কি হয়েছে, দাদা তো চোখ-মুখ লাল ক'রে ফিরল, বুঝলুম তোমাকে গলাতে পারে নি। সেই দেখে আমারও ভরসা হয় নি আর এদিকে ঘেঁষতে। নিহাৎ আজ কোথাও থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই বলেই—এক বন্ধু ছিল আমার মতোই

হতভাগা, সে আবার কোথায় চলে গেছে, নিরুদ্দেশ। বন্ধুটা বেশ যোগাড়ে ছিল, যখন এই রকম অবস্থা হত ঠিক কাউকে তাপ্পি দিয়ে টাকাটা সিকিটা বার ক'রে আনত। সে গিয়েই আরও—তাই মরীয়া হয়েই এসে পড়লুম তোমার কাছে। বলি আমি তো আর ওদের মতো মানুষ নই—আমার অত মান-অপমানও নেই, তাড়িয়ে দাও চলে যাব— ।'

'তা মানুষ হোস নি কেন ?' আপনিই বেরিয়ে আসে প্রশ্নটা, নিজের অজ্ঞাতসারে। মনটা অকারণেই কোমল হয়ে আসে।

দেখা গেল মানুষ হোক না হোক, বোকা নয় শিবু। এই কোমলতাটা তার বুঝতে দেরি হয় না। সে উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তা বাড়ি ঢুকব না ? ভয় নেই, বেশীক্ষণ থাকব না। কিছু যদি খেতে দাও খাব. ঐ সঙ্গে কিছু দক্ষিণে পাই আরও ভাল, তার পরই চলে যাব।'

ওর রকম-সকম দেখে হাসি পায় হেমন্তর। বলে, 'তা চলো। তবে সত্যিই বেশীক্ষণ বসা চলবে না। তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা আমার ঘুচে গেছে অনেক দিন। আমার বাপ-ভাই মরে গেছে বলেই আমি জানি।'

'সে বাবা আর দাদা। আমাকে মেরো না দিদি এরই মধ্যে—দোহাই! আমি তো তোমার কাছে এই সবে জন্মালুম। আমাকে তো হিসেবের মধ্যেই ধরা ছিল না। আমি যে আছি তাই তো জানতে না। তাহলে সে-অতদিন আগে মরব কেমন ক'রে ?'

ভেতরে এসে চারুর মার পেতে দেওয়া আসনখানা টেনে একটা দেওয়ালের দিকে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে জুৎ ক'রে।

উনুন ধরানোই ছিল, হেমন্তর নির্দেশে ঠাকুর ক'খানা লুচি ভেজে লুচি আর রসগোল্লা সন্দেশ সাজিয়ে দেয় জল খেতে। গণ্ডূষ ইত্যাদির বালাই তো নেই-ই, হাতও ধোয় না শিবু। রেকাবীটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দেয়। বলে, 'বাঁচালে ভাই, কি বলে যে আশীর্বাদ করব! যে নেশা করি তাতে একটু দুধ-মিষ্টির জন্যে প্রাণটা আইঢাই করে—কে দিচ্ছে বলো! অনেক দিন এমন জুতের ভোজ জোটে নি অদৃষ্টে!'

'তা কেন, নেশাভাঙ করোই বা কেন? বামুনের ছেলে, গুরু বংশের ছেলে—লেখাপড়া শিখতে পারো নি ?'

'হয়ে ওঠে নি। ঐ গুরু বংশের ছেলে হওয়াটাই কাল হয়েছে। ভণ্ডামি দেখে দেখে সমস্ত ব্যাপারটার ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছল। বিশেষ ঐ বাবাটাকে সহ্য করতে পারি না একেবারে। এমন স্বার্থপর লোক যদি দুটি দেখেছ সংসারে!…তাই মাথায় ঢুকে গেছল বাবা যা বলবে তার উলটোটা করব। সেই জন্যেই লেখাপড়া শেখা হল না—বদ সঙ্গে পড়ে নেশাভাঙ ক'রে উচ্ছন্নয় গেলুম। তবু রক্ষে যে, মদটা ধরি নি। একেবারে খাই নি যে তা নয়, দু-একদিন চেখে দেখেছি, কিন্তু ওতে দেদার পয়সা লাগে। তাছাড়া—হুঁশজ্ঞান থাকে না, নর্দমায় গড়াগড়ি যায় নেশার ধমকে—দেখে দেখে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছল গোড়া থেকেই, তাই বেঁচে গিইছি!'

অকস্মাৎ একটা অকারণ মমতায় যেন চোখে জল এসে যায় হেমন্তর।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'তা এখনও তো ফেরা যায়, সময় তো যায় নি। কতই বা বয়েস তোর ?'

কিছুক্ষণ বসে লুচি চিবোতে থাকে শিবু, যেন কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করে বসে বসে। তারপর বলে, 'নাঃ, ও আর হবে না। মিথ্যে স্তোক দিয়ে লাভ নেই তোমাকে। অনেক দিনের অব্যেস হয়ে গেল—এ কি ছাড়তে পারব? তাছাড়া বকাটে বাউণ্ডুলে স্বভাব হয়ে গেছে, আর শোধরানো যাবে না। বদ সংসর্গের বড় কড়া টান, কেউ এসে ডাক দিলেই চড়ুকে পিঠ সুড়সুড় ক'রে উঠবে—থাকতে পারব না, দলে ভিড়ে যাব আবার।'

'কিন্তু এইভাবেই কি চলবে? বিয়ে-থা সংসার-ধর্ম করতে হবে না?···রোজগার-পাতি? কে তোকে বারো মাস নেশার পয়সা যোগাবে?'

'কে আর যোগাবে! না যোগানোই তো ভাল। পয়সা না জুটলে ও কম্ম আর হবেও না।···আর সংসার-ধম্ম? সে তো মানুষে করে দিদি! আমি কি একটা মানুষ? এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন কোথাও পড়ে মরে থাকব—চুকে যাবে ন্যাটা, পুলিশে ডোম ডেকে মুর্দো সাফ করাবে।'

খাওয়া শেষ ক'রে কি ভাগ্যি উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে আসে কল থেকে।

হেমন্তও আর কথা বাড়ায় না। একবার মনে হয় কাছে রেখে দেয়, সংশোধনের চেষ্টা করে। তার পরই বোঝে বৃথা চেষ্টা। বদভ্যাস এতদূর মূল বিস্তার করেছে—তার উচ্ছেদ আর সম্ভব হবে না। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে চারটে টাকা বার ক'রে এনে ওর হাতে দেয়।

টাকায় পরিমাণটা দেখে দুই চোখ যেন চকচক ক'রে ওঠে শিবুর।

বলে, 'এত দিলে! অনেক দিন এত টাকা একসঙ্গে চোখেই দেখি নি। ভালই হল, ছোট ভাইপোটা বড্ড কাকা-কাকা করে—ঐ একজনই যা টানে ও বাড়ির মধ্যে—কখনও এক পয়সার একটা পুতুল নিয়ে যেতে পারি না—দেখি যদি সব উড়িয়ে না দিই পথের মধ্যেই—কিছু একটা নিয়ে যাব ওর জন্যে!'

হেমন্ত নিজের ভুলটা বোঝে। প্রথমেই এত টাকা দেওয়া উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব সংশোধনের চেষ্টায় বলে, 'কিন্তু ঘন ঘন এলে পাবে না, তা আগেই বলে দিচ্ছি। আমার যে-কথা সেই কাজ।···তোমার দাদাকে যেমন তাড়িয়েছি তেমনিভাবে তোমাকেও তাড়াব তাহলে ঐ বাইরে থেকেই—দূর দূর ক'রে। আমার কেউ নেই এ পৃথিবীতে আপনার লোক, কারও ওপর আমার এক কড়ারও টান নেই।'

শিবু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'আমাকেও তেমন বোকা পাও নি যে, তোমার মতো শাঁসালো মক্কেলকে জ্বালাতন ক'রে মুলো-তোলা করব!···এক বছর। দেখে নিও, এক বছরের মধ্যে যদি তোমার চৌকাট মাড়াই তো কি বলেছি?'

সে তর তর ক'রে—দুটো ধাপ একসঙ্গে ডিঙোতে ডিঙোতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

শিবু তার কথা রাখতে পারে নি কিন্তু—শেষ পর্যন্ত।

এই দেখা হওয়ার ছ'মাসের মাথাতেই আর একদিন এসে হাজির হয়েছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন, হেমন্ত তার পুজোর পর্ব শেষ ক'রে উঠে—সবে-দিয়ে-যাওয়া সাপ্তাহিক খবরের কাগজখানা খুলে বসেছে—ঝি এসে খবর দিলে, 'তোমার সেই ছোট ভাই এয়েছে গো দিদিবাবু, বলে, দিদিকে গিয়ে বলো আমার কথার খেলাপ করি না আমি, টাকা চাইতে আসি নি, অন্য খুব জরুরী কাজে এইছি।...ও দিদি, তেনার দুই চোখ যেন করমচার মতো লাল—'

'গুচ্ছের কি সব নেশা করেছে আর কি! গাঁজাফাঁজা খায়, যা বুঝলুম কথার ভাবে। তাতেই বেভ্ভুল হয়ে চলে এসেছে ঝোঁকের মাথায় হয়ত—' হেমন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলে।

'না গো দিদি—নেশা নয়।' চারুর মা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'নেশা হলে বুঝতে পারতুম, এ অন্য জিনিস। মনে হচ্ছে খুব কাঁদাকাটা করেছে।'

ভ্রূকুটি ঘনতর হয় হেমন্তর। বলে, 'নিয়ে আয় ওপরে, আসনটা পেতে দে।'

ওপরে এসে কিন্তু বসে না শিবু, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি কিন্তু নিজে থেকে আসি নি দিদি, আমাকে যেন দোষ দিও না—সবাই মিলে হাতে-পায়ে ধরে পাঠিয়েছে—'

গলার আওয়াজেই হেমন্ত বুঝতে পারে যে, চারুর মার অনুমানই ঠিক, কণ্ঠস্বর অশ্রুতে বা তার আভাসেই এত গাঢ়। তাছাড়াও, কথা বলছে যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, 'তা এত হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'এতটা পথ হেঁটে—প্রায় দৌড়েই বলতে পারো—এইছি যে! নিহাৎ আসার আগে জগা তেলেভাজাওলার দোকান থেকে কষে একটান গাঁজা টেনে এসেছিলুম তাই—নইলে কি সোজা পথ এটা, আড়াই কোশ বেওজর!'

তারপর মিনিটখানেক যেন দম নিয়ে বলে, 'বুড়োর বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত। তোমাকে একবার দেখতে চায়! বলে তো মাপ চাইবে নাকি—অন্যাই যে করেছে তা বেশ বুঝেছে—সেইটেই বলে যাবে।...তা তবু আমি সহজে আসতে চাই নি—বুড়ো যখন আমারও হাত ধরে বললে, আমাকে মাপ করিস শিবু। আমি বাপ হয়ে কখনও বাপের কাজ করি নি—আমি ঘোর পাপী, তখন যেন কেমন হয়ে গেল, কান্না পেয়ে গেল গুচ্ছের, তাই আর থাকতে পারলুম না। গাড়িভাড়ার পয়সাও তো নেই, ইদিকেও সময় নেই—হেঁটে আসা ছাড়া উপায় কি বলো, বেশ জোরেই হাঁটতে হয়েছে। তা ঐ বুড়োর কথাতেই আসা। যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে!'

হেমন্ত বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। অনেক দিনের অনেক বিস্মৃত আবেগ, অনেক অভিমান, অনেক রোষ—একসঙ্গে যেন ভীড় ক'রে আসে মনের মধ্যে। সেটা সামলে নিয়ে গলা পরিষ্কার ক'রে দৃঢ়স্বরে বলে, 'না ভাই, আমার যাওয়ার কোন কারণ নেই। যার কথা বলছ, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার বাপ-ভাই মরে গেছে বহুদিন। তারা যদি বেঁচে থাকত তাহলে বোধহয় আজ এমন ক'রে—আমার বলতে একমাত্র যে ছিল পৃথিবীতে—সেই ছেলেকে হারিয়ে পথের ভিখিরীর অধম হতে হত না। তোমার বাবা—তোমার দুঃখ তো হতেই পারে—কিন্তু আমার কেউ নয় ও, কোন কালেই ছিল না। যে ছিল সেও আমার মাকে খুন করেছে, আমাদের ভাসিয়ে

দিয়েছে—নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু ভাবে নি কোনদিন—এই পরিচয়েই তাকে জানতুম !...সে যাক গে, তুই বোস, কিছু খেয়ে যা—'

'না, থাকগে। দেরি হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না।' একরকম ধমক দিয়ে ওঠে হেমন্ত, 'ঘরে মিষ্টি আনা আছে, দুটো গালে ফেলে যা।'

মিষ্টির সঙ্গে একবাটি দুধও এনে, জোর ক'রে খাইয়ে দিলে একরকম।

শিবু বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কোন-মতে খেয়ে নিলে ! খাওয়া শেষ হতে হেমন্ত ওর হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, 'যাবার সময় আর হেঁটে যেও না, তাড়াতাড়ি যাওয়াও তো দরকার। এই মোড়েই গাড়ি পাবে—একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে চলে যাও। দেড় টাকার বেশি নেবার কথা নয়—বেশী নেয় বেশীই দিও। হেঁটে যেও না কিন্তু !'

শিবু কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। টাকাটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হয়েই চেয়ে থাকে—বলে, 'কে জানে তোকে যেন ঠিক বুঝতে পারি নে দিদি। ওরা যদি কেউই নয় —তাহলে আমার ওপরে এত টান কেন ? সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে ঝোঁকের মাথায় এতটা দৌড়ে এসে, বুকের মধ্যেটায় টান লাগছে কেমন—'

করুণ হাসে হেমন্ত। বলে, 'সে তো তুই-ই সেদিন বলেছিলি, ওরা মরে গেছে, কিন্তু তুই তো এই সেদিন জন্মালি আমার কাছে !'

আর কিছু বলে না শিবু।

সেদিনের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নয়—আস্তে আস্তেই নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

॥ ৪ ॥

এর পর অবশ্য আর অনেকদিন কেউ আসে নি।

ও বাড়ি বেচে শাঁখারিটোলায় চলে আসাও তার একটা কারণ হতে পারে। নতুন পাড়া, তাছাড়া কিছুদিন ঘোরাঘুরিটাও বন্ধ আছে। ঠিকানাটা ঠিক যোগাড় করতে পারে নি সবাই।

কেবল শিবুই আসে মধ্যে মধ্যে। এখানেও এসেছে। দৈবাৎ এখানে আসার আগে দেখা হয়েছিল—ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল হেমন্ত।

সেও আসে বছর ছ'-মাস অন্তর। উল্কার মতো হঠাৎ এসে পড়ে, হয়ত কোনদিন ভাতও খায় এসে কিংবা একটু মিষ্টি, দুটো-একটা টাকা নেয়, চলে যায় আবার। কোথায় থাকে কি করে তা বলে না, বাড়িতে থাকে না বেশির ভাগ সময়ই। চেহারা যা হচ্ছে, বাঁচবেও না বেশী দিন মনে হয়। তবু ফেরাতেও পারে না। কোন কথাই শোনে না, হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'বেঁচে কি হবে আমার ? কার কি কাজে আসব বলো ! শিগগির শিগগির শেষ হয়ে যাওয়াই তো ভাল।' দেখেশুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে হেমন্ত। আর সবাই যখন গেছে, ওর জন্যেই বা ভেবে কি হবে ? ছেঁড়াচুলে খোঁপা-বাঁধতে যাওয়া !

বাইরে ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হয়েছে নানা কারণে।

দেশে শান্তি বা স্থিতিশীলতা নেই। অতবড় স্বদেশী আন্দোলন গেল—অত হ্যাঙ্গাম-হুজ্জৎ দেশব্যাপী একটা অশান্তির তরঙ্গ—তাতে অত ক্ষতি হয় নি। এখন এই

কোথায় যেন একটা খুব গোলমাল—লড়াই বাধবে নাকি—তা সেই লড়াই বাধবার সূচনা বা উপক্রমণিকা থেকেই টাকার বাজারে বড় টালমাটাল যাচ্ছে। বাড়ি জমি যাদের আছে তারা বেশী দাম চাইছে—অথচ বাজারে খদ্দের কম। দু-একটা লেনদেনে কোনমতে কেনা দাম উঠেছে, একটাতে কিছু লোকসানও দিতে হয়েছে। তাই দেখে পূর্ণবাবুই পরামর্শ দিয়েছেন, 'এত হাঁকড়পাঁকড় করার দরকারই বা কি! যা ক'রে নিয়েছো তাতে তিন জন্ম বসে খেতে পারবে। বরং বেশী লোভ করতে গেলেই হয়ত অতি-লোভে-তাঁতি-নষ্ট—সেই কম্ম হবে। দিনকতক একটু চুপ ক'রে বসে থাকো দিকি। একটু জিরোও। খাটলেও তো কম নয়। বসে বসে দেশের হাওয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে একটু লক্ষ্য করো। এই যে লড়াই বাধল—এর কি ফলাফল হয় তাও দ্যাখো। সবাই বলছে ইংরেজ হারবে, তাহলে তো ঘোর অরাজকতা। যাওয়ার আগে মরণ-কামড় দেবে হয়ত ইংরেজ, টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াও আশ্চর্য নয়। খুব টাকা রোজগার হচ্ছে এ দুর্নাম এখন না হওয়াই ভাল, হ্যাঁ—যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধন-অপবাদ ভাল নয়। যুগে যুগেই—এই রকমের হানাহানিতে বড়লোক, ব্যবসাদাররা মার খেয়েছে, ডাকাত-লুটেরাদের পোয়া-বারো।···কাজ-কারবার বন্ধ ক'রে দিনকতক হাত গুটিয়ে বসে থাকো।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। শোনেও।

টাকার জন্যেই যে এই কারবার শুরু করেছিল—বা করছিল, তাও তো ঠিক নয়।

আসলে কিছু একটা কাজ ছাড়া থাকা সম্ভব নয় বলেই আরও এই ভূতের মতো উদয়াস্ত পরিশ্রম। ভেতরের শূন্যতা ও হাহাকার ভোলার জন্যেই দিনরাত মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখা। এটা এখন নেশা নয়, জীবনের একটা অবলম্বনও। চুপচাপ বসে থাকলেই কেবল মনে পড়ে যে, ওর কেউ কোথাও নেই। জীবনে কোন আশা বা আশ্বাস নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই। একেবারেই নিঃসঙ্গ, নিরাত্মীয় সে।

কিন্তু তবু—কী আর করা যাবে! লোকসান দেওয়ার থেকে দু-চার দিন চেপে থেকে বাজারের হাবভাব দেখাই ভাল। দালালরা আসা-যাওয়া করছে—সেদিকে খোঁজ-খবর যে না রাখছে তা নয়। কিন্তু বুঝতে পারছে না ঠিক, মানুষের মনের আর পয়সার গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে।···

এমনি একটা কর্মহীনতা ও অবলম্বনহীনতার মধ্যেই—ওর পূর্বজীবনের একটা হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় আবার যেন এক প্রেতমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে উঠে এল বিস্মৃতির শ্মশান-শয্যা থেকে।···

সেদিন ঝি যখন এসে খবর দিলে, 'কে একজন লোক দেখা করতে চায়'—তখন স্নানাহার শেষ ক'রে সবে একটু শুয়েছে হেমন্ত, তন্দ্রার ভাবও এসেছে একটু, তার মধ্যেই জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম লোক?'

চারুর মা বললে, 'কোন দুঃখী লোক বলেই মনে হয়, কোরা কাপড়ের ওপর একটা তালি দেওয়া ময়লা জামা, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—হাতে একটা গামছায় বাঁধা কি পুঁটুলি—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে তেমনি নিদ্রালু কণ্ঠেই বলে উঠল, 'ব্যাস, ব্যাস, বুঝে নিয়েছি। আমার হিতেকাঙ্ক্ষী কেউ। বলগে যা, দেখা হবে না।' বলেই পাশ ফিরে

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টা-দুই পরে ঘুম থেকে উঠতে চারুর মা খবর দিল, 'সেই লোকটা ঠায় বসে আছে দিদি, ঐ সামনের রকে—।'

বিরক্তিতে মনটা খিঁচড়ে যায় হেমন্তর।

এ পাড়াও ছাড়তে হবে দেখছি, না হলে আর শান্তি থাকবে না। শুরু হয়ে গেল এখানেও। কিন্তু কোন্ পাড়াতেই বা যাবে, যেখানে যাবে সেখানের খবর কি আর বার করতে পারবে না কেউ?

বিরক্তও হয়—তেমনি কৌতূহলীও হয় একটু।

উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ায়। আত্মীয় তো বটেই, সে তো বোঝাই যাচ্ছে—প্রশ্ন, কোন্ তরফের?

কিন্তু জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল।

এ কে?…কে এ? এতকাল পরে কোথা থেকে এল?

মৃত্যুর কোন্ পার থেকে?

হরিচরণ!

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই আকার ও আকৃতি।

হাত-পা কাঠি-কাঠি, পেটটি ডাগর, পোড়া তামাটে-তামাটে রঙ; কেশবিরল একখানি মাথা, চোখ দুটি ঈষৎ হরিদ্রাভ—দুষ্ট যকৃতের লক্ষণ; কতকাল স্নান করে নি, সর্বাঙ্গে খড়ি উঠছে, যে ক'টি চুল আছে তাও শনের মতো শুকনো খাড়া-খাড়া। এক কথায় আপাদমস্তক হরিচরণ।

অবাক হয়ে তাকিয়েই আছে, ছেলেটি হঠাৎ চোখ তুলে এদিকে চেয়ে দেখলে একবার। চোখোচোখি হতেই বিনত অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, 'জ্যাঠাইমা, আমি গো, সাধুচরণ।…অনেকক্ষণ বসে আছি। সেই ভোরে বেইরেছি বাড়ি থেকে, পেটে একটুন্ জলও পড়ে নি।'

সাধুচরণ নাম মনে পড়ে না। শোনে নি অবশ্যই। শোনবার কথাও নয়। তবে জ্যাঠাইমা যখন বলছে—আন্দাজে বোঝা যায়—ছোট দেওরের ছেলে। সে যখন চলে আসে তখনই দেওরের বিয়ের কথা হচ্ছিল, সম্ভবত তার পরই সেটা হয়ে গেছে। আর, বছর-দুইয়ের মধ্যেই যদি ছেলে হয়ে থাকে তো—এই বয়সীই হবার কথা। তারকের থেকে বছর ছয়েকের কি আটের ছোট।

কী করবে, রূঢ় হবে, চিনতে না পারার ভাব করবে, কি বাড়িতে আসতে বলবে—মন স্থির করার আগেই সাধুচরণ রোয়াক থেকে গুটি-গুটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে ওপরে উঠে এল, তারপর পুঁটুলিটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল।

'পায়ে আর কিছু নেই জ্যাঠাইমা, এতটা পথ হেঁটে আসা—ঘোরাঘুরি—তারপর ধরো দাঁড়িয়েই আছি অমন পাঁচ দণ্ড। দোর খুলবে না এখন, বুঝে—শেষে ঐ ওদের দাওয়ায় গে বসলুম। তাও ভয়—চোর বলে বুঝি বা পুলিশে দেয়।'

'তা এত কাণ্ড করার দরকারই বা কি ছিল? আমার কাছে কেন?' বিরসকণ্ঠেই

প্রশ্ন করে হেমন্ত। এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে যেন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'কিছু না, এমনিই।' খুব সহজভাবেই উত্তর দেয় সাধুচরণ, 'শুনি তো তোমার কথা—দেখা তো হয় নি কখনও। আরও একবার এয়েছিনু কেউ জানত না—বাড়ি থেকে পাইলেই এয়েছিনু বলতে গেলে—সে অনেক দিনের কথা, তখন ছেলেমানুষ, তারক-দার খুব ভাল চাকরি হয়েছে বলাবলি করছেল জ্যাঠারা, ভালভাবে ডাক্তারি পাশ করেছে শুনে ত্যাখন থেকে দেখার ইচ্ছে, শরীল তো ভাল না—ভেবেছিনু যদি দাদা কৃপা ক'রে কাছে রাখে—চাকর-বেয়ারাও তো দরকার হবে—তা ফাঁক পেয়ে আসব-আসব করছি, ইরিমধ্যে শুননু দাদার ভারী ব্যামো ; শোনামাত্তকই বেইরে পড়েছিনু দেশ থেকে—যা পাওয়া যায় ফল-ফলুরী নে—তা এসে শুননু তোমরা বাইরে কোথায় কোন্ পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে গেছ। সে এবাড়ি নয়—এর চেয়ে বড় একটা বাড়ি ছেল—তা কী আর করব, দারোয়ান ছেল সে বাড়িতে, সে তো আর আমাকে চেনে না, ফল-পাকড়গুলো তাকেই দিতে—সে এক পাত ভাত ধরে দিলে, খেয়ে ফিরে গেনু। তার পরও একবার এয়েছিনু—তখন তুমি কোথায় থাকো কেউ বলতে পারলে না। তার পর তো দেখি বাড়িতে অপর নোক সব।'

এইবার হেমন্তর মনে পড়ল কথাটা।

দারোয়ান শিউপূজন বলেছিল বটে যে, কে একজন এসেছিল ওরা দার্জিলিং চলে গেলে খোঁজ করতে—ষোল-সতেরো বছরের ছেলে—কিছু ফলমূল হাতে নিয়ে।···তখন এ-সব কথায় কান দেবার মতো অবস্থা নয় মনের—দেয় নি। তার পরও মনে ছিল না যে, ভাল ক'রে জিজ্ঞেস করবে। তবু স্মৃতির কোন্ অন্ধ গুহায় কথাটা থেকেই গিয়েছিল। আজ মনে পড়ল।···

কানে গেল সাধুচরণ বলছে, 'শরীল ভাল না জ্যাঠাইমা, কাল-রোগ ধরেছে, এই দ্যাখো কথা কইছি ভাল মানুষের মতো, এখুনি হয়তো কম্প দিয়ে ভালুকের মতো জ্বর আসবে। ত্যাখন একেবারে জন্তু হয়ে যাব। তাছাড়া পেটও ভাল না, পিলেলিবর পেটজোড়া——ডাক্তাররা বলে। তা চিকেচ্ছে করানোর তো পয়সা নেই, যা করে ঐ হাসপাতালের ডাক্তার—দু'কোশ পথ ভেঙে হাসপাতালে গেলে এক শিশি মিক্‌চার মিলবে, তা সে দুটি দিনের মতো, গোনা ছ' দাগ।···রোজ রোজ য়্যাত্‌টা পথ হাঁটা যায়—তুমিই বলো না?··· তাই বলি, বেশীদিন তো আর নয়, শেষই তো হয়ে এল—মানুষটাকে কখনও দেখি নি—মরার আগে চোখে দেখেই যাই একবার। আমি কিছু চাইতে আসি নি, বিধবাটাকে রেখে যাব, অল্প বয়েস আর ঐ একটা গুয়ের গোবলা ছেলে—ত্যাখন যদি ছিচরণে আচ্ছেরয় দাও একটু! ওখেনে থাকলে সেও বাঁচবে না!'

হেমন্ত শুনছিল কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই। সে চেয়ে ছিল সাধুচরণের চোখ দুটোর দিকে। ঠিক তেমনি চোখের চাউনিটা পর্যন্ত। অবিকল হরিচরণ একেবারে। মনে হচ্ছে, সেই আকার ধরে কোন আত্মা এসেছে, সবটাই অবাস্তব, অশরীরী ছায়ামূর্তি।

কী-ই বা বয়স ওর, তারকের থেকেও কত ছোট, এখনই মৃত্যুর কথা ভাবছে, বিধবা বৌ ও ছেলের কথা!

কেউই বাঁচবে না ও-বংশে, ঐ লোকগুলো নিজেদের পাপেই নির্বংশ হয়ে যাবে।

একটার পর একটা বৌ বিধবা হবে। তারই মতো অবস্থা হবে হয়ত—শিশুসন্তান নিয়ে বিধবা বৌয়ের। হয়ত এর বিষয়ের অংশ নিয়েও তেমনি কামড়াকামড়ি করবে এর জ্যাঠারা।...

মন কোথায় চলে গিয়েছিল, কোন্ সুদূর অতীতে। নিজের দুর্ভাগ্যের স্মৃতিতে ডুব দিয়েছিল। হঠাৎ এক সময় যেন আবার বাস্তবে নেমে এসে দেখল, সাধু একটু অবাক হয়ে কেমন এক ধরনের উৎসুক দীন চোখে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

মায়াও হয়। কোনই কারণ নেই ও-বংশের কারও প্রতি মায়া হবার, ঝাড়বংশ সব সমান, সবাই পাজী ; তা জেনেও মায়া হয়।

বলে, 'তা তোমার মা-বাবা ?'

'হুঁ !' গলায় জোর দিয়ে হাসে সাধুচরণ। বলে, 'বাবাও তো অক্কা গো—এই বছর-চারেক হল। মা-টা ছিল, তা জানোই তো ও-বাড়ির হাল, এমন ফ্যাচা-খেউ ক'রে লাগল সব্বাই—তবু তো ঠাক্মা নেই, ঠাক্মার কী হল জানো তো, গিরিণী অস্বস্তির ব্যামো, শেষকালটায়—যেমন পেছনে লেগেছেল তোমাদের—তেমনি শাস্তি ; গুয়েমুতে সব্বাঙ্গে নোংরা মেখে পড়ে থাকত, কেউ উঁকি মারত না, কাঠি ক'রেও ছুঁত না—এই আমি, এই শম্মা, ত্যাখন আমার কতই বা বয়েস—তবু আমিই কাছে যেতুন, জলটা খাবারটা দিয়ে আসতুন—য়্যাকো য়্যাকো দিন কাঁথাকানিগুলো নে গে পগারের জলে ধুয়ে দিতুন— তা হ্যাঁ—কী যেন বলছিনু—মায়ের কথা, মাও ও-বাড়ির যে ধারা, সেই ধারায় গেল, আড়া থেকে গলায় দড়ি দে ঝুলল একদিন। রাতারাতি ওরা রাষ্ট করে দিলে যে, ওলাউঠো হয়ে মরেছে।...তা আমাদের ও-বাড়ির কথা জানে তো সবাই, কেউ কি আর এত ভদ্দরতামাফিক কথা সহজে বিশ্বেস করে ? জানাজানি কানাকানি—শেষে থানা-পুলিশও হল—দারোগা এল বাড়িতে খোঁজ করতে, ত্যাখন এই শম্মার পায়ে ধরতে হল শেষকালে, কি করি—বংশের কেলেঙ্কার তো, য্যাতই হোক, আমিই বননু, যে, হ্যাঁ—ওলাউঠোই ঠিক। তবে ঐ জ্যাঠা হারামজাদারা ছাড়া পায় !...'

চারুর মা এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ কি রকম অভ্যর্থনা হবে জানতে চায়। চোখে নীরব প্রশ্ন, জলখাবার দেব, না গলাধাক্কা ?

হেমন্ত তবুও যেন মন স্থির করতে পারে না। কতকটা সময় নেবার জন্যেই বলে, 'সঙ্গে কি ও ?'

'এই বাগানের দু-চারটে ফল—। আর গামছা একখানা।'

'ওতে আমার দরকার নেই বাবা, ও তুমি কাউকে ডেকে দিয়ে দাও। ও বাড়ির দুব্বো ঘাসে পর্যন্ত পাপ, ও আমি ছোঁব না।...চারুর মা, ঠাকুরকে বল—কাঠের উনুনে একটু জল গরম ক'রে দিতে। চান করুক, একটু মিছরি ভিজিয়ে দে—শরবৎ খাক এখন। তারপর সকাল ক'রে চাটটি ভাত ক'রে দেয় যেন, নিরিমিষ কাঁচকলা পটলের ঝোল আর ভাত, তেল কম—লঙ্কা সর্ষে বাদ।...কিন্তু পরবে কি, এ বাড়িতে তো ধুতির পাট নেই।'

সাধুচরণ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, 'তা দাদার কাপড়-চোপড় এক-আধখানা পড়ে নেই ?'

'না, সে আমি রাখি নি। আর রাখলেও তোমাকে দিতুম না পরতে।...শাড়িই পরো

এখন। আমার আগেকার সরু পাড় শাড়ির ক'খানা পড়ে আছে এখনও—।'

দৈবক্রমে সেদিনই পূর্ণবাবু এসে গেলেন। আজকাল আর রোজ এধারে আসতে পারেন না, কষ্ট হয়। সাত-আট দিন অন্তর একদিন হয়ত এক-আধ ঘণ্টার জন্যে এসে খবর নিয়ে যান।

সাধুচরণের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ শুনে খুব হাসলেন খানিকটা।

বললেন, 'য়্যাঁ, বলো কি! ওর বাপ-জ্যাঠারা যা পারে নি—ও তাই পারলে! বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। যাক, এতদিনে সাধুর আগমন হল তোমার বাড়িতে।...তা মন্দ কি! যদি ওদের মতো বদ না হয়, তোমাকে দেখাশুনো করে একটু—ভালই হবে। কৈ দেখি একবার চিজটিকে, ডাকো দিকি।'

সাধুচরণ এসে নমস্কার ক'রে একেবারে পায়ের কাছেই বসল পূর্ণবাবুর।

পূর্ণবাবু কিছুক্ষণ ধরে আপাদমস্তক দেখার পর ঝিকে ডেকে বললেন গাড়ি থেকে তাঁর ডাক্তারী ব্যাগটা আনতে। তারপর নাড়ি দেখে চোখের কোল দেখে, আঙুলের ডগাগুলো টিপে-টিপে দেখে ঐখানেই শুয়ে পড়তে বললেন। বুকে চোঙা লাগিয়ে বুক-পিঠ দেখলেন, পেটটা টিপে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে।

দেখতে দেখতেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। এখন কান থেকে চোঙা নামিয়ে ওকে উঠে বসতে বলে, হেমন্তর দিকে চেয়ে বললেন, 'এ তো সিরিয়াস অবস্থা দেখছি!... কাল একবার কাউকে দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও। আমি ইন্দুকে দিয়ে দেখিয়ে নোব ভাল ক'রে। ও ছোকরার জ্ঞান খুব—। আমি অবিশ্যি কিছু ভুল দেখি নি এতকাল পরে—তবু সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়া ভাল।'

তারপর সাধুকে বললেন, 'রোগ তো বেশ পাকিয়ে তুলেছ দেখছি! যদি এখন থেকে ঠিক ধরাকাঠে না থাকো, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করো—তাহলে বেশীদিন আর জ্যাঠাইয়ের আদর ভোগ করতে হবে না। আমি তামাশা করছি না, কি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছি না—সত্যিই অবস্থা খুব খারাপ। যদি খুব সাবধানে আর নিয়মে থাকো তাহলে একটা চান্স আছে বাঁচার—নইলে ওষুধ যতই দিই, বাঁচতে পারবে না।'

সাধুচরণ কাঁদো কাঁদো হয়ে খপ্ ক'রে পূর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললে, 'মাইরি বলছি—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—যা বলবেন তাই শুনব, যেমনভাবে থাকতে বলবেন তেমনিভাবে থাকব। কচি বৌ, একটা ছেলে হয়েছে তার উপরি—জীবনে খুব মায়া, সত্যি বলছি আপনাকে। তবে আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম পেরায়—ওখেনে তো কোন চিকিচ্ছেই হয় নি ধরুন, আর খাওয়ার ধরাকাঠই বা করব কি, সাজার যা হয় বাড়ি-সুদ্ধু সবাইকার তাই তো খেতে হবে, ডাল চচ্চড়ি অম্বল—এই তো বাস্তুদেবতা বলতে গেলে—আমার জন্যে আলাদা ক'রে আর কে কি করছে! তুমিও যেমন।...এখেনে জ্যাঠাইমা দয়া ক'রে ঠাঁই দিলেন তাই, নইলে সত্যি কথা বলতে কি, শেষ দেখাই দেখতে এইছিনু—যদি বৌ-ছেলেটাকে একটুন্ কৃপা করেন এই আশায়। নিজের আশা আর রাখি নি। মাইরি বলছি!'

তারপর নিজের এই ভাবাবেগে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'ইস, পায়ে হাত দিয়ে ফেলনু, আপনি বামুন বটে তো? নইলে—মানে আপনার আবার পাপ হবে—

সেই চিন্তা।...আপনার নামটি কি? খুব বড় ডাক্তার তা তো বুঝতেই পারছি—তবু আপনারা?'

'আপনারা' অর্থাৎ আপনি কি জাত!

হেমন্তর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ধমক দিয়ে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আর বামনাই ফলাতে হবে না। তোমরা আবার বামুন! তোমরা বামুন তো চাঁড়াল কে?'

কাঁচুমাচু মুখ ক'রে সাধুচরণ আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ ক'রে ফেলে। কি করা উচিত, কি করলে জ্যাঠাইমা খুশী হবে ভেবে না পেয়ে—পায়ে হাত দেওয়াই নয় শুধু, পায়ের ধুলোই নিয়ে নেয় এক খাবলা।

॥ ৫ ॥

পরের দিনই ঠাকুরকে সঙ্গে দিয়ে সাধুচরণকে হাসপাতালে পাঠাল হেমন্ত। সেখানে দু-তিনজন ডাক্তারকে দেখিয়ে, পরামর্শ ক'রে পূর্ণবাবু প্রেসক্রিপশ্যন লিখে দিলেন, বড় বোতলের এক বোতল মিক্স্চার করিয়েও দিলেন। কিন্তু সব ডাক্তারই বার বার শাসিয়ে দিলেন, শুধু ওষুধে কোন কাজ হবে না—ধরাকাঠে না থাকলে বেশীদিন বাঁচবে না। ইন্দুবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, শুধু ম্যালেরিয়া নয়, কোথাও থেকে কালাজ্বরের জীবাণুও ওর দেহে ঢুকেছিল, রক্তের অবস্থা খুব খারাপ।

নিজেই এসে বলে সাধুচরণ কথাগুলো।

সেই মতো হেমন্তও বড়া হাতে রাশ ধরে। কাঁচকলা ভাতে আর কাঁচকলা পটল দিয়ে কচি মাছের ঝোল—তৈলবর্জিত—দু বেলা একই বরাদ্দ। জলখাবার পাঁউরুটি আর চিনি। কোন কোনদিন সুজির রুটি আর গুড়।

এদিকের কৃচ্ছ্রতা অন্যদিকে পুষিয়ে দেয় অবশ্য। নতুনবাজারে লোক পাঠিয়ে ভাল ভাল ফল আনিয়ে দেয়। বাতাবি-লেবু শশা কলা তো আছেই—আঙুর বেদানাও থাকে তার সঙ্গে। কিন্তু সাধুচরণ পাড়া-গাঁয়ের ছেলে, তার মুখে এসব রোচে না। খেতে বসে দু'বেলা কান্না আসে তার, ফল দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। দু-চারদিন যেতে ভয়ে ভয়ে জ্যাঠাইয়ের কাছে মুড়ির কথাটা তুলেছিল—মুড়িতে দোষ কি? ও তো ধরো ভাতের মতোই। হাল্কা ক'রে অল্প একটু তেল-হাত বুলিয়ে—? ধমক খেয়ে চুপ ক'রে গেছে।

কিন্তু ওর যে ভাল লাগে না, মনমরা হয়ে থাকে সেটা হেমন্তর চোখ এড়ায় না। এই গুম খেয়ে থাকার অর্থ সে ভুল বোঝে। বৌ-ছেলে ফেলে এসেছে, না জানি তারা কি দুরবস্থার মধ্যে আছে—তাদের কথা ভেবেই এমন মন-গুমরে থাকছে নিশ্চয়। দু-চারদিন দেখে সে বলল, 'তা বৌমাকেও এখানে আনিয়ে নাও না! তোমারই বা এত কন্না করে কে! তাছাড়া ওখানে থাকলে ছেলেটা বাঁচবে না এই তো বলো—দু'জনকেই আনিয়ে নাও।...চিঠি লিখে জানো, আসতে চায় কিনা—তারপর একদিন গিয়ে নিয়ে এসো।'

সাধু প্রথমটা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে খানিকটা, হাঁ ক'রে।

তারপর যখন বোঝে হেমন্ত তামাশা করছে না বা মনে ঢিল মেরে ওর মনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করছে না—তখন লাফিয়ে ওঠে একেবারে।

গলা থেকে এই ক'দিনের চিঁ-চিঁ ভাব এক নিমেষে কেটে গিয়ে বেশ জোর দিয়েই বলে ওঠে, 'আসতে পারবে কিনা, মত নেওয়া—মানে?—কি আমার একেবারে মান্যবর ঘরামী। আসতেই হবে। এ কি তার খুশীমতো কাজ নাকি? আমি হুকুম করব—আসবে না! ইঃ, তার বাপ আসবে—সে তো ছেলেমানুষ!'

তারপর এক মিনিট চুপ ক'রে থেকেই আবার বলে, 'আমি তাহলে কালই চলে যাই জ্যাঠাইমা, কি বলো? গে ঝুঁটি ধরে নে আসি—।'

হেমন্ত সেই প্রজ্বলন্ত উৎসাহে এক ঘড়া জল ঢেলে দেয়। বলে, 'না, আগে চিঠি লেখো, তৈরী হয়ে থাক। হঠাৎ আনতে গেলেই কেউ ঘর-সংসার থেকে অমনি দু'ঘণ্টায় বেরিয়ে আসতে পারে না।···আর ঐ ছুতোয় যে তুমি সেখানে গিয়ে বসে আবার দু'দিন তিনদিন ধরে নানান অখেচড় খেয়ে আসবে—তাও হবে না। অনেক কাণ্ড ক'রে সারানো হচ্ছে, দু'দিনের অত্যোচারে সে-সব নষ্ট করা চলবে না।···যেদিন যাবে—ভোরে দুটি ভাত খেয়ে চলে যাবে—সন্ধ্যের আগে এখানে এসে পেঁছিবে। না হলে আর এ বাড়ি ঢোকা হবে না, সে আমি সাফ বলে দিচ্ছি।'

মুখটা বেজার ক'রে বসে থাকে সাধু। এতটা বন্দীদশা কারুরই, বিশেষ পাড়া-গাঁয়ের ছেলের পছন্দ হবার কথা নয়, হয়ও না। নেহাৎ অনেক তোয়াজে আছে, তাছাড়া তিন-তিনটে প্রাণীর ভার নিতে চাইছে একটা লোক—তাকে চটাতেও ইচ্ছা করে না। জ্যাঠাইয়ের কত টাকা—তা সঠিক না জানলেও অনেক টাকা যে আছে—তার একটা আঁচ পেয়েছে সে। ভবিষ্যতে ওরই ছেলে এই সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক হবে, এটা কল্পনা ক'রে হর্ষ-রোমাঞ্চ হয় ওর।

অগত্যা একটা চিঠি লিখতে হয়, চিঠির উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে হয়।

মনোরমা—সাধুর স্ত্রী তো পা বাড়িয়েই ছিল বলতে গেলে, ও-বাড়ির নিরন্তর দুঃখ ভোগ এমনিতেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অভাব তো আছেই, তার ওপর নিরন্তর কলহকেজিয়া, পরস্পরকে ছোবল মারা—এ আর তার সহ্য হচ্ছিল না, তার ওপর—রুগ্নই হোক আর যা-ই হোক—স্বামী একটা ছিল, সেও নেই, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল তার। জ্যাঠশাশুড়ীদের অত্যাচার ও বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সেও শাশুড়ীর পন্থা অনুসরণ করবে কিনা যখন ভাবছে সত্যি সত্যিই—তখনই এই চিঠি গিয়ে পড়ল।

মনোরমা নিজে লিখতে জানে না, পাড়ার একটি ইস্কুলের ছেলেকে ধরে, একটা পয়সা দিয়ে পোস্টকার্ড আনিয়ে তাকে দিয়েই চিঠি লেখাল, 'তুমি আমাকে সত্বর লইয়া না গেলে আমি অবশ্য অবশ্যই কাঁটাপুকুরে ডুবিয়া মরিব। কোনমতেই তাহার অন্যথা হইবে না জানিবে।'

সাধু পরের দিন ভোরবেলাই রওনা হয়ে গেল, জ্যাঠাইমার নির্দেশমতো আলু-পটলভাতে আর দই দিয়ে ভাত খেয়ে। তবে সেদিনই আর ফিরতে পারল না। সম্ভব নয় তা হেমন্তও জানত, তবে আরও বেশী দেরি না করে সেই জন্যেই কড়া রকমের কড়ার করিয়ে নেওয়া। পরের দিন বিকেলেই মনোরমা আর ছেলে গোরকে নিয়ে চলে এল।

জ্যাঠাইরা নাকি আসার সময় খুব বাঁকাবাঁকা কথা বলেছে, 'যা রে গৌর, যা যা। এবার তোর কপাল ফিরল। ছেঁড়া ক্যাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখ্যু লোক কথায় বলে, তোর অদেষ্টে দেখি সেই স্বপ্নই সত্যি হয়ে গেল রে ছোঁড়া।···যা যা, লুটে নিগে যা— যা পারিস।···তবে বুঝব বরাতজোর, যদি টিঁকে থেকে ওর পয়সা ভোগ করতে পারো তবেই। ও বাবা পিচেশে-পাওয়া মেয়েমানুষ—তুই ওর পয়সা খাবি কি, ও তোর জীবনটা চুষে খাবে—তাই দেখগে যা। যাচ্ছিস তো নাচতে নাচতে!'

কথাটা গৌরকে বলা অনর্থক। সে তখন নিতান্তই শিশু, এসব কথার অর্থ বোঝা সম্ভব নয় তার। তাকে ওরা বলেও নি অবশ্য। আসলে সাধু আর মনোরমাকে উদ্দেশ করেই বলা। ঈর্ষার বিষ—কোনমতেই ঢাকা যাচ্ছে না।

সবটা ঠিক বলা না গেলেও সাধুচরণ এর অনেক কথাই বলল এসে। শুনে শুধু হেমন্তর মুখের কঠিন ভঙ্গীটা কঠিনতর হল। এর কোন উত্তর দেবার চেষ্টাও করল না। প্রতিপক্ষ যেখানে অনুপস্থিত—সেখানে বাদানুবাদ করতে গিয়ে নিঃশ্বাস নষ্ট ক'রে লাভ কি?···

মনোরমা কালো রঙের উপর মন্দ দেখতে নয়। আর—ও গ্রাম কি ও অঞ্চলের মেয়ে নয় বলেই বোধ হয়—বেশ স্বাস্থ্যবতী। ওর বাড়ি এদিকে—ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে। এদের বাড়ির এমনই 'সুনাম' রটে গেছে চারিদিকে যে, কাছাকাছি কোথাওকার মেয়ে এদের ঘরে দিতে চায় না। দূর-দূরান্ত থেকে আনতে হয়। ছেলেটাও, মায়ের স্বাস্থ্যের জন্যেই বোধহয়—খুব একটা রুগ্ন বা পুঁয়ে-পাওয়া নয়, হাত-পাগুলো মোটাসোটা গোলগাল।

দু-চারদিন দূরে দূরে রাখলেও বেশীদিন ছেলেটাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারল না, গৌর শিগ্‌গিরই 'গৌরসুন্দর' 'গোরা' হয়ে ওর বুকে উঠল এবং একরকম হেমন্তর কোলেই মানুষ হতে লাগল। মনোরমার তাতে খুব একটা আপত্তিও দেখা গেল না, সে যেন বরং নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সুখী ও নিশ্চিন্ত হবারই কথা সাধুচরণের, কিন্তু তা হতে পারল না সে।

এই শাসন আর বন্ধন তার ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল। এই খাওয়া রোজ খাওয়া যায় না। জলখাবার বলতে দুধ-সাবু, আর নয় তো কাঁচকলা-সেদ্ধ মিছরির গুঁড়ো দিয়ে। বড়জোর তাতেই কোন কোনদিন মিছরির বদলে নুন আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখা হয়। আগে পাঁউরুটি খাচ্ছিল, বামুনের কারখানায় তৈরী পাঁউরুটি, তাতেও অম্বল হতে লাগল—সেই জন্যেই নতুন এই ব্যবস্থা। একটু তেল না, একটু ঘি না—দুটো ভাজাভুজি কিচ্ছু খাবার উপায় নেই। সকালে সেদ্ধ মাছের ঝোল ভাত, রাত্রে সেই রকমই ঝোল আর রুটি। বড়জোর রকমফের হিসেবে—কোন কোনদিন একটু পলতা বা উচ্ছের সুক্তো হয়, তাও তাতে সর্ষে বাদ, শুধু ধনেবাটা দিয়ে সুক্তো—মানুষ কেন গোরুতেও তো খেতে পারে না। খেতে বসলে চোখে জল এসে যায় তার, মনে হয় এমন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও তো ঢের ভাল।

আরও মুশকিল হয়েছে এই, পুরনো রোগ—সারতে দীর্ঘ সময় লাগছে। এত

ধরাকাঠে থেকেও উন্নতির গতি এত মন্থর যে, ঠিক কতটা কি হচ্ছে, আদৌ কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা যায় না। মানে হিসেবে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয় সেটা। তাতেই সাধুচরণ ও মনোরমার ধারণা হয়েছে যে, এসব অকারণ, এই এত কড়াক্কড়ি। কিছুতেই কিছু হবে না। আর সারবেই না যখন, তখন যে ক'দিন বাঁচে একটু ইচ্ছেসুখে খেয়ে নিতে দোষ কি? এক-এক সময় আড়ালে কপাল চাপড়ায় সাধু, এই জন্যে কি এত মতলব খেলিয়ে সে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে এসেছিল! চারিদিকে ভোগের বস্তু থরে-থরে সাজানো, ভাল ভাল সুখাদ্যের আয়োজন চারিদিকে, তার মধ্যে সে-ই সবেতে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? তাহলে আর এত দীনতা স্বীকার ক'রে এখানে পড়ে থাকার প্রয়োজন কি?…

আহারের কষ্ট ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে এটা বুঝেছিল হেমন্ত—তাই বলে শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে সে যে এমন কাণ্ড ক'রে বসবে তা সে কেন, সাধুচরণ নিজেও বোধহয় ভাবে নি।

কথাটা তাকে একদিন চারুর মা-ই বললে।

'দিদি, বৌটো বোধহয় ওর বরকে বাইরে থেকে এটা-ওটা এনে খাওয়াচ্ছে!'

গত ক'দিনের মধ্যেই হঠাৎ যে খুব দ্রুত একটা অবনতি ঘটেছে তা হেমন্তও লক্ষ্য করেছিল।

চোখ দুটো আবার হলদে হয়ে উঠেছে, পাইখানার চেহারাও ভাল নয়, হাত-পা দুটো ফুলো-ফুলো বোধ হচ্ছে। বোধহয় গাও গরম হয় বিকেলের দিকে। লক্ষণ সব দিকেই খারাপ।

কিন্তু, শঙ্কিত বোধ করলেও, কারণটা কি আন্দাজ করতে পারছিল না। এক-একবার মনে হচ্ছে এই রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়ে স্ত্রীর কাছে থাকতে দেওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, আবার ভাবে তার সঙ্গে যকৃতের অবনতি ঘটার কি কারণ থাকতে পারে!

তবু হেমন্ত অবাক হয়ে যায় চারুর মার কথা শুনে!

'সে কি রে! দূর! বৌমানুষ কোথা থেকে কি নিয়ে আসবে? ও বাইরে বেরোয় নাকি?'

'হ্যাঁ গো দিদি, বললে বিশ্বেস করবে নি, আজ স্বচক্ষে দেখলুম যে! দুপুরবেলা এদিক-ওদিক দেখে টুপ ক'রে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই পেট-কাপড়ে ক'রে কি নে'সে বরের ঘরে ঢুকল। এই তো মোড়েই তেলেভাজার দোকান, কতটুকুই বা, যেতে আসতে তিন-চার মিনিটের বেশি লাগে না। ওরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—ফাঁকে বেরিয়ে দোকান-দানি করা ওদের খুব রপ্ত আছে। আর…মায়ের যা চেহারার ছিরি, আর যা কাপড়-চোপরের ছিরি—এখানেও কেউ অবাক হবে না দেখে। কোন ভদ্দরবাড়ির বৌ কেউ ভাববে না, মনে করবে কোন বাড়ির চাকরাণী।'

ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় হেমন্ত চারুর মাকে।

চেহারা নিয়ে এত ব্যাখ্যানা করার কি আছে! যতই হোক, ওর শ্বশুর-বংশের বৌ। চারুর মার সমান কেউ নয়।…

বিশ্বাস হয় না—তবু কথাটা উড়িয়েও দিতে পারে না ঠিক।

অসুখ যে আবার বাড়ার দিকে যাচ্ছে—সেটারও অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু, তখনই কিছু বলে না। চুপ ক'রে সুযোগের অপেক্ষা করে। নিজের চোখে না দেখলে কিছু বলা উচিত নয়।···শুধু সন্ধ্যেবেলা মনোরমা যখন তেল গরম ক'রে এনে ওর গায়ে মাথাতে বসল—এটা ওদের দেশের দিকে গুরুজনকে সেবার প্রধান অঙ্গ বলে পরিচিত, তা জানে বলেই প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি করলেও খুব বেশী বাধা দেয় নি—তখন হেমন্ত কথাবার্তার মধ্যে মোড় ঘুরে ইচ্ছে ক'রেই সাধুচরণের অসুখের প্রসঙ্গে চলে এল। ওর অসুখ যে কত গুরুতর—এ থেকে কত কী অনিষ্ট হতে পারে, সর্বনাশ ঘটাও আশ্চর্য নয়—তা বুঝিয়ে, কিছু বা সত্য কিছু কাল্পনিক এ রোগের অশুভ পরিণতির দৃষ্টান্ত দিয়ে—সাধুচরণের পরমায়ু কত সূক্ষ্মসূত্রে ঝুলছে তাই বোঝাবার চেষ্টা করল। ওষুধ নয়—ওষুধে বিশেষ কিছু করতে পারবে না আর, শুধু পথ্যের ওপ'ই ওর নিরাময় হওয়া নির্ভর করছে। সাবধান না থাকলে বাঁচার কোন আশাই নেই—এই কথাটাই বার বার নানারকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলল মনোরমাকে, যাতে মাথার মধ্যে চিন্তাটা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

'যদি নোলার সাধ ভাল ক'রে মেটাবার ইচ্ছে থাকে, অনেকদিন ধরে ইহজগতের ভাতমাছ খাওয়ার সাধ থাকে—তাহলে এখন কিছুদিন বাপু নোলাটি সামলাতে হবে—এইটে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও তোমার বরকে। মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে হবে। এই যা খাচ্ছে মনে করবে এইটেই ওষুধ, এর ওপরেই জীবনমরণ নির্ভর করছে।'

শান্তভাবে মুখে ঘোমটা টেনে বসে বসে শুনল মনোরমা, সায়সূচক ঘাড়ও নাড়ল বারকতক, ভাব দেখে মনে হল কথাটার গুরুত্ব ভাল ক'রেই বুঝেছে।

হেমন্ত কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। যদি বা একটু-আধটু অত্যাচার ক'রে থাকে—না-জানতে, এবার আর করবে না।

তবু পরের দিন একটু সতর্ক রইল।

দুপুরবেলা সে দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল প্রতিদিনের মতোই। মনোরমাদের খাওয়ার পাট তো আগেই চুকে গেছে, ঠাকুরও ঝিয়ের ভাত বেড়ে রেখে নিজে খেয়ে রান্নাঘর ধুয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ল দ্বিপ্রাহরিক আড্ডায়। চারুর মা রান্নাঘরের সামনের রকে খেতে বসেছে সদরের দিকে পেছন ফিরে।

এই উত্তম সুযোগ, যদি বাইরে যেতে হয় তো এখনই যাবে।

হেমন্ত পা টিপে টিপে বাইরে এসে দাঁড়াল। সাধুদের ঘরও দোতলায়, তবে সিঁড়ির ওধারে, দরজাটা চট ক'রে দেখা যায় না এঘর থেকে। কিন্তু হেমন্তরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—একটা ডুরে কাপড়ের আভাস ত্বরিতগতিতে সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেটা ওর নজর এড়াল না। তার পরই অতি মৃদু একটা শব্দ পাওয়া গেল সদর দরজা ভেজিয়ে দেবার। শব্দ না করারই প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছে—তবু সামান্য যেটুকু আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

হেমন্ত এবার এগিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল, এদিকের ঘরের দরজার খাঁজে। একটু পরেই আবার সেই অতি মৃদু শব্দ—এবার অবশ্য আগের চেয়ে একটু বেশী—

কেউ ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল নিশ্চয়। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই। পা টিপে টিপে সাবধানে উঠলে আওয়াজ পাওয়াই বা যাবে কেন ?…

সিঁড়ির মুখে এসে নিজেদের ঘরের দিকে বেঁকে যাবে মনোরমা—ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমন্ত ওর ওপর। কোঁচড়ের কাপড়টা একটা থলির মতো ক'রে কোমরে গোঁজা—সেটা ধরে টান দিতেই চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মুড়ি-বেগুনি, ডালবড়া-ফুলুরি, তেলেভাজা-কচুরি। কোন ঠোঙা নেয় নি পাছে জিনিসটা ফুলে থাকে—লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাপড়ে তেল লাগার আশঙ্কা গ্রাহ্য না ক'রে কোঁচড়েই নিয়েছে। এগুলি এখন হয় সাধুচরণ একা—নয় তো দু'জনেই বসে বসে খাবে। শেষেরটাই বেশী সম্ভব।

রাগ সামলাতে পারল না হেমন্ত। টেনে একটি চড় বসিয়ে দিল মনোরমার গালে। মনোরমা সে আঘাতের বেগ সামলাতে পারল না। টাউরি খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে। তবু তখনও নিরস্ত হতে পারল না হেমন্ত, তখন চণ্ডালক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে প্রায়, তার ওপরই একটা লাথি কষিয়ে দিল মনোরমার মাজায়।

'হারামজাদী! তোমার পেটে পেটে এত বজ্জাতি! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি! আমার কাছে উড়ে যাবে!…তোর বাপ-জ্যাঠা শ্বশুরেরা পারবে না, তিন পুরুষ এলেও না, তুই তো কোন্ ছার! এই সব হচ্ছে ভেতরে ভেতরে—সেইজন্যে দেখি আবার চোখ হলদে হচ্ছে ছোঁড়ার, নলিখলি পাইখানা শুরু হয়েছে। আর তুমি মাগ হয়ে নিজে হাতে ক'রে বিষগুলো এনে খাওয়াচ্ছ!…তাই তো বলি, আমার এত যত্ন এত ওষুধ সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে কেন! তুমি এই কাজ করছ বসে বসে তার হবে কি!… সেইজন্যে তোমাকে আনালুম এখানে ঝকমারি ক'রে!'

চেঁচামেচিতে চারুর মা ছুটে এসেছে নিচে থেকে ভাত ফেলে—কিন্তু সাধুচরণ ঘর থেকে বেরোল না। জ্যাঠাইয়ের এই রণচণ্ডী মূর্তি সে এর আগে দেখে নি। লাথি মারার আওয়াজটাতেই বুঝেছে পায়ের জোর। নিজে এখন বেরিয়ে বাঘের মুখে পড়তে রাজী নয় সে। ঐ লাথি সে খেলে আর বাঁচবে না।

চারুর মা-ই একহাতে মনোরমাকে ধরে তুলল। খুবই লেগেছে তার, উঠতে পারছে না। কোনমতে চারুর মার হাতে ভর দিয়ে বেঁকেচুরে উঠে ঘরের মধ্যে গেল। কথা বলার শক্তিও নেই তার, আর বলবেই বা কি!

চারুর মা পুরনো ঝিয়ের অধিকারে একটু তিরস্কার করল হেমন্তকে।

'উ কি বাপু! যা-ই করুক, এত বড় বোটোকে নাথি মারা তোমার উচিত হয় নি। মেয়েছেলের পা চলা বড় খারাপ। তার ওপর বামুনের সধবা! সাক্ষাৎ দুগ্‌গার অংশ ওরা। এমন চণ্ডাল রাগ রাখা ঠিক নয়। স্থানে-অস্থানে লেগে গেলে কি হত!…আর তোমার বা এত মাথা-ব্যথা কিসের? তাদের ছাগল তারা 'যদি ন্যাজের দিকে কাটে! মরবার শখ হয়েছে, মরুক না! তারা যদি নিজে হাতে ক'রে বিষ খায় তো তোমার কি! তুমি বড়জোর বলতে পারো যে, যেখেন থেকে এয়েছ সেখেনে যাও, আমার সামনে বিষ খাওয়া চলবে না।…ব্যস্। চুকে গেল ন্যাঠা!'

সে গজগজ করতে করতে নিচে নেমে গেল। ততক্ষণে হেমন্তরও লজ্জা বোধ

হয়েছে, সেও চুপ ক'রে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। রুদ্ধ ক্রোধে তখনও সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার—তবু এতখানি করা উচিত হয় নি, তাও বুঝেছে।

আবার সব চুপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই কানে গেল—কে একজন কোঁকাচ্ছে আস্তে আস্তে।

বোধহয় মনোরমা।

একবার ভাবল গিয়ে একটু দেখে কোথায় কী লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এ-ধরনের প্রশ্রয় পেলে ভবিষ্যতে কোন শাসনেরই মূল্য থাকবে না। এ-শাসনও অনর্থক হয়ে পড়বে।

ওর তরফ থেকে যথেষ্ট ইতরতা প্রকাশ হয়েই গেছে, তার যে সামান্য সুফল হতে পারে—মিছিমিছি সেটুকুও নষ্ট ক'রে লাভ নেই। তাছাড়া এ তো একরকম মানুষ খুন করাই। ঐ রুগীকে এই সব অখাদ্য যোগানো, এর সাজা কঠোর হওয়াই উচিত।

সেদিন মনোরমা আর উঠল না। ওঠার শক্তি নেই অথবা অভিমান—তাও খোঁজ করল না হেমন্ত। সাধুচরণও ওর সামনে এল না, এড়িয়ে এড়িয়ে গেল। সেটা রাগ নয়—ভয়। বৌয়ের যে পরিমাণ শাসন দেখল—না জানি ওর অদৃষ্টে কি আছে!

হেমন্ত পরের দিন চারুর মাকে হুকুম দিয়ে দিল, বেশ জোরে, সবাইকে শুনিয়েই—ঠাকুর যখন থাকবে না, সদর দরজায় ভেতর থেকে চাবি দিয়ে রাখতে। আর ঠাকুরকেও বলে দিল—সাধু আর সাধুর বৌয়ের ওপর যেন কড়া নজর রাখে।

দিনকতক শান্তিতেই কাটল। মনোরমাও তার অভ্যস্ত তেলের বাটি নিয়ে দেখা দিল আবার। হেমন্তও সম্ভবত অনুতপ্ত কুণ্ঠাতেই আর ও প্রসঙ্গ তুলল না। সাধুরও স্বাস্থ্যের সে-অবনতিটা বন্ধ হয়েছে, সেটাও বোঝা গেল ঐ ক'দিনেই।

আট-দশদিন পরে সাধু একদিন ভোরবেলা চোখের জল মোছার ভাব করতে করতে এসে জানাল, সে এই ভোরবেলা স্বপ্ন দেখেছে—ছোট ভাইটার খুব অসুখ। ভোরের স্বপ্ন তো বলে সত্যিই হয়, তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। জ্যাঠাইমা যদি একটা দিনের ছুটি দেন তাকে—তাহলে সে একবার গিয়ে বাপ-মা-মরা ভাইটাকে একটিবার চোখের দেখা দেখে আসে!

হেমন্ত বলল, 'ছুটির কথা বলছ কেন বাবা? তুমি এখানে চাকরিও করো না, জেলখানাতেও নেই। সে-ক্ষেত্রেই ছুটির কথা ওঠে! তুমি নাবালকও নও, ইচ্ছে হলেই চলে যাবে। তবে আমার সাফ কথা, যদি আজই ফিরে না আসো, তাহলে আর এখানে আসার চেষ্টা ক'রো না। আমি একগাদা টাকা খরচ ক'রে তোমার চিকিচ্ছে করাব, দু'বেলা দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়ি ধরে পথ্যি খাওয়াব—আর তুমি দু'দিনের জন্যে সেখানে অখাদ্যি-কুখাদ্যি খেয়ে সবটা বরবাদ ক'রে দেবে—বারে বারে এ-ধাষ্টামো আমি সহ্য করতে রাজী নই। যে মরবে আপনার দোষে, কী করবে তার হরিহর দাসে! মরার ইচ্ছে থাকে স্বচ্ছন্দে মরোগে যাও, তবে তার মধ্যে আর আমাকে জড়িও না!'

সাধু তখন তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু না-যাওয়ার কথা কিছু বলল না।

হেমন্ত ভেবেছিল যে, এই কঠিন কথার পর সাধু যাওয়া স্থগিত রাখবে। ভাইয়ের

শরীর কেমন আছে একখানা এক পয়সার পোস্ট-কার্ড লিখলেই জানা যায়। তার জন্য দেশে যাওয়ার কোন দরকার নেই, সেজন্যে যাচ্ছেও না। নিতান্ত মরণদশায় ধরেছে বলেই পতঙ্গের মতো মৃত্যু-আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কর্তব্যবোধে কথাটা মনোরমাকেও বলল একবার। মনোরমা মাথা নিচু ক'রে মেঝেতে পায়ের নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে জবাব দিল, 'কী জানি কি বুঝছে! আমিও তো তাই বলছিলুম—মিছিমিছি এত কাণ্ড ক'রে হুড়তে-পুড়তে যাওয়ার কি দরকার! স্বপন তো কত কি দেখছে লোকে!'

ওর কথা বলার ধরনে আর নিরুদ্বেগ গলার আওয়াজেই বোঝা গেল যে, এ-যাওয়াতে ওর সায় আছে। কে জানে সবসুদ্ধ চলে যাওয়ারই ভূমিকা কিনা! সাধুচরণ না ফিরলে জ্যাঠাইমা মনোরমাকে নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবেন, অথবা ভালয় ভালয় পাঠিয়েই দেবেন।···

তাতে কোন আপত্তিও ছিল না—কিন্তু ঐ ছেলেটা। গৌরটা যে ওকে পেয়ে বসেছে। মনোরমাকে তাড়ালে ওকেও ছেড়ে দিতে হয়, তাতে তেমন রাজী নয় হেমন্ত।

॥ ৬ ॥

সাধুচরণ সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও এল না।

তার পরেও বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, না এল মানুষটা, না এল তার কোন খবর। কিন্তু মনোরমা যেরকম নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত—তাতে মনে হয় সাধু যে আর আসবে না, অন্তত এখন কিছুদিন আসবে না, সে তা বিলক্ষণ জানে।

হেমন্তও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করল না এ নিয়ে—মনোরমাকেও কিছু বলল না, যেন সাধুচরণ বলে কেউ এখানে ছিল না, থাকার কথাও নেই—এইভাবে চলতে লাগল। একবার ওর নামও উচ্চারণ করল না।

দিন সাত-আট পরে একদিন দুপুর নাগাদ—সাধুচরণ নয়—আর এক মূর্তি দেখা দিল।

সাধুর ভাই নিমাইচরণ।

বিস্মিত হেমন্ত 'কে' বা 'কী চাই' প্রশ্ন করবার আগেই মনোরমা 'ওমা, এ যে ঠাকুরপো!' বলে ঘোমটা টেনে দিল এবং আগন্তুক ছেলেটি একেবারে ঠাকুর-প্রণামের মতো হেমন্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকাল।

উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে। ঠিক হরিচরণ বা সাধুচরণের ছাঁচ নয়—তবু চেহারা ও মুখের ধাঁচে ও-বংশের আদল আছে পুরো পুরি! বরং একে দেখে, আকারে-প্রকারে ছোটভাই শিবুর কথাও মনে পড়ে। তার মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, উস্‌কো-খুস্‌কো রুক্ষ—এর সে জায়গায় তৈলসিক্ত বিপুল টেরি। আর বিড়ি খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই ঠোঁট ও দাঁত কালো।

নিমাইচরণ অমায়িক হাসির সঙ্গে বললে, 'আমি নিমাইচরণ জ্যাঠাইমা, সাধু আমার দাদা, বললে বিশ্বাস যাবেন না—আপন বড় ভাই।'

হেমন্ত ততক্ষণে প্রাথমিক বিস্ময় সামলে নিয়েছে। নিরাসক্ত-ভাবে জবাব দিলে 'অ, তা হবে।···তা এখানে কি মনে ক'রে? আমি তো ডাকি নি!'

এ-নিরাসক্তি গায়ে মাখল না নিমাইচরণ, আত্মীয়তার সুরে বলল, 'দাদা—মানে, সেখানে গিয়ে খুব অত্যোচার চালাচ্ছে। পান্তাভাত, ডাল-চচ্চড়ি, তেলেভাজা, পঁ্যাজের বড়া—যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। বলে কি, বলে মরব তো জানা কথাই, তাহলে আর জেলখানায় লপ্‌সি খেয়ে মরি কেন!···তার ফল যা হবার তাই হয়েছে—হাত-পা ফুলে ঢোল। কাল থেকে রক্ত-পাইখানা রক্তপেচ্ছাপ শুরু হয়েছে!'

আবারও সেই শীতল কঠিন কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এছাড়া কোন কাজের কথা যদি থাকে, বলে চলে যাও। আমার অনেক কাজ আছে। অকারণ ভ্যাজ-ভ্যাজানি শোনার সময় নেই। বৌমাকে যদি নিয়ে যাওয়ার মতলব থাকে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই। তার যাবার ইচ্ছে থাকলেই চলে যেতে পারে।'

থতমত খেয়ে গেল নিমাইচরণ। আমতা আমতা ক'রে মাথাটাথা চুলকে বলল, 'আপনি—মানে আপনি হুট্‌ ক'রে ছেড়ে দিলেন কেন? কী রকম পাজী জানেন না? ওকে ছাড়াটাই ঠিক হয় নি আপনার।'

'ধরেই বা রাখব কেন? আমার কি গরজ? আমি এরে-বেরে তাকে আনতেও যাই নি, সে এখানে থেকে আমার কোঠাবালাখানাও তুলে দিচ্ছে না। নিজের ইচ্ছেতে এসেছে, নিজের ইচ্ছেতে চলে গেছে।···ব্যস্‌। ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে, আপদের শান্তি হয়েছে। আমি তোমাদের আত্মীয় বলে মানিও না, তার কথাও নেই। আমার অত টানও নেই, জোরও খাটাতে চাই না। এত কাণ্ড করবই বা কিসের জন্যে—নাকে-কান্নায় ভুলে ক'দিন ঠাঁই দিয়েছিলুম, সেইটেই আমার অন্যায় হয়ে গেছে!'

জ্যাঠাইয়ের কথাবার্তার যেন খেই ধরতে পারে না নিমাইচরণ। হতাশার ভঙ্গীতেই বলে, 'এত করলেন আপনি, প্রাণটা বাঁচাতে পারলেন না!'

'যার প্রাণ সে যদি বাঁচাতে না চায়, অপরের এত মাথা-ব্যথা কি? ছেলেমানুষও নয়, নাবালকও নয়। যা করছে বুঝেই করছে নিশ্চয়। যাক গে, তুমি এখন একা ফিরবে, না তোমার বৌদিকে নিয়ে ফিরবে?'

তারপর নিমাইচরণের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই চারুর মাকে ডেকে বলল, 'একে একটু জল খেতে দে চারুর মা। রুটি-পরোটা যা হয় ক'রে দিতে বল। ময়দা না থাকে রোলার আটা আছে, তাতেই করতে বলে দে। ভাত খেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস ক'রে জানিস! আর বৌমাকে এখানে আসতে বল।'

মনোরমা সামনে এসে নতমুখী হয়ে দাঁড়াতে বলল, 'সব শুনেছ তো?···এই জন্যেই তো পাঠিয়েছিলে! বিধবা হবার এত শখ—তা সেটার ব্যবস্থা তো শুনছি প্রায় হয়ে এসেছে। তা সে যাক গে, এখন যদি লোকদেখানো একবার যেতে চাও, অনায়াসে চলে যেতে পারো। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আবার চলে আসতে চাও, চলে এসো। কিন্তু এখানে যদি থাকতে হয়—এই শেষ যাওয়া, আর কখনই যাওয়া চলবে না। গেলে একেবারে যেতে হবে।···আর ছেলেকে নিয়েও যাওয়া চলবে না। সে গেলেও চিরকালের মতো যাওয়া—এ-দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলের ভার যদি আমাকে নিতে হয়, ঐ অস্বাস্থ্য আর কুশিক্ষার মধ্যে আমি ওকে যেতে দোব না। ওখানের মূলসুদ্ধ উপড়ে না

আনলে এখানে বাঁচাতে, বড় করতে পারব না।···দ্যাখো, যা ভাল মনে করো, বুঝে দেখে ঠিক করো।'

আর সেখানে দাঁড়াল না হেমন্ত। ভেতরে নিজের ঘরে চলে গেল—ওদের কথাবার্তা ও পরামর্শের সুযোগ দিয়ে।

কিছুক্ষণ গুজ-গুজ ক'রে নিমাইচরণের সঙ্গে কি পরামর্শ হল, তারপর গলা খাঁক্যারি দিয়ে নিমাইচরণ ঘরের মধ্যে ঢুকল।

'তাহলে ঐ আপনার কথাই রইল জ্যাঠাইমা। শুধু বৌদিকেই নিয়ে যাচ্ছি আমি। বলতে গেলে দাদার শেষ সময় তো—ওর একবার যাওয়া দরকার। গৌর এখানে থাক। যদি ভগবান নিয়েই নেন দাদাকে, তাহলে কাজকর্ম চুকে গেলে আবার বৌদিকে এনে আপনার পায়ে ফেলে দোব, আর—আশা নেই-ই অবিশ্যি, যদি একটু ভালর দিকে যায়ই —তাহলে তো দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছি। বাস্তবিক, আপনি যা করলেন—। ছেলেটা যদি মানুষ হয়, আপনার কাছে থাকলেই হবে। আর তো কেউই হল না মানুষ। আমাদের ওখানে যারা থাকবে তারা এমনি আমাদের মতো বাঁদরই তৈরী হবে এক-একটি। দাদার এধারে ভাগ্যিটা ভালই ছিল, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছিল—কিন্তু সুখভোগ করার বরাত আলাদা। নইলে এমন দুর্বুদ্ধিই বা হবে কেন?'

এই বলে আবারও হাঁটু গেড়ে বসে, ভক্তিভরে ওকে প্রণাম করল নিমাইচরণ।

হেমন্ত হাসল একটু। আর যা-ই হোক—নেশাখোর বখাটে ঠিকই, নির্বোধ নয় ছেলেটা। সম্ভবত ও-ই এতক্ষণ ধরে বলে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছে গৌরকে রেখে যাওয়ার প্রস্তাবে। আখেরটা নিজে বুঝেছে, বৌদিকেও বুঝিয়েছে। নইলে এই কঠিন শর্তে মনোরমার রাজী হবার কথা নয়।

তখনই ভাত খেয়ে নিয়ে ওরা দু'জনে রওনা হয়ে গেল।

চিঠি এল দিন-কয়েক পরেই।

একখানা নয়, দু'খানা।

একটি লিখেছে নিমাইচরণ, সম্ভবত নিজেই লিখেছে, কারণ হাতের লেখা দুষ্পাঠ্য—হরফ পড়াও যায় না সব—এত আঁকাবাঁকা—আর বানান ভুলে প্রায় দুর্বোধ্য।

তাতে শুধু সাধুচরণের মৃত্যু-সংবাদটুকুই দেওয়া হয়েছে। ওরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই শ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, হুঁশও ছিল না। ওরা যাওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেই বৌদিকে নিয়ে সে চলে আসবে। পরম পূজনীয়া জ্যাঠাইমার শ্রীচরণ দর্শনের জন্যে তাদের উভয়ের প্রাণই ব্যাকুল হয়েছে··· ইত্যাদি।

দ্বিতীয় চিঠিটা লিখিয়েছেন হেমন্তর মেজজা।

মানে তাঁর জবানীতেই লেখা, সম্ভবত পাড়ার কোন ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে লিখিয়েছেন, হাতের লেখা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং বানান-ভুলও কম।

তিনি প্রথমেই ডাইনী পিশাচী রাক্ষসী প্রভৃতি প্রীতিবর্ধক ও শ্রুতিসুখকর সম্বোধন জানিয়ে লিখছেন: 'পরে লিখি, এখনও কি এ-বংশের রক্তভক্ষণ করিয়া তোমার সাধ

মেটে নাই? তুমি কি সেই সাতশো রাক্ষসীর ঝাড় হইতে আসিয়াছ, তোমার শ্বশুর-বংশের এই ভিটাকে শ্মশান না করিয়া ছাড়িবে না? আরও কত জোয়ান ছেলের রক্ত খাইতে চাও তুমি? আরও কতগুলি মানুষ খাইলে তোমার ক্ষুধা মেটে? এখনও বড় ক্ষুধা—তাই বুঝি আর একটাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছ জিওল মাছের মতো?…ছিঃ! অতিবড় পাষাণ-হৃদয়ও কোন মানুষের মৃত্যুকালে তাহার একমাত্র পুত্রকে দূরে সরাইয়া রাখে না।…আহা, বাছার প্রাণটা বুঝি ঐটুকু আশাতেই, একবার ছেলের মুখটা দেখিবে বলিয়া কোনমতে কণ্ঠনালীর কাছে ধুক-ধুক করিতেছিল। না জানি বাছা আমার কি গভীর দুঃখ লইয়াই প্রাণত্যাগ করিল! কেন, একবার শেষ দেখাটুকু দেখিতে দিতেও এত কি আপত্তি হইল তোমার? তোমার মুখের গ্রাস তো আর কেহ কাড়িয়া লইতেছিল না!' ইত্যাদি ইত্যাদি—

এসব ভাষা আর হেমন্তকে আঘাত করে না।

সামনে বললেও না, চিঠিতে লিখলেও না। সে পড়ে হেসে চিঠিটা একপাশে ফেলে দেয়, চারুর মাকে বলে, 'কুড়িয়ে রেখে দে, কাল আমার গৌরের দুধ গরম করতে লাগবে!'

তারপর গৌরকে বুকে তুলে নাচাতে নাচাতে বলে, 'কী রে ছোঁড়া, তোকে নাকি আমি জীইয়ে রেখেছি—পরে খাব বলে? কি বলিস তুই, সত্যি? বল না! আ খেলে যা, দেখছিস এসব কত কি শক্ত শক্ত কথা হচ্ছে, ছোঁড়া হেসেই গেল। বড় মজা পেয়ে গেছ না, বড্ড আদর! আবার নাচন হচ্ছে আমার বুকের ওপর! এটা তোমার নাচার জায়গা? এ কি পাথরের দেহ পেয়েছ? অবিশ্যি তোর আর এক দিদা তাই বলেছে।…নে নাম, ঢের হয়েছে।'

বলে, কিন্তু নামাতে পারে না, উল্টে বুকে চেপে ধরে অজস্র চুমো খায় ছেলেটাকে।

আরও দিন বারো-তেরো পরে নিমাইচরণ ও মনোরমা ফিরে এল।

যতই রাগ থাক মনোরমার ওপর, ঐটুকু মেয়ের বিধবার বেশ দেখে চোখ ফেটে জল এসে গেল হেমন্তর। নিমাইয়ের মাথা কামানো, সম্ভবত সে-ই শ্রাদ্ধ করেছে দাদার।

'এই এনে দিলুম জ্যাঠাইমা তোমার বৌকে। আর এই আমিও। আজ থেকে আমাকেও তোমার সন্তান বলে জেনো। মারো কাটো ফাঁসি দাও, লাথি মারো—একটি টুঁ শব্দ করব না। সে ছেলে আমি নই। তোমার কোন হুকুম যদি কোনদিন গরমান্যি যাই তো আমার এই জিব তুমি নিজে হাতে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দিও, আমার নামে কুকুর পুষো।'

উদ্গত অশ্রু অতিকষ্টে সংযত ক'রে রুদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে হেমন্ত বলে, 'না বাবা, ঢের হয়েছে। আর সন্তানে কাজ নেই আমার। এমনিতেই রাক্কুসী ডাইনী পিশাচী শুনতে শুনতে কান পচে গেল, আবার কতকগুলোকে জড়িয়ে নিমিত্তের ভাগী হতে চাই নে।… আর, এই বলছি, সত্যিই যদি তোমাদের ধারণা হয়ে থাকে যে, আমি বসে বসে শ্বশুরকুলের সব ছেলে খাচ্ছি, তাহলে এখনও সময় আছে, গৌরকে নিয়ে চলে যাও। যা হবার—দেশে গিয়ে হোক—আমি আর দুর্নামের ভাগী হতে চাই না।'

নিমাইচরণ যেন নিমেষে জ্বলে উঠল।

'ঐ মেজ জ্যাঠাইটা লিখেছে বুঝি! কী এক চিঠি লেখাচ্ছিল বটে, আমি দেখিচি। হিংসে, হিংসে—রীষ; বুঝলে? ও আর কিছু নয়—লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে সব বুকে রীষের জ্বালা।...ঐ যে যাওয়া-মাত্তর শুনেছে খোকাকে তুমি ছাড় নি, ওখেনে গেলে শরীর খারাপ হবে বলে ধরে রেখেছ—অমনি মাথা ঘুরে গেছে সবাইকার। বলে, তবে ও তো পুষ্যি নিয়ে নিলে, ছেলে ক'রে নিলে ওটাকে। যথাসব্বস্ব যা কিছু আছে—পয়সা কড়ি—সব তো তাহলে ও পাবে। বাস, আর যায় কোথা, ঘরে ঘরে কপালচাপড়ানি শুরু হয়ে গেল। বলে কি, আমাদের ঘরে সব এমন চাঁদপানা ছেলে থাকতে কী দেখে ঐ কালো ভূতকে পছন্দ করলে! আবার বলে কি আমাদের নাতি-গুলোনকে চল গিয়ে একবার দেখিয়ে আসি, যদি কারুক্কে চোখে লাগে।...বুঝলে এবার রীষের জ্বালাটা কী প্রেকার!'

তারপর চিঠির বয়ানটা সব শুনে বললে, 'ইঃ রে! দেখবার জন্যেই পেরান ধুক-ধুক করছিল!...হুঁশজ্ঞান ছিল কিনা দাদার! আমরা য্যাখন গিয়ে পেঁছিলুম ত্যাখন কি কিছু বোঝার মতো আবস্তা ছিল নাকি দাদার? এই যে আমরা গেছি—তাই কি টের পেয়ে গেল, না চোখই খুলল একবার। ত্যাখনই তো হয়ে এয়েচে। তারপর যতটুকু বেঁচে ছিল সে তো নামে-মাত্তর।...তার আগে তো শুনলুম যা, মাথাটায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ঘোলাঘোলা বুঝছিল সব।...ও তুমি ওসব ছেঁদো কথায় কান দিও নি জ্যাঠাইমা, তুমি যদি একটা ছত্তরও জবাব দাও, তাহলেই হুড় হুড় ক'রে এসে পড়বে সব—দলকে দল!'

হেমন্ত আর কথা বাড়াল না।

এসব নোংরা কথা আলোচনা করার মতো অবস্থা নয় তার। ঐ যে থান-পরা শুধু-হাত সাশ্রুনতমুখী মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—ও যেন তারই দুর্ভাগ্য নতুন ক'রে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে—নতুন রূপ পরিগ্রহ ক'রে। একই দুর্ভাগ্য, একই ইতিহাস মনে হচ্ছে। ওর ঐ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া চোখের জলে নিজেরই সেই এক বিগত দিনের অসহায় অবস্থা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সে দু'হাত বাড়িয়ে মনোরমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল।

॥ ৭ ॥

এই যাত্রাতেই নিমাইচরণের থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার—কিন্তু হেমন্ত সে সাধে বাদ সাধল। দুটোদিন অপেক্ষা ক'রে থেকে, নিজে থেকে চলে যাওয়ার অবসর দিয়ে দেখল নিমাই সে দিক-দিয়েই যাচ্ছে না, এবং খাওয়া-দাওয়ার এত জুৎ—হলই বা নিরিমিষ খাওয়া—ফেলে তার আশু যাওয়ার কোন ইচ্ছেও নেই, তখন, তিন দিনের দিন সকালে নোটিশ দিল।

'তোমার বৌদিকে পেঁছে দেওয়া হয়ে গেছে, তুমি বাবা এবার সরে পড়ো। যদি কখনও দরকার মনে করি, ডেকে পাঠাব।'

একটু অবাক হয়ে যায় বৈকি নিমাইচরণ। থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলে, 'না, মানে আপনাকে এই বয়সে দেখা-শুনো করাও তো একটা কর্তব্য। তাছাড়া অনাথ ভাইপোটাকেও ছেড়ে যেতে ঠিক যেন প্রাণ চায় না। তাই ভাবছিলুম যে— আপনার শ্রীচরণেই যদি জীবনের বাকী দিন ক'টা—'

হেমন্ত ওর কথা 'শ্রী' ফাঁদাতেই থামিয়ে দিলে একরকম, 'এই বয়সে এখনও আমি তোমার মতো অনেক অপোগণ্ডকে দেখাশুনো করার হিম্মৎ রাখি। আমার কথা ভেবে তোমাকে অস্থির হতে হবে না। তাছাড়াও—আমাকে দেখবার ঢের লোক আছে। বোবা ছেলে আছে অনেকগুলি, তারা তোমার মতো বাজে বকে না, রোজগার ক'রে খাওয়ায়। আর অনাথ ভাইপোকে যদি মানুষ করার ক্ষমতা থাকে, তার মা যদি চায়—নিয়ে চলে যাও, চোখ-ছাড়া করতে হবে না। আমাকে যদি মানুষ করতে হয় তবে তোমাকে বাদ দিয়েই করব।—তোমার জীবনেরও এখনও অনেকদিন বাকী—আমার শ্রীচরণ এখন থেকে তোমার ভার বইতে রাজী নয়।'

নিমাইচরণ এত কথাতেও ক্রুদ্ধ হল না—অন্তত তার আচরণে সে ক্রোধ প্রকাশ পেল না—তর্ক করল না, ব্যস্ত হয়ে উঠে নিজের আন্তরিকতা প্রমাণ করতে চাইল না; এক রকমের করুণ বিষণ্ণ মুখে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল এবং দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরই—আবারও জ্যাঠাইমাকে একটা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, গোরকে চুমু খেয়ে বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

শুধু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসব বাপু তাইড়ে দিও না। আসব, আবার চলে যাব তোমাদের দেখেই।'

এর পর আর মনে মনে তারিফ না ক'রে উপায় থাকে না ছেলেটাকে।...

মনোরমার আদর-যত্নের কোন ত্রুটি রইল না।

নিজের প্রথম বৈধব্যের অসহায় দুঃখ-দিনগুলি মনে ক'রে এই মেয়েটার সমস্ত বেদনা যথাসাধ্য মুছে নেওয়ার জন্যে কৃত-সংকল্প হেমন্ত।

ওর স্বভাবের অসংখ্য দোষত্রুটি, স্বামীর সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার—সব ভুলে ওকে বুকে টেনে নিল সে, সেগুলোকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার দোষ বলে ধরে নিয়ে ক্ষমা করল। সেইসঙ্গে এ অবস্থায় যতটা সম্ভব—ওর অভাবগুলো পূরণের চেষ্টা করতে লাগল। মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেটার ক্ষতি দুধ দই ঘি দিয়ে পূরণের ব্যবস্থা করল। একাদশীর দিন জোর ক'রে সামনে বসিয়ে দুধ সন্দেশ খাওয়াল। বলল, 'পাপ হয় আমার হবে মা, নরকে যেতে হয় তো আমিই যাব। তুমি খাও, আমি বলছি এতে কোন দোষ হবে না।'

এছাড়াও একটা দুঃসাহসিক কাজ করল। যে থান দু'খানা সঙ্গে এনেছিল মনোরমা, সে দুটো চারুর মাকে বিলিয়ে দিয়ে নরুন পাড় ধুতি আনাল এবং সামনের হাতে পরার জন্য সেকরা ডেকে দু'গাছা চওড়া চুড়ি গড়িয়ে দিল, নিজের একটা সরু হারও বার ক'রে দিল বাক্স থেকে, বলল, 'ছেলের মায়ের শুধু-গলায় জল খেতে নেই, এটা পরে থেকো।'

হারে তত আপত্তি করার কারণ নেই, নরুন পাড় ধুতি ও চুড়ি পরতে মনোরমা নিজেই আপত্তি করেছিল; ভয়ে ভয়েই অবশ্য—ভয় তার দু'দিকেই, একদিকে জ্যাঠাইমা,

প্রতিবাদ করলে হয়ত জবলে উঠবেন, আর একদিকে—বোধ করি এই ভয়টাই প্রবলতর—সামাজিক দুর্নামের আশঙ্কা। সে বলেছিল, 'দেশের দিকে যদি জানতে পারে খুব নিন্দে হবে মা। বলবে বেবিশ্যে হয়ে গেছি। ভদ্দরলোকের—বামুনের ঘরে পেড়ে-কাপড় কেউ পরে না ওঁদিকে, হাতেও কিছু রাখে না।'

হেমন্ত সে আপত্তি কানে তোলে নি। বলেছিল, 'দেশের দিকে দুর্নাম হয় হোক, তুমি সেখানে যাচ্ছও না, সে বদনাম কানেও আসছে না। লোকে ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনী বললে রাজার মায়ের তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তুমি শহরে আছ, সেখানকার চালে চললেই হল, সেখানে না কেউ নিন্দে করে, সেইটেই দেখা দরকার। কলকাতায় এখন আস্তে আস্তে চল হচ্ছে, দু-একটা বেশ নামকরা লোকের বাড়িতে দেখে এসেছি নিজের চোখে, অল্পবয়সী বোয়েরা বিধবা হলে চুড়ি কি বালা একরকম কিছু হাতে রাখিয়ে দেয়—নরুনপাড় ধুতিও।···তাছাড়া আমার বাড়িতে কে-ই বা আসছে, কে-ই বা গিয়ে নিন্দে করবে তোমার!'

এর পর আর কোন কথা বলে নি মনোরমা।

সে তো পরতেই চায় এসব—পরার সাধ তো কিছুই মেটে নি। তার বাপের বাড়ি থেকে যা দু-এক ভরি সোনা দিয়েছিল তা বহু দিনই বেচে খেয়ে বসেছিল সাধুচরণ, শেষ যেটুকু ছিল—গলায় সরু গোট হার আর দু'গাছা পেটি—তাও বেচে শ্রাদ্ধ হয়েছে। কিছু কোথাও নেই বলেই আরও, অমন সর্ব-আভরণরিক্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।···

খাওয়া-পরা কোন দিকেই যত্নের কোন ত্রুটি রইল না, অবশ্য বিধবা—বিশেষ ব্রাহ্মণের বিধবার পক্ষে যতটা সম্ভব,—তার ফলে মনোরমার স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠল আগের চেয়ে। যৌবন যেন এতদিনে পরিপূর্ণতা লাভ করে ওর দেহে। আগেকার সেই জবুথবু জড়ভরত হয়ে থাকা মলিন চেহারা ঘুচে গিয়ে যেন নতুন মানুষ বেরিয়ে এল—কালো রঙের ওপরই একটা শ্রী আর লাবণ্য ফুটে উঠল।

তবু মনোরমার মনে সুখ নেই। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পাড়াগাঁয়ের বৌ—তাদের খাওয়া-দাওয়ার ধারণা আলাদা। গরমের দিনে তারা পান্তা খেতে চায়, গুড় তেঁতুল মেখে ভাত খাওয়ার লোভ; মুসুর ডাল মাসকলাইয়ের ডাল পুঁই শাক—এসব এখানে এসেই শুনছে বামুনের বিধবাদের পক্ষে অখাদ্য, দেশে এসবের বাছ-বিচার নেই। এগুলোও তার খেতে ইচ্ছে করে, আরও হয়ত খাওয়া নিষেধ বলেই এত প্রবল লোভ তার। পান্তা ভাত খেতে দেয় না হেমন্ত, বলে, 'ইচ্ছে হয় টাটকা ভাতে জল ঢেলে পরিষ্টি ক'রে খাও।' কিন্তু সে পান্তায় মন ভরে না, আমলাটা গন্ধ ছাড়ে না তা থেকে। মুড়িও আগে খেতে দিত না, ওর ঐকান্তিক আকুতি বুঝে পরে অনুমতি দিয়েছে; শুকনো মুড়ি তাও, বলে, 'জল লাগলেই সকড়ি হয়ে যায় মুড়ি-চিঁড়ে—সে খেলে আর সেদিন ভাত খাওয়া চলবে না। এমন কি শসার সঙ্গেও খাওয়া চলবে না।'

সবচেয়ে কষ্ট হয় ওর বেগুনি-ফুলুরির জন্যে, সেটা একেবারে নিষিদ্ধ এ বাড়িতে। মনোরমার জন্যেই মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে দিয়ে তৈরী করায় আজকাল, কিন্তু তাতে মনোরমার মন ভরে না। বলে, 'বাজারের বেগুনি-ফুলুরিতে যে সুন্দর গন্ধ আর সোয়াদ—এতে তা নেই।'

হেমন্ত বলে, 'ওদের যত রাজ্যের ভেজাল তেল—খুঁজে খুঁজে সস্তায় কিনে এনে ঐসব ছাইভস্ম ভাজে। আর সেও খুব দোষ দেওয়া যায় না, কারবার করতে বসেছে ওরা, লাভটাই দেখবে বৈকি।...আর তা ছাড়া সব বেগুনির দোকানেই পিঁয়াজের বড়া ভাজে—ছোঁয়া-নেপা একসা—জেনে-শুনে তোমাকে খেতে দিই কি ক'রে?'

অগত্যা চুপ ক'রে থাকে মনোরমা, সেই সুদূর সুদুর্লভ অখাদ্য বস্তুগুলির কথা মনে ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সবচেয়ে যেটা অপছন্দ ওর, বাড়ি থেকে কোথাও বেরুতে পারে না।

কখনও কখনও, জ্যাঠাইমা যখন গাড়ি ক'রে বাইরে যান, বাড়ি দেখতে কি বাড়ি সারাতে, কি অন্য কোন বৈষয়িক কাজে উকিল-বাড়ি—তাও সব সময় নয়—সঙ্গে নিয়ে যান হয়ত। পালে-পার্বণে গঙ্গাস্নানেও নিয়ে যান সঙ্গে ক'রে, একদিন কালীঘাটেও নিয়ে গিয়েছিলেন—তবে এ যাওয়াতে তৃপ্তি হয় না। দেশে থাকতে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে অন্য বৌ-ঝিদের সঙ্গে গল্প করা, বড় জাঠশাশুড়ির ভাষায় 'থ্যাসড়া পাড়া'—কিংবা নির্জন দুপুরে বাগানে-বাগানে ঘুরে ডাঁশা কুল কি ডাঁশা পেয়ারা সংগ্রহ করা—মনে পড়ে ওর চোখে জল এসে যায়। ওর খুব ইচ্ছে করে—অন্তত আশ-পাশের কারও বাড়ি গিয়ে প্রাণভরে খানিকটা বকে আসে, কিন্তু সেখানেও হেমন্তর কড়া নিষেধ—'একা কারও বাড়ি যাবে না, আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে'—অমান্য ক'রে যেতে সাহসে কুলোয় না।

শুধু ছেলের মুখ চেয়েই পড়ে থাকা এখানে—এই জেলখানায়।

ছেলের আখেরের কথা ভেবেই।

নইলে মনোরমা এই ভাল খাওয়া-দাওয়ার তোয়াক্কা করত না।

লুচি জলখাবার, দশমীর রাত্রে ঘনদুধের সঙ্গে লুচি খাওয়া—এসবে অরুচি ধরে গেছে ওর। ওর চেয়ে গুড় তেঁতুল কি পুঁই-চচ্চড়ি কি সজনে-খাড়া ছেঁচকি দিয়ে পরিপাটি ভাত খাওয়া ঢের সুখের।

কী যে ওর দেওরের এই খাওয়ার ওপর এত লোভ তা বুঝতে পারে না মনোরমা। তবু মাছ-মাংস ডিম এসবগুলো সে বোঝে। আজকাল, সে বিধবা হয়ে আসবার পর থেকে কোন কারণেই মাছ আসে না বাড়িতে আর। তবু ছুটে ছুটে আসে নিমাই এই খাওয়ার লোভেই। কত কড়া কড়া কথা বলেন জ্যাঠাইমা, কি হেনস্তা না করেন প্রতিবারই। কুকুর বেড়ালের মতো 'দূর দূর' 'ছেই ছেই' করেন প্রায়—তবু ছুটে ছুটে আসবে আর পড়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ঘাড়-ধাক্কা দেবার মতো যখন করবেন শাশুড়ি, তখন বাড়ি ফিরবে।

লজ্জা-সরম একেবারেই নেই, এমন বেহায়া যদি দুটি দেখেছে কেউ! এই অপমান লাঞ্ছনার মধ্যেই রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা ফরমাশ করবে আর সেই খাওয়া খাবে বসে বসে অম্লান বদনে। ঘেন্নাপিত্তির কোন চিহ্নও নেই ওর।...

নিমাইচরণের এই সহ্য-গুণ, বিনয় ও 'নেটিপেটি' ভাবে হেমন্ত ভেতরে ভেতরে যে একটু নরম না হয়েছে তা নয়, কিন্তু ওকে এখানে থাকতে দেয় না অন্য কারণে।

মুখ-চোখের চেহারা ভাল নয় ওর। যে উগ্র লোলুপতা ও ক্ষুধার্ততা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে তার অর্থ বোঝে হেমন্ত, ভালভাবেই। ওদের বংশের দোষ এটা। অর্থের লোভ যত না হোক—এই বয়সেই নারীদেহ সম্বন্ধে লোভ অত্যন্ত প্রবল। এই যে এত হেনস্তা সহ্য ক'রেও পড়ে থাকে, সে কেবল খাওয়ার জন্যে নয়। সুখাদ্য-লুব্ধতাটা ওর এখানে পড়ে থাকার একটা ছুতো।

বিশেষ ক'রে বছরখানেক এখানে কাটার পর যখন সুখাদ্য ও সুনিয়মে মনোরমার দেহ পূর্ণতর হয়ে উঠেছে, সাধারণ শ্যামাঙ্গী গ্রাম্য মেয়ের চেহারাতে লাবণ্য সঞ্চার হয়েছে—তখন থেকে নিমাইয়ের ছোঁকছোঁকানিও যেন বেড়ে গেছে। এটা হেমন্তর দৃষ্টি এড়ায় নি। কতই বা বয়স ওর, দুজনে হয়ত এক বয়সীই হবে—এই বয়সে এতটা ক্ষুধা স্বাভাবিক নয়, এ ওদের বিশেষ রক্তের দোষ।

মনোরমা অতটা বোঝে না। তার এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনে একটি সমবয়সী —অল্পবয়সী ছেলের সাহচর্য ভাল লাগার কথা—তা যেমন ধরনেরই হোক না কেন। তাছাড়া সে এই ধরনের অশিক্ষিত বিড়িখাওয়া হ্যা-হ্যা ক'রে বেড়ানো ছেলে দেখতেই অভ্যস্ত। তাই জ্যাঠাইমার এই কুকুর-তাড়া করায় ক্ষুন্নই হয়।

কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। করার প্রয়োজন আছে তাও বোঝে না। এটাকে শ্বশুর বংশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিদ্বেষ বলেই মনে করে। হেমন্তও নিজে থেকে বলতে পারে না। সাবধান করতে গেলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে ব্যাপারটা। তবে এটা সে জানে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বোঝে—কোন যুবতী মেয়ের একটি অল্পবয়সী ছেলের সাহচর্যের প্রতি আকর্ষণ সাধারণ ভাল লাগার স্তরে থাকতে পারে না বেশী দিন, অতি দ্রুত গভীরতর গাঢ়তর ভাল লাগায় গিয়ে পেঁছিবে। মনোরমার মতো স্বাস্থ্যবতী বলিষ্ঠ গঠনের মেয়ের জৈবক্ষুধা অবশ্যই সাধুচরণকে দিয়ে মেটে নি, সে ক্ষুধা তার তৃপ্তির পথ খুঁজে বেড়াবেই।

কারণটা বুঝতে পারে না বলেই মনোরমা ক্ষুণ্ণ হয়, ক্ষুব্ধ হয়। আজকাল সে নিমাইচরণের আসার দিনগুলির দিকে চেয়ে বসে থাকে। আর কিছু না, একটু গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা। তার মতো অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের বোধগম্য আচরণ ও কথাবার্তা। জ্যাঠাইমার শাসন ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গণ্ডীকাটা ঊষর জীবন-মরুর মধ্যে দেওরের উপস্থিতিগুলোই যেন ছায়াশীতল স্নিগ্ধ মরূদ্যান।

এ অবস্থায় ভাল খাওয়া কি পরার লোভে—কী-ই বা ভাল তাই, মাছ বাদ দিয়ে খাওয়া আর শাড়ি গয়না বাদ দিয়ে পরাই বা কি মেয়েদের? সে সব তো ঘুচেপুচে গেছে চিরকালের মতো—সে কিছুতেই পড়ে থাকত না এখানে, পালিয়ে ঐ শ্বশুর-বাড়িতেই চলে যেত। যেখানে ধান সেদ্ধ ক'রে ক্ষার ঠেঙিয়ে খাড়া-ছেঁচকি দিয়ে ভাত খাওয়াও ঢের ভাল, ঢের বেশী কাম্য। সেটা স্বাভাবিক জীবন, সেইটেতেই অভ্যস্ত সে। সেখানকার মানুষগুলো সাধারণ, ওর পরিচিত। দিন-রাত কলহকেজিয়া করে, পরের ভাল দেখলে তাদের বুক ফাটে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ—তবু রক্ত-মাংসের মানুষ তারা। সেখানে এই দেওর থাকে, গল্প করার লোক, খুনসুটি করার লোক।

যেতে পারে না—শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে। ছেলেটাকে জ্যাঠাইমা যেন হাতের তেলোতে রেখেছেন। তাকে মা বলতে শিখিয়েছেন নিজেই। মনোরমাকে ডাকে বৌমা বলে। ভাল সাহেবী ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তাদের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। সেই সব খরচ যোগান জ্যাঠাইমা, সেখানে উপযুক্ত দামী পোশাক-আশাক সব। তাতেই একটা স্বপ্ন দেখতে বাধে না যে, এই বিপুল ঐশ্বর্যের একদিন তার ছেলেই মালিক হবে, রাজা ছেলের মা হবে সে। সেদিন এসব শাসন কড়াকড়ি কিছু থাকবে না, যা খুশি তাই করতে পারবে।

ঐশ্বর্য যে ঠিক কত তা জানে না, তবে অনেক যে—এটা ধারণা করতে পারে। মাঝে মাঝে বুড়ো পূর্ণবাবু আসেন, ওদের সরিয়ে দিয়ে কি সব হিসেব-নিকেশ হয়, খাতাপত্র কত কি বেরোয়, টাকাও গোনাগাঁথা হয়। জ্যাঠাইমা একটা কারবার করেন, সে জানে—বাড়ি কেনাবেচা, জমি কিনে বাড়ি তৈরী করা। আগে নাকি খুব জোর ছিল ব্যবসা, এখন বিলেতে না কোথায় কি তুমুল লড়াই হয়ে গেল ক' বছর ধরে—সে লড়াই থামবার পর বাজার নাকি খুব মন্দা যাচ্ছে, দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে—কারবার আর তত জোর চলছে না। দু-একটা লেনদেনে নাকি কিছু লোকসানও খেয়েছেন। তৎসত্ত্বেও এখনও অনেক আছে। মধ্যে মধ্যে সাবধানে কিছু কিছু বেচাকেনাও করেন, তাছাড়া তিন-চারটে বাড়ির ভাড়াও তো আসে, সেও বড় কম নয়।

এই জন্যেই দাঁতে দাঁত চেপে সুখে থাকার এই কষ্ট সহ্য করে মনোরমা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে খুবই কষ্ট হয়। এক-আধবার—যখন জ্যাঠাইমা কাজে একা কোথাও যান—তখন নতুন ঝিয়ের প্রায় হাতে-পায়ে ধরে খোশামোদ ক'রে একটু-আধটু বেরিয়ে পড়ে সে। তবু ভাগ্যিস চারুর মা নেই, শরীর খারাপ বলে দেশে চলে গেছে, দেশেই থাকবে—জ্যাঠাইমা মাসে তিন টাকা ক'রে পাঠান তাতেই চলে যায় নাকি তার, সেদিক দিয়ে তবু সোয়াস্তি খানিকটা। চারুর মার বড় কড়া নজর ছিল, আর সে বড় বেশী মনিবের পোঁ-ধরা। সে থাকতে একটু কিছু করার উপায় ছিল না শাশুড়ির হুকুম না নিয়ে। তাহলেই আগে গিয়ে বলে দেবে অমনি কুট ক'রে। এ নতুন ঝিয়ের তবু দয়ামায়া আছে। জ্যাঠাইমারই খরচের বাক্স থেকে দু-এক পয়সা ক'রে সরানো সিকিটা-আধুলিটা দিয়ে তাকে হাত করেছে মনোরমা। এটা-ওটা আনিয়ে খেতেও পারে জ্যাঠাইমার অনুপস্থিতিতে, বাইরেও বেরোতে পারে। অবশ্য কারও বাড়ি যেতে ভরসা হয় না—কে কখন কথায় কথায় বলে দেবে ওঁকে—শুধুই একটু বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি-ঘোড়া দেখা যায়।

তবু তাতেই যেন খানিকটা মুক্তি।

আর শাশুড়িকে ফাঁকি দেবার একটা আনন্দ।

॥ ৮ ॥

সে বছর শেষা শীতে পূর্ণবাবু খুব অসুখে পড়লেন।

প্রথমটা অতকিছু বোঝা যায় নি—কিন্তু সামান্য তিন-চারদিনেই রোগটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়াল। একটু অত্যাচারও হয়ে গিয়েছিল, তবে সে এমন কিছু নয়। বাইরে থেকে এসে গরম বোধ হওয়াতে হঠাৎ জামা-টামা সব খুলে ফেলেন, মায় গেঞ্জি পর্যন্ত। ঘামের ওপরই ঢকঢক ক'রে ঠাণ্ডা জল খান খানিকটা। তাতেই—প্রথমে একটু সর্দি হল, সঙ্গে জ্বর—দেখতে দেখতে সেই সাধারণ সর্দিজ্বরই প্রবল আকার ধারণ করল, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়লেন একেবারে।

ডাক্তার বন্ধুরা এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, 'নিউমোনিয়া, বুকের অবস্থা খারাপ, বাঁচার আশা কম।'

এ রোগে চিকিৎসার চেয়ে শুশ্রূষা বেশী দরকার। পূর্ণবাবুর স্ত্রীও বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ছেলের বৌ চিররুগ্ন, মেয়েরা সবাই বিদেশে। এ অবস্থায় কে দেখে সে-ই সমস্যা। ডাক্তাররা বললেন, 'ভাল নার্স রাখা দরকার, মেডিকেল কলেজে খবর দিন, তারাই ভাল লোক পাঠাবে।'

ওঁরা নিজেরাই খবর পাঠাচ্ছিলেন মেডিকেল কলেজে, পূর্ণবাবুর স্ত্রী শরৎসুন্দরী নিষেধ করলেন। বললেন, 'ভাল নার্স আমার সন্ধানে আছে, আমি নিয়ে আসছি!'

পূর্ণবাবুর এক ছাত্র সম্প্রতি খুব নাম করেছেন, বিলেতফেরৎ ডাক্তার—তিনিই অগ্রণী হয়ে দেখছিলেন, তিনি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন।

'আপনি আর কেন কষ্ট করবেন, বলুন না কে, কাকে ডাকতে হবে, আমরাই খবর পাঠাচ্ছি।'

শরৎসুন্দরী একটু ম্লান হেসে ঘাড় নাড়লেন। সে হাসি একটু রহস্যময়ও—মর্মান্তিক কোন কৌতুকের হাসি—অন্তত বিধানবাবুর তাই মনে হল।

কথাটা শরৎসুন্দরী ক'দিন ধরেই ভাবছেন, পূর্ণবাবু এই অসুখে পড়া থেকেই।

স্বামীর মন কোথায় পড়ে আছে—তা তিনি জানেন। আগে বিদ্বেষ ছিল বৈকি, বিছের জ্বালার মতো সে বিদ্বেষ ঐ বিশেষ ব্যক্তিটি সম্বন্ধেই।

এদিক-ওদিকের নানা প্রণয়-ঘটনা তিনি জানতেন—দীর্ঘকাল ধরেই জানেন, ভাল ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই।

সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর—পূর্ণবাবুর বয়স তখন ষোল। খেলাধুলো ক'রে বেড়াতেন যখন তখনকার কথা আলাদা কিন্তু ষোল-সতেরো বছর বয়সে—যখন স্বামী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, তখনই বুঝলেন আর যাই হোক—স্বামীর জীবনে তিনি প্রথম রমণী নন, একমাত্র তো ননই।

তারপর বহু এসেছে, গেছে। এতে কতকটা তাঁরা অভ্যস্তও ছিলেন সেকালে। স্বামীকে একা পাওয়া প্রায় কারও অদৃষ্টেই ঘটত না। তবু তো ইনি আর একটা কি দুটো বিয়ে ক'রে সতীনের প্রতিষ্ঠা করেন নি বাড়িতে।

কিন্তু সে-সব ছুটকো-ছাটকা ক্ষণস্থায়িনীদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও হেমন্ত সম্বন্ধে থাকতে পারেন নি। এটা যে শুধুই দৈহিক আকর্ষণ নয়—গভীর ভালবাসা—তা তিনি স্ত্রীর মন দিয়ে বুঝেছিলেন। স্বামীপ্রেমের সুরে বাঁধা হৃদয়ের তারে সে আঘাত ধরা পড়েছিল—যেমন বহুদূরবর্তী ভূমিকম্পের সংবাদ সিস্‌মোগ্রাফে ধরা পড়ে।

রাগ করেছেন, ঝগড়া করেছেন, অশান্তি করেছেন—কিন্তু জেদী ও কর্তৃত্ব-সচেতন পূর্ণবাবুকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি, তিনিই বরং স্ত্রীকে শাসন ক'রে দিয়েছেন। বেশী বিরক্ত করলে সরিয়ে দিয়েছেন বা নিজেই সরে গেছেন, কিছুদিন অন্যত্র গিয়ে বাস করেছেন।

তারপর, কমলাক্ষ-পর্বেও আর একদফা কান্নাকাটি কলহবিবাদ করে স্বামীকে সতর্ক সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন—তবে তার আর প্রয়োজন রইল না।···তারপর তো দীর্ঘকাল সম্পর্কই ছিল না কোন, যাওয়া-আসা মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু শরৎসুন্দরী নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি—স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কী হাহাকার আর কি বিপুল তৃষ্ণা তাঁর অন্তরে তখনও।

বুঝেছেন, সেই প্রথম যে, ইতিমধ্যে ঐ অবাঞ্ছিত বাইরের স্ত্রীলোকটি কখন তাঁর স্বামীর মনের অধিকাংশ অধিকার ক'রে নিয়েছে—তিনি তা টের পান নি। সেখানে আজ শরৎ অতিরিক্ত, একটা দায় মাত্র।

এটা প্রচন্ড আঘাত। এই আঘাতেই তিনি আরও বুড়ো, আরও অথর্ব হয়ে পড়েছেন—স্বামীর চেয়ে ঢের বেশী। বেদনার সেই দুঃসহ বোঝাই এত দ্রুত তাঁকে অন্তরে বাইরে পঙ্গু করে দিয়েছে।

তার পরও সে যন্ত্রণা কমে নি।

দৈহিক সম্পর্ক আর নেই, থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতেও কোন সান্ত্বনা পান নি শরৎসুন্দরী। আগেকার সকাম তৃষ্ণার প্রবল তরঙ্গ আবেগোর্মি মিলিয়ে গেছে ঠিকই—এখন তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের গভীরতায় প্রবেশ করেছে, পূর্ণবাবুর রূপজ আসক্তি এখন সুগভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে।

পরস্পরের প্রতি এই নির্ভরতা, পরস্পরের সাহচর্যে—সুধুমাত্র সান্নিধ্যেই প্রীতি, তৃপ্তি বোধ—এ প্রেম তিনি স্বামীর কাছ থেকে কোন দিনই পান নি, এটা ভুলতে পারেন কৈ ?···

তবু, আজ স্বামীর এই জীবন-সংকটের মুহূর্তে—তাঁরও প্রেমই বড় হয়েছে—ঈর্ষা ও বিদ্বেষের চেয়ে। পূর্ণবাবু এই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে, অর্ধচেতন অবস্থাতে কার সঙ্গ কার সেবা চাইছেন—তা শরৎসুন্দরী জানেন ; এও জানেন যে, কোন ভাড়া করা নার্সই সেই মানুষটির মতো আন্তরিকভাবে সেবা করবে না।···তাই যদি হয়, হয়ত বা স্বামীর জীবনের এই শেষ ক'টি দিন—এইটুকু শান্তি ও তৃপ্তি লাভের হন্তারক হবেন না তিনি, সংসার থেকে শেষ বিদায়ের কালে ওঁর প্রাণের পাত্র অমৃতেই পূর্ণ ক'রে দেবেন। হলাহল যেটুকু তা তাঁরই থাক—ভাগ্যের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য—তার বদলে সুধাই তুলে দেবেন তিনি স্বামীর তৃষ্ণার্ত মৃত্যুহিম ওষ্ঠাধরে।

পূর্ণবাবুর বন্ধু বা ছাত্র কোন ডাক্তারেরই নিষেধ কানে তুললেন না তিনি। ছেলের

ভ্রুকুটিও গ্রাহ্য করলেন না। কোচম্যানকে গাড়ি বার করতে বলে নিজেই বেরোলেন শুশ্রূষাকারিণী ডেকে আনতে।

ছেলে বললে, 'আহা, তা না হয় আমরাই যাচ্ছি কেউ, তোমার আবার এই শরীরে—কোথায় পড়ে-টড়ে যাবে—গাড়ি পাঠালেও তো হয়—ডাকলেই আসবে, এর জন্যে এত হীনতা স্বীকারের দরকারটা কি? কী এমন মান্যমান লোক!'

মা যে কাকে ডাকতে যাচ্ছেন পরেশ তা অনুমান করতে পেরেছে বৈকি! তাতেই আরও বিস্মিত ও বিরক্ত সে।

কিন্তু শরৎসুন্দরী তেমনিই রহস্যময় মৃদু হাসির সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'ডাকলে সে আসবে না। এমনিই একাজ এখন আর করে না। এখানে তো আরও আসতে চাইবে না।···তোরা ব্যস্ত হোস নি বাবা, আমি যা করছি ভেবে বুঝেই করছি। এখন এসব ছোট-খাটো মান-অপমান মর্যাদার কথা ভাববার সময় নয়।'

ঠিকানা শরৎসুন্দরীর জানার কথা নয়—তবে কোচম্যানরা বাড়ি চিনবে এটুকু তিনি জানতেন। কিন্তু গাড়িতে উঠে যখন বললেন, 'হেমন্তমার বাড়ি চলো'—তখন তারও কথাটা বুঝতে কিছু সময় লাগল।

সে বোকার মতো খানিকটা ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'হেমন্তমার বাড়ি? মানে—সেই বহুবাজারে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কানে কম শুনছিস নাকি?'

'হাপনি যাইবেন—সেইখানে?' আবারও বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে সে।

এবার বিরক্ত হয়ে শরৎসুন্দরী মুখ ঘুরিয়ে বসলেন।

এরপর আর সন্দেহ রাখার কোন অবকাশ থাকে না। আপন মনেই, না-বোঝার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে—সহিসের দিকে চেয়ে হাত ও চোখের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে কোচবক্সে চড়ে বসে পেয়ার আলি কোচম্যান···

পূর্ণবাবুর অসুখের কথা হেমন্ত শুনেছিল। সইস-ই এসে খবর দিয়ে গেছে, সেও ঠাকুর পাঠিয়ে খবর নিয়েছে। তবে তাতে স্থূল খবরটা—অর্থাৎ বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছে—এর বেশী কিছু জানা যায় নি। বিস্তারিত সংবাদের জন্যে সেও ছটফট করছিল মনে মনে। পূর্ণবাবু আগের চেয়ে অনেক বেশী আপন হয়ে গেছেন এই ক' বছরে। প্রীতি ও সখ্যের বন্ধন কামজ আসক্তির থেকে অনেক বেশী নিবিড়, অনেক বেশী ঘাতসহ। অন্তরঙ্গ তো বটেই। তাই তখনকার বিদ্বেষ ও ঘৃণার লেশমাত্রও নেই আর মনে। এখনকার উৎকণ্ঠা একেবারেই নির্ভেজাল ও সত্য।

তবু এই আগমন আর আহ্বান বহু দূরে কল্পনাতেও ভাবা যায় না।

দরজার কাছে একটা গাড়ি এসে থামতে ঝি যখন এসে বলল, বুড়ো-মতো একজন মেয়েছেলে এসেছে এবং 'হেমন্ত আছে বাড়িতে?' বলে নাম ধরে খবর নিচ্ছে—তখনই যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিল—কিন্তু নিচে এসে মানুষটাকে দেখে একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর যাকেই হোক—শরৎসুন্দরীকে দেখার আশা করে নি সে, এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। অন্য যে কোন লোক—এমন কি স্বয়ং মহারাণী মেরী এসে দাঁড়ালেও

সে এত বিব্রত ও বিস্মিত হত না।

কীভাবে অভ্যর্থনা জানাবে এই অপ্রত্যাশিত অনাহূত অতিথিকে—'আপনি' বলবে না 'তুমি' বলবে, কী মনে ক'রে এসেছেন উনি, অপমান করতে, কলহ করতে—অথবা স্বামীরই খবর দিতে, কেবল মাত্র গুরুতর কোন দুঃসংবাদ জানাতেই—কিছুই বুঝতে না পেরে, জীবনে এই প্রথম বোধ হয় নির্বোধের মতো শূন্য মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—কোন সৌজন্য প্রকাশ করতে বা সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারল না।

সেজন্য অবশ্য অপেক্ষাও করলেন না শরৎসুন্দরী।

এ দৃশ্য উপভোগ করারই কথা তাঁর, অন্য সময়ে হলে এই সাক্ষাতের কৌতুকটুকু নিঃসন্দেহে আনন্দ দিত তাঁকে—কিন্তু এখন সে সময় নয়, সে কথা মনেও পড়ল না।

এমন কি, ওর এই বিমূঢ়তাও বোধ করি ভাল ক'রে লক্ষ্য পড়ল না—শরৎসুন্দরী নিজেই এগিয়ে এসে হেমন্তের হাত দুটি ধরে বললেন, 'ভাই, শুনেছ তো—ওঁর খুব অসুখ। ভাল হয়ে যে উঠবেন—এটুকু আশা করতে সাহস হচ্ছে না, কোন ডাক্তারও ভরসা দিতে পারছেন না। বোধ হয়...বোধ হয়—শেষ অবস্থাই এটা। তোমার একবার এসময়ে যাওয়া দরকার যে! তোমার জন্যে তাঁর প্রাণটা ছটফট করছে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে—তাছাড়া, আর কেউ তো নেই, এসময় তাঁর ভারই বা কে নেবে তুমি ছাড়া? আর তো কেউ এমন প্রাণ দিয়ে ওঁর মন বুঝে করতে পারবে না!'

বলতে বলতেই দু' চোখের কূল বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ল তাঁর।

কে জানে, এটা স্বামীর অসুখের জন্য উদ্বেগ, আসন্ন বৈধব্যের আশংকা—না নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করার—করতে বাধ্য হওয়ার বেদনা এটা! রিক্ততার, নিঃস্বতার, অশ্রু এটা!

প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা হেমন্তের কেটে গেছে ততক্ষণে। বুদ্ধি ও বিবেচনা ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব সক্রিয়তা।

সে ওঁর মুঠির মধ্যে ধরা নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁর হাত দুটোই চেপে ধরে, বলে, 'এর জন্যে আপনি এই শরীরে আবার নিজে আসতে গেলেন কেন দিদি? আমাকে একটা হুকুম ক'রে পাঠালেই তো যেতুম। সইসটাকে বলে দিলেই হত। চলুন চলুন, ভেতরে বসবেন চলুন!'

'আজ থাক ভাই। এখন আর অপেক্ষা করা চলবে না। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁর দয়ায় অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে—তাহলে অবশ্যই আর একদিন আসব, বসবও। বসার কি গল্প করার সময় আর হাতে নেই। এখন সবাই মিনিট গুনছেন সেখানে। সেই জন্যেই তো ছুটে আসতে হল—যদি ভাবো এ ডাকের মধ্যে কোন অসম্মান আছে, যদি না যাও সে ঝুঁকি আর নিতে রাজী নই।'

'তাহলে চলুন দিদি, এখনই চলে যাই—এই সঙ্গে।'

'এই অবস্থায়—?' এবার বিস্মিত হবার পালা শরৎসুন্দরীর, 'কাপড়টা বদলাবে না? অন্য কাপড়-চোপড়—চাদর?'

'না, কাপড় বদলাবার দরকার হবে না। কী এমন উৎসবের বাড়ি যাচ্ছি যে, সেজেগুজে যেতে হবে? তবে কাপড় একখানা নিতে হবে বটে। থান কাপড় পরি

তো—। সে ওখানে মিলবে না—ঈশ্বর করুন কোন দিনই না মেলার দরকার হয়।···
চলুন আপনাকে গাড়িতে বসিয়ে দিই আগে, তারপর ঠিক এক মিনিটের মধ্যে চলে আসছি—'

এক মিনিট না হোক, দু-তিন মিনিটের মধ্যেই নেমে আসে হেমন্ত। একটা গামছা ও থান-দুই থান ধুতি নিয়ে—তার মধ্যে একটা তসরের কাপড় পুজোর জন্যে—আঁচলে চাবিটা বাঁধতে বাঁধতেই এসে গাড়িতে চেপে বসে।

সেই যে গিয়ে রোগীর পাশে বসল হেমন্ত দীর্ঘ দিন আর উঠতে পারল না।

কঠিন অসুখ, এ বয়সে এ রোগী কেউই বাঁচে না—নিতান্ত পূর্ণবাবুর কঠিন প্রাণ বলেই বোধ করি যুঝে যেতে লাগলেন। জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাওয়া যাকে বলে কোন সংজ্ঞা নেই রোগীর, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। হেমন্ত যখন আসে তখন একবার চোখ চেয়ে দেখেছিলেন, চিনতেও পেরেছিলেন বোধ হয়—কারণ হেমন্ত হাতের ওপর হাত রাখতে দুর্বল হাতেই ঈষৎ একটু চাপ দিয়েছিলেন একবার—তারপর সেই যে যেন-নিশ্চিন্ত-হয়ে চোখ বুজেছিলেন পূর্ণবাবু আর একবারও চোখ খোলেন নি।

তাঁর এই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই দেখে ছাত্র বিধানবাবু সুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'মাষ্টার মশাইয়ের ঐটুকু দেহে যে এতটা শক্তি ছিল তা কখনও ভাবাও যায় নি—না? অদ্ভুত ফাইট দিচ্ছেন কিন্তু! এই দেখে মনে হচ্ছে বাঁচানো হয়ত একেবারে ইমপসিব্‌ল নাও হতে পারে।'

তিনি অবশ্য যা করবার সবই করলেন। অন্য প্রবীণ ডাক্তার দু-চারজন আসা-যাওয়া করলেও বিধানবাবুর মতেই চিকিৎসা হতে লাগল। নীলরতনবাবু অজিতবাবু এঁরা রোজই আসতেন, কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা পালটান নি কখনও। আসলে ওঁরা হাল ছেড়েই দিয়েছেন—ভাবটা এই রকম—'ছোকরার খুব সর্দারী করার শখ—করুক, কেমন বাঁচাতে পারে দেখাই যাক না!'

এর মধ্যে এক মিনিটও বিছানা ছেড়ে ওঠা যায় নি বলেই বাড়িতেও আসা যায় নি আর। স্নান ও আহারের ছুটি পেয়েছে ক্ষেপে ক্ষেপে। হয় ডাক্তারবন্ধু কেউ এসে বসে আছেন, সেই ফাঁকে একবার উঠে স্নান ক'রে এল, আহ্নিক করতে হয় রোগীর মাথায় আইসব্যাগ ধরেই, মনে মনে—খাওয়া সেও ঐখানে পাশে বসেই, একটা চোখ রোগীর দিকে রেখেই। ঘুমটা অবশ্য চলে পালা ক'রে। প্রথম রাত্রে শরৎসুন্দরী এসে বসেন, দশটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত। তিনি আপিংখোর মানুষ, তাঁর সহজে ঘুম আসে না—তিনি আরও জেগে থাকতে পারেন, কিন্তু হেমন্ত দেয় না। ওর এমনিতেই পর পর রাতজাগা অভ্যাস আছে, ছেলেকে দিয়ে সে অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে বলতে গেলে—তার দু-তিন ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। সে একটা নাগাদ উঠে পড়ে—জোর ক'রে শরৎকে পাশে তাঁর শোবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়—আর কারও জেগে থাকার দরকার হয় না।

এতদিন লাগবে হেমন্তও ভাবে নি, মনোরমাও না। সে পড়ে গেল এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। খালি, অভিভাবকশূন্য বাড়িতে ওর সঙ্গে প্রায়-ছোকরা উড়ে ঠাকুরকে

রাখা সঙ্গত হবে না বলে, এখান থেকেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছুটি দিয়েছে হেমন্ত। ঝি আর মনোরমা—এবং গোর এই তিনটি প্রাণী থাকে। হেমন্ত আসার সময় খরচের মতো টাকা মনোরমার কাছেই রেখে এসেছিল। একটা আন্দাজী হিসেব ক'রে—এক মাসের মতো খরচ। তাছাড়া কিছু ওর সঙ্গেও থাকে—টাকা রাখার জন্যে ক্রুশে বোনা পশমের একটা থলি সর্বদা কোমরে থাকে, গোপালীর নিজে হাতে বুনে দেওয়া—হেমন্ত বলে, 'হাতিয়ার, কলিযুগে টাকাই যথার্থ হাতিয়ার।' এই থেকেই সে একদিন অন্তর পূর্ণবাবুর সইস রামধনকে দিয়ে বাজার করিয়ে পাঠায়। সে অমনি সেই সময়ই আর কোন দরকার আছে কিনা, কে কেমন আছে সেই খবর নিয়ে হেমন্তকে এসে বলে যায়।

সেদিক দিয়ে অসুবিধে কিছু নেই। সহস্র দুশ্চিন্তা ও একাগ্র পরিশ্রমের মধ্যেও সে চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঠিক থাকে ওর। মাসকাবারী উটনো তোলা থাকে—তবু দু-চার পয়সার কোন জিনিস যদি দরকার হয় রামধনই এনে দেয়। 'ঝি যেন বৌমাকে একা ফেলে একপা-ও কোথাও না যায়'—কড়া হুকুম দিয়েছে হেমন্ত, 'যা কিছু দরকার হবে বাইরের কাজ রামধনই ক'রে দেবে।'

তা করেও রামধন। দু'বেলাই এসে খবর নিয়ে যায়।

ওদিকটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে রোগীর দিকে মন দিতে পারে হেমন্ত।

॥ ৯ ॥

একেই শহরের বন্দী জীবনে অস্থির হয়ে উঠেছিল মনোরমা, হেমন্ত ও ঠাকুর—দু-দু'জনের অনুপস্থিতিতে হাঁপিয়ে উঠল একেবারে। ওর যেন ডাক ছেড়ে কান্না পায় এক-একসময়। জনহীন শব্দহীন বাড়িটা গিলতে আসে ওকে। ছেলে থাকলেও তবু একরকম ক'রে কাটে। ছেলে দুপুরে ইস্কুলে যায়—সে সময়টা সম্পূর্ণ একা, গোটা বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে।

এ সময়টা পাগলের মতো অবস্থা হয় মনোরমার। প্রাণপণে রাস্তার দিকের ঘরটায়—হেমন্তর শোবার ঘরে থাকার চেষ্টা করে। রাস্তা বলতে অবশ্য গলিই, তবু যতটা সম্ভব সেই দিকেই চেয়ে বসে থাকে—সেখানে পথিকদের আনাগোনার আওয়াজের দিকে কান পেতে। দুপুরে তো বটেই, বিকেলে পর্যন্ত ঝিটা ঘুমোয় পড়ে পড়ে। ছেলে নেই—কোনমতেই সে সময়টা বাড়ির মধ্যে আসতে প্যারে না, গা ছমছম করে। সত্যি সত্যিই এক একসময় মনে হয় ওর, অশরীরী ছায়ামূর্তির দল চারিদিকের কোণে খাঁজে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওর দিকে চেয়ে নিষ্করুণ বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

আরও মুশকিল হয়েছে এই, আগে তবু ঝিকে দু'চার পয়সা ঘুষঘাষ দিয়ে এক-আধবার বাইরে বেরিয়ে পড়া চলত—দু-পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও সেটাও একটা মুক্তি। একটা অবকাশের মতো ছিল—এখন তাও যেতে ভরসা হয় না। বাড়িতে এত জিনিসপত্র, টাকাকড়িও অবশ্যই কিছু আছে—যদি চোর আসে? ওর দোষে কোন ক্ষতি হলে কিছু খোয়া গেলে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতবে জ্যাঠাইমা। যা লোক, আর যা মেজাজ!

বরং ঝিটাই এখন এক-আধবার বাইরে যায়—নিজের পানদোক্তা কেনার নাম ক'রে, সেই ফাঁকে আশ-পাশের বাড়ির ঝিদের সঙ্গে দুটো গল্প ক'রে আসে। সইস রামধন যখন খবরাখবর নিতে আসে, তখন তাকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যায় সে।

এই রামধন আসার সময়গুলোই মনোরমার মরুভূমি তুল্য জীবনে ওয়েসিস।

রামধন যেন ওর জীবনের দিকের, পৃথিবীর দিকের বাতায়নও। তার মুখেই সে সংসারের সংবাদ পায়—দুনিয়ায়, মানে ওদের সীমাবদ্ধ দুনিয়ার যত কেচ্ছাকেলেংকারীর মুখরোচক খবর।

এই ধরনের খবরই চায় সে, হেমন্তর সংসারে যা পাওয়ার উপায় নেই। হেমন্ত উপস্থিত থাকলে রামধনও যা দিতে পারত না। রামধনের মতো লোকের সঙ্গে কথা বলাই তো বৌমানুষের পক্ষে কল্পনাতীত। এর আগে যখন সে এসেছে, সদরের কাছে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলে চলে গেছে জবাব নিয়ে। বাড়িতে ঢোকারও উপায় ছিল না।

এখন তাই—রামধনের কথাগুলো, গল্পগুজব—বুভুক্ষুর মতোই গেলে সে বসে বসে। পূর্ণবাবুদের কথা, হেমন্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক মায় কমলাক্ষ প্রসঙ্গ—কিছুই বাদ যায় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রস দিয়ে রসান দিয়েই বলে রামধন। সে সময় সে ছিল না, তবে ভৃত্য-পরম্পরায় শুনেছে। এসব ন্যায্য উত্তরাধিকারের মতোই এক ঝি কি চাকর অপরকে বলে যায়—খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা হলেও, একবেলা কেন এক ঘণ্টা সময় পেলেও এইসব কেচ্ছাকেলেঙ্কারীগুলো বলে নেয়—অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে।

রামধনও এইভাবেই শুনেছে, সেই প্রথম আমল থেকেই পূর্ণবাবুর সব কেলেঙ্কারীর কাহিনী, স্বামী-স্ত্রীর অবনিবনাও হবার কারণ ও বিবরণ। কিছু বেশী শুনেছে হয়ত। একেবারে ভুল শোনে নি। সেইগুলোই হয়ত আর একটু রং চড়িয়ে মিথ্যের খাদ দিয়ে বলে তখন। রামধন নাকি জাতে পোদ বা হাড়ি বা ঐ ধরনের কোন জল-অচল জাত। তাই ব্রাহ্মণ-বাড়ির ভেতরে এসে বসতে পারবে কোনদিন একথা সে কল্পনাও করে নি কখনও, তার ওপর বসা শুধু নয়, বসে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করবে—এ তার স্বপ্নেরও বাইরেকার জিনিস। সুতরাং তারও উৎসাহের অবধি থাকে না—এক 'বামনী'কে এইসব খবর যোগাতে।

রামধনের বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ, বেশ শক্তসমর্থ। রংটা মিশকালো হলেও দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। বয়সের চেয়ে ছোটই দেখায় বরং। এমন লোকের সঙ্গে কথা কইতেও ভাল লাগে।

মনিববাড়ির ইতিহাস ছাড়াও অনেক কথা জানতে পারে মনোরমা ওর মুখ থেকে। লোকটা গল্প করতেও জানে। বেশ গুছিয়েই বলে কথাগুলো—যখন বলে। নিজের কথাও বলে অনেক। দুটো বিয়ে করেছিল, একটা আট বছর বয়সে, সে বৌ সোমত্থ হবার আগেই মরে যায়, আরেকটার সঙ্গে তবু বছর-দুই ঘর করতে পেরেছিল, ছেলেও হয়েছিল একটা—তারপর সবসুদ্ধ ওলাবিবির দয়ায় শেষ, যাকে বলে ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।

না, আর বিয়ে করে নি। এই তো বারোটি টাকা মাইনে এখানে, এর মধ্যেই নিজেকে খেতে হয়—কী-ই বা থাকে! দেশে মা নিজে হাতে মাটি কুপিয়ে যা পারে চাষবাস

করে—জমি কিছুই নেই, বিঘেখানেক বড় জোর ঠেঙিয়ে-বাড়িয়ে—তাতে তার কোন মতে চলে যায় ভিক্ষে দুঃখু ক'রে। রামধন এখন আর একটা বিয়ে করলে দেশে রীতিমতো টাকা পাঠাতে হবে। চার-পাঁচ টাকার কম পাঠানো চলবে না। এই মাইনের থেকে খাওয়া-পরা চালিয়ে মাসে চার-পাঁচ টাকা বাঁচানো খুব কষ্টের কথা। তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ আছে, ছেলেমেয়ে হতে থাকবে—পেটও বাড়বে—কী বা নিজে খাবে আর কী বা ওদের খাওয়াবে।

না না, ছেলেমানুষ ছিল যখন—বিয়ের ফুর্তিতে বিয়ে করেছে—অত কিছু ভাবে নি। মা দাদা দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে। এখন চোখ-কান খুলেছে—আর সাহস হয় না। দাদা ছিল যখন এতটা ভয়ও ছিল না। সে 'জন' খাটত, তাতেই সংসার চলে যেত। সেও 'নিউদ্দিশ' আজ চারবছর, কেউ বলে ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে 'পুলিপোলাও' খাচ্ছে আন্দামানে বসে, কেউ বলে খুন হয়েছে। দাদার 'পরিবার' আর একজনকে ধরে তার ঘরে গিয়ে উঠেছে ছেলেপুলে সুদ্ধ—ঝামেলা মিটে গেছে।

মনের মতো শ্রোতা পেয়ে রামধন সোৎসাহে বলে যায়—অতি অসাধারণ এইসব সাধারণ কাহিনী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে মনোরমাও। এখানকার পোশাকী জীবন নতুন পাম্পশু জুতোর মতোই অসহ হয়ে চেপে বসেছে, রামধনের এইসব গল্পের মধ্যে যেন মুক্তির স্বাদ পায় সে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।···

ক্রমশ রামধনের এখানে থাকার সময় বিলম্বিত হয়। ঝিও খুশি হয় তাতে, নিশ্চিন্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে যেতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারে। মনোরমাও ঝিয়ের অনুপস্থিতিতে অনেকটা স্বাধীনতা পায়। এটা-ওটা খাওয়ায় রামধনকে, চা ক'রে দেয় লুকিয়ে। এদের বাসনেই দেয়। শাশুড়ী জানতে পারলে জ্যান্তে পুঁতবে, এসব বাসন ব্যবহারযোগ্য তো থাকবেই না—সে কথা একবারও মনে পড়ে না। রামধনকে দিয়েই বেগুনি-ফুলুরি আনিয়ে খায় দু'জনে বসে। মনোরমার অত বামনাই নেই, ছোট জাতের ছোঁয়া লাগলেও জাত যাবে—একথাটা ওর মাথায় ঢোকে না অত। তাছাড়া লুকিয়ে খেতে দোষ কি ?

বেগুনি-ফুলুরি তো বটেই—রামধন প্যাঁজের বড়া খাওয়াবার জন্যও জেদ করে, কিন্তু অতটা আবার সাহসে কুলোয় না মনোরমার। পিঁয়াজের বড় দীর্ঘস্থায়ী গন্ধ, দূর থেকেও নিঃশ্বাসে পাওয়া যায়। ঝি যদি ধরে ফেলে ? সে বড় লজ্জার কথা। বামুনের বিধবা পিঁয়াজ খেয়েছে—তার ওপর রামধনের নিয়ে আসা খাবার ! হয়ত ঐ ঝিই আর তার কাজ করতে চাইবে না।

দিনের বেলায় এখানের উপস্থিতিটা দীর্ঘায়িত করতে রামধনেরও সাহসে কুলোয় না। হেমন্ত মার হুঁশ বড় 'টনকো'—চারদিকে চোখ-কান খোলা থাকে তাঁর। রামধন কখন যায় কখন ফেরে—বাড়ির আর কেউ অত লক্ষ্য না করলেও তিনি ঠিক খেয়াল ক'রে রাখেন। এত বড় অসুখের সেবা-শুশ্রূষার মধ্যেও একফাঁকে বেরিয়ে এসে জেরা করেন। তখন নানা রকম মিথ্যে বলতে হয় বানিয়ে বানিয়ে—কল্পিত কাজের ফিরিস্তি দিতে হয়, কোন কোনদিন হঠাৎ আত্মীয়ের সঙ্গে-দেখা-হয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদতে হয়।

না, সে বড় গোলমাল, দিনমানে দেরি হয়ে গেলে।

তাই—হেমন্তমা না পাঠালেও, অন্য কাজের ফাঁকে, কিংবা কাজ না থাকার অজুহাতে বেড়াতে যাবার নাম ক'রে পালিয়ে চলে আসে সে আজকাল। সন্ধ্যার পরই সে অবসর মেলে বেশির ভাগ। প্রথম প্রথম ছেলের জন্যে একটু অসুবিধা হত, রামধন ইঙ্গিত বুঝে আর একটু রাত ক'রে আসতে লাগল। তখন ঝি থাকলেও, সে বসে বসে ঢোলে কিংবা সোজাসুজি মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়েই পড়ে। নইলে—'বড্ড ঘুম পাচ্ছে বাপু বসে বসে, ঐ নোকটা তো আছে—আমি বৌদি ত্যাৎক্ষণ একটু পাশের বাড়ির হরিদিদির কাছ থেকে একটুন্ পান-দোক্তা খেয়ে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ে।

এই উভয় পক্ষেরই বাঞ্ছিত—একান্ত সাহচর্যের ফল যা ফলবার ফলল।

দ্রুতই ফলল বলতে গেলে।

একদিন—যথেষ্ট কাছাকাছিই বসে ছিল দু'জনে—তবু বাতাস করার অছিলায় আর একটু কাছ ঘেঁষে বসল মনোরমা। রামধনের সইস-জীবনে এ অভিজ্ঞতা অভিনব শুধু নয়—অবিশ্বাস্য। এমনিও তার দেশে থাকতেও এ কেউ করে নি কখনও। এর অর্থও তার না বোঝবার কথা নয়।···বিশেষ পাখার অভাবে যখন আঁচল দিয়ে বাতাস করতে হয়—হাতটা ওঠা-নামার ভঙ্গীগুলো তখন বিশেষ আমন্ত্রণ জানায়, আশ্বাস ও অভয় দেয়, স্পর্ধা ও সাহস যোগায়। আঁচল গায়ে এসে পড়ে স্পর্শের প্রশ্রয় দেয়—কাজটা এগিয়ে রাখে অনেকটা। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দটাও শুনতে কোন অসুবিধা নেই। সেটাও এক ধরনের উৎসাহ, প্ররোচনা।

অতএব রামধন যদি কিছুক্ষণের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে খপ্ ক'রে আঁচল সুদ্ধ হাতটা চেপে ধরে তো তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আর—ওপক্ষ থেকে যদি মুখ নত হওয়া ছাড়া কোন প্রতিবাদ না জাগে তাহলে সে হাত ধরে আরও কাছে টানবে রামধন—এও স্বাভাবিক।···

মরুভূমিতে তৃষ্ণার সময় থকথকে পাঁকও লোভনীয়, জীবনরক্ষক বলে মনে হয়, পোকা-বিলবিলে পচা জল দেখেও তৃষ্ণার্ত পথিক সাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মনোরমাও নিদারুণ তৃষ্ণায় এই পঙ্কে ঝাঁপ দেবে—এতেই বা আশ্চর্য কি?

পূর্ণবাবুকে মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনতে পুরো দুটি মাস সময় লাগল।

এই দু'মাস কোনদিকে তাকাবার, অন্য কোন কথা চিন্তা করার অবসর মেলে নি হেমন্তর।

প্রথম যেদিন চোখ খুলে চাইলেন পূর্ণবাবু, হেমন্তকে চিনতে পারলেন, প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কখন এলে? তোমাকে কে খবর দিলে?'

হেমন্ত হেসে বলল, 'কখন কি বলছ, কবে এলে তাই জিগ্যেস করো! এই তো প্রায় দু' মাস হল—এখানে বসে আছি, এই এক ঘরের মধ্যে!'

'দু' মাস! এতদিন ভুগছি!'

এই বলে—সম্ভবত এত কথা বলা ও অসুখের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব অনুভব করার

শ্রান্তিতেই চোখ বুজলেন আবার। খানিকটা পরে—আবার যখন কথা বলার মতো অবস্থা হল তখন প্রশ্ন করলেন, 'তার পর? তোমার ঘর-সংসার দেখছে কে?'

'গোবিন্দ দেখছেন। আর কে দেখবে! এখান থেকে রামধন গিয়ে খবর নেয়, বাজার-দোকান করে দেয়—ঝি আছে আর বৌমা আছে, রাঁধে বাড়ে খায়-দায়। বাড়িঘর যা হয়ে আছে, বুঝতেই পারছি—এক হাঁটু। এইবার তুমি একটু ভালর দিকে—এখন দিদিই দেখতে পারবেন, এবার আমি ছুটি নোব। সত্যিই—কী যে হচ্ছে!'

আরও খানিকটা চোখ বুজে থেকে শক্তি সঞ্চয় করেন পূর্ণবাবু, তারপর বলেন, 'আর দুটো-একটা দিন থেকে যাও। বসতে পারি একটু আগে—। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, দু-একদিনে বেশী কি ক্ষতি হবে!'

আর একটু থেমে বলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে—সেইটেই বুঝতে পারছি না। খবর পেয়ে এলে বুঝি? এরা কিছু বললে না?'

'না, খবর পেয়ে আসি নি। দিদি নিজে গিয়ে ডেকে এনেছেন।'

'কে ডেকে এনেছে—মেজবৌ? নিজে গিয়ে ডেকে এনেছে! আশ্চর্য!' অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না এর পর।

দুর্বল মস্তিষ্কে এতখানি বিস্ময়ের আঘাত সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল।

অবিশ্বাস্য বিস্ময়। সেই সঙ্গে বুঝি একটু অনুতাপও।

বুদ্ধিমান বহুদর্শী পূর্ণবাবুর সেই রোগাচ্ছন্ন চিন্তা-শক্তিতেও কার্যকারণ যোগাযোগটা বুঝে নিতে দেরি হয় না। কতখানি ভালবাসায় এতটা ঔদার্য, এতটা আত্মত্যাগ সম্ভব হয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। মেয়েদের এই ঈর্ষাটা জয় করা সহজ নয়, কঠিন পরীক্ষা এটা—চূড়ান্ত অসম্মান ও আঘাত ভুলে গিয়ে বহুদিনের বহু আঘাত ও অপমান—এই দীনতা ও পরাজয় স্বীকার করা।

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বড়ই অবিচার করেছেন স্ত্রীর প্রতি, জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি। দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী।

শরৎসুন্দরীর প্রতি অবিচারই ক'রে গেছেন জীবনভোর। কখনও তার দিকটা বোঝবার চেষ্টা করেন নি—তার জ্বালাটা বোঝবার চেষ্টা করেন নি। নিজের সুখের কথাই ভেবেছেন, শুধু নিজের প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যুগিয়ে গেছেন—বিচার বিবেচনা বিবেকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। ক্ষীণতম প্রতিবাদ সামান্যতম বাধাতেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন স্ত্রীর প্রতি।...

হেমন্তও বুঝি বোঝে এই নীরব থাকার অর্থ।

ওঁর মনের তরঙ্গ ওঠা-পড়ার শব্দ শুনতে পায় নিজের মনে।

আস্তে আস্তে বলে, 'আমার আর না থাকাই ভাল—বুঝলে? এবার দিদিই বসুন কাছে, তাঁর সেবাই নাও দু'দিন।...আর তো খুব একটা মেহনতের কাজ রইল না—যেটুকু দরকার হবে, উনিই পারবেন চালিয়ে নিতে।'

'তাই যেয়ো।' পূর্ণবাবুও ধীরে ধীরে জবাব দেন, কথাগুলোর অর্থ উপলব্ধি করতে করতে, 'কাল-পরশুই চলে যেয়ো। বরং মধ্যে মধ্যে এসে খবর নিয়ে যেয়ো এক-আধবার। গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে। গাড়িরও তো বিশেষ কাজ নেই, বসেই

তো আছে। চলেই যাও। তোমারও ঘরবাড়ির কি হাল হচ্ছে কে জানে!…এর মধ্যে একদিনও যাও নি?…কে জানে কী হবে! বৌটাকে একা রেখে আসা ঠিক হয় নি। ওটা আস্ত বুনো—পোষ মানতে এখন ঢের দেরি।'

'কী করবো বলো! ওদিকে আর তাকাবারই যে অবসর পাই নি। তোমার কথা ভাবব, না সংসারের কথা ভাবব!'

অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে পূর্ণবাবুর। বলেন, 'আশ্চর্য! তোমারও—। তোমাকেও এতকাল চিনতে পারি নি।…কাউকেই। নিয়েই গেলাম জীবনভোর, দেওয়ার কথাটা আর ভাবা হয়ে উঠল না।…এত পাষণ্ড—তবু তো তোমরা আমাকে—। এটা ভগবানের অহেতুক আশীর্বাদ, আমি এর যোগ্য নই।'

বলতে বলতে দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে পূর্ণবাবুর।

এই শরীরে এতটা আবেগের আঘাত সহ্য হবে না বুঝে হেমন্ত 'আসছি' বলে উঠে ভেতরের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সে যতক্ষণ কাছে থাকবে পূর্ণবাবু চুপ ক'রে থাকতে পারবেন না, আর এখন যে সব কথা হবে—এই ধরনের আবেগ ঘেঁষেই চলবে তার বক্তব্য।

॥ ১০ ॥

পরের দিন রামধনকে দিয়েই খবর পাঠাল হেমন্তঃ এই দুটো দিন পর পর সংক্রান্তি আর মাস পয়লা পড়ল, তার ওপর বেস্পতিবার—এগুলো কাটিয়ে তরশু শুক্রবার সে বাড়ি ফিরবে। এখান থেকে খেয়ে-দেয়েই যাবে অবশ্য, বেলা দুটো-তিনটে হবে পৌঁছতে। ঝি যেন ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে রাখে, আর একফাঁকে যেন ঠাকুরকে খবর দেয়—যাতে সে শুক্রবার বিকেলে এসে পড়ে। পাশের বাড়ির দত্তবাবুদের ঠাকুরকে বললেই সে খবর পাঠিয়ে দেবে।

সেই যে গেল রামধন আর ফিরল না। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর ক্রমশ বিকেলে গড়িয়ে গেল—মানুষটাও এল না, কোন খবরও না।

হেমন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এমনি সাধারণ উদ্বেগ নয়—কেমন এক ধরনের অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা। রামধনকে যখন কথাগুলো বলে দিচ্ছে তখনই মনে হয়েছিল যেন মুখটা শুকিয়ে গেল তার! হেমন্তর মুখের দিকে চাইতে পারল না, এদিক-ওদিক—মাটির দিকে—তাকাতে লাগল, বার-দুই 'আজ্ঞে' 'যে আজ্ঞে' বলে একরকম পালিয়েই গেল সামনে থেকে।

ঠিক তখনই অতটা ভাবে নি। লক্ষ্য করা যাকে বলে তা করে নি। আচরণটা কেমন যেন—এইটুকু শুধু মনে হয়েছিল। তাও খুব অস্বাভাবিক বলে তখনই অতটা বুঝতে পারে নি। ক্রমশ অনুপস্থিতিটা যখন কোনরকম সম্ভাব্য কারণ ছাড়িয়ে দীর্ঘ হয়ে উঠল, জানাশুনো তার সমস্ত আড্ডাতে খোঁজ ক'রেও কোন খবর পাওয়া গেল না, তখনই সে সময়কার আচরণের দুর্বোধ্যতাটা মনে পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মনে হল ভাবভঙ্গীটা আদৌ স্বাভাবিক নয়, এবং সেটা বুঝে তখনই একটু সচেতন হয়ে ওঠা উচিত ছিল।

শেষে সন্ধ্যা হয়ে আসতে বাড়ির অপরাপর লোকও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পূর্ণবাবু শুনে বললেন, 'মোহনকে তোমাদের বাড়ি পাঠাও আগে, দ্যাখো সেখানো কোন বিভ্রাট বেধে বসে আছে কিনা!'

মোহন ওঁদের পুরনো চাকর, এখন দারোয়ান-বাজারসরকারের পদে উন্নীত হয়েছে।

মোহন খবর নিতে গেল, কিন্তু সে ফিরল না।

সে জায়গায় কাঁদতে কাঁদতে এল হেমন্তর ঝি। মোহনকে বসিয়ে সে এসেছে। গোরা এসেছে ইস্কুল থেকে, সে কার কাছে থাকবে—তাই এতক্ষণ আসতে পারে নি।

আসল কথা, মনোরমাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

রামধন সকালে গিয়েছিল একবার—অনেকক্ষণ কী সব কথা হয়েছে তা ঝি জানে না—সে তখন কলতলায় ছিল—তার পর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু আঁচলটা বিছিয়ে চোখ বুজেছে, উঠে দেখে নিচের সদর দরজা ভেজানো—মনোরমা নেই। কোন ঘরেই নেই। সেই থেকে এখনও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি। ছেলেটা এসে খিদেতে কাঁদছিল—কে রাঁধে কে খেতে দেয়—ঝিই সামনের দোকান থেকে দুটো মিষ্টি কিনে এনে খাইয়েছে, তারও পয়সা দেওয়া হয় নি—টাকা-পয়সা তো সব বৌদির কাছে থাকে, কোথায় থোয়া কি করে ঝি সে সব জানে না। ইত্যাদি—

হেমন্তর মুখ শুনতে শুনতে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছিল। ক্রমশ তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ওর মেজাজ সম্বন্ধে এতদিনে কিছু ধারণা হয়ে থাকলেও এ চেহারা কখনও দেখে নি ঝি, সে ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল।

হেমন্তর তীক্ষ্ন ক্ষুরধার জেরাতে বলেও ফেলল সে অনেক কথা।

অন্তর্যামীর মতো প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তরটা এগিয়ে দেয়—সেখানে মিথ্যা কথা বলাও যায় না বেশীক্ষণ।

'এর মধ্যে ওদের খালি বাড়িতে রেখে তুই ক'দিন গিয়েছিলি পাড়া বেড়াতে? সন্ধ্যেবেলা পানদোক্তার ছুতো করে মল্লিকবাড়ির গিন্নি ঝিয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতিস কতক্ষণ ধরে? ঠিক ক'রে বলবি, সত্যি কথা—এসব কথা ছাপা থাকবে না—গিয়ে আমি বার করবই, কোথায় কতক্ষণ ক'রে থাকতিস—তার পর তোর একদিন কি আমারই একদিন, জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নোব, কোন বাবা তোর রুখতে পারবে না।...ভাল চাস তো সত্যি কথা বল!'

এর পর আর মিথ্যে কথা বলতে সাহস হয় হয় না। সত্যি কথাই বসে সে। সব স্বীকার করে।

একদিন-দু'দিন নয়, এর মধ্যে অমন অনেকদিনই বেরিয়ে গেছে সে। বাবুর বাড়ির লোক, পুরনো বিশ্বাসী লোক—তাকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েই গেছে। এর মধ্যে কোন বিপদের কথা আছে ভাবে নি। বামুনের মেয়ের এত ছোট প্রিরবিত্তি হবে তাও মনে করে নি। এখন কিন্তু সব মনে পড়ছে ওর—কোন কোন দিন মনোরমাই পাঠিয়েছে ওকে—নানা ছুতোনাতায়। কিংবা ওর ওপর 'আত্তিশো' দেখিয়ে—'যাও না একটু, পানদোক্তা কেনাও হবে, অমনি ফাঁকে একটু ঘুরেও আসা হবে। দিনরাত বন্দী থয়ে থাকা তো!'—তখন অত কিছু বুঝতে পারে নি ও, আজ বুঝছে

যে, সবটাই ওকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবার ছুতো।

আরও বলে।

কবে কি ধরনের কথা কানে গেছে, টুকরো টুকরো কথা, কী রকমের রসিকতা হাসিবটকেরা, চোখে চোখে ইশারা। তখন অত কিছু ভাবে নি সে সত্যি-সত্যিই। এমন যে সম্ভব, এও যে হতে পারে, তাও মাথাতে যায় নি। ছোট জাত ছোট কাজ করে—উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলে যাওয়ার কথা যার, ভদ্দরলোক বামুনের ঘরে যার রোয়াকে ওঠার অধিকার নেই, তার সঙ্গে যে—না না, একথা কী ক'রে বুঝবে সে?

'মাইরি মা, এই কালীঘাটের কালীর দিব্যি, সত্যি বলছি!'

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে হেমন্তর দুই ঠোঁটের ভঙ্গী।

শাণিত ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'না, তুমি তা বুঝবে কেন, তুমি এক বছরের শিশু—তোমার মাথাতে এসব কথা ঢোকে কখনও! এই তো এখন যে সব কথাগুলো বলছ—এই ধরনের কথা হয়েছে—তুমি কিছু বুঝতে পারো নি? এত সরল তুমি? সবে জন্মেছ, না? তবে আজ বুঝলে কি ক'রে যে কথাগুলো গর্হিত? আজ যে মানেটা মাথায় যাচ্ছে সেদিন তার কিছু বুঝতে পারো নি? কোন মনিবের ঘরের বৌ, তার চাকর—তাও বাড়িতে কাজ করার লোক নয়—আস্তাবলের সইসের সঙ্গে এইভাবে কথা কয় শুনেছিস কখনও? তুই-ই তো বলছিস ওদের রোয়াকে উঠতে দেয় না। তবে? এতেও তোমার সন্দ হল না?—আসলে তুমিই কুটনীগিরি ক'রে জুটিয়ে দিয়ে মজা দেখেছ।—দাঁড়াও, বাড়ি যাই আগে, তোমার মায়াকান্না বার করছি।'

তারপর ঘরে ঢুকে পূর্ণবাবুকে বলে, 'শুনলে তো সব? এখুনি তো যেতে হয়। বেস্পতিবার মানতে গেলে তো আর চলবে না!'

'না, না, তুমি যাও, রাত্তিরে বার-দোষ থাকে না। বরং মোহনকে নিয়েই যাও, দরকার হয় এক-আধদিন রেখেও দিতে পারবে। মনে হয় এখানে তার জন্যে কিছু আটকাবে না।...ও ঝিকে যে আর রাখবে না সে তো বুঝতেই পারছি।'

'ওকে আবার রাখব! গিয়েই বিদেয় করব ঝাঁটা মেরে। তবে সে জন্যে মোহনকে আটকে রাখার দরকার হবে না। ও শুধু যদি গিয়ে একবার ক'রে সকাল-বিকেলে খোঁজ নেয় তাহলেই হবে। তারপর—দু-একদিনেই লোক ঠিক ক'রে নোব। ঠাকুর তো আছেই।'

যাবার আগে পূর্ণবাবু আর একটি উপদেশ দিলেন, 'যদি ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে থাকে, ওকে পালতে চাও, এখানে বাড়িতে রেখো না। কোন মিশনারী ইস্কুলের হোস্টেলে রেখে দেবার ব্যবস্থা করো। ঝি-চাকরদের ওপর ভরসা ক'রে থাকলে ছেলে মানুষ হবে না। তুমি তো এখন রোজগেরে বেটাছেলে—বিশেষ ব্যবসাদার, তুমি পারবে না দেখতে, ঝি-চাকরের কাছেই থাকবে বেশির ভাগ—একেবারে বাঁদর তৈরী হবে।'

'দেখি! তুমি তো ওঠো আগে। যা ব্যবস্থা করতে হয় তোমাকেই করতে হবে। আমি আর কি জানি বলো, কোথায় কি খোঁজখবর করতে হবে না হবে সে-সব তুমিই জানো।'

প‍ূর্ণবাবুই ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সম্পূর্ণ সেরে ওঠা পর্যন্ত—অপেক্ষাও করতে হল না। কারণ তাতে অনেক দেরি লাগবে, এই বয়েসে এতবড় অসুখটার ধকল সামলে ওঠা সময়সাপেক্ষ, সেটা ডাক্তার হিসেবে উনি নিজেই বুঝেছিলেন। একটি ছাত্র—এখন বড় ডাক্তার—তাকে বলে দিলেন, সে-ই বাছাবাছা কয়েকটা ইস্কুলে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করল।—

হেমন্ত চেয়েছিল কলকাতার কাছাকাছি কোথাও রাখতে, তেমন কোন ভাল ইস্কুল পাওয়া গেল না। দার্জিলিং আর রাঁচী, এই দু' জায়গা থেকে উত্তর এল, তাঁরা নিতে রাজী আছেন। দুটোই ভাল ইস্কুল। এ ছাড়া যা পাওয়া গেল—পূর্ণবাবুর পছন্দসই নয়। উনি এসব ব্যাপার হেমন্তর চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন—সুতরাং সে কোন তর্ক করল না বা জেদ ক'রে কলকাতাতেই রাখার চেষ্টা করল না।

তবে দার্জিলিং সে পাঠাবে না কিছুতেই। ঐ নামটাই তার কাছে অপ্রীতিকর—সেখানে পাঠানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং রাঁচীতেই পাঠাবে স্থির করল। মাস চারেক পরে সেসন্‌স্ শুরু হবে—সেই সময় কেউ গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসবে।

এই ক' মাস গৌরকে নিজের কাছে রেখে হেমন্ত বুঝল পূর্ণবাবুর উপদেশ কত মূল্যবান। এখন একেবারে শিশু নেই, বছর সাত-আট বয়স হয়েছে—তবু দায়িত্ব অনেক। ইস্কুলের সময়গুলো ছাড়া অষ্টপ্রহর বাড়িতে আটকে থাকতে হয়। নতুন ঝি বা ঠাকুর কারও ভরসাতেই একা রেখে যাওয়া যায় না। একদিন বিশেষ কাজে বেরোতে হয়েছিল, যাতায়াতে মাত্র ঘণ্টা-দুই সময় গেছে। তার মধ্যেই বাড়ি এসে দেখল হৈ-হৈ কাণ্ড। মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে ঠাকুর বেরিয়েছিল সামনের বাড়ির ঠাকুরের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে আসতে—তারই মধ্যে কখন কোন ফাঁকে ভেজানো কপাট খুলে গৌর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, কেউ লক্ষ্যও করে নি।

অনেকক্ষণ পরে ঝিয়েরই প্রথম লক্ষ্য হয়েছে যে, খোকা নেই। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে খবর দিয়েছে ঠাকুরকে—ঠাকুর ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে সময় নষ্ট করেছে খানিকটা—তারপর পাড়ার ছেলেদের জানিয়েছে। তারা চারিদিকে ভাগ হয়ে বেড়াজালের মতো খুঁজতে খুঁজতে চাঁপাতলার বাজারের কাছে এক ময়রার দোকানে দেখতে পেয়েছে বসে থাকতে।

তারাই ধরে এনে বাড়িতে পেঁছে দিয়েছে, কিন্তু তখনও যায় নি, সম্ভবত হেমন্ত এলে সব জানিয়ে জিম্মা ক'রে দিয়ে যাবে বলেই দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। সেই সময়েই হেমন্ত ফিরেছে। দরজার সামনে অত ভীড় দেখে প্রথমটা ভয়ে বুক কেঁপে গিয়েছিল তার। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর ঘটলে কারই বা ঘটবে—গৌরের ছাড়া? যাই হোক—ব্যস্তভাবে ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরে, তাকেই শুকনো মুখে আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—একটু তবু আশ্বস্ত হল। পরে ভেতরে এসে শুনলও সব ব্যাপারটা। তখনই আগে দু' টাকার রসগোল্লা আনিয়ে ছেলেগুলোকে প্রাণপুরে মিষ্টি খাইয়ে দিল।* তারপর ঝি-ঠাকুরকে খুব একচোট বকাবকি করল।

---

* সে সময়, সে সময় কেন, ১৯৪০ পর্যন্ত কলকাতায় সাধারণ দোকানে এক পয়সায় একটা ভাল আকৃতির রসগোল্লা পাওয়া যেত। আর দু' পয়সারগুলো (বর্তমান ৩ পয়সা) এখনকার পঞ্চাশ পয়সা সাইজের চেয়েও বোধ করি বড় হত।—লেখক

এর বেশী কিছু করার নেই। ফী-হাত এই ধরনের ঘটনায় তাড়িয়ে দিতে গেলে কিছুদিন পরে আর কাজ করার লোকই পাওয়া যাবে না। ঝি-চাকরের ওপর ভরসা ক'রে থাকলে এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী দায়িত্বজ্ঞান আশা করা ঠিক হবে না। তাদের কি গরজ? যাদের নিজেদের প্রাণের টান নেই—সে সদাজাগ্রত সদাসতর্ক হয়ে বালক কি শিশুকে পাহারা দিতে পারবে না কিছুতেই। কোন অর্থ বা পারিশ্রমিকের বিনিময়েই না। যার গরজ আর দায়িত্ব থাকার কথা—সেই তো অনায়াসে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল ছেলেটাকে, নিতান্তই রিরংসা চরিতার্থ করতে।

এর মধ্যে মনোরমার খবরও পাওয়া গেছে।

হেমন্ত অবশ্য খবর নিতে যায় নি—কিন্তু এসব খবর আপনিই আসে—যেন বাতাসে ভর দিয়ে এসে যথাস্থানে পৌঁছয়।

হেমন্তদের পাশের বাড়ির ঝিয়ের কে এক বোন কাজ করে বালিগঞ্জের দিকে—হেমন্তর বালিগঞ্জের বাড়ির পাড়াতেই—সে-ই খবর এনেছে, ঝিয়ের মুখে মুখেই এসেছে—সেখানে নাকি এক বিরাট দীঘি কাটানো হচ্ছে, ওদের ভাষায় 'অজগর পুকুর' একটা—রামধন নাকি সেইখানে মাটি কাটার কাজ করে, 'রোজ' পায়। রীতিমতো সংসার পেতেছে ওরা, পূর্ণবাবুদের বাগানবাড়ির কাছে রেল লাইনের ধারে এক বস্তির মধ্যে জমি ভাড়া ক'রে নিজেদের খরচায় মাটির ঘর বেঁধেছে।

সম্ভবত মনোরমার গলায় যে সোনার হারটা ছিল, তাছাড়া চার গাছা চুড়ি—হেমন্তই দিয়েছিল, সেইগুলো বেচেই ঐ ঘর উঠেছে। হয়ত তাছাড়াও দেনা কিছু হয়েছে, কারণ শোনা যাচ্ছে যে, ভারী পেট নিয়েও মনোরমা পাড়ায় কাদের বাড়ি ঠিকে কাজ করতে যায়—বাসনমাজা ঘর মোছার কাজ—মাসিক আড়াই টাকা মাইনেয়।

প্রথমটা অস্পষ্টভাবে, উড়ো উড়ো কথায়—মানে ওর ঝি ওকে সোজাসুজি খবরটা দিতে সাহস করে নি, ইশারায়-ইঙ্গিতেই একটু-আধটু যা জানিয়েছে—নতুন ঝি, মনিবের কড়া মেজাজ, কতদূর কড়া এখনও তার হিসেবটা পুরো বোঝে নি—তারপর সব কথাই কানে গেছে হেমন্তর। কিন্তু কে জানে কেন, কুরুচির জন্যে একটু ঘৃণাবোধ হলেও খুব একটা উষ্মা বোধ করে না সে। এই প্রবৃত্তি যে কত প্রবল তা ওর থেকে বেশি আর কে জানে! কার বিচার করতে যাবে সে নিজের লজ্জাজনক ইতিহাস নিয়ে! তাছাড়া—এতদিনে এটা বুঝেছে, সংসার পাতার ইচ্ছা আরও প্রবল। কামের থেকে সেই কামনার আকর্ষণ অনেক, অনেক বেশী।

সেটা যে কত প্রবল তা নিজের আচরণেই আরও একবার বুঝল।

হঠাৎ—গৌরকে রাঁচী পাঠাবার মাস-কতক বাদে—কোথা থেকে নিমাইচরণ আবার এসে হাজির হল।

সেই রকমই বেশভূষা—আধময়লা কাপড়ের ওপর ফরসা লংক্লথের পাঞ্জাবি একটা। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, খড়িওঠা চামড়া হাত-পায়ের—তফাতের মধ্যে এবার আর হাতে গামছায় বাঁধা পুটুলি নয়, একটা নতুন ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তাতে এক প্রস্থ

কাপড়-জামা, একখানা গামছা এবং কয়েকটা চালতা ও গোটাকুড়ি সুপুরি।

তবে সে তো পরের কথা, থিতিয়ে জিরিয়ে বসে ব্যাগ খোলার পর বোঝা গেল তার রহস্য। তার আগে তার আসাটা এবং সেটা যেমন আকস্মিক তেমনি নাটকীয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই, কোন কথা বলা কি কুশল-প্রশ্নের অবসর পাবার আগেই, ব্যাগটা একদিক ছুঁড়ে ফেলে একেবারে হেমন্তর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল বলতে গেলে।

'এই এলুম মা-জননী জ্যাঠাইমা, তোমার চরণে চিরদিনের মতো। মারো কাটো ফাঁসি দাও, লাথি মারো জোড়া জোড়া—একটা কথাও বলব না, তোমার পা ছেড়ে নড়ব না কোথাও। খেতে না দাও, না খেয়ে মরি, এখানেই মরব। এইখেনেই আমার আসল আছুয় বেশ বুঝেছি।'

মুখ চলছে বলে হাত বসে নেই—কথা বলতে বলতে হেমন্তর দুই পা সজোরে চেপে ধরেছে ততক্ষণে।

ঘটনাটার আকস্মিকতা সামলাতে ও সম্যক বুঝতে যেটুকু দেরি হয়েছিল, তারপরই আরও এই নাট্যুকেপনায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল হেমন্ত। ইদানীং মেজাজ ও রসনা দুই-ই যথেষ্ট উগ্র ও রুক্ষ হয়ে উঠেছিল—শ্বশুরকুল সম্বন্ধে তিক্ততাও বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন—সুতরাং যা মুখে এল তা-ই বলল ওকে—কোন গালাগালি দিতে কোন কটু কথাই বোধহয় বলতে বাকী রইল না, দৈহিক আঘাত ছাড়া সব লাঞ্ছনাই বর্ষিত হল সেই শ্বশুর বংশের প্রতীক ও প্রতিনিধি এই নিমাইচরণের ওপর,—কিন্তু নিমাই মূর্তিমান সহিষ্ণুতার মতো সমস্তই সহ্য করল। তাও বাধ্য হয়ে ম্লাননত মুখে নয়—যেন গালিগালাজ ও কটুক্তির মালা নয় ফুলের মালা পরিয়ে ওকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। এমনি সপ্রতিভভাবেই শুনে গেল সব, মুখের স্মিত প্রসন্নতা এতটুকু ক্ষুন্ন হল না।

বহুক্ষণ ধরে নিজের শ্বশুরকুলের ঝাড়গুষ্টি সম্বন্ধে বাছাবাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে নিজেই একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উপরন্তু এই ছেলেটার শান্ত প্রতিরোধের বর্মে প্রতিহত হয়ে শেষের দিকে গালাগালগুলোর ধারও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে এল—সেটা বুঝেই আরও একসময় চুপ ক'রে গেল, বাধ্য হল চুপ করতে।

তবে, এত কথা বললেও, 'দূর হয়ে যাও' বা 'তোমাকে থাকতে দোব না' একথাটা একবারও বলতে পারল না। আর তা বলতে পারল না বলেই নিমাইচরণের নিশ্চিন্ত প্রশান্তিও নষ্ট হল না। সে রয়েই গেল, সেদিন থেকে, বরং দিন-দুই পরে হেমন্তকেই বেরোতে হল তার জন্যে একজোড়া ধুতি ও একটা নতুন জামার ব্যবস্থা করতে।

অর্থাৎ অবাঞ্ছিত আগন্তুক পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল সংসারে। অতিথিও নয়—গৃহস্বামীর আত্মীয় সম্পর্কেই।

পূর্ণবাবু সব বিবরণ শুনে বললেন, 'আবার ঐ জঞ্জাল জড়াচ্ছ! এখনও তোমার চৈতন্য হল না!'

'চৈতন্য হল না কে বললে? এ আমার জ্ঞান পাপ। এই তো আমার আসল শোধ। যে শ্বশুরবাড়ি থেকে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শ্বশুরবাড়ির লোকই

অন্নদাস হয়ে থাকছে।'

পূর্ণবাবু হাসলেন শুধু একটু।

অশান্তির ভয়েই আসল কথাটা বললেন না। নইলে অনেকবারই মুখের কাছে এল কথাটা যে, 'আসলে তোমার সংসার পাতারই শখ!'

তবে তিনি না বললেও ও হাসির মর্ম হেমন্তর কাছে অজ্ঞাত রইল না।

নিজের কাছেই কি চাপা ছিল কথাটা?

এ পৃথিবীকে ও অনেকদিন দেখছে, অনেক রকম করে। নিজের মনের কথাটা নিজের কাছে ধরা না পড়ার কোন কারণ নেই।

॥ ১১ ॥

তবু, নিমাইচরণ যে বেশীদিন টিকবে তা মনে করে নি হেমন্ত। বরং কিছু হাতিয়ে নিয়ে একদিন সরে পড়বে—এই কথাই ভেবেছিল। কিন্তু সে-সব আশঙ্কা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নিমাই টিকে গেল। বরং বেশ জেঁকে বসল, বলাই উচিত।

শুধু তাই নয়, সে যা বলেছিল—'মারো কাটো ফাঁসি দাও—কোথাও নড়ব না, চরণ ধরে পড়ে থাকব' তাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করল সে।

হেমন্ত যেন ওকে তাড়াবার জন্যেই—অথবা যাচাই ক'রে বাজিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই—একটু বেশী রকমের দুর্ব্যবহার করে, ভূতের মতো খাটিয়ে নেয় তো বটেই, সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। 'ভূতগতো খাটুনী' যাকে বলে। বিনামাইনের কেন, কোন মাইনের চাকরও এত খাটতে রাজী হত না। তার ওপর উঠতে বসতে দুর্বাক্য—অশ্রান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার। এতটুকু ভুল-ত্রুটি—পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা নেই।

হেমন্তর বাড়ির ঠাকুরই পূর্ণবাবুর কাছে গল্প করেছে, 'সক্কাল বেলা উঠে মা ওর চোদ্দপুরুষকে নরকে না পাঠিয়ে এক ফোঁটা জল খেতে দেন না।···গালাগালে ঘুম ভাঙে দাদাবাবুর, গালাগাল শুনতে শুনতে শুতে যায়। যা মুখ মার, তাতে ভূতও পালাত হ্যাদ্দিন—এ ভূতের বেহদ্দ!'

কিন্তু সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। এতটা বাড়াবাড়িরও প্রতিক্রিয়া হবে বৈকি!

আস্তে আস্তে হেমন্তরও মন ভেজে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত। কখন যে নরম হয়ে আসে, কবে থেকে যে নিমাইকে—নিজের ছেলে না হোক, বাড়ির ছেলে, আত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে—তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

একদিন, ঝিয়েরই কী একটা অসম্ভ্রমকর উক্তিতে (ঝিয়ের দোষ কি, সে এতকাল যে ব্যবহার দেখেছে এবং তার যে ব্যবহার সহ্য করতে দেখেছে মনিবকে, তাতে এই ব্যবহারই মনিব চান—এই কথা যদি সে মনে করে তো সেটা অস্বাভাবিক ভাববার কোন কারণ নেই) অকস্মাৎ জ্বলে উঠে 'দাদাবাবু কি এ বাড়ির চাকর-বাকর?' বলে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চমকে উঠে প্রথম এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে সে!

নির্ভরতাও এসেছে বৈকি! আবার একটু একটু ক'রে ঘর-বাড়ির কাজ শুরু করেছে, সে কাজে এমনিই একটি বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল, মনে মনে তাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকটা দায়িত্বের আর ঝঞ্ঝাটের ভার লাঘব হয়েছে এই ছেলেটার দ্বারা।

হেমন্তর কাছে ফাঁকি দিয়ে পার পাওয়া বা চুরি করা শক্ত—তবু সে চেষ্টাও যে করে না নিমাই, এটা খুব লক্ষ্য ক'রে দেখেছে সে।

তার মানে ছেলেটা চালাক, খুবই চালাক।

যে গাছে বসে থাকবে বলে ভেবেছে, বসে আছেও—তার ডাল কাটতে চায় না, মুলোচ্ছেদ করে না। যার অনেক পয়সা আছে, উত্তরাধিকারী নেই—তার মন যুগিয়ে চলে সুনজরে পড়লে এককালে এই সবই পেতে পারবে—এ জ্ঞানটা আছে।

তবে নিমাইচরণ যতই বশম্বদ হোক, তার ওপর আশা বা ভরসা বিশেষ ছিল না, ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে নায়ক নয়—আর যা-ই হোক।

যেখানে আবার নতুন ক'রে আশা অঙ্কুরিত হয়েছে, অনেকখানি আশা—সেখানেই ক্রমে হতাশ হতে হয় ওকে।

তারকের মৃত্যুর পর গৌরের মতো আর কাউকে ভালবাসে নি ও, আর কাকেও কেন্দ্র ক'রে এমন আশার প্রাসাদ গড়ে তোলে নি। ইতিমধ্যেই বিগত জীবনের বিপুল আশাভঙ্গের দুঃস্মৃতিগুলো বিবর্ণ হতে চলেছে, সে জায়গা অধিকার করেছে কল্পনা—সুদূর ভবিষ্যতের অনেক সুখ-সৌভাগ্যের রঙীন চিত্র আঁকতে শুরু করেছে।

গৌর বড় হবে, পাস করবে—ডাক্তারী নয়—ডাক্তারী পাস করার কথা মনে হলেই ভয় করে ওর—ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াবে শিবপুরে কি রুড়কীতে রেখে, বিয়ে দেবে, ছেলেপুলে হবে, ওরই নাতি-নাতনী।...হ্যাঁ, নাতি-নাতনীই। গৌরকে কে—বোধ হয় সাধু কি মনোরমাই—মা বলতে শিখিয়েছিল হেমন্তকে, হেমন্তও তার প্রতিবাদ করে নি, বরং এখন তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এই সম্পর্কেই স্বাভাবিক বোধ হয়—আস্তে আস্তে কখন সত্যিই ছেলে বলে ভাবতে শিখেছে।

চেষ্টা বা আয়োজনেরও কোন ত্রুটি নেই অবশ্য—

কবিদের ভাষায়, আশাতরু-মূলে বারি-সিঞ্চনের।

বড় মিশনারী ইস্কুলের খরচ ও ঝঞ্ঝাট দুই-ই বেশী। বাঁধা পোশাক, হরেক রকম বাড়তি খরচ। শিক্ষার সমারোহ বলা চলে। সে-সব হাসিমুখেই বহন করে হেমন্ত, হয়ত প্রয়োজনের বেশিই করে।

বড়লোকের ছেলের মতোই মানুষ হয় গৌর—সেইভাবেই মানুষ করার চেষ্টা করে হেমন্তও। তারকের বেলায় যে সব সাধ মেটে নি—কতকটা নিজের অক্ষমতার জন্যেও বটে, তখন আদৌ স্বচ্ছল ছিল না অবস্থা, কতকটা তারকের অনিচ্ছার জন্যেও—মা যে তার জন্যেই এত নিচে নেমেছে, এই কাজ করছে, সেজন্যে তার কুণ্ঠা ও বেদনার অবধি ছিল না, যত কম খরচ ক'রে পারে ততটাই করার চেষ্টা করত—সেই সব সাধ গৌরকে দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করে।

এখান থেকে রাঁচী বহুদূর, সবটা ট্রেনে খাওয়াও যায় না—একটু হাঙ্গামা ক'রেই যেতে হয়, তবু দু'মাস-তিনমাস অন্তরই হেমন্ত গিয়ে দেখে আসে। পুজো ও গরমের ছুটির আগে নিজে গিয়ে নিয়ে আসে। সে সময়ও ওকে ভাল ভাল খাবার ক'রে খাওয়াবার, ওকে নিয়ে উৎসব করার ধুম পড়ে যায়। আর সেই আড়ম্বরের মধ্যে যে নিমাইচরণের প্রতি কিছুটা অবিচার ও অসম্মান করা হয়—সেটাও মোহাচ্ছন্ন হেমন্ত বুঝতে পারে না।

কাকা চাকরের মতো খাটে, তাই নয়—চাকরের মতো ভাইপোরও খেজমৎ খাটতে হয় তাকে, ফাইফরমাস পালন করতে সদা তটস্থ ত্রস্ত থাকতে হয়। হেমন্তর মতো বহুদর্শী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকেরও এই বিসদৃশ আচরণ চোখে পড়ে না—এটাই আশ্চর্য। গোরা তাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, মানুষের সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিও আর কাজ করছে না।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে নিমাইচরণকে তবু কিছুটা রক্ষা করেন পূর্ণবাবু।

সে-ই বোধকরি এ সংসারে তাঁর শেষ কর্তৃত্ব, শেষ হস্তক্ষেপ।

নিউমোনিয়ার পর থেকে বৃদ্ধ পূর্ণবাবু আর কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি, আগেকার সে পরিশ্রমের শক্তি কিছুই প্রায় ফিরে পান নি। সুতরাং এ-বাড়িতে আসাটাও তাঁকে কমাতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু'মাস-তিনমাস অন্তর এক-আধঘণ্টার জন্যে আসতেন—চাকরদের নামাতে হত গাড়ি থেকে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ও তাদের সাহায্য দরকার হত—সেটা চিরদিনের কর্মঠ পূর্ণবাবুর ভাল লাগত না। সে জন্যে আসতেও চাইতেন না আর।

বেশির ভাগ সময় হেমন্তই ওঁর খবর নিত তাই। পূর্ণবাবুর বাড়াবাড়ি অসুখের সময় থেকে ও-বাড়ির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রীই খুলে দিয়েছেন সে দরজা। সুতরাং কোথাও কোন কাজে যাতায়াতের সময় বা এমনিই, খবর নিতেই—শরীর খারাপের খবর পেলে—হেমন্তই যেত ওঁর কাছে। প্রয়োজন বুঝলে এক-আধদিন থেকেও যেত। শরৎসুন্দরীও আসতেন কখনও কখনও, তবে তিনি বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সঙ্গেও লোক থাকা দরকার হত।

এমনি এই দুর্লভ অবসরেই পূর্ণবাবু এসে পড়েছিলেন, দেখেছিলেন নিমাইচরণের হেনস্থাটা।

তিনিই আড়ালে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন হেমন্তকে, 'এ কী করছ! বিষয়ের লোভে ছোঁড়াটা হয়ত সব সহ্য করছে, করবেও—কিন্তু ভাইপোটা যে বিষ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যতই হোক, এতটা থ্যাৎলানো কখনও কোন মানুষের বরদাস্ত হয় না। কেনই বা অমন করছ? এতে বড় আকোচ বেড়ে যায়—শুধু শুধু একটা শত্রু তৈরী করছ কেন? এ রকম অকারণ মার খেতে খেতে একদিন না একদিন সাপ ফণা তুলবেই—তখন পারবে সে বিষের ধাক্কা সামলাতে? পাড়াগাঁয়ের লোক ওরা—না পারে এমন কাজ নেই, কখন কোথা দিয়ে কি অনিষ্ট ক'রে বসবে তা টেরও পাবে না। একটা কিছু হয়ে গেলে কি ফেরাতে পারবে? হাজার কপাল চাপড়ালেও ফিরে আসবে না সময়টা। ছিঃ! তোমার মতো মানুষ এমন অন্ধ হয়ে যায় কি ক'রে তা বুঝি না।...আদর করতে চাও আদর দেখাতে চাও তার হাজারো পথ খোলা—তার জন্যে ও ছোঁড়াটার ওপর এমন অত্যাচার চালাতে হবে কেন?'

তাতেই কাজ হয় খানিকটা। হেমন্ত সাবধান হয়।

কাকা যে কাকা—বাড়ির চাকর-বাকর নয়—হঠাৎ সেই জ্ঞানটা গোরের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দেরি হয়ে গেছে বহুদিক দিয়েই।

এত আদরে ও আড়ম্বরে মানুষ করার আগে বা মানুষ করার কথা চিন্তা করার সময়ই একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল বোধ হয়।

বিলাসে ঐশ্বর্যে মানুষ করতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমানুষ হয় ছেলেমেয়েরা।

তাছাড়াও হেমন্ত নিজেই শ্বশুরদের 'ঝাড়গুষ্টির'—যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ করত, তাদের গুণের ব্যাখ্যানা ক'রে—গৌরও যে সেই ঝাড়-বংশেরই একজন, সেই ক্ষেত্রেই তার জন্ম—একথাটাও স্মরণ রাখতে পারত। আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না—এ তো অবিসম্বাদী সত্য।

কারণ যা-ই হোক—আসল কথা যা, হেমন্তর এত চেষ্টা সত্ত্বেও গৌর মানুষ হল না।

রাঁচীতে পাঠাবার পর একবছর বেশ ছিল। হয়ত বেশ থাকতও—যদি না হেমন্ত বার বার দেখতে যেত।

কে জানে—হেমন্তর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আবহাওয়া, কলকাতার বহুবিধ উৎসব-সমারোহ তার সহস্রবিধ প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হত কিনা! সেই স্মৃতিই হয়ত তাকে চঞ্চল অস্থির গৃহাভিমুখী ক'রে তুলত। কিন্তু এখানে এলে সুবিধা হবে না, এটুকুও সে জানত, কঠোর তিরস্কার সইতে হবে এবং কঠোরতর ব্যবস্থায় আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তাই সে অন্যত্রই পালাতে চেষ্টা করল।

এই শ্রেণীর ছেলেরা প্রায়ই নির্বোধ হয়। নির্বোধ না হলে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে নষ্ট করবে কেন? কেউ কেউ হয়ত কিছু ধূর্ততা বা চাতুর্যের পরিচয় দেয়—এইভাবে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করার সময়—কিন্তু সেটা বুদ্ধির নিদর্শন নয় আর যা-ই হোক।

বাড়ি থেকে কি হোস্টেল থেকে পালাবার সময় এরা আপাত-ভবিষ্যতের কথাটাও চিন্তা করে না। পালিয়ে কি করবে, কি খাবে, ক'রে-খাবার কোন যোগ্যতা বা সম্ভাবনা আছে কিনা—এসব কথা ভাবার শক্তি, হয়ত বা ইচ্ছাও থাকে না এদের, অপ্রীতিকর চিন্তার এই দিকটাতে চোখ বুজে থাকে জেনেশুনেই—আপাতত এই নিয়মের কড়াকড়ি শাসন বা লেখাপড়ার হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাবে—এই কথাটাই মাথায় থাকে শুধু।

গৌরও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। হয়ত বা আরও বেশী নির্বোধ। সাধুচরণের ছেলে সে, কতকটা সেইরকমই হবে বৈকি!

সেও কিছু না ভেবেই পালাল।

তবে মিশনারী পাদ্রী সাহেবরাও এসবে অভ্যস্ত। এর জন্য কতকটা প্রস্তুতই থাকেন তাঁরা, একটা ব্যবস্থাও ঠিক থাকে। প্রয়োজন হলেই যন্ত্রের মতো কাজ করে সেটা। সুতরাং ধরে ফেলতে বা ফিরিয়ে আনতেও বেশী দেরি হল না। ফিরিয়ে এনে কড়া পাহারায় রেখে তাঁরা হেমন্তকে জানালেন সংবাদটা।

বলাবাহুল্য হেমন্ত খবর পেয়েই ছুটে গেল।

ইস্কুলের কর্তারা বিরক্ত, ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁদের কাছে বহু মিনতি ক'রে—মা-বাপ-মরা অনাথ ছেলে, তাঁরা দয়া না করলে মানুষ হবে না—ইত্যাদি

বলে নিরস্ত করল। তাঁদের ব্যবস্থায়ও কিছু ত্রুটি আছে, ছোট ছোট ছেলেদের ওপর নজর রাখাও তাঁদের দায়িত্ব—একথাটাও যথাসম্ভব মোলায়েম আবৃত ভাষায় ভদ্রভাবে মনে করিয়ে দিল। তাতেই কাজ বেশী হল হয়ত। তাঁরা ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

ওদিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে গোরাকে নিয়ে পড়ল।

কিছু মিষ্টি কথায় বোঝাল, কিছু তিরস্কার করল। ভয়ও দেখাল কিছু। এইভাবে পালিয়ে এই বয়সে কী ক'রে খাবে সে? হয় ভিক্ষে করতে হবে, কোন বদ-ভিখিরীর পাল্লায় পড়লে কানা-খোঁড়া ক'রে দেবে, জোর ক'রে হাত-পা ভেঙে দেবে হয়ত ভিক্ষে করবার জন্যে—নয়তো চায়ের দোকানে কাপ-ডিশ ধুতে হবে। কি বিড়ি পাকানো শিখতে হবে। তাও সে কাজও শিখতে হবে, সে সময়টা খাবে কি? আর সে-ই কি খুব ভাল লাগবে? কেউ তো কোথাও নেই তিনকুলে। দেশের বিষয়-আশয় তো জ্যাঠা-কাকা-ঠাকুর্দার দল দখল ক'রে বসে আছে—পাত্তাও দেবে না। আর সে-সব জমিজমা ভাগ হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সারা বছরের শুধু ভাতও মিলবে না। তাহলে কী করবে সে, কিসের আশায় পালিয়েছিল?

প্রথমটা মুখ গোঁজ ক'রে বসেছিল গোরা—হয়ত একটু বুঝল, হয়ত ভয়ও পেল। দীর্ঘ বক্তৃতার ফল কিংবা এতক্ষণের বকুনিতে ক্লান্ত হয়ে অব্যাহতি পাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিল এমন কাজ আর সে করবে না। মন দিয়ে পড়াশুনো করবে।

নিশ্চিন্ত হতে পারল না পুরোপুরি, ঠিকই—তবু আর কী-ই বা করার আছে? এতেই খুশী হয়ে ফিরতে হল। আরও দু'দিন থেকে, গোরাকে আরও একটু বুঝিয়ে—ভবিষ্যতের অনেক মনোহর প্রলোভন দেখিয়ে—পাদ্রী-সাহেবদের কাছে আর এক দফা মিনতি জানিয়ে হেমন্ত ফিরে এল।

এবার যাওয়া-আসা অর্থাৎ দেখতে যাওয়াটা অনেক কমিয়ে দিল। যেটা আগে প্রায় দু'মাস অন্তর ছিল সেটাই পাঁচ-ছ'মাস অন্তর হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে অনেকেই কথাটা বলেছে ওকে। এত বার বার বাড়ির লোক দেখতে গেলে হোস্টেলে মন বসে না, সেইজন্যেই আরও পালাতে চায়। স্বাভাবিক সেটা।

অপরে যতই বলুক অত গ্রাহ্য করত না হয়ত—স্বয়ং পূর্ণবাবুও ঐ এক কথাই বললেন। হেমন্তর পরিচিত সকল লোকের থেকেই পূর্ণবাবুর সাংসারিক জ্ঞান বেশী, এ পরিচয় বার বারই পেয়েছে সে।

বহু অভিজ্ঞতা ও পরাজয় স্বীকারের পর ইদানীং হেমন্ত নিজের কাছেই কথাটা মানতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু কে জানে, হয়ত এতেই আরও অনিষ্ট হল খানিকটা, হিতে বিপরীত হল। এবার এই দেখতে আসার বা খবর নেবার সময়গুলোর মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘতর হওয়াটাকে সে উপেক্ষা বা অবহেলা বলে মনে করল। আর সম্ভবত সেই অভিমানেই—পড়াশুনো ভবিষ্যৎ—সমস্ত তিক্ত অর্থহীন মনে হল। বছরখানেক না যেতে আবারও পালাল সে একদিন।

এবার আর খবর পেয়ে হেমন্ত ছুটে গেল না আগের মতো।

গেল না—তার কারণ, এখানে খুব কাজ পড়ে গেছে সেই সময়। বাড়ি-ঘরের কাজ। ইদানীং নিমাইচরণকে পাওয়ায় ওর কাজের উৎসাহ কিছু বেড়ে গিয়েছিল। ভূতের মতো খাটতে পারে—খাটার মধ্যে টো-টো ক'রে ঘোরাই বেশী—অথচ বিশ্বস্ত, এমন লোক পাওয়া সহজ নয়। আর এরকম লোক না পেলে একা মেয়েছেলের পক্ষে এই ধরনের ব্যবসা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ওরই দুর্বুদ্ধি—হাতের লোককে উদ্যোগী হয়ে ও-ই খুইয়ে বসে রইল।

নিমাইচরণই কথাটা পেড়েছিল প্রথমে, খুব সাধারণভাবে, কতকটা বাজে কথার মতোই।

'বসেই তো আছি, ডাক্তারবাবুকে বলে একটা কোথাও কাজকর্ম যোগাড় ক'রে দিন না জ্যাঠাইমা!···আপনার আর এ কতটুকু কাজ, ফাইফরমাশ খাটা বই তো নয়—বাকী সব সময়ই তো বসে হাপুগেলা বলতে গেলে!'

'কি কাজ করবি তুই? কি জানিস?'

প্রশ্নও যেমন উত্তরও তেমন। সমান তাচ্ছিল্য আর ঔদাসীন্যের সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল হেমন্ত।

'কুলীগিরি! মিস্ত্রী! আবার কি!' আত্মধিক্কারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল নিমাই, 'বামুনের ঘরের গরু, শাঁকে ফু' কি কানে-ফু'রও তো যুগ্যি নই যে, সে কাজ করব—এক আছে উনুনে ফু', রাঁধুনী বামুনের কাজ করতে হয়। বামুনের কাজ তো ঐ পর্যন্ত ইতি। তা নইলে সোজাসুজি মোট বওয়া কি লোকের বাড়ির উঠোন ঝাঁট দেওয়া। তবে তুমি যেকালে চরণে ঠাঁই দিয়েছ (নিমাইচরণের 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে বারংবার যাতায়াত ঘটে—হেমন্তকে সম্বোধন করার সময়), সেকালে—একেবারে তো ভাতের দুঃখু ঘটে নি—অত ছোট কাজ আর করব না। নইলে আমি সে বান্দা নই, ঐ যে ভোরবেলা পাইপে ক'রে রাস্তায় জল দেয়—সে কাজও আমি করতে রাজী আছি। খাটুনি তা সে যা-ই হোক—কোনটাতেই আমি পিছ্‌পা নই। তবে অততে দরকারই বা কি, আমাদের উদিক থেকে কত লোক তো সব নানান্‌ কারখানায় কাজ করতে আসে এই কলকেতাতে। সে কাজ নাকি মেলেও, একটু খোঁজ করলে। বেশিরভাগই নোয়া পেটার কাজ, অন্যরকম মিস্তিরীর কাজও করে কেউ কেউ। নেলোর কারখানায়* যায়। আমার এক জ্ঞাতিকাকা বুড়ো বয়সে বলতে গেলে—মানে সত্যি কি আর বুড়ো—এই তিরিশ-বত্তিরিশ হবে পেরায়, নেলোর কারখানায় ঢুকেছে। বারো আনা রোজে ঢুকেছেল, এখন আঠারো আনা ক'রে পাচ্ছে।...এলেক্টার কোম্পানীর কারখানাতে ভাল মাইনে দেয় শুনেছি—এক টাকা পাঁচসিকে রোজ পায়—ওদের ওখেনে কুলীও বলে না, বলে মিস্তিরী। ···আমার এক বোনাই ঢুকেছে ওখেনে, মাসে পেরায় তিরিশ-একতিরিশ টাকা রোজগার করছে!'

এমনি কত কি বকে যায়—কিছু শোনে কিছু শোনে না হেমন্ত, অন্যমনস্ক হয়ে বসে

---

* লিলুয়ার ওয়ার্কশপ। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের অন্যতম কারখানা ছিল। এখন ইস্টার্ন রেলওয়ের।

হিসেব লেখে শেলেটে।

নিমাইচরণ অবশ্য এ ঔদাসীন্যে দমে না। সে অপেক্ষা করতে জানে। খুব কড়া তাগাদা করে না—তবে মধ্যে-মধ্যেই কথাটা তোলে। হয়ত বলে, 'হ্যাঁ গো জ্যাঠাই, তুলেছিলেন কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে? বসে বসে যে শেকড় গইজে গেল পেছনে!'

নয়তো বলে, 'সন্তানকে একেবারে ভুলে বসে রইলে জননী! বুড়োটা থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও না!'

তাই বলে সত্যিই কিছু বসে থাকে না সে। খাটুনী খুবই তা হেমন্ত নিজেই স্বীকার করে। সেইজন্যেই আরও—ওর এই বিনয়ে খুশী হয়। এ খাটুনিটা নিমাইয়ের গায়ে লাগছে না এতে তার গোপন অপরাধবোধ অনেকখানি সান্ত্বনা পায়।...ভূতের মতো খাটছে শুধু পেটভাতায়—এ তথ্যটা ওর বিবেককে পীড়া দেয় বৈকি মধ্যে-মধ্যে।

এইভাবে কথাটা শুনতে শুনতে একদিন পূর্ণবাবুকে বলেছিল হেমন্ত। পূর্ণবাবু এখন প্রায় শয্যাশায়ী—শুয়েই থাকেন বেশির ভাগ—চলাফেরা করা কি রুগী দেখতে বেরনো ন'মাস-ছ'মাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখনও বহু লোকই ওঁর কাছে আসে, ডাক্তার ছাড়াও বহু গণ্যমান্য লোক। সুতরাং এখনও তাঁর সুপারিশের দাম আছে।

পূর্ণবাবু শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'ছোকরা চালাক আছে তো!...সত্যিই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ক'রে কাজটা শিখছে ঠিকই—কিন্তু টাকা না থাকলে নিজে কোনদিনই এ কারবার করতে পারবে না। তুমি তো করছ কতকটা শখ ক'রে—না করলে ভাতভিক্ষে জুটবে না এমন তো নয়—খেয়াল হলেই কোনদিন টপ ক'রে সব বন্ধ ক'রে দেবে—তখন ও কি করবে? নিজের সেই ভবিষ্যৎটাই চিন্তা করছে আর কি!...তা ভালই। তোমার মর্জি-মেজাজের সঙ্গে চিরদিন যে তাল রেখে চলতে পারবে, তারও তো ঠিক নেই। দিন থাকতে থাকতে দিন-কিনে নেওয়াই দরকার। আচ্ছা, দেখি!'

আর এ প্রসঙ্গ ওঁর কাছে তোলে নি হেমন্ত। অত মনেও ছিল না। পূর্ণবাবু যে সত্যি-সত্যিই কিছু ক'রে দিতে পারবেন তা ভাবে নি, সেরকমভাবে সুপারিশ করার মতো ক'রেও বলে নি। কতকটা কৌতুকছলেই বলেছিল।

কেবল নিমাইচরণকে কথাটা বলে ফেলেছিল একবার।

তাগাদাটা অনেকদিন অন্তর অন্তর দিত নিমাই—মেজাজ বুঝে—পাছে বিরক্ত হয়ে ঝেঁঝে ওঠে, সেজন্যে অতি সাবধানে। এমনিই একটা তাগাদার মুখে হেমন্ত কতকটা দায়-এড়ানোর ভাবেই বলে ফেলেছিল, 'ডাক্তারবাবুকে বলেছি তোর কথা। তিনি চেষ্টা করবেন বলেছেন।'

আর কিছু বলে নি নিমাইচরণ। তাগাদা করে নি আর। মানে হেমন্তকে করে নি। করেছে যথাস্থানে। যাতায়াতের পথে ওদিকে কোন কাজ থাকলে—পূর্ণবাবুর খবর নিত সে। হেমন্তই বলে রেখেছিল। সেই সুযোগটাই নিয়েছে নিমাইচরণ।

আগে কোনদিনই নিজের কথা বলে নি, আইন বাঁচিয়ে চলেছিল—হেমন্ত কথাটা ওঁকে বলেছে শোনার পর তাগাদাটা ঐখানে শুরু করেছে—যথাসম্ভব দীনতা ও বিনয়ের সঙ্গে। তাতে কাজও হয়েছে। এক বন্ধুকে বলে টেলিফোন কোম্পানীর এক সাহেবকে ধরিয়ে সেখানেই শিক্ষানবীশ মিস্ত্রীর কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন পূর্ণবাবু, আঠারো টাকা

বারো আনা মাইনেতে। একবছর পরে কাজ শিখলে চাকরি পাকা হবে, মাইনেও হবে চব্বিশ টাকার মতো।

হেমন্ত যখন কথাটা জানল তখন কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। চাকরির চিঠি এসে যেতেই জানল সে। তার হাতেই চিঠি এসে পড়ল। তখন আর বাধা দেওয়া যায় না, দিতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়, প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, এই আয়টা পুষিয়ে দেবে সে।

তাছাড়া, তখন অতটা বোঝেও নি। চাকরির মধ্যেই ওর কাজটাও কতক দেখতে পারবে—মিস্ত্রী খাটাতে পারবে না ঠিকই, তবে, ভোরে কি অফিসের ফেরৎ ইটসুরকির বায়না দেওয়া, তাগাদা করা অর্থাৎ মাল আনার যাবতীয় ঝঞ্ঝাট বইতে পারবে—এইটেই ভেবেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিশেষ কিছুই আর তার দ্বারা হচ্ছে না। সকাল সাতটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় সে—তার মধ্যেই বাজার ক'রে নিজের ভাত নিজে রেঁধে খেয়ে যায়। আজকাল এক মেয়েছেলে রাঁধুনী হয়েছে হেমন্তর—সে বুড়োমানুষ, অত সকালে ভাত দিতে পারে না। হেমন্তই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, রাত্রের তরকারী আলাদা ঢাকা থাকে, ভোরে উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে একটা বাঁটলোয় শুধু চাট্টি ভাত চাপিয়ে দেয় নিমাই। চান সেরে ভাত নামিয়ে রেখে বাজার চলে যায়, সেখান থেকে ফিরে কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজেই বেরিয়ে পড়তে হয়, সকালে আর কোন কাজেই পাওয়া যায় না।

বিকেলে ফেরে—যেদিন খুব সকালে হয়—পাঁচটায়, নইলে সাতটায়, কোন-কোনদিন বাইরে দূরপাল্লার কাজ থাকলে রাত আটটা-ন'টাও বেজে যায়। তখন আর তাকে কোন কাজের কথা বলা যায় না। বললেও কোন কাজ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। অত রাত অবধি কে ওর জন্যে বসে থাকবে দোকান-দপ্তর খুলে?

এক শুধু রবিবারগুলোতেই যেটুকু কাজ পাওয়া যায় নিমাইচরণকে দিয়ে—শনিবারের বিকেল আর রবিবার। অবশ্য এই দেড়দিন ভূতের মতোই খাটে নিমাই, অবিরাম—তবু সাড়ে পাঁচদিনের ক্ষতি তাতে পোষানো যায় না।

এই প্যাঁচে পড়েই হেমন্ত হিমসিম খাচ্ছিল—যখন গোরার দ্বিতীয়বার পালানোর খবর এসে পৌঁছল। অনেক কাজ হাতে, অনেক কাজে হাত দিয়ে ফেলেছে—এখন তিন-চারদিন বাইরে কাটিয়ে এলে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটাতে হয়—সে না থাকলে মিস্ত্রী-মজুর নিজেরা তো ফাঁকি দেবেই, সেও এক কথা—আবার মালপত্র ঠিকমতো না যোগাতে পারলেও কাজ পড়ে থাকবে, শুধু শুধু ওদের রোজ গুনতে হবে। তার ওপর—উনো কর্ম দুনো—একরকম ও বলে যাবে তারা আর একরকম ক'রে রাখবে, একে আবার হয়ত ভেঙে নতুন ক'রে করাতে হবে। এতকাল মিস্ত্রী খাটিয়ে এবিষয়ে তার এ অভিজ্ঞতা বার বারই হয়েছে, সেই ভয়ই তার সবচেয়ে বেশী।

সে জন্যেও বটে—হয়ত আবার পাদরীদের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট ক'রে অনুনয়-বিনয় করতে হবে, সেটাও খুব রুচিকর মনে হল না—সে ইস্কুলে চিঠি লিখে দিল, তাঁরা যেন যেমন ক'রে পারেন ধরে আনেন—দরকার হয় পুলিশের সাহায্য নিয়েও—খরচা যা

লাগে সে দিতে প্রস্তুত আছে। তবে এ ব্যাপারে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব যে ওঁদেরই—একথাটাও চিঠির শেষে মনে করিয়ে দিতে ভুলল না।

॥ ১২ ॥

কিন্তু শুধুই নিজের স্বার্থের জন্যে হেমন্ত যায় নি রাঁচীতে—একথা বললে বোধ হয় সত্যের একটু অপলাপই হয়।

আর একটা কারণ ছিল।

রাচী থেকে যেদিন চিঠি আসে সেই দিনই সকালে পূর্ণবাবু ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাঁচীর চিঠি বিলি হবার অনেক আগেই।

ডেকে পাঠানোর মধ্যেও একটু বিশেষ ছিল। একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছিল কোচম্যান। প্রথমটা চমকে উঠেছিল হেমন্ত, বেশ একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল—অত সকালবেলা ও-বাড়ি থেকে গাড়ি এসে দাঁড়াতে—কিন্তু কোচম্যান যে চিঠিটা দিলে সেটা পূর্ণবাবুর নিজের হাতের লেখা দেখে একটু আশ্বস্ত হল।

সামান্যই, এক লাইন চিঠি।

'পারো তো একবার এখনই একটু ঘুরে যাও। খুব বিশেষ দরকার।'

কোন স্বাক্ষর নেই—না ইংরেজী না বাংলা—কোন সম্বোধনও নেই। তার দরকারও নেই। হাতের লেখাটা এত পরিচিত যে, কার লেখা বা কাকে লেখা—বুঝতে দেরি হয় না।

হাতে জরুরী কাজ ছিল, তবু হেমন্ত তখনই রওনা হয়ে গেল।

এরকম আহ্বান এই প্রথম—এতকালের মধ্যে। খুব জরুরী দরকার না থাকলে এমনভাবে ডেকে পাঠাতেন না পূর্ণবাবু।

বাড়ি ঢুকতে সিঁড়ির মুখেই শরতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার দিদি? এমন জোর তলব?'

তখনও ভাল ক'রে শরতের মুখের দিকে চায় নি সে। ঐদিক থেকেই আলোটা এসে পড়েছে বলে দেখাও যাচ্ছিল না ঠিক। আর কয়েক ধাপ উঠে কাছে এসে দেখতে পেলে খুব ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছেন শরৎসুন্দরী। ঠিক কাঁদছেন না, কিন্তু চোখের কোণে কোণে জল—যে কোন মুহূর্তে ঝরে পড়বে হয়ত। চোখ অনেকটা ভেতরে বসে গিয়েছে, চারিদিকের চামড়া কুঁচকে বেড়ার মতো হয়ে আছে বলেই জলটা বাঁধে বাধা পাওয়ার মতো আটকে আছে সম্ভবত, নইলে অনেক আগেই ঝরে পড়ত।

শরৎসুন্দরী প্রায়-বুজে-আসা গলায় বললেন, 'কি জানি ভাই! এমনি তো দেখি বেশ সহজ মানুষ, হঠাৎ কাল রাত্তিরে আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে—বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে—কোন্‌টা কার নামে—কত টাকা কোথায় কিভাবে লগ্নী আছে—এই সব বোঝাতে লাগলেন।...যত বলি, "কেন এখনই এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে, এত কি তাড়া"—ততই বলে, "তুমি বোঝ না, মানুষের কি কারও মাপা পরমায়ু আছে, কার কখন দিন ফুরিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। আর এমনিও তো অনেক দিন হয়ে গেছে, এতদিন আর কে বাঁচছে আজকাল? ভগবানের দেওয়া ছুটি

ফুরিয়ে গেছে, এখন যাকে বলে জাঁকড়ে থাকা—তাই আছি, কখন ফেরৎ নেবে তা কেউ জানে না। এসব বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, একটু বুঝে জেনে রাখো। ছেলে জানে সব—তবে তোনারও একটু জেনে রাখা ভাল, এখনকার দিনে—বিশেষ যেখানে টাকা-আনা পাইয়ের গন্ধ আছে—কোনো ব্যাটা-বেটিকে বিশ্বাস করি না।"...বলি যে, "আমিই বা আর কতকাল বাঁচব, কদ্দিনের ইজেরা নিয়ে এসেছি তুমি মনে করো?" তার বেলায় জবাব দেয়, "তারও কি কিছু ঠিক আছে? বুড়ো হয়েছ ঠিকই—তাই বলে যে আরও তিরিশ বছর বাঁচবে না এও কেউ বলতে পারে না। আর কি জানো, হাতে টাকা থাকলে বুড়ো বয়সে লোকে দেখবে—নইলে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী সকলেই দূরছাই করবে, বেশীদিন ভুগলে তো কথাই নেই—কেউ ঘরে উঁকিও মারবে না। সেবা করা তো দূরের কথা। তেষ্টার এক ফোঁটা জলও পাবে না।" এই সব যত বাজে কথা। শরীর খারাপ হলে কেউ এভাবে এত কথা গুছিয়ে বলতে পারে? তুমিই বলো ভাই? ...এ তো মনে হচ্ছে সহজ মানুষ, সেই আগের মতো।...অথচ কেন যে হঠাৎ এমন তাড়া পড়ে গেল—এইভাবে বিদেয় নেবার মতো ক'রে—'

কথা শেষ হয় না, বলতে বলতেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেন এবার শরৎসুন্দরী।

'কাঁদবেন না দিদি, ছিঃ!' হেমন্ত নিজের আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়ে দেয় ওঁর, 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হয়ত ওঁরই বোঝার ভুল, শুয়ে থেকে থেকে রোগা মানুষের অনেক রকম ঝোঁক চেপে বসে, মনে হয়েছে হয়ত এবার তৈরী হওয়া দরকার—তাই!...আর সে যা-ই হোক, প্রিয়জনের নিঃশ্বেস থাকতে মা স্ত্রী এদের শোকের জল ফেলতে নেই চোখ থেকে—তাতে অকল্যাণ হয়। আপনি স্থির হোন, অদৃষ্টে যদি থাকে কেউ খণ্ডাতে পারবে না—তবে আগে থাকতে এসব ভেবে মন খারাপ ক'রে লাভ কি?'

বোধ হয় এমনি বলিষ্ঠ আশ্বাসেরই প্রয়োজন ছিল, শরৎসুন্দরী নিজেকে সামলে নিলেন আস্তে আস্তে। চোখের জল মুছে অনেকটা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন, পূর্ণবাবু যে ঘরে ছিলেন তার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন হেমন্তর সঙ্গে। তবে ঘরে ঢুকলেন না, বললেন, 'তুমি যাও ভাই, তোমাকে নাকি আলাদা কি বলতে চান। আমি একটু ওদিকটা দেখি—তোমার জন্যে চা-জলখাবার নিয়ে আসি গে বরং—'

মুখে শরৎকে যা-ই বলুক, আশঙ্কা একটু ছিলই মনে মনে। পূর্ণবাবুকে এর আগে দু-একবার রুগীর চেহারা দেখে 'নিদান হাঁকতে' শুনেছে সে। তখন মনে হয়েছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে পূর্ণবাবুর, রুগীর মরার কোন কারণই ঘটে নি। কিন্তু পরে মিলিয়ে দেখেছে পূর্ণবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক ফলে গেছে, সত্যিই সে রুগী আর বাঁচে নি। পূর্ণবাবু হয়ত বলেছেন, 'আজ রাত কাটে কিনা সন্দেহ' সে রুগী হয়ত বড়জোর পরের দিন ভোর অবধি টিকেছে। একটা ঘটনা তো বেশ মনে আছে, উনি সময় দিয়েছিলেন বারো ঘণ্টা—দশ ঘণ্টার মুখেই সে রুগী মারা গেছে।

অবশ্য ঘরে ঢুকে পূর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল সে। শরৎসুন্দরীর কথাই ঠিক। বেশ সহজ মানুষ—বরং এ ক'দিনের থেকে আরও ভাল, বেশী সুস্থ। বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়েই থাকেন আজকাল বেশির ভাগ—আজ সোজাসুজি

একটা তাকিয়া কোলে নিয়ে উঠে বসেছেন। মুখের চেহারা চোখের দৃষ্টি দুই-ই স্বাভাবিক, বরং ওকে দেখে অনেক দিন পরে, সেই আগের মতোই চোখ দুটি প্রসন্ন-কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'এসো। বসো। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে তা ভাবি নি!'

'তা ভাববে কেন? তুমি কি ভেবেছিলে ঐ রকম চিঠি পাবার পরও আমি চুপ ক'রে বসে থেকে এড়িয়ে-গড়িয়ে আটঘণ্টা পরে আসব? তা এত জরুরী তলবই বা কেন, ছিষ্টির কাজ ফেলে চলে আসতে হল! কোনমতে দশবার জপ সেরেই চলে এসেছি—পুজো-আশ্রা কিচ্ছু হয় নি—মুখে একটু জলও পড়ে নি এখনও।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে জল এখানেও পড়তে পারবে। আর ঠাকুর? সে তাঁরা অবস্থা বুঝে মনের পুজো মনে মনে ঠিক নিয়ে নেবেন'খন। বসো তুমি—অনেক কথা আছে।'

চেয়ারখানা খাট থেকে একটু দূরে ছিল—বোধ হয় শরৎসুন্দরী বসে ছিলেন এতক্ষণ—হেমন্ত সেইখানেই বসতে যাচ্ছিল, পূর্ণবাবু বাধা দিয়ে উঠলেন, 'উঁহু। ওখানে নয়, এই কাছে টেনে নিয়ে এসো, সেই যেমন অসুখের সময় বসতে এখানে—'

তারপর, হেমন্ত অভ্যস্ত জায়গায় চেয়ারখানা টেনে এনে বসতে বললেন, 'জরুরী তলবের মানে আছে। নিজের দেহের মধ্যে আরও ঢের জরুরী তলব একটা শুনতে পাচ্ছি কাল থেকে। কতটা আর দেরি করা যাবে তা বলা কঠিন। চিত্রগুপ্ত মানুষটি বড় সোজা নন, তিনি আমার মর্জির জন্যে অপেক্ষা করবেন না—হঠাৎ একসময় পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবেন। তাই হাতের কাজগুলো সেরে নিতে চাই জলদি জলদি।'

বুকের মধ্যেটায় একটু কেঁপে ওঠে বৈকি!

অকারণেই চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হতে চায়—শরৎসুন্দরীর মতো।

তবু জোর ক'রেই মুখে হাসি এনে, প্রায়-স্বাভাবিক গলাতেই বলে হেমন্ত, 'হঠাৎ এ পাগলামি চাপল কেন মাথায়? কি হয়েছে তোমার যে, এরই মধ্যে জোর তলব শুনতে পেলে?···বরং তোমায় তো আগের ক'দিনের থেকে ঢের ভাল দেখাচ্ছে!'

হাসেন পূর্ণবাবুও। বলেন, 'পাগলামিই যদি মনে করো—তাহলে এ বয়সে সেটা তো ভীমরতি। আর ভীমরতিও তো মরবার আগেই দেখা দেয় মানুষের—মৃত্যুরই পূর্বলক্ষণ। ভীমরতির বয়সও অবিশ্যি আমার হয়েছে—আশি পেরিয়ে গেছি তো কবেই, আর কি! তবে তা নয়, তুমি বুদ্ধিমতী, দেখলেও অনেক—এই বেশ ভাল-থাকাটাও এ বয়সে ভাল নয়—তা কি জানো না?'

আবারও বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে হেমন্তর।

মনে পড়ে যায়, অনেক দিন আগেকার একটা কথা—যা প্রাণপণে ভোলার চেষ্টা করেছে কাজেকর্মে পয়সার নেশায়—অথচ যা ভোলা যায় নি—সেই তারকের মৃত্যুর কথাটা।

দীপ নেভার আগে একবার—শেষবারের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে দীপ্তি আসন্ন অন্ধকারেরই আগমনবার্তা মাত্র—পূর্বাভাস।

আশঙ্কাটা চকিতেই দেখা দেয়, চকিতের জন্যেই স্মৃতিটা খেলে যায় চিন্তার মধ্যে, এক লহমার বেশি স্থায়িত্ব নয় তার। তবু, বোধ করি সেইটুকু সময়ের জন্যেই মুখে যে আশঙ্কা ও দুঃস্মৃতির ছায়া খেলে গেল তা পূর্ণবাবুর চোখ এড়ায় না। তিনি যেন সে ছায়ার অর্থ ছাপার হরফের মতোই পড়তে পারেন। এ অতিমানবিক শক্তি এর আগেও লক্ষ্য করেছে হেমন্ত। পূর্ণবাবু হেসে বলেন, 'তাই। শেষ হওয়ার আগে একবার শেষবারের মতো জ্বলে ওঠা। অন্তত আমার তাই ধারণা। আর এ ধারণা আমার বিশেষ ভুল হয় না, তা তো তুমি জানোই।···আমার মনে হচ্ছে, বেশীক্ষণ আমার মাথা এমন পরিষ্কার থাকবে না, বেঁচে থাকলেও অজ্ঞান হয়ে একটা তন্দ্রার মতো পড়ে থাকব—তাই সময় থাকতে থাকতেই সেরে নিই কথাগুলো। তারপর—বেঁচে থাকি, ভালই। তৈরী হয়ে রইলুম, যখন খুশী ডেকে নিয়ে যাও, কোন আপত্তি নেই।··· না, কি বলো?'

হেমন্ত এই একটু আগেই শরৎসুন্দরীকে কি সব উপদেশ দিয়ে এসেছিল না?

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—না কি সব বলেছিল?

এই গত কয়েক বছর ধরে একটা আত্ম-অহমিকাও ওর মনে গড়ে উঠেছিল না—যে, কোন শোক-দুঃখই আর তাকে বিচলিত করতে পারবে না—পাথরের মতোই শক্ত হয়ে গেছে তার বুকটা, পাথরের মতোই নির্জীব—কোন আঘাতই আর তা ভেদ করতে পারে না?

তবে এ কি হল তার, কোথা থেকে এতখানি অবুঝ চোখের জল অকারণে তার দুই চোখ অন্ধ ক'রে দিল। কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারল না বুদ্ধি-বিবেচনার আগড় দিয়ে।

'এই দ্যাখো। তুমিও ঐ দলে চলে গেলে! মেজবৌয়ের খাতায় নাম লেখালে··· আরে, শোন, শোন, পাগলামি ক'রো না, কাঁদবার ঢের সময় পাবে এর পর—কাঁদবেই তো, সেইটুকুই তো আশা করি, যাওয়ার সময়ে সান্ত্বনা, আবার ভুলেও যাবে তা জানি—ভুলে না গেলেও সামলে নিতে পারবে। স্বামী-শোক, পুত্র-শোক সবই এক সময়ে সামলে নেয় মানুষ, দেখছই তো—। কিন্তু কথাগুলো আমাকে শেষ করতে দাও, লক্ষ্মীটি! মনে হচ্ছে হাতে একদম সময় নেই আর। তুমি অন্তত ওদের মতো অবুঝ হয়ো না। অনেক মৃত্যু তো দেখলে, অনেককে হারালে—তুমি একটু শক্ত হবে সাধারণ মেয়েদের থেকে এইটেই আশা করেছিলুম!'

জোর ক'রেই সামলে নিতে হয়, শক্ত করতে হয় মনটা।

অনেক দিন, অনেক বছর দেখছে এ লোকটাকে। এ যখন এত জোর ক'রে বলছে—তখন হয়ত সত্যিই আর সময় নেই। শোকের সময় ঢের পড়ে রইল সেও সত্যি—এখন যদি সম্ভব হয় একটু কাজে লাগাই উচিত।

তার, এতকালের শুশ্রূষাকারিণীর শিক্ষাই তাকে সাহায্য করে। চোখ মুছে, অপেক্ষাকৃত সহজ মুখেই চায় সে পূর্ণবাবুর দিকে।

পূর্ণবাবু বলেন, একটু যেন দ্রুতই বলতে থাকেন, 'তোমার কথাটাই আগে সেরে নিই। তোমাকে অনেক কিছুই আমার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, অবসর মেলে নি। তুমি

নিজের উপার্জনেই বেশ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছ, আর বোধ হয় দরকারও হবে না কিছু। তবু—যদি মনে করো যে, কিছু টাকা পেলে ভাল হয়, লজ্জা ক'রো না, স্বচ্ছন্দেই বলো। চাই কিছু ?'

'না।' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে হেমন্ত, 'কি হবে ? এই যা করেছি—দিয়ে যাবার লোক নেই। ঐসব অমানুষগুলোর জন্যে কেন নোব তোমার কাছ থেকে হাত পেতে ? তাই হয়ত রামকৃষ্ণ মিশন কি কোন হাসপাতালকে দিয়ে যেতে হবে।...না, টাকার দরকার নেই। বেঁচে থাকতেই নিলুম না, মরবার সময় তোমার টাকা নোব কেন ?'

'এ আমি জানতুম—তোমার এ উত্তর। তবু কর্তব্য একবার জিগ্যেস করা—তাই করলুম।...কোন শখ যদি থাকে! আমি অবশ্য উইলেও মেনশান করেছি, তুমি যদি কখনও বাস করতে চাও আমার বাগানবাড়ির দোর খোলাই থাকবে, যতদিন খুশি যখন খুশি গিয়ে বাস করতে পারবে। তোমার অনুমতি না নিয়ে ও বাড়ি বিক্রি কি দান করতে পারবে না ছেলে। আর—নগদ টাকা যা রইল, তার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা তোমার মৃত্যু পর্যন্ত বা পনেরো বছর জমাই থাকবে—যদি কখনও দরকার হয়, চাইবা মাত্রই পাবে, নইলে ঐ সময় কেটে গেলে আমার পুত্রবধূতে অর্শাবে।'

'না না না!' যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে হেমন্ত, 'ও বাগানবাড়িতে আর নয়, আর কোনদিনই আমি থাকতে চাই না।'

অনেক দিনের অনেক দুঃখের স্মৃতি ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কমলাক্ষ। পূর্ণবাবু। হ্যাঁ—পূর্ণবাবুও।

পুত্রশোক ভোলার জন্যে ওখানে এসে উঠেছিল, সে স্মৃতিও পুত্রশোকের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মনের মধ্যে।

'সে তোমার ইচ্ছে। আমার দিক থেকে পরিষ্কার রইল। আজ যতটা অসহ্য মনে হচ্ছে ততটা নাও হতে পারে দশ বছর পরে। সে যাক গে—এখন দু' নম্বর কথা। আমার স্ত্রী। কখনও ভাবি নি। যে, তোমাদের দু'জনের এমন সামনা-সামনি দেখাশুনো মেলামেশা ভাবসাব হবে। যখন হয়েই গেছে তখন তার সুবিধেটা নিতে ছাড়ি কেন!...ওকে আমি কখনই সুখী করতে পারি নি, ঐকান্তিক ভালবাসা যাকে বলে তা আমার স্বভাবেই নেই,—ওর সঙ্গে ঘর করেছি ঠিকই, যেটুকু নেবার ওর কাছ থেকে তা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা আদায় ক'রে নিয়েছি—কিন্তু কখনও ওর দিকটা তাকিয়ে দেখি নি। দেখার দরকার মনে করি নি। ভেবেছি ছেলেপুলে হয়েছে—ঘরবাড়ি সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে আছে—আর কি চাই ? দীর্ঘকালে মেয়েছেলে তো কম আসে নি জীবনে, সে সবই ও জানে, ঠিক চোখে না দেখলেও বুঝতে পেরেছে ঠিকই, আর আমিও গোপন করার চেষ্টা করি নি কোনদিন—তোমার তো কথাই নেই, তোমাকে ভালবেসেই প্রথম ভালবাসা কাকে বলে বুঝলুম—সে কথাটাও ওর জানতে বাকী নেই, ব্যভিচার যদি বা সহ্য করেছে, দেহের ভাগ দিয়েছে—এই ভালবাসাটা, মনের দাবী ছেড়ে দেওয়াটা অসহ্য হয়েছে নিশ্চয়, মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছে—সেটা আজ বুঝি, সেদিন বুঝি নি।...ও যে আমাকে কতটা ভালবাসে ঐ অসুখে পড়ার পর বুঝলুম—নিজে গিয়ে তোমাকে ডেকে আনাতে বুঝলুম, চোখ খুলে গেল আমার।...আজ অনুতাপ হয়,

কিন্তু সেও বৃথা, প্রায়শ্চিত্তর আর উপায় নেই। কে জানে পরজন্ম আছে কিনা, হয়ত সামনের জন্মে এই পাপের দেনা শোধ করতে হবে কড়ায়-ক্রান্তিতে।'

বলতে বলতে কি গলা ধরে আসে পূর্ণবাবুর ?

পূর্ণবাবুরও ?…

একটু, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম, শরতের কথা। বেশীদিন আর বাঁচবে না বলেই মনে হয়, আমার থেকে অনেক জবুথবু হয়েছে এই বয়সেই—হয়ত সেজন্যেও আমিই দায়ী—মনের অসুখে শরীর তাড়াতাড়ি ভাঙে, তবে বলাও তো যায় না। তুমি ওকে একটু দেখো। যদি পারো—যদি এখানে থাকো, অসুখ-বিসুখ হলে কি মরার সময় একটু সেবা ক'রো।…এতটা জোর তোমার ওপর আমার কিসের তা জানি না, কোন অধিকারই নেই হয়ত—বিশেষ ক'রে এই ধরনের দায় চাপিয়ে দেওয়ার—তবু কে জানে কেন কেবলই মনে হয় যে, তুমিই পারবে এ দায় বইতে, আর এ জন্যে রাগও করবে না…টাকা-কড়ি ওর নামে আলাদা করা রইল, ওর পক্ষে ঢের—মোদ্দা শেষ সময়ে তা কতটুকু কাজে লাগবে কে জানে!…ছেলেটা খারাপ নয়, তবে আমারই ছেলে তো, বেশ স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, পয়সা চিনেছে খুব।…বৌমাও—এমনি মন্দ নয়, অবশ্য শাশুড়ি-বৌয়ের সম্পর্ক তো জানই—বিশেষ ক'রে এর পরে যদি আরও খিটিমিটি বাধে, মানুষ বুড়ো হলে একটু বেশী অবুঝ হয়ে পড়ে—তাই কেবলই ভয় হয়, হয়ত ওর মরার সময় মুখে জল দেবারও থাকবে না কেউ।…আমি যাওয়ার আগে ও গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম—এতকাল তো দেরিও করলুম—কিন্তু ওর বরাতে দুঃখ-ভোগ আছে আমি কি করব ? দুঃখ আছে বলেই বেঁচে রইল—'

হেমন্ত বাধা দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অত ব্যাখ্যানা করতে হবে না। যদি বেঁচে থাকি আর খবর পাই—তাহলে যেখানেই থাকি না কেন, ছুটে আসব আর দেখবও, যতটুকু সাধ্যে কুলোয়। তার জন্যে অত ক'রে বলতে হবে না। মানুষ যে যার পরমায়ু নিয়ে আসে—তোমার সুবিধে মতো সে মরবে কেন ?'

'আঃ! বাঁচলুম! এবাব আমি নিশ্চিন্ত। জানি—তুমি এ কথার খেলাপ করবে না।'

তার পর হঠাৎই যেন পূর্ণবাবুর এতক্ষণের প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে, ঈষৎ বুঝি বা একটু ম্লানও। মিনিট খানেক চুপ ক'রে থেকে, আস্তে আস্তে, কেমন একটু কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলেন, 'আর একটাই কথা বাকী আছে। অনেক দিন ধরে বলব বলব ভাবছি, ঠিক সাহসে কুলোয় নি। মানে—তুমি রাগ করবে সে ভয় নয়—কথাটা মনে পড়লে অনেক তিক্ত স্মৃতি মনে পড়ে গিয়ে দুঃখ পাবে, সেই ভয়ে বলতে পারি নি।… কথাটা মানে—কমলাক্ষর কথা। তুমি—তুমি কেন অনেকেই তখন ভেবেছিল, হয়ত আজও ভেবে রেখেছ যে, ওকে আমি মেরে ফেলেছি, ইচ্ছে ক'রে ওষুধের নামে বিষ দিয়ে—'

বাধা দিয়ে আকুলভাবে কি বলতে যাচ্ছিল হেমন্ত, বোধ করি বলতে যাচ্ছিল—এতকাল পরে সে মরা মানুষটাকে টেনে এনে আজকের দিনের এ বিদায়ক্ষণটিকে বিষাক্ত ক'রে কাজ নেই—যা ভুলে গেছে তা মনে করতে চায় না আর ; বহুকাল—দুই যুগ কি আরও—আগে যা ঘটে গেছে তাকে আর কবর খুঁড়ে বার ক'রে লাভ নেই—কিন্তু ওকে

একটা কথাও বলতে দিলেন না পূর্ণবাবু। প্রবলতর বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'উঁহু উঁহু, শেষ করতে দাও, আর মোটে সময় নেই আমার—মাথার মধ্যে কেমন করছে, বুকটাতেও—শোন, মরবার সময় মিথ্যে বলছি না তোমাকে, এটা বিশ্বাস করো আজ, মেরে ফেলা যাকে বলে তা ফেলি নি, জেনে-শুনে বিষও দিই নি। কোন ভাল ডাক্তারই বোধহয় তা পারে না—কোন ভাল গাইয়ে যেমন চেষ্টা করলেও পারে না বেসুরো বেতালা গাইতে—তবে হ্যাঁ, এও ঠিক—হয়ত আর একটু চেষ্টা করলে বাঁচানো যেত, সেরকম প্রাণপণ চেষ্টা করি নি—হয়ত অন্য ডাক্তার ডাকাও উচিত ছিল আমার, নিজের হাতে রাখা ঠিক হয় নি। হয়ত—আর আর মিছে বলব না—ভগবানকে ঠকানো যাবে না ঠিক, আর তাঁর দরবারেই তো চলেছি—হয়ত মনে মনে মৃত্যু কামনাই করেছিলাম সেদিন তার—'

আর কথা শেষ করতে পারেন না পূর্ণবাবু, বলতে বলতেই কথাগুলো যেন গলায় জড়িয়ে যায়—তারপর একেবারেই কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে কি রকম একটা অস্ফুট শব্দ বেরোতে থাকে গলা দিয়ে, দুই কষে যেন ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে দেখতে দেখতে—চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—তারপরই ঘাড় নুয়ে পড়ে তাকিয়ার ওপর মুখ গুঁজড়ে ঢলে পড়েন।

হেমন্ত লাফিয়ে উঠে ওঁকে ধরে শুইয়ে দেয়, তার চিৎকারে আরও লোকজন ছুটে আসে, ওঁর ছেলে, এক জামাই—শরৎসুন্দরী, অনেকেই। জামাইও ডাক্তার, সে গিয়ে নাড়ি ধরে, চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করে—বৌমা যান নীলরতনবাবুকে টেলিফোন করতে—তবে কিছুতেই যে কিছু আর হবে না, হেমন্ত তা বুঝতে পারে। পক্ষাঘাত হয়েছে—ডান দিকের হাত-পা দুই-ই পড়ে গেছে, জ্ঞানও আর নেই। বোধ হয় আর কোনদিন তা ফিরবেও না।...

সেই জন্যেই আরও রাঁচী যাওয়া হয়ে ওঠে নি হেমন্তর।

কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে দেওয়া ছাড়া কোন খোঁজ-খবরও করতে পারে নি।

এবার আর হেমন্তর ওপর সেবার ভার ছিল না—ছেলে-জামাইরা হাসপাতাল থেকে দু'বেলার মতোন নার্স আনাবার ব্যবস্থা ক'রে ছিল—তবু এ সময় ওর পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে শরৎসুন্দরী—এই আসন্ন সর্বনাশের মুখে—বোধ করি পূর্ণবাবু তাঁকেও এই আশ্রয়ের ভরসা দিয়ে গিয়ে থাকবেন, ওকেই যেন একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন, সম্পূর্ণভাবে ভরসা ক'রে বসে আছেন।

তাই এর পর যে মাস-দুই পূর্ণবাবু বেঁচে ছিলেন—জীবন-মরণের মাঝামাঝি অবস্থায়, মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু বেরিয়ে জরুরী কাজগুলো সেরে আসা ছাড়া—দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় এই বাড়িতেই কাটাতে হয়েছে তাকে—শরৎসুন্দরীকে আগলে।

কে জানে আরও কতকাল বাঁচবে বুড়ি! এইভাবেই ওকে জড়িয়ে থাকবে নাকি?

কিন্তু সে সব কথা ভেবেও লাভ নেই। সে বাক্যদত্ত আছে, আর তা না হলেও—শরৎসুন্দরী ওকে ত্যাগ না করলে ও পারবে না তাঁকে ত্যাগ করতে।

পূর্ণবাবুর মৃত্যুর পর হেমন্ত আস্তে আস্তে ওর জমি-বাড়ির ব্যবসা গুটিয়ে আনে। ঠিক মন-ভেঙে-যাওয়া যাকে বলে তা হয়ত নয়—কেমন যেন সাহস হারিয়ে ফেলে—মনের জোরটা কমে যায়।

রোজ দেখা হোক না হোক, উঠে দৌড়ঝাঁপ ক'রে কোন সাহায্য করতে পারুন বা না পারুন—পূর্ণবাবু বেঁচে আছেন, দরকার হলেই। ছুটে তাঁর কাছে যেতে পারবে, অতি বিচক্ষণ ও বিষয়ী লোক, প্রতিপত্তিশালীও বটে, ঠিক ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন; তেমন প্রয়োজন হলে, বড় বড় লোক বন্ধুবান্ধব, রোগশয্যায় শুয়েই কাউকে চিঠি লিখে বা টেলিফোন ক'রে বলে দিলে কোন সাহায্যেরই অভাব ঘটবে না—এইটেই ছিল মস্ত বড় ভরসা। প্রথম বয়সের সেই পরিশ্রম করার অমিত শক্তি এবং উৎসাহ-উদ্যম কমে গিয়েছিল। কিন্তু জেদটা ছিল। সে যে কারুর থেকে কম নয়—কর্মশক্তিতে কোন পুরুষ মানুষের থেকে কোন অংশে ন্যূন নয়, এইটে দেখিয়ে দেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছাই তাকে তখন ঠেলে নিয়ে গেছে। বিপুল শূন্যতা-বোধ ও হাহাকার ভোলবার উপায় হিসেবেই কতকটা অবিশ্রাম কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে নিজেকে।

এখন আর তার কিছুই নেই। বহু—বহু বছর কেটে গেছে তারপর—ফলে হাহাকারটাও কমেছে। জেদ বজায় রাখা, জেতবার ইচ্ছা—কোনটার মধ্যেই আর সে আগের তৃপ্তি নেই। কাজকর্ম উপার্জন সবই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। পরিচিত যারা ছিল, যাদের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক—যাদের নিয়ে তবু এই চারিদিকের সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে নিজের একটু জগৎ (হয়ত সেও ভুয়ো, ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা) তৈরী ক'রে নিয়েছিল—তারাও একে একে সব সরে পড়ল। শুধু সে-ই রয়ে গেল একা, এই অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন আশাহীন জীবনটা বইতে। তারই শুধু মৃত্যু নেই। শরীর খারাপও হয় না একটু, বরং দিন দিন যেন শক্তি স্বাস্থ্য বাড়ছে আরও—এই বয়সেও।...

হাতে যেসব কাজ ধরা ছিল, সেগুলো যথাসম্ভব দ্রুত সেরে নিয়ে কারবার বন্ধ ক'রে দেয় সে। যেগুলো বিক্রী করার মতো তাড়াতাড়ি বেচে দেয়, লাভ-লোকসানও অত হিসেব করে না। শুধু নিশ্চিন্ত হতে চায় সে, লাভের হিসেব অত না কষলেও তার চলবে। অনেক আছে তার—এসব বাদেও তিনখানা বাড়ি রইল কলকাতায়; কোম্পানীর কাগজ, ইলেকট্রিক কোম্পানীর শেয়ার, টেলিফোনের শেয়ার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার। এগুলো পূর্ণবাবুই কিনিয়ে দিয়েছিলেন জোর ক'রে। এখন এর আয় দেখে বুঝছে তিনি কত উপকার ক'রে গিয়েছেন। এছাড়া নগদ টাকাও রইল কিছু হাতে। যত দিনই বাঁচুক—অভাব হবে না তার—ফেলে ছড়িয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে।

কেবল নিমাই গজ গজ করে খুব। এই কারবার গুটিয়ে ফেলাটা তার পছন্দ নয়। যত আয় হবে তত জমবে—ততই তাদের জন্যে থাকবে—বোধহয় এই রকম তার একটা আশা। সে বলে, 'ইরি মধ্যে হাত গুটোচ্ছ কেন বাপু, কী হয়েছে কি! দেখাশুনো না করতে পারো—বলো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেগে পড়ছি। ভারী তো চাকরি—

য়্যাদ্দিনেও যেকালে তিরিশ টাকা মাইনে হল না—সেকালে থাকলেই বা কি গেলেই বা কি! তোমার পায়ের ধুলো কুড়িয়ে পেত্যহ জড়ো করলে এর থেকে বেশী রোজগার হবে আমার।'

'না বাবা' দৃঢ়কণ্ঠে বলে হেমন্ত, 'সেই ইচ্ছে থাকলে তোমাকে চাকরি নিতেই বা দোব কেন, আর নিলেও এর আগেই তো ছাড়িয়ে আনতে পারতুম।—না, তোমার ভরসায় এসব কাজ আমার চলবে না, মানে আমি চালাব না। আর তুমিও আমার ভরসায় চাকরি ছেড়ো না। তুমি এখানে গোড় ফেলেছ, আমার ফাইফরমাশ খাটছ বলেই আমি তোমাকে যথাসম্বস্ব লিখে দিয়ে চলে যাব—এ মনে ঠাঁই দিও না। আছ, বনিয়ে চলছ—চলছ, ভাল কথা। বেচাল দেখলেই পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দোব। আমার কাজের নাম ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে আর দিনে পঞ্চাশবার ক'রে আমাকে চোখ রাঙাবে—তোমার জন্যে আমি পাকা চাকরি ছেড়েছি, মাথা কিনে নিয়েছি তোমার—সেও চলবে না। আমি আর কোন কারবার করব না, ব্যস, চুকে গেল। আমার আর রুচি নেই, দরকারও নেই। কতকগুলো ভূত পোষবার জন্যে আমি এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ভূতের মতো খেটে যাব—এত ঝামেলা বইব—এত আহাম্মক আমি নই। তোমার যদি তেমন কোন আশা-ভরসা-খোয়াব থেকে থাকে—মনে হয় অনেক পেতে পারতে তাতে ঘাটতি পড়বে—তো তুমি নিজেই দ্যাখো, অনেকদিন তো দেখলে—অনেকের সঙ্গে জানানো হল—মাল ধারেও পাবে হয়ত, পারো নিজে কারবার করো। তবে আমি এক পয়সাও দোব না, সাফ কথা। আমার নাম ক'রেও কোথাও থেকে মাল আনার চেষ্টা ক'রো না—আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, আমি যদি কোন মাল কিনি—নগদে কিনব কিংবা নিজে গিয়ে বলে আসব—এছাড়া কেউ কিছু নিলে আমি তার দায়ী হব না। আমি জামিন হব না কারও—যে যা দেবে নিজে বুঝে দেবে।'

অতটা ঠিক সাহসে কুলোয়ও না নিমাইয়ের।

তাছাড়া বাড়ির কারবারে জমিটা আগে দরকার। ইট চুন সুরকি বিলিতি-মাটি যদি বা ধারে পাওয়া যায়—জমি কেউ ধারে দেবে না। মিস্ত্রী খাটাতে গেলেও নগদ টাকা চাই কিছু—তাদের অন্তত খোরাকীটা 'বুঝ' দিয়ে যেতে হবে।

না, সে হবে না। অথচ এদিকে এই হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাও খারাপ লাগে। কোন কাজ না থাকলেও কি তাকে পুষবে হেমন্ত?

জ্যাঠাইয়ের মেজাজের যেন তল পায় না নিমাইচরণ। চাকরি ক'রে এনে মাইনের সব টাকাটাই হেমন্তকে ধরে দেয় সে, হেমন্তও মাত্র বারটি টাকা নিজে রেখে সবটা ওকে ফিরিয়ে দেয়। এ-বাড়ির যা খাওয়াদাওয়া, ঠাট—ঝি-চাকর-রাঁধুনী রেখে সংসার—তাতে ঐ বারো টাকাতে ওর খোরাকি চলে না সেটা নিমাইও বোঝে। বাড়তি খরচটা অম্লানবদনেই বহন করে হেমন্ত, বাড়ির ছেলের মতোই রেখেছে তাকে—কিন্তু তবু তার স্নেহের আসনটিতে যে আজও ঠাঁই পায় নি, সে সম্বন্ধেও ও দস্তুরমতো সচেতন—কোন ভ্রান্ত দুরাশা বা আশামিশ্রিত সংশয়ও নেই ওর মনে।

এ এক বিচিত্র সম্পর্ক ওদের। ওরা পরস্পরকে সহ্য করে এই মাত্র। কোন পক্ষেই কোন আন্তরিক টান নেই। নিমাইয়ের এ সহ্য করায় স্বার্থ আছে—কিন্তু হেমন্ত কেন

যে সহ্য করে, কেন যে তাড়িয়ে দেয় না, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। স্নেহ প্রীতি কোনদিনই কিছুমাত্র ছিল না, নেইও—বরং এক একসময় নিমাইয়ের ভাবভঙ্গী কথাবার্তা অসহ্যই মনে হয়—ছেলের মতো ভাবা তো দূরের কথা—গৌরের ওপর যেটুকু মায়া, তার শতাংশও বোধ করে না কখনও, তবু চলে যেতেও বলতে পারে না। সে যে কাজে লাগে বলে—তাও নয়। এমনিই, কি কারণ কে জানে! যত্নই করে বরং, স্নান খাওয়াদাওয়া এগুলোর ওপর কড়া নজর রাখে, তখন, তখন মনে হয় আপনার জনই, রক্তের সম্পর্ক—হাড়ভাঙা খাটুনী খাটতে হয় বলে দুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, ওর জন্যেই মাছ আসে আজকাল—ঝি-চাকররা যাতে ভাবে আশ্রিত অনুগ্রহপ্রার্থী নয়, বাড়ির ছেলেদের মতোই সম্মান দেয়, সেদিকেও লক্ষ্যের ত্রুটি নেই—অসুখ করলে সেবা করে, পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার ডাকে—অথচ পান থেকে চুন খসলেই নির্মম কটু কথা বলে, গালিগালাজ দেয়—তখন যে ঝি-চাকররাও শুনছে এসব কথা, তাও খেয়াল রাখে না।

হয়ত এটা নিমাইচরণের ধৈর্যেরই পুরস্কার—এই সহ্য করা, যত্ন-আত্তি করাটাও। এতদিনের এত রূঢ় আচরণ, এত দুর্বাক্য সহ্য ক'রে—প্রথম দিকে তো নির্যাতনই করেছে বলতে গেলে—নিমাই যে টিকে আছে, কোথাও চলে যায় নি, কি কখনও কোন প্রতিবাদ করে নি—সম্মান শ্রদ্ধা যথেষ্ট করে, অন্তত লোক-দেখানোও—এর জন্যেই মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারে না সে। এই একটা বিষয়ে ছেলেটা যে ওদের দল-ছাড়া গোত্র-ছাড়া—এটুকু মানতে বাধ্য হেমন্তও। সেইজন্যেই নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত ছেলেটার উপস্থিতি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—ছাড়তেও পারে না ঠিক।

কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে—এবার ভগবানে মন দেওয়াই উচিত। মন দিতে চায়ও সে, কিন্তু কে জানে কেন ঠিক সেভাবে মনটাকে বাইরের চিন্তা থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে আর দিতে পারে না।

সেই তারকের মৃত্যু থেকেই কোথায় একটা অবিশ্বাস বা অভিমানের ভাব দেখা দিয়েছে ওর মনের মধ্যে—পুজো করার চেষ্টা করে, অভ্যস্ত মুখ কলের মতো মন্ত্র পড়ে যায়, হাত সময়মতো ফুলচন্দন গঙ্গাজল ব্যবহার করে—কিন্তু সে সঙ্গে মনটাকে শান্ত ক'রে তাঁর পায়ে সংহত করতে পারে না।

কেউ আর নেই, কেউ রইল না—এই চিন্তাটাই যেন বেশী পেয়ে বসেছে ওকে। আসলে এখনও মানুষের চিন্তাটাই যেন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ওর মনকে—ঘর বাঁধার কল্পনা, সংসারের সাধ। এটা ঠিক স্পষ্ট ক'রে বোঝে না—নিজের কাছে স্বীকার তো করেই না—অথচ কেন যে এখনও ঠাকুরঘরে ইষ্টদেবতার ছবির সামনে বসে তাঁকে ভাবতে পারে না—হারিয়ে-যাওয়া মানুষগুলোকেই খোঁজে—তাও বুঝতে পারে না।

খোঁজে অনেককেই। অনেকের কথাই মনে পড়ে আজ—অনেক স্মৃতি, অনেক তিক্ততা, অনেক অনুতাপ ভাবনাকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে। বাবার সম্বন্ধে বিষাক্ত মনোভাব এখনও সমান আছে, কিন্তু দাদার কথা মনে পড়ে একটু লজ্জাই পায় এখন। বেচারী দাদা! অসহায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত, পিতৃতাড়িত। তার দোষ কি! ওদের মা-ই এজন্যে দায়ী—স্বামীকে গুরুর আসনে বসিয়ে ইষ্টের আসনে বসিয়ে পুজো ক'রে গেলেন

চিরকাল—নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে থেকে ভয়ে ভয়েই কাটিয়ে গেলেন সারাজীবন। সেই শিক্ষায় সেই আদর্শে দাদা যদি ভয় করতেই শিখে থাকে তো তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সেজন্যে অত অপমান, অত লাঞ্ছনা না করলেও চলত। হেমন্তর অত টাকা ছিল, ওদের তুলনায় অনেক—তা থেকে দু-চার দশ-বিশ দিলে কেউ টেরও পেত না।

দিলেই হত। বেচারী ভাইপো-ভাইঝিগুলো তো কোন অপরাধ করে নি—তাদের কোন একটাকেও যদি নিয়ে কাছে রাখত হয়ত মানুষ হত সে, মানুষ করা চলত, হাজার হোক তার পিতৃকুলের রক্ত, শ্বশুর বংশের মতো নয়। মানুষ হয়ে উঠতে না পারে হয়ত —এমন পশুর চেয়ে হীন জীব হবে না। তাদের লেখাপড়া শেখালে নিশ্চয় শিখত। সে জন্যেও যদি কিছু ক'রে দিত দাদাকে! মাসে দশটা ক'রে টাকা দিলেও হয়ত ওদের লেখাপড়াটা হত। পিতৃবংশের জন্যে এটুকু করা উচিত ছিল ওর।

অনুতপ্ত হয়ে খোঁজ যে পরে না করেছে তা নয়—কিন্তু কোন খবরই পায় নি।

খবর দেবার একটি লোকই ছিল—ও সংসারের সঙ্গে যোগসূত্র—ছোটভাই শিবু। সেও হারিয়ে গেছে কোথায়। মধ্যে মধ্যে দু-পাঁচ মাস অন্তর ধূমকেতুর মতো এসে উদয় হত—লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে চেহারা, উপবাসে ও নেশাভাঙে শীর্ণ, ক্লান্ত—তবু মনটায় ছিল ব্রাহ্মণ। সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ। নির্লোভিও। পরবর্তীকালে এক-একদিন বেশী টাকা দিতে চেয়েছে হেমন্ত, শিবু নেয় নি। তার তখনকার প্রয়োজনের মতো দু-এক টাকার বেশি কিছুতে নিতে রাজী হয় নি। আসতও না ঘন ঘন, সেই যে বলেছিল যখন-তখন এসে বিরক্ত করব না, একেবারে না ঠেকলে আসব না—সে-কথা চিরদিন বজায় রেখে গেছে।

এই ভবঘুরে বৃত্তির মধ্যেই কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে নিজের ধরনে একটা আত্মসম্মানজ্ঞানও ছিল শিবুর। শেষের দিকে নরম হয়ে এসে ওর হাতে দাদা-বৌদির জন্যে কিছু টাকা দেবার চেষ্টা করেছিল হেমন্ত—শিবু নেয় নি।

সোজাই বলেছে মুখের ওপর, 'না। বাবা মরবার সময় এক পয়সাও দাও নি, দাদা নিজে এসেছেন, তাকে রাস্তার কুকুর-বেড়ালের মতো ক'রে তাড়িয়েছ—খুবই দুর্দিনে এসেছিলেন বেচারী—তোমার টাকা আর তাদের নিয়ে কাজ নেই। হয়ত সামনে নিয়ে গেলে লোভে পড়ে অভাবের তাড়নায় হাত পেতে নেবে—তবে সেটা মানুষের কাজ হবে না। বামুনের একরকম ক'রে চলেই যাবে, না হয় বামুনের ছেলে হাতে পৈতে জড়িয়ে ভিক্ষে করবে, তাতে দোষ নেই—তোমার ও অচ্ছেদ্দার ভিক্ষে আর না-ই নিল!'

তারপর বলেছে, 'আর সত্যিই—বাপের ওপরই যেখানে তোমার কোন ছেদ্দা নেই—সেখানে তার বংশের উপ্‌গার আর না করলে!···না না, আমি এ কোন রাগ বা অভিমানের কথা বলছি না—এ আমার পষ্টাপষ্টি, হক কথা। আমারও তো বংশের ছেলেমেয়ে তারা—এত ছোট হতে না-ই দিলাম!—আর কি জানো, দুঃখ-কষ্ট পাওয়া একরকম ভাল, বসে খেলেই ছেলেপিলে নষ্ট হয়ে যায়। পরের দয়ার ওপর বরাৎ দিয়ে বসে থাকা—গুরুবংশের এই একই তো ব্যাপার। তার ফল তো নিজের চোখেই দেখলুম, তোমারও নিশ্চয় দেখতে বাকী নেই!'

ঠিকানা পর্যন্ত দেয় নি শিবু, পাছে খোঁজ ক'রে নিজেই যায় হেমন্ত। বাবার

মৃত্যুর পর দেনার জ্বালায় ওদের বাড়ি বিক্রী ক'রে দিতে হয়েছিল—সে সময় গড়পার অঞ্চলে কোথায় ভাড়াবাড়িতে উঠে এসেছিল। তার কিছুদিন পরে শুঁড়োর কোন এক শিষ্যের পড়ো বাগান বাড়িতে এসে উঠেছে। প্রথমটা এমনি বিনাভাড়ায় থাকতে দিয়েছিল—পরে নাকি দানপত্রও ক'রে দিয়েছে একেবারে। লোকালয় থেকে অত দূরে, জঙ্গলের মধ্যে, শুয়োরের পাল শুধু চারদিকে, দিনের বেলায় মশা—প্রথম প্রথম নাকি কারও মন বসে নি, কেউ রাত্রে ঘুমোতে পারত না, ছেলেমেয়েগুলো ডাক ছেড়ে কাঁদত অনেক লাঞ্ছনাই সহ্য করেছে বেচারীরা—নিহাৎ নাচার বলেই বাদল সব সহ্য করেছে। বিনাভাড়ায় আর কোথায় থাকতে পাবে ?

'তা—তাবলে ঐরকম জঙ্গলে থাকতে হবে ?' প্রশ্ন করেছিল হেমন্ত।

'নইলে এমনি এমনি দেবেই বা কেন? দাদার তো দশটা টাকাও ভাড়া দেবার ক্ষ্যামতা নেই সব মাসে। এ না পেলে তো বস্তিতে এসে উঠতে হত।...এ বড় বাড়ি, দেদার খোলা, দু-চারটে ফল-ফুলুরীর গাছও আছে, একটা ডোবামতো পুকুর—সবদিক দিয়েই ভাল। আর ও জায়গা কি চিরকাল অমনি পড়ো থাকবে নাকি ? কলকাতায় আর জমি কৈ, ঐসব দিকেই এবার সকলে ঠ্যালা মারবে দেখো। এ একরকম ভালই হল দাদার। ভিটে গিয়ে যা হোক একটা ভিটে তো পেলে! খাক-না-খাক বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকতে পারবে।'

শিবুকে দিয়েই হেমন্ত তার মার মৃত্যুতিথিটা জেনে নিয়েছিল। শিবুর ওসব মনে থাকে না, দাদার কাছে জেনে এসে বলেছিল। এখনও সেই তিথিতে হেমন্ত একটি ব্রাহ্মণ ও একটি ব্রাহ্মণের সধবাকে খাওয়ায়। ধুতি শাড়ি সিঁদুর আলতা দেয়। বাবার মৃত্যুতিথি ও-ই জানে—শিবু যেদিন ছুটে এসেছিল, সে তারিখটা তো মনেই আছে—কিন্তু তাঁর জন্যে কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না ওর।

ঠিকানাটা জানা থাকলে হয়ত এখনও কিছু করা যেত।

হয়ত শিবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ থাকলে সে হারিয়ে-যাওয়া যোগসূত্রটা আবার খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব হত না। কিন্তু শিবুই গেছে হারিয়ে। কোথায় যে গেছে, বেঁচে আছে কিনা—কিছুই জানে না হেমন্ত। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আর তার দেখা পাওয়া যায় নি—হঠাৎই যেমন এসেছিল ওর জীবনে, তেমনি হঠাৎই হারিয়ে গেল। প্রথম প্রথম দু-চার মাস অত কিছু ভাবে নি, আসার তো কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—হয়ত আর তেমন দরকার পড়ে নি বলেই আসে নি, আবার একদিন ঠিক এসে হাজির হবে। কিন্তু মাস কাটতে কাটতে যখন বছরও কেটে গেল, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। খোঁজ-খবরও করার চেষ্টা করল। কিন্তু 'শুঁড়ো' এইটুকু মাত্র ঠিকানার ওপর নির্ভর ক'রে তাদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনভাবে কে-ই বা পথে পথে দোরে দোরে ঘুরে খোঁজ করবে? পূর্ণবাবুর সাহায্যে দু-একজন ঐ পাড়ার লোককেও ধরেছিল—তাঁরা কেউই কোন খবর দিতে পারেন নি।

তারপর থেকে আর তার দেখা পায় নি হেমন্ত।

কোথাও যেতে আসতে পথে গাড়ি থেকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে কত খোঁজ করে, চেয়ে চেয়ে দেখে—চারিদিকের অসংখ্য মুখের মধ্যে সেই চেনা অত্যাচারশীর্ণ বিশেষ

মুখখানা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—কিন্তু কোনদিনই আর চোখে পড়ে না। কলকাতা শহরের এই বিপুল জনারণ্যে সেই একটি উড়ো শুকনো পাতা কোথায় উড়ে যায়, প'ড়ো পাতার রাশি থেকে তাকে খুঁজে বার করা যায় না।

॥ ১৪ ॥

অকস্মাৎ দীর্ঘকাল পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া পিতৃকুলের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় একটা। হারানো ছেঁড়া সুতোর খেইটা আবার কুড়িয়ে পায় হেমন্ত।

চলা-পা আর বলা-মুখ নাকি বন্ধ হয় না। প্রবাদটা কতদূর সত্য তা না জানলেও বন্ধ করার চেষ্টাতে যে বিষম কষ্ট—সেটা নিজেকে দিয়েই মর্মে মর্মে অনুভব করল সে।

কর্মহীনতা—মানে বাইরের বৃহত্তর কাজের অভাব যে এত ভয়াবহ রকমের যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে তা জানা ছিল না। পূর্ণবাবু একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ওর সম্বন্ধেই বলতেন, 'ও, অমনি বুঝি চড়ুকে পিঠ সুড়-সুড় ক'রে উঠল!' তারপর ব্যাখ্যা করতেন কথাটার মর্মার্থ—চড়কে যে সন্ন্যাসীরা মার খায়—কাঁটাতে বঁটিতে—তারা ফের পরের বছর গাজনের বাজনা শুনলেই অস্থির হয়ে ওঠে, চুপ ক'রে থাকতে পারে না, যেন মার খাবার জন্যে তাদের পিঠের সেই পুরনো ঘাগুলোর জায়গা সুড়-সুড় ক'রে ওঠে।

অর্থাৎ যে কাজে সে অভ্যস্ত, এতকাল যে কাজ ক'রে এসেছে—পুরুষের কাজ ঠিকই, হয়ত সেই জন্যেই আরও এত আকর্ষণ, বিজয় গর্বের নেশা একটা বোধ করে সে কাজে—আজ সেই কাজের অভাবে নিজেকে বড় অসহায় অপদার্থ বলে মনে হয়। মনে হয় জীবনের সবকিছু ফুরিয়ে গেছে তার, বেঁচে থাকারই কোন অর্থ নেই। কাশী বৃন্দাবনের সেই উপেক্ষিতা আত্মীয়-পরিত্যক্তা বুড়িদের মতো মরণের দিন গোনা ছাড়া অথবা মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা সিঁটিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজই নেই জীবনে। সব শেষ ক'রে ঘুচিয়ে বসে বসে শেষদিনের প্রতীক্ষা করা।

অন্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে ভোলবার চেষ্টা করেছে বৈকি! ইষ্টের পায়ে মনকে সংহত করতে চেয়েছে,—নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে না পারুক—পুজোর সময় বাড়িয়ে দিয়েছে, রাঁধুনী ছাড়িয়ে দু'বেলা রান্নার কাজ নিয়েছে নিজের ওপর—শেষরাতে উঠে নিজেই নিমাইকে রেঁধে ভাত দেয় আজকাল—তবু মনে হয় কোন কাজ নেই, কিছু হচ্ছে না, জীবনটাই বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেছে।

শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে স্থির করল কিছুদিন আবার একটু ঘুরতে বেরুবে। সেবারের তীর্থযাত্রার পিছনে একটা শোকের ছায়া লেগে ছিল। পুত্রশোক ভোলবার জন্যে তীর্থে বেরিয়েছে—এই চিন্তাটা বিড়ম্বিত ক'রে রেখেছিল সেই যাত্রাটাকে। এবার একবার এমনিই খেয়াল-খুশি মতো বেরিয়ে পড়বে কোথাও—তীর্থ না হলেও ক্ষতি নেই, বরং হয়ত না হলেই ভাল হয়—অন্য বেড়াবার জায়গা যে-সব আছে—যেমন মধুপুর, শিমুলতলা, কি দূরে কোথাও পাহাড়ের ওপর, মুসৌরী-দেরাদুন কি নৈনীতাল কিংবা শিলং। এগুলোর নাম বহুবার শুনেছে—গোপালীর মুখে, পূর্ণবাবুর মুখে, অন্য অন্য মক্কেলদের মুখেও—কোথাও যাওয়া ঘটে ওঠে নি। আরো যায় নি, পাহাড়ের ওপর ঠাণ্ডা জায়গার কথা মনে হলেই দার্জিলিং-এর কথাটা মনে পড়ে যায়—সমস্ত কল্পনাটা বিষাক্ত

হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

এখন অনেকটা নিজেকে শক্ত করেছে সে। দার্জিলিং যাবে না ঠিকই—তাই বলে ওখানকার মতো অন্য কোন জায়গাতেও যাবে না এমন কোন দুর্বলতা নেই আর।...

ভ্রমণের সঙ্কল্পটা যত সহজে নেওয়া গেল—তত সহজে ব্যবস্থা ঠিক হল না।

প্রথম প্রশ্ন—সঙ্গে কে যাবে? সেবার পূর্ণবাবু লোক দিয়েছিলেন, এবার পূর্ণবাবু নেই। সেই একটি লোকের স্নেহ ও প্রশ্রয় যেন সর্বদা সমস্ত শোক-তাপের মধ্যে বনস্পতির মতো স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার ক'রে রেখেছিল মাথার ওপর, ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল সংসারের সমস্ত দুঃখ ও আঘাত থেকে।

এককালে এই পূর্ণবাবু সম্বন্ধেই তার মনোভাব বিরুদ্ধ তো বটেই, অনেকটা বিদ্বিষ্টও ছিল। স্বার্থপর, কামুক, লোভী, মতলববাজ—কত কি মনে হত প্রথম প্রথম।...হায় রে, তখন কে জানত আজ তাঁরই অভাব এমন প্রতিপদে অনুভব করতে হবে—প্রতিহাত অসুবিধা ভোগ করতে হবে তাঁর বিহনে। অসুবিধাটা বাইরের, মনের শূন্যতাবোধটাও কম নয়। এও এক বিস্ময়কর অনুভূতি তার। ছেলের মৃত্যুতে বা কমলাক্ষের মৃত্যুতে দুঃখের যে তীব্রতা ছিল, যে হাহাকার—এক্ষেত্রে ততটা নেই, কিন্তু এ বেদনা যেন আরও দীর্ঘস্থায়ী, আরও অন্তঃপ্রসারী। জীবনের সত্যকারের সাথী, বহুদিনের সঙ্গী ও আশ্রয় হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ যেন অনেক বেশী। এ নিঃসঙ্গতা ও অসহায়বোধ সে মর্মান্তিক শোকের মতো দুঃসহ বিহ্বলকর না হলেও—দুর্বহ যে তাতে সন্দেহ নেই।...

চিন্তাটা অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে ছিল, কাউকে বলে নি। বিশেষ ক'রে নিমাইকে বলার কথা আদৌ মনে হয় নি। মনের মধ্যেই সম্ভাব্য সেথোকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎই একদিন কী একটা প্রসঙ্গে বেরিয়ে গেল। নিমাই কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

'ও হরি! এর জন্যে এত ভাবছ! বলি আমি আছি কী করতে—তোমার কেনাকেলে নফর! বা রে! বলে এই তালই তো আমি খুঁজছি, তোমার সেথো হয়ে না গেলে তো আর এই জীবনেই যাওয়া হবে না—পিরথিমীটা যে কত বড় তা জানাও হবে না। ও তুমি ভেবো নি, আমাকে নে যেতেই হবে সঙ্গে যেকালে, সেকালে অন্য লোকের ভাবনা বাদ দাও। আমাকে ফাঁকি দে কোথাই যেতে দোব না, না নে যাও—পা জড়িয়ে ধরে আড় হয়ে পড়ে থাকব, গোহত্যে বেম্মহত্যে হব তোমার সামনে। যাও দিকি একা কী ক'রে যাবে!'

'তা তোর আপিস?' হঠাৎ যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে হেমন্ত, কণ্ঠস্বর সেই কারণেই কোমল হয়ে আসে, 'আপিস নেই?'

'আপিস তা কি! আপিসও যেমন আছে, তেমনি ছুটিও পাওনা আছে। আমি তো এর ভিতরি একদিনও ছুটি নিই নি গো। দুমাস তো হেসে-খেলে অক্‌কেলেশে নিতে পারব। তারপরও পারি, পাওনা আছে—তবে য়্যাদ্দিন একসঙ্গে নিতে গেলে গাঁইগুঁই করবে—দিতে চাইবে না।...তবে আছে, তারও অন্তর আছে। এক মিটিকেল ছাড়ব কোনো ডাক্তারকে দে—বাপ বাপ বলে ছুটি দেবে। একটা টাকার মামলা।'

'মিটিকেলটা কি ?' হেমন্ত মুখ টিপে হেসে প্রশ্ন করে।

'ঐ যে ডাক্তাররা লিখে দেয় গো—যে এর ভারী অসুখ এ এখন যেতে পারবে না।··· আহা, তুমি যেন জানো না—এতকাল ডাক্তারদের সঙ্গে মিশলে ! ঐ তো হাসছ মিচকি মিচকি।'

'আমি যা জানি তা হচ্ছে মেডিকেল সার্টিফিকেট।'

'ঐ হল ! যার নাম ভাজাচাল তার নাম মুড়ি। তুমি বুঝতে পারলেই হল। আমি মুখ্খুর ডিম, অত কি গুছেচ বলতে পারি !'···

যাওয়ার সঙ্গী এইভাবে—অপ্রত্যাশিতভাবেই ঠিক হয়ে গেল। এখন রইল যাওয়ার স্থান ও তারিখের প্রশ্ন।

দেখা গেল, সঙ্গী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত হেমন্তর কিছু স্বাধীনতা ছিল—তার পরের যা কিছু স্থির করা—তার দায়িত্ব নিমাইচরণ নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। শিলং কি মুসৌরী কেমন জায়গা সে জানে না। পাহাড় কোনকালে সে দেখে নি—এই গরমে সেখানে লেপমুড়ি দিয়ে শুতে হবে—কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। প্রাণ-পণে ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধারণায় এল না ব্যাপারটা।

সুতরাং—যা বোঝে না তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বা আগ্রহ নেই ওর। অজ্ঞাত ব্যাপার সম্বন্ধে বরং একটা আতঙ্কের ভাব আছে। তীর্থটা বোঝে, কাশী-গয়া-পৈরাগ-জগন্নাথ—এগুলোর নাম শুনেছে, তাদের দেশ থেকে গেছে কেউ কেউ। খুব বড় তীর্থ, ওসব জায়গায় গেলে ভগবানের দর্শন মেলে। সে বললে, 'ওসব পাহাড়-পব্বর্ত থাক জননী, সে বরং অন্য একসময় যেয়ো। তার চেয়ে চলো একটু তীথ্যি-ধর্ম্ম ক'রে আসি।··· কাশীই কেন চলো না—কাশী গয়া পৈরাগ শুনেছি ঐ একদিকেই পড়ে। আর একটু এগিয়ে অমনি বদ্যিনাথ না বদ্যিনারাণ কী আছে তাও—'

বাধা দিয়ে বলে ওঠে হেমন্ত, 'রক্ষে করো। এই গরমে কাশী-গয়া ! পুড়ে ঝল্সে যাব নাকি !'

একটু দমে যায় নিমাই, ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'তা—জগন্নাথ ? সে কেমন জায়গা —এখন যাওয়া যায় ?'

'জগন্নাথ—মানে পুরী ? হ্যাঁ, তা যাওয়া যায়। এ সময় সমুদ্দুরের হাওয়া খুব মিষ্টি লাগে। যায়ও অনেকে। কিন্তু তাহলে শুধুই পুরীতে গিয়ে বসে থাকতে হয়। আর তাই যদি থাকি—যে জায়গায় যাই নি কখনও, নতুন জায়গা—পাহাড়ে-টাহাড়ে গেলে ভাল হত। তোরও শরীর সারত। সে কি জিনিস তা তো দেখলি না কখনও, দেখলে বুঝতে পারতিস !'

'হেই জ্যাঠাই, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব পাহাড়-পব্বত মাথায় থাক—তুমি না দয়া করলে জগন্নাথ বিশ্বনাথ দর্শন আমার কোন জন্মে হবে না। তুমি একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে মনটা সুস্থির ক'রে ফ্যালো। আর ধরো, তুমিই তো বলছ তোফা সমুদ্দুরের হাওয়া—রথ-দেখা কলাবেচা—আহার-ওষুধ দুই-ই হবে।'

'দেখি, হয়ত তাই-ই হবে শেষ পর্যন্ত।' এমনি নিমরাজী গোছ-ভাবে অর্ধেকটা মত দেয় হেমন্ত।

তখনও একটু দ্বিধা ছিল হয়ত—তখনও ভেবেছিল আর কোন ভাল জায়গার কথা মনে পড়বে সেইখানেই যাবে—সেই মতোই ব্যবস্থা করবে—কিন্তু এই অর্ধ-সম্মতিকেই কাজে লাগাতে একবিন্দু দেরি করল না নিমাই। এমনি ঘোর উৎসাহে তোড়জোড় শুরু ক'রে দিল, এমন স-কলরবে যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগল যে, তারপর আর হেমন্ত 'না' বলতে পারল না। এতখানি উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে মায়া হল ওর শেষ পর্যন্ত। অন্য কিছু ভাববারও সময় পেল না অবশ্য, নিমাইয়ের প্রচণ্ড উদ্যম আর কর্ম-ব্যস্ততার ঘূর্ণিতে ওরও বুদ্ধি-সুদ্ধি-কল্পনা যেন গুলিয়ে গেল।

শেষে সত্যিই একদিন এখানের বাড়িতে তালা বন্ধ ক'রে—ভাড়াটেদের একটু দেখাশুনো করার অনুরোধ জানিয়ে পুরীর গাড়িতে গিয়ে উঠতে হল।

কে জানে—যেদিন এ যাত্রায় প্রথম জগন্নাথ দর্শন করতে গেল—সেদিন কোন্ চিন্তাটা মনের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল!

লোকে বলে জগন্নাথ অন্তর্যামী, যার যেমন চিন্তা তাকে সেই রকমই সিদ্ধি দেন—সেইভাবেই দেখা দেন বা ধরা দেন তার কাছে। কোন বুড়ি একমাচা পুঁইশাক ফেলে এসেছিল, পাড়া-প্রতিবেশীরা এতদিনের অনুপস্থিতিতে সব লুটেপুটে খাবে এই সম্ভাবনাতেই কণ্টকিত ছিল তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা—সে বেচারীর নাকি জগন্নাথ দর্শনই হয় নি, সে যতবার দেখার চেষ্টা করেছে পুঁই-মাচাই দেখেছে।

এ বহুদিনের গল্প। এমন কাহিনী অজস্র আছে।

কলিতে দারুভূতো মুরারি—জগন্নাথদেবই নাকি সাক্ষাৎ ভগবান। একমনে তাঁর কাছে কোন প্রার্থনা জানালে তো তা তিনি পূরণ করেনই—অনেক সময় নিজে থেকে মন বুঝেও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

হয়ত হেমন্তরও সেই বাঞ্ছাই পূর্ণ করলেন।

পুরীতে পৌঁছে—স্টেশন থেকে নেমেই ধুলো-পায়ে দর্শন করার রেওয়াজ আছে, তবে গাড়ির কাপড়ে কেউ মণিকোঠা স্পর্শ করে না, গর্ভদেউলে ঢোকে না। সে দর্শন শুধু বাইরে থেকে একবার 'থানাদারকে সেলাম জানিয়ে' দেখা দিয়ে আসা। দেহ ক্লান্ত, মন উদ্বিগ্ন, তখনকার সে দেখাকে কেউই রীতিমতো দর্শনের মধ্যে গণ্য করে না। হেমন্তও করে নি। বাসা কিছু ঠিক করা ছিল না, পাণ্ডার বাড়িতে উঠে স্নান-আহ্নিক শেষ ক'রে মুখে একটু জল দিয়েই বাড়ি খুঁজতে বেরোবে—কোথায় কি মেলে তার ঠিক নেই। মানুষটানা ছইওলা গাড়িতে ঘোরা—দেরিও হবে, এই রোদ্দুরে বালি তেতে আগুন হয়েছে, হেঁটে ঘুরতে পারবে না। এইসব চিন্তাই সেই দর্শনের সময় অগ্রগণ্য ছিল মনের মধ্যে।

পরের দিনের দর্শনটাই আসল। স্বর্গদ্বারে সমুদ্রের ওপর বাসা ঠিক হয়েছে, ভাল ঘর, বাড়িতে কুয়া আছে—ঘরে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। সুতরাং মনটাও শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ছিল সেই অনুপাতে। তবু একমাত্র ভগবানের চিন্তাটাই মনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল, ঈশ্বর দর্শনের তৃষ্ণাই প্রবল ছিল—এমনও মনে করার কোন কারণ নেই। ঠিক কোন্

কথাটা ভাবছিল সে সময় তা হয়ত হেমন্তও জানে না—হয়ত যেমন শূন্য মস্তিষ্কে নানা ধরনের চিন্তা জড়িয়ে মিশে তাল-পাকিয়ে থাকে—তেমনিই ছিল।

গতবারে এখানে আসা, ছেলের মৃত্যু, পূর্ণবাবু—তার সঙ্গে নিজের জীবন—বাপ-ভাই-স্বামী সব চিন্তাগুলো একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রেই ছিল, একটা থেকে আর একটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ধরাও শক্ত। বিশেষ যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন বাতাসের থেকেও দ্রুতগামী মন—সেটাও সত্য নয়, মন আলোকের চেয়েও দ্রুতগামী কিংবা শব্দের চেয়েও—বললেই ঠিক বলা হয়—একটা চিন্তা থেকে আর একটায় আলোর চেয়েও ত্বরিতগতিতে পৌঁছয়—সেক্ষেত্রে ঠিক কখন কোন্ কথাটা ভাবছিল তা নিশ্চিত ক'রে বলা শক্ত।...

রত্নবেদী প্রদক্ষিণের সময় কিংবা জগন্নাথের সামনে 'মাথা' করার সময় অবশ্যই ভগবানের চিন্তা ছিল মনে, প্রার্থনাও ছিল—মন শান্ত করার, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা ফিরিয়ে আনার—তবু হয়ত তার মধ্যেই শিবুটার কথাও কখন ভেবে ছিল। যাই হোক—দর্শন শেষ ক'রে বেরিয়ে বিমলার মন্দিরে ঢুকতে যাবে—ঠিক ভূত দেখার মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই, জীবনে প্রথম বোধহয়, দেহ শুধু নয়, মনটাও ক্ষণিকের জন্য জড়, বিহ্বল হয়ে উঠল।

ভূত দেখার উপমাটা অবশ্য ঠিক হল না। ওটা কথার কথা। ভূত দেখলে কার কি হয় বা হতে পারে, আমাদের কারুরই জানা নেই। কারণ আমরা কেউই ভূত দেখি নি। হয়ত এক-একজনের এক-এক রকম হয়। ভয়ে কেউ চিৎকার ক'রে ওঠে, কেউ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাছাড়াও নিজের ভূত নিজে দেখলে কেমন অবস্থা হয়—তা কেউ জানে না। কোন বইতেও পড়া যায় নি। কেউ দেখেছে বলেও শোনা নেই।

হেমন্ত কিন্তু সামনে যা দেখল তাকে নিজের ভূতই বলা উচিত। অন্তত ভূতপূর্ব। কারণ, মনে হল সামনে বিমলার মন্দির থেকে যে মানুষটা বেরিয়ে আসছে—সে আসলে বহু বছর আগের হেমন্তই। যেন আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে কোন যাদুমন্ত্র-বলে পঁচিশ কি আটাশ বছর বয়সের নিজের চেহারাটা দেখতে পেল। যমজ বোনও বলা চলত যদি বয়সের এতটা তফাৎ না থাকত। বয়সের তফাতে চেহারার তফাৎ যতটা হয়—ততটা তফাৎও।

সেই কারণেই, সামনে যে আসছিল দেবী-দর্শন ক'রে—তার বিস্ময় অতটা নয়। সে হয়ত অত লক্ষ্যও করত না, যদি না অমনভাবে চমকে থমকে দাঁড়িয়ে যেত হেমন্ত স্থাণুর মতো হয়ে, ওর চোখ-মুখে যদি অমন বিস্ময়-বিহ্বলতা ফুটে না উঠত।

তার কারণ হেমন্ত ওর পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়েসের চেহারাটা দেখেছে—এ মেয়েটি, পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে তার কি চেহারা হবে তা দেখে নি। দেখা সম্ভব নয় বলে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সে এই হঠাৎ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া থেকেই নিজেও দাঁড়িয়ে গিয়ে—সংকীর্ণ প্রবেশপথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েই—অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল এবং সাদৃশ্যটা লক্ষ্য করল, তা থেকে চিনতেও পারল।

দেখা বা কল্পনা করা সম্ভব নয় নিজের বহু দূরে ভবিষ্যতের চেহারাটা—তবু চিনতে পারল, তার কারণ সাদৃশ্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট। চামড়া কুঁচকে গেছে, বলি-রেখা ফুটে

উঠেছে এককালের ভেলভেট-মসৃণ ললাটে—সুগৌর বর্ণ রোদে ঘোরাঘুরিতে, পরিশ্রমে, চিন্তায়, সর্বোপরি শোকে হতাশায়, তার সঙ্গে বয়সের যোগে—পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তথাচ চোখ-মুখ-চিবুকের গঠনে এমন আশ্চর্য মিল, মায় ডান কানের নিচের ছোট্ট আঁচিল দুটোয় পর্যন্ত—এগুলো চোখে না পড়ার কথা নয়।

সে মেয়েটিও খানিকটা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'সেজপিসী—মানে হিমি-পিসীমা?'

হয়ত সেই বিহ্বল অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘাড়টা একটু নড়েছিল। মেয়েটি হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেল। এইবার কিছুটা সম্বিৎ ফিরল হেমন্তর, কিন্তু এবার অন্য মনোভাব কাজ ক'রে উঠল, বহুদিনের নিরুদ্ধ আবেগে—আত্মীয়ের জন্যে স্বাভাবিক ক্ষুধার সঙ্গে একটা অপরাধ-বোধের সংযোগে—বাধা দিয়ে মেয়েটিকে একেবারে বুকে চেপে ধরল। বলল, 'দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে দেবতা আর এক নিজের দীক্ষাদাতা গুরু ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই মা। কিন্তু—এদিকে সরে এসো, অন্য লোকের অসুবিধে হচ্ছে।'

সেইভাবে বুকে জড়িয়ে রেখেই, মেয়েটিকে বাইরে জগমোহনে সরিয়ে নিয়ে এল হেমন্ত। তারপর—অকস্মাৎ কোথা থেকে কি কারণে চোখে জল এসে গিয়েছিল, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'আমি তোমার হতভাগী হিমি-পিসীই হব নিশ্চয়—কিন্তু তোমার তো পরিচয় পেলুম না মা—অবিশ্যি পাবই বা কী ক'রে! কখনও তো দেখি নি, ভগবান এমনভাবে একছাঁচে ঢালাই না করলে দেখলেও চিনতে পারতুম না, তুমিও পারতে না'—বলতে বলতে স্বগতোক্তির মতো বলে ওঠে, 'ষাট ষাট! তাই বলে একছাঁচে না কপালও ঢালাই হয়, আমার বরাতের বাতাস পর্যন্ত না লাগে—কিন্তু তুমি—বিয়ে তো হয়ে গেছে দেখছি। তা আর সব কই? তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি, আমাদের জামাই?'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথা হেঁট করল মেয়েটি, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এঁরা এই যে—আমার মা আর বাবা—' গলাটা আরও নিচু ক'রে বলল, 'মানে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি। তোমার জামাই আসতে পারেন নি—দেশেঘাটে কেউ না থাকলে চলে না—একসঙ্গে বেরোনো যায় না—তাই—'

তাঁরাও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় একজন, কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি, পিছনে মহিলাটি বোধ করি অকালেই বুড়ো হয়ে পড়েছেন—দেখলে মনে হয় স্বামীর চেয়েও বয়স বেশী হয়ে গেছে—রঙ এককালে খুবই ফরসা ছিল—এখন অনেকটা পাকা আমের মতো অবস্থা হয়েছে।

তাঁরাও বিস্মিত। আত্মীয়তার চিহ্ন এত স্পষ্ট, সাদৃশ্যটা এত সুপ্রত্যক্ষ যে, তাঁদেরও চোখে না পড়ার কথা নয়। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাঁরা অবাক হয়ে একবার হেমন্তর আর একবার তাঁদের পুত্রবধূর দিকে চাইলেন।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার পিসীমা। সেই যে—ছোটকা যার কথা বলতেন, কলকাতায় থাকেন—বাড়ির কারবার—মানে কেনাবেচা করেন, সেই যে বলতেন না—বিধবা হয়েও কারও কাছে মাথা হেঁট করেন নি—কারও দ্বারস্থ হন নি—নিজের চেষ্টায় ক'রে খাচ্ছেন, যে শ্বশুরবাড়ি থেকে ষড় ক'রে পেছনে লেগে তাড়িয়ে

দিয়েছিল তাদেরই পুষছেন সাতগুষ্টিকে—মনে নেই? এই ইনিই সেই বেয়ান আপনাদের।'

তারপর একটু থেমে, মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, 'দেখা-সাক্ষাৎ তো নেই, জন্মের পর এই প্রথম দেখা—বাপের ওপর অভিমান ক'রে বাপেরবাড়ির সঙ্গেই সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন তো।—মুখখানা দেখে চেহারা দেখে চিনলুম!'

হেমন্ত ইঙ্গিতটা বুঝল।

ওর পরিচয়ের লজ্জাজনক অংশটা যে এঁরা জানেন না—ওর প্রথম জীবনের মুখ্য বৃত্তির ইতিহাসটা—সেইটেই ওকে কৌশলে বুঝিয়ে দিল মেয়েটি, যাতে কথাবার্তায় না সেটা প্রকাশ ক'রে ফেলে হেমন্ত।

সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল সে, অনেকটা নিশ্চিন্তও হল।

অনেকটা হেঁট হয়ে ওঁদের নমস্কার ক'রে অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, 'খুবই অন্যায় হয়ে গেছে আমার—বাবার ওপর অভিমান ক'রে এদের সুদ্ধ দূরে রেখেছিলুম। যখন ভুল ভেঙেছে তখন অনেক চেষ্টা ক'রেও খোঁজ পাই নি। শিবু—শিবুই আসত, খোঁজ-খবর পেতুম তবু—তা সেও তো আসে না আর। অনেকদিন আসে নি। তা হ্যাঁ রে, সে—সে বেঁচে আছে তো?'

মেয়েটি আস্তে আস্তে ওর হাত ধরে ঈষৎ টান দিয়ে বলল, 'এত কথা কি আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়! চলো বাইরে যাই। দর্শন তো হয়েছে? কোথায় উঠেছ তোমরা? স্বর্গদ্বারে হলে তো গোল চুকেই গেল—আমরা ঐ শ্মশানের ধারেই উঠেছি।'

বলতে বলতে হেমন্তকে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে এল। সেইভাবেই লক্ষ্মীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল।

নিমাই যে সঙ্গে আছে, সে যে এই আকস্মিক নিকটাত্মীয়-সমাগম দেখে মুখ কালো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে—এদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে সেকথা মনেও রইল না হেমন্তর।

॥ ১৫ ॥

দেখা গেল মেয়েটির স্বভাব যেমন মিষ্টি—দৃষ্টি সেই পরিমাণেই তীক্ষ্ণ। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই দিতে কার্পণ্য করেন নি ভগবান।

হেমন্তর খেয়াল না থাকলেও তার ছিল। পিসী নিশ্চয় একা আসে নি, আর ঐ যে ছোকরা মুখ গোঁজ ক'রে পিছু পিছু আসছে সে-ই নিশ্চয় ওর বাহন—এটা অনুমান ক'রে বেশ শ্রুতিগোচরভাবেই পরিচয়টা জিজ্ঞাসা ক'রে নিল, 'ইনি—পিসীমা?'

'ও, ওটি? ও আমার এক দেওরপো, নিমাই। ওর ভরসাতেই তো আসা।'

'বাঃ, তাহলে তো আমার দাদা হলেন।' এই বলে নিমাই কিছু বোঝার কি বাধা দেবার আগেই হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম ক'রে বসল। সেই সঙ্গে রীতিমাফিক হেমন্ত আর শ্বশুর-শাশুড়িকেও।

নিমাইয়ের এ অভিজ্ঞতা এই-ই প্রথম। সে এতই হকচকিয়ে গিছল যে, হাঁ-হাঁ ক'রে

ওঠা তো দূরের কথা—সাধারণ সৌজন্য সূচক কথাগুলোও তার মুখে যোগাল না। তাকে কেউ এত সম্মান দিচ্ছে, বিশেষ এক-গা গয়না-পরা এমন সুন্দর চেহারার একটি মেয়ে—এ যেন তার দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না।

সে বোকার মতো—সত্যি-সত্যিই হাঁ ক'রে (সে মুখ বুজতে বহু বিলম্ব হওয়ায় বিস্ময়টা সকলেরই দৃষ্টিগোচর এবং হাস্যকর হয়ে উঠল) খানিকটা তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'বা বা—আমি একটা বোন পেয়ে গেলুম ফাঁকতালে। তা-তাহলে আমিই বা কম যাই কেন, আবুইমাদের পেন্নামটা সেরে নিই।'

এই বলে সে সেইখানেই, আনন্দবাজারের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ঢিব ঢিব ক'রে সবাইকে একদফা প্রণাম ক'রে নিল। ঝোঁকের মাথায় সদ্য-পাওয়া বোনটিকেও ক'রে ফেলত হয়ত—যদি না সে সম্ভাবনা অনুমান ক'রে সে যথাসময়ে খানিকটা পিছিয়ে যেত।

সিঁড়ি দিয়ে মন্দির থেকে নামতে নামতে হেমন্ত কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলল, 'পাতানো নয়, রক্তের সম্পর্ক—একথা বলতেও মাথা কাটা যায়—যাবারই কথাও—তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, তোমার নামটাই আমার এখনও জানা হল না।'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'ওমা, এতে আর লজ্জার কথা কি আছে! দ্যাখো নি কখনও—জন্মে-এস্তকই দ্যাখো নি—আসা-যাওয়া খোজ-খবর নেই—খামোকা নাম জানতে যাবে কি জন্যে, কে-ই বা বলবে! আমার নাম নিভা। ছোটবেলায় ঠাকুরদা এক উদখুট্টে নাম রেখেছিলেন—ভুবনেশ্বরী না কি যেন—মাতঙ্গী কি ছিন্নমস্তা রাখেন নি এই আমার ভাগ্যি—তা সে নাম এখনও কাগজেপত্তরে কাজে লাগছে—কিন্তু মা আমাকে নিভা বলে ডাকত, সেই নামেই চেনে সবাই। তুমিও আমাকে নিভাই ব'লো।'

তারপর একটু হেসে—'বাট-জগন্নাথের'* কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন—মুচকি হেসে বলল, 'ছোট্‌কার তো সবেতেই রঙ্গ-রস করা—ছোট্‌কাই শুধু নামটা উল্‌টে ডাকত—ভানি। বিচ্ছিরি!'

হেমন্ত আবারও যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উদ্বিগ্ন, ঈষৎ করুণকণ্ঠে বলে, 'ডাকত বলছিস কেন রে? তোর ছোট্‌কা—? তার কথা কেবলই চেপে যাচ্ছিস কেন? সে—সে বেঁচে আছে তো? মাথা খাস—লুকোস নি, সত্যি ক'রে বল্‌!'

হাসিটা একেবারে মিলোয় না বটে, কিন্তু নিভার মুখও ঈষৎ বিষণ্ণগম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, 'ডাকত বলেছি—ওটা কথার দোষ। মানে ছেলেবেলায় ডাকত। বে'র পর কি আর ও নামে ডাকতে পারে—সেই জন্যেই। না, মরে নি, বেঁচেই আছে। তবে সে না থাকার মধ্যেই। চলো না, এই তো বেরিয়েই পড়েছি। আমাদের গাড়ি যাওয়া-আসা ভাড়া করা দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা কোথায় আছ বললে? ও, কাঁচকামিনীর বাড়ির কাছে?—সে তো আমাদের ওখান থেকে বড় জোর এক-রশি পথ হবে। চলো চলো, একসঙ্গেই যাই। তোমরা একটা গাড়ি ক'রে নাও—পুরুষরা একটা গাড়িতে ওঠো—

---

* সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে ডানহাতি যে একটি জগন্নাথ মূর্তি আছেন, আগে তাঁকে বলা হত 'বাট-জগন্নাথ'—বাট অর্থে রাস্তা—এখন অনেকে বলেন 'পতিতপাবন'। যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই—তারা বাইরে থেকে এঁকে দেখেই উদ্ধার পাবে এই জন্যেই।

আমরা আর একটা গাড়িতে যাই গল্প করতে করতে। আমাদের ওখানে নেমে জলটল খেয়ে তবে যেয়ো।'

নিভা যেন ওদের কিছু ভাববার অবসর দেয় না, তার অনুরোধের মধুর আন্তরিক ভঙ্গী আর প্রবল ইচ্ছা-শক্তির বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

এপক্ষেও অবশ্য বাধা দেওয়ার ইচ্ছা বা কারণ ছিল না। এমন কিছু বেশী বেলা হয় নি। তাছাড়া হেমন্তর অনেক কথা এখনও শুনতে হবে, অনেক কথা জানা দরকার। এই মেয়েটাকেও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, ও যেন দশ মিনিটে রাজ্যের মায়া নিয়ে এসে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের পরিচয়; মাঝে কিছুদিন দেখা হয় নি, অনেকদিন ওর পথ চেয়েই ছিল।

সে তাই নিমাইকে একটা গাড়ি ঠিক ক'রে নিভার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে আসতে বলে নিভা আর তার শ্বাশুড়ির সঙ্গে ওদের ছইওলা গরুর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে আর একটি ছোট মেয়েও ছিল দশ-এগারো বছরের, বোধ হয় নিভার ননদ, তাকে পুরুষদের সঙ্গে ঐ গাড়িতে যেতে বলল, কিন্তু সে প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে একেবারে বৌদিকে জড়িয়ে ধরল, তাকে ছেড়ে সে যাবে না। অগত্যা চারজনেই উঠল ওরা এক গাড়িতে। একটু ঠাসাঠাসি হল, কিন্তু তখন ওদের সেটা খারাপ লাগার কথা নয়। হঠাৎ-পাওয়া আত্মীয়ের সঙ্গে এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বরং ভালই লাগল।

এর ভেতর নিভা কথা বলেই যাচ্ছে। সহজ অন্তরঙ্গ কথা।

'চলো, ওখানে বসে দু'দণ্ড জিরোও তো। খুব হাওয়া বাড়িটায়, উড়িয়ে নিয়ে যায় একেবারে। চাইকি, রান্নার ব্যবস্থা যদি করা না থাকে—আমি যেয়েই ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি, দুটো ডাল-ভাত খেয়েই যাও একেবারে। আমার দীক্ষা হয়ে গেছে—খেলে দোষ হবে না। বাড়িতে নারায়ণ আছেন, ভোগ রাঁধতে হয় বলে বাবা বে'র সঙ্গে সঙ্গেই মন্তর দিয়ে দিয়েছেন—নইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না তো।···বাবা এখানে পেসাদ ছাড়া কিছু খান না—বলেন মাসখানেকের জন্যে এসে আর পুরী পোড়াব না—তা পেসাদ আসতে তো সেই ধরো যার নাম বেলা একটা-দেড়টা—ছেলেমেয়েরা কি ততক্ষণ টাঙিয়ে থাকতে পারে? তাছাড়া—আমাদের পেসাদ ভালই লাগে—কিন্তু আঝালা আতেলা ওরা বেশীদিন হয়ত খেতেও চাইবে না। আবার শুনছি তো মহাপেসাদের সঙ্গে তেলের তরকারী মাছ-মাংস ঠেকাতে নেই। কাজেই আমাদের জন্যে উনুন জ্বালতেই হয়।'

ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে ওরা, গাড়ি চলতে শুরু করেছে স্বর্গদ্বারের দিকে—দক্ষিণ-মুখো। আস্তে আস্তে চলছে—দু'দিকে ভিখিরির ভিড় বাঁচিয়ে সংকীর্ণ গলিপথের মধ্যে দিয়ে চলা, দ্রুত চলার উপায়ও নেই। মানুষটানা নয়—এখনও যা দু-একটা বলদে টানা গাড়ি আছে, এ তারই একটা। তবে হেমন্তর পরিচিত ওদের দেশের গো-গাড়ির মতো নিচের বসার জায়গা শক্ত এবড়ো খেবড়ো বাঁশে তৈরী নয়, বেশ মসৃণ কাঠ দেওয়া, তাতে পুরু চেটাই পাতা, বসতে কোন অসুবিধা নেই।

হেমন্ত বলল, 'তাও তো বটে। আমার কপাল! কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি। তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি? কই, তাদের মন্দিরে আনো নি?'

'আমার ষেটের দুটি। একটি ছেলে একটি মেয়ে। এসেছে তারা। এর আগে

দু-তিনদিন দর্শন ক'রে গেছে। তাই রোজ আর আনি না। তারা ছোট্‌কাকে ছেড়ে আসতেও চায় না। ওর সঙ্গেই তাদের জমে বেশী!'

'ছোট্‌কা—মানে শিবু? তোমার সঙ্গে এসেছে? এখানে আছে?'

যেন বিশ্বাসই হতে চায় না কথাটা হেমন্তর।

'হ্যাঁ গো, তাই তো আরও টেনে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়!' তার পর চোখে একটু কৌতুকের ভঙ্গী ক'রে বলে, 'ইচ্ছে ছিল হঠাৎ দেখা করিয়ে চমকে দোব। তাই কথাটা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলুম।...কথার পৃষ্ঠে কথাটা এসে পড়ল বলেই—'

শুধু এখানে বা এখন নয়, অনেকদিন ধরেই নিভার কাছে আছে শিবু।

যেতে যেতে সংক্ষেপে শিবুর অনেক খবরই দিল নিভা।

ওর নিজের প্রসঙ্গেই বেশী অবশ্য।

যাকে বাঙাল দেশ বলে সেইখানেই বিয়ে হয়েছে নিভার। জেলা হিসেবে নদীয়া হলেও আসলে ফরিদপুরের প্রান্তে ওদের গ্রাম। ওর শ্বশুর-শাশুড়ির কথাতে সেই টানটাই স্পষ্ট।

সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ওঁরা, জোতজমা যথেষ্ট। লেখাপড়াও শিখেছে, পয়সা আছে বলে বসে খায় না কেউ। নিভার স্বামী বি-এ পাশ, ওখানকার ইস্কুলে মাস্টারী করে। তবে সেটা নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। দেশের জমিজমা ক্ষেতখামার দেখাশুনো করার জন্যেই কলকাতায় চাকরি নেয় নি, অন্য কোথাও বা অন্য কোন কাজ পাওয়ার চেষ্টা করে নি। নিভার একটি মাত্র দেওর, সে ডাক্তারী পড়ে, তার পক্ষে বিষয়-আশয়ের কাজ দেখা সম্ভব নয়। গুরুদাসবাবু বহুদিন ধরেই সংসারবিমুখ, পুজোপাঠ নিয়েই থাকেন—বৈষয়িক ঝামেলায় আর যেতে চান না। সুতরাং ওদিকের সমস্ত দায়িত্বই নিভার স্বামী অতুলপ্রসাদের।

এই সম্বন্ধ নাকি শিবুই আনে।

সে হতভাগা ভবঘুরে—তার নিজের ভাষাতেই 'ভ্যাগাবেন', কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবদের সবাই ও-শ্রেণীর নয়। তার নিজের মতো একটা সততা ও আত্মসম্মান-জ্ঞানের জন্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরেই যাতায়াত ছিল ওর। অবস্থাপন্ন বন্ধুবান্ধবরা তো ওকে ভালবাসতই—তাদের অভিভাবকরাও স্নেহের চোখে দেখতেন।

এই রকম একটি বন্ধু-পরিবারের সূত্রেই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে ওর পরিচয় হয় এবং তিনি বড় ছেলের বিয়ে দেবেন এই খবর পেয়ে—পাত্রটিকে দেখে ও তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভাল ছেলে বুঝে—নিভার কথাটা পাড়ে, শুধু তাই নয়—গুরুদাসবাবুকে একরকম পাকড়াও ক'রে ধরে এনে মেয়ে দেখিয়ে দেয়।

মেয়ে অপছন্দ হওয়ার কোন কারণ ছিল না, হয়ও নি।

পাত্রপক্ষ বিশেষ কোন কামড়ও করেন নি। নগদ টাকা তাঁরা চান নি একটিও—হয়ত মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছিল আর পাত্রীর বাবার অবস্থাও বুঝেছিলেন, সেইজন্যেই চান নি, পাছে বেশী টানতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে যায়—শুধু 'গা-সাজানো গহনা ও সাধারণ দানসামগ্রী যা হয় দেবেন' এই কথাই বলে দিয়েছিলেন। এছাড়া আর একটি মাত্র শর্ত

ছিল—দেশ থেকে জনকুড়ি বরযাত্রী আসবে, তাদের দু'দিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিভার অভিভাবক অদ্বৈত বা বাদল চিরদিনের ভালমানুষ মুখচোরা লোক, সেই হিসেবে একটু বোকাও—সে এককথায় রাজী হয়েছিল—সম্মত হওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব না বুঝেই। হয়ত তার ধারণা ছিল শিষ্যশ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীয়মাণ হলেও এখনও যা আছে, কন্যাদায় জানালে তাদের মধ্যে থেকেই এ-টাকাটা অনায়াসে উঠে যাবে।

তাও উঠত হয়ত—যদি তেমন চেষ্টা করা যেত। সে উদ্যম ও বুদ্ধি বাদলের নেই। সুতরাং বিশেষ কিছুই ওঠে নি, যা প্রয়োজন তার অর্ধেকও ওঠে নি নাকি। বাদল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধুই আশা ক'রে বসেছিল, আর কোন চেষ্টা করে নি। দিনের পর দিন কেটেছে—না পেরেছে অন্য কোন ব্যবস্থা করতে—না পেরেছে সমস্যার কথাটা কাউকে জানিয়ে সুপরামর্শ চাইতে।

বলেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। বরযাত্রী এসে পৌঁছবার যখন আর মাত্র দুটি দিন বাকী। বলেছে শিবুকেই, কিন্তু সে কোন উপায় করতে পারবে বা কোন সদ্‌যুক্তি দিতে পারবে এ-ধরনের কোন আশায় নয়—যেহেতু শিবুই ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, সেইহেতুই শিবুর কাছে বিপদের কথাটা জানিয়েছে—বিয়েটা বন্ধ করা কিংবা পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা, শিবু সেদিক দিয়ে কিছু করতে পারে কিনা সেই উদ্দেশ্যেই।

সে-সময় নাকি একবার হেমন্তর কথাও তুলেছিল বাদল। শিবুকে তো ভালবাসে। সে গিয়ে চাইলে কি আর এই তিন-চারশো টাকাটা দেবে না হেমন্ত? দান নয়—ধার হিসেবেই চাইবে।

শিবু বলেছিল- 'না। সে আমি চাইতে পারব না। আর সে দিদি দেবেও না। তোমাদের তো একেবারে গুড়পানা ভালবাসে—তা জানো না? মিছিমিছি মুখ নষ্ট। আর ধার বলে চাইবে—শোধ দেবে কোথা থেকে? এই তো এতদিন দেখলে, কোন আয়ের পথ কি করতে পেরেছ একটা? তবে আবার ধার চাও কোন্ আক্কেলে? সে জানে আমি কথার ঠিক রাখি, আমি চাইলে হয়ত দেবে—কিন্তু আমি সেইজন্যেই চাইব না। অত টাকা শোধ দেওয়া আমার হাড়ে হবে না। আর আমি যখন পারব না জানি—তখন সে-দায়িত্ব ঘাড়ে নোব কোন্ ভরসায়?'

এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারে নি বাদল। মাথা হেঁট ক'রে বসে থেকেছে শুধু।

শেষ পর্যন্ত শিবুই নাকি অসাধ্য সাধন করেছে। পুরনো নতুন সব পাড়া ঘুরে ওর আলাপী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেই নাকি ঐ বিপুল টাকাটা তুলেছে সে। বেশি কারও কাছ থেকে নেয় নি, কোন একজনের বোঝা না হয়ে পড়ে। দশ-পনেরো-বিশ ক'রে নিয়েছে—তাও ধার বলে নয়, দান বা সাহায্য হিসেবেই চেয়ে নিয়েছে। স্পষ্টই বলে দিয়েছে চাইবার সময়—'আমার যে শোধ দেবার ক্ষমতা নেই সে তো তোমরা জানোই, আর আমার দাদা আমার মতো বকাটে-বাউণ্ডুলে না হলেও তার অবস্থাও আমার থেকে ভাল নয়। শোধ দিতে পারব না কোনদিনই—এ বুঝে যে দিতে পারবে সে দাও।'

তাই দিয়েছে—যাদের যাদের কাছে গিছল তাদের প্রায় সবাই। পাঁচ দশ কুড়ি

পর্যন্ত দিয়েছে এক-আধজন। তিনদিনের মধ্যেই উঠে গেছে টাকাটা।

সেই ঋণটাই নিভা ভোলে নি। স্বামী শ্বশুরবাড়ি—যাকে ঘর-বর বলে—পেয়ে পূর্ণ তৃপ্ত সে। নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে। শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদরা তাকেই সর্বময়ী কর্ত্রী ক'রে রেখেছে—সচ্ছল উপচে-পড়া সংসার, দেবতার মতো স্বামী। যে অবস্থায়, যে অভাব-অনটন এবং সেই কারণেই অপমানের মধ্যে দিন কেটেছে বাপের-বাড়িতে, সে-দারিদ্র্য সে-সব দিনের কথা ভাবলে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তা থেকে যে মুক্তি পেয়েছে, এই অভাবনীয় সুখের মধ্যে এসে পড়তে পেরেছে, সে তো শুধু ঐ সকল-সুখসৌভাগ্যের আশাহীন, সর্ববঞ্চিত হতভাগ্য কাকাটার জন্যেই। শুধু শেষ মুহূর্তে টাকাটা তুলে দিয়ে বিয়েটা সম্ভব করেছে বলেই নয়—সম্বন্ধটাও সে-ই এনেছিল। নইলে বাদলের সাহসেই কুলোত না এমন পাত্রের দিকে হাত বাড়াবার। হয়ত কোন পাত্রের জন্যেই যথেষ্ট সক্রিয় হতে পারত না, আদৌ যে তার পক্ষে মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করা সম্ভব তাই হয়ত মাথায় যেত না তার।

সেইজন্যেই যেদিন শুনেছে যে, শিবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়, বোধহয় আর বেশীদিন বাঁচবে না—প্রকৃতি এইবার এতদিনের অনাচার-অবহেলার শোধ নিতে শুরু করেছেন—সেদিন আর স্থির থাকতে পারে নি। আগে স্বামীকে বলেছে, তাঁর মত নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে বলেছে। তাঁরা যে শুধু আপত্তি করেন নি তাই নয়, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, নিজেরাই তৎপর হয়ে লোক সঙ্গে দিয়ে নিভাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন শিবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে বেশী ক'রে টাকা দিয়ে দিয়েছেন যে, অবস্থা যদি খুব খারাপ দেখে তো ভাল বড় কোন ডাক্তার দেখিয়ে কিছুটা সুস্থ ক'রে তুলে ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করিয়ে যেন নিয়ে যায়।

এত কাণ্ডের প্রয়োজন হবে প্রথমে তা ভাবে নি নিভা। গুরুদাসবাবু যখন একেবারে দুশো টাকা ওর হাতে দিয়েছেন, তখন সে আপত্তিই করেছে। গুরুদাসবাবু একরকম জোর ক'রেই দিয়েছেন টাকাটা। ক'দিনের পরিচয়ে তিনিও এই বাউণ্ডুলে প্রায়-আত্মঘাতী ছেলেটাকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। এমন নিজের হাতে নিজের জীবন উড়িয়ে দেওয়া দেখলে সাধারণতঃ লোকে অবজ্ঞার চোখে দেখে—তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়—কিন্তু শিবুর মধ্যে কী একটা ছিল, সময়ে সময়ে তার মন মহত্তর চিত্তবৃত্তির স্তরে উঠে যেতে পারত অনায়াসে। তার মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের প্রকাশও অস্বাভাবিক বোধ হত না। সেইজন্যেই অনেক ভদ্র ছেলে বা ভদ্রলোক ওকে ভালবাসত, প্রশ্রয় দিত, সেই কারণেই গুরুদাসবাবুও এত বিচলিত হয়েছিলেন।

বাপেরবাড়ি পৌঁছে নিভা দেখেছিল, শিবুর অবস্থা—ও যতটা আশঙ্কা ক'রে এসেছিল তার থেকে অনেক খারাপ। শিবুর স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না—ওর জন্মের সম্ভাবনারও অনেক আগে থেকে ওর মার শরীর ভেঙে গেছে, নানারকম রোগে শরীর জীর্ণ হয়েছে। সেই প্রায়-মুমূর্ষু অবস্থাতেই গর্ভে বহন ও জন্মদান করেছেন তিনি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বুকের দুধ দিতে পারেন নি—জলবার্লি খেয়ে মানুষ হয়েছে। অর্থাৎ ভিতটাই গাঁথা হয়েছে পুরো বালির ওপরে।

তার ওপর, যেটুকু যত্নে ও নিয়মে থাকলে শরীর বাঁধতে পারত—তার কিছুই হয় নি,

একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো সে বরং বিপরীতটাই করেছে। জোর ক'রে, যেন জীবনটাকে নষ্ট করার জন্যেই—যত রকমে সম্ভব অনাচার আর অনিয়ম করেছে। নেশা করেছে অথচ তার সঙ্গে যা খাওয়া দরকার তা খায় নি। অর্ধাহারে, অনাহারে থেকে ক্ষয়কারী নেশা ক'রে গেছে। নিয়মিত খাওয়া বা কোন পুষ্টিকর খাওয়ার কথা তো কল্পনাতীত—সর্বদিন অর্ধাহারও হয়ে ওঠে নি।

এ সত্ত্বেও যে এতকাল বেঁচে ছিল—শুধু এই উচ্ছৃঙ্খলতার সর্বপ্রধান আনুষঙ্গিক যেটা—স্ত্রীলোক-ঘটিত অনাচারটা তার ছিল না বলেই।

তবু প্রকৃতি বেশীদিন এ ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন তা সম্ভব নয়। তিনি প্রথম প্রথম কয়েকবার হুঁশিয়ার ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন, শিবুর নিজের ভাষায় 'ওয়ার্নিং' দিয়ে—সে সতর্কবাণীতে জেনে-শুনেও কান দেয় নি শিবু, গ্রাহ্য করে নি। বহুদিন সহ্য ক'রে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত সংহার-মূর্তি ধারণ করেছেন তিনি। নিভা যখন গেছে তখন আর ওঠার অবস্থা নেই। গ্রহণী রোগ ধরেছে, দৈনিক উনিশ-কুড়িবার পাইখানায় যেতে হয়। কিছুই সহ্য হয় না—সামান্য ঝোলভাতও খেতে পারে না। পেটে খাদ্যনালীতে বোধহয় ঘা হয়েছে, লঙ্কা তো অসম্ভব—নুন-দেওয়া কোন খাবার খেলেও অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ডাক্তার বলেছে দুধভাত খেতে—কিন্তু গুড় বা চিনি ছাড়া দুধ-ভাত খেতে পারে না, খেলে বমি হয়ে যায়। সুতরাং প্রায় অনাহারেই দিন কাটছে।

এর ওপর ঘুষঘুষে জ্বর আসছে রোজ। তার সঙ্গে চটচটে ঘাম। ডাক্তাররা আশঙ্কা করেছেন টি-বি, আগে যাকে থাইসিস বলা হত, যক্ষ্মারোগ। যদিচ তার চূড়ান্ত নির্ণয় তখনও কিছু হয় নি।

অবস্থা দেখে প্রথমটা তো নিভা কেঁদে বাঁচে না। তবে সেও ওদেরই ভাইঝি, বেশীক্ষণ হাল ছেড়ে বসে বৃথা কান্নাকাটি বা হা-হুতাশ করার লোক নয় সে। সক্রিয় হয়ে উঠতে—মন থেকে হতাশার ভাব দূর ক'রে ফেলে গাঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে—একঘণ্টার বেশী সময় লাগে নি তার। সে একেবারেই বড় ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আনিয়েছে, তাঁর নির্দেশমত দামী ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছে, ঠিক টি-বি না অন্য কিছু—নির্ণয় করার জন্যে যা যা পরীক্ষা করার সব করিয়েছে।

তবু কিছু সংশয় ছিল, নীলরতনবাবুরই পরামর্শে বিধানবাবুকে এনেও দেখিয়েছে। তিনি অভয় দিয়েছেন, এ জ্বর যক্ষ্মার জ্বর নয়, দূষিত লিভারের জন্যেই এ জ্বর হচ্ছে। তবে এও বলে দিয়েছেন, হার্ট বা ফুসফুসের অবস্থা খুব ভাল নয়। অচিরেই হাঁপানির মতো টান দেখা দিতে পারে। যত শীঘ্র হোক কলকাতার বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর—নিদেন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করাই উচিত, তাহলে কিছুটা অন্তত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

মাসখানেক চিকিৎসা চালিয়ে, খানিকটা আশার দিকে মোড় ফিরছে দেখেই, নিভা ওকে নিয়ে নিজের শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসেছে। এর মধ্যে আরও টাকা পাঠিয়েছেন গুরুদাসবাবু, শিবুর বন্ধুদের ভেতরও দু-একজন এসে কিছু কিছু টাকা দিয়ে গেছে। সুতরাং চিকিৎসার কোন অসুবিধা হয় নি—ত্রুটি ঘটে নি। কিন্তু যার দেহে একেবারেই কিছু নেই—শুধু ওষুধপত্রে তাকে কতটা চাঙ্গা করা যায়? আল্‌গা বালির ওপর

ভিত ক'রে বিশাল ইমারত তৈরীর মতোই অবাস্তব সে-চেষ্টা।

বলা বাহুল্য ওর জন্যে চিকিৎসার এই ঘটা—বিশেষ নিভার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করেছিল শিবু। শেষের দিকে তো একেবারেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাঁটাচলার অবস্থা থাকলে পালিয়েই যেত বোধহয়—কিন্তু নিভাও নাছোড়বান্দা, ওর সামনে ঢিব ঢিব ক'রে মাথা খুঁড়ে ওকে রাজী করিয়েছে।

সেই থেকেই নিভার কাছে আছে শিবু। গোড়ার গোড়ায় খুব ছটফট করেছে, চলে আসতে চেয়েছে, তারপর ক্রমে পোষ মেনেছে, খুব বেশী আপত্তি করে নি আর। পল্লীগ্রামের জীবন, নিভাদের আদরযত্ন—সবচেয়ে নিভার ছেলেমেয়ে দুটোর মায়া—এসব কাটিয়ে চলে যেতে পারে নি। ঐ কুঁচো দুটোর টানেই আরও, পুরী আসতে রাজী হয়েছে। ওরা যেন শিবুর গায়ের পোকা, সর্বদা ঘিরে আছে। অবশ্য ওকে আনার জন্যেই আরও নিভাদের পুরীতে আসা, সমুদ্রের হাওয়া লাগলে বুকটা সহজ হবে, এই আশায়।···

সংক্ষেপে বললেও অনেকটা সময় লেগেছে।

গোরুর গাড়ির মন্থর যাত্রাও এক সময় শেষ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ, এদের খেয়ালও হয় নি। শেষ পর্যন্ত পিছনের গাড়িওলার তাড়নায় জোয়াল থেকে বলদ দুটোকে খুলে সরিয়ে দিতে যখন গাড়িটা সামনের দিকে হেলে পড়েছে—তখন চৈতন্য হয়েছে ওদের। তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

শ্মশানের ওপরই বলতে গেলে, একতলা বাড়ি একটা—নিভারা ভাড়া নিয়েছে। 'প্রিয়ধাম' নাম, বাড়িটা নতুন, হাওয়া-বাতাস আছে। সামনেই চওড়া বারান্দা খানিকটা। হেমন্ত নামতে নামতেই লক্ষ্য করেছে, এক অতিশীর্ণ পলিত-কেশ বৃদ্ধ বাইরের বারান্দায় বসে দুটি ছোট ফুটফুটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলছে। কে তা কে জানে, হেমন্তর মন এবং চোখ তখন শিবুকেই খুঁজছে। একবার মাত্র বারান্দার দিকে চোখ বুলিয়ে শিবু নেই দেখে উৎসুক চোখে ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে বারান্দার দিকে এগোচ্ছে—সেই বৃদ্ধটি মুচকি হেসে বলে উঠল, 'আমার মন কেমন যেন বলছিল দিদি যে, তুইও আসবি এখানে—তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জগন্নাথ যে বলে অন্তর্যামী হয়ে সকলের মনের খবর জেনে বাঞ্ছা পূরণ করেন—তা কথাটা দেখছি নিহাৎ মিথ্যে নয়।'

পাথরের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হেমন্ত। এই রুগ্ন অতি-বৃদ্ধ লোকটাই শিবু? তার অনেক পরের ছোট ভাই?

॥ ১৬ ॥

কথাটা সহজভাবেই বলেছিল শিবু, হেমন্তর ওপর যে এতখানি প্রতিক্রিয়া হবে তা ভাবে নি।

যার চেহারা খারাপ হয়ে যায়, স্বাস্থ্য ভাঙে, সে নিজে বুঝতে পারে না, ঠিক কতটা খারাপ দেখতে হয়েছে তাকে। আয়নায় মুখ দেখার সময় হয়ত একটু চমকে ওঠে—কিন্তু অন্য সময় অভিজ্ঞতাটা অত মনে থাকে না। সে নিজের চোখ দিয়ে যখন আর

সবাইকে দেখে, দেখে তাদের চিনতে পারে—তখন আশা করে যে, তাকে দেখেও সবাই চিনবে, কেন চিনতে পারবে না !

শিবুরও সেই অবস্থা। হেমন্তর যে তাকে চিনতে পারার কোন অসুবিধা আছে —তা ওর মাথাতেই যায় নি। সে সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিল, দিদি ওকে দেখে খুশী হবে, বড়জোর এতদিন ডুব মারার জন্যে তিরস্কার করবে—এই ধরনের কিছু কিছু প্রতিক্রিয়ার কথাই ভেবেছিল। এমন স্তম্ভিত অবস্থা হবে, এতটা সশংক বিস্ময় বোধ করবে তা ভাবে নি। কে জানে, হয়ত হেমন্তর এই বিহ্বল দৃষ্টিতে নিজের অবস্থাটা সম্বন্ধেই নতুন ক'রে সচেতন হয়ে উঠে সেও আঘাত পেল একটা। আস্তে আস্তে বলল, 'কী হল ? ভূত দেখলি নাকি ?'

তাতেও, তখনই উত্তর দিতে পারল না হেমন্ত। তারপর সেও গাঢ় ধীরকণ্ঠে—এখন তার পক্ষে এতখানি হৃদয়াবেগও কতকটা অস্বাভাবিক—বলল, 'না, ভূত তো শুনেছি মানুষের দেহ ধরেই আসে। চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। আমি ভাবছি অন্য কেউ। তোমার মধ্যে শিবুর চেহারার মিল কিছু আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করছি।'

শিবু হেসে বলল, 'ভাবছিস অন্য কেউ এসে শিবুর পরিচয় দিয়ে এদের আদরযত্ন খাচ্ছে কিনা ?···তা একরকম তাই বটে। যে শিবুকে তুই চিনতিস—মানে ওদিকে ক'দিন দেখেছিলি—সে শিবু আমি নই। এই দু-তিন বছরের মধ্যে কোন নেশা করি নি—শুনলে অবাক হয়ে যাবি !'

ততক্ষণে নিভার শাশুড়ি ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি একটা শতরঞ্চি এনে পেতে দিয়েছেন। বসে পড়তে পেয়ে যেন বেঁচে গেল হেমন্ত। পায়ের জোরটা হঠাৎ আশ্চর্য-রকমভাবে কমে গেছে তার, দাঁড়িয়ে থাকার বা চলার ক্ষমতা নেই। এখনও যে মনের মধ্যে এতখানি উদ্বেগ আর আবেগ আছে কারও জন্য, ওর পক্ষে এতখানি বিচলিত হওয়া সম্ভব, তা কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পারত না সে। সেই আবেগেই আরও এই দুর্বলতা বোধ করছে—বুকের মধ্যেটা হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেছে।

এতখানি বয়সে অনেক দেখল সে। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। এই যে অকালবৃদ্ধ লোকটি তার সামনে বসে হাসবার চেষ্টা করছে—যে হাসির চেষ্টায় ওর অস্বাস্থ্যবিকৃত মুখটা বিকৃততরই হয়ে উঠছে শুধু—মানুষের মুখের যে হাসি অধিকাংশ সময় দর্শকদের মনে আনন্দ বা কৌতুকের প্রতিধ্বনি জাগায়—এ সে হাসি নয়, এ হাসি দেখলে বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন গুর-গুর ক'রে ওঠে। ওকে যতই যত্ন করা হোক, যতই চিকিৎসা করানো হোক, এ আর বেশীদিন বাঁচবে না। এই জীবন-চঞ্চলা পৃথিবীতে এর অবস্থিতির কাল সীমিত হয়ে এসেছে, এর পরমায়ু তার নির্দিষ্ট পরিমাণের শেষ প্রান্তে পেঁাচেছে, সেটা বুঝেই হঠাৎ এমন দুর্বল, অসহায় বোধ করছে।

অনেকক্ষণ পরে অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে শিবুই আবার প্রশ্ন করল, 'কী দেখছ অমন অবাক হয়ে ? ভয় পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে ?···বাঁচব না বেশীদিন আর—এই তো ? ···তা এতে আর ভয় পাবারই বা কি আছে, অবাক হবারই বা কি কারণ ?···কেনই বা বাঁচব ? বাঁচার জন্যে যা করা দরকার কিছুই তো করি নি কোনদিন। এখন হঠাৎ বাঁচতে চাইলে চলবেই বা কেন ? আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার বাঁচার কোন

অধিকারও নেই আর—চলে যাওয়াই উচিত। মিছিমিছি, যতদিন বাঁচব নিজের ভোগান্তি, পরকেও বিব্রত জ্বালাতন করা। খেটেখুটে নিজের ভাত নিজে রোজগার ক'রে খাওয়ার মতো অবস্থা আর কোনদিনই হবে না। আমি গেলে এই ভাতটা অন্য একটা লোকের কাজে লাগবে—যার প্রাণের দাম আছে।'

আবারও হাসে সে, কথা শেষ ক'রে।

অর্থাৎ হাসির ভঙ্গীতে মুখটা বিকৃত হয় আর একবার।

এতক্ষণে ভাল ক'রে তাকাতে পেরেছে হেমন্ত। সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে কিছুক্ষণ—নরদেহের পরিহাস—ঐ শরীরটার দিকে চাইতে। লোকে উপমা দেয় প্রেতের মতো। কিন্তু প্রেত কেউ দেখে নি, সে যে ভয়ঙ্কর হবেই তার কোন মানে নেই। মানুষের মূর্তি ধরে যদি আসে তো তাকে মানুষের মতোই দেখতে হবে। এ মানুষের মতো নয়। এর দিকে চাইলে ভয় হয়, বুকের মধ্যে কেমন করে।

রঙটা আগেই তামাটে হয়ে গিয়েছিল—এখন রীতিমতো কালো। দেহে মাংস বলতে কিছু নেই, কংকালের ওপর একটা চামড়া ঢাকা শুধু, সে-চামড়াও কুঁচকে কেমন শিথিল হয়ে গিয়েছে, খড়ি-ওড়া-ওড়া খসখসে—বহুদিনের মৃত পশুর চামড়ার মতো নির্জীব—তেল রাখার যে চামড়ার কুপি-পাওয়া যায়—অনেকটা সেই রকম। চোখের কোণে সর্বদা একটা জলের আভাস, অশীতিপর বৃদ্ধের যেমন হয়—তাও সকলের না; সে জল ঝরে পড়ে না, টলটল করে। কাপড়ে মুছলেও সঙ্গে সঙ্গে আবার ভরে যায়। দাঁত বেশির ভাগই পড়ে গেছে—যা গোটা-দুই-তিন আছে, তার জন্যে মুখটা আরও বীভৎস দেখায়।

হেমন্ত সেদিকে চেয়ে থেকেই তেমনি ধরা-ধরা গলায় বলল, 'এমন দশা হয়েছিল, তা আমার কাছেও তো যেতে পারতিস! তোকে তো কোনদিন আমি যেতে বারণ করি নি, দূর-ছাইও করি নি!'

'সেইজন্যেই তো যাওয়া যায় না ভাই। কখনও কিছু দিতে পারলুম না—ভক্তিছেদ্দা ভালবাসা তো চুলোয় যাক—কোনদিন খোঁজটা পর্যন্ত করলুম না,—এতটুকু উপকারে লাগলুম না জীবনে—দেখা হওয়ার পরও নিজের দরকার ছাড়া কখনও খবরটুকুও নিলুম না; আমাদের বংশের দ্বারাই তোমার কোন উপকার হল না কখনও—এখন নিজের দোষে নিজের শরীর নষ্ট ক'রে গিয়ে তোমার ঘাড়ে চাপব কোন্ আক্কেলে? সেটুকু বোধ তখনও ছিল—যতটা অমানুষ হলে লোক এসব বিবেচনা হারায় অতটা বোধহয় হতে পারি নি।...এই তাই দাদার ওপরও বোঝা হয়ে চাপার ইচ্ছে ছিল না—বার বার বলেছি যে, হাসপাতালে ফেলে দিয়ে এসো। পালাবার ক্ষ্যামতা থাকলে কোথাও কোন দূর দেশে গিয়ে পথের ধারে পড়ে থাকতুম। আমার কোন পাওনা নেই কারও কাছে—তা আমি বেশ জানি, শুধু শুধু চাইবই বা কেন—নোবই বা কেন?...দাদা-বৌদি চিরকালের বোকা—তাই ছাড়ল না। আর তেমনি কাঠ-বোকা এই ছুঁড়িটাও, ঘাটের মড়াকে এনে ঘরে তুলল। মাঝখান থেকে বেয়াই-বেয়ান নাজেহাল—শুধু শুধু কতকগুনো খরচান্ত!'

নিভা এবার ধমক দিয়ে উঠল, 'থামাও দিকি বাপু একটু—তোমার প্যগবগানি! একটা খেই পেলে কি অমনি বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল। য়্যাদ্দিনে এই প্রথম পিসীকে

পেলুম—একটু আলাপ-পরিচয় করি, একটু চা-জলখাবার খাক—নিরম্বু টাঙিয়ে আছে এত বেলা অব্দি—তা নয়, আপনার কথাই পাঁচ কাহন!'

স্নেহ-করুণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে শিবু বললে, 'দাদার চাইতেও বোকা হয়েছে এ-মেয়েটা—মাইরি বলছি দিদি।...পাগল একটা। আস্ত পাগল! ওর এখনও আশা আমাকে বাঁচিয়ে ভাল ক'রে তুলবে। আবার আমি আগের মতো বেপরোয়া নেশাভাঙ ক'রে হল্ল হল্ল ক'রে ঘুরে বেড়াব।...আচ্ছা, আচ্ছা, এই চুপ করলুম। দে, কি দিবি দে—ওদের খেতেটেতে। মিষ্টি পেসাদ এনেছিস কিছু? আমাকেও একটু দিস তাহলে!'

নিভা জলখাবার সাজাতে সাজাতে ঘর থেকেই বললে, 'কিছুতে রুচি নেই, একটা কিছু যদি মুখে তুলবে! কী ভাগ্যি—বাবার পেসাদ আসে—তাই একগাল একগাল খায় কোন-কোনদিন—নুন-ঝাল কম বলেই মহা-পেসাদে একটু যা হোক রুচি আছে—আর ঐ পেসাদী মিষ্টিও—এমনি রসগোল্লা সন্দেশ কিছু খাবে না। জগন্নাথের ভোগের মিষ্টি নরম যা—তাই একটু-আধটু।'

'প্রাচিত্তির করছি রে—প্রাচিত্তির। পরমহংস না কে যেন বলেছে না জগন্নাথের পেসাদে মহাপাতক কেটে যায়—আর জম্মাতে হয় না?...অনেক অনাচার অনেক পাতক জমা আছে, সেইটেই ক্ষ্যায় ক'রে নিচ্ছি—যাতে মরার সময় নিভ্ভয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে যেতে পারি!'

বলতে বলতে—ওদিক থেকে কড়া শাসানির ভয়েই বোধহয় চুপ ক'রে গেল। নিভা এতক্ষণে তালপাতার ঠুঙ্গিতে ক'রে মিষ্টি-প্রসাদ সাজিয়ে এনে হাত দিয়ে জায়গাটা মুছে হেমন্ত, নিমাই আর শিবুর সামনে দিয়েছে। গুরুদাসবাবুর জন্যে ভেতরে ব্যবস্থা। তাঁর স্ত্রী আলতো একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে—একখানা পাখা হাতে ক'রে ওদের সামনে এসে বসলেন। হাওয়া করার দরকার নেই—হু-হু ক'রে ঝড়ের মতো বইছে সমুদ্রের হাওয়া—এটা শুধুই অভ্যাস—সৌজন্য রক্ষার অঙ্গ একটা।

খাবার নামাতে নামাতে কৈফিয়ৎ দিল নিভা, 'মাছ-খাওয়া বাসনে মহাপ্রসাদ দিতে নেই—এখানে আর পুজোর বাসন কোথায় পাব—তাই তালপাতার এই বাটিই আনিয়ে রেখেছি। বাবা অন্নপেসাদ খান পাতায়।'

'তুমি নিলে না? বেয়ান—?' হেমন্ত প্রশ্ন করে।

নিভার আগে বেয়ানই উত্তর দেন, 'আপনাদের হোক তারপর আমরা শাশুড়ি-বৌ-খাব নিশ্চিন্ত হয়ে। নইলে—আমাকে খাওয়াবার দায় না থাকলে ও যা বৌটি আমার, দাঁতে কুটো কাটবে না, রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসে যাবে। মন পড়ে আছে ওর সেই-খানেই। উনুন ধরে গেছে তো। ছোট বেয়াই উনুন ধরিয়ে রেখে দেন যে—ফেরার সময় আন্দাজ ক'রে।'

এমনি টুকরো-টাকরা কথাবার্তা—প্রীতির ছোট ছোট আদান-প্রদান। হেমন্তের বুকটা ভরে যায়। সেই সঙ্গে কোথায় যেন একটু দুঃখও অনুভব করে, অতৃপ্ত তৃষ্ণার বেদনা একটা। এদের সে-ই পর ক'রে দিয়েছে, দিয়ে পাজীর বংশ ওর শ্বশুরবাড়ির ঝাড় এনে পুষছে—অকৃতজ্ঞ বেইমান অমানুষের ঝাড়।...যা হবে না, হবার নয়—সেই ছেঁড়া-চুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা তার।...

এরাই ওর আপন হতে পারত। এই মেয়েকে আপন মেয়ের মতোই কাছে রেখে মানুষ করতে পারত। মেয়ের মতোই দেখত শুনত। ঐ ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটোকে দিয়ে নাতি-নাতনীর অভাব মিটত।

আবার পরক্ষণেই শিউরে ওঠে মনে মনে।

দরকার নেই, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! তার যা অভাগা কপাল, ভাল কিছু সইত না। এদের মানুষ করতে গেলে, এরাও বাঁচত না হয়ত। সংসার পাতা তার কপালে লেখেন নি ভগবান, হুতোশনী মেয়েমানুষ সে, যেদিকে চাইবে জ্বলে-পুড়েই যাবে।

তন্ময় হয়েই ভাবছিল কথাগুলো, মন চলে গিয়েছিল কোন্ সুদূরে—নিজের অতীত জীবনের অগণিত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে—হঠাৎ কানে গেল নিভার শাশুড়ি বলছেন, 'আপনে কবে আসছেন আমাদের ওখানে তাই বলেন। চলেন না কেন এই যাত্রায়ই আমাদের সাথে। বেশ আনন্দ করতে করতে যাওয়া যাইব!'

যেন চমকে ঘুম ভাঙল হেমন্তর।

'আপনাদের ওখানে? যাব বৈকি! নিশ্চয়ই যাব। তবে এ যাত্রায় হবে না ভাই। আপনাদের ওখানে যাব যখন, বেশ কিছুদিন থাকব, নিশ্চিন্ত হয়ে আপনাদের আদর-যত্ন খাব।'

আস্তে আস্তে, দন্তবিরল মুখে পাক্‌লে পাক্‌লে খাচ্ছিল শিবু, খাওয়া শেষ ক'রে প্রসাদের হাত মাথায় মুছে বলল, 'উঁহু উঁহু—এখন না দিদি, বলে রাখলুম। যখন ঠেকবি, শরীর ভাঙবে, দেখার কেউ লোক থাকবে না—তখন একেবারে গিয়ে আশ্রয় নিস। স্বচ্ছন্দে—কিছু ভাবিস নি, কোন সংকোচ করিস নি। তোরও তো কেউ নেই, মরণকালে দেখার কি সেবা করার, এই মেয়ের কাছেই যাস—মাথায় ক'রে রাখবে। ওকে ভগবান ঐ একরকম ক'রে তৈরী করেছেন, ওর ওপর যা খুশি, যত খুশি বোঝা চাপানো যায়—একটুকু 'কিন্তু' হওয়ার দরকার নেই।…তেমনি গিয়ে পড়েওছে—যেমন আমার জামাইটি, তেমনিই বেয়াই-বেয়ান। বৌ যদি দুনিয়ার সমস্ত হা-ঘরে, ভবঘুরে বাউন্ডুলেকে খাইয়ে যথাসব্বস্ব উড়িয়ে দেয়—তাও কিছু বলবে না। বলবে, বেশ করেছ বৌমা, বেশ করেছ। ভালই তো। ভাল বুঝেছ করেছ। তোমারই তো সব মা—আমাদের জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই। আর তুমি তো কোন অন্যায় করছ না। কুণ্ঠিত হওয়ারই বা কী আছে এতে?' গলাটা নকল করার চেষ্টা করে বেয়ানের।

'দ্যাখো দ্যাখো, কথার ছিরি দ্যাখো ছোট্‌কার!' নিভা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কোত্থাই কিছু নেই, মরণকালের কথা টেনে আনল! কবে মরণকাল ঘনাবে, অক্ষ্যাম হয়ে পড়বে—তবে পিসী যাবে ভাইঝির বাড়ি বেড়াতে।…কেন এমনি বুঝি যেতে নেই, দরকার না পড়লে? বেশ তো, এখন থেকে গিয়েই তো থাকলে পারে—আর কলকাতায় পড়ে থাকার দরকারটা কি?'

বেলা হয়েছে এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হেমন্ত।

কতকটা যেন নিজেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে উঠতে হয়। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে নেশা লেগে যাবে। তাছাড়াও, সে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটা রান্নাঘরে যেতে পারছে না;

মনে মনে হানটান করছে, রান্না এখনো চাপাতে পারল না, ছেলেমেয়েগুলো—রোগীর হয়ত দেরি হয়ে যাবে খেতে।...

টেনে ছিঁড়ে চলে গেল বটে কিন্তু দূরে থাকতেও পারল না। এরপর যে ক'দিন নিভারা রইল এই বাড়ি এই বারান্দা যেন অমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল। ওদের শান্তির সংসারটাই যেন তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। দেখে দেখে তাই যেন সাধ মেটে না।

রোগা মৃত্যুপথযাত্রী ভাইটাও তার একটা আকর্ষণ। এমন ক'রে কাছে কখনও পায় নি। ওর মনটা যে এত ভাল, এত কোমল—তাও বোঝে নি এর আগে। কোমল বলে, মানুষের প্রতি মানুষের অবিচারে ক্ষুণ্ণ বলেই—আর ওর বাবার আচরণে, দাদার মূঢ়তায়, ওদের পরনির্ভরতার চেহারা দেখে—নিদারুণ অভিমানেই সে নিজেকে অমনভাবে নষ্ট করেছে। ভালবাসে সবাইকে—কারও ভাল করতে না পেরে তাই নিজের ভালর পথটা বন্ধ করেছে।

অনেক কথা ওর মুখ থেকে শোনে হেমন্ত। বোনদের কথা, তাদের ইতিহাস, বাবার কথা—বাবা নাকি বৃদ্ধ বয়সে আর একটা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এক শিষ্যকে আদেশ করেছিলেন তার কন্যাকে দান করতে। নিহাৎ সে শিষ্যর মেয়ে গলায় দড়ি দিতে চেয়েছিল, আর শিবু রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল বলেই পেরে ওঠেন নি। তারপর আর বেশীদিন বাঁচেনও নি অবশ্য।

আরও অনেক খবর পায় সে আস্তে আস্তে।

নিভার ইতিহাসটাই তো অবিশ্বাস্য এক কাহিনী। নিভা নাকি ওর দাদার আপন মেয়ে নয়। ওদের এক পিসতুতো দাদা থাকতেন ভাটপাড়ায়—তাঁকে দেখেছে হেমন্তও ছেলেবেলায়, ছায়ার মতো মনে আছে। রামধন ভট্চায নাম, আপন পিসতুতো ভাই ওদের—তাঁরা নাকি এক চৈত্রমাসে সপরিবারে তারকেশ্বর গিয়েছিলেন কী মানসিকের দণ্ড খাটতে। সেখানেই কোন অনিয়ম হয়ে থাকবে—ফিরেই ওলাউঠো হয়—এশিয়াটিক কলেরা যাকে বলে—একদিনে স্বামী-স্ত্রী, বড় ছেলে, এক বিধবা দিদি—সব শেষ। শুধু বেঁচে ছিল ঐ নিভাই। ছ'মাসের শিশু, মুখে জল দেবার কেউ নেই, কলেরার ভয়ে তাকেও কেউ ঘরে আনতে সাহস করে নি।...খবর পেয়ে বাদলই ছুটে যায়, মেয়েটাকে নিয়ে চলে আসে। এতেও তাদের পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন, মন্দভাগ্য মেয়েকে বাড়িতে রাখলে সকলের অমঙ্গল হবে—অনাথ আশ্রমে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু এই একটা আদেশ তাঁর কিছুতেই শোনে নি বাদল—নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছে নিভাকে। নিভা এখনও ওদেরই মা-বাবা বলে জানে, ওরাও তাকে নিজের মেয়ে বলে মনে করে—বোধহয় আর কেউই এখনও জানে না যে, নিভা বাদলের আপন মেয়ে নয়।

বাদলের খবরও পায় কিছু কিছু। বলতে চায় না শিবু, হেমন্তর অনুগ্রহের দান তাকে নিতে হয়—সেটা ওর আজও পছন্দ নয়। শুধু অতিকষ্টে এইটুকু জানতে পারে যে—ওদেরই এক শিষ্যবংশ কিছু জমিজমা দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামে বসত করিয়েছে, এখন সেখানেই আছে তারা, কোনমতে দিন চলে যাচ্ছে। একটি

ছেলে, লেখাপড়া তেমন না শিখলেও কোনমতে রেলে একটা চাকরি যোগাড় করেছে—বিহারের দিকে কোথায় সাহেবগঞ্জ, না কোথায় থাকে, তার বিয়ে-থাও হয়ে গেছে। সে সেইখানেই থাকে। আর এক ছেলে কলকাতায় কি সামান্য কাজ করে। ছোট ছেলেটিই চাষবাস দেখে, লেখাপড়ার চেষ্টাও করে তারই ফাঁকে ফাঁকে ; এছাড়া একটি অবিবাহিতা বোন আছে।

সসঙ্কোচেই দেয় খবরটা, খবর দিয়েও শিবু বলে, 'একটা কথা বলব দিদি ? ওদের দিন চলে যাচ্ছে, এতকাল যেভাবে কেটেছে, সেইভাবেই কেটে যাবে। তুই আর ওদের সাহায্য করার চেষ্টা করিস নি। ও ছেলেটাও হয়ত তাহলে অমানুষ হয়ে যাবে। খেটে খেতেই শিখুক, সে-ই ঢের সম্মানের। ঢের সুখের।'

এ কথার কোন উত্তর দেয় নি হেমন্ত, কোন প্রতিবাদও জানাতে পারে নি।

হেমন্তর খুব ইচ্ছে ছিল ওদের সকলকে রেঁধে খাওয়ায়। কিন্তু গুরুদাসবাবু তো প্রসাদ ছাড়া কিছু খাবেনই না, নিভার শাশুড়িকেও বলতে ভরসা হল না। জেনে-শুনে ওর এই হাতের জল খাওয়াবে না সে। আজ ওঁরা সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন না ওর, একদিন হয়ত জানতে পারবেন—সেদিন ক্ষুণ্ণ হবেন, নিভাকেও দু-দশ কথা শোনাবেন। একদিন একবেলা খাওয়াতে গিয়ে নিভার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য লাঞ্ছনার কারণ হতে পারবে না সে!

তাই শুধু নিভা আর ছেলে-মেয়েদেরই খেতে বলল, সেই সঙ্গে শিবুকেও। শিবু অবশ্য কিছুই খায় না প্রায়—খাওয়ার উপায়ও নেই—পায়েসটাই যা একটু তৃপ্ত ক'রে খেল। শিবুকে দু-একটা দিন রাখতে চেয়েছিল নিজের কাছে, শিবু রাজী হল না।

বলল, 'ওদের বাড়ি ওদের আশ্রয় সয়ে গেছে। ঐখানেই বেশ থাকি, শান্তি পাই।...এখন থাক, যদি সত্যি-সত্যিই কোনদিন ঐ আবাগীর ইচ্ছেটা ফলে—একটু অন্তত উঠে-হেঁটে বেড়াবার মতো জোর পাই—সেদিন কলকাতায় এসে তোর বাড়িই উঠব, কিছুদিন থাকব বরং। এখন না। ছেলেমেয়ে দু'টোও ভারী বন্ধন হয়েছে আমার—ওদের ফেলে থাকতেও পারি না কোথাও গিয়ে। ওরাও—আমার—যতই ন্যাওটা হোক, মাকে ফেলে থাকতে পারবে না।'

আর জোর করে নি হেমন্ত। ক'দিনই বা আছে আর! যেখানে থেকে শান্তি পায় সেখানেই থাক।

মুশকিল হল নিভাদের যাওয়ার সময় এগিয়ে আসতে!

ওরা হেমন্তদের অনেক আগে এসেছিল—ওদের ফেরার সময়টাও এদের আগেই পড়া উচিত। মাস হিসেবে বাড়িভাড়া নেওয়া—দু-তিনটে দিনও বেশি থাকার জো নেই, পুরো একমাসের ভাড়া দিতে হবে তাহলে আবার। কে জানে, হয়ত আগে থেকে অন্য ভাড়াটেও ঠিক হয়ে আছে পরের মাসের—সেক্ষেত্রে তো টাকা দিলেও থাকা চলবে না।

নিভারা চলে যাওয়ার পর আর এক মিনিটও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

মেয়েটা ওকেই শুধু মায়ায় জড়িয়ে ফেলে নি—নিজেও জড়িয়েছে। কেন তা হেমন্তও জানে না, এই তো প্রথম দেখাশুনো, ক'দিনের মাত্র পরিচয়। এমন কিছুই করতে পারে নি আদর-যত্ন—স্নেহের কোন পরিচয় দেবার সুযোগ পায় নি। উপকারে তো লাগার কথাই ওঠে না। বোধহয় নিভার সম্বন্ধে শিবুর হিসেবটাই ঠিক, দুনিয়ায় যত অভাগার ওপরই মেয়েটার অহেতুক স্নেহ। হেমন্তর দুর্ভাগ্যের বিবরণই নিভার অন্তরে মমতার আসন দখলে প্রবেশপত্রের কাজ করেছে। মায়াটাই বেশী ওর। নিমাইয়ের নিজস্ব ভাষায়—'আমার এই নতুন বোনটা খুব মায়াবী—কী বল গা জ্যাঠাই ?'

বিদায়ের সময় প্রণাম করতে গিয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিল নিভা। হেমন্ত ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, অনেক বলে, অনেক আদর ক'রেও থামাতে পারে নি। কে জানে কেন, বেয়ানের চোখ দু'টোও ছলছল ক'রে এসেছিল। ভালবাসা সে পেয়েছে বৈকি—এর আগে, কমলাক্ষর কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রেমই পেয়েছে সে—কিন্তু এমন অহেতুক স্নেহ জীবনে এই বোধ করি প্রথম পেল। আত্মীয়ের স্নেহ, আত্মীয়তার প্রীতি, বন্ধন। তার কাছে প্রত্যাশী অনেকে, দেয় না কেউই। এই প্রথম একজন দিল—কিছু পাওয়ার আশা না রেখেই।

তার ফলে, নিভারা চলে গেলে, ওর মনে হল—এই শহর কেন, ওর জীবনটাই যেন নতুন ক'রে অন্ধকার হয়ে গেল ; এবার এখানের বাস যথার্থ প্রবাস হয়ে উঠল—আর জগন্নাথের কাছে, মনে মনে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি জেনে-বুঝে মাপ করুন। আর, ওর এই মনোভাবের জন্যেও কি তিনিই দায়ী নন ?

আরও সেই জন্যেই জোর ক'রে রইল পাঁচ-সাতটা দিন।

দু'দিনের মায়া—সে মায়ায় জড়িয়ে পড়ে নিজেকে এমন দুর্বল ক'রে লাভ নেই। জোর ক'রে কাটিয়ে ফেলাই ভাল। সত্যিই সেখানে গিয়ে কিছু থাকতে পারবে না। আট-দশ দিনের পরিচয়ের জোরে আত্মীয়তার দাবীতে কুটুমবাড়ি গিয়ে ওঠা যায় না। উঠলেও দু-চার দিনের বেশি থাকা সম্ভব নয়। ওসব চিন্তা ত্যাগ করাই দরকার। তার যে জীবন, যে জীবনের পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে—সেই জীবনই তাকে বহন করতে হবে পরমায়ুর শেষ দিন পর্যন্ত—বজ্রদগ্ধ, মরুভূমিতুল্য—মিছিমিছি স্নেহ মায়া প্রীতি—এসব সুখের স্বপ্ন দেখে লাভ নেই।...অকারণে যন্ত্রণা ভোগ। এ লোভ, এ দুরাশা দূর করাই মঙ্গল।...

নিমাইয়েরও এ ক'দিনে খুব মায়া বসে গিয়েছিল। সেও এত আদর-যত্ন, এমন খাওয়া-দাওয়া বহুকাল পায় নি। তবু নিভাদের অভাবে তার যে পুরী থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা হয় নি, তার কারণ নিজের স্বাস্থ্য। তার ধারণা এখানে বেশীদিন থাকলে শরীর বেশী ভাল হবে। তাই সে আর ক'টা দিন থেকে যাবার জন্যেই বরং পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

এর মধ্যে বাড়িওলার এজেন্টের সঙ্গে কথাও কয়ে এসেছে। তিনি আরও পনেরো দিনের ভাড়া নিয়ে আট-দশ দিন থাকতে দিতে রাজী হয়েছেন। কারণ, এর মধ্যে আর

কোন ভাড়াটে আসার সম্ভাবনা নেই। যা আসবে সেই রথের সময় একেবারে। তখন এই উদারতার দাম পুষিয়ে নিতে পারবেন তিনি।...

আর যা অন্য বাধা—বাড়তি ছুটি, তার জন্যেও কোন দুশ্চিন্তা নেই নিমাইয়ের। মাত্র দু'টি টাকা খরচ ক'রে—ওর ভাষায় একটা 'মিটিকেল' ছাড়লেই পাওয়া যাবে—তারা বাপ-বাপ বলে ছুটি দিতে পথ পাবে না। কথাটা হেমন্তকে জানিয়েও দিয়েছে সে। জ্যাঠাইয়ের 'শরীলটা' ভেতরে ভেতরে গুমরে দুর্বল হয়ে গেছে—সুতরাং ক'টা দিন এখন থাকা দরকার—বার বার এই কথাটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিল জ্যাঠাইকে।

হেমন্তও হয়ত রাজী হত শেষ পর্যন্ত, তার কাছে পুরীও যা, কলকাতাও তাই—সেখানে গিয়েই যে ভাল লাগবে তার কোন মানে নেই। স্মৃতিটা অত পীড়া দেবে না এই পর্যন্ত। এখানে যেমন স্বর্গদ্বারের রাস্তা দিয়ে আসতে গেলে বাড়িটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আসতে হয়, অনেক সময় হরিদাস মঠের পথে ঘুরে গৌরবাটশাহী দিয়েও যায়, একআনা বেশী ভাড়া কবুল ক'রেও—সেইটে থাকবে না। তবে—এ মায়া যখন ভুলতেই হবে, এইখান থেকেই ভোলা ভাল, এমন ক'রে পালিয়ে যাওয়ারও কোন অর্থ হয় না।

দোনামনা ক'রে নিমাইয়ের প্রস্তাবের দিকেই ঝুঁকেছে একটু—ওর জন্যে নিমাইয়ের যে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই তা বুঝতে বাকী ছিল না অবশ্যই, এমনিই নিজেকে শক্ত করার জন্যেই রাজী হচ্ছিল—অকস্মাৎ জগন্নাথই বুঝি বাদ সাধলেন। জ্যাঠাইকে সুমতি দেওয়ার জন্যে নিমাইয়ের মণিকোঠায় বার বার মাথা ঠোকাতেও কোন উপকার হল না। কলকাতা থেকে ঠিকানা বদল হয়ে একখানা চিঠি এসেই সব গোলমাল ক'রে দিল।

চিঠিটা এসেছে গোরাদের ইস্কুল থেকে। গতবছর থার্ড ক্লাসে (ওদের ওখানে কি ক্লাস এইট না কি বলে) ফেল করেছিল গোরা। তখনই রেক্টর চিঠি লিখে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—পড়াশুনোয় ছেলেটির একেবারেই মন নেই, হেমন্তর অনুরোধে ওঁরা যে কোচিং-এর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন সেখানের রিপোর্টও খুব খারাপ—বিষম অমনোযোগী ও ফাঁকিবাজ—এই কথাই প্রতি সপ্তাহে জানাচ্ছেন তাঁরা—যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তো তাঁরা আর রাখতে পারবেন না। এর পরের পরীক্ষা পর্যন্ত দেখতে পারেন—তবে সেই-ই শেষ সুযোগ, তখনও যদি এই রকমই ফল দেখা যায় তো তাঁরা সেসন-এর মধ্যেই ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন। সুতরাং অভিভাবিকার ইচ্ছা থাকলে এখনই ছাত্রকে নিয়ে যেতে পারেন।

সেই সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন যে, ওঁরা নানা রকমে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, ছাত্রটির মাথা একেবারে নিরেট নয়—অমনোযোগ ও পাঠে বীতস্পৃহাই এই রকম ফল হওয়ার প্রধান কারণ।

হেমন্ত সে চিঠির কোন জবাব দেয় নি। নিয়ে এসে কি করবে? কোথায় দেবে? গোরাকেই একটা কড়া চিঠি দিয়েছিল যে, এখনও যদি তার চৈতন্য না হয়, পড়ায় মন না দেয় তো অতঃপর পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে, অথবা বিড়ি পাকাতে কি কোচোয়ানী করতে হবে—হেমন্তর কাছে আর স্থান হবে না।

যার মন একেবারেই লেখাপড়ার দিকে পিছন ফিরেছে, সম্পূর্ণ বিরূপ—সে এই

হুঁশিয়ারীতে হঠাৎ মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করবে তা সম্ভব নয়। হেমন্তও তা আশা করে নি। তবু সত্যি-সত্যিই যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বছরের মাঝখানে ছাড়িয়ে দেবেন তা ভাবে নি। হয়ত এও মনে ক'রে ছিল যে—একেবারে যখন গবেট নয়, তখন সামান্য কিছুও উন্নতি করতে পারে—দশ নম্বর বেশী পেলেও আইনে বাঁচে। তাও হয় নি। রেক্টর জানিয়েছেন যে, বর্তমান 'পিরিয়ডিক্যাল' পরীক্ষায় গোরা আরও কম নম্বর পেয়েছে। তিনটি বিষয়ে তো একেবারেই শূন্য, তার মধ্যে দু'টি বিষয়ে স্রেফ সাদা খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই। তা ছাড়াও ওর স্বভাবে এবং চরিত্রেও নানা রকম দোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আর কোনমতেই তাঁরা ওকে স্কুলে রাখতে রাজী নন, অভিভাবক-পক্ষ যেন সাত দিনের মধ্যে এসে ছেলেকে নিয়ে যান। এর বেশী সময় তাঁরা দিতে পারবেন না কোনমতেই।

অতঃপর পুরীতে আরও ক'টা দিন থেকে যাওয়ার কথা বলতে নিমাইয়েরও সাহসে কুলোল না।

॥ ১৭ ॥

মুখে যতই যা বলুক বা চিঠিতে ভয় দেখাক যে—ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে এ বাড়িতে আর স্থান হবে না, বিড়ি পাকিয়ে অথবা কোচোয়ানী ক'রে খেতে হবে, কার্যত সে ব্যবস্থা করা গেল না, বাড়িতেই এনে তুলতে হল। তবে নিজে আর গেল না, সেখানে গিয়ে স্কুল-কর্তৃপক্ষকে মুখ দেখাতে লজ্জা করল। ভাড়াটে ভদ্রলোকের দু-তিনদিন ছুটি ছিল, তাঁকেই গাড়িভাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিল—সেই সঙ্গে কিছু বেশী টাকাও দিয়ে দিল—হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে আসতে।

গোরকে কিন্তু বিশেষ লজ্জিত কি অনুতপ্ত বোধ হল না। দুঃখিত তো নয়ই। কে জানে, লজ্জা ঢাকতেই হয়ত, বাড়ি ঢুকল সে আস্তে শিস দিতে দিতে; সে যে বেপরোয়া এটা বুঝিয়ে দিতেই।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর চেহারারও। বয়সটা—মনে মনে হিসেব ক'রে দেখল হেমন্ত—আঠারো বছর পার হতে চলেছে। গোঁফের রেখা ঘন হয়ে উঠেছে। দাড়ির লক্ষণও সুস্পষ্ট। গায়ের রঙ বা চেহারার আদলটা বংশের ধারায় গেলেও পিলে-রোগা ভাবটা নেই। বোধ হয় স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্যেই বেশ জোয়ান হয়েই উঠেছে।

এতদিন ধরে প্রায়ই দেখছে বলে বোধ হয়—কখন যে বালক গোর তরুণবয়সীতে পরিণত হয়েছে তা লক্ষ্য করে নি হেমন্ত। এই তো মাসকতক আগেও দেখেছে। এবার হঠাৎই যেন পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। বুঝল, এই বয়সে থার্ড ক্লাসে অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা বোধ হচ্ছে বলেই পড়াটা আরও অরুচিকর হয়ে উঠেছে। একেই বেশী বয়সে পড়াশুনো শুরু করেছে—তার ওপর সঙ্গী অন্য ছেলেরা ওপরের ক্লাসে উঠে গেছে, সে আরও লজ্জার কারণ। লজ্জা থেকেই বিতৃষ্ণার উৎপত্তি।...হয়ত ভুলই করেছে সে জোর ক'রে ওখানে ফেলে রেখে—প্রথম ফেল

করার পরই এখানে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

নিমাই সৎ-পরামর্শই দিতে গেল, 'আর ও চেষ্টায় দরকার নেই জননী, এ আমড়াগাছে ন্যাংড়া কেন—টোকো আমও ফলবে না। বংশের যা বিদ্যের দৌড়, তার বেশীই গেছে তবু। ঐখানেই ইতি করো। তোমার এত জানাশুনো, কাউকে ধরে চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও। পড়ালেখা আর ওর দ্বারা হবে না। দেখছ না—জোয়ান হয়ে উঠেছে, চনমন করছে—। বে' দিলে এখনই ছেলেপুলে হতে শুরু করবে। ঐ দিকেই এখন ঝোঁক যাবে ওর। আর এ তো হতেই হবে, তোর পিছে কেন খাড়া—না বংশাবলীর ধারা! মিছিমিছি ওর পেছনে আর পয়সা ঢেলো না।··· যা হোক তো কিছু শিখেছে, আমাদের মতো মুখ্খু—ক-অক্ষর-গো-মাংস তো নয়, নোহা-ঠেঙানো কাজ করতে হবে না, চেষ্টা করলে কলম-পেষার কাজই পেতে পারবে।'

কথাটা হেমন্তর পছন্দ হল না। আস্তে আস্তে আবারও একটা আশা হয়ত গড়ে উঠেছিল গোরকে কেন্দ্র ক'রে, সেটায় প্রবল আঘাত লেগেছে, তার গোড়াটা গেছে আলগা হয়ে—তাতে মনে মনে একটা বিপুল ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, সেইটেই একটা উপলক্ষ পেয়ে বেরিয়ে এল এবার, জ্বালাটা গিয়ে পড়ল নিমাইয়ের ওপর।

'অ! ল্যাজকাটা শেয়াল—ওরও ল্যাজটা কাটতে না পারলে চলছে না বুঝি! এখনই ওর লেখাপড়া ঘুচিয়ে কোথাও একটা নিজের মতো কুলী-মিস্তিরীর কাজে ঢুকিয়ে না দিলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না—না! কেন, ও কি খেতে পাচ্ছে না—না আমারই ভাত জুটছে না?···না কি ওর পেছনে পয়সা না ঢাললে সে পয়সা তোমার ভোগে লাগবে তাই এঁটে আছ!'

'ঐ লাও!' হতাশার ভঙ্গী করে নিমাই, 'বলে যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! তবে আর কলিকাল বলেছে কেন! যার ভাল করতে যাবে সে-ই উলটো বুঝবে!···পড়াও বাবা, পড়াও! যত পারো তেল ঢালো। পয়সা কুটকুট করছে বৈ তো নয়। খানিকটা বাজে-খরচ না হলে কুটকুটুনি সারবে কেন? তবে এখানে এনে শহরে রাখছ, কলকাতার ইস্কুলে দিচ্ছ—তাহলে কিছু কিছু ওর হাতেও দিও, হাতখরচা। নাতি তো বিড়ি-বার্ডসাইতে পক্ক হয়ে উঠেছে—ইরি মধ্যে ঠোঁটে দাঁতে কালো ছাপ—সেটা এটু তাকিয়ে দেখে ব্যবস্থা ক'রো। নইলে যা শিখেছে তা তো শিখেছেই, পয়সা না পেলে বাক্স ভাঙতেও শিখবে!'—

মারের বদলে এই চরম মার দিয়ে নিমাই দ্রুত সেখান থেকে সরে যায়, জ্যেঠাইয়ের ছড়াকাটানো গালাগাল—চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করা—শোনার জন্যে বসে থাকে না।

কালো দাগ যে চোখে না পড়েছে তা নয়। তবে ওটা বয়সের ধর্ম ভেবেই গায়ে মাখে নি হেমন্ত। সব দিকে বাঁধতে গেলে চলবে না, দড়ি ছিঁড়তে চাইবে। আর সবাই যে তারক হবে তার কোন মানে নেই। নিমাইয়ের এই চোখে-আঙুল-দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াতেই সে বরং বিরক্ত হল। বড্ড গায়ের জ্বালা আসলে ওর। এই ছেলেটাকে তাড়াতে পারলেই ষোলকলা আশা পূর্ণ হয়, সবটা ওর ভোগে লাগে—এই ভাবছে বসে বসে।···'দাঁড়াও, ভোগ করাচ্ছি। আর কিছু না হোক, গোরার ভাল দেখে একটা বিয়ে দিয়ে—ভাল ঘরের বৌ এনে পণটা তো পালটাতে পারব। ও

মানুষ না হোক, ওর ছেলে মানুষ হবে। তাদেরই দোষ। তাও না হয়—কুকুর-বেড়ালকে খাইয়ে যাব, তবু ও হিংসুটে কুচক্রুরেকে দোব না!'

ছেলেমানুষের মতোই মনে মনে গজরায় সে। আশাভঙ্গের আঘাতে বুদ্ধি-সুদ্ধি সব যেন কোথায় তলিয়ে গিয়ে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের পর্যায়েই পেঁাছে যায় এক নিমেষে।

কলকাতাতেও কোন কোন স্কুলের বোর্ডিং আছে, ওর ভাড়াটে দেবেনবাবু তার একটা তালিকাও সংগ্রহ ক'রে দেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বোর্ডিং-এ দেয় না হেমন্ত, বাড়িতেই রেখে পড়ার ব্যবস্থা করে। ওখানের ফলাফল দেখে কোন ভাল স্কুল ছেলেকে নিতে চায় না, বিশেষ বছরের অর্ধেক কেটে গেছে—অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্কুলেই দিতে হয়। তাও অনেক বলা-কওয়া ধরাধরির পর রাজী হন তাঁরা। হেড-মাস্টার মশাইয়ের পরামর্শক্রমে দু'টি প্রাইভেট টিউটর ঠিক করল—নইলে, তিনি বললেন, ভর্তি করাই সার হবে, আর মাইনের টাকা গোনা।

বললেন, 'যা ওর পড়াশুনোর অবস্থা হয়ে আছে দেখছি, এই চার-পাঁচ মাস পরে এগজামিন দিয়ে পাস করতে পারবে না। আবারও একটা বছর নষ্ট হবে। যদি পড়াতেই হয়—সেই মতো ব্যবস্থা করুন। তারপর কি জানেন—ছেলে বড় হয়ে গেছে, বেশী বাজে সময় হাতে না রাখাই ভাল, নইলে বদ ছেলেদের বাজে আড্ডায় গিয়ে পড়বে।'

ঠিক হল একজন সকালে পড়াবেন, শুধু অঙ্ক—আর একজন সন্ধ্যায়, ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়। সকালের মাস্টারমশাইকে দশ টাকা দিতে হবে, সন্ধ্যায় যিনি পড়াবেন তাঁকে পনেরো। এতগুলো টাকা বাজে খরচ হচ্ছে দেখে নিমাইয়েব গা গসগস করে, আড়ালে-আবডালে তা নিয়ে টিটকিরিও দেয় সে, কিন্তু হেমন্ত এ খরচা গায়ে মাখে না। রাঁচীতেও যে কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল—তার জন্যে কুড়ি টাকা দিতে হত বাড়তি, এ যেমন পাঁচ টাকা বেশী যাচ্ছে, তেমনি অন্য অন্য খরচ ঢের কমে গেল। তাছাড়া ছেলে দু'বেলা আটকে থাকবে—সে-ই একটা বড় লাভ। তাও—হেডমাস্টার মশাই বলেছেন, 'যদি দেখেন এই এগজামিনেশ্যনে রেজাল্ট ভাল হয়—একজনকে ছাড়িয়ে দেবেন, ধরণীবাবুই সব সাবজেক্ট পড়াবেন তখন!'

অবশ্য সে আশা সুদূরপরাহত।

হেমন্তর এমনি লেখাপড়া কিছু নয়—তবে এতকাল বহু শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এসে এ বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান তার হয়েছে। লেখাপড়ার আসল চেহারাটা ধরতে কোন অসুবিধা হয় না। আর সেই জন্যেই তোড়জোর ক'রে লেখাপড়ার পর্ব শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে যে, ফল তেমন কিছুই হচ্ছে না, হবেও না কোনদিন। সে মনই আর ছেলেটার নেই। ওর তরফে এতদিন ছাত্রগিরিতে বিতৃষ্ণা ছিল—এবার হয়ত, সেটা বিলম্বিত করার জন্যে, একটা বিদ্বেষ দেখা দেবে এদের ওপরও।

আর, সেটা বোঝে বলেই মনে মনে একটা হিম-হতাশার ভাব অনুভব করে। হার মানার গ্লানি একটা। ভাগ্যের কাছে হার মানাটা এতদিনে অভ্যেস হয়ে গেছে,

নিমাইচরণের কাছে যে হার মানতে হচ্ছে—ওর ব্যঙ্গ টিটকিরি খেয়ে চুপ ক'রে যেতে হচ্ছে, সেইটেই আরও অসহ্য।

তবু হাল ছাড়ে না। দু'বেলা পড়ার সময় ঘরের বাইরে মাদুর পেতে বসে থাকে—যাতে মাস্টারমশাইদের না বেশী বিরক্ত করতে পারে, অথবা তিনিও ফাঁকি না দেন, কিংবা সকাল ক'রে না পালিয়ে যান। ঐ ইস্কুলেরই শিক্ষক ওঁরা—ওঁদের কাছে প্রত্যহ খবর নেয়, ছাত্র কেমন পড়াশুনো করছে, ক্লাসে ঠিকমতো থাকে কিনা—ইত্যাদি। হাতখরচা দেয় কিছু কিছু, তবে এমন দেয় না যাতে বেশী কোন বদ খেয়ালে খরচ করতে পারে। টিফিনের পয়সা বলেই দেয়, টিফিন ক'রে দিতে চেয়েছিল, ওর নাকি স্কুলের মধ্যে বসে বাড়ি-থেকে-নিয়ে-যাওয়া খাবার বার ক'রে খেতে লজ্জা হয়, ছেলেরা উত্ত্যক্তও করে, তাই গোরা রাজী হয় নি—তবে এমন হিসেব ক'রে দেয় যাতে খাবার খেয়েও দু-একটা পয়সা বাঁচে, এক-আধটা সিগারেট খাওয়ার মতো।

অবশ্য তাতে ওর কুলোয় না, পয়সার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে—এটাও লক্ষ্য করেছে। এক-আধবার যেচে বাজার ক'রে দিতে চেয়েছে, হেমন্ত রাজী হয় নি। সোজাই বলেছে, 'ঝি বাজার থেকে চুরি করে তাতে একটা, পয়সার লোকসান শুধু—তোমাকে দিলে ডবল ক্ষতি, পয়সাকে পয়সাও যাবে, হয়ত বেশিই যাবে, তোমাকেও একটা চোর বানানো হবে, বেশী ক'রে নেশাভাঙ করতে শিখবে, আলটপ্‌কা-পাওয়া বাড়তি পয়সার নেশা চাপবে তার ওপর। সে হবে না। যেমন আছ তেমনি থাকো।'

পরীক্ষার ফল অবশ্য একেবারে খুব খারাপ হল না। হেমন্ত যতটা ভেবেছিল ততটা নয় অন্তত। অঙ্ক আর ইতিহাসে মাত্র ফেল করেছে, ইংরেজীটায় টায়ে-টায়ে পাস (পরে জেনেছিল, প্রাইভেট মাস্টার-মশাই ধরণীবাবুই ঐটুকু ক'রে দিয়েছিলেন নিজের চাকরিটা রাখতে, নইলে নাকি দশ নম্বরও পাওয়ার কথা নয়)—তবে ওখানকার মতো শূন্য কোন বিষয়েই পায় নি। দু'টো বিষয়ে ফেল হওয়া সত্ত্বেও, সকল দিক বিবেচনা ক'রে হেডমাস্টার মশাই ক্লাসে উঠিয়ে দিলেন। এই ক'মাসেই যেটুকু উন্নতি করেছে সেইটেই যথেষ্ট, তাছাড়া আবারও এই থার্ড ক্লাসে ফেলে রাখলে একেবারেই মন ভেঙে যাবে, জীবনে আর লেখাপড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না—এই ভেবেই। সেটা হেমন্তর সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝিয়ে বলেও গেলেন। পাস করেছে ভেবে উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই, হাল ছেড়ে দিলেও চলবে না। এখনকার মতোই কড়া-হাতে রাশ ধরে রাখতে হবে।

তবু রাশ বোধ হয় একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল। হেমন্তর এই বয়সে সদা অতন্দ্র থাকা হয়ত সম্ভবও নয়—অথবা, শুধু লেখাপড়ার দিকটাতেই কড়া নজর রেখেছিল, ইস্কুলের দৈনন্দিন জীবনের দিকেই—অন্য দিকের কথা অত ভাবে নি। অত মনেও হয় নি। ঘরেই আছে, ওর চোখের সামনে—এই তো যথেষ্ট। নিজের সজাগ-সতর্কতা সম্বন্ধেও একটু গর্ব ছিল, এখানে ওর চোখ এড়িয়ে কিছু করতে পারবে না। আর, তাছাড়া, বদখেয়ালের কোন উপকরণ বা মানুষও তো বাড়িতে নেই।

ওদিকটা অত ভাবে নি বলেই সম্ভাবনার কথাটা মনে পড়ে নি।

নইলে—ওদের নতুন ঝি হরিমতী যে একটু বেশী আগ্রহের সঙ্গে গোরার ফাই-ফরমাশ

খাটে—এটা লক্ষ্য করতে পারত। গোরাও ইদানীং একটু বেশী খুনসুটি করে ওর সঙ্গে—অকারণে হুকুম করে, খাটায়, ক্ষেপায়। কথাবার্তায় একটা কৃত্রিম কলহের সুরও বাজে মাঝে-মাঝেই।

অর্থাৎ অনভিপ্রেত ঘনিষ্ঠতার আভাস—একটু নজর করলেই দেখতে পেত হেমন্ত। পাওয়া উচিত ছিল। বাইরের দিকে চোখ খোলা ছিল বলে ঘরের দিকে চাওয়া হয়ে ওঠে নি।

হরিমতী সবে বছরখানেক বহাল হয়েছে এ বাড়িতে। সে গোরাকে এর আগে ভাল ক'রে দেখে নি। বড়দিনের ছুটিতে গোরা বাড়ি আসে নি—তার আগে পূজোর ছুটি শেষ হবার মুখে হরিমতী এসেছে। এবারই প্রথম দেখল বলা চলে। মনিবের আদরের নাতি, তাকে যত্ন করাই উচিত। যত্নটা একটু বেশী ক'রেই করবে—মনিবকে দেখিয়ে—সেটাও স্বাভাবিক। হেমন্তও তাই ভেবেছিল।

অস্বাভাবিকও মনে হয় নি—অশোভনও না। হরিমতীর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়। গোরার আঠারো। দেখতেও এমন কিছু ভালো নয় হরিমতী। রঙটা অবশ্য ফর্সা-ঘেঁষাই, যাকে মাজা রঙ বলে তার চেয়েও দু'পোঁচ উজ্জ্বল, গড়নটাও পুরুন্ত—কিন্তু মুখখানা লেপা-মোছা মতো, দেখলে বিরূপতা জাগে না হয়ত, তবে আকর্ষণও বোধ করার কথা নয়।

ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছিল একজন—এবং ক'রে খুশীই হয়েছিল।

নিমাইচরণের লক্ষ্য করার কারণও ছিল, সে কারণ ঈর্ষার জ্বালা। দু'দিকেই। হরিমতীর এই সেবা ও মনোযোগ সে-ই পাবে এমনি একটা ইচ্ছা ও আশা হয়ত তারও ছিল। পেলে মন্দ লাগত না, এই কথাই ভেবেছে। যে পেল, পাচ্ছে—তার সম্বন্ধে তো আরও জ্বালা, কাকার সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার ক'রে তার মাথার ওপর ভাইপোকে তুলে ধরা, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে—সে-ই এ বাড়ির, এ বিপুল সম্পত্তির ভাবী মালিক; কাকা আশ্রিত চাকর-বাকর শ্রেণীর একজন বৈ বেশী কিছু নয়—এতটা নির্বিকারে সহ্য করা কঠিন।

তবু, এতটা বিষ জমে থাকা সত্ত্বেও, অথবা সেই জন্যেই—নিমাইচরণ এর বিন্দু-বাষ্প আভাস দেয় নি কাউকে। হেমন্তকে সতর্ক ক'রে দেওয়ার কোন কথাই থাকে না। গোরা সম্বন্ধে নিমাইচরণের কোন সৎ-পরামর্শই সে নেয় নি, উলটে কটূক্তি করেছে, মর্মান্তিক রূঢ় কথা শুনিয়েছে। সেক্ষেত্রে তার কাছে এ তথ্য জানানোর দায়িত্ব আর যারই হোক, ওর নয়। তা ভিন্ন, জানাতে গেলেও গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়ার অবস্থা হবে হয়ত।

কেউ আভাস পায় নি, পাত্র-পাত্রী দু'জনেও তাই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোঝে নি।

নিমাইকে এ পরিবারের একজনের মধ্যে, এমন কি মানুষের মধ্যে গণ্য করার কথা কখনও ভাবতে শেখানো হয় নি গোরাকে—তাকে হিসেবের বাইরে ধরাটা তাই অভ্যাস, ক্রমে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওর। তার কাছে নিজের আচরণ আবরিত রাখার কি সতর্ক হওয়ার কোন কারণ আছে, তা-ই গোরার মাথাতে যায় নি। সে যে দেখতে পায়,

লক্ষ্য করে—এবং একদিন সে লক্ষ্য করার ফলাফল অন্যত্র পৌঁছে দিয়ে বিপদের কারণ ঘটাতে পারে—তা কোনদিন মনে হয় নি। সে সতর্ক হয় নি বলেই হরিমতীও হতে পারে নি। প্রথম প্রথম কাকাবাবুর সামনে একটু হুঁশিয়ার হয়ে থাকার চেষ্টা করত—গোরাই সব আশংকা উড়িয়ে দিল। ওর তাচ্ছিল্য ও অবহেলা দেখে হরিমতীরও একটু একটু ক'রে ধারণা হল যে, নিমাইচরণ এ বাড়ির আসবাবগুলোর মতোই প্রাণহীন—দৃষ্টিহীন।

নিমাইচরণও সেই ভাবটাই বজায় রেখেছিল। বোধোদয়ের সেই পুত্তলিকার মতোই—'কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, চক্ষু আছে দেখিতে পায় না।' মাস্টারমশাই চলে গেলে, হেমন্ত পুজোর ঘরে ঢুকেছে, কিংবা পুজো সেরে বেরিয়ে এসে হিসেবের কাগজপত্র নিয়ে বসেছে টের পেলে—নিমাই বাড়ি ফিরলে পাহারা শিথিল ক'রে নিজের কাজে উঠে যায় আজকাল—গোর পা ছড়িয়ে পড়ার-মাদুরে শুয়ে পড়ে বলে, 'এই মতি, পা টিপে দিয়ে যা।'

(হরি উচ্চারণ করতে নেই বলে হেমন্ত শুধু মতী বা মতি বলে—সেই থেকেই সংক্ষিপ্ত নামটা প্রচলিত হয়েছে এ বাড়িতে।)

ফরমাশ করা মাত্র হরিমতী এসে পা টিপতে বসে। পা-হাত-কোমর—উরুও। অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে নিমাই দেখে হরিমতীর সাগ্রহ সেবা। মনের দাহ প্রাণপণ চেষ্টায় সংযত রাখে সে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সোপানের পরবর্তী ধাপে পৌঁছনোর।

তার বিলম্বও হয় না অবশ্য। আড়ালে-আবডালে, সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে—একটির পর একটি ধাপ পার হতে থাকে ওরা—অতি সত্বর, আশাতিরিক্ত দ্রুতবেগে।

এর পর রাতও জাগতে হয় বৈকি! অনুমানের ওপরই সে কষ্ট করা। তবে অনুমান মিথ্যাও হয় না। দু-তিন দিন জেগে বসে থাকার পরই সে কষ্টের 'কেষ্ট' মেলে। গোরা নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে সিঁড়ির কোণে—হরিমতীর শয্যার দিকে চলে যায়—দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে ঘুমোয় নিমাইচরণ, ক'দিন পরে।

পরের দিন ইচ্ছে ক'রেই আপিস কামাই করে সে। শরীর খারাপের অজুহাতে বিছানায় পড়ে থাকে। বিশ্রামের একটু প্রয়োজনও ছিল, ক'দিনের অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার পর। তবে তাই বলে বেলা চারটে পর্যন্ত ঘুমোয় না। হেমন্ত আড়াইটে নাগাদ উঠে চিঠিপত্র লিখতে বসে—চিঠির কাজ তেমন না থাকলে খবরের কাগজ পড়ে—কাজের কথা পাড়ার সেই উৎকৃষ্ট অবসর।

হেমন্তর চা খাওয়ার সময় সেটা নয়। গোর স্কুল থেকে ফিরলে চা-খাবার তৈরি হয়। সেই সময়ই খায় সে। নিমাইয়ের আপিস যাওয়ার দৌলতে দুপুরবেলা চা খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে, সে উঠে কেরোসিনের স্টোভ জেলে নিজেই কলাইয়ের একটা মগ-ভর্তি চা তৈরি ক'রে এনে জ্যাঠাইয়ের সামনে জেঁকে বসল।

এ বসার ধরন হেমন্ত চেনে। কোন কাজের কথা আছে নিশ্চয়, মানে নিমাইয়ের নিজের তরফে কোন কাজের কথা, হয়ত কোন প্রার্থনা আছে, সেই জন্যে আজ আপিস যায় নি—এতক্ষণে বুঝতে পারে। সেও বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে সময় নষ্ট করে না, মিনিট পাঁচেক পরে হাতের চিঠিটা লেখা শেষ ক'রে সোজাসুজিই বলে, 'তা কী বলবে বলে

ফ্যালো। আমার বিস্তর কাজ হাতে।'

'বলবার আর কি আছে বলো? বললেই বা শুনছে কে? বলে—অন্ধ জাগো, না আমার কিবে রাত্তর কিবে দিন। চোখ বুজে যে থাকবে বলে ঠাউরেছে—তাকে কি কিছু দেখানো যায়?'

বলার রকমটা ভাল লাগে না। অন্যদিন হলে হেমন্ত ধমক দিত। কিন্তু নিমাইয়ের গলার জোরটা কানে বেজেছে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় গলার এতটা জোর দেওয়া স্বাভাবিক নয়। অনেকখানি বুকের বল নিয়েই এসেছে নিশ্চয়ই।

সে মিনিটখানেক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। তারপর মৃদু বিরক্তির সুরে বলে, 'তোমার ও হেঁয়ালির মানে ভাবার আমার এখন সময় হবে না বাবা, যদি কাজের কথা কিছু থাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলো।'

'পষ্টাপষ্টি বললে কি শুনবে তুমি—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে? অনেক আগেই বলতে পারতুম। বলা হয়ত উচিতও ছেল—কিন্তু সাহসে কুলোয় না যে!··· পেয়ারের পুষ্যি এঁড়ের সম্বন্ধে যত হিতকথাই বলি না—তোমার কানে বিপরীত শোনাবে, নাম উচ্চারণ করলেই হয়ত দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচতে থাকবে ধেই ধেই ক'রে। তোমায় চিনি তো!

অর্থাৎ সেই পুরনো ঈর্ষার জ্বালা।

বিরক্তি আরও বেড়ে যায়, কঠিন হয়ে ওঠে হেমন্তর কণ্ঠ।

'তার মানে? তোমার ভাইপো আবার নতুন কি করলে! তার নামে চুকলি খাবার জন্যেই আপিস কামাই ক'রে ঘরে বসে আছ বুঝি! তার আড়াল না হলে সুবিধা হচ্ছে না বলে? যদি কোন দোষ ক'রে থাকে তার মুখের সামনে বলতে পারো না?'

'সব দোষ কি সকলের মুখের সামনে বলা যায় মা-ঠাকরুন! সব দোষের কথা বলারও নয়—দেখাতে হয়। বলি অত গরম হয়ো না। কথা আমি একটিও বলব না, বলতে চাইও না। বললে ঢের দিন আগে বলতে পারতুম। তুমি কানা বলে তো আর আমি কানা নই! তোমাকে চিনি বলেই সে আহাম্মুকী করি নি। তবে এবার আর কিছু না করলেই নয়, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—এর পর আমাকেই হয়ত নাতির দোলনা কিনতে বাজারে ছুটতে হবে, কিংবা দুধের জন্যে গাই খুঁজতে—সেই জন্যেই মুখ খোলা। তবে আজও বলব না কিছু, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব। আর আমাকেই বা দেখাতে হবে কেন? আজ রাতটা একটু চোখ-কান খুলে মটকা মেরে পড়ে থেকো—যা দেখার নিজেই দেখতে পাবে। তোমরা তো বোষ্টম, কীর্তনে যা কিছু ভগবান করেন তা গৌরচন্দ্র করছেন বলে গান শুরু করে না? তা তোমারও ধরগে রাসলীলার গৌরচন্দ্রিকা দেখে চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে···হরি বলো হরি বলো!'

আর সেখানে বসে না নিমাই, বসতে সাহস হয় না।···

সাহস হয় না দু' কারণে। জ্যেঠাইয়ের মেজাজ সে চেনে, হয়ত এখনই বোমার মতো ফেটে উঠে তার মরা-বাপের মুখে ময়লা দেবে, চাইকি দুটো লাথি কষিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

আরও একটা কারণ—হরিমতী তার কোন্ দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিছল, এখনই ফিরে এসেছে। নিচে দোর খোলার আওয়াজ পেয়েছে। ঘর থেকে চলে এসেও ঠাকুর-

ঠাকুর করতে লাগল, যা চণ্ডাল রাগ বুড়ীর—ওর সামনেই না গাল-মন্দ দিয়ে সব ফাঁস ক'রে দেয়।

কিন্তু হেমন্তর তখন রাগারাগি বা চেঁচামেচির অবকাশ নয়। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল ঐ ক'টা কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। সবটা বুঝতে পারে নি তখন—তবু মূল ইঙ্গিতটাই যথেষ্ট।

এমন কোন আশা রাখে নি গৌরের ওপর—এতদিন নিজেকে বুঝিয়েছে—শুষ্ক কর্তব্য মাত্র ক'রে যাচ্ছে, এই কথাই ভেবেছে বা ভাবার চেষ্টা করেছে। আজ বুঝল—এতখানি হতাশার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আশা না থাকলে আশাভঙ্গের এতটা আঘাত লাগা সম্ভব নয়। আসলে নিজেকেই নিজে মিথ্যে বুঝিয়েছে এতকাল।

কিন্তু পাথর হয়ে থাকলে চলবে না। হরিমতী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। সাধারণত এ সময় এ ঘরে আসে না। তবে একেবারে আসা অসম্ভবও নয়, কোন কাজ থাকলেই আসবে। 'রাসলীলা' কথাটা বৃথা উচ্চারণ করে নি নিমাই, রাসলীলা কিছু একাও হয় না। সঙ্গিনী একটা থাকা দরকার। হেমন্ত ছাড়া স্ত্রীলোক বলতে তো ঐ এক হরিমতী বাড়িতে। ভাড়াটেদের ঘরেও তেমন কমবয়িসী ঝি-বৌ নেই, তাছাড়া তাদের সঙ্গে তেমন লেপ্‌চোও নেই। সুতরাং—কথাটা যতই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মনে হোক—হরিমতীকে একেবারে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।...

মনোভাব দমনের শিক্ষা বহুকালের, বহু আঘাতে পোড়-খাওয়া—আজও সেই শিক্ষাই কাজে লাগল। খানিকটা পরে হরিমতী যখন এ ঘরে এল তখন হেমন্তর কথায়, গলার আওয়াজে বা মুখভাবে কোন বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পেল না। গৌরের ইস্কুলের কথা, পড়ার কথা জিজ্ঞেস করল। ওর এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে নিমাই পর্যন্ত আড়ালে হাত তুলে নমস্কার করল। হাজার চেষ্টা করলেও তার দ্বারা—তাদের দ্বারা মনকে এতটা শাসন করা সম্ভব হবে না।

রাত্রে যখন ধরণীবাবু পড়িয়ে চলে গেলেন, তখন অন্য দিনের মতোই হেমন্ত কাগজপত্র নিয়ে বসেছে। উঁকি মেরে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই পা টিপতে গেল হরিমতী। কিন্তু চোখ মেলে রাখা সম্ভব না হোক—কানটা এদিকে খাড়া ছিল, এই পদসেবার পর্বটা জানতে অসুবিধে হল না। ও এই প্রথম জানল ব্যাপারটা—হয়ত প্রতিদিনই এই কাণ্ড হয়। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছে করল ওর। ...নির্বুদ্ধিতা নিমাইকে অকারণে—বিচার না ক'রে—রূঢ় কথা বলা, তাকে বিদ্বিষ্ট ক'রে রাখা, নইলে অনেক আগেই সে সতর্ক ক'রে দিতে পারত। আসলে সে গৌরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এটা ধরে না নিয়ে তার পরামর্শই শোনা উচিত ছিল—পড়ানোর চেষ্টা আর না ক'রে চাকরীর ব্যবস্থা করা। দেহ ও মনে যে সম্পূর্ণ সাবালক হয়ে গেছে—তাকে অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পড়তে দেওয়াটাই বিরাট ভুল হয়ে গেছে।

ভুল হয়েছে অনেক, অনেক দিক দিয়ে। স্কুলের দিকেই সমস্ত নজরটা রাখতে গিয়েছিল। দিনকাল খারাপ—স্কুলের ছেলেরাও আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে উঠেছে—ইংরেজের কোপে পড়ে মার খাচ্ছে, জেল খাটছে। পূর্ণবাবুর এক দৌহিত্র মার খেয়ে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। ঠিক এ সময়টা সোজাসুজি

আন্দোলন না হলেও এদিকে-ওদিকে হচ্ছে বৈকি। লুকিয়ে লুকিয়ে নাকি বোমাও তৈরী করছে কেউ কেউ—কলেজের ছেলেরাই বেশির ভাগ, তার মধ্যে স্কুলের ছাত্রদেরও টানছে। ধরা পড়লে ফাঁসি অনিবার্য। অত বড় ছেলে দেখে গৌরকেও যদি ঐ সর্বনেশেগুলো দলে টানে! ও যা বোকা, হয়ত এখনি যেতে বললে ছুটে যাবে।

সেজন্যেই আরও বাড়ি ফিরলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করত। ইদানীং খেলতে যাওয়া বন্ধ করেছিল গৌর—হেমন্তরই আপত্তি, গৌর তা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে নি—সেটাকে সুবুদ্ধির পরিচয় ভেবে আরও বরং নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বাইরের প্রতি ঔদাসীন্যের মধ্যে যে গৃহের প্রতি টানটা বড় কথা—তা মনে হয় নি একবারও। বিপদের মূলটা যেখানে, যেখান দিয়ে সত্যকারের সর্বনাশ ওর আসার কথা, সেখানকার কথাই চিন্তা করে নি কখনও—ওদের বংশের ধারা!

আঠারো বছরের ছেলে আর ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েছেলে—এই হিসেবটা মেলাতে পারে নি বলেই এদিকটাতে চোখ পড়ে নি। আজ মিলল। ওদের রক্তেই সে হিসেব লেখা আছে। সেইটে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

এই নিমাইয়ের মুখেই বহু গল্প শুনেছে সে। বিষ্ণুচরণ তার ছেলেমেয়ের ঘরে আড়ি পাতত, জানলার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারেই দেখার চেষ্টা করত তাদের বিছানাটা। নইলে নাকি তার নিজের অসুবিধে হত। শিবচরণের ভয়ে কোন ঝি ওদের গোয়াল কাড়তে কি বাসন মাজতে রাজী হত না, সে নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল এই ব্যাপারে। স্ত্রীর হাতে সত্যি সত্যি ঝাঁটা খেয়েও তার রোগ সারে নি। এমনি নানা বিচিত্র ও বীভৎস বিবরণ। হেমন্ত ধমক দিয়েছে, কাহিনীর সূচনাতেই থামিয়ে দিয়েছে—অনেক সময়। তবু, যতটা কানে গেছে তাই যথেষ্ট।

এর পর সে বংশের ছেলের কাছে কি আশা করবে সে?

॥ ১৮ ॥

রাত্রে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেল হেমন্ত, কিন্তু ঘুমোল না। ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রইল—নিমাইয়ের পরামর্শমতো। আজ নিমাইয়ের কথা উপেক্ষা করার সাহস নেই তার—কথাটা মনে পড়ে এই দুঃখের মধ্যেও হাসি পেতে লাগল। একেই কি ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে—অদৃষ্টের পরিহাস?

অবশ্য এজন্যে খুব কষ্টও করতে হল না। ঘুম তার চোখের ধারে-কাছেও নেই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে সেই বিকেল থেকে। তার মধ্যে অপমানের জ্বালাটাই প্রধান। নিমাইয়ের কাছে অপমান, ঐ ঝিটার কাছেও। তাকে ঠকাচ্ছে এতদিন ধরে, সেই চিন্তাটাই যেন অসহ্য।

না, ঘুমের জন্যে কোন চিন্তা নেই। কেবল একটা ভয় ছিল—ইদানীং নাকি মধ্যে মধ্যে নাক ডাকে তার। এদের মুখেই শুনেছে—নিমাই-গোরাদের মুখেই—সে শব্দ না পেয়ে গৌর না সন্দেহ করে, সাবধান না হয়ে যায়। তবে মধ্যে মধ্যে ডাকে—সব সময় নয়, এই একটা রক্ষা। আর যদি নিমাইয়ের ইঙ্গিত সবটাই সত্য হয়, তরুণ বয়সের প্রথম কামোন্মত্ততা, অত সতর্ক হওয়ার, হিসেব করার, অত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা

করার কথা নয়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতেও হল না। রাত বারোটা নাগাদ ওদিকে নিজের বিছানায় উঠে বসল গৌর। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল—সম্ভবত এদিকে তাকিয়ে। তারপর, হেমন্তকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে বুঝে বিছানা থেকে নেমে এসে দরজার কাছেও দাঁড়াল অল্পক্ষণ—বোধহয় এদিকে কোন প্রতিক্রিয়া জাগে কিনা দেখার জন্যেই—তারপর সন্তর্পণে দোর খুলে বেরিয়ে গেল, কপাটটা আবার সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে।

দরজার বাঁদিকের কপাটটায় অনেকদিন ধরেই বন্ধ করার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছিল একটা—আজ দেখল বিনা শব্দেই বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত এর ভেতর কেউ তেল দিয়ে মসৃণ ক'রে রেখেছে—হেমন্তই অত লক্ষ্য করে নি।

একটা ভয় ছিল, বাইরে থেকে না শেকল দিয়ে যায়। হাওয়ার বেগ দড়াম ক'রে কপাট পড়লে সে শব্দে ঘুম ভেঙে যাবে—এই ভেবে বন্ধ ক'রে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ গৌর জানেই—হেমন্ত রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ যে শোয় একেবারে সাড়ে তিনটে-চারটেয় উঠে পড়ে, মধ্যে ওঠা কি কলঘরে যাওয়ার অভ্যাস নেই তার। তবে ভয় যেমন ছিল, ভরসাও ছিল, শুধু সে-ই জেগে নেই, ওদিকে নিমাইচরণও জেগে আছে নিশ্চয়। দরজা বন্ধ করলে খোলার লোকের অভাব হবে না।

কিন্তু হাওয়ার তেমন জোর নেই বলেই সে-কথাটা বোধহয় মনে পড়ল না গৌরের, অথবা তাড়া বেশী ছিল। সে-অধীরতার মধ্যে এত কথা মনে পড়া, এত হিসেব করা সম্ভব নয়।···

গৌর বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল হেমন্ত, তবু তখনই নড়তে পারল না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা ওর, অবর্ণনীয় মনোভাব। কী দেখবে তা কতকটা জানে, অনুমান করতে পারছে। অনুমান যে সত্য হবে তাও নিজের মনেই বুঝছে। কিন্তু সেইজন্যেই যেন এই আড়ষ্টতা, একটা অপরাধবোধের সঙ্কোচ। সে অপরাধী নয়—বিচারক, তবু তারই যেন লজ্জার অবধি নেই। লজ্জা আর ভয়। হ্যাঁ, ভয়ই বেশী বরং। এতদিনের আশা, এতদিনের স্নেহ ও আত্মীয়তার মৃত্যু ঘটবে—তবে তার জন্যেও ঠিক নয়। এ ভয়টা লজ্জারই। কি দেখবে সেই ভয়। যে অন্যায় করছে তার হয়ত লজ্জা নেই—ওর হাত-পা অনড় হয়ে যাচ্ছে সেই লজ্জাকর পরিস্থিতিটা কল্পনা ক'রে। আশঙ্কা সেই লজ্জাটা ভোগ করতে হবে ভেবেই। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে তার, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

একবার মনে হল কাজ নেই। এমনিই কাল দূর ক'রে দেবে বাড়ি থেকে—কোন কারণ না দেখিয়েই। এমন তো কোন লেখাপড়া নেই যে, পুষতেই হবে। দয়ার দান—না দিলে নালিশ-মকদ্দমা নেই। কোন কৈফিয়ৎই চাইতে পারবে না কেউ। মিছিমিছি তার জন্যে এই কদর্যতা, এই ইতরতার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই।···

কিন্তু শেষ অবধি মনকে শক্ত করল। অবিচার কারুর ওপরই করবে না। চোখে না দেখা পর্যন্ত এটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

অকারণ লজ্জার দুর্বলতা ও জড়তা কাটিয়ে আস্তে আস্তে সেও নেমে এল খাট

থেকে। এর শেষ নিজেই দেখবে সে, নিজের চোখে দেখে এ-পর্বে ছেদ টানবে। নিজের হাতে আশার এই ক্ষীণতম মূলটুকুও ঘুচিয়ে দেবে।

এবং—আর অপেক্ষাও করা চলবে না, অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

গোরের মতোই নিঃশব্দে কপাট খুলে অন্ধকারে বেরিয়ে এল হেমন্ত। কোথায় যেতে হবে তা তো জানাই—সিঁড়ির পাশের ঐ খাঁজমতো জায়গাটা—ঝি যেখানে শোয়।

একবার পিছন ফিরে দেখল, ওদিকের ঘরের জানলায় একটা সূক্ষ্ম অগ্নিবিন্দু, একবার ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। তার হিসেবই ঠিক, নিমাইও জেগে আছে, দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

খালি পায়ে যাওয়া—পায়ের শব্দ অবশ্যই তেমন হল না—তবু, সতর্ক থাকলে, এদিকে খেয়াল থাকলে টের পেত বৈকি! নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতায় এটুকু শব্দও কানে যাবার কথা, বিশেষ যারা মেঝেতেই শুয়ে আছে।...রাস্তার গ্যাসের আলো পিছনের তেতলা বাড়ির দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আলোর যে একটা আবছা আভা সৃষ্টি করেছে, তাতেও ছায়ামূর্তির আগমন লক্ষ্য করা চলত। আরও—সিঁড়ির নিচের দিকের জানলা দিয়ে সোজাসুজিই একফালি রাস্তার আলো ঊর্ধ্বমুখে এসে পড়েছে এদিকের দেওয়ালে—সেখানে কেউ এলে তো ছায়াটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু যে-দু'টি মানুষ দেখবে কি লক্ষ্য করবে, তারা নিজেদের নিয়েই মশগুল। দৈহিক আনন্দের উগ্রতায়, অবৈধ সংসর্গের নেশায় আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত। একজন তো বালক মাত্র, তার এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম, সে উন্মত্ত হয়ে উঠবে এও স্বাভাবিক। আর একজনের আশার অতিরিক্ত পাওনা। এসব দিকে নজর রাখার মতো অবস্থা তাদের কারও নয়।

তাছাড়া এরকম কোন আশঙ্কাও করে নি তারা। এ-ব্যাপার ক'দিন ধরেই চলছে, তাতে সাহস বেড়েও গেছে খানিকটা।

তাও একটু অসুবিধা হত হয়ত—আলোর জন্যে। মাসখানেক আগে হলেও হত। এই মাত্র কুড়ি-পঁচিশ দিন আগেই ইলেক্‌ট্রিক এসেছে এ-বাড়িতে। এর জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে হেমন্তকে। গলির মোড় থেকে এ পর্যন্ত তিনটে খুঁটি বসানোর বাড়তি টাকা ওকেই দিতে হয়েছে। তবে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আশপাশের বাড়িতে যেমন যেমন কনেকশ্যন নিতে থাকবে, তেমনি কিছু কিছু টাকা ফেরৎ পেতে থাকবে হেমন্ত।

ঠিক এখানটায় কোন আলোর ব্যবস্থা নেই—কিন্তু বারান্দায় আছে। এমনভাবেই বসানো হয়েছে সেখানে যে, সে আলো জ্বললে এই খাঁজটায় পুরো,—সেই সঙ্গে সিঁড়ির মুখটা পর্যন্ত আলো এসে পড়বে।

সেই আলোর সুইচটা টিপতেই ওরা টের পেল, হেমন্ত জেগেছে ও জেনেছে—এবং একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তখন আর গোপন করার কি সামলে নেওয়ার কোন উপায় নেই। মিথ্যা কোন কাহিনী বয়ন করারও না। একেবারেই হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে।

কোনরকম সামলে নেবার কি পালাবার সময়ও দিল না হেমন্ত। অনেকদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে একটা সরু লিকলিকে বেতের ছড়ি কে এনে দিয়েছিল পূর্ণবাবুকে,

ভারী বাহারে ছড়ি, ঐটুকুর মধ্যেই নানারকম কাজ-করা। সেটা হেমন্তকে দেখাতে এনে এখানেই রেখে গিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত সেটা কোন কাজে লাগে নি, আলনার খাঁজে ঝোলানো থাকে শুধু। দৈবাৎই বেরোবার সময় সেটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, হাতে ক'রে নিয়ে বেরিয়েছিল হেমন্ত। গৌর চমকে, ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করার আগেই সেই বেত এসে পড়ল তার পিঠে।

তারপর সপাং সপাং বেতের বৃষ্টি হতে লাগল যেন। হরিমতী কোনমতে কাপড়টা টেনে জড়াতে জড়াতে গুড়ি মেরে পায়ের পাশ দিয়ে গলে নেমে গিয়েছিল। তার দিকে লক্ষ্যও ছিল না হেমন্তর। তার সম্বন্ধে অত ক্ষোভ নেই, সে যা—যে-ঘরের মেয়েছেলে—সেই ঘরের মতোই কাজ করেছে। তার প্রবৃত্তির দোষ দেওয়া যায় না। কারও সাধ্যের অতীত কোন ভোগাবস্তু হাতের কাছে যেচে এলে সে হাত সরিয়ে নেবে—এতটা আশা করা উচিত নয়। সে সংযমের শিক্ষা পারিবারিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে। আসল অপরাধী গৌর। দিক্‌দাহকারী প্রচণ্ড রোষ তার সম্বন্ধেই—সেই সঙ্গে একটা গা ঘিন্‌-ঘিন্‌-করা গ্লানি। ভদ্রলোকের ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলে—অন্ততঃ ভদ্রলোকের ছেলের মতোই মানুষ হয়েছে সে বাল্যকাল থেকে—তার ওপর এখনও ছাত্র, শিক্ষার্থী—তার এ অপরাধ মার্জনীয়।

উপর্যুপরি বেত এসে পড়ার মধ্যেই গৌর উঠে দাঁড়িয়েছিল কোনমতে, কিন্তু কাপড়টা গুছিয়ে পরার কি পালাবার অবকাশ পেল না। অবিরল ধারে বেতের বর্ষণ চলতে লাগল ওর সেই প্রায়-উলঙ্গ দেহে—সূক্ষ্ম পাকা বেত চামড়ায় কেটে কেটে বসতে লাগল, দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল ওর সর্বাঙ্গে—কোথাও কোথাও, একাধিকবার একই জায়গায় পড়ার ফলে চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

প্রথমটা চুপ ক'রেই ছিল গৌর—শেষে আর পারল না, চিৎকার করতে লাগল, 'ওগো আর মেরো না গো, ওগো আর করব না গো, ও মাগো, মরে গেলুম গো!' ইত্যাদি—। পাগলের মতো চিৎকার ক'রে যাচ্ছে সে—কী বলছে তাও কোন হুঁশ নেই—কিন্তু যে মারছে তার কানে যেন কিছু ঢুকছে না। সেও যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—একটা আর্তনাদের শব্দ কানে যাচ্ছে মাত্র—তার মর্মার্থ মাথায় পৌঁচচ্ছে না।

বেগতিক দেখে নিমাইচরণই ছুটে এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এদিকে সরিয়ে নিয়ে এল জ্যাঠাইকে।

'কী হচ্ছে কি! তুমিও কি জ্ঞান হারালে নাকি? ষাঁড়ের মতো চিচ্‌কার করতে লেগেছে—এখুনি পাড়ার লোক ছুটে আসবে যে, একটা খুনখারাবি হচ্ছে ভেবে! এই নিষুতি রাতে দুপুরে-মাতন শুরু হয়ে গেল যেন!...তারপর? ঐ শোন জানলা-দরজা খোলার আওয়াজ চারদিকে। কী কৈফেৎ দেবে জানতে এলে?...লাও। ঢের হয়েছে, চলে এসো এখন। সাজাটাজা যা দিতে হয় কাল সকালে তখন দিও, মাথা ঠাণ্ডা হলে। আর মারলে ছেলেটা মরেও যাবে যে! হাতে দড়ি পড়ার কাণ্ড করবে নাকি! ভ্যালা রে ভ্যালা!...ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। নাই দিলে কুকুর মাথায় উঠবে এ তো জানা কথাই—ত্যাখন দোষটা হয় কুকুরের, তাকে তখন আছড়ে মেরে ফেল্‌!... তা সেই কাণ্ড তোমার। আমরা কুকুরের জাত জানো না। কী বংশে এসে পড়েছেলে!'

চাপা গলায় ধমক দিল সে।

সামলে নেওয়া শক্ত খুবই। তখনও অপমান ও আশাভঙ্গের দাহ কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি। অব্যয়িত প্রচণ্ড ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপছে থরথর ক'রে, বহুক্ষণের রুদ্ধ বিলম্বিত নিঃশ্বাসের বেগে ও উত্তেজনায় বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। ওকে সত্যিই খুন করতে পারলে হয়ত এ-জ্বালার কিছুটা শান্তি হত।

তৎসত্ত্বেও—নিমাইয়ের কথাগুলোর যাথার্থ্য না বোঝার মতো জ্ঞান হারায় নি। এ-কেলেঙ্কারী জানাজানি হলে কাল আর পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না। সে প্রাণপণ চেষ্টাতেই নিজেকে সামলে নিল কতকটা। আগে যেমন অনায়াসে উত্তেজনা আবেগ আবরিত করতে পারত, এখন আর পারে না। তাতেও কষ্ট হয় খুব, বুকে যেন লাগে। এতক্ষণের উম্মত্ত ক্রোধ ও তাকে সংযত করার আকস্মিক চেষ্টা—দু'টোর প্রতিক্রিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য মনে হল ওরই হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে। দু'চোখের সামনে কয়েক মুহূর্ত যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল। কোনমতে বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরে সামলে নিল কতকটা। তারপর বেতটা ফেলে দিয়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'ওকে ঐ ঘরে চলে যেতে বল্ নিমাই, আর একটুও আওয়াজ যেন না শুনি!'

আঙুল দিয়ে যে-ঘর দেখিয়ে দিল, সেটা গোরেরই পড়বার ঘর, প্রয়োজন মতো বাইরের ঘর হিসেবেও ব্যবহার হয়। সেখানে শোওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, খানচারেক চেয়ার আছে শুধু, একটা টেবিল, আর মেঝেয় বসে পড়বার জন্যে মাদুর একখানা।... তা হোক, গৌর তখন ওর সামনে থেকে সরে যেখানে হোক পালাতে পারলে বাঁচে। সেও ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কান্নাটা সামলে নিল। সমস্ত গা ঘামে-রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, তারই মধ্যে কাপড়টা জড়িয়ে পরতে পরতে পাশ কাটিয়ে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। হেমন্ত নিজের হাতে দরজা বন্ধ ক'রে শেকল লাগিয়ে দিলে বাইরে থেকে; কঠিন কণ্ঠে সাবধান ক'রে দিলে নিমাইকে, 'কেউ যেন না আদিখ্যেতা ক'রে দরজা খুলে দিতে যায়!...মরুক ও, ঐ ঘরে না খেতে পেয়ে। ওর বাঁচার কোন দরকার নেই, এ কালামুখ নিয়ে!'...

তারপর নিমাইকে নিচের সদর দরজাটা দেখে, খোলা থাকলে বন্ধ ক'রে আসতে বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তখন আর একটুও দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই, বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে, মাথা ঘুরছে—সেখানেও যেন কিসের একটা প্রবল শব্দ হচ্ছে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে। ওর মনে হল এটা সন্ন্যাস রোগের সূচনা—কিংবা, এখনই হয়ত হার্টফেল করবে। তা করুক, মরতে কিছুমাত্র দুঃখ নেই—তবে ঐ অমানুষ বেইমানের ঝাড়ের জন্যে এ-দুর্গতি হবে—সেইটেই লজ্জার কথা।

সে-রাত্রে কারুরই ঘুম হল না। হওয়া সম্ভব নয়। নিমাই রাত চারটেয় উঠে বাড়ির ধোওয়ামোছা শেষ ক'রে বাসনের গোছা নিয়ে মাজতে বসে গেল। হরিমতী সেই রাত্রে তখনই পালিয়েছে—প্রায় একবস্ত্রে। উঠোনে যে কাপড়টা আর সেমিজটা শুকোচ্ছিল, তাছাড়া আর কিছুই নিয়ে যেতে পারে নি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে বেরিয়ে গেছে, ঐ বেত তার পিঠে পড়লে সে আর বাঁচবে না, জীবন থাকলে জিনিসের কথা ভাবার ঢের সময় পাবে—এই বোধহয় তার মনের ভাব তখন। সে যে এক মুহূর্তও আর এ-বাড়ি থাকবে

না তা হেমন্তও বুঝেছিল, সেইজন্যেই দরজাটা দেখে বন্ধ করতে বলেছিল নিমাইকে।

ঘুম না হোক—ঘণ্টাচারেক চুপ ক'রে শুয়ে থেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করল হেমন্ত। সেও ভোরে উঠে স্নান সেরে রান্না চড়াতে যাচ্ছিল, নিমাই বারণ করল। বলল, 'অত তাড়ার কিছু নেই, আমি আজও আপিস যাচ্ছি না।...সিক-রিপোর্ট যখন ঝাড়তেই হবে তখন যাঁহা একদিন তাঁহা দু'দিন। তুমি পুজো-আচ্ছারা ক'রে নাও, চা-টা খাও—আমি এর ভেতর বাজারটা সেরে আসি। আর দেখি আমাদের সেই পুরনো মতির মাকে পাওয়া যায় যদি; সেদিন তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে ছেল, শুনলুম দেশ থেকে বেশ সেরেসুরে এয়েছে। নেবুতলায় বাজারের পেছন দিকে থাকত তো—দেখি যদি খুঁজে বার করতে পারি!'

সকাল থেকে গৌরের প্রসঙ্গ কেউই তোলে নি। কিন্তু পুজো সেরে উঠে চা তৈরী ক'রে অন্যদিনের মতো রান্নাঘরের সামনের বারান্দাতেই যখন খেতে বসল—পড়ার ঘর থেকে যাতে সোজা নজর চলে—তখন আর নিমাই থাকতে পারল না। একটু উশখুশ ক'রে একবার একটু কেশে নিয়ে বললে, 'তা—ও-ছোঁড়াটাকেও—মানে, দোরটা তো একবার খুলে দেওয়া দরকার!'

হেমন্ত চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'না।'

সারারাত কেঁদেছে ছেলেটা, কান্না নয়—গোঙানি বলাই উচিত, মারের অবস্থা দেখেই যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পেরেছে নিমাই, তাতেই নরম হয়ে এসেছিল সে, তার ওপর তাকে একবিন্দু জলও না দিয়ে তার সামনেই বসে চা-খাবার খাওয়া—ও-ঘরে জলের কোন ব্যবস্থা নেই—এটা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হল ওর। সে আরও একটু ইতস্ততঃ ক'রে মাথা-টাথা চুলকে বলল, 'ওর নাম কি—মানে, না, খেতে না দাও, বাইরের কাজকম্মগুলো তো আছে, সকালের ব্যাপার! শেষে ঘরদোর নোংরা করলে সেই তোমাকেই তো মোক্ত করতে হবে—'

'হোক। সেজন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না বাবা, সে আমি বুঝব। ওকে উপোসী রেখে তোমার খেতে যদি বাধে—সটান উঠে চলে যাও, কিচ্ছু বলব না। খাবার তুমি খেলেও যা, নষ্ট হলেও তাই। খরচ যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি খেলে সে পয়সাটা কিছু ফিরবে না।...সে তোমার খুশি, তবে ওর হয়ে সুপারিশ করতে এসো না—পরিষ্কার বলে দিচ্ছি!'

এর ওপর কথা বলতে যাবে, নিমাইয়ের একটা ঘাড়ে কিছু এমন দশটা মাথা নেই। অগত্যা নিঃশব্দে নিজের চা-টুকু শেষ ক'রে উঠে ঝিয়ের সন্ধানে চলে গেল।

গৌর ঠিক এতটা আশঙ্কা করে নি। সমস্ত গা তার বিষফোড়ার মতো টাটিয়ে আছে, শোবার উপকরণ বলতে তো একমাত্র মাদুর—তাতেই শোবার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, পারে নি, এত ব্যথা সর্বাঙ্গে। কাটা জায়গাগুলোয় রক্ত জমাট বেঁধে এসেছে, তবু এখনও ঘাম লাগলেই জ্বালা করছে। আর ঘাম হয়েই যাচ্ছে। এ-ঘরে একটি মাত্র জানলা ভেতরের দিকে, দরজাটা খোলা থাকলে তবু একটু হাওয়া খেলে—এখন গুমোট হয়ে আছে এই প্রথম বসন্তের দিনেও। তাতেই আরও এত যন্ত্রণা। বার বার কোঁচার কাপড়ে মুছছে, কিন্তু সামনের দিকটায় থুপে থুপে মোছা যায়, পিঠে তা চলে না। জল

মোছার মতো ক'রে কাপড় টানতে গেলে আরও জবালা ক'রে উঠছে সেই ঘষটানিতে। কাপড়খানাও রক্তে ঘামে ভিজে উঠেছে প্রায়। গায়ে যদি গেঞ্জিটাও থাকত তো এত লাগত না। খালি গায়ে শুতে যায়, সেইভাবেই উঠে এসেছে, গেঞ্জি গায়ে দেবার কথা মনে হয় নি।

তার ওপর কষ্ট তেষ্টার। গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। কান্নাতে যন্ত্রণাতে আরও বেশী তেষ্টা পায়। একটু জল দেবার কথাও কারও মনে পড়ল না। কাকা আবার ঐ ডাইনী-বুড়ির হুকুম নিতে গেল। কেন, এত যদি টান—বুড়ি যখন শুয়ে ছিল দরজাটা খুলে এক গেলাস জল দিয়ে যেতে পারে নি! কে জানে কাকাটাও হয়ত ঐ দলে আছে! ও-ই হয়ত গিয়ে লাগিয়েছে বুড়িকে। নইলে এতদিন পরে টেরই বা পেল কি ক'রে! মহা শয়তান ঐ কাকাটা, চোরকে বলে চুরি করতে গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে। এখন আবার দরদ দেখাতে এসেছে!

ছোট প্রাকৃতিক কাজটা সে ঘরেই সেরেছে একবার— জল নেই পেটে বলে এখনও আর সে চেষ্টা হয় নি। অন্য যা—তা হবেও না এখন এ-অবস্থায়। সেদিকে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু একটু জল না পেলে বা এর চেয়ে অন্তত একটু নরম বিছানায় শুতে না পারলে মরে যাবে যে। ঠায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কাঁহাতক। ভাল ক'রে বসতেও যে পারছে না।

চা খেতে না দিলেও—আশা ছিল দুপুর নাগাদ ছেড়ে দেবে, নিদেন একটু জলও দিয়ে যাবে। কিন্তু কাকা বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঝিয়ের খবর দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল—এতক্ষণে নিশ্চয়ই আরাম ক'রে বিড়ি ধরিয়েছে একটা—ঠাকুমাও দেখল দিব্যি এদিকের রান্না শেষ ক'রে ভাত চাপিয়ে ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসল, বেশ যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন, যেন কোথাও কিছু ঘটে নি, যেন একটা লোক চোরের মার খেয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে টাঙ্গিয়ে নেই কাল রাত থেকে!

এইবার সে ক্ষেপে উঠল যেন। প্রথমটা একটু অস্ফুট স্বরেই কী সব গজগজ করল, তার মধ্যে 'আক্কেল' 'বিবেচনা' প্রভৃতি শব্দগুলোই শুধু এ-ঘর থেকে শোনা গেল, তারপর—তাতেও এদিক থেকে কোন সাড়া না আসতে সোজাসুজি গলা চাড়িয়ে দিল, 'তাই বা কেন, ও আমার কে যে, ওর শাসন মানতে হবে! কিসের এমন সম্পর্ক আমার। সত্যিকারের কেউ তো নয়! বাপের জ্যাঠাই, ভারী রে! মাসীর মার কুটুম! তাও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল! কেলেঙ্কারী জানতে আমার বাকী আছে নাকি! বেশী ওস্তাদি করতে এলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দোব আমি—তা বলে দিচ্ছি! আমাকে চেনে না!...উঁ! ভারী আমার আপনার লোক এলেন শাসন করতে! কিসের জন্যে এমন চোরের মার মারবে শুনি!...বেশ করেছি, খুব করেছি। আলবাৎ করব, যা খুশি আমার করব। ওকে মানি না। কী করবে আমার? আবার মারবে? আসুক না, এবার মারতে এলে আমিও আছি!...বন্ধ ক'রে রাখবে? এখনও চুপ ক'রে আছি তাই—এরপর এমন চেঁচাব যে, পাড়ার লোককে ছুটে আসতে হবে, তখন হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব। বলব, আমাকে খুন করতে চেয়েছিল কাকাতে আর ঐ ডাইনী-মাগীতে মিলে—আমার বিষয়ের লোভে।...হুঁ—এই বলে দিচ্ছি সাফ্!

স্তম্ভিত হয়ে যায় হেমন্ত। জীবনে বহু অকৃতজ্ঞতা সে দেখেছে—জীবনভোরই মানুষের পশুত্ব দেখে আসছে সে, নানাদিক দিয়েই—তবু এখনও যে দেখার বাকী ছিল তা ভাবে নি। এ ঐ বংশেরই ছেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হেমন্তর শাশুড়ির ও ভাশুরদের চেহারাই যেন আর একবার দেখতে পেল এর মধ্যে। মনে হচ্ছে তাদেরই প্রেতাত্মাগুলো মিলেমিশে এক হয়ে এই দেহটার মধ্যে ঢুকেছে। নইলে আঠারো বছরের ছেলের মুখ দিয়ে—এই কাণ্ড ধরা পড়ার পরও—এসব কথা বেরোয় না।

নির্বাক হয়ে গেল নিমাইও। সে যখন দরজা খুলে দেওয়ার সুপারিশ করতে গিছল তখন বালক ভেবেই দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, কাজও হয়েছে ঢের—ছেলেমানুষকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এসব কী শুনছে সে, সেই ছেলেমানুষটার মুখ দিয়েই কি বেরুচ্ছে এই কথাগুলো?

সে খানিকটা বোকার মতো চুপ ক'রে বসে থাকার পর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওকেই শাসন করবে কি হেমন্তকে বলবে দরজা খুলে এই দণ্ডে ওকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে—কিছুই ভেবে পাচ্ছে না যেন, কিছুই মাথায় আসছে না। ছেলেটা ঐ ধরনের কুৎসিত কথা বলেই যাচ্ছে। একবার ভাবল ধমক দিয়ে ওঠে—'এই চুপ কর, কী হচ্ছে কি?' সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল—তাকেই হয়ত যা-তা বলে উঠবে এখনই। দাঁড়িয়ে রইল সে তেমনি—কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে, হাতে যে বিড়িটা ধরা আছে, আর জ্যাঠাইয়ের যে তা দেখতেও কোন অসুবিধে নেই—সে কথাটাও খেয়াল রইল না।

তবে ওকে দেখে বোধহয় হেমন্তর জড়বৎ অবস্থা কিছুটা কাটল।

একটা অপরিমাণ ঘেন্না গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে উপচে পড়ছে যেন। ঘেন্না নিজের ওপরও কম নয়, হয়ত বেশিই। ওই বংশের ছেলেকে সে মানুষ করতে চেয়েছিল। অপরাধ করেছে ভেবে শাস্তি দিতে গিয়েছিল। কাকে শাস্তি দেবে, রাগ করছে কার ওপর? ছাগলের কাজ ছাগল করেছে—তার ওপর আবার রাগ করার কি আছে; শাস্তিই বা কিসের? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হচ্ছে ছাগল যা-ই হোক—সে এমন সাপের মতন ছোবল দেয় না। দুধকলা দিয়ে সযত্নে সে সাপই পুষেছে এতকাল।

সে আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না। অনেক ভেবেও ওকে বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেল না। এতকাল মানুষের সঙ্গেই কথা বলে এসেছে, যে মানুষ নয়—তাকে কি বলবে বুঝতে পারল না।

অবশ্য ভাল ক'রে কিছু ভাবারও অবস্থা ছিল না। অপ্রত্যাশিত অকল্পিত আঘাতে মাথা ও মন দুই-ই যেন জড় পাথর হয়ে গেছে। কিছু বলার, এমন কি কিছু ভাবারও অবস্থা ফিরে পায় নি এখনও। মাথায় কোন কঠিন আঘাত লাগলে নাকি সমস্ত চৈতন্য ও চিন্তাশক্তি এমনি আচ্ছন্ন হয়ে যায় কিছুকালের জন্যে—একথা অনেকের মুখেই শুনেছে—কথার আঘাতেও যে এমন হয় তা জানত না। কালকের যে ঘৃণ্য অপরাধ ধরা পড়েছে—ঘৃণ্য, রুচির দিক থেকে—পশুত্বের যে কুৎসিত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে, তারও আঘাত এত রূঢ় এত মর্মান্তিক নয়।

॥ ১৯ ॥

এর পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলাই উচিত, কিন্তু তাও বলতে পারল না।

চার বছর বয়স থেকে এই আঠারো পর্যন্ত—চোদ্দ বছর যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছে—সে সাপ হলেও তাকে এ অবস্থায় রাস্তায় বার ক'রে দেওয়া যায় না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সব আস্ফালন থেমে গিয়েছিল গোরার, কে জানে সে হয়ত ভাবল আবার শাসন করতেই আসছে,—মাথা হেঁট ক'রে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই সময়··· একবার এক চকিতে সেদিকে চেয়ে দেখেছিল—এক পলক মাত্র। তবু তাতেই অনেক দেখা হয়ে গেছে। পিঠে, বাহুমূলে—মায় গালেরও এক জায়গায় বেতের দাগগুলো লাল হয়ে ফুলে ফুলে আছে, কোথাও রক্ত বেরিয়েছিল সেই দাগে দাগে জমে গেছে, কোথাও বা ঘামেতে রক্তেতে মিশে গড়িয়ে পড়ে ছিল, সেই অবস্থাতেই শুকিয়ে একটা ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে; যন্ত্রণায় অনাহারে তৃষ্ণায় চোখ-মুখ বসে গিয়ে যেন সুগভীর কালি মেড়ে দিয়েছে চোখের কোলে; সমস্তটা জড়িয়ে একটা অসহায়, আর্ত চেহারা।

সব অনাচার অসদাচরণ, সব অকৃতজ্ঞতা, ভয়ঙ্কর ক্রূর মনের জঘন্য নগ্ন প্রকাশ—সদ্যলব্ধ বিষাক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি—সমস্ত কিছু ছাপিয়ে এই দীন ক্লিষ্ট অবস্থাটাই বড় হয়ে উঠল—বেদনায় টন-টন ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। যে মার খেয়েছে—তার থেকে, যে মেরেছে, আঘাত তাকেও যে কম বাজে নি, তার যন্ত্রণাও যে কিছুমাত্র কম নয়—এই মুহূর্তে সেই সত্যটাই স্পষ্ট ধরা পড়ল হেমন্তর কাছেও।···

কিছুই বলা হল না, বলতে পারল না। 'চলে যাও' যেমন বলা গেল না, তেমনি কোন সান্ত্বনার বাক্যও না। ধীরে ধীরে ফিরে এসে নিজের ঘরেই শুয়ে পড়ল আবার। সারা রাত্রের চেষ্টায় সকালে যে মনের বল ফিরিয়ে এনেছিল—তা এই ক' মিনিটে আবার হারিয়ে গেছে। মনে বা দেহেও—কোন শক্তিই আর নেই, বিন্দুমাত্রও।···

কী করা উচিত—নিমাইও ভেবে পায় না। ঘর থেকে বাইরে আসার জন্য যে এত লাফালাফি চেঁচামেচি করছিল এতক্ষণ, দরজা খুলে দেবার পর সে আর বাইরে আসবার কোন চেষ্টাই করল না। হেমন্তর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন চুপ্‌সে গিয়েছিল সে-ও, তেমনি মাথা হেঁট ক'রে ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। সেও বুঝতে পারছে না কী করা উচিত তার। এরা এখনই দূর ক'রে দেবে কিনা, পুলিশে দেবার মতলব আছে কিনা (এসব ব্যাপারে পুলিশে দেওয়া যায় কিনা তাও তার জানা নেই, গর্হিত কাজ করলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায় এমনি একটা আবছা ধারণা মাত্র আছে)—তাও বুঝতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার একটা পা, আর একবার অন্যটা তুলে অপর পা-টা—চুলকোতে লাগল।

মেঝেতে মাদুরের ওপরই শুয়ে পড়েছিল হেমন্ত চোখ বুজে। খানিকটা দেখে নিমাই পা-পা ক'রে সেখানেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে ওকে কি বলা হবে এখন?'

তেমনি চোখ বুজেই ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'জানি না।'

এ-আবার কি কথা! হতভম্ব হয়ে যায় নিমাই। এ বাড়িতে চিরকাল সব ব্যাপারে হেমন্তই হুকুম দিয়ে আসছে, সিদ্ধান্ত যা কিছু নেওয়ার সে-ই একমাত্র লোক—নিমাইয়ের কাজ শুধু নির্বিচারে সেগুলো তামিল করা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কখনও তো পড়ে নি সে।

খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে এক ধরনের কাষ্ঠ-হাসি হেসে নিমাই আবার বলল, 'হেঁ হেঁ, বাবাজী হয়ত ভাবছে যে, ওর তড়পানিতে ভয় পেয়েই তুমি দোর খুলে দিলে। নিজের কেরামতি ভেবে নিজে নিজেই খুব বাহবা নিচ্ছে হয়ত।...ঠিক যে তা নয়—এটা যে মনের ঘেন্নায় করলে—সেটা একটু বুঝিয়ে দিলে পারতে!'

তবু ওপক্ষ থেকে কোন সাড়া এল না। অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে হেমন্ত, কথা বলারই আর কোন শক্তি নেই তার। মানুষ হলে তাকে কিছু বোঝানো যায়, কোন কোনও ক্ষেত্রে পশুকেও কথা বোঝার মতো ক'রে তৈরী করা যায়, কিন্তু যে পশুর অধম তাকে—কেন সে অধম তা বোঝানো যায় না। ছুঁচোকে মারলে নিজের হাতেই দুর্গন্ধ হয়—ছুঁচোর ছুঁচোত্ব যায় না তাতে।

কিন্তু এসব কথা মনে এলেও বলতে পারল না, মনে হচ্ছে কথা বলার বড্ড পরিশ্রম, তার চেয়ে যা খুশি হোক, যার যা খুশি করুক—শুধু তাকে একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দিক। এ যে কী সুগভীর শ্রান্তিতে পেয়ে বসেছে তাকে—কাউকে সে এ অবস্থা বোঝাতে পারবে না। মনে হচ্ছে এমনিভাবে কোন অন্ধকারে নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়াই সবচেয়ে আরামের, এই অবস্থায় এখনই মরে যেতে পারাই সবচেয়ে কাম্য।...কোন নির্দেশ না পেয়ে নিমাই আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ভাতটা বুঝি পুড়ে যাচ্ছে। এ কাপড়ে সে ছুঁলে হেমন্ত হয়ত খাবে না—কিন্তু কাপড় বদলাবার সময় নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাতে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে নামিয়ে ফেন গেলে ফেলল।

তারপর আবার এসে প্রশ্ন করল, 'পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছিল, আমাকে তো এই কাপড়েই ছুঁতে হল ভাত। তা উনুনটা পেড়ে নিয়ে গামছা পরে কি তোমার মতো চাট্টি ভাত চাপিয়ে দোব আবার—না তুমিই উঠে চাপাবে? উনুনটা নিকিয়ে কয়লা দিয়ে রাখব—?'

এবার উত্তর এল। তেমনি চোখ বুজেই বলল, 'আমি এবেলা কিছু খাব না, ঐ ভাতটাত যা পারো খেয়ে নাও গে—আর কিছু চাপাতে হবে না।'

'তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে? ডাক্তার-টাক্তার কাউকে ডাকব? যদি হোমিওপ্যাথী খেতে চাও তো—কাছেই দীর্ঘাঙ্গী আছেন, তাঁকেও ডাকতে পারি। এখনও হয়ত বেরোয় নি কলে, বারোটার পর বেরোয়—।'

'না, না। কিচ্ছু দরকার নেই। তোমরা সবাই সব করেছ, এখন শুধু দয়া ক'রে একটু শুয়ে থাকতে দাও শান্তিতে—তাহলেই ঢের উপকার হবে।'

আর ঘাঁটাতে সাহস হল না নিমাইয়ের। আশ্বস্তও হল খানিকটা। অসুখ বিসুখ—বুকের ব্যামো বা সেরকম কিছু নয়—অভিমান, রাগ, ঐ জাতীয় কিছু।

'মরুকগে, যাকে মাথায় ক'রে নেচেছেলে সে যদি মাথায় নাথি মেরে থাকে—তার আমি কি করব। আমার ওপর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। আমাকে নিয়ে এত

আদিখ্যেতা করোও নি কখনও, আমার কাছে কিছু পিত্যেশাও করো না। জ্বালাই নি পোড়াই নি এই ঢের।…আমি তোমার উগ্‌গার করব, কাজে লাগব, ছেলের মতো দেখব—তেমন ব্যাভার তো করো নি কোনদিন। এখন দু'পক্ষ সমান করতে এলে চলবে কেন?'

আপন মনেই গজগজ করে সে রান্নাঘরে গিয়ে।

অবশ্যই অস্ফুট কণ্ঠে—হেমন্তর কানে না যায়।…

আর কোন শাসন কি পুলিশ ডাকা কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম কিছুই হল না দেখে গৌরও কিছুটা ভরসা পেল।

সে এবার আস্তে আস্তে—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে কলতলায় গিয়ে আগে পেট পুরে খানিকটা জল খেয়ে নিল, তারপর মুখ ধুয়ে ওপর ওপর একটু জল ঢেলে স্নানের চেষ্টা ক'রে—জল ঢাললেই কাটা জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠছে—কাপড় ছেড়ে বারান্দায় এক কোণে চুপ ক'রে এসে বলল।

নিমাই আড়ে সবই দেখল। এখন কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা দরকার কিনা—করলে গিন্নী খুশী হবেন না নারাজ হবেন—ভেবে ঠিক করতে পারল না। বিশেষ কিছু নেইও ঘরে—গোটা দুই সন্দেশ পড়ে আছে ঠাকুরের প্রসাদ। এ অবস্থায় সন্দেশ খেতে দেওয়াটা আবার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে, 'নাই' পেয়ে যাবে—নিজেরই মনে হল। তাই সে চেষ্টা আর করল না।

নিজেও স্নান সেরে এসে দু'জায়গায় ভাত বেড়ে—এখন বাড়তে গিয়ে দেখল তিনজনের মতোই চাল নেওয়া ছিল, নিত্যকার অভ্যাস কাজ ক'রে গেছে না স্বেচ্ছাকৃত কে জানে—ভাতের থালাটা এনে গৌর যেখানে চুপ ক'রে বসে ছিল—নীরবে সেইখানে নামিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে খেতে বসল।…

ও-বেলা মতির মা ঝি আসবে বলেছে। সুতরাং রান্নাঘর ধোওয়া কি বাসন মাজার দরকার নেই। সেগুলো রান্নাঘরেই গুছিয়ে রেখে দোরে তালা দিয়ে দিল। তারপর এক গেলাস শরবৎ তৈরী ক'রে হেমন্তর মাথার কাছে রেখে দিল ঢাকা দিয়ে, বলল, 'একটু মিছরির পানা রইল এখেনে—যদি তেষ্টা পায় তো খেয়ে নিও। শুধু শুধু আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি বলো—চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া বৈ তো নয়।'

বিকেলের দিকে হেমন্ত উঠে পড়ল। সংসারের কাজও করল কিছু কিছু, অভ্যস্ত প্রতিদিনের কাজ। ঝি এসে গিয়েছিল, পুরনো ঝি—তবু একবার তাকে কাজকর্মগুলো ঝালিয়ে দিতে হল, তারপর যথারীতি গিয়ে রাঁধতেও বসল। শুধু নিমাইকে ডেকে বলল, 'পারো তো একটা রাঁধুনী বামুন কি বামনী ঠিক করো। আমার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে—দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে পারব না। ঠিকে লোক হলেও চলবে, রাতদিনের হলেও আপত্তি নেই। নেবুতলার বাজারের কাছে উড়ে ঠাকুরদের একটা আড্ডা আছে, সেখানে খোঁজ করলে পেতে পারবে। আমাদের বাড়ি কাজ ক'রে গেছে পীতাম্বর, বনমালী—দুজনেই এখন হালুইকরের কাজ করে শুনেছি—তাদের বললে তারাই ঠিক ক'রে দেবে।'

রাত্রে গৌরকে সে-ই রুটি তরকারি বেড়ে ধরে দিল। গৌরও মাথা হেঁট ক'রে এসে

খেতে বসল। কথাবার্তা কোন তরফেই নেই সেটা একরকম বাঁচোয়া, গৌরের পক্ষে তো ভগবানের আশীর্বাদ। বুড়ির কথা বেতের চেয়ে কিছু কম ধারালো নয়।...এমন কি রাত্রে যখন মতির মাকে দিয়ে ওর বিছানাটাও পড়ার ঘরে পাতিয়ে দিল তখনও সে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতকাল হেমন্তর ঘরেই সামনাসামনি চৌকিতে শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল—সেখান থেকে এ নির্বাসনে ক্ষুন্ন হবার কথা—কিন্তু গৌর খুশীই হল। এটাই সে চাইছিল। এবার এসে পর্যন্ত ঠাকুমার সঙ্গে—সে এতকাল মা বলত—দিনরাত এত কাছাকাছি থাকা পছন্দ হচ্ছিল না। মুখ ফুটে না বলতেই যে ব্যবস্থাটা হয়ে গেল এ একরকম শাপে বরই হল বলা যেতে পারে।

এইভাবেই কাটল ক'টা দিন।

ইস্কুল যাওয়ার কথা কেউ বলে না আর—গৌরও যাওয়ার চেষ্টা করে না। খায় দায়, বাড়িতেই বসে থাকে চুপ ক'রে। বই-খাতা খুলে পড়বার ভানও করে না। ধরণীবাবুকে আগেই বারণ ক'রে পাঠিয়েছিল হেমন্ত, সে দায়েও নিশ্চিন্ত। কোথায় কিলবরণ না কি কোম্পানীর চুনের ভাটিতে একটা কাজের চেষ্টা দেখছে নিমাই—আড়াল থেকে শুনেছে, কিন্তু তাকে কেউই বলে নি কোন কথা।

ছ'সাতদিন পরে একদিন বিকেলে মতির মা দোকানে গেছে কি কিনতে, হেমন্ত কলঘরে কাপড়-কাচতে গা ধুতে ঢুকেছে—গোরা ছাদে বসে আছে দেখে কলঘরে ঢুকেছিল সে—এসে দেখল, ওর শোবার ঘরের গা-আলমারীটা খোলা, কেউ কোথাও নেই।...প্রথমটা ভেবেছিল ভুল, কারণ চাবিটা আলমারীর কপাটে ঝুলছে। তার পরই—বিদ্যুদ্বেগে সংশয়টা খেলে গেল মাথায়! সে দৌড়ে গিয়ে ছাদটা দেখে এল, নিচে-ওপরের পাইখানা, নিচের কলঘর, নিমাইয়ের ঘর, গৌরের বর্তমান শোবার ঘর—কোথাও গোরার কোন চিহ্ন নেই। সদর দরজাটা হা-হা করছে খোলা।

সেটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে আলমারীটা দেখল ভাল ক'রে। গয়নাপত্র, মোটা টাকা, দলিল-দস্তাবেজ এ আলমারীতে থাকে না, কিছু থাকে য়্যাটর্নীর কাছে, কিছু লোহার সিন্দুকে। সিন্দুকের চাবি ঠাকুরঘরে গুরুদেবের ছবির সিংহাসনে, ভেলভেটের আসনটা চাপা—তার অস্তিত্ব কেউই জানে না। কারও সামনে, এমন কি নিমাইয়ের সামনেও আজ পর্যন্ত সেখান থেকে চাবি বার করে নি কি রাখে নি।

এখানে থাকে সংসার খরচের টাকা, ভাড়া ইত্যাদি যখন যা ওয়াশিল হয়—কিছু বেশীই থাকে দরকারের চেয়ে, আকস্মিক কোন বিপদ-আপদের জন্যে—আর থাকে দু'চারটে সামান্য সোনার জিনিস। সেইখান থেকেই—ভাল ক'রে গুনে হিসেব মিলিয়ে দেখল হেমন্ত—ছ'শ টাকা আর দু'গাছা সোনার বালা অন্তর্হিত হয়েছে। কতকগুলো খুচরো বাইরে দেবার টাকাও ছিল—নিমাই বলে 'পেমেণ্টের টাকা'—বাড়ির ট্যাক্স্, ইলেক্ট্রিকের বিল (এই এক আপদ নতুন বাড়ল), পাইখানায় কাজ ক'রে গেছে 'পীতাম্বর' ক'দিন আগে তার মজুরী, বালি সিমেণ্টের দোকানে কিছু খুচরো দেনা আছে—সে সব টাকা আলাদা আলাদা কাগজের মোড়ক ক'রে নাম লিখে রাখা ছিল ছেঁড়া কাপড়গুলোর নিচে—সেগুলো ঠিকই আছে, সম্ভবত চোখে পড়ে নি।

আসলে খুবই তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছে। হেমন্তরই বোকামি, অথবা কথাটা মাথায়ই যায় নি—চাবির গোছা আগেকার অভ্যাসমতো বালিশের তলায় রেখে কলঘরে গেছে। এইটুকু মাত্র অবসর। গা-ধুতে পনেরো মিনিটের বেশী লাগে না কোনমতেই, তাও তার মধ্যে ঝি এসে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে—সুতরাং মিনিট তিন-চারের বেশী সময় দিতে পারে নি ; ওর ভেতর যেটুকু যা পেয়েছে হাতের সামনে—নিয়েছে। খরচের টাকা কোথায় থাকে তা সে জানে, সেইটেই নিতে গিয়েছিল, বালাটা উপরি লাভ। কোন ছুতোয় নিভার কাছে পাঠাবে বলে সিন্দুক থেকে বার ক'রে রেখেছিল ক'দিন আগে।

কাপড়-জামাগুলো দেখল, সে-সব কিছুই নিয়ে যায় নি। যা গায়ে-পরা ছিল, ধুতির ওপর শুধু কামিজটা চড়িয়ে নিয়েছে। বাড়তি কাপড় নিতে গেলে ব্যাগে ক'রে নিতে হয়—ইস্কুলে যেত রাঁচীতে পোর্টম্যাণ্ট নিয়ে, সে অসম্ভব—কাপড় হাতে ক'রে কি বগলে ক'রে নিয়ে যেতে গেলে কোন চেনা লোক দেখে ফেলতে পারে। তাহলেই নানা কৈফিয়ৎ, ডেকে জিগ্যেস করবে কোথায় যাচ্ছ কী বৃত্তান্ত—সেই ভয়েই নেয় নি। সময়ও পায় নি হয়ত।···

সব দেখে আলমারীটা আবার বন্ধ ক'রে চাবির গোছাটা আঁচলে বেঁধে নিল। চেঁচামেচি করল না, বিলাপও করল না। অতিরিক্ত কোন দুঃখ পেল বলেও বোধ হল না। বরং যেন একটা স্বস্তির—মুক্তির ভাব বোধ করল। কোন্ একটা অবাঞ্ছিত দায় থেকে যেন অব্যাহতি পেল। ক'দিন ধরেই গোরার উপস্থিতিটা কষ্টদায়ক বোঝার মতো বুকে চেপে বসেছিল, না পারছিল তাড়াতে না পারছিল আগের মতো সহজ হতে—দিনরাত একটা অশান্তি ভোগ করছিল। সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপনার লোক যখন পর হয় কি মনের বাইরে চলে যায়, তখন তার সান্নিধ্যটা অপরিচিত পরের চেয়েও অসহ্য বলে বোধ হয়।···

ঝি এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কাকা কোথায় মা, তাকে দেখছি না যে ?'

হেমন্ত মা, সেই সুবাদে গোরা ভাইপো। খাতির ক'রে কাকা বলে।

হেমন্ত সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিল, 'এক জায়গায় গেছে।'

মতির মা আর কিছু জানতে চাইল না, হেমন্তকেও মিথ্যা বলতে হল না বেশী।

কিন্তু নিমাই আপিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে যখন প্রশ্ন করল, 'তোমার গুণধর পেয়ারের নাতি কোথায় গেলেন—তাঁকে দেখছি না যে, সট্‌কালেন নাকি ?' তখন তাকে কথাটা বলতে হল। মিথ্যে বলে লাভ নেই, ক'দিন আর চেপে রাখবে ? চলে গেছে যে—সেটা তো বলতেই হবে।

নিমাই শুনে তখনই আবার জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে যাচ্ছিল।

'এই দ্যাখো ! এ-কথাটা এখনও বলো নি ! আসামাত্তরই বলবে তো ! এখুনি থানায় যাওয়া দরকার তাহলে।···ওরা হুলিয়া বার ক'রে দিক একটা। সহজে ছাড়ব না আমি।···যাবে কোথায়—ঠিক ধরা পড়বে। কী চেনে কলকাতার !···তুমি ভেবো নি, টাকা হয়ত পাঁচ ভূতে লুটে নেবে ইরি ভিত্‌রেই। তবে ওকে জব্দ ক'রে দোব। ইস ! শেষে চুরিটাও করলে ! ঐটেই বোধহয় বাকী ছিল আমাদের বংশে, চুরি ক'রে

জেল খাটা।'

হেমন্ত বাধা দিল, 'না না, এ নিয়ে থানা-পুলিশ হাঙ্গামা আমি করতে পারব না। আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই লাগে। তাকে জেলে দিয়ে কি আমার ইজ্জৎ বাড়বে? আমাদেরই বলবে লোকে—তোমরা মানুষ করতে পারো নি। ও থাক। কাউকে কিছু বলতে হবে না।...তাছাড়া এ তো ভালই হল—অল্পের ওপর দিয়ে গেল। এত সহজে অব্যাহতি পাব ভাবি নি আমি। আপনা থেকে ঘাড় থেকে নেমে গেল এই তো ভাল। নইলে ওকে নিয়ে কি-ই বা করতুম আমি!'

বলতে বলতে কি গলার আওয়াজটা গাঢ় হয়ে এল একটু?

কে জানে, ভাল ক'রে তাকিয়েও কিন্তু চোখে জল দেখতে পেল না নিমাই।

অগত্যা সে জামাটা আবার হুকে টাঙিয়ে রেখে সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য করল, 'ভাল!'

॥ ২০ ॥

দাদার মেজছেলে কলকাতায় থেকে চাকরি করে—এই খবরটুকু নিভার কাছ থেকে বার করতে পেরেছিল। ঐ একজনই কলকাতায় থাকে, ছোটটিকে কোন শিষ্য উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল, সেইখানেই কলেজে পড়ে, সম্প্রতি কোন ইস্কুলে মাস্টারীতে ঢুকেছে।

কলকাতায় থাকে এই খবরটুকু মাত্র পেয়েছিল, ঠিকানা পায় নি। বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই দেয় নি তখন—পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে দু-তিনখানা চিঠি লেখার পর নিভা ঠিকানা লিখে পাঠাল। কাছেই—সার্পেনটাইন লেনের ঠিকানা।

পরের শনিবার নিমাইকে পাঠাল হেমন্ত সুরেনের খোঁজে। ফিরে এসে নিমাই যা খবর দিল তাতে চোখ ফেটে জল আসার যোগাড়। মেসে থাকলে খরচ বেশী, তাছাড়া যে-কোন ঠাকুর-নামধারী লোকের হাতে খেতে হয়, তাদের অনেকেই বামুন নয়, চাকরির জন্যে একগাছা পৈতে গলায় ঝুলিয়ে মেসে-হোটেলে রাঁধতে আসে। তাছাড়া সেও সত্তিক জাতের ছোঁয়া-নেপা; বাসনপত্র ভাল ক'রে মাজা হয় না—বলতে গেলে সকলকার এঁটো খাওয়া। সুরেন তাতে রাজী নয়। ওদের বাড়ির নিয়ম-সংস্কার অনেক ত্যাগ করেছে—গুরু-বংশের প্রায় সমস্ত রকম কড়াকড়ি, নিষ্ঠা—এইটুকু এখনও ছাড়তে পারে নি।

এই সব কারণেই সে একটা ঘরভাড়া ক'রে থাকে। সার্পেনটাইন লেন অনেক দিনের গলি, চারিদিকেই বড় বড় বাড়ি। কিন্তু ওদেরটা পাকা বাড়ি নয়। মাটকোঠা যাকে বলে তাই। দেওয়াল মাটির, টিনের চাল। তবে তার মধ্যেও দোতলা; একতলার ছাদ বা দোতলার মেঝে, যা-ই বলুন, কাঠের ওপর আধ পাকা অর্থাৎ একটু চুন-সুরকী খোয়া পেটা আছে তার ওপর মাটি লেপা। একতলার ঘরের মেঝেগুলো বিলিতি মাটির—কিন্তু ওপরে অত খরচ করতে পারেন নি বাড়িওলা। ঐটুকুই করেছেন, যাতে দৈবাৎ জল-টল বেশী পরিমাণ পড়ে গেলেও নিচের ঘরে না পড়ে সেই জন্যে। দোতলার দেওয়াল অবিশ্যি মাটির নয়; করোগেট টিনের, কাঠের ফ্রেমে আটকানো।...এমন হাল্‌কা ফঙ্গবেনেভাবে তৈরী যে, দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে

গেলে কি কোন ঘরের মেঝেতে জোরে পা ফেললে ওপরতলার সব মেঝেটাই নাচতে থাকে।

এই মাটকোঠারই একটা ঘর নিয়ে থাকে সুরেন।

একটা গোটা ঘর নিয়েই থাকে, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায়। অন্য অন্য ঘরে তিন-চারজন পর্যন্ত আছেন, ঐ ভাড়াই ভাগ ক'রে দেন। তবে তাঁরা বেশির ভাগই বাইরে, হোটেলে বা অন্য কারও মেসে খান। সুরেন নিজে রান্না করে—তোলা উনুন ধরিয়ে। ফলে ঐ ঘরের মধ্যেই কেরোসিন-কাঠের বাক্সে কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি রাখতে হয়। বেশী পয়সা দিয়ে দোকান থেকেই কয়লা ভাঙিয়ে আনায়, তাও স্থানাভাবে দশ-পনেরো সেরের বেশি একসঙ্গে আনা যায় না। যারা নিচের ঘরে থাকে তারা উঠোনটা পায়, বাঁধানো উঠোন। কিন্তু সেটা এত নোংরা ক'রে রাখে সেইজন্যেই যে, সুরেন নিচের ঘর নেয় নি। নইলে ভাড়াও এক টাকা কম হত।

ঘুঁটে কয়লা ছাড়াও, ঐ এক ফালি ঘরের মধ্যেই মাটির হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাঁড়ার থাকে। পেতলের বোগ্‌নো, চাটু কড়া থালা বাসন সব। মায় কলসীতে জল—একটা খাওয়ার, দু'টো রান্নার। এরই মধ্যে এক প্রান্তে একটি সংকীর্ণ, সামান্য বিছানা—শতরঞ্জি কম্বল আর চাদর পাতা ; শীতকালের কী একটা—লেপ বা কাঁথা—পুঁটুলি বাঁধা বাঁশের আড়াতে টাঙানো।

ব্যারাক-মতো বাড়ি, নিচে-ওপরে টানা দু'হাত বারান্দার গায়ে সারবন্দী ঘর পাশাপাশি, চারখানা ক'রে। নিজে রেঁধে খায় বলে একেবারে কোণের ঘরটা নিয়েছে সুরেন। ফলে সমস্ত জল নিচে থেকে টানতে হয়—দু'টো টানা বারান্দা পেরিয়ে বালতি ক'রে তোলা। রাত্রে যখন আসে তখন কলে জল থাকে না বেশিরভাগ দিনই, তাই ভোর চারটেয় উঠে, এই জল বই করে প্রত্যহ। রাত চারটেয় না উঠলে অতক্ষণ কল কেউ ছেড়ে দেবে না। আর এত নোংরা ক'রে কলতলা যে, ভাল ক'রে না ধুয়ে নিজের রান্না-খাওয়ার জল নিতে ইচ্ছে করে না সেখান থেকে।

জল বওয়া ছাড়া বাসনও মাজতে হয় মধ্যে মধ্যে। একটা ঠিকে-ঝি আছে বাসন মাজার জন্যে, মাসিক এক টাকা মাইনে নেয়। ভোরে এসে মেজে দিয়ে যাবে এই কথা—কিন্তু দেরি হয়ে গেলে, মানে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলে আর অপেক্ষা করতে পারে না। তখন মেজে না নিলে পড়েই থাকবে সারাদিন। এমনিই একটু সময় হাতে রাখতে হয়, ঝি মেজে দিয়ে গেলে স্নানের আগে বাসনগুলো একবার ধুয়ে দেখে নেয় নিজে। এক-একদিন ওর বাসন মাজা শেষ হবার পর ঝি এসে পড়ে।

'কিন্তু উপায় কি বলুন ?' সুরেন বলেছে, 'এক টাকা মাইনে দিয়ে তো আর তার মাথা কিনে নিই নি। তার হাতেও কিছু ঘড়ি বাঁধা নেই। রোজ যদি ঠিক সময়ে তার ঘুম না ভাঙে তো দোষ দেওয়া যায় না। আমি কোম্পানীর চাকরি করি—ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে বাধ্য, সে তো আমাদের মতো ফক্কিগড়ের নবাবের কাজ করে, তার অত কিসের বাধ্যবাধকতা বলুন ?'

রান্নাটা একবেলাই করে সুরেন। ফলে খাওয়ার ধারাটা বড় বিচিত্র। আপিস থেকে ফিরে এসে উনুনে আঁচ দিয়ে ভাত রুটি দুই-ই করে। রাত্রে ভাতটা খায়—

রুটি আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু ভাজাভুজি, শীতকালে তরকারিই থাকে—সকালে খেয়ে আপিসে চলে যায়। বাধ্য হয়েই নাকি এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাকে। পোর্ট কমিশনারের আপিসে কাজ করে, সকাল আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে হয়। শীতকালে সাড়ে ছ'টাতেও ঘোর ঘোর থাকে, তখন তার মধ্যে রান্না ক'রে খেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থা বদলায় শুধু রবিবারে। তবে সেদিন দিনের বেলায় রান্না হয় যেমন, তেমনি সোমবার চিঁড়ে খেয়ে আপিসে যেতে হয়। সকালের রুটি পরের দিন সকালে খেয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে চিঁড়ে-গুড় ঢের ভাল।

অবশ্য মাসে একটা রবিবার বাড়ি যায়, সেদিনটায় রান্নার ছুটি। ঐ একটা দিন মায়ের হাতে খেতে পাবে সেই আশায় মাসের বাকী ঊনত্রিশ দিন দিন-গোনে। তার জন্যে গাড়ির ধকল বড় কম সইতে হয় না, খরচও হয় বিস্তর, তবু মাসে অন্তত একদিনও মা-বাবা-ভাইদের দেখতে না পেলে যেন হাঁপ ধরে ; শারীরিক কষ্ট অনুভব করে একটা।

নিমাই অনেক ক'রে—কাকুতি-মিনতি ক'রে বলে এসেছিল—হাত-জোড় ক'রে বলেছিল, নইলে জ্যাঠাইমা নিজেই এসে হাজির হবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছিল—হয়ত সেই কারণেই সুরেন পরের দিন দুপুর বেলা এসে দেখা করল।

এই প্রথম দেখল হেমন্ত। এতদিন পরে। সুন্দর দেখতে, সুপুরুষ যাকে বলে তাই। ওদের বংশের মতোই চেহারা পেয়েছে। বয়সে নিমাইয়ের থেকে কমই হবে, হয়ত সাতাশ-আটাশ, কি আরও কম।

দু'জনেরই দু'জনের সঙ্গে এই প্রথম দেখা। একটু আড়ষ্ট ভাব তো থাকবেই। সুরেনেরই বেশি। অনেক শুনেছে সে এই পিসীর সম্বন্ধে। অনেক খারাপ কথাও শুনেছে। বাপের মৃত্যুশয্যাতে খবর পেয়েও দেখতে আসে নি। দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমনি অনেক কথাই।

হেমন্তর লজ্জার চেয়ে কুণ্ঠাই বেশী। কতটা শুনেছে এ ছেলেটা কে জানে, সে হৃদয়হীন অমানুষ—শুধু এইটুকু, না আরও ঢের বেশী? সে দাইয়ের কাজ করেছে, স্বভাব-চরিত্র খারাপ—এ ধরনের কথাও? সেইটে আঁচ করতে না পারার জন্যেই তার অস্বস্তি, কুণ্ঠা বেশী।

সহজ ক'রে দিল নিমাইচরণই কতকটা। সুরেনের জীবনযাত্রার বিবরণী কালই ফিরে এসে যথেষ্ট দিয়েছে—সেইটেরই আবার আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করতে বসল, কিছু বাড়তি রঙ, টীকাটিপ্পনী সুদ্ধ। মানুষেরই স্বধর্ম এটা। কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে প্রতিবারেই কিছু কিছু কাল্পনিক কথা যোগ হয়, ক্রমশ সেগুলো বক্তারও বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। অনেক সময় যেটা ভুলে যায় সেই ফাঁকটা কল্পনায় ভরায়—নিজেও সেটা সত্য ভাবে। এক্ষেত্রেই বা তার অন্যথা হবে কেন? ফলে লজ্জা পেয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল সুরেন, আর সেই প্রসঙ্গে হেমন্তও দু'টো বলবার মতো কথা পেল। এইভাবেই প্রথম দিককার আড়ষ্টতা কমে এল আস্তে আস্তে।

এইবার জানা গেল নিভা সুরেনকেও পিসীর ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখেছে, দেখা করতে লিখেছে বার বার। পিসীর প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ, অমন ভালমানুষ যে কেউ হয়,

মানুষকে অমন ভালবাসতে পারে—তা তার জানা ছিল না। পিসীর সম্বন্ধে ওদের যা ধারণা ছিল তা নাকি সব ভুল, নিশ্চয়ই ভুল-বোঝাবুঝির ওপরই এতটা ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া পিসীর ওপর যে তাঁর বাবা অনেক অবিচার করেছিলেন সে তো সুরেন বাবার মুখেই শুনেছে। ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ গল্প করার পর—যে কথাটা সেই প্রথম থেকে বলার জন্য উশখুশ করছিল, সঙ্কোচে বলতে পারে নি—সেইটেই ভরসা ক'রে বলে ফেলল হেমন্ত। যেরকম নিষ্ঠার কথা শুনছে, বলতে সাহস হয় না—বাজারের সন্দেশ-রসগোল্লা খাবে তো সুরেন?

'খুব, খুব!' সুরেন লজ্জা পায়, 'নিমাইদার কথা শোনেন কেন!···কলকাতায় বাসা ক'রে থাকি, আপিসে চাকরি করি—আমার আবার নিষ্ঠা! নেহাৎ সতেরো জাতের এঁটোটা খেতে একটু বাধে এখনও, তাই মেসে থাকি না। তাছাড়া খরচের কথাও তো আছে! এ আমি এক-তরকারি-ভাত খাই—মাছ-ফাছের বালাই নেই- দশ টাকার মধ্যে হয়ে যায়। কয়লা ঘুঁটের খরচ ধরেও। মায় কেরোসিন তেল সুদ্ধ। মেসে থাকলে যেমন-তেমন ক'রে চোদ্দ-পনেরো টাকা লাগবে। মাইনে পাই মোটে চুয়াল্লিশ টাকা, তার মধ্যে ট্রাম ভাড়াতেই তিন সাড়ে তিন বেরিয়ে যায়—বাকী টাকার মধ্যে কী-ই বা খাব আর কী-ই বা পাঠাব বলুন? সেখানে মা বাবা ভাইবোন বলতে গেলে উপোস ক'রে কাটায় অর্ধেক দিন—আমার মুখে এখানে মাছভাত আরামের খাওয়া রোচে? মনে হয় চারটে পয়সা বাঁচাতে পারলেও অনেকখানি সাশ্রয়। শুধু খাওয়াই তো নয়—আপিস করতে হয়, জামাকাপড় জুতো এসবও তো আছে। মাসে ক'টা টাকাই বা পাঠাতে পারি!'

আবারও যেন চোখ উপ্‌চে জল বেরিয়ে আসতে চায়। এখানে এই বেইমানের ঝাড়ের জন্যে কত টাকা খরচ করেছে সে, বার বার। এখনও করছে। নিজের ভাই-ভাইপো-ভাইঝিরা উপোস ক'রে দিন কাটাচ্ছে। এমন ভদ্র বিবেচক সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েরা!···

একটু চুপ ক'রে থেকে উদগত অশ্রু সামলে নিয়ে বলে, 'তা যখন বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বাবা, আমি খোলাখুলি কথা জিজ্ঞেস করছি, তুমিও খোলাখুলি উত্তর দিও এইটুকু অনুরোধ—আমি যদি লুচি-পরোটা ভেজে দিই, তুমি খাবে? আমার অবশ্য নিরিমিষের বাসন সবই, ওরা মাছ খেলে নিমাই নিজেই রেঁধে নেয় আজকাল, সে-সব কড়াখুন্তি আলাদা।'

এতখানি জিভ কেটে হাত জোড় করে সুরেন। বলে, 'আমাকে কি পেয়েছেন বলুন তো! ছি-ছি, এসব কথা বলে কেবল আমায় অপরাধী করা! আমি কি গুরুদেব এসেছি আপনার? আপনিই তো গুরুজন বরং। আপনার হাতে খাব না কেন? কত বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি খেয়ে আসছি, ব্রাহ্মণ ছাড়াও যাঁদের জানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আচার-বিচার আছে—তাঁদের বাড়িও লুচি-পরোটা খেয়েছি। ভাত তাঁরা কোনদিন খেতে বলেন নি, আমিও খাই নি। তাছাড়া নিরিমিষের কড়া কিসের? আমি মাছ-মাংস খাই না এমন তো নয়। এখানে খাই না—পয়সার প্রশ্ন তো আছেই, তবে এক-আধদিন কি আর খেতে পারি না—অত ঝঞ্ঝাট করে কে? মাংস অবিশ্যি, বৃথা-

মাংস কোনদিন বাড়িতে রান্না হয় না, তবে খাব না এমনও কোন প্রতিজ্ঞা নেই আমার।'

মুগ্ধ হয়ে শোনে হেমন্ত। যেমন নিভার তেমনি এরও। কথা শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। এতদিন এইসব কাঞ্চন ফেলে কী সব ভাঙা কাঁচ বেঁধেই না জীবনের আঁচল ভারী ক'রে রেখেছিল!

সন্দেশ আনানোই ছিল, সুরেন আসবে আশাই করেছিল ওরা, তখনকার মতো জল খেতে দিয়ে—চা বিশেষ খায় না সুরেন, মানে নিয়মিত খাওয়ার কোন অভ্যেস নেই তা আগেই বলে দিয়েছিল—উনুনে আঁচ দিয়ে দিল। তারপর নিমাইকে দিয়ে মাছ আনিয়ে লুচি তরকারি মাছের কালিয়া রেঁধে সামনে বসিয়ে পরিপাটি ক'রে খাওয়াল।

সুরেনও বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেল। নিজেই স্বীকার করল বহুকাল এত সুখাদ্য পেটে পড়ে নি। নিজের হাতের সেদ্ধ পাঁচন খেয়ে খেয়ে মুখে চড়া পড়ে গেছে, আজ যেন জিভটা ছাড়ল। মাছের কালিয়া বিশেষ ক'রে—খুবই ভাল হয়েছে, হালুইকরদের মতো।

'তুমি যদি রোজ এসো ভায়া, তুমিই বলছি কিছু মনে ক'রো না—' নিমাই খেতে খেতে আরামে চোখ বুজিয়ে বলল, 'তাহলে আমাদেরও মুখে ছড়াঝাঁট পড়ে। অন্য রান্না অবিশ্যি উনিই করেন, কিন্তু মাছ তো আমাদের ভাগে—কী আর রাঁধব বলো, ঐ এক ঝাল দিয়ে—ফি রবিবারেই রাঁধা বরাদ্দ। জ্যেঠাই রেঁধে দিতে চায়, মিথ্যে বলব কেন—আমিই রাঁধতে দিই না। আজকাল আবার বাতিক হয়েছে, মাছ রান্না করলে চান না ক'রে কিছু খায় না। কাঁহাতক আর কষ্ট দিই বুড়িকে!'

চমকে ওঠে সুরেন, 'এই রাত্তিরে এখন চান করবেন আবার! ইস, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল তো! মাছের কথাটা না তুললেই হত। মাছ খাই না ধরে নিয়েছিলেন, সে ভুল না ভাঙলেই ভাল হত!'

'না ভাঙলে সেটাই অন্যায় হত বাবা। এখন গরমের দিনে একবার চান করব তাতে কষ্টটা কি? এমনিই তো দু'বার-তিনবার চান করি।'

খেয়ে উঠে আঁচিয়ে বাসায় ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, হেমন্ত বলল, 'লুচি অনেক রয়েছে, নিরামিষ দিকেই তো সব, লুচি আর আলু-পটল ভাজা একটা জায়গায় একটু বেঁধে দিই না? কাল সকালের তো কিছু নেই—খেয়ে যেতে? নিরিমিষ ভাজা—রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে কি দোষ হবে?'

'তা হবে না।' সুরেন অপ্রতিভভাবে হেসে বলে, 'কিন্তু রাত্রে অনভ্যেসের পেটে গুরুপাক এইসব খাওয়া হল—রীতিমতো পাকা ফলার যাকে বলে—তার ওপর আবার কাল সকালে লুচি সহ্য হবে না, ভালও লাগবে না। ও আমার চিঁড়েই ভাল। যাবার সময় দু'পয়সার দই নিয়ে যাব—দোকানের হাঁড়িচাঁচাগুলো এক জায়গায় জড়ো করা থাকে, সে পেলে দু'পয়সায় এতখানি দই হবে—তোফা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চিঁড়ে-দই দিয়ে দধিমঙ্গল করা যাবে'খন ভোরবেলা।'

'তা দুপুরে টিফিন করো কি?'

'কী আর করব? ওখানে কি কিছু পাওয়া যায়? আর পাওয়া গেলেই বা পয়সা কোথায়? যেদিন শুধো ছোলাভাজা-টাজা পাই—এক-আধ পয়সায়—সেদিন পেটে

পড়ে, নইলে ঐ একেবারে ফিরে এসে—।...ও আজকাল অব্যেস হয়ে গেছে, দরকারও হয় না। জলই মেলে না অর্ধেক দিন, একটু বাই আছে তো, গিয়ে যেদিন নিজে কল থেকে জল নিয়ে গেলাসে ক'রে রাখতে পারি সেদিনই খেতে পাই, নইলে সে গুড়েও বালি।'

জুতো পরতে পরতেই বলে সে।

'তা কবে আবার— ?' প্রশ্নটা শেষ করে না, উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে হেমন্ত।

'আবার কবে ?...দেখি !'

'না না, দেখি-টেখি নয়। সামনের রবিবারে অবশ্য আসবে। দুপুরে বরং এখানেই দুটি ঝোলভাত খেয়ো, কেমন ? না, আপত্তি হবে ?'

'কিছু হবে না। কী যে বলেন— ! আচ্ছা তাই হলো, দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ আসব।'

'না, মনে যদি কোন খুঁৎ থাকে—'

'আবার ঐ সব কথা ? তাহলে আর আসবই না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। দু'বেলাই খেয়ে একেবারে রাত্রিতে ফিরবে, পরের দিনের সকালের খাবার নিয়ে।'

'না, ঐটে করবেন না। দোহাই ! দু'বেলা আপনার এখানে খাওয়া, সে-ই তো রাজসূয় যজ্ঞ, তার ওপর আবার পরের দিন সকালে লুচি খাওয়া চলবে না। আর একটা কথা—যদি রবিবার রাত্রেও খেতে হয়, ভাত কি রুটি দেবেন। এত ঘি মরা পেটে সইবে না।'

সে হাসিমুখে প্রণাম ক'রে চলে গেল। হেমন্ত ছলছল চোখে তার নিষ্ক্রমণ পথের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইল।

নিমাই বললে, 'বেশ ছোকরা, না ?'

হয়ত 'বেড়া-নেড়ে-গেরস্তর-মন-বোঝা'র মতো ক'রেই বলল সে। হেমন্ত কোন জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইল। কিন্তু তার মনও যেন চিৎকার ক'রে এই কথাটাই বলতে চাইছিল। বেশ ছেলেটি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কথাবার্তা শুনলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এই ছেলেকে যে গর্ভে ধারণ করেছে, যে আপন ক'রে পেয়েছে—তার তুল্য সৌভাগ্যবতী তার তুল্য ঐশ্বর্যশালিনী কে আছে ! তারই তো জন্ম সার্থক। হোক সে গরীব, এত তো পয়সা হেমন্তর, একলা মেয়েছেলে হিসেবে অনেক পয়সা—তবু সে আজ সুরেনের মাকে ঈর্ষাই করছে। এমন ছেলে থাকলে জন্ম-জন্মান্তর পরের বাড়ি ঝাঁট দিয়ে বাসন মেজে খেতেও রাজী ছিল।

আসল কথাটা—যেটা ঠোঁটের ডগায় এসে আটকে আছে—প্রথম দিন বলি-বলি ক'রেও বলা হয় নি। একেবারে প্রথম দিনই বলাটা অশোভনও হত।

পরের রবিবার দুপুরের খাওয়া শেষ ক'রে মাদুরে শুয়ে গড়াচ্ছে সুরেন, কাছে বসে কথাটা পড়ল।

'একটা কথা বলব বাবা ? কিছু মনে করবে না তো ?'

'সে কি কথা! আপনি সব ব্যাপারে অত "কিন্তু" হন কেন বলুন তো?··· এতকাল পর হয়ে ছিলেন—তাই? কিন্তু সে তো বাবার মুখে শুনেছি—বাবা বিশেষ মিথ্যে কথা তো বলেন না—যে, সে তাঁদেরই অন্যায়, বাবা বলেন অপরাধ। পিতৃনিন্দা করবেন না বাবা কোন কারণেই—তবু আকারে-ইঙ্গিতে যা শুনেছি, ছোটকা তো স্পষ্টই বলেন, সবচেয়ে সে জন্যে দায়ী ছিলেন আমাদের ঠাকুর্দামশাই-ই। সে অবস্থায় অন্য যে কোন লোক হলেই আত্মহত্যা করত, আপনি যে নিজের চেষ্টায় সৎপথের উপার্জনে দাঁড়িয়ে ছিলেন—সে-ই তো আপনার বাহাদুরী।'

কে জানে আরও কতটা শুনেছে, সবটা শুনেছে কিনা—বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে হেমন্তর—বিবেচক ছেলে ইচ্ছে ক'রেই অন্ধকার দিকটা চেপে গেল কিনা!

তবু অনেকটা ভরসা পেল বৈকি!

আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'তাই যদি মনে করো—এতদিন জানতুম না কে কোথায় আছে, সেইজন্যেই খোঁজ করতে পারি না—এত বড় বাড়ি খালি পড়ে, আমিও একা থাকি দেখছই তো, দেখার লোক বলতে তো ঐ এক নিমাই, তা ওরও মতিগতি কেমন হবে জানি না, ও বংশের কাউকেই আমার বিশ্বাস নেই—তাহলে তুমি ওখানে অত কষ্ট ক'রে পড়ে থাকছ কেন আর? মিছিমিছি এই খাটুনি! একা ওপরে জল তুলে নিয়ে গিয়ে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া! শরীর কি টিকবে এতে? বারোমাস বাসি রুটি খেয়ে আপিস যাওয়া! এখানে তো নিমাইকেও আমার সাতটার মধ্যে ভাত দিতে হয়, মাঝে মাঝে একটা ঠিকে বামুন কি বামনীও রাখি—তা সে নবাব-বেগমের দল—তো আসেন সাতটা সাড়ে সাতটায়—ততক্ষণে নিমাই খেয়ে বেরিয়ে যায়। আমার কিছু বেশী খাটুনিও হবে না। এখানেই থাকো না এখন থেকে?···না-না, কথা শেষ করতে দাও, তারপর উত্তর দিও—ভেবে দেখে ভাল ক'রে। আমি তোমার সম্মানহানি করতে চাই না। তোমার ওখানে যে খরচ পড়ছে—মায় ঘরভাড়া সুদ্ধ—আমাকে ধরে দিও, আমি হাসিমুখে হাত পেতে নোব, তাহলেই হল তো?'

'তা ঠিক হল না পিসীমা।' উঠে বসে দু'হাত জোড় ক'রে বলে সুরেন, 'অনেক তফাৎ, অনেক ফাঁক থেকে যায়। ঐ হুকুমটি আমাকে করবেন না। একথা যে আপনি পাড়বেন তা আমি জানতুম। সত্যি কথা বলতে কি—এখানে আসার আগে, আপনাকে দেখার আগেই ভেবেছি। নিভার চিঠিতে আপনার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, আর এই গরজ ক'রে নিমাইদাকে পাঠানোতেই—তাতেই জানি—এ উত্তর আমাকে দিতে হবে।'

তারপর একটু থেমে, আস্তে আস্তে বলল, 'না পিসীমা, এ কোন রাগ কি অভিমানের কথা নয়, কিংবা আমি এখানে থাকলে বাবা যে ক্ষুণ্ণ কি বিরক্ত হবেন তাও না। আমারই আপত্তি। যতই হোক—আমার যেটকু দেবার ক্ষমতা, এখানে যে রাজভোগে থাকব, তার তুলনায় সে কিছুই নয়। ওটা মনকে স্তোক দেওয়া মাত্র। আর কি জানেন, আরাম একবার অভ্যেস হয়ে গেলে—না পেলে বড় কষ্ট। নিজের সাধ্যমতো চলাই উচিত নয় কি? চাল বিগড়ে গেলে হয়ত এই টাকা ভেঙেই বিলাসে খরচ করব—মা-বাবা, ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে। সেটা ভাল নয়। যতই হোক, আজ আমাকে ভাল লাগছে—একদিন মাত্র দেখেছেন, আমার স্বভাব আচার-আচরণ কিছুই জানেন না—এর

পর যদি ভাল না লাগে তখন আবার পুনর্মূষিক হতে হবে তো ? না-না, আপনি বলেও বলছি না, আমার মতে বাপের পয়সা থাকলেও—বড় হলে, নিজে রোজগার করতে শুরু করলে নিজের আয়-মতোই চলা দরকার। বাবাও যে সব সম্পত্তি ছেলেকে দিয়ে যাবেন তার মানে কি? আর দিয়ে যাওয়াও তো মরবার সময়, নিশ্চিত পাবে তো বাপ মরার পর—। কত বড়লোকের ছেলেকে তো দেখছি, বিয়ে-থা করার পর বৌয়ের সঙ্গে বাপ-মার বনিবনাও হয় না—আলাদা হয়ে গিয়ে তারপর ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে। বাপের কাছে টাকা চাইবার মুখ নেই, নিজেরও মুরোদ নেই। বুঝলেন না ?'

হাসল হেমন্ত। ম্লান করুণ হাসি। বলল, 'বুঝলাম। খুব সুন্দর ক'রেই বললে বাবা, আমার যাতে আঘাত না লাগে তার জন্যে অনেক গুছিয়ে-সাজিয়ে বললে, তবু আসল কথাটা বুঝতে পারলুম বৈকি !···আমারই হয়ত ভুল হল, একটু বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কথাটা পাড়া। আর কিছুদিন না গেলে আমাকে তোমার চেনার সুযোগ হবে না। তার আগে হুট ক'রে এখানে এসে ওঠা সম্ভবও নয়।···যাক, তাহলে আজই জোর-জবরদস্তি করব না। তবে রবিবারগুলোয় তোমার দেখা পাব তো ?

'তা পাবেন, তবে সব রবিবারে তো হয়ে উঠবে না। মাসকাবারের পর একটা রবিবার ক'রে বাড়ি যাই। তা-ছাড়াও অন্তত আর এক রবিবার যাওয়া উচিত, মাঝে মাঝে যাইও। তা-বাদে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি—এদিক-ওদিক যেতে হয় মধ্যে মধ্যে। তবে তা হলেও—এখানে থাকলে যখন হোক একবার ঘুরে যাব। দিনে না খাই, রাত্রে খেয়ে যাব, কিংবা উল্টোটা—সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাই হবে। তবে আর একটা অনুরোধ রইল বাবা, কোনদিন যদি আপিস থেকে বেরিয়ে শরীর খারাপ লাগে—এমনিও অনেক সময় ইচ্ছে করে না ফিরে গিয়ে রান্নাবান্না করতে—সে-সব দিনে অবিশ্যি এখানে চলে এসো। এখানেই চান-সন্ধ্যে সেরে খেয়ে যেয়ো। পরের দিনের খাবার না নিয়ে যেতে চাও না-ই গেলে—রাতটা তো নিশ্চিন্ত !'

একটু হাসল সুরেন।

নানাদিক দিয়েই স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চাইছে হেমন্ত—সেটা সে বুঝেছে, এ হাসিতে যেন সেইটেই জানিয়ে দিল। তারপর শুধু বলল, 'দেখা যাক। তবে তেমন খারাপ লাগলে অনেক সময় চান-সন্ধ্যেও করতে ইচ্ছে ক'রে না, মনে হয় কোথাও গিয়ে এখুনি শুয়ে পড়ি। কিন্তু সে-সব কথা আগে থেকে ভেবে লাভ নেই।'

॥ ২১ ॥

হেমন্তর কথাটাই ঠিক। কিছুদিন পরে অনেকটা সহজ হয়ে এল সুরেন। এ-বাড়িতে এসে উঠল না বটে, তবে আসার মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেল। সপ্তাহের মধ্যেও এক-আধ দিন এসে পড়তে লাগল। রবিবারের তো—যে রবিবারে কলকাতায় থাকে—হয় সকালে নয় বিকালে একবার ক'রে আসেই। নিতান্ত আসবার মতো অবস্থা না থাকলে সে অন্য কথা। তাও এক রবিবার কোন বন্ধুর বাড়ি কী কাজে সেওড়াফুলি যেতে হয়েছিল—তার আগের দিন শনিবার রাত্রে এসে দেখা ক'রে বলে গিয়েছিল।

তবে আজকাল প্রায়ই কিছু-না-কিছু হাতে করে আনে, পিসীমা যা খেতে ভালবাসে

এমনি সব—ডাঁসা পেয়ারা, যশোরের আতা, সিমলে থেকে একটু ভাল দই—এই ধরনের জিনিস। কুন্ঠিত হয় হেমন্ত, বেচারীর অত দুঃখের হিসেব করা পয়সা এইভাবে খরচ করছে বলে, আবার আনন্দিতও হয়। কেউ তো এমন আনে নি কখনও, পূর্ণবাবু যাবার পর। কুণ্ঠিতই বেশী হয় যখন ওর সামান্য আয়ের কথা ভাবে, তবু বারণও করতে পারে না পাছে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

তবে এও সে জানে—হেমন্তকে চেনা ও জানার সুযোগ পাওয়ার পর তার আসাটা বেড়েছে বটে—কিন্তু কারণটা সে যা ভেবেছিল তা নয়—সম্পূর্ণ আলাদা। পিসীর প্রতি দয়া ক'রে—দয়া কথাটা নিজের কানেই আঘাত করে—মমতাতেই আসে। পিসীটা যে কত দুঃখী, কত নিঃসঙ্গ, কী বিপুল শূন্যতা সে দিনরাত বহন করছে মনের মধ্যে—সংসার পাতার কত সাধ, অদৃষ্টের বিদ্রূপে ও বিরূপতায় সেই সাধই বার বার কী নিদারুণ পরিহাসে পরিণত হচ্ছে, কী নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক সে ভাগ্যের বক্রতা—এতদিনে সে নানা প্রসঙ্গে অতীত দিনের টুকরো টুকরো নানা কাহিনীতে ভাল ক'রেই জেনেছে। সেইজন্যেই সে আসে, নিজের আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, ভাল খেতে পাবে বলে আসে না। বরং এটা-ওটা—বলে বলে, ফরমাসের ছলে, নিজের বাড়ির মতো খাওয়ার জন্যে ওর মন কত ছটফট করে, সেই কথা শুনিয়ে—খাওয়াটা অনেক সাধারণ ক'রে এনেছে। নিরিমিষের দিকেই বেশী যায়—মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্তো চচ্চড়ি ইত্যাদিতে। এইগুলোই ফরমাশ করে বেশী, খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

এ-কৌশলটা যে হেমন্ত না বোঝে তা নয়। যাতে দু'বার ক'রে রান্নার বেশী ঝামেলা না থাকে, ওদের পাঁচরকম মাছ-মাংস রান্না ক'রে খাইয়ে নিজেকে না ভাতে ভাত খেতে হয়।

এ-ব্যবস্থায় নিমাইচরণ খুশী হয় না তা বলাই বাহুল্য। পরিহাস-ছলে প্রকাশ্যেই অনুযোগ করে। বলে, 'তোমার দৌলতে বেশ খাওয়া-দাওয়াটা চলছিল, তুমি ঘোড়ার ডিম আবার সেই বিধবার খাওয়া ধরলে! থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়—সেই যে কী বলে না, তা এও তো সত্যি সত্যিই তাই। কী আছে এতে? এ তো চিরকালই খাচ্ছি। দেশে তো এ-ই। পুকুর কি বিলের ধারের শাক—নয়তো সজনেশাক আছে বারোমাস গাছে—খাড়া, ডুমর, থোড়, কাঁচকলা—বাগানে যা হয়, বাজার করার তো ক্ষ্যামতা নেই—এর বেশী কিছু জোটে না। কোন বাবু কোনদিন পুকুরে ছিপ্ ফেললে তো মাছ। সে ধরো ন'মাসে ছ'মাসে একদিন। এই শাক-চচ্চড়ি খেয়েই জম্মকাটা বলতে গেলে।··· অবিশ্যি নিরিমিষও জ্যাঠাই রাঁধে ভাল তা মানছি, চচ্চড়ি তো বলতে পারি অমন কেউ রাঁধতে পারবে না, রাজা পঞ্চম জর্জকে খাওয়াতে পারলে বিলেতের চাটিবাটি তুলে এই কলকেতায় এসে বসত—তবু এ তো খাচ্ছিই চিরকাল। এখন এই পাঁচরকম মাছ-টাছ পেলে আবার একটু নতুন হয় তবু উঁর মধ্যে—'

'আমার আবার ঐ পুরনো খাওয়াটাই যে হয় না দাদা। বারো মাসই তো হয় ডাল-আলুভাতে, হয়তো একটা সেদ্ধপক্ক তরকারী, এই তো বরাদ্দ। বাটনা বাটতে পারি না—যা করে ঐ ফোঁড়ন ভরসা, তার সঙ্গে একটু নুন একটু মিষ্টি এই তো। মুখে যে সাতপুরু ছ্যাতলা পড়ে গেল। বাড়ি যাই মাসে একদিন, তা ধরুন শনিবার রাত্তিরে

গাড়ি চাপি, বাড়ি পেঁছিতে সকাল সাতটা বেজে যায়, আবার সন্ধ্যের মধ্যে না বেরোতে পারলে এখানে এসে সোমবার ভোরে পেঁছিতে পারি না। বাড়ির খাওয়া বলতে মা'র হাতের রান্না—মাসে ঐ এক বেলা। এর বেশী তো নয়।'

'আহা বাছা রে!' চোখের জল চাপার চেষ্টাও আর করে না হেমন্ত, 'এই কষ্ট ক'রে ঐ ক'টা টাকা!'

'এই ক'টা টাকাই বা পাচ্ছি কোথায় পিসীমা? ম্যাট্রিকটাও তো পাস করি নি। বাবার অবস্থা শুনেছেনই—পড়ানোর ক্ষমতাই ছিল না। লোকজনকে ধরে-ক'রে চেয়ে-চিন্তে পড়াবেন সে মানুষও নন, মুখচোরা লোক। নিজের চাড়ে যতটা হয় শিখেছি, তবু পাস করার সার্টিফিকেটখানা তো নেই। কাগজে-কলমে তো মুখ্খু! নেহাৎ একটু সুপারিশ ধরা গিছল বলে, বাবারই এক শিষ্য এখানের বড়বাবু, তাই, এইটুকু পেয়েছি। এ যদি যায়, এখন আর এ-মাইনের কাজও কোথাও পাব না বোধ হয়।'

এই ক'টা টাকা কেন—এর বেশীই দিতে পারে। হেমন্তই পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এর মধ্যে একদিন কথাটা পাড়তে গিয়েছিল, ঠিক দেওয়ার কথা নয়, সে সাহস হয় নি—একটু ঘুরিয়ে বলেছিল, 'আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবি বাবা, তুই যেদিন যাবি? দাদা বেঁচে থাকতে থাকতে মাপটা চেয়ে আসি!'

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল সুরেন। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে, নিমাই কাছাকাছি নেই দেখে বলেছিল, 'তা নিয়ে যেতে পারি, আপনাকে তো আর বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। কিন্তু আপনার সেখানে না যাওয়াই ভাল পিসীমা। না, আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না, বাবা কোন কথা মনে ক'রেও বসে নেই. দেখে খুশীই হবে বরঞ্চ—আপনিই দুঃখ পাবেন। যে কষ্টে তারা আছে, কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনটা চালাচ্ছে এই পর্যন্ত। দাদার আবার বিয়ে দিয়েছেন বাবা—খরচ বেড়েছে, আয় বাড়ে নি এক পয়সাও। অথচ না দিলেও চলে না, জমিজমাই বলুন, শিষ্যি-যজমানই বলুন,—সবই গেছে প্রায়, আজকাল কেউ ঘবোয়া গৃহী-গুরুর কাছে মন্তর নিতে চায় না। তাছাড়া ঠাকুর্দমশাই নষ্ট ক'রে গেছেন বেশির ভাগ—যা আছে দু-এক ঘর—দাদাকেই তো দেখতে হয়, উদয়াস্ত খাটুনি, তাঁকে কে দেখে? সেজন্যেই আরও বিয়ে দেওয়া—। মা অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তিনিও তো এতকাল কম খাটেন নি, ঠিকে ঝি, রাঁধুনীকে রাঁধুনী—আমি তো বলি তুমি আমাদের ঠাকুরঝি—এখন সংসারে একটা লোকও দরকার। কলকাতায় এক রকম. ওসব জায়গায় গিয়ে বসা, কোন শিষ্যর হয়ত ছেলের অন্নপ্রাশন, আগের দিন বাঁকে ক'রে সিধে তেল ঘি পাঠিয়ে দিলে, কী সমাচার, না আপনাদের প্রসাদ ছেলের মুখে দোব। সে-সব তো চিরকাল মাকেই এক-হাতে করতে হয়েছে, এখন আর পারেন না।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে এবং বোধ করি পরের প্রশ্নটার জন্যে সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বলে হেমন্ত, 'তা সে কষ্ট কি কিছু দূর করতে পারি না আমি?'

'সেই তো হয়েছে বিপদ। আপনি যে কেন যেতে চাইছেন তা কি আমি জানি না! তাদের কষ্ট দূর করতে চাইবেন সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বাধা আছে। বাবার

দিকে বাধা। বাবা—বাবা যেদিন আপনার ওখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দা-মশাই জানতেন যে, বাবা আপনার সন্ধানেই এসেছিলেন, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আশা ছিল কিছু টাকা দেবেন আপনি, একটু ভালরকম চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হবে তাঁর, ঐ ধরনের মানুষ ছিলেন তো, নিজের কথাটাই শুধু চিন্তা করতেন—বাবা কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই ঠাকুর্দামশাই বুঝেছিলেন যে, বাবা অপমান হয়ে ফিরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি দিয়েছিলেন বাবাকে যে, এর পর কোনদিন আপনি কোন সাহায্য করতে গেলেও তিনি যেন না নেন। কঠিন দিব্যি দিয়েছিলেন। এটা কেন করতে গেলেন, তা আমি বুঝি এখন, তবে গুরু-নিন্দা আর করব না—গুরুর গুরু। পরে হয়ত মত বদলে ছিল, আপনার সঙ্গে দেখাও করতে চেয়েছিলেন।—দেখা হলে হয়ত তিনিই হাত পেতে নিতেন কিছু, সেই রকমই ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছিলেন এদান্তে—আর তাহলে সে দিব্যিরও কোন মানে থাকত না, কিন্তু তা তো হয় নি, সে সময় সে-দিব্যির কথা কোন পক্ষের মনেও ছিল না—তাই সেটা কাটানোও হয় নি, থেকেই গিয়েছে।···নিহাৎ ছেলেমানুষী, আমি ওসব মানি না, তবে বাবাকে তো চেনেনই। ঠাকুর্দামশাইয়ের আদেশ বেদবাক্যের থেকেও অলঙ্ঘ্য।'

এর পর নীরবে বসে চোখের জল ফেলা আর অনুতাপ করা ছাড়া পথ কি ?

আর যেতে চায় নি সেখানে। সুরেনের কথাই ঠিক। শুধু দুঃখ বাড়াতে গিয়ে লাভ কি ? কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে তাদের অন্নধ্বংসে আসা !

বোধহয় বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে মাথা কুটছিল কথাটা। মুখ ফুটে বলতে পারে নি হেমন্তকে। সাহসে কুলোয় নি। জানে—গালা-গাল তো খাবেই, দু-চার ঘা মারধোরও এই বুড়ো বয়সে খাওয়া আশ্চর্য নয়। হয়ত তন্দণ্ডেই দূর ক'রে দেবেন। 'বেরোও আমার বাড়ি থেকে হারামজাদা, দূর হয়ে যা !' বললেই হল, সে মেয়াদের ওপর আপীল চলবে না আর।

প্রধানত এই ভয়েই বলতে পারে নি।

এতদিন পরে সুরেনের প্রতিপত্তি দেখে, তার প্রতি টান-ভালবাসার 'আদিখ্যেতা' দেখে, তাকেই পাকড়াও ক'রে ধরল নিমাইচরণ। টান আরও একজনের ওপর ছিল—গোরা—কিন্তু থাকলে সে-ই করুণার্থী হয়ে থাকত, সে আর তার হয়ে কি ওকালতি করবে! তাছাড়া তারও স্বার্থের সম্পর্ক। ভাগীদার বাড়ানোতে তারই অসুবিধা বরং। এসব কথা ছেলেমানুষ ভাইপোকে দিয়ে বলানোও যায় না। বলতে গেলে শুধু সেইজন্যেই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত।

সেদিক দিয়ে সুরেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। সে দয়ার প্রার্থী নয় জ্যাঠাইয়ের। তাকে প্রার্থী করার জন্যে জ্যাঠাই-ই তার করুণার প্রার্থী। সে বিষয়ের ভাগ চায় না, এই ঐশ্বর্যে তার লোভ নেই। এ-নিরাসক্তি যে ঢং নয়, ন্যাকামি নয়, তা ভাল ক'রেই বাজিয়ে দেখেছে নিমাইচরণ। সত্যিই, নিজের খাটাকড়ি ছাড়া কিছু চায় না—পড়ে-পাওয়া টাকা-পয়সার কোন লোভ নেই ছেলেটার। সুতরাং নিমাইচরণের বিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌ নিয়ে সংসার পাতলে তার ঈর্ষার কোন কারণ হবে না বোধহয়—বাগড়া দেবার

চেষ্টা করবে না।

তাই সুরেনকেই ধরল একদিন নিমাই—সটেপটে। এ-বাড়িতে ফাঁক পাওয়া শক্ত, সেই জন্যে সেদিন আপিসের পর ওর সেই সার্পেন্‌টাইন লেনের বাসাতে গিয়েই হাজির হল।

'এলুম ভাই তোমাকে একটু বিরক্ত করতে। তুমি বোধহয় রাগ করছ, রান্না-বান্নার দেরি হয়ে যাবে, কাজের সময় আগড়োম-বাগড়োম করতে এলুম বলে—তা ভাই আমি নাচার, আমারও ধরগে কথাটা না বললে নয়।'

'না না, সে কি কথা! রাগ করব কেন? এমন কি আর, আমার বন্ধু-বান্ধবরা আসে না! এই তো পাশের ঘরের বিশ্বনাথবাবুই—কোন কাজ নেই, কর্ম নেই, আপিং খান আর ঝিমোন,—হঠাৎ কোন কোন দিন মনে হয় আমি একা আছি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে,—এসে বিছানা-জোড়া ক'রে বসেন, আমাকে নানারকম সাংসারিক সদুপদেশ দেন—যদিও নিজে সে-সব সৎ-আদর্শ মানেন নি—নিজের জীবনবৃত্তান্ত শোনান, রাত এগারোটার আগে নড়েন না। তাই বা কি করছি বলুন? আপনি কিছু কুণ্ঠিত হবেন না। তবে দাদা, পাঁচটা মিনিট বসুন, এখনও দেখছি কলে জলটা আছে, দু'ঘটি মাথায় ঢেলে আসি চট ক'রে। এ-ভাগ্যি প্রায়ই হয় না, মানে হয়ে ওঠে না। চৌবাচ্চার জলে আর চান করতে ইচ্ছে করে না; যা বারোভূতে নোংরা ক'রে রাখে—সকলকার চানের জল সাবান তেল তো পড়ছেই—কাক্‌-চিলের ময়লা তার ওপর ফাউ।'

বলতে বলতেই গামছাটা টেনে নিয়ে দৌড়য়। চান ক'রে এসে বারান্দায় তোলা উনুনটা ধরিয়ে একেবারে ঘরে এসে বসে, বলে, 'বলুন, দাদা, কী হুকুম!...তবে চা-টা কিছু খাওয়াতে পারব না, ও-পাট নেই। বসেন একটু তো মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে আসি কিছু।'

'না না, ওসব কিচ্ছু করতে হবে না।...এমন সময়ে মিষ্টি খেলে অম্বল হয়ে যাবে। তুমি থির হয়ে ব'সো।...হেঁ হেঁ—হুকুম-টুকুম কিছু নয়, তুমি বলো বেশ কিন্তু, মাইরি—তা নয়, আমি এসেছি তোমাকে একটু সুপারিশ ধরতে।'

'আমি? সুপারিশ? বলেন কি দাদা, আমার হয়ে কে সুপারিশ করে তার ঠিক নেই! বলে যে টিকে ধরাতে জামিন লাগা, আমারও তো সেই অবস্থা, আমি আপনার কি কাজে লাগব?'

'আছে আছে, তাও আছে। তেমন পাত্তর না জেনে কি বলছি! তুমি ওকালতি করলে মামলা ফতে হবে—এমন আদালতও আছে বৈকি!...হেঁ হেঁ, বলছি কি তোমার এই পিসীর সব ভাল, কেবল আমার বিয়ের নামটি করে না কেন বলো তো? এতদিকে এত বিবেচনা, তোমাদের দুঃখু-কষ্ট দেখে তো ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বেস ফেলে অনবরত—আমার কথাটা মনে পড়ে না তো কৈ? অথচ আমি তো পায়ের তলার জুতো হয়ে, জুতোর সুখতলা হয়ে পড়ে আছি বলতে গেলে। আমার কথাটা একটু মনে করা উচিত ছেল না? এদিকে আমার যৈবন যে যেতে চলল। বয়েসটা কি আর কম হল? জোয়ারে না বেয়ে কি ভাঁটায় বাইব? সে যে ব্যাভ্রম হতে হবে

শেষ-মেষ ! বৃদ্ধস্য তরুণী ভাজ্জা যাকে বলে !'

এই বলে একটু থেমে, সুরেনের দিকে খানিকটা অপ্রতিভভাবে চেয়ে থেকে, অকারণেই খানিকটা হেঁ হেঁ ক'রে হেসে নেয়। তারপর আবার বলে, 'তাই একটু বলছিলুম কি—তাগ বুঝে তুমি একবার কথাটা পাড়ো না একদিন ! মনে করিয়ে দাও না ! হয়ত মনেই নেই, বড্ড কাছে থাকি তো, এত কাল আছি—আমার যে মানুষের শরীল, আর মানুষের শরীল হলেই শরীলের ধম্মও থাকবে—এইটেই হয়ত মনে পড়ে না।...আর, আর, আমার বে না দিলে আমার বংশ না থাকলে—ওর পয়সা খাবেই বা কে ? যক্ দিয়ে যেতে হবে যে মরার সময়। হেঁ-হেঁ।'

এসব কথা ভাল লাগে না সুরেনের। সে চুপ ক'রে থাকে খানিকটা। তারপর বলে, 'এসব কথা আমার তোলা কি ভাল ? আমার সঙ্গে সম্পর্ক যা-ই হোক—দু'দিনের তো পরিচয়। আপনি এতকাল—আছেন ছেলের মতো—আপনার জোর ঢের বেশী। দেখি তো, আপনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন।'

'না না ভায়া, বোঝ না। ঐ পজ্জন্ত। নিভ্ভর করেন, কাজ থাকলে বলেন—তার পর আর মনে থাকে না। বলে কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী। তুমি এখন নতুন হাজার হোক, অনেক বেশী পেয়ারের। তুমি বললে সাতখুন মাপ ! আমি বলতে গেলে হয়ত তেড়ে মারতেই আসবে। এদান্তে যা মেজাজ হয়েছে ! সেদিন, এই তো পুরী থেকে আসবার দিন—কুলীটা মাল নিয়ে আসতে আসতে বাসনের থলেটা ফেলে দিয়েছেল, ফেলে দিয়েছেল মানে তোরঙ্গের ওপর থেকে গইড়ে পড়ে গেছল, ছেঁড়া কাপড় পোরা ছেল দেদার—একটা বড় সাগুরীর কানা ছাড়া কিছু ভাঙে নি—তা সে তো পরের কথা, খুলে দেখে তো বিচের—এমন টেনে এক চড় কষিয়ে দিলে, সাজোয়ান হিন্দুস্থানী কুলী 'বাপ' বলে বসে পড়ল। সে কী কাণ্ড ইস্টিশানে—ভীড় জমে গেল রীতিমতো।...হেঁ হেঁ !'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুরেন বলল, 'বলেন আমি বলতে পারি। তবে যেমন ভাবে আপনি বললেন, ওভাবে বলতে পারব না।'

'তা সে ভাই তুমি যেমন ভাল বোঝো ব'লো। তুমি বেশ গুছিয়ে মিষ্টি ক'রে বলতে পারো, সে আমি দেখিছি। হাজার হোক পণ্ডিতের বংশ তোমাদের, নিজেও ঢের বই-টই পড়েছ, তোমাদের কাছে আমরা ? হেঁ-হেঁ—'

আরও কিছুক্ষণ সুরেনের সময় নষ্ট ক'রে, রান্না সম্বন্ধে নানান জ্ঞান দিয়ে যখন বিদায় নিল নিমাই—তখন উনুনের প্রথম আঁচটা পড়ে গেছে। আবার অতি দুঃখের কয়লা চাট্টি খরচ ক'রে বাতাস দিয়ে তবে আঁচ তুলতে হল সুরেনকে।

পরের রবিবারেই কথাটা হেমন্তকে বলল সুরেন।

সবই বলল—যা যা বলেছিল নিমাই। ওরই মধ্যে একটু ঘষা-মাজা মোলায়েম ক'রে নিয়ে। মায় তার বংশরক্ষা না হলে হেমন্তরও যে বিপদ—সে-কথাটা সুদ্ধই বলল।

ওকে আসতে দেখেই নিমাইচরণ বাজারে বেরিয়ে পড়েছিল, বলার অবসর দিতেই,

সুতরাং সব কথা বলারও কোন অসুবিধা হল না।

কথাটা শুনে কিন্তু হেমন্ত রাগ করল না, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠল না, গালিগালাজও করল না, বরং যেন চিন্তিতই হয়ে উঠল। কুটনো কুটতে কুটতেই শুনছিল কথাগুলো, আরও খানিকটা নিঃশব্দে বসে কুমড়ো ডাঁটার আঁশের মতো খোসা ছাড়াবার পর ঈষৎ একটু অপ্রতিভ ধরনের হাসি হেসে বললে, 'তা বটে! আমার না-হয় সব ঘুচে-পুচে গেছে, তাই বলে ও-ও এই বয়সে মানব-জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে বসে থাকবে, বিধবা হয়ে—তা তো আর সম্ভব নয়। আমারই কথাটা ভেবে দেখা উচিত ছিল। তবে কি জানিস, আবার এই সব ঝঞ্ঝাটে জড়াতে আর ভাল লাগে না, ভয় করে। হবে যা তা তো বুঝতেই পারছি, মিছিমিছি ওদের জীবনটাও হয়ত মাটি হয়ে যাবে আমার বরাতের সঙ্গে বরাত জড়িয়ে।...এই তো একজনকে নিয়ে নতুন ক'রে সংসার গড়তে গিছলুম, আমার তো প্যাজ-পয়জার-গুনোগার হলই—সে ছোঁড়াটার জীবনও নষ্ট হয়ে গেল। কোথায় হয়ত ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে, কিম্বা চুরি ক'রে জেল খাটছে—কে জানে!...আমি যা কিছু করতে যাব—শুধু অশান্তিই বাড়বে, আর কোন লাভ হবে না।'

সুরেন আস্তে আস্তে বলে, হেমন্তর ব্যথাটা বুঝেই, 'কিন্তু জড়িয়েছেন যখন, এতকাল কাছে রেখেছেন আশ্রয় দিয়ে, তখন এটুকু ঝুঁকিও নিতে হবে, নইলে কর্তব্যের হানি ঘটবে না কি?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! আগেই হয়ত সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হই নি—তখন দুবুর্দ্ধির খেসারৎ দিতে হবে বৈকি। আসলে সবই মহামায়ার মায়া, আশা গিয়েও যেতে চায় না। দেখি, আবার সমরাঙ্গনে নামি বিধাতার সঙ্গে, দেখি তিনি জেতেন কি আমি জিতি!'

তারপর কুটনোগুলো রান্নাঘরে ঠাকুরের কাছে দিয়ে বলে, 'তুমি বাকী সব রান্না কর, চচ্চড়িটা আমি রাঁধব। আমার হাতের চচ্চড়ি খেতে ভালবাসে তোমার এই দাদাবাবু।...তোমার হলে আমাকে ডেকো, আমি সব সরিয়ে নিলে তুমি মাছটা রেঁধে রেখে চলে যেয়ো। কেমন?'

তারপর ফিরে এসে বঁটি কুটনোর ঝুড়ি গুছিয়ে তুলে রাখতে রাখতে বলে, 'তা বাবা দ্যাখ্ না একটা মেয়ে গরীবের ঘরের-টরের—ঐ তো বাঁদর পাত্তর, কে-ই বা ভাল মেয়ে দেবে!...তোদের যদি জানাশুনো কেউ থাকে—আমি এক পয়সা চাই না, নোবও না। শুধু একগাছা কড় পরিয়ে বে দিলেও নোব। মেয়েটা একটু ভাল হয়, দেখতে-শুনতে যত না হোক, স্বভাবটা ভাল হয় এইটেই চাই। জানাশুনো ঘরের হলে নিশ্চিন্তি হয়ে নিতে পারি। একটু ভেবে দ্যাখ, তেমন কারও কথা মনে পড়ে কিনা!'

'দেখি! এই তো বললেন। মাকেও লিখি না হয়।'

সুরেন নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দু'টোর দিকে চেয়ে উত্তর দেয়।

হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছিল, এতক্ষণ নিজের মনের মধ্যেই ভাবছিল কিছু। ভাবছিল কথাটা পাড়বে কিনা, মানে এই পাত্রের সঙ্গে। যে বংশের ছেলে—তাদের বিবরণ তো কিছু কিছু শুনেছে—বাবার মুখে, কাকার মুখে—এই পিসীর মুখেও।

তার পরও এ পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করা ঠিক হবে কিনা, চিরজীবনের মতো দায়ী অপরাধী হয়ে থাকতে হবে কিনা—মনে মনে বোধ হয় এই কথাটাই তোলাপাড়া করছিল, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াও একটা।

শেষে সন্ধ্যার পর, বলেই ফেলল কথাটা।

'একটি মেয়ে আছে পিসীমা, বড় পিসীমার ভাগ্নী হয় সম্পর্কে। আপন নয়—মাসতুতো ননদের মেয়ে।...এরা তো চাটুজ্যে—না? তা হলে হবে, মেয়েরা মুখুজ্যে।'

'কি রকম মেয়ে, তুই দেখেছিস? তারা একে দেবে—নিমেকে?'

'মেয়ে আমি চোখে দেখি নি, তবে যে দেখেছে সে-ই বলে খুব ভাল দেখতে। সাকারা সুন্দরী নয় হয়ত—খুব চটক আছে। অনেকে সুন্দরীই বলে। শুধু তাই নয়—মেয়ে এখানের ভাল ইস্কুলে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছিল, একটু-আধটু গানও জানে নাকি। মানে তেমন—যাকে শেখা বলে তা শেখে নি—তবে ওদিকে খুব ঝোঁক আছে, একবার শুনলেই নাকি তুলে নিতে পারে, গলা মিষ্টি, সুরের জ্ঞান আছে।'

'দূৎ! সে মেয়ে কখনও এই রূপী বাঁদরের হাতে দেয়! মিছিমিছি ওকথা তুলে লাভ কি?' হেমন্ত হতাশার সুরে বলে।

'আছে, এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 'কিন্তু' আছে, নইলে কথাটা তুলতুম না। ভদ্রলোক, মানে পিসীমার নন্দাই অবিনাশবাবু না কি যেন নাম, অবিনাশই বোধ হয়—কলকাতায় বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতেন, কি এক বাঙালী বাড়ি কাজ করতেন। বাঙালী বাড়ির চাকরী হলেও ভাল মাইনে ছিল নাকি—শতাবধি টাকা পেতেন মাসে। তা ছাড়া উপরিও ছিল কিছু, বিল পেমেণ্ট নিতে আসত যারা, শতকরা এক টাকা দস্তুরি দিয়ে যেত, সেইটে জমে বছরের শেষে কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ হত। তাতেও শ'-দুই টাকার মতো হত প্রায়, পুজোর সময় সেটা হাতে পেতেন। হঠাৎ মালিক মরে গিয়ে দুই-তিন ভাইপো এসে গদীতে বসল, ভাইয়ে-ভাইয়ে রেষারেষি ক'রে দেদার চুরি শুরু করল নিজেরাই। যে কারবারে মাসে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা মুনাফা হত, সেই কারবার দেড়বছরের মধ্যে ফেল হয়ে দেউলে খাতায় নাম লেখাল, আদালতের লোকে এসে চাবি দিলে—এক কথায় মেসোমশাইয়ের চাকরীটা গেল। সেই থেকেই বেকার—তখনকার দিনে বড়বাবুকে ধরে চাকরীতে ঢোকা, ম্যাট্রিক পাস-টাস কিছু নয়, বুড়ো বয়সে—এখন প্রায় পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়স হল—কে চাকরী দেবে? সরকারী চাকরী তো হবেই না, যেটা হতে পারত বাঙালী বাড়ির কাজ—তাও এখন সবাই সন্দেহ করে, মালিক পক্ষ নিজেরা চুরি ক'রে ব্যবসা ফেল করেছে এ কেউ বিশ্বাস করে না। ভাবে ভাইপোরা নতুন লোক, বুড়ো গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর—মনিব মরতে না মরতে এই সব বুড়ো ঘুঘুর দল লুটে-পুটে খেয়ে নিয়েছে।

'মেসোমশাইয়েরও আহাম্মুকি' একটু থেমে হেসে বলে সুরেন, 'এইখানে এক বছর ধরে ভাড়া গুনে বাসা বজায় রেখে ঘুরেছেন চাকরীর জন্যে, এক বছরেরও ওপর—ফলে সর্বস্বান্ত। কত টাকাই বা থাকে বলুন! দিন-আনা দিন-খাওয়া কেরানীর ঘরে? শেষে মাসীমার গায়ে সোনারত্তি বলতেও যখন কিছু রইল না তখন হুঁশ হল। ওঁর আর এক ভায়রাভাই বলে-কয়ে এই রাজগঞ্জের কাছে এক চালের কলে একটা তিরিশ টাকা

মাইনের খাতা-লেখার কাজ যোগাড় ক'রে দিয়েছেন। তাতেও হত না, মালিক একটু জমিদার-মতোও বটে, তাঁর ঠাকুরবাড়ির এক পাশে, বোধ হয় এককালে পুজুরীদের জন্যে তৈরী হয়েছিল, আসল পুজুরী তো থাকেনই একটা অংশে, এ বাড়তি—সেইখানে দু'টো ঘর দিয়ে রেখেছেন বিনা ভাড়ায়। এখন শুনছি ছেলেমেয়েগুলোর ওপর একটু নজর পড়েছে—দেখতে ভাল সবাই নাকি, স্বভাবও খুব ঠাণ্ডা—ছোট দু'টোকে ওখানের ইস্কুলেও ভর্তি ক'রে দিয়েছেন। তাছাড়া যদিও বাবুরাও ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলী, তবু ব্রত-পার্বনের ছুতোয় বড় বড় সিধেও পাঠান প্রায়ই, কাপড়-চোপড় চাল-ডাল। তাইতেই এক রকমে যোগেযাগে চলছে ওঁদের, বলতে গেলে পরের দয়ার ওপর—'

দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত ক'রে চুপ করল সুরেন। চোখ দু'টো ওর কিন্তু এখনও নিজের সেই পায়ের নখ দু'টোর ওপর নিবদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে একবারও পিসীর মুখের দিকে তাকায় নি।

হেমন্তও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর নত মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তুই এত কথা জানলি কি ক'রে? দিদি তো নেই, এত ছিষ্টির কথা তোকে বললেই বা কে, আর কেনই বা বলতে গেল? নিশ্চয় তোর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিল কেউ?'

যেন চমকে উঠল সুরেন, ঈষৎ ত্রস্তভাবে চোখ তুলে পিসীর দিকে তাকাতেই তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা চোখে পড়ল, তার ফলে যেন আরও বিব্রত আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল—এই অন্তর্যামীর মতো কথা বলাতেই এত ভয় তার—তার পর আবার মুখ নিচু ক'রে বললে, 'আপনি যা গণকঠাকুরের মতো বললেন, আপনার কাছে আর গোপন করব না। হ্যাঁ, তাই।'

আবারও হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে হেমন্ত।

'তোর যেমন কথা! তোকে যে পাত্তর ধরতে এসেছিল সে কখনও নিমেকে দেয় ঐ মেয়ে, বানরের গলায় মুক্তোর মালা!'

'কেন? বা রে!' এবার যেন গলায় একটু জোর পায় সুরেন, 'নিমাইদা খারাপ পাত্রটা কিসের? প্রায়-সরকারী চাকরী করে, দেশেও যা-ই হোক গিয়ে পড়তে পারলে কিছু ধানচাল পাবে,—তারপর হয়ত আপনার এই বিষয়ও ওতেই অর্শাবে যদি বনিয়ে চলতে পারে। আমার চেয়ে তো ভাল পাত্র পিসীমা!'

'হ্যাঁ! কিসে আর কিসে। শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার ল্যাজে! অজ মুখ্খু, ক-অক্ষর গোমাংস। মেয়ে বলছিস থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়া, গান জানে, সুন্দরী—'

'মুখ্খু তো আমিও পিসীমা। যতই যা পড়ে থাকি, পাসের ছাপ তো নেই, সেখানে দু'জনেই সমান। চাকরীর বাজারে দু' আনা এক আনার তফাৎ কেউ দেখে না। দরখাস্ত লিখতে গেলে দাদাও লিখবেন রেড আপ টু দি ম্যাট্রিক ক্লাস—আমিও তাই।'

'দেখতে-শুনতেও তো একটা কথা আছে!' হেমন্ত তবুও বলে, 'তোর মতো রূপবান ভদ্র জামাই যে খুঁজতে এসেছিল—'

বাধা দিয়ে সুরেন বলে, 'সে যখন হবার জো নেই তখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি বলুন! তাছাড়া রুপো যখন নেই ঘরে, জামাইয়ের রূপ খুঁজতে এলে চলবে কেন? এই তাই—যদি আপনারা দয়া ক'রে নেন—নইলে কি আর ঐ মেয়ের বিয়ে হবে ভাবেন?

যতই ভাল মেয়ে হোক, একেবারে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তুলতে কেউ রাজী হবে না। ঐ যে বাবুরা অত ভালবাসেন, দয়া করেন—কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন তাই বলে ?'

'তবে দ্যাখ—যদি দেয়। চিঠি লিখে দ্যাখ।···বিশ্বাস তো হয় না।'

হেমন্ত যেন মেয়ের রূপগুণের বিবরণে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে।

মনোরমার মতোই আর একটা জংলী বৌ আসবে হয়ত—এই তার মস্ত ভয়।

॥ ২২ ॥

সাতদিনের মধ্যেই খবর এসে গেল। কন্যাপক্ষ খুব রাজী—তবে খরচ কিছুই করতে পারবেন না। দানের বাসনটা দেবেন, তাও সব সাজিয়ে দিতে পারবেন না হয়ত—মোটামুটি থালা বাটি গেলাস গাড়ু ঘড়া এগুলো দেওয়া যাবে, বর-কনের কাপড়, আঙটিও হয়ত ভিক্ষে-দুঃখু ক'রে যোগাড় হয়ে যাবে—কুড়ি-পঁচিশটি বরযাত্রীও খাওয়াতে পারবেন কোনরকমে—তার বেশী একটি পয়সাও খরচ করতে পারবেন না। মেয়ের হাতে দু'গাছা পেটি আছে, কানে একজোড়া ক্ষয়াঘষা ফুল, সেগুলো অবশ্য খুলে নেবেন না, তবে ঐ পর্যন্তই 'ইতি', ঐ দিয়েই সালঙ্কারা করবেন।

হেমন্ত এতেই হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পায়।

'খুব, খুব! খুব রাজী আমি। যা শুনছি মেয়ে যদি সেরকম হয়—পৌনে রকম হলেও চলবে—আমি ওদের ঘরখরচা সুদ্ধ দিতে রাজী আছি। আমি আগেই বরং গয়না পাঠিয়ে দোব, দু-একটা গয়না শাড়ি, যা বলে।'

'আরে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আগে মেয়ে দেখুন। সবই তো শোনা কথা পিসীমা।'

'মেয়ে দেখা? তাই তো! সে আবার কে যাবে! তোকেই যেতে হয় তাহলে!'

'আমি—।' আঁৎকে ওঠে প্রায় সুরেন, 'আমি যাব কি! না, না। সে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন। এ ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।'

'কী ব্যবস্থা করব বল? আমার কে আছে আর? এক যদি ডাক্তারবাবু থাকতেন তো কথাই ছিল না। আর যারা ছিল, কর্মসূত্রে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তারা একে একে অনেকেই চলে গেছে, যাও-বা দু'চারজন বেঁচে আছে, অন্তত বিশ-বাইশ বছর কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে। এখন তাদের কাকে গিয়ে বলব—আমার হয়ে মেয়ে দেখে এসো! এখন যাদের সঙ্গে কাজ—য়্যাটর্ণী রাজমিস্ত্রী চুনসুরকীওলা—তাদের তো আর একথা বলা যায় না!'

'তা হলে যার বিয়ে সে-ই দেখে আসুক না!'

'না না, ছিঃ! ও কী দেখবে? তাছাড়া ওকে দেখলে, কথাবার্তা শুনলে আর তারা মেয়ে দেবে না। আর, ওর আর দেখাদেখি কি? ওকে একটা বাঁদরী ধরে দিলেও পরমপদার্থ করবে—বাপের সঙ্গে বর্তে যাবে।'···

সুরেন বিব্রত বিপন্ন মুখে চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ।

এমন প্রস্তাব আসতে পারে জানলে সে এ কথা পাড়তই না বোধহয়।

হেমন্তই ওকে নীরব দেখে ওর একটা হাত চেপে ধরল। 'হেই বাবা, দোহাই তোর, একবারটি যা !'

সুরেন বলল, 'পিসীমা, আপনি কথাটা বুঝছেন না। একে অল্পবয়িসী ছোকরাদের কেউ মেয়ে দেখাতে চায় না, তায় প্রবীণ কেউ সঙ্গে থাকলেও কথা ছিল—একজন ভারিক্কি লোকের সঙ্গে দু-একজন ছেলেছোকরা গেলে তত দোষ হয় না—তার ওপর, মানে আমার সঙ্গে একবার কথা উঠেছিল, সেই আমিই যাব সে-মেয়ে দেখতে—না না, সে বড় বিশ্রী !'

'তাহলে কী করব বল ? এক্ষেত্রে মেয়ে না দেখেই বিয়ে ঠিক করতে হয় !'

'তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না ? আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজী আছি।… আমি বাইরে থাকব, আপনি ভেতরে গিয়ে মেয়ে দেখে নেবেন—'

'না রে, সে বড় খারাপ দেখায়। একেবারে কেউ কোথাও নেই, নিমুড়ো-নিছুড়ো—সেইটেই আরও ভাল ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়।…শুনেছে, জানতেও পারবে—তবু গোড়া থেকেই—। একটা মাগী যাবে ধ্যাং ধ্যাং ক'রে মেয়ে দেখতে—না না, সে বড় লজ্জা আর অপমানের কথা।'

চুপ ক'রে থাকে সুরেন।

কী বলবে কী করবে কিছুই ভেবে পায় না।

শেষে হেমন্তই প্রস্তাবটা দেয়, 'হ্যাঁ রে—তা তোর আপিসে এমন কোন প্রবীণ লোক-টোক নেই, যাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারিস ? বলবি যে, আমার এক দাদার জন্যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি—আর কেউ নেই তেমন যাবার মতো—আপনি দয়া ক'রে চলুন একবার। আমি যাওয়া-আসার সব খরচ দোব। ট্যাক্সী করে নিয়ে যাস বরং।… রাজগঞ্জ তো স্টীমারে যেতে হয় ?—চাঁদপালঘাট থেকে ছাড়ে, না ? সে ভাড়া, যাওয়া-আসা ট্যাক্সী, সেখানে যদি পাল্‌কি লাগে—ওখানে এখনও পাল্‌কির চল আছে শুনেছি—সব আমি দোব। যাতে কোন কষ্ট না হয় তাই করিস, খরচের জন্যে কোন ভাবনা করতে হবে না।'

'না, আপিস থেকে কাউকে নেওয়া যাবে না।' চিন্তিত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় সুরেন। মনে হয় মুখে কথাগুলো বলতে বলতেই অন্য কোন কথা ভেবে নিচ্ছে, 'এমনিই আপিসে সবাই বিয়ের কথা বলে দিনরাত—অনেক বামুন আছে তো, তারা প্রায় সবাই—কেউ শালী, কেউ বোন, কেউ মেয়ের জন্যে নিত্যিই ঘ্যানঘ্যান করে। আমার বিয়ের অবস্থা নয় শুনলেও বিশ্বাস করে না। তার ওপর এই কথা তুললে আপিসময় জানাজানি হয়ে টিটকারি পড়ে যাবে। সবাই ভাববে দাদা-টাদা বাজে কথা—আমার নিজের দাদার বিয়ে হয়ে গেছে তাও সবাই জানে—নিজের জন্যেই মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। সবাই টিটকিরি দেবে, নানান কথা কইবে, যাঁরা নিজেদের ঘরের পাত্রীর জন্যে দরবার করছিলেন, তাঁদের মুখ হাঁড়ি হবে। না পিসীমা, সে সম্ভব নয়।…তবে আমি আর-একজনের কথা ভাবছিলুম—'

এই বলে একটু যেন অপ্রতিভের হাসি হেসে বলে, 'আমার পাশের ঘরে যে বিশ্বনাথবাবু আছেন, এমনি ভদ্রলোক—খুব উঁচুঘরের ছেলে তো—কথাবার্তায় খুব চোস্ত ; সভায় বসিয়ে দিলে দরবার-জিতে বেরিয়ে আসবে। দোষের মধ্যে কুঁড়ে—

কাজে ভীষণ ভয়। ইচ্ছে ক'রে ক'রে চাকরি ছেড়েছে একটার পর একটা—ভাল ভাল চাকরি। আর প্রচণ্ড আপিঙের নেশা, রোজ গুলি খেলার মার্বেলের মতো দু'-ডেলা আপিঙ লাগে। ফলে ছেলেমেয়ে স্ত্রী কারও সঙ্গে বনে না, দিনরাত খটাখটি—ঐখানে আলাদা পড়ে থাকেন। একবেলা হোটেলে খান আর একবেলা বেগুনি ফুলুরি ভরসা। ছেলে ভাল কাজ করে, মাসে মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে দেয়—তা হলে কি হবে, সর্বস্ব আপিঙ খেতেই চলে যায়, মাসের শেষ চার-পাঁচদিন শুধু বেগুনি আর চা খেয়েই কাটে, কারণ ও-দু'টো ধারে পাওয়া যায়।...এক-আধদিন আমি এক-আধখানা রুটি দিই, তাতেই ড্যাম গ্ল্যাড—তা আমার আর কত ক্ষমতা বলুন? জামা-কাপড় ভাই-ভাইপোদের কাছে চেয়ে-চিন্তে চলে। আগে তারা টাকাই দিত, সে-টাকাতেও আপিঙ খেয়ে শতছিন্ন জামা-কাপড় পরে বেড়ান দেখে এখন সেয়ানা হয়ে গেছে, কাপড়-জামা-ই দেয়—তাও নতুন আন-কোরা নয়, নিজেরা এক-আধ ধোপ পরে দেয়, নইলে তাও হয়ত বেচে দেবে। কতকটা রেসের নেশার মতো ব্যাপার।...তাঁকে বললে এখুনি রাজী হয়ে যাবেন। একটা ভদ্র জামা-কাপড় পরিয়ে যদি নিয়ে যাওয়া যায়—ট্যাক্‌সী ভাড়া লাগবে না, ওঁকে ট্রামেই নিয়ে যেতে পারব—বরং আপিঙ খেতে একটা নগদ টাকা দোব বললে নাচতে নাচতে যাবেন ভদ্রলোক। এমনিও, আমি বললে ঠিক যাবেন।'

'বেশ তো, তাহলে তো খুব ভাল হয়। যদি তেমন বুঝিস তো—আমি টাকা দিচ্ছি—ভাল জামা-কাপড় কিনে দে—? বড় বংশের ছেলে বলছিস, ঐ রকম লোকই তো এসব কাজে দরকার।...তাই একটু বলে দ্যাখ বাবা!'

'দেখি! তবে নতুন জামা-কাপড় লাগবে না, এক প্রস্থ সম্প্রতি পেয়েছেন এক ভাইপোর কাছ থেকে, কাচানো ধোপদস্ত—আমি কালও দেখেছি, মাথার কাছে মাটিতে পড়ে আছে বিছানার পাশে। বাক্‌স-প্যাঁটরার তো বালাই নেই, যা করে ঐ মাথার কাছে খবরের কাগজ পেতে—ও-ই ঘরগেরস্তালী ওঁর।'

মেয়ে দেখতে যাওয়ার আগে যে কথাই মনে থাক, যত ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততা, অথবা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতদূর কল্পনা—এখন সামনা-সামনি দেখে যেন বুকে একটা ধাক্কা খেল সুরেন।

ঠিক এ মেয়ে দেখবে বলে প্রস্তুত ছিল না সে।

দেখে প্রথম যে-কথাটা মনে এল—ফুটন্ত ফুল একটি।

সাধারণ কোন ফুল নয়, পদ্ম কি উঁচুজাতের গোলাপ কিংবা ম্যাগনোলিয়া—এই ধরনের রাজসিক ফুলের কথাই মনে পড়ে যায় একে দেখে।

কোন তথ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাঁশীর মতো নাক, কি সপ্তমীর চাঁদের মতো কপাল, কি পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ—এ-সব কিছুই খুঁটিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখার কথা মনে রইল না, লক্ষ্য ক'রে দেখলে হয়ত নিশ্চয়ই কিছু খুঁত বেরোত, শুধু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালের জন্যে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর।...সম্প্রতি একটা কি ইংরেজী বইতে পড়েছে **breath-taking beauty**—সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল—বুকে আঘাতটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে।

তার পর আর অনেকক্ষণ চাইতে পারল না সেদিকে।

না চাইতে পারার অনেক কারণ—কিন্তু সেও তখন হিসেব ক'রে দেখার অবস্থা নয়। তবে একটা কারণ সুপ্রত্যক্ষ।

পাত্র। পাত্রের কথাটা ভেবেই যেন শারীরিক একটা কষ্ট হতে লাগল তার।

একটা অনুশোচনা, গ্লানি বোধ করতে লাগল।

বানরের গলায় মুক্তোর মালা—না, তাও নয়, বানরের গলায় পদ্মফুলের মালা দোলাতে যাচ্ছে সে।…ঐ ছেলের হাতে এই মেয়ে দেওয়া—এ তো একটা সামাজিক অপরাধ!…

কোন কথাও কইতে পারল না। সব চিন্তা যেন মনের মধ্যে গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী প্রশ্ন করতে হবে, কোনো প্রশ্ন করা উচিত কিনা—মেয়ের বাবার সঙ্গে হয়ত একটু কথা বলা উচিত—এসব কোন কথাই মনে রইল না তার। ভাগ্যে বিশ্বনাথবাবু এসেছিলেন, তিনি বহু পাত্রী দেখতে গেছেন জীবনে, কি বলা—কি কি প্রশ্ন করা উচিত—সব জানেন, তিনিই কাজ চালিয়ে দিলেন, কোন অস্বাভাবিক অশোভনতা ঘটল না।

বহুক্ষণ পরে সুরেনের হুঁশ হল—অবিনাশবাবু তাকেই কি জিজ্ঞাসা করছেন। এই মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকাটাকে স্বাভাবিক লজ্জা বলে মনে ক'রে তিনি বলছেন, 'কী হল বাবা সুরেন, তুমি কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করো!…তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে—আত্মীয়। যদিও বলে মামার শালা পিসের ভাই তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই—তবে সে বে-র ব্যাপারে যাতে না আটকায় সেই জন্যে—নইলে আত্মীয় তো বটেই, সেটা না বলার জো নেই। তুমি অমন ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইলে কেন?'

'না না, কী আর বলব? বিশ্বনাথকাকা তো বলছেনই। আমার তো কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, আমি তো সব জানিই।'

আস্তে আস্তে যেন বুকে বল এনে, চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে যায় মেয়েটির দিকে।

হাতদু'টির দিকে প্রথম চোখ পড়ে। একেই বোধহয় চাঁপার কলির মতো আঙুল বলে। ঠিক তেমনিই দেখতে। চাঁপার কলি থেকে প্রথম পাপড়ি ছাড়লে সেটা যেমন অপরূপ ভঙ্গিমায় বেঁকে থাকে—তেমনিই আছে কড়ে-আঙুলদুটো। কনকচাঁপার মতোই রঙ—না, শ্বেতচাঁপার মতো!…আরও খানিক চেষ্টার পর আর একটু ওপরে চোখ পেঁছিতে চোখে পড়ে খাঁজ-কাটা সুডৌল গলা, সুন্দর দু'টি চোখ। খুব বড় হয়ত নয়, যতটা বড় হলে মানানসই হয় ঠিক ততটাই। কিন্তু ভারী সুন্দর, যেমন একটা আবেশ আছে দৃষ্টিতে, চোখের টানটাও শিল্পীর হাতের কাজ বলে মনে হয়।…আর সবচেয়ে ঠোঁট-দু'টি। দুর্গাপ্রতিমার ঠোঁটের মতোই গঠন, ওপরেরটি যেন উপুড় করা ধনুক একখানি।

আবার সব গোলমাল হয়ে যায় বুঝি। চোখ ফিরিয়ে জোর ক'রে সে অবিনাশবাবুর সঙ্গে কথা শুরু করে। স্টীমারের সময় জিজ্ঞাসা করে, এবার উঠতে হবে—সে-কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন অবিনাশবাবু। সে হতেই পারে না। কখন কোন্ সকালে

খেয়ে বেরিয়েছে ওরা—সেইটেই যথেষ্ট অন্যায় করেছে, এ-বেলা না খেয়ে যাওয়া হতেই পারে না।

'না না, সে কী ক'রে হবে?' সুরেন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, 'সাতটায় নাকি শেষ স্টীমার ছেড়ে যায়—'

অবিনাশবাবুর বর্তমান মনিব ও আশ্রয়দাতা ষোড়শীবাবু বসে ছিলেন, তিনি এদের খুবই স্নেহ করেন—বিশেষ এই মেয়েটিকে—তিনি বললেন, 'সে আমি খোঁজ করছি। না হয় আমি পাল্‌কি ক'রে সাঁকরেল ইস্টিশানে পাঠিয়ে দোব, ট্রেনে চলে যাবেন। রাত ন'টা পর্যন্ত গাড়ি আছে।'

'না না, ইনি—বিশ্বনাথকাকা সন্ধ্যের পর অসুস্থ বোধ করেন, তার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব ওঁকে, সেই কড়ারেই এনেছি—'

বিশ্বনাথবাবুও ক্ষীণকণ্ঠে সমর্থন করেন তা। আপিঙ খেয়ে সন্ধ্যের সময়টা ঝিমিয়ে পড়েন ঠিকই। তাই বলে একটা যাচা-ভোজ ছেড়ে (ভাল খাওয়া-দাওয়া হবে নিশ্চয়ই—তাতে সন্দেহ নেই) যেতেও ঠিক ইচ্ছে করছে না। তাই সমর্থনটা খুব প্রবল বা সরব নয়।

ষোড়শীবাবু হয়ত তা বুঝলেন বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সাতটার স্টীমারেই আমি ধরিয়ে দোব। তা বলে না খেয়ে যাওয়া চলবে না। ও ব্যবস্থাটা আমার ওখানে, আমিও ব্রাহ্মণ—আপত্তির কোন কারণ নেই, করলেও শুনব না। তালপুকুরে ঘটি ডোবে না—তবু নামে এখনও জমিদার, আমি না ছাড়লে যেতে পারবেন না।'

অগত্যা সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে যেতে হল। খুবই খারাপ লাগলো সুরেনের। যেন শারীরিক অসুস্থ বোধ করছে তখন সে। এও বুঝছে যে, খেতে বসে সুখাদ্য সব গলায় ডেলা পাকিয়ে যাবে, কিন্তু উপায়ও কিছু পেল না অব্যাহতি পাবার।...

বিদায়ের সময় অবিনাশবাবু রীতি-মাফিক হাত কচলাতে কচলাতে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আমি—মানে কবে নাগাদ—ইয়ে খবর পেতে পারব?'

সুরেন যেন একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ চমকে উঠল অবিনাশবাবুর কথায়, কতকটা বিহ্বলভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'কিসের খবর মেসোমশাই?'

'এই—ইয়ে মানে মেয়ে পছন্দ হল কিনা?'

হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'এ-মেয়ে আবার অপছন্দ হবার কি আছে মেসোমশাই? এ তো লোক-দেখানো দেখতে আসা। এবার খবর দেওয়া-নেওয়া সবই আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনি একবার গিয়ে পিসীমার সঙ্গে বসে কথাবার্তা সব পাকা ক'রে আসুন। দিন-টিন ঠিক ক'রে—যা-কিছু বলার বা শোনার সব সেরে ফেলুন। আপনি কবে যাবেন খবর দিলে পুরুতমশাইকে সেই সময় থাকতে বলবেন তিনি।'

প্রায় অস্ফুটস্বরে অবিনাশবাবু যেন একবার বললেন, 'মেয়ে অপছন্দ হবার কিছু নেই, তবু তো তোমাকে রাজী করাতে পারলাম না বাবা। মেয়ে যে ভাল—সে তো

তুমিই স্বীকার করছ—'

এ-কথার কোন উত্তর দিল না সুরেন, কথাগুলো তার কানে গেছে কিনা তাও বোঝা গেল না। সে আধো-অন্ধকারে তার মুখটাও ভাল ক'রে দেখতে পেলেন না অবিনাশবাবু। ষোড়শীবাবু সঙ্গে লোক দিয়েছিলেন, তার পিছু পিছু বিশ্বনাথবাবুকে ধরে নিয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

অদৃষ্টের পরিহাস কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, এমনভাবে কখনও বোঝে নি—যেমন এবার বুঝল সুরেন। যে-কাজে তার সবচেয়ে অনিচ্ছা, সেই কাজেই জড়িয়ে পড়তে হল—অণ্ট-বন্ধনে বাঁধা পড়ল বলতে গেলে।

নিমাইয়ের এই বিয়েটা প্রাণপণেই এড়াতে চেয়েছিল সে, এড়াতে চেয়েছিল ঐ মেয়েটাকেও, সেই মেয়ের সঙ্গে সেই বিয়ের সমস্ত ভারটাই তার ওপর এসে পড়ল।

অবিনাশবাবু যেদিন কথা কইতে এলেন, সেদিন স্বভাবতই সুরেনের উপস্থিত থাকার কথা উঠল। সে-ই চেনে তাঁকে, আত্মীয়তারও—যত ক্ষীণই হোক—সূত্র একটু আছে।

পুরুতমশাইকে আগেই খবর দিয়ে আনিয়েছিল, তবু পাঁজিটা তাকেও দেখতে হল একবার। কারণ এটা পিসী বুঝেছিল, ঐ ভটচাযমশাইয়ের চেয়ে এ-বিষয়েও তার ভাইপোর দখল অনেক বেশী। একেই গুরুবংশের ছেলে—এসব জ্ঞানের কিছুটা তার সহজাত, তার ওপর শখ ক'রেও এসব কিছু কিছু চর্চা করেছে সে।

অবিনাশবাবুর ইচ্ছা বৈশাখের গোড়ার দিকে কি মাঝামাঝি দিন ধার্য হোক—হেমন্তর ইচ্ছা বিয়েটা এই ফাল্গুনেই হয়ে যাক। তার তখন যেন একটা ঝোঁক চেপে গেছে, নেশার মতো পেয়ে বসেছে বিয়েটা। আগে যতটা ঔদাসীন্য ছিল এখন ততটাই তাড়া।... মেয়েটি ফুটফুটে শুনেই আরও এই ঝোঁক। একটা সুশ্রী কচি মুখ সামনে ঘুরে বেড়াবে, হয়ত সামান্য একটু-আধটু সেবাও করল—না করলেও ক্ষতি নেই—কাছাকাছি থাকবে, তাতেই অনেক শান্তি। ইদানীং ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে তার।...

এদিকে ফাল্গুনের শেষ লগ্নের আর তেরোটি দিন মাত্র বাকী। অবিনাশবাবুর মুখ শুকিয়ে উঠল।

'এর মধ্যে কি হয়ে উঠবে বেয়ান—ভিক্ষে-দুঃখু করে মেয়ের বে দেওয়া আমার!'

'ভিক্ষে-দুঃখুর ব্যাপার তো আপনার শুনছি সামান্যই বেইমশাই! আপনি তো বলছেন দানের বাসন ঘরেই আছে, রসান দিয়ে নেবেন শুধু একবার। আর যা সামান্য কাপড় আঙটি—সে যদি চাইতে হয়—যার কাছে চাইবেন, মানে দেবার মতো লোক যে, সে তখনও দেবে এখনও দেবে। বরং দেরি হলে ফ্যাকড়া তুলতে পারে। কিছু মনে করবেন না একথা বললুম বলে। আপনি সব কথা খুলে বললেন বলেই এত আস্পদ্দা আমার। বলেন তো, যদি অপরাধ না নেন—যা-যা দরকার আমিও ক'দিন আগে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'না না', প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন অবিনাশবাবু, 'সেটি পারব না। আপনাদেরই আমার দেবার কথা—দিতে পারছি না, সে-ই তো যথেষ্ট লজ্জা একে—তার ওপর আপনার কাছ থেকে হাত পেতে নেওয়া—সে পারব না। ছিঃ! আর গয়নাপত্তরও আপনাদের

যা দিতে ইচ্ছে হয়—সম্প্রদানের পর পরিয়ে দেবেন দয়া ক'রে, আগে কিছু পাঠাবেন না। আপনাদের দেওয়া জিনিস পরিয়ে দান করা—সে তো একরকমের দত্তাপহারী হওয়া বলতে গেলে। আরও একটা নিবেদন, গায়ে-হলুদও—তেল হলুদ শাড়ি ছাড়া কিছু পাঠাবেন না—কারণ আমরা যখন ফুলশয্যের তত্ত্ব করতে পারব না, তখন—না না, সে বড় লজ্জার কথা হবে।'

'তাই হবে, যা বলেন। তবে একটু মাছ মিষ্টি দইও তো ঐ সঙ্গে দিতে হবে—লক্ষণ একটা—না হয় কম-কমই দিলুম। কিন্তু বিয়েটা আপনি এর মধ্যেই সেরে ফেলুন, অযথা দেরি করবেন না।'

'অযথা ঠিক নয়—' চিন্তিত মুখে অবিনাশবাবু বলেন, 'মনে তো লাগছে এত তাড়াতাড়ি হবে নে। এর মধ্যে কি আর গুছিয়ে উঠতে পারব ?'

কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল সুরেনের মুখ দিয়ে, নিয়তির বিধানেই বোধ করি, 'কিন্তু বোশেখে মেসোমশাই ঝড়বিষ্টির ব্যাপার আছে একটা। আপনাদেরও যেমন অসুবিধে, আমাদেরও তেমনি। তার ওপর কালবৈশাখীর দিন জাহাজে ক'রে ফেরা বরকনে নিয়ে—। সবটা ভেবে দেখুন ভাল ক'রে।'

এই কথাটাতেই অবিনাশবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন।

এর ভেতর সুরেনও আর একটা দিন খুঁজে বার করল। সংক্রান্তির আগের দিন—গোধূলি লগ্নে, অরক্ষণীয়া মতে দিন আছে একটা। কিছু না—তবু দু'টো দিন বাড়তি সময় পাওয়া যাবে।

পাঁজির দাগ দেওয়া জায়গাটা পুরুতমশাইকে দেখিয়ে সুরেন বলল, 'আজকাল আর কোন্ মেয়ে অরক্ষণীয়া নয় বলুন ?'

তিনিও সে কথায় সায় দিলেন, 'তা ঠিক। লেহ্য কথা বলছ বাবাজী।'

ঐদিনটাতেই রাজী হয়ে চলে গেলেন অবিনাশবাবু।...

এদিকে যতক্ষণ আপত্তির আশঙ্কা ছিল ততক্ষণ সেইটেকেই যা কিছু বাধা ভেবেছিল ওরা—এখন দেখা গেল, এ পক্ষেও প্রস্তুতির অনেক কিছু আছে। হাটবাজার করা, গয়না গড়ানো, লোকখাওয়ানোর ব্যাপার—বিবাহের হাজারো খুঁটিনাটি—আনুষ্ঠানিক তথ্য। সবগুলিই একে একে সুরেনের ঘাড়ে এসে পড়ল। সে যত সরে যেতে চায় তত কাকুতি-মিনতি করে হেমন্ত, হাতে ধরে কাঁদে। কেবলই বলে, 'আমার আর কে আছে বল্, এইটুকু দয়া কর। নিমেকে যা হুকুম করবি ও তাই করবে—কিন্তু ও কিছু তো জানে না—হুকুম তামিল করা ছাড়া ও কিছু করতে পারবে না।'

এমনি ক'রে আস্তে আস্তে যেন নাগপাশের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল। হেমন্তও ইতিপূর্বে কখনও কিছু করে নি—এ ধরনের কোন কাজ। বিয়ে দেখেছে, নেমন্তন্ন খেয়েছে, কিন্তু তার জন্যে কতটা প্রস্তুতি দরকার তা জানে না। নিত্যকিত্যই অনেক জানে না, শ্বশুরবাড়ির কী সব নিয়ম আছে, হয়ত এক-আধবার শুনেছে, কিন্তু সেও বহু আগে, তখন সাধুচরণই জন্মায় নি, ওর বাবার বিয়েও হয় নি। কিছু কিছু নিমাই বলল, তার যা শোনা আছে বা দাদার বিয়ের সময় যা দেখেছে—যতটা মনে পড়ল, বাকীটা

সুরেনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিল। অর্থাৎ কিছুটা শ্বশরবাড়ির মতে কিছুটা হেমন্তর বাপের বাড়ির মতে কাজটা হল।

বিয়ের চিঠি ছাপাবার খুব শখ। সুরেন বলল, 'কিন্তু এত কাকে নেমন্তন্ন করবেন পিসীমা? বাইরের লোক কি খুব বেশী একটা হবে?'

'না' একটু যেন লজ্জিতই হয়ে পড়ে, 'মানে তোদের বাড়ি, দিদির বাড়ি, অন্য আমার যে আত্মীয়-স্বজন আছে; এখানে পূর্ণবাবুর বাড়ি—শরৎদিদি মারা গেছেন, তার পর থেকে আর অবশ্য সম্পর্ক নেই বিশেষ—তবু বলতে হবে।...অন্য দু'চারজন আগেকার কর্মসূত্রে জানাশুনো—'

'এসব যে বলবেন আপনাকেই গিয়ে বলতে হবে। সে ছাপা চিঠিতে হবে না। আর আপনার নামে চিঠি ছাপানো সে বড় খারাপ দেখায়—ওর জ্যাঠারা জাঠতুতো দাদারা বর্তমান থাকতে। এক তাহলে তাদের নামেই, সম্পর্কে বড় যে তার নামে চিঠি ছাপাতে হয়।'

'না না, তার দরকার নেই। মাগো!' প্রবল প্রতিবাদ ক'রে ওঠে হেমন্ত, 'ও গুষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

'কে বরকর্তা হবে তাহলে পিসীমা?' সুরেন প্রশ্ন করে, 'নিমাইদার জ্ঞাতগুষ্টির কেউ এসে না দাঁড়ালে খারাপ দেখাবে না? বরকর্তা তো একটা চাই!'

'বরকর্তা তুই, আবার কে!' ছদ্ম প্রশান্তির সঙ্গে উত্তর দেবার চেষ্টা করে হেমন্ত।

'ওমা, সে কি কথা! আমার সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই—পিসের ভাইয়ের ছেলে—তার ওপর আমি বয়সেও ছোট—আমি কখনও বরকর্তা হতে পারি?'

'হতেই হবে। আর কে আছে বল্? তাছাড়া বাধাই বা কি? যাদের কেউ নেই তাদের কি হয়? আর এ তো বলাই আছে তাঁদের যে, কেউ কোথাও নেই, দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর। সে সব জেনেই তো তাঁরা রাজী হয়েছেন!'

'তা হয়েছেন বটে। তবু তাঁদেরও তো আত্মীয়-স্বজন আছে; তাঁদের কাছে বরযাত্রী বার করতে হবে, দেখাতে হবে।'

'সে ওর আপিসের লোক আছে, আমার পাড়ার লোক আছে। ধন্নুবাবুর ছেলেকে বলব, আমার য়্যাটর্নী, খুব লম্বা-চওড়া চেহারা তার। 'বিশ্বনাথবাবুকে বলিস, যদি তোর আপিসের কাউকে বলতে চাস—'

'না না, আমি কাকে বলব! বিয়েটা কার—বোঝাতেই তো একঘণ্টা লাগবে!'

অপ্রসন্ন মুখে বলে সুরেন।

ভাল লাগে না, একেবারেই ভাল লাগে না তার। যেন হাঁফ ধরে। মনে হয় তাকে যেন একটা গবাক্ষহীন ঘরের মধ্যে দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে, আর তার দেওয়ালগুলো ক্রমশ ভেতর দিকে সরে আসছে—ঘরের সীমিত বায়ুকে সীমিততর ক'রে। খাঁচাকলে পড়ার অবস্থা হয়েছে ওর।

এক-একবার ভাবে ক'দিনের ছুটি নিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়। ছুটি পাওনাও আছে, সেক্শ্যনের বড়বাবুকে খোশামোদ করলে পাওয়াও যাবে—কিন্তু কোথায় যাবে, যেখানেই যাবে খরচা আছে। আর এই অসহায়া বৃদ্ধাকে ফেলেই বা যায় কোথায়?...

এ কী বিপদে পড়ল সে ! এই কথাই বার বার কেবল নিজেকে প্রশ্ন করে।

ছোট কাকাটাও যদি থাকত এখানে !···নিভা যা লিখেছে—তার আর কোথাও যাবার সামর্থ্য নেই। আস্তে আস্তে পিদীমের তেল ফুরিয়ে আসছে আর কি ! ওদের নাকি দেখার ইচ্ছা খুব—কিন্তু এরা কোথায় যাওয়ার খরচা পাবে সেই ভেবেই লেখে না। নিভার কাছ থেকেও নিতে রাজী নয়, বলেছে, 'তুই যদি আমার অজান্তে পাঠিয়েছিস এক পয়সাও—তাহলে তোর ভাত এই পর্যন্ত। পথে গিয়ে মরে পড়ে থাকব সেও ভি আচ্ছা !'

সে চিঠি পাবার পর থেকে তার প্রাণের কথাটা ভেবেই সদাকণ্টকিত আছে—কোনদিন কি খবর আসে—সে লোকের কাছ থেকে কোন দৈহিক সহায়তা পাওয়ার আশা তো বাতুলতা। সুতরাং যীশুখ্রীস্টের এই ক্রুশ তাকেই বইতে হবে।

আগে যতই যা বলুক—ক্রমশ নরম হয়ে আসে হেমন্ত।

ব্যাপারটা যে নিমাইচরণেরও ভাল লাগছে না, তা বুঝতে পারে। এও বোঝে যে, ভাল লাগা সম্ভব নয়—সবাই থাকতে এমন অনাথার মতো বিয়ে করতে যাওয়াটা। শেষে দিন-তিনেক হাতে থাকতে ডেকে বলে, 'দ্যাখো, তোমার জ্ঞাতগুষ্টি কাউকে যদি বলে আসতে চাও তো বলে এসো। ভাইয়েরা কেউ বরযাত্রী যেতে চায় তো কে কে আসবে আসতে বলো। বৌভাতেও যে ক'জন আসবে আসুক। তবে এখানে এসে বেশ গেড়ে বসে থাকবে এই ছুতোয়—তা হবে না সেটাও বলে দিও। একদিনও না। আর যেন কেউ বরকর্তাও না সাজতে যায়, কিংবা সেখানে গিয়েও না চাল দেখায় কি আত্মীয়তা জাহির করে। সেটা ভাল ক'রে সাবধান ক'রে দিও, নইলে অপমান হতে হবে।'

নিমাই বোধহয় এই অনুমতিটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, সে সেইদিনই রওনা হয়ে গেল।···

রাত্রে ফিরে আসতে আর একটা খবর পাওয়া গেল। অপ্রীতিকর ও অস্বস্তিকর। গৌর নাকি কোথা থেকে কি খারাপ অসুখ ধরিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। কঙ্কালসার চেহারা হয়ে গেছে, চুল-টুল উঠে একেবারে বুড়োর মতো দেখাচ্ছে।···

তার ফলে এক ধারের একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে দাদারা, কেউ সেদিকে যায় না, ছেলেমেয়েদের যেতে দেয় না। আলগোছে ভাত ফেলে দিয়ে আসে কেউ গিয়ে, নিজের থালাবাসন নিজেকে মাজতে হয়। কী অসুখ তা কেউ খুলে বলল না, তবে উঠোনের ধানসেদ্ধ উনুনে নিমপাতার জল ফুটিয়ে আড়ালে বাগানে গিয়ে চান করে দু'বেলা, আর যন্ত্রণায় কাতরায়—নিমাই দেখে এসেছে। খুব কাকুতি-মিনতি ক'রে কিছু পয়সা চেয়েছে ওর কাছে, হাতে নগদ পয়সা বলতে একটাও নেই, দাদারা কেউ দেয় না। পয়সার অভাবেই কোন চিকিৎসা হচ্ছে না, কে খরচ করবে ? নিমাই ওর কষ্ট দেখতে না পেরে নাকি দু'টো টাকা দিয়ে এসেছে। অন্য কোন উপকার অবশ্য হবে না, ডাক্তার দেখানো যাবে না, তবু মাসখানেক বিড়ির খরচাটাও তো চলবে। এমনি কষ্ট তো আছেই—নেশা না করতে পেরে পেট ফুলে মরছে যে তার ওপর !

এমনি অনেক খবর দেয় নিমাই, অনেক কথা বলে যায়।

চোখ দু'টো কি জ্বালা ক'রে ওঠে হেমন্তর—শুনতে শুনতে ?

বুকের মধ্যটায় কি একটা ব্যথা বোধ করে ? একটা দৈহিক যন্ত্রণা ?

আর সেইটে কমাতেই কি অকস্মাৎ, নিমাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই, উঠে চলে যায় সেখান থেকে ? কে জানে !

নিমাইও অনেকক্ষণ তার পর গুম হয়ে বসে থাকে। হাজার হোক নিজের ভাইপো। তার এ দুর্দশা ভাল লাগে না। আগেকার ঈর্ষার ভাবটা চলে গেছে—এখন একটা উৎকণ্ঠা আর অনুকম্পাই বোধ করে ছেলেটার জন্যে।

॥ ২৩ ॥

সুরেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আশা ধরে ছিল যে, হয়ত এমন একটা কিছু ঘটবে, যাতে এই বিয়ের ভারটা তার কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে অন্যের ওপর পড়ে। এর মধ্যে হয়ত তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন এসে যাবে নিমাইদার। চাই কি পিসীরও সুবুদ্ধি হতে পারে কিছু।

কিন্তু কিছুই ঘটল না সে রকম। নিজের একটা অসুখ-বিসুখও করল না। সে-ই শুকনো মুখে ওকেই সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে সবাইকে গুছিয়ে ডেকে বর নিয়ে রওনা হতে হল এক সময়। যত দিন এগিয়ে আসছিল তত সেই চাপা-দেওয়ালের নিঃশ্বাস-বন্ধ-হয়ে-আসা ভাবটা বেড়েই যাচ্ছিল, তত অসহায়বোধ বাড়ছিল—কিন্তু তাতে শরীরটা এমন ভাঙল না যাতে এধার থেকে অব্যাহতি পায়।

শুধু এই ঝঞ্ঝাট বা পরিশ্রমই নয়, আরও কিছু।

যেন একটা অজ্ঞাত আশংকা, কেবলই মনে হচ্ছে কী একটা বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। অকারণ, অবর্ণনীয় অস্বস্তিবোধ। অথচ এসব কথা কাউকে বলা যায় না, বললেও কেউ এটাকে অব্যাহতি দেবার মতো যথেষ্ট কারণ বলে মনে করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে।

যা-ই হোক, শেষ অবধি অবশ্য একেবারে হত-দরিদ্রের বিয়ে হল না, বিয়েটা বিয়ের মতোই মনে হল। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী—সব মিলিয়ে ষাটজনের বেশি নয় অবশ্য—খাওয়াবার ভার অবিনাশবাবুর মনিব সেই ষোড়শীবাবুই নিয়েছিলেন। তিনি একটা হারও দিয়েছিলেন কনেকে, তাঁর বাড়ি থেকেও আর কারা মিলে ব্রোঞ্জের ওপর সোনা বাঁধানো চুড়িও দিয়েছিল ছ'গাছা ! এছাড়া কম দামের হলেও একটা বেনারসীর ব্যবস্থাও হয়েছিল কোথা থেকে, হয়ত অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কোন আত্মীয় দিয়ে থাকবেন। সুতরাং বিয়ে করতে বসে খুব একটা ভিক্ষে-দুঃখুর বিয়ে বলে মনে হয় নি নিমাইয়ের।

ষোড়শীবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গেই দেখাশুনো তদ্বির-তদারক করলেন, কিন্তু এমনই ভাগ্য, ঠিক সম্প্রদানের সময়টা থাকতে পারলেন না ; তাঁর নাকি শরীর খারাপ হয়ে পড়ল হঠাৎ। কি রকম খারাপ, কি হয়েছে—কেউ ভালরকম বলতে পারল না। একজন বলল জ্বর, আর একজন বলল মাথা ধরেছে। কেবল এক ভদ্রলোক চুপি চুপি বললেন—কন্যাযাত্রীদের একজন কি ষোড়শীবাবুদের আত্মীয় তা ভাল বোঝা গেল না

—'আরে মশাই আসল কথা ভোচকানির মতো কিছু হয়েছে। সকাল থেকে কিছু মুখে দেয় নি, ঠায় উপোস দিয়ে এইসব করছে তো! আজ তো দু'তিনদিন থেকেই বলতে গেলে উপোস চলেছে।…শরীর খারাপ হবে না! তার আর অপরাধ কি বলুন!'

এই বলে তিনি ডান-চোখটার একটা বিশেষ ভঙ্গী করলেন।

'উপোস কেন?' সুরেন বুঝতে পারে না কথাটা। চোখের এই বিশেষ ভঙ্গীটাও না, 'ওঁর তো আর নান্দীমুখ করার কথা নয়।'

ভদ্রলোক গলাটা আরও নামান, 'আপনি তো মশাই জোয়ান আজকালকার ছেলে, বুঝতে পারলেন না?…মেয়েটার ওপর যে বড্ড টান ছেল। বলি তার জন্যেই তো চাকরির নাম ক'রে বাড়িতে এনে রাখা আর গুষ্টিবগ্‌গ পোষা। বয়স এখনও পঞ্চাশও হয় নি, আর ঐ তো সাড্‌ডোল সাজোয়ান চেহারা, এতটুকু কোথাও টসকায় নি—ঘি-দুধ খেয়ে স্বাস্থ্য যা রেখেছে, দেখলে চল্লিশও মনে হয় না। বলি সে একটা অল্পবয়িসী ফুটফুটে ছুঁড়িকে নিজের মেয়ের মতো দেখবে—তা তো আর হয় না, বললে কি হবে? সে কথা ওর গিন্নীও বিশ্বেস করে না।…কৈ, তাকে দেখছেন? তার বাড়িই তো কাজ বলতে গেলে। সেই প্রথমেই যা একবার মাত্তর এসে দাঁইড়েছেল—ধম্মডাক দেবার মতো ক'রে—তার পর সেই যে উবে গেছে—আর কেউ টিকি দেখেছে তার? বলি, তার ভয়েই তো, গিন্নী যে একেবারে দশভুজো-চণ্ডী, খাণ্ডারণী—নইলে বাবুটি আমার সোনায় মুড়ে দিত এক-গা গয়না দিয়ে। আর তা-ই বা কেন, তাকে বাঘের মতো ভয় করে বলেই না—নইলে হাতছাড়া করবে কেন? আপনাদের কি সাধ্যি তার গর্তে ঢুকে ওকে নিয়ে যান!…বৌটোরও যে হয়েছে বয়েস অল্প, মরবার মতো কোন রোগ-অসুখও নেই, নইলে কিছুদিন এখন জিইয়ে রাখত, এমন ক'রে দানপত্তর লিখে দিত না।…হরিবোল, হরিবোল!… যাক গে যাক দাদা, অনেক কথা বলে ফেললুম, কারুক্কে বলবেন না এসব কথা, কে কি ভাববে! আমার পাগলের খ্যাল, যা মনে এল তাই বললুম। এর কি দাম বলুন? বলি জজে মানবে?… হরিবোল, হরিবোল, মা তারা, তুমিই রক্ষা করো মা!…আমরা মশাই খাই দাই কাঁসি বাজাই—রগড়ের কি ধার ধারি?…এসেছি, একপাত খেয়ে চলে যাব। আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে দরকারটা কি?'

এই বলে আবারও এক চোখ টিপে একটা কদর্য ইঙ্গিত ক'রে সেখান থেকে চলে গেলেন লোকটি।

এত অল্প লোকের মধ্যে বরপক্ষীয় কে কে—চেনার কোন অসুবিধা নেই; বিশেষ সুরেনই বরকর্তা। তার সঙ্গেই অবিনাশবাবু কথাবার্তা কইছেন, অনুমতি নিচ্ছেন, এখানে কুশণ্ডিকা হবে, সে ব্যবস্থাও সুরেনই করল—কী আনতে হবে তার জন্যে টাকা ধরে দিল—সুতরাং বরপক্ষের লোক বিশেষ বরকর্তা জেনেই লোকটি এই বিষ উদ্গার ক'রে গেলেন। হয় এঁদের কোন আত্মীয়, নয় ষোড়শীবাবুদের। ভাবে মনে হয় অবিনাশবাবুদেরই কেউ হবেন, আগে ভাংচি দেবার সুযোগ পান নি, সেই অবশ্যকরণীয় কাজটা এখন সেরে নিলেন।

তবু মনটা দমে গেল সুরেনের। কথাটার মধ্যে কতটা সত্যি আছে তা কে জানে! তবে অসম্ভব কিছুই নয়। ষোড়শীবাবুর আকর্ষণের যথেষ্টই কারণ আছে। মেয়েটার দিক থেকে তার কোন প্রশ্রয় আছে কিনা?…একবার নিমাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল: কালো রোগাটে চেহারা, চোয়াড়ে চোয়াড়ে; গাল চড়ানো, দুটো রগের কাছও ভেতরে ঢুকে-যাওয়া, টেঁপা-মতো। একেবারেই শ্রীহীন। শুধু এ মেয়ে কেন—কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ-বংশের মেয়ে এর জীবনসঙ্গিনী হচ্ছে, ভাবতেও কষ্ট লাগে।…

যাকগে, এসব চিন্তা এখন ক'রে কোন লাভ নেই।…লোকটাই বিষম বদ।…জেনে-শুনে এই অনিষ্টটি ক'রে গেল। বিশ্বাস করুক বা না করুক—কাঁটার মতো কথাটা মনে গেঁথে রইলই।…অশান্তি আর অস্বস্তি।

তবে আর কারও কোন অসুবিধা নেই। খাওয়া-দাওয়া ভাল হয়েছে, বরযাত্রীরা খুশী। একটা বড় ঘরে ঢালাও ফরাশ পেতে বিছানার ব্যবস্থাও হয়েছে, বালিশও এসেছে কতকগুলো—খুব সম্ভব বিভিন্ন বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে, কারণ কোন বালিশের ওয়াড় ধব ধব করছে ফরসা, কোনটা আধময়লা, কোনটা একেবারেই তেলচিটচিটে; মশারি অবশ্য এত লোককে দেওয়া সম্ভব নয়, তবু বরযাত্রীরা অপ্রসন্ন নন। কেবল নিমাইয়ের দেশ থেকে দুই জ্ঞাতিভাই এসেছিল—তারা কিছু কিছু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে লাগল। সুরেনের মনে হল তারা একটা ঝগড়া বাধাবারই চেষ্টা করছে, তবে সে দলে আর কেউ যোগ না দেওয়ায় মজাটা তেমন জমল না।

এটা স্বাভাবিক। ঐ রকমই শিক্ষা-দীক্ষা ওদের। বরযাত্রী হয়ে এলে কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে হয়, ঝগড়া বাধাতে হয়—এ-ই ওরা জানে। এটা একটা নিয়মের মতো হয়ে গেছে। তা ছাড়াও, এখানে ঈর্ষারও পর্যাপ্ত কারণ আছে। নিমাইয়ের এমন সাড়ম্বরে বিয়ে হবে—সুন্দরী বৌ—এ ওরা কল্পনাও করে নি কখনও। জ্যাঠাইয়ের বাড়ি অন্নদাস হয়ে পড়ে আছে, চাকরের মতো খাটিয়ে নেয়, তারও বেশী—'উঠতে লাথি বসতে ঝাঁটা' মেলে সেখানে মজুরী—এ-ই শুনে এসেছে। বিশেষ গৌর গিয়ে আরও বেশী ক'রে বাড়িয়ে রঙ ফলিয়ে বলেছে, নইলে তার চলে আসার কারণটা দেখানো যায় না।…সেই নিমাইয়ের এমন বৌ!

তার ওপর, সম্প্রদানের পালা চুকে গেলে যখন সুরেন পকেট থেকে চুড়ি বালা নেকলেস বার ক'রে অবিনাশবাবুর হাতে দিয়ে বলল কনেকে পরিয়ে দিতে, তখন তো ক্ষেপে যাবার অবস্থা হবেই।

খুশী নিমাইও। খুশী বললে কিছু বলা হয় না। সুন্দরী শুনেছিল বটে, কিন্তু সত্যিই তার বৌ যে এত সুন্দরী হবে, হতে পারে তা কখনও কল্পনাও করে নি। তার ওপর যে রকম গরিব লোক, ভিক্ষে-দুঃখু ক'রে বিয়ে দিচ্ছে শুনেছিল—তাতে বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়ন সম্বন্ধেও দুশ্চিন্তা ছিল একটা। এর পর না জানি কত টিটকিরি শুনতে হবে। এখন দেখল যেমন আর পাঁচজনের বিয়ে হয়—ওদের মতো ঘরে, তেমনিই হচ্ছে। বেনারসী শাড়িও দিয়েছে, গহনাও চলনসই—মেয়ে একেবারে 'নেড়াবুঁচো' নয়—দানসামগ্রী, ওর আঙটি, জোড়—রেশমের জোড় দিতে পারে নি, ভাল সুতীরই ধুতি-চাদর দিয়েছে—বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া—

সবই সাধারণ আর পাঁচটা বিয়ের মতোই হয়েছে। এ আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না —নিমাইয়ের এমন অবস্থা। একফাঁকে আড়ালে পেয়ে সুরেনকে বলেই ফেলল, 'ভাই রে, কী বলব তুই বয়সে অনেক ছোট, নইলে পায়ের ধুলো নিতুম।…তুই আমার বাবার কাজ করলি। অবিশ্যি তাও আমার বাবা বেঁচে থাকলেও এ বে দিতে পারত না, ঐ পাড়াঘর থেকে একটা খেঁদীবুঁচি কেলুটি এনে গছিয়ে দিত!'

পরের দিন সকালে অবশ্য ষোড়শীবাবু দেখা দিলেন আবার। শরীর খারাপের জন্য থাকতে পারেন নি, সে জন্যে এঁরা কিছু মনে করলেন কিনা জানতে চাইলেন। তবে সুরেনের মনে হল মুখটা গম্ভীর তাঁর, দৃষ্টিও বিষণ্ণ। কিংবা সবটাই কালকের কথাটা শোনার ফল—কে জানে! সে-ই হয়ত এসব কল্পনা করছে!

কুশণ্ডিকা কাল রাত্রেই সারা হয়ে গিয়েছিল, সুরেন সকালে জলযোগের পরই চলে যেতে চাইল। ষোড়শীবাবুই ছাড়লেন না। বললেন, 'সব আয়োজন প্রস্তুত, একটু ঝোলভাত খেয়ে যান, নইলে আমাদের খুব দুঃখ হবে।'

বরযাত্রীরা অবশ্য বেশির ভাগই ভোর পাঁচটায় উঠে ছ'টার স্টীমার ধরে চলে গেছে। তাদের আপিস আছে। তারা একটু চা-ও পায় নি। সুরেন বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে। অবিনাশবাবু খিঁচিয়ে উঠেছেন, 'এত রাত্তিরে চা কে ক'রে দেবে? এ কি মামার বাড়ির আবদার নাকি?' অপ্রিয় পরিস্থিতির ভয়ে সে-কথা এদের আর বলল না সুরেন, বলল, 'ওঁরা বলছেন কিছুই তো যোগাড় নেই, অনেক দেরি হবে। উনুন না ধরলে—'

সে পয়সা দিয়ে দিল হিসেব ক'রে, জাহাজ-ঘাটায় যদি পাওয়া যায় তো যেন কিনে খেয়ে নেয় তারা। আসলে—এই প্রথম, এঁদের অন্তঃপুরে ঢুকে দেখল সুরেন—অবিনাশবাবুদের ওখানে কিছুই হচ্ছে না, কোন যোগাড়ই নেই। সমস্ত ব্যবস্থাই—হয় ষোড়শীবাবু যেচে নিজের হাতে নিয়েছেন, নয়তো এঁরাই তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।…

তাড়া-লাগানো সত্ত্বেও খাওয়া-দাওয়া আশীর্বাদ সেরে রওনা হতে হতে তিনটে হয়ে গেল। তাও, পরে বারবেলা পড়বে তাই—এঁরা তাড়া করলেন একটু। সাড়ে তিনটের স্টীমার। বর-কনের পাল্কি ঠিক ছিল, মালপত্র মুটের মাথায় গেল। মাল আর কি, কনের তোরঙ্গতেই বাসনপত্র সব, মায় হেমন্তরা যা সামান্য গায়ে-হলুদের তত্ত্ব করেছিল, কাপড়জামা, একপ্রস্থ বাসন ইত্যাদি—তাও ধরে গেল। এ ছাড়া গাড়ু-ঘড়া আসন প্রভৃতির একটা পুঁটলি।

বিদায়ের আগে যখন হাতে-হাতে-সঁপে-দেওয়া অর্থাৎ কান্নাকাটির পালা, তখনও আর ষোড়শীবাবুকে দেখা গেল না। তবে তিনি আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, দুপুর নাগাদ এক সময় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট কাগজের মোড়ক সুরেনের পকেটে ফেলে দিলেন। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ভাই—আমার হয়ে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। আমার বোধহয় কাল বৌভাতে যাওয়া ঘটে উঠবে না। আপনি আমার হয়ে এইটে যৌতুক করবেন—প্লীজ! এখন কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই, তাহলেই এরা চেঁচামেচি করবে, আপনি কাল কথাটা ওকে বলে—দিয়ে

দেবেন। কেমন ?'

সৌজন্য প্রকাশের জন্য যতটুকু পীড়াপীড়ি করা দরকার তা করল সুরেন—যাওয়ার জন্যে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করল, বলল, 'আমি কিন্তু আগে দোব না, আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, আপনি গিয়ে নিজে হাতে দেবেন সেইটেই তো শোভন হবে। কনেও খুশী হবে তাতে।···এ যেন একটা দায়-ঠেলা গোছের হচ্ছে না ?'

'না না, কনে ঠিক বুঝবে যে—যেতে পারলে যেতুম। আচ্ছা, চেষ্টা করব।' এই বলে প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে গেলেন ষোড়শীবাবু।

আর একটু আড়ালে এসে মোড়কটা খুলে দেখল—খুব সরু একটা চেনে পাথর-বসানো লকেট, বেশির ভাগই লাল পাথর আর কুঁচো মুক্তো, লকেটের ভেতর দিকে, যেখানটা গায়ে লেগে থাকে তাতে খোদাই-করে নাম লেখা—'ষোড়শী'।

ফেরার সময় বরযাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। ধনুবাবুর ছেলে শেষরাত্রেই জাহাজ-ঘাটায় চলে এসেছিল, পূর্ণবাবুর ছেলেও তাই। তাদের ঐ মশায় ঐ রকম শয্যায় এইসব সঙ্গীদের সঙ্গে শোওয়া অভ্যেস নেই—বাইরে বসে বসে সিগারেট খেয়েই রাত কাটিয়েছে তারা, চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে—কেউ ওঠার আগেই—সুরেনকে বলে চলে এসেছে! আর যারা, বেশির ভাগই ছ'টায় স্টীমার ধরেছে। বাকী বর-কনে, নিমাইয়ের জ্ঞাতিভাই দু'জন, বিশ্বনাথবাবু, হেমন্তদের ভাড়াটেদের ছেলে একটি, পাশের বাড়ির একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের গোলগাল বোকা-বোকা ছেলে আর সুরেন। পুরুত-নাপিত দশটার সময় চলে এসেছে। সুরেনের বড় পিসীর ছেলেরা এসেছিল এদের সঙ্গে—কিন্তু তারা থেকে গেল, পরের দিন কন্যাপক্ষর সঙ্গে আসবে।

কনের ভাইবোন কাউকে সঙ্গে দেবার কথা বলেছিল সুরেন, কি ঝি একটি—যেমন দস্তুর—তাতেও অবিনাশবাবু ঝেঁজে উঠেছেন, 'আমাদের কি ঝি রাখার অবস্থা যে ঝি দোব ? বাবুদের ঝি দোব—সে বড়লোকের ঝি কি বলবে এসে না বলবে—মাঝখান থেকে শতেক কথা উঠবে। আর ভাইবোন কাকে দোব বলো—সে রকম সঙ্গে যাবার মতো কেউ নেই। তোমাদের মধ্যে গিয়ে কথাবার্তা ভাল বলতে পারবে না, ভয় পাবে। কাল বৌভাতে যাবে তারই কাপড়-জামা নেই—হয়ত কারও যাওয়াই হবে না।'

স্টীমারে উঠে বর-কনেকে এক জায়গাতেই বসিয়েছিল সুরেন, নিমাই খানিকটা পরে ওদিকে উঠে গেল। সম্ভবত বিড়ি খেতে। আর যারা—তারা লজ্জাতেই দূরে দূরে রইল। বেচারী কনে-বৌ একা বসে—শুকনো মুখে। স্বভাবতই আসবার আগে যথেষ্ট কান্নাকাটি করেছে। সকাল থেকেই কাঁদছে তাও লক্ষ্য করেছে সুরেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, উদ্বেগে এবং বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার বেদনায়—চোখ-মুখ বসে গিয়েছে বেচারীর। আসবার সময় বমি করেছে একবার। যেটুকু যা সকালে ওরা খাইয়েছিল জোর ক'রে, সবই উঠে গেছে। এখন এইভাবে সর্বপরিত্যক্ত গোছের একা পড়ে গিয়ে আরও যেন ভয় পেয়ে কেমন হয়ে পড়েছে বেচারী।

সুরেন এদিকে-ওদিকে খুঁজে দেখল ওদিকের রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে নিমাই বিড়ি খাচ্ছে আর জ্যাঠতুতো ভাই নিতাইচরণের সঙ্গে গল্প করছে। কাছে গিয়ে বলল, 'এ

কী করছেন নিমাইদা, বৌদি একা বসে রয়েছে ! একটু কাছে থাকুন, গল্পগুজব করুন—'

'তুমি যাও না ভাই, একটু কথাবার্তা বলো না !···ওসব লেখাপড়াজানা মেয়ে, শহরে ছিল, তায় গান জানে—খাসা গাইলে কাল বাসরঘরে, আবার বড়লোক জমিদারের আওতায় গিয়ে পড়েছে—আমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত, তার উপরি মিস্তিরির কাজ করি—কী বলব না বলব, প্রথম থেকেই বিগড়ে যাবে। আমার ভাই ভয়ই করছে একটু, সত্যি বলছি। তুমি যাও, একটু কথাবার্তা বলোগে। সত্যিই তো, একা পড়ে গেছে—আবার হয়ত কান্নাকাটি লাগাবে।'

তার পর আরও একটু গলা নিচু ক'রে বললে, 'নামটা শুনেছ তো ? একেবারে হালফ্যাশানের বিবি-বিবি নাম, মণিকা। আগে বুঝি রেণুকা ছিল, কী নাকি পরশুরামের মায়ের নাম অপয়া বলে ষোড়শীবাবুরা পাল্‌টে মণিকা করে দিয়েছেন। নাম শুনেই তো পিলে চমকে গেছে।···আমাদের বাড়ির যত বৌ এসেছে—এই জ্যাঠাইয়ের নামই যা শহুরে হালফ্যাশানের। নইলে সবই ঠাকুর-দেবতাদের নাম, কেবল বৌদির নামটাই যা—'

শেষ অবধি শোনার আর ধৈর্য রইল না, সেখান থেকে চলে এল সুরেন। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। সে যত ঘনিষ্ঠতা এড়াতে চাইছে এদের সংসারের সঙ্গে, ততই যেন ভগবান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন ঐ দিকে।

কিন্তু তবু বৌটির মুখের দিকে চেয়ে—করুণ অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ে দূরে থাকতেও পারল না, কাছে গিয়ে বসতেই হল।

কী কথা কইবে খুঁজেই পায় না। কখনও এ ধরনের আলাপ শুরু করতে হয় নি ওকে। অনেক ভেবে, ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে বৌদি ?'

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, মাথা নিচু করল শুধু। তবু সুরেনের মনে হল যে, ওর সাহচর্যটা ভালই লাগল তার।

'খুব একা-একা লাগছে, না ? ভয়-ভয় করছে একটু—কোথায় যাবেন, কাদের মধ্যে—ভাবনা হচ্ছে ?'

এবার ঈষৎ একটু ঘাড় নাড়ল মণিকা, সমর্থনসূচক।

'ঐ জন্যেই বলেছিলুম আবুইমশাইকে যে, আপনার ভাইবোন কাউকে সঙ্গে দিতে, একেবারে সব অপরিচিত লোকদের সঙ্গে যাওয়া—'

'সে রকম কেউ নেই যে।' আস্তে আস্তে প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ভাই বড্ড ভীতু, আর দুই বোনের পর ভাই তো, বিষম আব্‌দেরে আর জেদী, ওকে কুটুমবাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। ছোট বোন খুকী এখনও বিছানায় ইয়ে ক'রে ফেলে। সঙ্গে যাবার মতো এক আমার পরের যে বোন বাসন্তী—তাকে বলেছিলাম, সে আসতে চাইল না, সে একটু ময়লা তো, বলে, 'হ্যাঁ, তুমি সুন্দর—তার সঙ্গে আমি এই কুচ্ছিত গিয়ে দাঁড়াই আর সকলে টিটকিরি দিক !' কোথাও যেতে চায় না ও আমার সঙ্গে। মাও পাঠাতে চাইলেন না, বড় হয়ে গেছে তো ? চোদ্দ-পনেরো হবে তা।'

সুরেন হেসে একটু তামাশার সুরে বলল, 'ও, আপনি যে সুন্দর দেখতে তা আপনি বেশ জানেন, অহঙ্কারও একটু আছে !'

'না না, তা কেন? বা রে!' অপ্রতিভ হয়ে ওঠে মণিকা, একটু সহজও হয়, 'ও বলে তাই বলছি। আমি কি বলেছি আমি সুন্দর!'

'আপনার কি সে বিশ্বাস একটুও নেই, সত্যি ক'রে বলুন তো?'

দেখা গেল মেয়েটি বোকা নয় আদৌ। অনায়াসে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি-আপনি ক'রে বলছেন কেন? বৌদিকে কেউ আপনি বলে?'

'বৌদিই বা দেওরকে আপনি বলছে কেন?' সুরেন হেসে জবাব দেয়।

'দেওর যে বয়সে বড়, সে 'তুমি' বলতে শুরু না করলে বৌদি বলে কোন্ সাহসে?'

'ঠিক আছে। দু'জনেই বলব এবার। কেমন তো?'

হেসে ঘাড় নাড়ে মণিকা।

'খুব মন-কেমন করছে, না? ভাইবোনদের জন্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ম্লান হয়ে ওঠে আবার। মাথা নিচু করে বলে, 'খুকীটা বড্ড ন্যাওটো আমার। মা তো সংসারের কাজ ক'রে ওকে দেখতেই পারে না। আমিই মানুষ করেছি বলতে গেলে। কী যে করবে—! আসার সময় আছাড়ি-পিছাড়ি ক'রে কাঁদছিল, দেখলেন তো!'

'আবার!' ভুলটা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার পথ খুঁজছিল, এখন মণিকার এই ভুল পেয়ে বেঁচে গেল।

মণিকা তার মধ্যেই একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'এক-আধবার ভুল হবে বৈকি!'

'আচ্ছা, ষোড়শীবাবু আপনাকে খুব ভালবাসেন, না?'

একবার যেন, সুরেনের মনে হল, চকিতে একটা রক্তাভা খেলে গেল মণিকার সুগৌর কপোলের ওপর দিয়ে, একবার যেন একটু ত্রস্ত দৃষ্টিতে এক লহমা দেখে নিল সুরেনের মুখটা—কথাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে চাইল—তারপর মাথা হেঁট ক'রে সদ্যপ্রাপ্ত চুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ষোড়শীবাবু আমাদের খুবই ভালবাসেন। খুব ভাল লোক উনি। উনি না থাকলে আমাদের বোধহয় উপোস ক'রে মরতে হত।'

এরপর দু'জনেই চুপ ক'রে গেল কিছুক্ষণ। খুব আস্তে আস্তে চলছে স্টীমারটা। এতক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে গিয়ে ভেড়বার কথা। ইঞ্জিনে কোন গোলমাল হয়েছে না গঙ্গায় কোথাও চড়ার ভয়,—এমনি কোন কারণেই গতি মন্থর হয়েছে। হু-হু ক'রে দক্ষিণা বাতাস বইছে। একটু গরম হয়ে এসেছে বাতাস এরই মধ্যে—গঙ্গার ওপরে বাতাস দিলে শীত করারই কথা, কিন্তু এখন আরাম লাগছে। দূরে কলকাতার বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্টের চুড়োটা, খিদিরপুরের ডকে জাহাজ বাঁধা। এদিকে ছোট ছোট গ্রাম, নিবিড় নারিকেল বন, মধ্যে মধ্যে ইটখোলায় কাঁচা ইট শুকোচ্ছে নদীর পাড়ে। চারিদিকে একটা শান্ত নিশ্চিন্ততার ভাব।

হঠাৎ নিমাই এসে পিছন দিকে দাঁড়াল।

'কী হল, তোমরা সব চুপচাপ যে!···তোমার বৌদি খাসা গান গায় হে সুরেন। শোন না একটা! কাল আমি তো শুনে—হাঁ। আমার হাতে পড়ে কি আর এসব—! শোন শোন। আমি থাকলে লজ্জা পাবে, আমি চলে যাচ্ছি। এই খোকা, তুমি এসে

বসো না বৌদির কাছে। গাইতে-টাইতে বলো না একটু!'

অভাবনীয় মূল্যবান জিনিস হাতে পেলে ছেলেরা যেমন সবাইকে তার সব গুণগুলো দেখাতে চায়—নিমাইয়েরও তেমনি মনের ভাব কতকটা।

'শুনেছি তো আপ—না মানে তুমি গান জানো, গাও না একটা!' অগত্যা সুরেন অনুরোধ করে।

লজ্জায় মাথাটা আরও ঝুঁকে আসে মণিকার। বলে, 'পরে শোনাব এখন। ওখানে গিয়ে।'

'সে তো শুনবই। এখন একটা হোক না!'

'এই সকলের সামনে—? অনেক লোক যে চারদিকে!'

'কাছাকাছি তো কেউ নেই। এমনিই এ সময়ে ভীড় থাকে না বিশেষ। এই স্টীমার গিয়ে যখন আবার ফিরবে তখন দেখবে ভীড়।'

নিমাইদের পাশের বাড়ির যে মোটাসোটা ছেলেটি এসেছিল, সে এবার কাছ ঘেঁষে বসে বললে, 'করো না বৌদি একটা গান! গুনগুন ক'রেই গাও না!'

'কার কাছে গান শিখলে?' সুরেন আবার প্রশ্ন করে।

'কারও কাছেই না। কলকাতায় যে বাড়িতে ভাড়া থাকতুম, সেই বাড়িওলার মেয়ে গান শিখত মাস্টারের কাছে, আমি তাই শুনে শুনে শিখেছি—এক-আধখানা। এখানে এসে ষোড়শীবাবুর গ্রামোফোন আছে—তা থেকেও তুলেছি দু-চারটে গান। ঐ গোটা দশ-বারো, সব জড়িয়ে। শেখার মতো কিছু নয়। হার্মোনিয়ামও বাজাতে জানি না।'

সেই ছেলেটি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তাগাদা করল, 'আবার সব বাজে কথা হচ্ছে! ও বৌদি, ধরো না একটা গান!'

'গাও না ভাই বৌদি' সুরেনও বলে, 'জাহাজ তো থেমে গেল দেখছি। কখন পৌঁছবে তার ঠিক নেই।...ওখানে অনেক কাজ, সকাল ক'রে ফেরা উচিত ছিল।'

সে চুপ করতে একটু নীরব থেকে গুনগুন ক'রে গান ধরল একটা মণিকা।

'জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি,
ও কে নিল হরি, মরি মরি!

* * *

যার লাগি ফিরি একা একা
আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা
তারি বাঁশী ওগো তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি—'

সাধারণ মিষ্টি গলা, তবে সুরজ্ঞান আছে—গান শুনলে সেটা বোঝা যায়। যত্ন ক'রে শেখালে ভাল গাইয়ে হত। ওখানেই কি হবে? পিসী হয়ত শেখাতে চাইবেন, কিন্তু ছেলেপুলে হয়ে গেলে সংসার ঠেলে কি আর গান শেখা হবে?

গান কখন শেষ হয়ে গেছে তা হুঁশও ছিল না সুরেনের। গানটার সুর মনের মধ্যে কোথায় একটা যেন বিশেষ তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে। গঙ্গার জলে অপরাহ্নের আলো,

উদাস-করা বাতাস আর এই বিরহকরুণ সুর—সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা গুমরে উঠছে, যার কোন অর্থ নেই, প্রত্যক্ষ কারণও নেই। কী পাওয়া হল না জীবনে—কি এল না, আসবেও না কখনও—এমনি অজ্ঞাত একটা অভাববোধ।

একটু পরে মণিকাই প্রশ্ন করল, 'ভাল লাগল না, না?'

চমক ভেঙে উত্তর দিল সুরেন, 'না না, খুব ভাল লেগেছে—ভাল লেগেছে বলেই তো সুরের মধ্যে অমন তলিয়ে গিয়েছিলুম। খুব ভাল লেগেছে।...আর একটা গাইবে?'

'এখন থাক ঠাকুরপো।' মিনতির সুরে বলে, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

'তবে থাক। ইস, আমারই এটা ভাবা উচিত ছিল। যা ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, আর যা কান্নাকাটি!'

সেই ছেলেটি উঠে গেল ওদিকে, বিলম্বের কারণ জানতে। জাহাজটা প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এখন আবার চলতে শুরু করেছে। তবে এখনও আস্তে আস্তে যাচ্ছে খুব।

একটু পরে অকারণেই খাপছাড়াভাবে মণিকা বলল, 'এই গানটা ষোড়শীবাবু খুব শুনতে ভালবাসেন—আমার গলায়।'

বলেই যেন বুঝল যে, কথাটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক—হঠাৎই অপ্রতিভভাবে চুপ ক'রে গেল।

'ষোড়শীবাবু একটা জিনিস দিয়েছেন তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে? কি জিনিস?' নিমেষে যেন উদ্‌গ্রীব, কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে মণিকা।

'সেটা কাল দিতে বলেছেন, কনে সেজে যখন বসবে। কালই দেখো।'

সুরেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো বলে।

মণিকা চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ। অবসন্ন ক্লান্ত মুখটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে কিনা, তা ঠিক বোঝা যায় না। খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, 'তার মানে কাল আসবে না। আমাকে মিছে ক'রে বললে, নিশ্চয় যাব।'

বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে স্টীমার এসে দাঁড়ায়। বহু লোক নেমে যায়—ওঠেও কিছু। এবার যাত্রা ওপারে—সামনে চাঁদপাল ঘাটে। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নামার জন্যে। নিমাইও এগিয়ে আসে, তবে তখনও পাশে বসে না।

তারই মধ্যে চুপি চুপি একটু যেন ভয়ে ভয়েই এক সময় মণিকা বলে, 'আমার একটা ব্যাপারে কিন্তু বড্ড ভয় করছে ভাই ঠাকুরপো! কী বলবেন জ্যাঠাইমা কে জানে! খুব রাগ করবেন হয়ত—'

'তুমি ওঁকে মা-ই ব'লো বৌদি, মায়ের মতোই তো। কিন্তু ভয়ের কী আছে? খুব ভাল লোক, অনেক আঘাত পেয়েছেন, তাই মাঝে মাঝে হয়ত রেগে ওঠেন, কিন্তু আসলে রাগী বা ঝগড়াটে নন।'

'তা নয়—মানে—সে আপনাকে বলতে পারব না! হওয়ার কথা নয়—হঠাৎ কাল—কি ভাববেন কে জানে!'

সুরেন যেন চমকে উঠল। ঘটনাটায় নয়—তাকে এই কথাটা বলায়। তারপর

বুঝল, আর কেউই নেই সঙ্গে যাকে এটা বলতে পারে, অথচ ভয়ও স্বাভাবিক, নিতান্ত বাধ্য হয়েই বলেছে।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'সেই অবস্থাতেই বিয়েটা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, উপায় ছিল না নাকি। তখন কি আর বিয়ে বন্ধ করা যায় !'

'তুমি পিসীমাকেই কথাটা খুলে ব'লো। রাগ করবেন কেন, তিনি কি অবুঝ ?'

সব কথাবার্তার মধ্যে—নিজের মনের বিষণ্নতা, বুকচাপ ভাবটার কোন কারণ খুঁজে পায় না সুরেন, তার মন সেই কথাটাই ভাবে।

॥ ২৪ ॥

বৌ দেখে হেমন্ত খুব খুশী। আনন্দে যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল সে। সুরেনের গলা ধরে মাথাটা নামিয়ে চুমোই খেয়ে ফেলল একটা তার গালে। বললে, 'তুই লজ্জা পাবি তাই, নইলে কোলে তুলে নাচতুম !'

সুন্দর শুনেছিল, কিন্তু এতটা সুন্দর হবে ধারণা করতে পারে নি। গান শুনে আরও মুগ্ধ। এই ধরনের মার্জিত রুচির গান জানে, তা সুরেনও আশা করে নি। যা গাইল—রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তর গান। দু-একজন প্রবীণার অনুরোধে একটা পুরনো দেহতত্ত্বর গানও গাইল। তবে বেশী গান জানে না—সেটা বার বারই বলল ওঁদের, মোট পুঁজি ওর বারো-চোদ্দখানার বেশি নয়। সুরেন যা বলেছিল—হেমন্ত তখনই বলে দিল, 'তুই একটা ভাল মাস্টার দ্যাখ সুরেন, আমি ওকে গান শেখাব ভাল ক'রে।...এ একটা আলাদা শান্তি।'

তবু, স্বভাবটা কি রকম দাঁড়াবে—সে সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ছিলই। তাতেও 'পাস' হয়ে গেল মণিকা। ঠাণ্ডা মেজাজ, আস্তে কথা বলে। নতুন অভ্যাস শুরু—তবু মাথার কাপড়ও সরে না। শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, রাত্রে প্রত্যহ পা-কোমর টিপে দেয়। শুতে যাবার সময় হলে হেমন্তর কোলে মুখটা গুঁজে বলে, 'আপনার কাছেই শুই না মা—কি হয়েছে ?' হেমন্ত হেসে মুখটা তুলে আদর ক'রে বলে, 'না মা, তা কি হয় ? সে জন্যে কি আর নিমে বিয়ে করেছে ?...না কি তোমারই ভাল লাগবে ? যাও মা, শুয়ে পড়ো গে, আমিও কপাট বন্ধ করি।'

ষোড়শীবাবুকে কেন্দ্র ক'রে সুরেনের মনে যে একটা সূক্ষ্ম সংশয়ের কাঁটা ছিল, সেটাও উঠে যায় আস্তে আস্তে। এ পক্ষ থেকে যে কোন আকর্ষণ আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিয়ের পর বাপের বাড়ি গিয়ে মাত্র আট-দশ দিন ছিল, আরও বেশী দিন থাকার জন্যে কোন বায়না তোলে নি বা ফিরে এসেও ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে আবদার ধরে না। বরং বাপের কোন ভাল চাকরি হয় কিনা—হওয়া সম্ভব কিনা—সেই কথাটাই বলে বার বার। হেমন্তকেও ধরে মধ্যে মধ্যে, 'আপনার তো শুনেছি অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে জানা-শুনো—দিন না মা একটা কিছু ক'রে! ওখানে বলতে গেলে পেটভাতায় থাকা—একটুও ভাল লাগে না। বাবা চিরদিন ভাল চাকরি করেছেন, খরচের হাত—অভাব-অনটনে যেন কেমন হয়ে গেছেন—কথায় কথায় চটে যান, ক্ষেপে ওঠেন একেবারে।'

সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেমন হওয়া উচিত তেমনিই। চেষ্টা ক'রেও কোন অসঙ্গতির সুর বার করা যায় না তা থেকে।

ষোড়শীবাবুর কথা উঠলেও সহজভাবেই আলোচনা করে। তিনি ওকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁদের অন্তঃপুরে ওর যাতায়াত ছিল। ইদানীং এমন কি কোন কোন দিন লোহার সিন্দুকের বা আলমারীর চাবি ওকে দিয়ে বলতেন টাকাকড়ি কাগজপত্র বার ক'রে আনতে, কখনও কখনও গুছিয়ে তুলে রাখতেও বলতেন। আদর ক'রে বলতেন, 'সেক্রেটারী।'···সে জন্যে যে ও-বাড়ির কেউ কেউ ঈর্ষার চোখে দেখত বা এখনও দেখে—সে কথাও সরলভাবেই স্বীকার করে। কৌতুকের হাসি হাসে।

সহজভাবে আলোচনা করে বলেই দুশ্চিন্তাটা কেটে যায় সুরেনের—অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

নিশ্চিন্ত হতে পারে না নিজেকে নিয়েই।

যেটা সে প্রথম থেকে ভেবেছিল, সেটাই হয়ে ওঠে না।

মনে মনে অনেকবার নিজেকে শাসিয়ে ছিল সে, নিমাইয়ের বিয়ের পর—অনুষ্ঠানগুলো চুকে গেলেই সে এ বাড়ি আসা কমিয়ে দেবে, ফি রবিবারেও আর আসবে না।···যেমন ছিল সে তেমনিই থাকবে। এ মায়ায় আর জড়াবে না—এ ঝঞ্ঝাটে থাকবে না।

সেটা আর হয় না কিছুতে। বরং ক্রমশই যেন আরও জড়িয়ে পড়ে। ছুটির দিন ছাড়াও প্রায়ই আসতে হয়। না এলে এমন করুণ মুখে অনুযোগ করে মণিকা, এত দুঃখ করে—আসবার সময় কাকুতি-মিনতি করে পরের দিনই আসবার জন্যে, এমন ছোটখাট ফরমাশ চাপিয়ে দেয় যে—না এসে থাকতে পারে না সুরেন।

অনুরোধ অবশ্য নিমাইও করে। বলে, 'আমি তো জানই একে মুখখু তায় পাড়াগেঁয়ে ভূত, তায় মিস্তিরির কাজ করি যত রাজ্যের খোট্টাদের দলে—আমার সঙ্গে কথা কয়ে কি ওর সুখ হয়? সেটা আমি বুঝি, প্রেথম প্রেথম দুটো-চারটে কথার পরই বলা ফুরিয়ে যায়।···তুমি এলে একটু আনন্দে থাকে তবু। অল্পবয়িসী বলতে তো আর বাড়িতে কেউ নেই। দুপুরে তবু এবাড়ি-ওবাড়ির বৌ-ঝিরা আসে এক-আধজন বেড়াতে—সন্ধ্যেটা কাটে না একেবারে। জ্যেঠাই হয় পুজোয় নয় রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে—বেচারা একেবারে একা পড়ে যায়।'

বলেন পিসীমাও, 'আসিস না বাবা একটু! বলি যে এখানেই রাত্তিরটা নিদেন খাওয়ার ব্যবস্থা কর—তা তো করবি না, কি যে তোর গোঁ বুঝি না—অন্তত এমনিই আয়।'

এতেই আরও অস্বস্তি লাগে সুরেনের। অসুবিধাও হয়—তা এঁরা বোঝেন না। খাওয়া রাত্রে একরকম হয়েই যায়—জলখাবার যা দেন তাতেই। সেও, পিসীমা খানিকটা পীড়াপীড়ি করেন, সেটা যদি বা এড়ানো যায়—মণিকা এমন জেদ ধরে আব্‌দার করে যে—'না' বলতে পারে না। 'এটা আমি করেছি ঠাকুরপো, এই তরকারিটা আমি রেঁধেছি—ও কি, উঠছেন কি, এই পরোটাখানা আমি নিজে হাতে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম যে, বা রে—এ কে খাবে?' ইত্যাদি। ফলে বাড়ি গিয়ে

আর রাঁধতে ইচ্ছা করে না অত রাত্রে। সেদিনও পর্যাপ্ত খাওয়া হয় না, পরের দিনেরও কোন ব্যবস্থা থাকে না। কোন কোন দিন রাত চারটেয় উঠে ভাতেভাত চাপিয়ে দেয়—সেও রোজ অত ভোরে উঠতে ইচ্ছে করে না।

এটা অসুবিধার দিক। অস্বস্তির কারণ অন্য, এ ছাড়াও। মেয়েটি তাকে যেন ক্রমশই বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরছে। বিকেলে ছাদের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দূর থেকে আসতে দেখলেই দুড় দুড় ক'রে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়—'প্রথম দেখা হল আমার সঙ্গেই' বলে ছেলেমানুষের মতো খুশী হয়ে ওঠে। যত মনের কথাও যেন সারা দিন ধরে জমিয়ে রাখে—ওর জন্যেই। না এলে যে ম্লান হয়ে যায় আউতে-পড়া-ফুলের মতো—তা এক-আধদিন আসার অভ্যস্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এসে পড়ে—লক্ষ্য করেছে সুরেন। যেদিন আসা হয় না তার পরের দিন তো কাঁদো-কাঁদো হয়ে থাকে একেবারে।

নিমাইও আজকাল প্রায়ই সকাল সকাল ফেরে, কিন্তু তার সঙ্গে গল্পে জমে না। বিশ্বব্যাপী 'ডিপ্রেসন' চলেছে, কাজ-কারবার সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বেকার, কোথায় কোন দেশে কত হাজার ছোকরা (না কি এক লাখ?) কাজকর্ম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, গান্ধী যে কত ভুল করছে, সি আর দাসের চালটা ধরতে পারছে না—এই সব আলোচনাতেই তার উৎসাহ। নিজে কাগজ পড়ে না, অথবা পড়ে মানে বুঝতে পারে না, এসব তথ্য বা সংবাদ আপিসের 'বাবু'দের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে নিজের পাণ্ডিত্য এবং রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। লেখাপড়া জানে না বলেই বোধ হয় এই ঝোঁক তার এত বেশী। এ বাড়িতে 'বসুমতী' কাগজ আসে একখানা ক'রে, গত ক'বছর ধরেই নিচ্ছে হেমন্ত, দুপুরে মণিকাও একটু-আধটু পড়ে বসে। নিমাই ভুলভাল বললেই টপ ক'রে ধরে ফেলে—এবং তখন তার কণ্ঠস্বর অকারণেই তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। সেটা সুরেনের ভাল লাগে না, তার কানে বাজে। অকারণে—মানে বাইরের খবর শুনে এসে একটু ভুল বললে এতটা বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। এ যেন বড় বেশী। একটা অশোভন জ্বালাই প্রকাশ পায়। নিমাই অবশ্য অত বোঝে না, রাগও করে না। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে খানিকটা আমতা-আমতা ক'রে সরে পড়ে।

অবশ্য বেশীক্ষণ বসা তার হয়েও ওঠে না—দোকান-বাজার বাইরের যত কাজ বিকেলের জন্যেই তোলা থাকে, চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ে। ফেরে যখন—সুরেনের ওঠার সময় হয়ে যায়। অন্তত ওঠার চেষ্টা করে সে তখন থেকেই।

স্বামী সম্বন্ধে মণিকার মনোভাবটা যে সশ্রদ্ধ নয়—সেটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই শঙ্কিত বোধ করে সুরেন। শ্রদ্ধা না থাকলে প্রেম থাকা সম্ভব কি?—এইটেই প্রশ্ন করে নিজেকে বার বার। ঘর করে—এমন অনেকেই করে, বিবাহটা অচ্ছেদ্য বন্ধন মেনে নিয়ে, এরকম অনেককে দেখেছে—কিন্তু দাম্পত্য প্রেমটা গড়ে ওঠে না। পুরুষ বা স্ত্রী একজনের দৈহিক কামনা থাকে, হয়ত দু'জনেরই থাকে, ছেলেপুলেও হয়—তবু, ভালবাসা যাকে বলে, একাত্মতা, তা খুব কম দম্পতির মধ্যেই গড়ে ওঠে।

তা হোক—মানিয়ে নিয়ে চলতে পারলেই হল।

মণিকা সেটুকুও পারছে কি ?

দু-চার মাস যেতে সেই সন্দেহটাই বদ্ধমূল হয় সুরেনের মনে। এক-আধটা কথায় অবজ্ঞা—হয়ত-বা বিতৃষ্ণাও ফুটে ওঠে, মণিকার অজ্ঞাতসারেই !

'ঠাকুরপো, তোমার দাদা বিড়ি খায় কেন ভাই ? বলে-কয়ে বকে-ঝকে বন্ধ করাতে পারো না ? মা গো, কি বিচ্ছিরি গন্ধ, বমি আসে কাছে এলে।…কোনদিন ঐ গন্ধটা আমি সইতে পারিনে। বাবা মধ্যে ধরেছিলেন—তা-ই আমি কাছে যেতুম না, শেষে আমার জন্যেই ছেড়ে দিলেন, এখন এক-আধটা সিগারেট খান, মানে পেলে—নইলে কিছুই খান না। সেই আমার কপালেই বিড়িখোর জুটল !'

সুরেন হাসে—যদিও মনের মধ্যে সে হাসির সমর্থন পায় না। বলে, 'পারলে তুমিই ছাড়াতে পারবে বৌদি, ও কি আমাদের কাজ !…পিসীমা কত গালমন্দ দেন গন্ধ নাকে গেলে—সে তো তুমিও শুনেছ, তা-ই বন্ধ হয় না, আমি আর কত বকাঝকা করতে পারব যে, বন্ধ হবে !'

আবার হয়ত কোনদিন মণিকা বলে, 'বড্ড বাজে বকে ভাই তোমার দাদা। আমার যেন বিরক্ত লাগে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে—এটা-ওটা বকেই যাচ্ছে অনবরত !'

কোন কোন দিন, হেমন্তর আড়ালে, নিজেই ধমক দেয় নিমাইকে, 'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। একটু চুপ করো তো। উঃ, সেই এসে পর্যন্ত সমানে বকছে। মুখও ব্যথা করে না। আমাদের তো শুনতে শুনতেই মাথা ধরে গেল !'

নিমাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, চুপ ক'রে যায়। মাথা চুলকোতে চুলকোতে সেখান থেকে সরে পড়ে একটু পরেই।

এইগুলোই ভাল লাগে না সুরেনের। এর বহুদূরপ্রসারী ফল দেখতে পায় সে মনে মনে।

আর সেই সঙ্গেই বোঝে যে, এখানে এমনভাবে দিনে দিনে জড়িয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। তার এ বাড়ীতে আর না আসাই উচিত, অন্তত খুব কমিয়ে দেওয়া উচিত যাওয়া-আসাটা।

তবু সেটাই হয়ে ওঠে না। বার বার সংকল্প করা সত্ত্বেও।

দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ স্নেহ-বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবন—আশাহীন, আনন্দহীন—অবলম্বনহীন—এই আকুলতা ও পথচাওয়ার, অনুযোগ ও অনুরোধের আকর্ষণ এড়াতে পারে না। বুদ্ধি-বিবেচনার সতর্কবাণী, হিসেব-নিকেশ সব এক প্রবল অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগের টানে কোথায় ভেসে চলে যায়।

শেষে বুঝি দৈবই বাঁচিয়ে দেয় সুরেনকে। অথবা ওর গুরুবল।

ছোট্ট ঘটনা, শুনলে হাস্যকর, ছেলেমানুষীই মনে হয়—তবু তাতেই চৈতন্য হয়। ওরও, হেমন্তরও।

যত দিন কেটেছে, সংযত হওয়া, ব্যবধান রচনা করা দূরের কথা—সুরেন যেন বেশী ক'রে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা হেমন্তও যে লক্ষ্য করে নি তা নয়, তবে তার মধ্যে

দুষ্য কিছু আছে ভাবে নি। মা-বাবা-ভাইবোন থেকে দূরে একা পড়ে আছে একটা টিনের ঘরে, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়—না পায় কারও স্নেহভালবাসা, না পায় কোন মধুর সাহচর্য। এখন যৌবন কাল, স্ত্রী-সঙ্গ তো একরকম প্রয়োজনই—অথচ সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কোন ভাল চাকরি পেলে তবে ; যা দিনকাল, সে আশা করাও বাতুলতা। বোনেদের বিয়ে দিয়ে নিজে বিয়ে করবে, তত দিনে আবার ভাইঝিরা বড় হয়ে উঠবে। তাছাড়া নিজেও তো বুড়িয়ে যাবে। বিয়ের বয়স কি থাকবে?

নাঃ, সে আশা বিশেষ নেই। সুতরাং দু'টো দিন এখানে যদি একটু শান্তি পায় —পাক না। ছোট বোনের মতো—আবদার অনুযোগ করে, আদরযত্ন করে—সেটা ভাল লাগা স্বাভাবিক। আর তাতে দোষই বা কি! থাকে তো বড়জোর মেরেকেটে দু-ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা। আরও, আজকাল প্রায়ই ফিরতে দেরি হয়ে যায় বলে এখানে খেয়েই যায় বেশির ভাগ দিন, সেও একটা শান্তি হেমন্তর। সে রাত্রে ভাত খাইয়ে পরের দিনের রুটিও এখান থেকেই ক'রে দিতে চেয়েছিল—সুরেন কিছুতে রাজী হয় নি। তবু রাত্রের খাওয়াটা চোখের সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারে সেও কম তৃপ্তি নয়।

সুরেনও যে বুঝতে পারত না তা নয়। কিন্তু ক্রমশ, জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা-হিসাব-বোধের ওপর আবেগের এই প্রাধান্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল। আজকাল আর অতটা ভাবতও না। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক, কতকটা এইরকম হয়ে উঠেছিল মনের ভাব। এখানের হাস্য-পরিহাস দু-একখানা গান, কিছুটা প্রীতির প্রকাশ—জোর ক'রে এটা-ওটা খাওয়ানো, জোর ক'রেই বাতাস করা, ময়লা গেঞ্জি ছাড়িয়ে নিয়ে জোর ক'রে সাবান দিয়ে কেচে দেওয়া—এই ধরনের ছোটখাট সেবার চেষ্টা—সব জড়িয়ে যে মধুর স্মৃতি—বাসায় ফিরে গিয়ে সেটারই রোমন্থন চলত—তার মধ্যে বিবেক বা পরিণত বুদ্ধি প্রবেশের পথ খুঁজে পেত না ওর মস্তিষ্কে। সুখ-স্মৃতির এই পুনরাস্বাদনের মধ্যে যেন কোথায় একটা মুক্তি, একটা অবকাশের আস্বাদন লাভ করত।

এক-আধ দিন বিশ্বনাথবাবু মৃদু ঠাট্টা করতেন, 'কি হে, ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে!...নাঃ, যা দেখছি ক'দিন পরে ওখানে গিয়েই বাসা বাঁধবে।...আমার আড্ডাটাই দেখছি ভেঙে গেল! রান্নাবাড়া চুলোয় যাক—রাত্রে কখন ফেরো তাই টের পাই না।... আর যা সব লোক, দু'টো কথা কইব সে মানুষ নেই।...তা সোজাসুজি পিসীর বাড়িই গিয়ে উঠলে পারো, আপন পিসী তো—পর তো আর নয়?'

এ ঠাট্টার মধ্যে কোন খোঁচা বা জ্বালা ছিল না বলেই অত গায়ে মাখত না সুরেন।

চৈতন্য হল অন্য ঘটনায়। অন্য আঘাতে।

হেমন্তর বাড়ির ছাদে অনেক ফুল গাছ ছিল,—টবে-টিনে-ডাবায়। ফুল কেন—একটা পেয়ারা গাছ একটা লেবু গাছও ছিল। ছোটখাট বাগান বলা যায়। ঘোলা জলের ট্যাঙ্ক আছে ছাদে, আগে ঝিরা জল দিত, এখন মণিকাই দেয়। তারও গাছের শখ খুব, ক' বছর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে সেটা আরও বেড়েছে—নিজের গরজেই যত্ন করে, পরিচর্যা করে। আগে এখানেই—এই ফুল গাছের মধ্যে ওদের সান্ধ্য আড্ডা বসত, মাস খানেক হল

হেমন্ত মণিকাকে সন্ধ্যার পর ছাদে যেতে বারণ করেছে। এমনিও কোথাও গেলে কি বিকেলে ছাদে উঠলেও খোঁপাতে খড়কে কাঠি গুঁজে দিচ্ছে। অর্থাৎ সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণ। এখনও ঠিক নিশ্চিত নয় হয়ত—তবে সাবধানের মার নেই বলেই এখন থেকে এত সতর্কতা।

সুরেন কিন্তু এই গাছগুলির আকর্ষণেই একবার ক'রে ছাদে ওঠে রোজ। তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে পাড়াগাঁয়ে, গাছপালার মধ্যেই মানুষ বলতে গেলে। এখানে এই সার্পেণ্টাইন লেনের অন্ধ গলির মধ্যে মাটকোঠার জীবন যেন এক-এক সময় অসহ্য বোধ হয়। সত্যি-সত্যিই হাঁফ ধরে সেসব সময়গুলোয়, মনে হয় দু'টো একটা গাছ-পালার মুখ দেখা গেলেও কিছুটা স্বস্তি পেতে পারত। পয়সা বা সময় থাকলে ওখানেই টবে দু'টো গাছ বসাত। ও ঘরের একমাত্র জানলা (জানলা নয়—ঘুলঘুলি বলাই উচিত, এতই ছোট সে) থেকে পেছনের বাড়ির এক টুকরো ছাদ দেখা যায়, সেই কোণটায় আলসের ওপর একটা টবে তুলসী গাছের সঙ্গে একটা হাড়ভাঙার গাছ লাগানো আছে, কোন কোন দিন দম বন্ধ হয়ে আসার মতো ভাব হলে খানিকটা সেই দিকেই চেয়ে থাকে।

এই জন্যই তার পিসীমার বাড়ির ছাদ এত ভাল লাগে। ঊনত্রিশটা টব আছে—টব আর কেরোসিনের টিন মিলিয়ে। এ ছাড়া একটা কাঠের ডাবা। তাতে একটা হাসনু-হানার ঝাড় হয়েছে। এটা এসেছে মণিকা আসার পর, তারই শখে। টিন দু'টোতে আছে লেবু আর পেয়ারা গাছ, এত টুকু-টুকু ফলও হয় মধ্যে মধ্যে। তাতেই যথেষ্ট আনন্দ এদের। এছাড়া সবই ফুলের গাছ—বেল যুঁই রজনীগন্ধা গন্ধরাজ গোলাপ জৈওজষষ্ঠী—এই সব গাছই বেশী। একপেটে টগরও আছে একটা। ভোরে উঠে হেমন্ত কিছু ফুল পুজো করতে তুলে নিয়ে যায়, বেশির ভাগই টবে থাকে।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় এমনিই ছাদে উঠে বেড়াচ্ছিল সুরেন। তখন হেমন্ত ঠাকুর-ঘরে—মণিকা ওর জন্যেই কি একটা খাবার করতে রান্নাঘরে গেছে। এবেলা হেমন্ত এটা-ওটা দেখিয়ে দেওয়া বা যোগাড় দেওয়া ছাড়া রান্না বিশেষ করে না, মাছ থাকে বলে। যা পারে ঠাকুরই করে, ঠাকুর না এলে মণিকা। তবে ঠাকুর থাকলেও সুরেনের জলখাবার তার হাতে ছেড়ে দিতে চায় না মণিকা। ঠাকুরপোর জন্যে নিজে হাতে একটা কিছু ক'রে দিতে না পারলে ওর মন ওঠে না। তা হোক, কেউ না থাক, চারিদিকে এই ফুলের রাশির মধ্যে কিছুক্ষণ একা থাকতে ভালই লাগে সুরেনের। বরং এই অবসরটাই চায় সে।

ফুলের গাছগুলোর সামনে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করল, অনেক দিন পরে মতিয়া বেলের গাছটায় ফুল এসেছে, এক বোঁটায় একসঙ্গে দু'টি ফুল ফুটেছে। বেশ বড়, মাঝারি আকারের গাঁদা-ফুলের মতো এক-একটা ফুল। দেখে এত লোভ হল যে, কেন তুলছে তা ভাল ক'রে ভাবার আগেই, বোঁটাসুদ্ধ জোড়া ফুল তুলে নিল। তুলে একটু ভয়ও হল অবশ্য—পিসিমা যদি কিছু মনে করেন। তিনি হয়ত দেখে গেছেন, পরের দিন সকালে ঠাকুরকে দেবেন বলে চিহ্নিতও ক'রে রেখেছেন ···তবে তার পরই মনে হল, সব ফুল তো পিসিমাও তোলেন না, বলেন গাছ একেবারে ন্যাড়া ক'রে ফুল তুললে বিশ্রী লাগে, গাছ আলো ক'রে থাকে সে-ই ভাল। আর ফুলও তো ফুটেছে অজস্র, তাঁর

পুজোর মতো ঢের আছে।

তোলার পর অতর্কিতে আপনিই একবার মনে হল, এটা মণিকার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে আসে সে।

তারপর এই আকস্মিকভাবে মনোভাবটা নিজের কাছেই ধরা পড়ে যাওয়ায়—নিজের মনের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল, আসলে এটা মণিকার জন্যেই তুলেছে সে। ফুল তার সাধারণত গাছ থেকে তুলতে ইচ্ছে করে না—আজকে এটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত এগিয়ে গেছে এবং কী করছে তা বোঝার আগেই তুলে নিয়েছে—তার পেছনে এই ইচ্ছাটাই কাজ করেছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই। সে সময় ওর মানস-চক্ষুর সামনে যে সুগৌর সুডৌল গ্রীবা ও কাঁধের ওপর এলিয়ে-পড়া বিপুল কালো খোঁপার ছবিটা ছিল, সেটা মণিকারই। এ-ফুল ঐ খোঁপাতেই, ওকেই মানায় ; ও খুশী হবে—এ-চিন্তাটা আপনা থেকেই মনে এসেছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হবার অনেক আগেই হয়ত।

এবার, এই ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল লজ্জা বোধ করল সে। একটা অবচেতন অপরাধবোধের লজ্জা। সেইজন্যেই হাতে ক'রে নিয়ে এসে—খোঁপায় পরিয়ে না হোক, অন্তত ওর হাতে দেবার প্রবল ইচ্ছা হলেও—শেষ অবধি দিতে পারল না ! অনেকবার ইতস্ততঃ করল, কয়েকবার চেষ্টাও করল—কিন্তু একটা রাজ্যের সংকোচ এসে যেন হাত চেপে ধরল, মনের মধ্যে আকুতিটা আকুলি-বিকুলি করা সত্ত্বেও পারল না। পিসীমা কি নিমাইদা কি মনে করবেন, এ-আশঙ্কার থেকেও তার নিজের কুণ্ঠাটাই যেন বেশী।

একবার ভাবল মণিকাদের ঘরে রেখে আসে—তাও পারল না। ওর মাথায় পরিয়ে দেবার জন্যে যা তুলেছিল, তা হাতে দিলেও কিছু তৃপ্তি পেত—শুধু শুধু ঘরে রেখে আসার কোন মানে হয় না। হয়ত নিমাইদাই নিয়ে কানে গুঁজবে কি হাতে ক'রে চটকাবে ! তার চেয়ে পথে ফেলে দেওয়াও ভাল। সুতরাং কিছুই করা হল না, শেষ পর্যন্ত নিজেরই বুকপকেটে রেখে দিল ফুলজোড়াটা।

হেমন্ত দেখেছিল ফুলটা, 'বাঃ, বেশ বড় হয়েছে তো ! বৌমার সার দেওয়াতেই এত বড় হয়েছে এবার !' এছাড়া কোন মন্তব্য করে নি। একটা ফুল তোলা নিয়ে এত বলারই বা কি আছে !

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি যাবার সময়ও ভাবল একবার—বৌদিকে ডেকে দিয়ে যায়, তখনও পারল না। সেই একই সঙ্কোচ। শেষে কতকটা নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

অন্যদিন যাওয়ার সময় নিচের সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়েই চলে যায় সে, ঝি একেবারে রাত্রে ভালভাবে বন্ধ ক'রে দেয়। আজ নিচে নেমে দরজা খুলতে গিয়ে দেখল দরজার ঠিক পাশে ছায়ামূর্তির মতো কে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বিস্মিত হবার, সন্দিগ্ধ হবার কি কোন প্রশ্ন করার আগেই, যে দাঁড়িয়েছিল সে সটান ওর বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে ফুলদুটো বার করে নিয়ে চকিতেই সিঁড়ির নিচের ঘনতর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল।…

বাইরে বেরিয়ে এসে বহুক্ষণ সেইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সুরেন। হঠাৎ যেন পা-দুটো বড় দুর্বল, অনড় হয়ে গেছে। একটা অসহ সুখে, দুরাশার সংশয়-কন্টকিত বেদনায় এবং অনির্বচনীয় চরিতার্থতাতেও—বুকের মধ্যেটা রিন্‌রিন্‌ করছে। এধরনের সমস্ত-ইন্দ্রিয়-অবশ-করা অনুভূতি এই প্রথম তার জীবনে। এ যে সুখ নয়, অধিকতর দুঃখেরই ভূমিকা, সে কথা তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবু এই মুহূর্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কাকে আচ্ছন্ন ক'রে একটা চিন্তাই মনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল, মনে হল—এই মুহূর্তটারই জয় হোক জীবনে। বিবেচনা হিসেব—এ তো রইলই।

এর মাস-দুই আড়াই পরে হেমন্তই একদিন শেষ বিকেলে সুরেনকে 'এই, একবার শোন্' বলে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল।

তখনও অপরাহ্নের আলো একেবারে বিদায় নেয় নি, আলো না জ্বললেও কিছুটা নজর চলে। ছাদে মুঠোর মধ্যে থেকে একটা কি বার ক'রে দেখাল হেমন্ত, 'এটা চিনতে পারিস?'

হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল সুরেন, শুকনো ফুলের মতো কি। আর একটু ভাল ক'রে দেখে চিনল, শুকনো মতিয়া বেলদুটো। এখনও, এত শুকিয়ে গেলেও, এক বোঁটাতেই আছে।

মুখটা শুকিয়ে গেল ওর, বুকের মধ্যে অকস্মাৎ যেন মৃদু যন্ত্রণা বোধ করল একটা। বুঝি রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠারই বেদনা এটা—কিন্তু শুধুই কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায় নয়, বোধ করি একটা অনির্বচনীয় আনন্দেও—ঘটনার অভাবনীয়তায়।

তবু সে মিছে কথাও বলল না। বলার চেষ্টা করাও মূর্খতা সে জানে—হেমন্তর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও শাণিত সহজ বুদ্ধির বহু পরিচয় সে পেয়েছে এর মধ্যে। শুধু বলল, 'পারি।'

হেমন্ত মিনিট-দুই চুপ ক'রে রইল। ও-পাশের মিত্তিরদের বাড়ির ছাদে কে একটি মেয়ে ছেলে-কোলে ক'রে বেড়াচ্ছে; গাঙ্গুলীদের ছাদ থেকে একটা বেড়াল লাফিয়ে ওদের ছাদে যাবার চেষ্টা করছে—মেয়েটি থাকার জন্যে যেতে পারছে না; দূরে বড় রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ হচ্ছে, মোটরের হর্ণ; আকাশে একটা তারা উঠে পড়ল, হঠাৎই—অকূল চিন্তার মধ্যেও হেমন্তর সংস্কার কাজ ক'রে গেল, মৃদুকণ্ঠে 'কপিল' 'কপিল' বলে উঠল একবার; নিচের কলতলায় জল পড়ার শব্দ; পাশের বাড়িতে কোথায় একটা শিশু কেঁদে যাচ্ছে; এমনি নানান তথ্যে দৃষ্টি ও মন দেবার চেষ্টা করল সুরেন। কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে একটা সকারণ অপরাধবোধ ও অকারণ আনন্দের সংঘাতই মনের মধ্যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে—কিছুতে কোনদিকে যেন মন দেওয়া আর সম্ভব নয়।

হেমন্তই নীরবতা ভঙ্গ করল একটু পরে। ধীর গম্ভীর—ঈষৎ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'বৌমার পোর্টম্যান্টটা গুছিয়ে দিতে বসেছিলুম আজ। পেটে ছেলে আসার পর অনেকেরই শরীর খারাপ হয়—এর আবার বড্ড বেশী, কিচ্ছু মুখে তুলতে পারছে না। যা খাচ্ছে, বমি হয়ে যাচ্ছে তা তো দেখছিসই। ওর দ্বারা কিছু হবে না। অথচ কাপড় বার করতে ফি-বারই দেখি সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে, হাণ্ডুল-মাণ্ডুল করা। সেইজন্যেই

আজ দুপুরে ওটা নিয়ে বসেছিলুম। বৌমা ঘুমুচ্ছিল তখন আমার ঘরে, সে জানেও না। তোরঙ্গের তলার দিকে নেক্‌লেসের বাক্‌সর মধ্যে এটা ছিল, এমনি পড়ে থাকা নয়, বাক্‌সর মধ্যে যখন ছিল তখন কেউ যত্ন ক'রেই রেখেছে নিশ্চয়।'

এই বলে আবারও চুপ করল হেমন্ত।

সুরেনেরও কিছু বলার কথা নয়। দণ্ডাদেশ শোনার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে সে। সে-ও চুপ ক'রে রইল।

হেমন্তই আবার বলল, 'তোর দোষ নেই, তুই তো আসতে চাইতিস না, আসা কমিয়ে দিতেই চেয়েছিলি। আমরাই জোর করেছি।...কিন্তু এবার সত্যিই আসা-যাওয়া কমিয়ে দে বাবা। নিমে যা-ই হোক, ওর ঘরই করতে হবে মেয়েটাকে। এ তো আর ফেলবার জিনিস নয়, জন্মান্তরের সম্পর্ক বলে—তা না হলেও আমরণ সাথী তো বটেই! মিছিমিছি মনে একটা বড়রকম ভাঙন ধরলে দ্যাখ দু'টো জীবনই নষ্ট হবে।...এ তো বদলে নেওয়া সম্ভব নয়।...আর চাঁদ সামনে থাকলে জোনাকীতে কার মন ভরে বল্‌?'

তবুও সুরেন কিছু বলল না। কত কী পরস্পর-বিরোধী ভাবসংঘাত হচ্ছে তার মনে—সে প্রবল বিপ্লবে বা সংঘর্ষে কিছু গুছিয়ে ভাবা কি বলার শক্তি নেই আর।

একটা প্রবল অভিমান, অবিচারবোধ মাথা তুলতে চাইছে, ইচ্ছে করছে চিৎকার ক'রে প্রতিবাদ করে। 'কেন কেন, এই মণিকার মতো মেয়ের জীবন ঐ নিমাইয়ের মতো অর্ধ-বর্বরের সঙ্গে জন্মান্তরের মতো গাঁথা হয়ে থাকবে, আর থাকলেও কেন তার একটু উপরি পাওনা—একটু স্নেহ, একটি পূজাবনত নীরব হৃদয়ের প্রীতির অর্ঘ্য—নেওয়াও নিষিদ্ধ হবে? এ তো কোন কলুষিত সম্পর্ক নয়।'

আবার সেই ক্ষোভের মধ্যেই কোথায় একটা পরিণত বিচার-বুদ্ধি যুক্তি প্রয়োগ করে—হেমন্ত যা বলছে তা ষোলআনাই সঙ্গত। আকর্ষণটা যে এইখানেই থেমে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। পূজারী যে পূজা ক'রেই তৃপ্ত থাকবে চিরদিন, তারই বা নিশ্চয়তা কি? দু'জনে দু'জনের দিকে আর একটু বেশী এগিয়ে এলে—তারপর? সুরেন কি করতে পারবে, কতটুকু সাধ্য তার? সে কি পারবে ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে, জীবনের ভার নিতে—জীবনসঙ্গিনী করতে?...না, তা সম্ভব নয়। আর সম্ভব যখন নয়—তখন অকারণে মেয়েটার মনে একটা প্রবল তৃষ্ণা, সেই সঙ্গে বর্তমান ভাগ্যে অতৃপ্তির ভাব বাড়িয়ে লাভ কি?...

কিন্তু এ সমস্ত মনোভাব ছাপিয়ে একটা আনন্দেও বুক ভরে যায় যেন।

এমন কখনও ভাবে নি, এমন আশাও করেনি। অন্তরবাসিনী দেবী যেদিন পূজার্থীর কাছ থেকে নিজে পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনও সে-অর্ঘ্যের এ-পরিণতি ছিল স্বপ্নের অগোচর। পূজার্থীই পূজিত হবে—ভক্তের নিবেদিত দেবীই পূজার আসনে বসাবেন—এর চেয়ে বড় কোন্‌ বর কোন্‌ পুরস্কার ভক্ত আশা করতে পারে?

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—বুঝি বা নিজের বুকেরই তুফান ঝঞ্ঝার দিকে কান পেতে থাকতে থাকতেই—উদ্বেলিত আবেগ সংঘাত কিছুটা সামলে নিয়ে শুধু বলল, 'আচ্ছা... আমি তাহলে এখন যাই?'—সে সত্যিই ছাদের দোরের দিকে পা বাড়ায়।

হেমন্ত সজোরে ওর একটা হাত চেপে ধরে, 'ও কি, এখনই যাবি কি? পাগল

হয়েছিস নাকি ? না না, রাগ-অভিমান ক'রে চলে যাস নি। তোকে দিন-রাতই চোখের সামনে রাখতে ইচ্ছে করে আমার, সেই তোকে আসা কমিয়ে দিতে বলতে হল—বিধাতার বিড়ম্বনা ছাড়া কি বল্ ! দশচক্রে ভগবান ভূত হয়—এও তাই ।···তাই বলে একেবারে আসা-যাওয়া বন্ধও করিস নি। পেটেপোয়ে মেয়েটা মন গুমরে গুমরে থাকলে বাচ্ছাটা শেষপর্যন্ত হয়ত 'হাবা-কালা' হয়ে যেতে পারে। এই তাই— তুই এসেছিস শুনে মরে মরেও রান্নাঘরে গেছে তোর জন্যে চা-হালুয়া করতে। তোর খাবার আর কাউকে দিয়ে করালে শান্তি হয় না ওর।'

অগত্যা বসতে হল একটু। চা-হালুয়াও খেতে হল। সে হালুয়া গলার মধ্যে ঢেলা পাকিয়ে কণ্ঠরোধ করতে চায়—তবুও খেল, জোর ক'রেই। তবে সেদিন আর মণিকার কোন অনুরোধ-উপরোধই শুনল না, একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে ।···

কিন্তু তখনই সেই নিরানন্দ অন্ধকূপেও ফিরতে পারল না। সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। বসেও রইল বহুক্ষণ।

দুঃখ ? বেদনা ?

না, বোধহয় শুধু তাও না। কী যে, নিজেই বুঝতে পারছে না যেন।

এইমাত্র সর্বাপেক্ষা কঠিন এক নির্বাসনের দণ্ডাদেশ শুনে এল, বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিয়েও এল সে দণ্ড। একটি মাত্র যে দীপশিখা তার সামনে অসীম অন্ধকার-জীবনপথে জ্বলে উঠেছিল ক্ষণকালের জন্য—তা চিরকালের মতোই নিভে গেল। আশা কিছু ছিলই না—সাময়িক আনন্দের যে উৎসটুকু ছিল—এইমাত্র বোধ করি নিজ হাতেই —স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।

তবু সব দুঃখ, জীবনব্যাপী—ভবিষ্যতে যতটা দৃষ্টি চলে—দিকদিশাহীন অন্ধকারের মধ্যেও একটা তৃপ্তি একটা পরিপূর্ণতার আনন্দও যে বোধ করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিজের মনোভাবের সুরটি অপর একটি ঈপ্সিত হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়েছে এই তো যথেষ্ট, এই তো অনেক পাওয়া। তার মতো ছন্নছাড়া জীবনে এর বেশি আর কি পেতে পারত সে ?···

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই একভাবে বসে কেটে গেল সুরেনের। ক্রমশ জনবিরল হয়ে এল পার্ক, যে দু-চারজন পার্কেই শুয়ে থাকে রাত্রে—তারা একে একে আসতে শুরু করল আবার, দূরে চাঁপাতলায় গাড়িঘোড়ার শব্দও আর পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়িতে আলো নিভতে লাগল একটির পর একটি, শুয়ে পড়ছে সবাই দিনের কাজ শেষ ক'রে শ্রান্তি ও চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেতে—সুরেন কিন্তু উঠতে পারল না। তার লাভ বেশী হল কি ক্ষতি—সেই হিসেবটাই মিলছে না তার কিছুতে—অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা ক'রেও।

॥ ২৫ ॥

মণিকার প্রথম সন্তান ছেলেই হল। মায়ের মতো অত সুন্দর নয় হয়ত—তবে নিমাইয়ের মতোও নয়। মোটের ওপর দেখতে ভালই। রঙ এখন যতটা অত থাকবে না, তবু ফরসা-ঘেঁষাই হবে। বেশ স্বাস্থ্যবানও হয়েছে।

হেমন্ত আদর ক'রে নাম রাখল 'গোপাল'। নিমাইচরণ নিজেদের নিয়মে কৃষ্ণচরণ রাখতে চেয়েছিল—কালীচরণেও আপত্তি নেই জানিয়েছিল—হেমন্ত ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে, 'রাখ দিকি! তোর বংশের বিন্দুবাষ্পও ছোঁয়া না লাগে ছেলেটার। যদিবা কেষ্ট নাম রাখতুম ফরসা ছেলের কেষ্ট নাম রাখতে দোষ নেই—কেলে ভূত যদি নিমাই গৌর হতে পারে তো ফরসা ছেলের কেষ্ট হওয়াই উচিত—তা ঐ জন্যেই রাখব না, ও আমার গোপালই ভাল।'

মণিকার অবশ্য কৃষ্ণ বা গোপাল কোনটাই পছন্দ নয়। ষোড়শীবাবু নাকি কবে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে হলে রবীন্দ্রনাথ নাম রাখব'—সেইটেই ধরে ছিল মণিকা, বললও শাশুড়িকে—হেমন্ত তাও উড়িয়ে দিল।

'হ্যাঁ! গণ্ডা গণ্ডা রবীন্দ্রনাথ চারদিকে গড়াগড়ি খাচ্ছে, সবাই কি রবিঠাকুর হচ্ছে নাকি? দ্যাখো গে যাও কত রবীন্দ্রনাথ বিড়ি পাকাচ্ছে, কত জেল খাটছে বসে। ঐ যে আধপাগলা লোকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় চাইতে আসে—ওর নামও রবীন্দ্রনাথ।'

আর কথা বলতে পারে না মণিকা। তবে কৃষ্ণচরণ নাম যে রাখে নি তার জন্যে শাশুড়ির কাছে সে কৃতজ্ঞ। মাগো, ঐ আবার একটা নাম নাকি? সবাই ডাকবে কেষ্টা বলে।...চাকর-বাকরের মতো।...ওদের নাকি বংশের ধারা। রক্ষে করো! বংশের ছেলেদের যা নমুনা! ঐ তো এসেছিল সব জ্ঞাতি-ভাইরা, কী এক-একখানি চেহারা আর তেমনি কথাবার্তা। তেমনি সব কীর্তি-কাহিনী। ওদের জন্যেই তার সাধটা হতে পারল না। নিসেধো হল ছেলেটা, সে আর এক রাগ। এর কে ভাইপো এক, গোরা না গৌর—সাধের যে দিন ঠিক হয়েছিল, তার দু'দিন আগেই মারা গেল। অশৌচ পড়ল—সে অশৌচ যখন কাটল, তখন আর পাঁজিতে দিন নেই, আর তারপর—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ছেলেও তো হয়ে গেলই।...সে ভাইপোও তেমনি, ঊনিশ-কুড়ি তো মোটে নাকি বয়েস—বলে তো, কত ঠিক কে জানে—এরই মধ্যে খারাপ রোগ ধরিয়ে বিনি চিকিচ্ছেয় মরে গেল। শেষে নাকি গায়ে এমন পচা গন্ধ হয়েছিল যে, কেউ ওর ঘরে যেত না। ধসা-পশ্চিমে না কি বলে—তাই হয়ে গিছল।...

ঐ তো গুণধর ভাইপো—ইনি আবার বলেন সে-ই নাকি ওর গোপাল হয়ে এ-বাড়িতে এসেছে আবার। ভাগ্যিস শাশুড়ি অনেক জানেন শোনেন, তিনি বলেছেন, 'তা কখনও হয়, পাঁচ মাসে প্রাণ এসে যায় ছেলের—আর এ তো মরেছে বৌমার ভরা ন'মাসে। তোর যেমন কথা!'...তা শাশুড়িও তো ঐ গুণধর নাতির জন্যে কেঁদেকেটে চোখ ফোলালেন। এদের বাড়ির কি ব্যাপার ভগবানই জানেন!...

ছেলে ভালভাবেই মানুষ হতে লাগল। হেমন্তর যত্ন খুব। নিয়মকানুন জানেও অনেক, ঘড়ি ধরে নাওয়ানো খাওয়ানো করে, সেদিক দিয়ে মণিকা অনেক নিশ্চিন্ত। তবে কড়াও খুব। ষোড়শীবাবুর স্ত্রী নাকি হঠাৎ মারা গেছেন, শুনে বাপের বাড়ি যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, হেমন্ত যেতে দিল না। ছেলের নাকি অযত্ন হবে, অনিয়ম হবে। সেইটেই প্রধান কারণ। তার পর বলল, 'আর তার বৌ মরেছে, তুমি গিয়েই বা কি সান্ত্বনা দেবে! তোমাদের জ্ঞাতি কি আত্মীয়ও নয়। তার বাড়িতেও ঢের লোক—তোমাকে শোক ভোলাতে যেতে হবে কেন? বৌ মরেছে বেশ হয়েছে, ভাগ্যমানের বৌ মরে। পয়সা আছে, চেহারা ভাল, বয়স বোঝা যায় না—আবার দু'মাস পরেই দেখো একটা বিয়ে করবে। ওদের আবার শোক, ওদের আবার দুঃখ!'

এর পরে আর কিছু বলতে পারে না মণিকা, মুখ ভার ক'রে থাকে। ষোড়শীবাবু এর ভেতর দু-একবার দেখা করতে এসেছিলেন, হেমন্তর সঙ্গেও দেখা ক'রে গেছেন। 'বেয়ান' বলেন নি, বলেছেন 'মাসীমা'। চলে যেতে হেমন্ত ভ্রূকুটি ক'রে বলেছে, 'কী রকম সম্পর্ক তোমাদের বৌমা? অতবড় মানুষটা, যতই লোক—পঞ্চাশের মতো বয়স তো হবেই, হয়ত দু-এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে, বেশী হওয়াও আশ্চর্য নয়—তা তুমি কাকা কি মামা কি মেসো কিছু বলো না? সে সুবাদে আমাকে তো বেয়ান বলা উচিত। কী বলে ডাকো তুমি?'

ভাল ক'রে জবাব দিতে পারে নি মণিকা, জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে, 'না আমরা—মানে —এমনি কিছুই বলি না—মানে ডাকার তো দরকার হয় না।...আড়ালে ষোড়শীবাবুই বলি। তেমন হলে—এক-আধবার বুঝি ষোড়শীদাও বলেছি।...কে জানে, অত মনে নেই—।'

'অতবড় মানুষটা তোমার দাদা হতে গেল আবার কি সুবাদে!' অপ্রসন্ন মুখে মুখে মন্তব্য করেছে হেমন্ত।...

অবশ্য সান্ত্বনা দেবার জন্যে মণিকাকে যেতে হল না, নেবার জন্যে ষোড়শীবাবুই এলেন। এবার যেন একটু ঘন-ঘনই আসতে লাগলেন। এসে হয়ত বলেন, 'এই— একটু কাজ ছিল এদিকে—ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে হল একবার।' একটু য়্যাটর্ণী বাড়ি যেতে হয়েছিল—তাই বলি তোর একটু খোঁজ নিয়ে যাই।' কিংবা 'রেভিনিউ আপিসে একটা কেস ছিল তাই আসতে হল। বলি যে যাই একবার—' ইত্যাদি।

হেমন্ত এমনি কিছু বলে না, শুধু একদিন আর থাকতে পারে নি, বলেছিল, 'বৌমা, ভদ্রলোকের দেখছি ঘন-ঘন কলকাতায় আসবার দরকার হচ্ছে। ঘরে বোধহয় একেবারেই মন টিকছে না আর!'

মণিকা ফোঁস ক'রে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'তা ভদ্রলোক আসছেন, উপকারী লোক, আমাদের অন্নদাতা—ওঁকে কি মুখের ওপর আসতে বারণ ক'রে দোব? উনি কি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আসেন?'

হেমন্তও শীতল কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'এ আবার কি ধরনের কথা বৌমা! আমি তো বারণ করার কথা বলি নি, উদ্দেশ্যও খুঁজতে যাই নি। এ তো ঠাট্টা ক'রেই

বলা—এমন তো হামেশা বলে থাকে লোকে। এ আমি ওঁর মুখের ওপরই বলতে পারি। একথা তোমার-গায়েই বা বাজে কেন? বলে পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে!...তাহলে কথাটা তোমার মনেও লেগেছে বুঝতে হবে!'

এরপর চুপ্সে চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হঠাৎই কথাটা বেরিয়ে গিছল মুখ দিয়ে, এতটা ভাবে নি।

এর দিনকতক পরে ভদ্রলোক আর একদিন একটা ছুতো ক'রে এলে হেমন্ত খাতির ক'রে বসিয়ে জলখাবার খাইয়ে—নিজেও সামনে চেপে বসল। অন্যদিন, বাপের বাড়ির লোক এলে একটু আড়ালে ওদের কথা কইতে দেওয়া উচিত বলেই, কোন একটা ছুতো ক'রে অবসর দিয়ে সরে যায়। আজ ইচ্ছে ক'রেই গেল না কুশল-প্রশ্নের পর বৌমার বাবা-মা-ভাই-বোনের খবর নিয়ে বলল, 'বেইমশাই (বেই শব্দটায় একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করল) এমন সময়েই আসেন, একদিনও আপনাদের জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় না। আজ বরং থেকে যান, আলাপ-টালাপ ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে যেতে পারেন যাবেন—নয়ত একটা রাত না হয় গরিব মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি কাটালেনই!'

'বেইমশাই' শুনেই মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ষোড়শীবাবুর, তার ওপর 'মেয়ে-জামাই' যোগ করাতে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তবে তিনিও, ছোটখাটো হলেও জমিদার ও ব্যবসাদার, বললেন, 'না, সে আজ আর হবার জো নেই মাসিমা, বলা-কওয়া তো নেই, তাছাড়া মা-মরা ছোট ছেলেটা, রাত্রে আমি কাছে না থাকলে বড় কান্নাকাটি করে। আর একদিন তখন সময় ক'রে—একটা ছুটির দিন দেখে এলেই হবে।'

তারপর একটু কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে বললেন, 'তা আপনি আমাকে বেইমশাই বললেন কি সুবাদে? আমি তো আপনাকে মাসিমা বলি, আর মনুও তো দাদা বলে আমাকে—!'

'তা বটে। ঐ দেখুন—মনের ভুল। বয়েস হয়েছে তো। তাছাড়া আপনাকে বয়সের তুলনায় একটু বড়ই দেখায় বলে—কেমন যেন বৌমার দাদা ভাবতে পারি না, গুলিয়ে যায় সম্বন্ধটা। কাকা কি মেসো ভাবতেই ইচ্ছে করে।...তা আপনি আমার বেয়াইকে কি বলেন—কাকা না মামা না মেসো?'

খুবই সরল, সহজ কণ্ঠস্বর—প্রশ্নেও কোন জটিলতা নেই। কিন্তু ষোড়শীবাবু এতেই ঘেমে উঠলেন। বললেন, 'না মানে কী যে বলি কখন—আসলে তার কিছু ঠিক থাকে না। কিছু যে সম্পর্ক পাতিয়ে ডাকি তা মনে হয় না।...আপিসে তো. অবিনাশবাবুই বলি বেশির ভাগ।'

মণিকার মুখও রাঙা হয়ে উঠেছে এ প্রশ্নে। সে জলখাবারের খালি রেকাবিটা নিয়ে বাইরে রাখতে চলে গেল। হেমন্ত পুনশ্চ তেমনি অমায়িককণ্ঠেই বললে, 'আমার অবিশ্যি বলা শোভা পায় না, আস্পদ্দার মতোই শোনায়—তবু যখন মাসিমা বলেন, সেই অধিকারেই বলছি—এমন কিছু বয়েস নয় তো আপনার—আর একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন দেরি করবেন না। শুধু শুধু এমন ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ নেই এখানে ওখানে, এতে শান্তি পাবেন না, ঘরের ফাঁকটা ভরবে না তাতে। কতদিন বাঁচবেন তার তো ঠিক নেই, কদ্দিন আর অপরের ভরা-ঘর দেখে নিঃশ্বেস ফেলবেন? বিয়ে করতেই হবে, করবেনও —সেক্ষেত্রে মিছিমিছি আরও খানিকটা বয়েস না বাড়িয়ে কাজটা সেরে নিন।...আর যদি

আপনি অপরাধ না নেন তো বলি, এদের তো আপনি ভালবাসেন—বৌমার বোনটিকেই দয়া ক'রে গ্রহণ করুন না। তারও জানাশুনো ঘর—আপনার ছেলেমেয়েরাও তাকে চেনে—বাইরে থেকে কাকে আনবেন, সে কি রকম লোক হবে তা তো জানেন না, সেগুলোর হয়ত দুর্গতির সীমা থাকবে না। এ গরিবের মেয়ে, আপনার ঘরে পড়লে বর্তে যাবে, প্রাণ দিয়ে খাটবে।'

ঘামের ফোঁটাগুলো বড় বড় ধারায় গড়িয়ে পড়তে শুরু করে ষোড়শীবাবুর কপাল গলা বেয়ে। দরজার বাইরে মণিকাও যেন পাথর হয়ে যায়—উত্তরটা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। শাশুড়ি যে একথাটা পাড়বেন তা স্বপ্নেও ভাবে নি, তবে এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

'কিন্তু সে তো মানে'—ষোড়শীবাবু আমতা আমতা করেন, কী যে বলবেন যেন ভেবে পান না।

'সে দেখতে ভাল নয়, রঙ ময়লা—এই তো? তা না-ই বা হল বেই—ঐ দেখুন আবার সেই ভুল, বাবাই বলি—তা না-ই বা হল বাবা, একবার তো সুন্দর পেয়েছিলেন, এতকাল তো ভোগও করলেন—এখন সেবাযত্ন ঘরকন্না করবে গুছিয়ে, ছেলেমেয়েদের দেখলে—এই জন্যেই তো বিয়ে করা? এখন আপনি একটা সুন্দরী অল্পবয়সী বৌ আনলে সে আপনাকে পছন্দ করবে কিনা তাও ভাবুন। মিছিমিছি বুড়ো বয়সে অশান্তি জোটানো।'

ষোড়শীবাবু এতখানি জীবনে কখনও এমন বিব্রত বোধ করেন নি বোধ হয়। তাঁর যেন মনে হল তিনি একটা খাঁচা-কলে পড়ে গেছেন। অন্য কোনভাবে ধিক্কার দিলে মণিকা তাঁর দলে আসত, এ পরিস্থিতিতে তার কি মনোভাব হবে সেটা বুঝতে না পেরেই আরও অস্বস্তি তাঁর।

ফলে তিনি যেন একটু রুষ্টই হয়ে উঠলেন। আর রাগ হলে খুব বুদ্ধিমান লোকও যা-তা বলে বসে। ষোড়শীবাবুও হঠাৎ বলে ফেললেন, 'তা তাহলে মনুর সঙ্গে শালী সম্পর্ক হয়ে যাবে—তখন তো রোজ এলেও আপনি আপত্তি করতে পারবেন না!'

'ওমা, তা এখনই বা আপত্তি করছে কে? আমরা কি কখনও আপত্তি করেছি? আপনি রোজই আসুন না। আমি তো আপনাকে উল্টে থেকে যেতেই বলছিলুম আজ।...তা নয় বাবা, এলে কি আপনার লাভ হবে? স্পষ্ট কথা বলছি কিছু মনে করবেন না—অনেক বয়েস হল, দেখেছি শুধু শুধু ঢেকে-ঢুকে কথা বলতে গিয়ে কোন লাভ হয় না—এখানে, আপনার দিক থেকেই বলছি, নিত্য না আসাই ভাল। চোখের সামনে এই চেহারা দেখলে এমনি বৌ-ই চাইবেন, কিন্তু এ চেহারা পাওয়া কি এত সোজা? আর দোজবরে—যতই যা বলুন পঞ্চাশের কাছাকাছি তো বয়েস গিয়েইছে—আপনাকে এত সুন্দরী মেয়ে দেবে কেন? এ জিনিসও পাবেন না, সে তো আর হবার নয়—এমন জিনিসও পাবেন না। এ ভুলে যাওয়াই ভাল। আপনার মঙ্গলের জন্যেই কথাটা বললুম বাবা, হয়ত একটু রূঢ় শোনাল—নিজগুণে অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন।'

আর বসতে পারলেন না ষোড়শীবাবু। রাগ, না ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা, তা তাঁর কাছেও স্পষ্ট নয় তখন—শুধু এই মহিলাটির তীক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে

থেকে সরে যাওয়া দরকার—এইটেই মনের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রবল। মণিকা এই দরজার বাইরেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, তা অনেকক্ষণ ধরেই আড়ে দেখছেন। তবু তার চোখের দিকে চাওয়া তো দূরের কথা, যাবার সময় একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত ক'রে গেলেন না। কোনমতে হেমন্তর দিকে একটা হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে দ্রুত নেমে চলে গেলেন।

॥ ২৬ ॥

ষোড়শীবাবুর আসা এবার বন্ধ হল। সুরেন তো বহুদিনই আসা বন্ধ করেছে—ন'মাসে ছ'মাসে হয়ত একদিন আসে—মণিকা অনুযোগ করলে কাজের অজুহাত দেখায়, বলে, 'টিউশ্যানী ধরেছি সন্ধ্যেবেলায় বৌদি, ফিরতে বড্ড রাত হয়ে যায়। আর অন্যদিন কোন কাজ সারা হয় না, রবিবারের জন্যে সব তোলা থাকে বলে সেদিনও নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না।' নেহাৎ হেমন্তর শরীর খারাপ শুনলে কিংবা কোন উপলক্ষে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'রে না পাঠালে সে আর আসে না। এলেও একটু পরে চলে যায়।

এতে মণিকার মন তিক্তই হয়ে ওঠে ক্রমশ। স্বামীর কাছাকাছি আসা হয় না—বরং এর ফলে আরও যেন দূরেই সরে যায়। চাঁদ সামনে না থাকলেও জোনাকি জোনাকিই থাকে। তার আলোয় চাঁদের কাজ হয় না।

হেমন্ত এটা লক্ষ্য করে, চিন্তিত হয়।

প্রথম প্রথম ভেবেছিল—গোড়ায় একটু আশাভঙ্গ হয়েছে, ক্রমে সেটা সয়ে যাবে; যখন দেখবে বুঝবে যে, বিয়ে ফেরানো যায় না, এর সঙ্গে জীবনের মতোই গ্রন্থি-বন্ধ হয়েছে, তখন আস্তে আস্তে ভাগ্যকে মেনে নেবে। কিন্তু যত দিন যায় ততই যেন স্বামী সম্বন্ধে অবজ্ঞা আর তিক্ততা বাড়ে মণিকার। বরং যতদিন সুরেন আসত, এমন কি তারপর যখন ষোড়শীবাবুর আসা-যাওয়া বাড়ল—তখনও যেন অনেকটা সয়ে থাকত—বন্ধ জীবনে এরাই কতকটা বাতায়নের কাজ করত—আরও, এদের সামনে বলেই হয়ত মানিয়ে নিয়ে চলত। কিন্তু সবদিকের বাতায়ন বন্ধ হয়ে গিয়ে যখন পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বাস্তব-জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল তখন, যেন প্রথম নিজের অবস্থাটা বুঝল—এবং আরও তিক্ত, আরও রুক্ষ হয়ে উঠল।

এ অবজ্ঞা না-বোঝার মতো বোকা নিমাই নয়। কিন্তু সে সইতে জানে, নইলে হেমন্তর ঘরে অদ্বিতীয় হয়ে থাকতে পারত না আজ। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে তার নিজের ধারণা স্ত্রীরই অনুরূপ—সে জানে যে, সে কোন অংশেই এ স্ত্রীর যোগ্য নয়। রূপসী, তার তুলনায় লেখাপড়া-জানা মেয়ে—গান-জানা, ভদ্রসমাজের উপযুক্ত কথাবার্তা কইতে পারে, তাদের সঙ্গে সমানে মিশতে পারে—এ বৌ তার মতো মূর্খ মিস্ত্রীর হাতে পড়ার কথা নয় কোনমতেই। দেশেঘাটে যেসব বিবাহযোগ্যা মেয়েকে দেখেছে তাদের সঙ্গে কোন মিলই নেই এর। নিতান্তই তার ভাগ্যের জোর আর জ্যাঠাইয়ের পয়সার জোরে এ-ঘরে এসেছে ঘর করতে।

তাই, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেলে কিছু লাঞ্ছনা সইতে হবে—এটা সে মেনেই

নিয়েছিল। বিশেষ চাঁদ যখন করায়ত্ত তখন একটু-আধটু লাঞ্ছনাতে কিছু এসে-যাবে না। তাছাড়া মণিকার মতো স্ত্রী তাকে ধমক দেওয়ায়, শাসন করাতেও নিমাই এক রকমের সুখ অনুভব করত, এক ধরনের গর্ব বোধ করত। কারণ তার থেকে সর্বাংশে উচ্চস্তরের না হলে এ অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারত না এবং এই উচ্চস্তরের জীব যতই যা করুক—সে যে তার স্ত্রী, তারই ঘরণী, চিরদিনের মতো—ইহজন্মের মতো তার সঙ্গে বদ্ধ—তিরস্কারের প্রতিটি শব্দে সেই সত্যেরই স্বীকৃতি প্রকাশ পাচ্ছে না কি?

কিন্তু তবু সহ্যেরও সীমা আছে। প্রথমদিকের সৌভাগ্য-বিহ্বলতা একটু একটু ক'রে কাটে। সুন্দরী স্ত্রীর অভিনবত্বও ক্রমে সহনীয়, অভ্যস্ত হয়ে আসে। বন্ধুবান্ধবদের কারও কারও কাছে অবস্থাটা বর্ণনা করলে তারা পরিহাস করে, বলে, 'তুই যে গোড়া থেকেই মাগের ভেড়ো হয়ে রইলি হাত জোড় ক'রে—তাকে বুঝিয়ে দিলি যে, সে লাথি মারলেও তোর সুখ, তার গালাগাল তোর অঙ্গের ভূষণ, লাথি খেলে তার পায়ে লাগল কিনা সেই চিন্তেই তোর বেশী হবে! এ ক'রে কি আর বৌকে বশ করা যায়! ওরে, ওরা হল নাথখোরের জাত, লাথি না খেলে ঢিট থাকে না। লাথির ঢেঁকি চড়ে সোজা হয় না—তা জানিস তো? প্রথম থেকেই বেচাল দেখলে যদি চুলের ঝুঁটি ধরে ঘা-কতক দিতিস তো দেখতিস সে-ই তোর কাছে হাত জোড় ক'রে থাকত, পিছু পিছু ঘুরত।···নেঃ! সুন্দরী, সুন্দরী তো কী হয়েছে! তুই-বা কমতি কিসের? নিজেকে ছোট মনে করিস কেন? হাজার হোক তুই তো তার মরদ, সে তোর বাঁদী। যতই ভাল হোক—বাপের এক পয়সার মুরোদ নেই, ভিখিরীর মেয়ে—তার আবার অত অহঙ্কার কিসের! ওকে বাড়তে দেওয়াটাই তো ভুল হয়েছে।'

তারা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা মতোই বলে। জীবনের যে স্তরের মানুষ তারা—সেই রকমই! এ দুই স্তরে তফাৎ আছে খানিকটা, তা নিমাই জানে। তবু এতেই, এই অবিরাম ধিক্কারেই একটু একটু ক'রে শক্ত হয় নিমাই, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এতদিন পরে তা আর সম্ভব হয় না। মিছিমিছি তিক্ততাই আরও বেড়ে যায়। এতকাল যে সর্বপ্রকার বশ্যতা স্বীকার ক'রে ছিল—এখন সে পা থেকে মাথায় উঠতে চায় দেখে আরও জ্বলে যায় মণিকা। খিটিমিটি লাগে প্রায় প্রত্যহই—দু'জনেরই মুখের রাশ আলগা হয়ে আসে। ক্রমে মতান্তরটা মনান্তর—শেষে ইতর কলহে পেঁছিয় গিয়ে।

হেমন্ত ভেবেছিল একটা ছেলেমেয়ে কিছু কোলে এসে গেলে এটা কমে যাবে—এই আশাভঙ্গের ভাবটা। সন্তানই সেতু রচনা করবে মা-বাবার মনে। তারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হয়ত, গোপাল তার কাছেই বেশির ভাগ মানুষ হতে লাগল বলে সে সেতু-বন্ধন সম্ভব হল না।

হেমন্ত অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, অনেক উপদেশ অনেক উদাহরণ দিয়ে—কিন্তু মণিকার যেন কিছুই পছন্দ হয় না নিমাইয়ের। চেহারা, চালচলন, কথাবার্তা অভ্যাস স্বভাব—কিছুই না। সব বিষয়েই সে নিমাইকে তার অযোগ্য অনেক নিম্নস্তরের জীব বলে মনে করে। ক্রমে হেমন্তরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। এতই বা কিসের অহঙ্কার, কত তফাৎ ওর স্বামীর সঙ্গে? এমন কিছু আহামরি সুন্দরী, নূরজাহান নয়

মণিকা। লেখাপড়া! একটা পাসও তো করে নি, দু-চারটে ক্লাস বেশী পড়েছে এই পর্যন্ত। গানবাজনা শেখা যাকে বলে তাও শেখে নি—শুনে শুনে দু-চারটে গান গাওয়া, সে তো গাড়োয়ানরাও গেয়ে থাকে। তেমন কোন নামকরা বংশের মেয়েও নয়। বাপের তো না চাল না চুলো—না পরিচয় দেবার মতো কিছু। বড়লোকের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছিল, সে লোকটার কুমতলব ছিল বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, প্রশ্রয় দিত—তাতেই যদি নিজেকে জমিদারের বাড়ি রাজার বাড়ি পড়বার যোগ্য বলে ভেবে থাকে তো সেটা ওর আহাম্মুকি। বোকারা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে যায়—তাতে দেওয়ালের কোন ক্ষতি হয় না, নিজেরই কপালে লাগে, কপাল ভাঙে।

প্রকারান্তরে এই কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে জ্বালা যেন আরও বাড়ে, বিতৃষ্ণা বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিদ্বেষটা হেমন্তর ওপরও, বরং ওর ওপরই বেশী। মণিকার মনে হয় ওর টাকার জোরে গরিব বাপ-মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে, কেড়ে এনেছে। সে বিদ্বেষ তর্কাতর্কি বাদানুবাদের মুখে বেরিয়েই যায়, এখন আর ঢাকবার চেষ্টাও করে না।

কদর্যতা ও ইতরতা—আপাত-শান্ত মানুষের মধ্য থেকেও ঐ দু'টো বস্তু টেনে বার করে, বেনোজলের মতোই। হেমন্তর আজকাল এমনিই মেজাজ উগ্র হয়েছে, সে এত স্পর্ধা সইতে পাবে না। ভদ্র সংস্কারের মুখোশ খসে পড়ে। সে বলে, 'আর কে জুটত তোর—রাজা মহারাজা লাটবেলাট? বাপের তো ঐ মুরোদ—দুশো টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, তাও চেয়ে-চিন্তে, ভিক্ষে ক'রে। ডবকা মেয়ে দেখিয়ে মনিবের বাড়ি এসে বসে তার ঘাড় ভেঙে বিয়ে দিলে—তাও সে মনিবও তো কৈ খরচা ক'রে ভাল পাত্তরে দিতে পারল না। সে নামও তো করে নি, দিন গুনছিল কবে বৌটা মরবে, তোকে নিয়ে গিয়ে বসাবে—বুড়ো বাপের বয়িসী ভাতারের সেবা করার জন্যে আর এক পাল সতীনপো-সতীনঝি মানুষ করার জন্যে! কপাল ভাল তাই এমন ঘরবরে পড়েছিস। মাতাল নয়, গেঁজেল নয়, রাঁড়খোর নয়—যা রোজগার করে একটা সংসার স্বচ্ছন্দে চালাতে পারে—তাতেও বৌয়ের কাছে জোড় হাত ক'রে আছে সর্বদা। আর কি চাস তুই? যা অবস্থা তাতে তো বিড়ি'ওলা কি গাড়োয়ানের হাতে পড়বার কথা।'

একথার উত্তর দেওয়া যায় না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসে মণিকা।

'ওগো বাবা গো, দেখে যাও গো—কী রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছ! কী খোয়ার হচ্ছে তোমার আদরের মেয়ের!' ইত্যাদি—

অন্য সময় হয়ত বলে, 'এর চেয়ে গরিব কেরাণীর হাতে পড়ে বাসন মেজে রান্না ক'রে সংসার চালাতুম সে আমার ঢের ভাল ছিল। মানুষের মতো মানুষ হলে তার জন্যে সব করা যায়।'

অনুচ্চ কণ্ঠে হয়ত বলে, হাতে একটা কাজ করতে করতে। তবু রান্নাঘর কি পাশের ঘর থেকে হেমন্তর জবাব আসে সঙ্গে-সঙ্গেই, 'তারা তোকে নেবে কেন? আ মলো যা! মানুষের মতো মানুষ—মানে তো আমাদের সুরো, তা তার সঙ্গেও তো সম্বন্ধ পাড়তে গিয়েছিল—কৈ হল? তাকে রাজী করাতে পারলে!…লাট সায়েবের ঘরে পড়লে তো

আরও ভাল হত। তা তো সকলকার হয় না। কী করবি বল! এই যা পেয়েছিস তাই ভাগ্য বলে মান। গুণ তো যা দেখতেই পাচ্ছি, ওরই মধ্যে একটু চকচকে চামড়া—তা তার জন্যে কি স্বর্গের দেবতারা এসে সেধে নিয়ে যাবে ভেবেছিলি?'

অশান্তি বেড়েই যায়। নিমাই এক-একদিন রাগ ক'রে বলে, 'ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও জ্যাঠাইমা—কত ধানে কত চাল হয় বুঝে আসুক!'

কিন্তু কে জানে কেন এই প্রসঙ্গেই কেমন চুপ্‌সে যায় মণিকা!

খবর আসেই সেখান থেকে, কেউ না কেউ খবর দেয়—আর সে খবর নাকি ভাল নয়। ওর বোনকে বিয়ে করেন নি ষোড়শীবাবু, কোথা থেকে একটি বয়স্কা মেয়ে ধরে এনেছেন, সে নাকি আগে খুব 'নেটিপেটি' ছিল, এখন উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে একেবারে। কারও কাছ থেকে কিছু শুনেছে কিনা কে জানে, অবিনাশবাবুদের ওপর প্রচণ্ড কোপ এসে পড়েছে; বলেছে, 'কর্মচারী আছে কর্মচারী আছে—বাড়িতে এনে তোলা কেন? কাছে না থাকলে বুঝি রাসলীলে করার সুবিধে হয় না? ওদের ভালয় ভালয় বিদেয় করবে তো করো, নইলে আমি নিজেই একদিন ঝেঁটিয়ে সাফ করব। বুড়ো বরের ঘর করতে এসেছি—তার আবার ভাগ দিতে পারব না।'

মণিকার বোনই বলে পাঠিয়েছে, 'তুই যেন ভুলেও কোনদিন আসার চেষ্টা করিস নি, তাহলে হয়ত সত্যিই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। মনে হয় তোকে জড়িয়েই কেউ কিছু রটিয়ে থাকবে, সে রটনা ওর কানে উঠেছে—'

সেই জন্যেই চোখের জল চোখে মেরে সয়ে যেতে হয় সব। বাপের বাড়ির জোর না থাকলে শ্বশুর বাড়িতে মুখ থাকে না দাঁড়াবার—এ কথাটা ওর মা-ই অনেকবার বলেছে, আজ তার মূল্য বুঝল!

নইলে, এক একদিন লোভ হয় বৈকি যে, গিয়ে দেখে একবার—ষোড়শীবাবুর ভাবখানা কি? না, কোন অসৎ কি অবৈধ কিছু করতে চায় না—বৌ হতে পারলে তবু কথা ছিল, একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করার মতো বোকা সে নয়। তেমন কন্দর্প কামদেব কি রাজামহারাজাও নন ষোড়শীবাবু। সে সব কিছু না, এমনিই, স্রেফ একটু নেড়েচেড়ে দেখা—এখনও আগের প্রভাবের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, এখনও তাঁর চোখে সে মুগ্ধতা, সে বিহ্বলতা ফোটে কিনা ওকে দেখে! শুধু এই কৌতূহলটাই মেটাতে চায় মণিকা, এতে কি লাভ হবে তা জানে না—সে হিসেব ক'রে দেখে নি, শুধু এইটুকু জানার জন্যেই, ষোড়শীবাবুর চোখে নিজের মূল্য যাচাই করার জন্যেই ছটফট করে সে।

কিন্তু সে আর হবার উপায় নেই। ভগবানই মেরেছেন, এই অন্ধকূপেই পড়ে থাকতে হবে চিরকাল।

হেমন্ত এইবার যেন ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করে নিজেকে। কেবলই মনে হয় সে ফুরিয়ে গেছে, তার জীবনে আর কিছু করারও নেই, পাবারও নেই।

কে যেন অহরহ বলে মনের মধ্যে, 'ছেলে-বৌ নিয়ে ঘর করার সাধ তো মিটল, আর কেন? এখনও কোন্ লোভে সংসারে পড়ে থাকতে চাও!'

সবেতেই বিতৃষ্ণা আসে। আরও ওর বিপদ, যে-ভগবানে মন দিয়ে রিক্ত নিঃস্ব দুঃখী মানুষ সান্ত্বনা বা অবলম্বন পায়—সেখানে ওর কোন আশ্রয় নেই। পুজো করে নিত্য, পুজোর সময় বাড়িয়ে দেয়—কিন্তু আর কেউ না জানুক ও নিজে জানে যে এসবই লোক দেখানো কতকটা।

হ্যাঁ, মন দেওয়ার চেষ্টা করে, মনকে বাইরে থেকে টেনে তাঁর পায়ে সংহত করার জন্যে ভগবানকে ডাকে প্রত্যহই—তার মধ্যে কোন ফাঁকি বা ভেজাল নেই—তবু সে মন ঈশ্বর থেকে বহু দূরেই সরে থাকে। সেই যে তারক আর কমলাক্ষর মৃত্যুর পর ভগবান সম্বন্ধে বিরূপ হয়েছিল, বিশ্বাস হারিয়েছিল মন—সে বিরূপতা আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না। ফলে শূন্যতা আর হাহাকারও গেল না জীবন থেকে।…

খাঁ খাঁ করে যেন বাড়িটা। গোপাল যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ তাকে নিয়ে একরকম কাটে, দুপুরে যখন ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা সন্ধ্যায়—তখনই যেন বড় অসহ্য বোধ হয়। আজকাল আর রান্নার দিকে যেতে পারে না—যেতে ইচ্ছেও করে না—কদাচ কোনদিন সুরেনের আসবার কথা থাকলে রান্নাঘরে ঢোকে, নয়ত ঠিকে বামনী বা ঠাকুর আর মণিকাই যা পারে করে। দুপুর বেলাটা ঘুমও হয় না আজকাল, ফাঁকা খালি বাড়িতে প্রেতিনীর মতো নিঃশব্দে এঘর-ওঘর ওপর-নিচ করে। কাজ নেই, বিশ্রামও নেই। খবরের কাগজখানা সকালেই উল্টে দেখা হয়ে যায়; লাইব্রেরী থেকে বই আনায় কিন্তু তাতে আজকাল আর মন বসে না, কোন তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ তো পড়তেই পারে না—সে শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে মহাভারত ছাড়া কিছুই পছন্দ হয় না ওর। গীতাটা পুজোর সময় নিয়ম ক'রে পড়ে এই পর্যন্ত।

সবচেয়ে অসহ্য এই দুপুরগুলোই। নিজের জীবনের ব্যর্থতা তার দুঃসহ স্মৃতিগুলো নিয়ে যেন তাড়া ক'রে বেড়ায়। তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেই আরও যেন—অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করে। অকারণেই কখনও নিচে নামে কখনও ওপরে ওঠে। মাঝে মাঝে এক-একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েও পড়ে, রিকশা ক'রে গঙ্গার ধারে চলে যায়। সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক শেষ ক'রেই ছাদে ওঠে। গোপাল এই সময় থেকেই ঘুমোয়। নিমাই আসে, স্বামী-স্ত্রীর ঘর-সংসারের কথা হয়, কলহকোঁদল তো আছেই, দোকানবাজার করতে বেরিয়ে যায় আবার; ওপর থেকে সবই টের পায় হেমন্ত—দাম্পত্য আলাপের স্বরগ্রাম এখান অবধি পেঁছিয় মধ্যে মধ্যে—কিন্তু কোন কিছুই আর তাকে আকৃষ্ট বা বিচলিত করতে পারে না। মানুষের চেয়ে সংসারের চেয়ে টবের এই গাছগুলো ভাল, ঋতুতে ঋতুতে বর্ষে বর্ষে যার যা সাধ্যমতো ফুল ফল দিয়ে যাচ্ছে, এরা কখনও বেইমানী করে না। সুরেন কোথা থেকে একটা কমললেবুর চারা এনে বসিয়েছিল বড় একটা টবে, নিজেই কোথা থেকে পুঁটিমাছ পচা না কি সব সার এনে দিয়েছিল—এবার তাতেও দুটো তিনটে লেবু হয়েছে। সুপুরির মতো ছোট ছোট, তবু হয়েছে।

এখানেই যা একটু সান্ত্বনা, যা একটু শান্তি। কিন্তু এদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যখনই ওপর দিকে কি আশপাশে চায়, তখনই আবার যেন সেই রিক্ততার হাহাকার, মন হু-হু-করা ভাবটা ফিরে আসে। বাড়ির পর বাড়ি চারিদিকে—অসংখ্য

ছাদ আর পাঁচিল—এ সময় লোকজন কম থাকে, থাকলেও অন্ধকারে দেখা যায় না—আর ওপরে কলকাতার ধূম্রমলিন আকাশের বিবর্ণ ধূসর জ্যোৎস্না কিংবা অস্পষ্ট নক্ষত্ররাজি; এই আকাশ আর পৃথিবী—পৃথিবীর ঘরবাড়ি মানুষ—সবই তার কাছে অরণ্য বলে মনে হয়। মনে হয় সীমাহীন এই বনে সে সম্পূর্ণ একা, এখানে তার কেউ আপন নেই, কিছুই আপন নেই; তার বর্তমান নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই, একা একটা বিশাল শূন্যতার মধ্য দিয়ে সে চলেছে অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে। কোনদিন কোথাও এর মধ্যে সে আশ্রয় পাবে না, শান্তি পাবে না, শেষও হবে না এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনযাত্রা।

ভাবতে ভাবতে নিজের জন্যেই বেদনায় তার দু'চোখ জ্বালা ক'রে জল আসে, মনে মনে বলে, 'ভগবান সত্যিই যদি তুমি থাকো—আমার জন্যেই বেছে বেছে এমন জীবন বরাদ্দ করেছিলে কেন? কেন আমার ওপর তোমার এত বিদ্বেষ। আমি তো তোমার কিছু করি নি! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই কপালে আমার ভাগ্যলিপি লিখে দিয়েছ। সে সময় কি কোন ভাল কথা মনে পড়ে নি তোমার, বিষ ছাড়া কোন ভাল জিনিস দিতে পারো নি? অকারণ এ আক্রোশ কেন তোমার—একটা মেয়েছেলের ওপর? কেন? কেন?'

॥ ২৭ ॥

ক্রমশঃই এই নিঃসঙ্গতা-বোধ ও সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহা বেড়ে যায় হেমন্তর। কেউ নেই তার, কিছুই নেই—মিছিমিছি কেন এই ঠাট? এই কথাই কেবল মনে হয়।

মণিকার আবার একটি মেয়ে হয়েছে, গোপালের দু' বছর বয়সে ওদের দেখাশুনো, হেমন্ত নাম রেখেছে কমলা। ফুটফুটে মেয়ে, মায়ের মতোই দেখতে হত হয়ত—কিন্তু ফরসেপ্ ডেলিভারীর সময় শেষ পর্যন্ত বুঝি ডাক্তারের আঙুলের প্রবল চাপে রগ দু'টো অস্বাভাবিক চাপা হয়ে গেছে। হয়ত বড় হলে এতটা থাকবে না, এখন খুব খারাপ দেখায়, অত সুন্দর মুখের শ্রীটাই গেছে নষ্ট হয়ে।

দুটো ছেলেমেয়ে দেখার অসুবিধে বলে হেমন্ত আলাদা একটি ঝি রেখেছে—পুরনো জানাশুনো—খরচের কোন ত্রুটি করে না সে। খাওয়া-দাওয়ায় জামায়-পোশাকে ওষুধে ধনীর সন্তানের মতোই মানুষ হয় ওরা। এক-একবার মনে হয়—আগের দিন হলে বলতও—মণিকাকে শুনিয়ে বলে, 'তোর ষোড়শীবাবুর ছেলেমেয়ে কি এভাবে কোনদিন মানুষ হয়েছে? তার ঘরে পড়লি না বলে তো দুঃখে পরাণ ফাটে, সেখানে কি এই রাজার হালে থাকত ছেলেমেয়ে? বুকে হাত দিয়ে সত্যি ক'রে বল দিকি।' কিন্তু বলে না, অপ্রীতি বাড়াতে ইচ্ছে করে না। কিছুই বলতে ইচ্ছে করে না কাউকে, প্রীতিকর অপ্রীতিকর কোন কথাই—নির্লিপ্ত উদাসীনভাবেই থাকতে চায়। যা কিছু কথা ওর এই বাচ্চা দু'টোর সঙ্গেই। কমলা কথা বলতে পারে না, তবু তার সঙ্গেই একতরফা বকে যায়—তাতেই খানিকটা শান্তি।

মণিকারও সে উত্তাপ সে জ্বালাটা কমেছে অনেকটা। নিমাইয়ের চেষ্টাতেই বোনের একটা বিয়ে হয়ে গেছে। ওরই আপিসের এক সহকর্মীর ভাই, আবাদায় বাড়ি, ম্যাট্রিক

পাশ রেলে কাজ করে—নিজেদের বাড়িঘর আছে। আশাতীত ভাল সম্বন্ধ ওদের পক্ষে। হেমন্ত বিয়ের সময় এক জোড়া বালা ও নগদ দুশো টাকা মণিকার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাতেই নাকি কোনমতে সম্মান রক্ষা হয়েছে।

কৃতজ্ঞ হওয়ারই কথা, স্বামী-শাশুড়ি দু'জনের কাছেই। বিশেষ এবার ষোড়শীবাবু নতুন স্ত্রীর ভয়েই সম্ভবত, একখানা হাওড়ার হাটের সস্তা দামের তাঁতের শাড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারেন নি। তবু মণিকার সে উদ্ধত ভাবটা যায় না। অবশ্য আগের জ্বালা আর নেই, কথায় কথায় নিমাইকে অপমান করা, অকথাকুকথা শোনানোটা বন্ধ হয়েছে, ভাগ্যকে অনেকটা মেনেই নিয়েছে—কিন্তু কে জানে কেন হেমন্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাবটা যেন কিছুতেই যায় না। কেন, তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না হেমন্ত, নিমাইও না। এ কি শাশুড়ি সম্বন্ধে বধূদের সহজাত বিদ্বেষ—শাশুড়ি হলেই তার ওপর আক্রোশ হবে—না অন্য কোন কারণ আছে?

তবু দিন-রাত খটাখটি, কথা-কাটাকাটি, রুক্ষ রূঢ় কথার আদান-প্রদানটা কমেছে—এই একটু তবু শান্তি। এতেই অনেকটা খুশী হেমন্ত। আর কিছু না হোক নিজের মনটা উত্ত্যক্ত, নিজের মুখটা ছোট হওয়ার থেকে তো অব্যাহতি। নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাগ্য নিয়ে একা চুপচাপ থাকতে পায়—এইটুকু ঢের।

হয়ত এইভাবেই চলত, অনন্তকাল না হোক অনেকদিন। হয়ত এইভাবেই ছেলে-মেয়ে দু'টো বড় হত, লেখাপড়া করত, পৈতে বিয়ে-থা হত—আরও ভাইবোন হয়ে যেত ওদের, তাদেরও মানুষ করত এই রকম ক'রে—একটানা জীবনযাত্রা বয়ে যেত, যেমন আর পাঁচটা পরিবারে যায়। তাই ভেবেছিল নিমাই, মনে মনে আশার বিরাট সৌধ গড়ে তুলে-ছিল। মণিকাও ভেবেছিল তাই—তবে সে অন্যরকম ; কোনদিন নিজের মতো ক'রে নিজের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী হওয়া আর হবে না—এইভাবেই বুড়ি হয়ে যাবে সে একদা। হয়ত কিছুদিন আগে হলে হেমন্তও তাই ভাবত, আর তাতে বিস্মিত হবার, ক্ষুব্ধ হবার—অন্য কিছু ভাববার কি পরিবর্তন করার কোন কারণ দেখত না।

কিন্তু ক্রমশ হেমন্তর আর এই একঘেয়ে জীবন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—'রাঁধার-পরে-খাওয়া আর-খাওয়ার-পরে-রাঁধা'-গোছের এই গতানুগতিক, একটা বিশেষ বাঁধা-ছকে বাঁধা-পথে আবর্তন এ যেন আর সহ্য হল না। অনেকদিন ধরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল—আর নয়। এখানে এভাবে আর নয়। নিঃসঙ্গই যদি থাকতে হয়, কারও সঙ্গে দু'টো প্রাণ খুলে কথাই না বলতে পারে, তাহলে এ সংসারে থেকে লাভ কি? নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে থাকার! এ ঠাট তুলে দেওয়াই তো ভাল।...

কলকাতায় যারা পরিচিত ছিল, আপনার লোকের মতো—তারা সকলেই চলে গেছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রী এক দায়িত্ব ছিল—তিনিও মারা গেছেন। এখানে আর কোন আকর্ষণ কোন বন্ধন নেই। এক যে পায়ের বেড়ি হতে পারত, গোরা—তার ওপরই যা একটু অপত্যস্নেহ পড়ে ছিল সে নিজে থেকেই বেড়ি ভেঙে অব্যাহতি দিয়ে গেছে। নিমাই কোনদিনই আপন হয় নি, হয়ত হেমন্তরই দোষ সেটা, আপন করতে চায় নি। যাই হোক, নিজের সংসার নিয়ে সুখী না হোক, ব্যস্ত পরিপূর্ণ সে—

থিতু হয়ে গেছে। আর কেন?

সম্পর্কে আপনার লোক কিছু আছে বৈকি। কিন্তু হেমন্ত তাদের আপন হতে বা আপন করতে পারে নি।

নিজের বোন বোন-পোরা কে কোথায় ছড়িয়ে আছে, যোগাযোগ হয় নি। করারও ইচ্ছা নেই আর। অনেক তো ক'রে দেখল; তার অদৃষ্টে কোন স্নেহের বন্ধন লেখেন নি ভগবান। মিছিমিছি আরও আঘাত আরও অপমান যেচে নিতে গিয়ে লাভ কি? সবচেয়ে বড় কথা—যাকে অবলম্বন করতে পারলে শেষ জীবনে একটু শান্তি পেতে পারত, হয়ত তাকে নিজেই সরিয়ে দিল—এই বাইরের জঞ্জাল জড়িয়ে, ছেঁড়াচুলে খোঁপা পরতে গিয়ে।—কে জানে, সুরেনের ও-ই ক্ষতি করল কিনা।

সুরেন এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কুষ্ঠিয়ায় এক কাপড়ের কলে কাজ নিয়ে চলে গেছে। অনেক ধরপাকড় ক'রেই নাকি সে চাকরি যোগাড় করেছে অথচ আর্থিক সুবিধা কিছু হয় নি। প্রায় একই রকম আয় থেকে গেছে, হয়ত চার-পাঁচ টাকা বেশী হতে পারে। এ যেন কলকাতা থেকে পালাবার জন্যেই চলে যাওয়া। এই মেয়েটা বুঝি সুরেনের জীবনেও অভিশাপের মতো এল। কেউ নয় সে, নিমাইয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নেই, মাঝখান থেকে হেমন্তই তাকে জড়িয়ে এই অনিষ্টটি করল। নিজেরও, সুরেনেরও।

একবার ভাবে তখন যদি নিমাইকেই সরিয়ে দিত—তাহলে হয়ত সুরেনকে অবলম্বন করা অসম্ভব হত না। আবার ভাবে, তাতে আরও কুফলই হত হয়ত। তার জন্যে মণিকারা পর হয়ে গেল, পথে বসল—এ জেনে সে কিছুতেই ওর কাছে আসত না, কোনদিনই। সে প্রস্তাবেই হয়ত চাকরি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে যেত! অনিষ্ট যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে, এই বিয়েতে তাকে জড়াতে গিয়েই।

কিন্তু এসব চিন্তাও তো এখন অনর্থক। জীবন-ভোর তো ভুলই ক'রে গেল। কোনটা কতটুকু বেশী আয় কোনটা কতটুকু কম, সে হিসেব এখন আর ক'রে লাভ নেই।

হঠাৎই মন স্থির ক'রে ফেলল একদিন।

নিমাইকে ডেকে বলল, 'তুই একটা ভাল মেস-টেস দেখে নে নিমে, এখানকার পাট তুলে দোব এবার।'

বিনামেঘে বজ্রাঘাত কথাটা বহুবার শুনেছে নিমাই, এইবার জিনিসটা বুঝল। প্রথম তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না ভাল ক'রে হতভম্ব হয়ে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল, তারপর যদি বা আবছা আবছা শব্দগুলো নিজের মনে মনে পুনরাবৃত্তি ক'রে একটু বুঝতে পারল—সে শুধু তার শব্দগত অর্থই, মর্মার্থ তখনও মাথায় পৌঁছল না। গলা এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, কোন প্রশ্ন করা কি কথার উদ্দেশ্যটা বুঝতে চাওয়ারও শক্তি রইল না অনেকক্ষণ।

এতদিনে, সবে—এই বোধহয় মেয়েটা জন্মাবার পর—অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে আশার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল—এই সম্পত্তি তার না হোক তার ছেলেমেয়েদের কপালেই নাচছে এই রকম একটা ধারণা হতে শুরু করেছিল, সেই সঙ্গে তার সংসারও

দৃঢ়মূল হল এই রকম একটা বিশ্বাস, এমন সময়ে এ আবার কী রকম কথাবার্তা ?···

অনেকক্ষণ, বোধহয় পাঁচ-ছ' মিনিট পরে, বিস্তর চেষ্টায় গলার স্বর ফুটল, 'তার—তার মানে ?'

'কেন, মানে না বোঝার মতো কিছু বলেছি নাকি ?' হেমন্ত ধমক দিয়ে ওঠে প্রায়, 'এখানকার সংসার তুলে দোব ! এখানে থাকলে ছেলেমেয়ে দুটো মানুষ হবে না, সেই গোরার মতোই হাল হবে। কাশীতে বাড়ি কিনব, সেইখানেই থাকব গিয়ে। ওরা সেখানে পড়বে—য়্যানি বেসান্তের ইস্কুলে। শুনেছি খুব ভাল ইস্কুল !'

আবারও কিছুক্ষণ সময় লাগে—কথাগুলোর মধ্যে থেকে বার্তাটা ছেঁকে নিতে। প্রশ্ন করতে আরও খানিকটা। গলা যে আপনিই এমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় মানুষের কোন পরিশ্রম কি রোদে ঘোরাঘুরি না ক'রেও—তা কে জানত ! অবশেষে অনেক কষ্টে শুধু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে, 'তা ওদের গর্ভধারিণী ?'

'আ মরণ তোমার ! ওদের গর্ভধারিণী ওদের সঙ্গেই যাবে। সে আবার কোথায় থাকবে !···আবার শুদ্ধভাষা—গর্ভধারিণী !···ঐ কচি শিশু দুটোকে নিয়ে যাচ্ছি কার ভরসায় তাহলে ?···মা ছেড়ে কি থাকতে পারে এখন থেকে ? ওদের সবাইকে নিয়ে চলে যাব একেবারে, এখানের বাড়ি ভাড়া দিয়ে। সেই জন্যেই তো তোকে মেস দেখতে বলছি একটা !'

আবারও কিছুক্ষণ—কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা একটা।

আবারও অতিকষ্টে, যেন আর কার ঠোঁট ও জিভ নড়ছে তেমনিভাবে, প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে, 'তা তার পর ?'

'তারপর আর কি, মেসে থাকবি, চার মাস ছ' মাস অন্তর যেমন যেমন ছুটি পাবি গিয়ে দেখে আসবি। তোর তো সংসারের জন্যে এক পয়সা খরচ হচ্ছে না, শুধু মেসে থাকা-খাওয়ার যেটুকু—সেই পয়সাটা রেল-কোম্পানিকে দিবি, তাতেও ঢের বাঁচবে।··· তোর আপিসে যে-সব হিন্দুস্থানী মিস্তির আছে, তারা কি করে খোঁজ ক'রে দেখিস, কেউ একবছর কেউ দেড় বছর অন্তর দেশে যায়। ঐ মাইনেতেই তাদের সংসার চালাতে হয় বলে ঘন-ঘন যাওয়া হয় না, তোর তো সে-সব দায়-দায়িত্ব রইল না।'

আর কোন কথা বলতে পারল না নিমাই। কী বলবে ? এ প্রস্তাব যে কেউ করতে পারে, করা সম্ভব তাই তো ধারণায় আসে না। এ তো মাথা খারাপের লক্ষণ। উন্মাদ-পাগল না হলে একথা কেউ বলতে পারে না, সেক্ষেত্রে সে কি জবাব দেবে, কাকে দেবে ? এরকম কোন প্রস্তাবের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা মাথায় থাকলে তার উত্তর একটা ভাবার চেষ্টা করত। এখন তো তারই মাথা খারাপ হবার যোগাড় এই আকস্মিক ধাক্কায়—কিছু ভাবা কি বোঝার মতোই তো অবস্থা নেই।···

তখনও কিছু বলতে পারল না, তার পরও অনেকক্ষণ নয়। গুম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ সেইখানেই। হেমন্তর তখন 'বোমা' ফেলা হয়ে গেছে—সে নিশ্চিন্ত হয়ে তার হিসাবপত্রের খাতা নিয়ে বসল, নিমাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না বা এ প্রসঙ্গে অন্য কোন আলোচনা করারও চেষ্টা করল না।

সেইভাবেই নিঃশব্দে বসে থাকার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল নিমাই।

উঠলও না, খেতেও গেল না।

হেমন্ত যে সে খবর না পেল তা নয়, তবে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করার মানুষ নয় সে। জীবনের এসব স্তর অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে। যাদের জন্যে এতটা ব্যস্ত হওয়া চলত তারা কেউ নেই। কেন যে খাচ্ছে না সে কারণ তো জানাই। এটুকু বিচলিত হবে বৈকি, আকস্মিক এত বড় একটা পরিবর্তন—বলতে গেলে একটা বিপর্যয়ের—প্রস্তাবে।

সাধাসাধি মণিকাও করল না। ঠিকে লোক রান্না ক'রে চলে গেছে। রাত্রের খাবার ও-ই পরিবেশন করে। হেমন্ত এখন রাত্রে শুধু দুধ আর ফল খায়—তার খাবার সাজিয়ে দিয়ে নিজে খেয়ে রান্নাঘর সেরে নিশ্চিন্ত সহজভাবেই শুতে এল।

দরজা বন্ধ হতে প্রথম প্রশ্ন করল নিমাই, 'শুনলে কথাটা? সব শুনলে?'

'শুনলুম বৈকি!'

'এর পরেও মুখে ভাত উঠল, বেশ খেতে পারলে! ধন্য, ধন্য তুমি!'

'ওমা, তা এর সঙ্গে না খাওয়ার কি আছে? খাওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, এখানেও তাঁর কাছে আছি সেখানেও তাঁর কাছে থাকব। এর মধ্যে এত আপোস-তাপোস করার কি আছে?'

'তার মানে? তা হলে তুমি চলে যাবে ওর সঙ্গে?'

'তুমি বড় বাজে কথা বলো। আমি কি যাওয়া না-যাওয়ার মালিক! আমি কে যে, যাব কি যাব না ঠিক করব, যাব কিনা ভাবতে বসব! আমি হলুম হুকুমের বাঁদী, যা হুকুম করবে তাই করব। শাশুড়ি, শাশুড়ির ছেলে—সবাই তো আমার মালিক, আমার মাথা কিনে রেখেছে। আমার কিছু ভাবারও নেই, ঠিক করারও নেই। তোমরা তোমাদের মতো ঠিক করবে—আমি যেমন হুকুম পাব তেমনি তেমনি কাজ করব। আমার অত ভাববার দরকার কি?'

এই বলে সে যেন বেশ গুছিয়ে আরাম ক'রে শোয়, পাশ-বালিশটা টেনে নিয়ে।

প্রায় সেই সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে নিমাই, 'উঃ! হুকুম! কিসের হুকুম? ওসব হুকুম-টুকুম আমি মানি না! আমার পরিবার, আমার ছেলেমেয়ে। তারা কোথায় থাকবে না থাকবে সে আমি বুঝব। ওঁর সঙ্গে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ভ্যাগাবেনের মতো ঘুরে বেড়াব নাকি?'

'তোমার পরিবার তোমার ছেলেমেয়ে পোষবার মতো ক্ষমতা আছে? তা থাকলে হুকুম শুনবেই বা কেন? আর তা থাকলে এ হুকুম দেওয়ারও সাহস হত না। জানে যে, এক কড়ার মুরোদ নেই তাই চোখ রাঙাতে সাহস করে।'

'আচ্ছা! মুরোদ আছে কি নেই সে বোঝা যাবে? আমি আমার মতো চলব। মাথার ওপর যে এলেকটার পাখা ঘোরাতেই হবে কি রাঁধুনী বামুন রেখে বসে খেতে হবে তার কি মানে আছে? আমার সঙ্গে কাজ করে হরিশ বসাক, সাতটা প্রাণী তার সংসারে, খাচ্ছে না? ওপোস ক'রে আছে নাকি?'

আর কথা কয় না মণিকা। এইটেই ঝোঁকের মাথায় বেশী বলে ফেলেছে, শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষটা প্রবল বলেই। বলার আগে অতটা তলিয়ে বোঝে নি তখনও। হরিশ

বসাকের বৌয়ের মতো সংসার করার—একমাত্র নিমাইয়ের ভরসায়—খুব উৎসাহ নেই তার। এত আকর্ষণও নেই স্বামীর ওপর, অত পরিশ্রম করারও সাধ নেই।

সারারাত ঘুমোয় না নিমাই। বলতে গেলে জীবন-মরণের প্রশ্ন তার সামনে। অনেক সহ্য করেছে সে এই বিষয়ের মুখ চেয়ে, অনেক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছে। অমানুষিক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে একসময়। সেই বিষয়—এই বিপুল বিত্তের আশা এক কথায় ছেড়ে দেবে? এতদিনের এত দুঃখ এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

আবার অন্য দিকটাও ভাবে।

জ্যাঠাইয়ের যে কথা সেই কাজ—এতদিন ধরে দেখে এটুকু বেশ চিনেছে সে। গোঁ যখন ধরেছে তখন ছাড়বে না। বাধা দিলে আরও বেঁকে দাঁড়াবে। 'মোষের সিং বাঁকা যোঝবার বেলায় একা'। এ মানুষকে নোয়ানো যাবে না। বিষয়ের আশা রাখতে গেলে, ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে—তারা ভালভাবেই মানুষ হবে হয়ত ওখানে গেলে—এই মতে মত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার মানে স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম তুলে দেওয়া।

হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে আবার নরম হতে পারে, তখন হয়ত ওকেই সেখানে নিয়ে যেতে পারে, কিংবা আবার কলকাতাতেই ফিরে আসতে পারে—তবে সে অনিশ্চিত মর্জির মুখ চেয়ে থাকা।…এক যদি মরে যায়। বয়স হয়েছে, মরার বয়সই হয়েছে। কিন্তু এখনও যা শক্ত শরীর, সহজে মরবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ সংসারে যারা জ্বালাতে এসেছে তারা চট ক'রে মরে না।

সমস্ত রাত ভেবেও মন স্থির করতে পারল না।…মণিকার কাছ থেকে কোন সাহায্য —যুক্তি-পরামর্শ পাবার উপায় নেই। সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সুতরাং সকালবেলাও দুশ্চিন্তা নিয়েই উঠল।

সেইভাবেই কাটল ঘণ্টাখানেক।

হয়ত এই চিন্তা নিয়ে আপিসে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদেব সঙ্গে পরামর্শ করলে মধ্যপন্থা কিছু বেরোত, কিন্তু তার আগেই, হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বুদ্ধি-বিবেচনা ভবিষ্যতের চিন্তা গেল ভেসে।

হেমন্ত মেয়েটাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিমাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন ঝাঁপিয়ে কোলে চলে এল; আর ঠিক সেই সময়ই স্নান সেরে সিঁদুরের ফোঁটা পরে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো ভিজে চুলের রাশি পিঠে এলিয়ে তার ওপর দিয়ে আলতো মাথার কাপড় টেনে সামনে এসে দাঁড়াল মণিকা! কি রকম কী একটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিমেষে আগুন জ্বলে উঠল। সব হিসেব ভেসে চলে গেল কোথায়। দুম দুম ক'রে পা ফেলে নিচে নেমে গিয়ে সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বগতপাঠ শুরু করল, একটা অদ্ভুত সুর ক'রে বলে উঠল, 'উঁঃ, হুকুম মানতেই হবে। পরিবার আমার রায় দিয়ে বসে রইলেন। কেন, কিসের জন্যে মানব আমি অন্যাই হুকুম? আমি কি এতটা বয়সে বে করেছি আমার বৌ শুধু ঐ

বুড়ির সেবা করবে বলে ?…আর আমি এখেনে মেসে পড়ে পড়ে হাপু গিলব ! তারপর ঐসব ছাইভস্ম গু-গোবর খেয়ে আমার শরীরটি যখন যাবে—তখন ? একে আমরা হলুম গে অল্পভূগীর বংশ !…তাছাড়া, বলি শরীরের ধম্মও তো একটা আছে ! শেষে কি ভাইপোটার মতো কুচ্ছিত রোগ ধরিয়ে বসে থাকব ?…না, ওসব হবে-টবে না, এই বলে দিলুম। বৌ ছেড়ে ছেলেমেয়ে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না তোমার শাশুড়িকে বলে দিও। হুঁ !'

বক্তব্যের শেষেও একটা বিচিত্র সুর বার করে গলা দিয়ে।…

এক মুহূর্তের জন্যে কি চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল ?

ভ্রূকুটিতে দেখা দিয়েছিল বজ্রের আভাস ?

কে জানে, মণিকার সাহস হয় নি সেদিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার।

তবে কথা যখন কইল হেমন্ত, তখন কণ্ঠস্বরে জ্বালার আভাসমাত্র নেই। বরং বড় বেশী কোমল বলে মনে হল।

'তা অমন ক'বে চোখের আড়ালে গিয়ে আর একজনকে উপলক্ষ করে বলছিস কেন ? এ আর এমন কি দোষের কথা যে, সামনা-সামনি বলা যায় না ? আমিই বা রাগ করব কেন এতে ? তোমার মাগছেলে নিয়ে তুমি তোমার মতো ঘর করবে, সে ক্ষমতা হয়েছে তোমার—এ তো অতি উত্তম কথা।…খুব ভাল কথা ! সুমতি হয়েছে তোমার বুঝতে হবে। এত সহজে অব্যাহতি দেবে আমাকে তা ভাবি নি।…তা বেশ, সেই ব্যবস্থাই করো তাহলে। এই কথা পাকা তো ?'

তবুও নিমাইয়ের সাহস হয় না ওপরে এসে মুখোমুখি কথা কইতে। উত্তর দেয়, 'ব্যবস্থা করো বললেই তো আর এখুনি করা যায় না ! এখুনি বেইরে যাও বাড়ি থেকে বলবে, আর অমনি বৌছেলে নে বেইরে যাব সুড়সুড় ক'রে তা হবে না। নোটিশ দিতে হবে। সময় চাই আমার। একটা ভাড়াটে তুলতে গেলেও একমাসের নোটিশ লাগে।'

'সে তো লাগবেই। ভাড়াটে তো লক্ষ্মী, তারা টাকা দেয়, খাওয়ায়। তাদের সঙ্গে কি আর পথের শ্যাল-কুকুরের তুলনা ! তাদের তো দূরদূর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত, দ্যাখ-মার দ্যাখ-মার ক'রে।…তা তবে সেও অত ভয় পেতে হবে না। সময় দিচ্ছি, সময় নাও। একমাসের নোটিশই দিলুম। বাড়ি বিক্রি করাও তো একদিনে হচ্ছে না, দালাল ধরাব, খদ্দের দেখবে, দরদস্তুর আছে, বায়না, সার্চ, রেজেস্ট্রী—অনেক সময় লাগবে। তোমাদের অবিশ্যি অতদিন থাকতে হবে না। তোমরা তোমাদের সুবিধেমতো যখন খুশি চলে যেয়ো।'

তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার কিছুই ছিল না, এক-বস্তরে এসে-ছিলে, মনে আছে বোধহয়—শ্বশুরও ঐ একপ্রস্থ দানের বাসন ছাড়া কিছু দেয় নি। তবু যা-যা দরকার, যা-যা ভোগ করছ—বাসন বিছানা খাট—সব নিয়ে যেয়ো, স্বচ্ছন্দে। কুকুরে মুখ দেওয়া বাসন, বেড়াল শোওয়া বিছানা—ওতে আমার দরকার নেই। …একটু আগেই ঘর ঠিক ক'রে যা-যা নেবার নিয়ে যেয়ো, কেন না—এসবও তো রাখব না। খাট চেয়ার টেবিল বাসন-কোসন—সব বেচে দোব। খদ্দের ঠিক হলে যা থাকবে সব নিয়ে চলে যাবে। তোমাদের যা নেবার তা আগেই আলাদা ক'রে নিও, আমাকে দেখিয়ে।'

শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে, বিচারকের রায় দেবার মতো ক'রেই বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল হেমন্ত, সহজ ধীর গতিতে।...

সেই সিঁড়ির কাছেই অনেকক্ষণ আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে রইল নিমাই। তারপর কেমন এক-রকমের করুণ অসহায় কণ্ঠে বললে, 'এসব আবার কি কথা ? এ বাড়ি বিক্কিরি ক'রে দেবে নাকি ? তবে যে শুনেছিলুম ভাড়া দিয়ে চলে যাবে !'

'সে তো তখন তোমরা একদিন বাস করবে—এই কথা ভেবেছিলুম ! সে পাট যখন চুকেই গেল, তখন আর এসব ঝামেলা কার জন্যে রাখব ? কে দেখবে কে মেরামত করাবে। কে সময়ে টেক্সখাজনা দেবে।' ঘর থেকেই তেমনিভাবে উত্তর দেয় হেমন্ত।

আরও কিছুক্ষণ সময় লাগে নিমাইয়ের সাহস সঞ্চয় করতে, তারপর গোটা পাঁচ-ছয় ধাপ উঠে এসে বলে, 'তা এ-কাজগুলো কি আমি করব না বলেছি ? এসব তো দেখাশুনো আমিই করতে পারি, যেমন করছি—'

'হ্যাঁ, অমনি ভাড়াটা আদায় ক'রেও খেতে পারি ! সে জানি। অত উপ্‌কার তোমাকে না করতে হয়, অত কষ্ট—সেই জন্যেই সব ঘুচিয়ে দিয়ে চলে যাব। তুমি স্বাধীন জীবন বেছে নিয়েছ, নিজের ছেলেমেয়ে নিজের বৌ নিয়ে নিজের বাড়িতে নিজস্ব সংসার পাতবে —তার মধ্যে আর এসব কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না। মিথ্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এসব পিছটান জঞ্জাল পায়ে না বাধানোই তো ভাল। আমিই বা অত কষ্ট দোব কেন ? তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, আমাকেও সেটা দেখতে হবে বৈকি ! পাল্টা মুক্তি দিতে হবে না ?'

আরও খানিক পরে নিমাই কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল হেমন্ত, 'চোপ ! আর একটা কথাও না শুনি ! ফের যদি ঐ ক্যানক্যানানি গ্যাজোর গ্যাজোর শুনি—এখুনি এই দণ্ডে তোর আর তোর বোয়ের পেছনে লাথি মেরে বার ক'রে দোব—তোর কোন বাবা কোন শ্বশুর রুখতে পারবে না বলে দিচ্ছি !...হারামজাদা। ডুঢও খাব টামাকও খাব—নিজের নিজের হিসেব ষোলকাহন বুঝে নোব, অথচ তোমারটাও ষোল আনা চাই—না ? অত আহ্লাদ এখানে চলবে না। নিজের পথ বেছে নিয়েছ—দেখে বুঝে—ঐখানেই ইতি করো, আর এ সম্পর্ক নয়।'

সেদিন আর আপিস গেল না নিমাই। খেলও না কিছু। থুম হয়ে বসে রইল শুধু। কথাটা যখন বলে তখন কোন জ্ঞান ছিল না তার। থাকলেও এ পরিণতি হবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। সত্যি সত্যিই সব বেচেকিনে দিয়ে চলে যাবে—হয়ত বা কোন মঠে কি হাসপাতালেই দান ক'রে দেবে—এ সম্ভাবনার কথা মাথাতেই যায় নি তার। কিন্তু এখন আর কথাটা তামাশা বলে মনে হচ্ছে না। এ বুড়ি সব পারে। এ কী হল তাহলে তার ? এখন কি হবে ? একটা মিনিটের ভুলে এতদিনের সব কষ্ট অনর্থক হয়ে যাবে নাকি ?

সারা দিন ভেবে বিকেলের দিকে শুষ্কমুখে রুক্ষ চুলে হেমন্তর কাছে গিয়ে বসল। গলায় একটা কান্নার মতো আওয়াজ ক'রে পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'উঁহুঁ উঁহুঁ হুঁ, আর কখনও এমন করব না, উঁহুঁ হুঁ, এই বারটির মতো মাপ

করো। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছল তাই—উঁ হুঁ হুঁ—আরও ঐ মাগীর জন্যে, দিন-রাত জ্বালায়, আমার জন্যে এমন ক'রে সর্বত্যাগী হলে আমাকেও তাহলে আত্মঘাতী হতে হবে। হুঁ হুঁ, বলে কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—'

কথাটা শেষ করা গেল না। প্রচণ্ড এক চড় এসে পড়ল গালে তার মধ্যেই, সে চড়ের বেগে কিছুক্ষণের জন্যে চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল নিমাইয়ের. সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামলাবার আগেই প্রচণ্ডতর লাথি!

'হারামজাদা! আমার সঙ্গে ন্যাকাপনা করতে এসেছ! ঐ মায়াকান্নায় আমাকে ভোলাবে! মানুষ চেন নি এতদিনেও? ফের যদি আর একটা কথা শুনি, এখুনি এক-কাপড়ে বের ক'রে দোব বাড়ি থেকে—মাগছেলেমেয়ে সুদ্ধ! কাল সক্কালবেলাই যেখানে হোক ঘর খুঁজে নিয়ে চলে যাবি এই বলে দিলুম, যদি লাথি খেয়ে না বেরোতে চাস! আত্মঘাতী! আত্মঘাতী হবার হলে অনেকদিন আগেই হতিস—যদি লজ্জাঘেন্না কিছু থাকত! বেইমান, বজ্জাত, নাথখোর!...নাথখোরের জাত কোথাকার!'

এরপর আর একটা কথাও বলার সাহস হল না নিমাইয়ের। আঘাতে অপমানে এবার সত্যিকার চোখের জল ফেলতে ফেলতেই উঠে আসতে হল।

॥ ২৮ ॥

পরের দিনই দু-তিনজনকে ডেকে দালাল ধরিয়ে দিল হেমন্ত। বাড়ি জমি যেখানে যা আছে সব বিক্রী করবে সে। এ ছাড়াও ফার্ণিচার গহনাপত্র বিক্রী করতে শুরু করল। ঠিক পরের দিন না হলেও দিন-তিনেকের মধ্যেই নিমাইকে চলে যেতে হয়েছিল। তবে অবশ্য এক-কাপড়ে নয়—রাগের মাথায় যা বলেছিল—খাট বিছানা বাসন-কোসন, যা-যা ওদের দরকার হতে পারে সবই দিয়ে দিল হেমন্ত। মায় কাপড়-চোপড় রাখার একটা বড় তোরঙ্গ—বাসনপত্র রাখার কাঠের বাক্স, আলনা সব। যাবার সময় মণিকা প্রণাম করতে এসেছিল, তাকে কিছু বলে নি, তবে সেই সময়ই বলে দিয়েছিল, 'ঐ হারামজাদা না আমার সামনে আসে বৌমা, বারণ ক'রে দিও। আমার মেজাজের ঠিক নেই, আবার একটা কেলেঙ্কারী করে বসব হয়ত যাওয়ার সময়।'

সে সাহস এমনিও হত না—একথা শোনার পর তো হবেই না—চোরের মতোই চলে গিয়েছিল নিমাই একদিক ঘেঁষে, ঘাড় হেঁট ক'রে।

যাবার সময় মণিকা ছেলেমেয়ে দু'টোকে কোলে দিতে গিয়েছিল, হেমন্ত তাও নেয় নি, পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল একেবারে।

এরপর একেবারেই বাড়ি খালি হয়ে গেল, শুধু ঝিয়ের ভরসায় থাকা। এভাবে থাকা উচিত নয়—ঝি নতুন, তা ছাড়া সে মুখ্যু মেয়েছেলে—তার দায়িত্বজ্ঞানের ওপরও ভরসা করা ঠিক হবে না বুঝে—ধন্নুবাবুর ছেলেকে গিয়ে ধরল। সে তার জানা একটা বয়স্ক আর বেশ শক্ত-সমর্থ দেখে দারোয়ান ঠিক ক'রে দিল, বলল, 'যতদিন না আপনি যান, বাড়ি খালি করেন, ততদিন একেই রেখে দিন। এর প্রাণ থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। গোণ্ড জেলায় বাড়ি, বুড়ো হলে কি হয়, সুযিয় এখনও চলন্ত ট্রেণে উঠে দু-চারটে লোকের মুণ্ডু কেটে নিয়ে আবার নেমে আসতে পারে। ওর হাতে লাঠি

থাকতে বন্দুক, পিস্তল নিয়ে কেউ এলেও ভয় নেই। তবে তেমনি, মনিবের কোন অনিষ্ট কখনও করবে না। যার নিমক খেয়েছে তার জন্যে যে কোন সময় জান দিতে তৈরী। একেই রাখুন—বাইরে-টাইরে বেশী পাঠাবেন না, দিন-রাত পাহারা দেবে সে-ই ভাল।'

বাড়ি জমি সবই দ্রুত বিক্রী হয়ে গেল, তিন-চারমাসের মধ্যেই। কিছু হয়ত কম পেল—ধৈর্য ধরে থাকলে সবগুলোরই কিছু কিছু বেশী দাম পেত—কিন্তু কমে ছাড়ল বলে তাড়াতাড়ি বিক্রী হল। কলকাতা যেন তাকে বেঁধে মারছে মনে হয়—চারিদিক থেকে গলা টিপে ধরছে। যত তাড়াতাড়ি হয় এখানের পাট চুকিয়ে যেন পালাতে পারলে বাঁচে—এই রকম মনের ভাব তার। লোকসান হয় হোক, তার আর লাভই বা কি লোকসানই বা কি, দু-পাঁচ হাজার কম পেলে তার এমন কি ক্ষতি হবে—তার চেয়ে মনের শান্তির দাম ঢের বেশী।

সব বেচে দিল, মানে অধিকাংশই। সামান্য কিছু সোনার গহনা ও ক'খানা গিনি হাতে রাখল। বিদেশে গিয়ে যদি থাকতে হয় একা—হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে, ভারী অসুখ-বিসুখ কিছু যদি হয়—তখন এগুলো কাজে লাগবে। সোনা ফেললে রাত-দুপুরে টাকা মেলে, আর কোন জিনিসের বদলেই অত তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যাবে না। এছাড়া যা কিছু টাকা—বাড়ি জমি ফার্ণিচার বাবদ পাওয়া গেল সব ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিল। বলে দিল সুদের টাকাটা তাকে ছ'মাস অন্তর পাঠাতে। ধন্নুবাবুর ছেলের পরামর্শেই—আর যা-যা, শেয়ার কোম্পানীর কাগজ ছিল তাও ব্যাঙ্কেই জমা ক'রে দিল, তারাই যাতে সুদ আদায় ক'রে নিতে পারে!

ওর পরামর্শেই তিনটে ব্যাংকে ভাগ ক'রে রাখল টাকাটা, দিনকাল খারাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়, বড় বড় কারবারীরা টলমল করছে। স্বদেশী হাঙ্গামায় সায়েবদের কারবার অনেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কোন্ ব্যাংক কখন ফেল হল কেউ বলতে পারে না। তবে এসব ব্যাপারে হেমন্তরও কিছু জ্ঞান-অভিজ্ঞতা হয়েছে এতদিনে—সুদ কম পাবে জেনেও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকেই বেশির ভাগ টাকা জমা ক'রে দিল।···

এবার তল্পি গুটোবার পালা। আর নয়, এখানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সময় হল।

শেষ বাড়িটা রেজেস্ট্রি হবার আগেই সে সুরেনকে একটা টেলিগ্রাম করল—সে যেন অতি অবশ্য এই রবিবার এসে ওর সঙ্গে দেখা করে। সৌভাগ্যক্রমে সেই শনিবারেই মুসলমানদের কী একটা বড় পর্ব পড়েছিল, দু'দিন ছুটি—একদিন আগেই এসে পড়ল সুরেন।

'কী ব্যাপার পিসীমা, এমন জরুরী তলব? আমি তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছি, কেবল ভাবছি অসুখ-বিসুখ কারুর না ক'রে থাকে! হে ভগবান।···কিন্তু এ কী? বাড়ির কি হাল? জিনিসপত্তর সব কোথায় গেল?—খালি বাড়ি ঢা-ঢা করছে। এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাচ্ছেন নাকি? সেই জন্যে খবর দিয়েছেন?···নিমাইদারা কোথায় গেল, তাদেরও তো দেখছি না—?'

'বোস বোস, বলছি। তুই এক নিঃশেষে সব জিজ্ঞেস ক'রে যাচ্ছিস—উত্তরটা দেবার অবসর না পেলে কেমন ক'রে দোব ?…কিন্তু সারারাত জেগে এসেছিস, আগে কাপড়-চোপড় ছাড়, মুখ-হাত ধো, বলছি সব। আমার একটা থানই পর, কী আর হবে ! অনেক বেঁচেছে দাদা, তার আর অকল্যাণ হবার ভয় নেই।'

তার পর, সুরেন স্নান-আহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে বসলে সবই খুলে বলল হেমন্ত। ওর প্রস্তাব থেকে নিমাইয়ের প্রতিক্রিয়া—তাকে তাড়ানো, সব। সেইজন্যেই সুরেনকে ডেকেছে সে। এবার এখানকার যা-কিছু সম্পত্তি বেচে দিয়ে, এখানের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে, পাট উঠিয়ে, চিরদিনের মতো কাশীবাসী হতে চায় সে। বিক্রী সমস্তই হয়ে গেছে, বালিগঞ্জের বাড়িটা বাকী ছিল, সে-ও বায়না হয়ে গেছে, তারা সার্চ প্রভৃতি যা করবার সব করিয়েছে, সামনের পরশু রেজেস্টি হলেই হেমন্তর সব দায় শেষ। এ-বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে গত মাসেই, তারা ক'টা দিন দয়া ক'রে রেখেছে ; তবে এবার ছেড়ে দিতেই হবে। সেই জন্যেই সুরেনকে এত জরুরী তলব পাঠাতে হয়েছে।

সুরেন এসব কিছুই জানত না। ইচ্ছে ক'রেই হেমন্ত লেখে নি এসব। যে শান্তির জন্যেই এখান থেকে সরে গেছে—তাকে আর উত্ত্যক্ত ক'রে লাভ কি ?

সমস্ত শুনে সুরেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার পর ঈষৎ একটু অনুযোগের সুরেই বলল, 'এটা কেন করতে গেলেন পিসীমা ? এ কি মানুষ পারে ! সবে দু'টো ছেলেমেয়ে হয়েছে, অল্পবয়সী স্ত্রী, তাদের সেই কোন মুলুকে রেখে এখানে পড়ে থাকবে—এ কি সম্ভব ? এ কেউই রাজী হত না। অন্তত বাঙালীর ছেলেরা নয়। এ আপনার তাকে তাড়াবার জন্যেই মতলব করা !'

অনুযোগের সুরটা শেষ পর্যন্ত যেন তিরস্কারের সুরেই পরিণত হয়।

হেমন্ত অভিযোগটা মেনে নিল। বলল, 'তা যে একেবারে মিথ্যে তা বলতে পারি না। আসল কথা বৌটা ঐ রকম, নিমেটার অবশ্য কিছু করার নেই, তাকে দোষ দেওয়া বৃথা—আমার যেন কেবলই মনে হতে লাগল, নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে আছি—একা, নিঃসঙ্গ। এতগুলোকে নিয়ে রয়েছি, এত খরচ করছি, গতরেও খাটছি, তবু আমার কেউ নেই। আমি একা। এইটেই সহ্য হল না বাবা। এতে যদি অমন মতিচ্ছন্ন না হত, মুখের ওপর কথা না বলত—কি হাতে-পায়ে ধরে সময় চাইত—কি যদি আমার কথাটা বলত মিথ্যে ক'রেও, যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—তাহলে কি হত বলা যায় না ! হয়ত আমিই মত বদলাতুম, কিম্বা হয়ত ওদেরই এ বাড়িতে রেখে আমি একা কাশী চলে যেতুম। ওরও অদৃষ্টে দুঃখ আছে, গ্রহ বিরূপ—তাই অমন ছন্নমতি হল। …তবে এ একরকম ভালই হল, বুঝলি ? সে তার জোর বুঝেছে, বৌ-ছেলে নিয়ে সংসার পেতেছে—এত চিন্তাই বা কি ? এতদিন ত্যে টানলুম, পয়সাও হাতে জমেছে কিছু নিশ্চয়। আর সে যা হয় করবে। গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হবার তো হয়েই গেছে।'

'হয়ে কি গেছেই ঠিক ? আর ফেরানো যায় না ?''

'না। ওর মনের চেহারাটা দেখতে পেয়েছি। আর আমার সাধ নেই সংসারের বাবা। আমারও তো ঢের বয়স হল—আমার দিকটাও তো আমার ভাবার অধিকার আছে !'

'তা আমি এখন কি করতে পারি বলুন ?'

সুরেনের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ একটু শঙ্কার আভাস।

হাসে হেমন্ত। বলে, 'ভয় নেই, নিমের বদলে তোকে নিয়ে সংসার পাততে চাইব না। ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, 'তোকে আমি সেই একদিনেই চিনে নিয়েছি। আর সে শখ থাকলে, সব বেচে-কিনে দিয়ে তোকে খবর দোব কেন, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতুম!'

তারপর বলে, 'তা নয়। তোকে একটু সাহায্য করতে হবে বাবা। এই বোধহয় শেষ, আর তোকে বোধহয় বিরক্ত করতে হবে না। মনে তো হচ্ছে আর ফিরব না, যা হবার বাবা বিশ্বনাথের চরণেই হবে।···আমাকে একটু গিয়ে থিতু ক'রে দিয়ে আসবি শুধু। একা তো কখনও যাই নি কোথাও, কেউ না কেউ সঙ্গে গেছেই।···তারক যখন যায়, ডাক্তারবাবু পুরুতঠাকুরকে ঝিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এমনি বেড়াতে যাওয়া সে তবু একরকম। এ ধর—সংসার ভেঙে নিয়ে চিরদিনের মতো এখানের বাস উঠিয়ে যাওয়া, এই বয়সে আর একা যেতে ভরসা হয় না। হ্যাঙ্গাম ঝঞ্ঝাটও তো কম নয়। কলকাতা শহর দাঁদুড়ে বেড়াই চিরদিনই, আমাদের সে আমলে পাল্‌কি ছিল, ব্যায়রাদের বলতুম অমুক জায়গায় যাব—নিশ্চিন্তি, উড়ে ব্যায়রারা তখনকার দিনের গুণ্ডা-বদমাইশ কি চোর-ডাকাত ছিল না। একালে ট্যাক্সী হয়েছে, একা ট্যাক্সী চড়তেও অবিশ্যি সাহস হয় না, তেমনি রিক্‌শাও আছে, যেখানে খুশি যাওয়া যায়। কাশী শুনেছি গুণ্ডার জায়গা—বড় ভয় করে।'

'তা জেনে-শুনে সে দেশে যাচ্ছেন কেন তাহলে?' দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে ফেলে সুরেন।

'বদমাইশও যেমন আছে, তেমনি বাবাও আছেন।' হেমন্তও হেসে জবাব দেয়, 'তাছাড়া সবাই কি আর বদমাইশ গুণ্ডা, ভাল লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যিসি সাধক বিস্তর আছেন। আমার মতো অনাথা অবীরে বিধবাদের তো কথাই নেই। আমাদের তো ও-ই জায়গা বাবা! এমন তো হাজারে হাজারে ওখানে!'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তোকে বলা এই জন্যে যে বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আমার ঝোঁকটা পছন্দটাও জানিস। তুই তিন-চারটে দিন আগে চলে যা—কোথাও একটা হোটেল-মোটেলে থেকে—আমার জন্যে একটা বাড়ি কি ঘর খোঁজ। কোন ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে একটু আলাদা বন্দোবস্ত—এই হলেই ভাল হয়। একেবারে একা থাকতেও ভরসা হয় না, অথচ আবার কারও সঙ্গে পাশাপাশি গাওয়া-গাওয়িও থাকতে পারব না। এক জায়গাতেই জল-কল হবে হয়ত, তাই নিয়ে দিন-রাত খ্যাচখ্যাচানি, নোংরার দল যত, ছেলেপুলে থাকলে ক্যালব্যাল—সে আর এ বয়সে বরদাস্ত হবে না।···মানে, একটা বাড়ির দোতলা কি তেতলা নিয়ে রইলুম, অন্য অংশে বাড়িওলা কি অন্য ভাল ভাড়াটে রইল—এই রকম হলেই সবচেয়ে ভাল।···আর সেই সঙ্গে মা-গঙ্গার ধারে-কাছে হয়—চট ক'রে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে পারি কি জানলা ছাদ থেকে দর্শন হয়—।···অনেকখানি ফরমাশ মনে হচ্ছে, কিন্তু তা নয় রে, গোটা বাঙ্গালী-টোলাটাই বলতে গেলে গঙ্গার ধারে, ওদিকেও শহরের ধার দিয়েই তো মা গেছেন—এমন বাড়ির অভাব হবে না।'

'তার পর? আপনি যাবেন কার সঙ্গে? আবার ফিরে এসে নিয়ে যেতে হবে তো?'

'উঁহু, সে এখন আমার যে দারোয়ান আছে—সূর্য, গোণ্ড জেলায় বাড়ি, এদিকে ডাকাত শুনেছি কিন্তু খুব বিশ্বাসী, নজরও খুব চারদিকে।...মালপত্তর যা আলাদা যাবে তা বুক করিয়ে দেবে এখন, সে লোক আমার আছে। এই বাড়ি যে কিনেছে সে রেলেই কাজ করে—সে বলেছে আপনি নিভ্ভরসায় থাকুন—আমি বুক করিয়ে রসিদ এনে যাবার আগে পেঁছে দোব।...তুই বাড়ি ঠিক ক'রে টেলিগ্রাম করিস একখানা, আমি আর দারোয়ান এখান থেকে রওনা হয়ে যাব, তুই ইস্টিশানে নামিয়ে নিস। যেটুকু গিয়েই দরকার হবে, বাক্স একটা, বিছানা, ঠাকুর আর রান্নার বাসন—এই শুধু সঙ্গে যাবে, মোট তিন-চারটে মাল, সে দারোয়ানই নিয়ে যেতে পারবে। ও ধনুবাবুর আমলের লোক, ওঁর কাজে যখন ভর্তি হয় তখন কুড়ি-একুশ বছর বয়েস—ধনুবাবুর সঙ্গে ঘোরাই ওর কাজ ছিল বাইরে বাইরে।'

সুরেন তখনই কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ ক'রে বসে রইল। বোধহয় মনে মনে একটা হিসেব ক'রে নিলে, তারপর বললে, 'এ যা বলছেন, যাওয়া-আসা, বাড়ি দেখা, আপনাকে বসিয়ে থিতু ক'রে আসা—অন্তত পনেরোটি দিনের ধাক্কা। বেশী তো কম নয়। এত দিন ছুটি তো পাব না আমি। পাওনাও নেই। বছরে ক'টা দিনই বা ছুটি, এই ক'মাস আগে মায়ের কাজেই সব চলে গেছে, বেশীই নিতে হয়েছিল দু-একদিন। আর, ওসব কাপড়কলের ব্যাপার, পাওনা থাকলেও অত দিন একটানা ছুটি দিত না। এমনিই ছুতো খুঁজছে অবিরত জবাব দেবার। আমি বড়বাবুর থুন্ দিয়ে, তাঁকে ঘুষ খাইয়ে ঢুকি নি, তাঁর একটা গাত্রদাহ আছেই। নিহাৎ মা মারা গেছেন, তাঁর কাজ বলে কিছু বলতে পারে নি। এ বাজারে চাকরি গেলে আর কোথাও কাজ পাব না।...ধীরুটা ঐ কাণ্ড ক'রে বসে রইল, যা হোক তবু মাসে কুড়ি-পঁচিশটা টাকাও দিত—সে তো বন্ধ হলই, বেরিয়েও কোথাও কাজ পাবে না। আমার যদি কাজ যায় এখন—ঐ এক গন্ধ রইল গায়ে, আমিও অন্য চাকরি পাব না।'

'সে কি রে! ধীরু আবার কী করল? কৈ, শুনি নি তো! ধীরু মানে তোর ছোট ভাই ধীরেন?'

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সুরেন বললে, 'সে আপনাকে লেখা হয় নি বটে। এমনিই তো চিঠি লিখি না বিশেষ—অত মনেও ছিল না ; তাছাড়া এসব খবর লেখাও উচিত নয়, আপনার পেছনে টিকটিকি লেগে থাকত। এখন আমাদের সব চিঠি খুলে পড়ে। আসা-যাওয়া—দু'দিকেই।'

'কেন, ধীরু কি করল কি?'

'আর বলেন কেন, চাকরি-বাকরি ছেড়ে—হঠাৎ খেয়াল হল নাইট ইস্কুল করবে, চরকা-কাটা খদ্দর-বোনা এই সব শেখাবে। মা মারা যাবার আগেই—মা মারা গেছেন তা বোধ হয় শোনেও নি—বলে আমি তো সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করছি না, এসব ব্যাকওয়ার্ড জায়গা, পশুর মতো জীবনযাপন করে সব, না খেয়ে মরছে—না শিক্ষা, না কিছু—শাঁস যেটুকু রাজাই শুষে নিচ্ছে,—দু' পায়ে থ্যাঁৎলাচ্ছে এদের। এর বিহিত না করতে পারি—চেষ্টাও করব না, তবে আর মানুষ কি?...তা এসব দেশ

হলেও না হয় হত—ইংরেজের খাস দখলে—এদের তবু একটু চক্ষুলজ্জা আছে—ওখানে রাজার অনেক হাত পুলিশের ব্যাপারে, তিনি এসব প্রজা-ক্ষেপানো, বিশেষ তাদের সচেতন ক'রে দেওয়া নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে—ভাল চোখে দেখবেন কেন? তিনিই বোধ হয় কলকাঠি টিপে দিয়েছিলেন, কাছাকাছি একটা ডাকাতি হতেই তার সঙ্গে ওকে জড়িয়ে সাক্ষী-সাবুদ এমনভাবে সাজালে—ওর সেই নাইট ইস্কুলের ছাত্ররাই সাক্ষী দিয়ে এল দু-তিনজন; কি করবে, তাদেরও প্রাণের ভয় আছে তো?—প্রমাণ হয়ে গেল যে, ধীরু সে দলে ছিল। যদিও আসল ডাকাত একজনকেও ধরতে পারে নি নাকি, টাকা-পয়সাও রিকভার করতে পারে নি। তবে তাতে কিছু এসে গেল না, ধীরুর জেল হয়ে গেল দু' বছর। এখনও সেই জেল খাটছে।'

হেমন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'বলিস কি রে, তা বাড়ির কথা, মা-বাপ ভাইয়ের কথা ভাবল না একবার?'

এই ধরনের দেশপ্রীতির কথা সে ভাবতে পারে না, সেরকম শিক্ষাও নেই তার।

'সে বলে তোমরা তো ভাবছই। সবাই যদি বাড়ির মার কথা ভাবে তো এ মার কথা ভাববে কে? দেশও তো মা। দেশের জন্যে, দেশের লোকের জন্যে সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।'

বলে একটু হাসল সুরেন, বিষণ্ণ ম্লান হাসি। বলল, 'আমাদেরই কি আর ইচ্ছে করে না দেশের কাজে লাগতে? চোখের সামনে যেদিন দেখলুম মদের দোকানে পিকেটিং করেছিল বলে পুলিশ দু'টো ছেলেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে খোয়া-বার-করা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—জামা ছিঁড়ে পিঠের চামড়া কেটে রক্তারক্তি, তার ওপর লাথি মারছে বুট সুদ্ধ—সেদিন কি আর রক্ত গরম হয় নি, ইচ্ছে হয় নি কি ছুটে গিয়ে ওদের পিস্তল-বন্দুক কেড়ে নিয়ে ওদের গুলি ক'রে মারি? কিন্তু মহাত্মাজীরও নিষেধ আছে, আর তা ছাড়া বুড়ো বাপ-মার কথা ভেবেই. তারা উপোস ক'রে থাকবে হয়ত, হয়ত কেঁদে কেঁদেই প্রাণটা দেবে—আর সাহসে কুলোয় নি।'

শুনতে শুনতে হেমন্তর কঠিন শুষ্ক চোখও জলে ভরে এসেছিল বলল, 'আহা, বাছা রে! দাদা জানে এসব কাণ্ড?'

'জানেন বৈকি! না বলে আর কত ঢেকে রাখব পিসীমা! জীবনে অনেক আঘাতই তো পেলেন, জীবনভোরই ভাগ্যের কাছে আঘাত খাচ্ছেন, একটা-দুটো বেশী-কমে কি এসে-যাবে?'

এর পর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল দু'জনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে বলল, 'শোন। তোকে চাকরির ঝুঁকি নিয়ে যেতে বলব না, এটা ঠিক। সে আমার কপালে যা-ই থাক। তবে এ-কথাও ভেবেছি, তোর ছুটির কথাও। আগে মনে পড়ে নি, একটা কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল ক'দিন আগে, এই তোকে চিঠি লিখব লিখব ভাবতে ভাবতেই। তোদের কলের যিনি বড়-কর্তা বা মালিক—চক্রবর্তী মশাইয়ের সঙ্গে আমাদের ওঁর, মানে ডাক্তারবাবুর, পূর্ণ ডাক্তার আর কি—খুব জানাশুনো ছিল। উনি একবার কি একটা সংকটাপন্ন অবস্থায় নাকি ভদ্রলোকের স্ত্রীকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়েছিলেন, দিন-রাত পাশে বসে থেকে, আহার-নিদ্রা জ্ঞান না রেখে। সেই থেকে

খুব ভাব, বন্ধুত্বের মতো। মানে উনি পূর্ণবাবুকে খুব ভক্তি করতেন, দেবতার মতো দেখতেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গেও জানাশুনো; আমার এখানে এসেছেনও ক'বার। তাছাড়া ওঁর—মানে ডাক্তারবাবুর ভারী অসুখের সময় অনেকবার এসেছেন—আমি তো পাশেই বসে থাকতুম—আমার সঙ্গেও খুব জানাশুনো হৃদ্যতা হয়ে গিছল। অনেকবার বলেছেন, আপনি যা করলেন, যা করছেন তার জন্যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। ডাক্তারবাবু ভাল হয়ে উঠুন—একবার আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের ওখানে—নদীর ওপর বাড়ি, দু'দিন বিশ্রাম করবেন।···সে অবশ্য আর যাওয়া হয় নি, তবে আমার তো মনে হয় আমাকে ভোলেন নি একেবারে।···আমি এই সব ভেবেই একখানা চিঠি লিখে রেখেছি তাঁর নামে। চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তুই তাঁর হাতে দিস, যদি সামনে পর্যন্ত পেঁছিতে না পারিস তো কাউকে দিয়ে পাঠাস, নয় তো ওখান থেকেই রেজেস্ট্রি ক'রে ডাকে দিস। তাতে তোর নাম-ধাম সব দিয়ে দিয়েছি, দরকার হলে নিজেই খুঁজে বার করবেন। আমার তো মনে হয় এ চিঠি চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে পেঁছিলে তোর ছুটির অভাব হবে না, চাই কি চাকরিতেও কিছু উন্নতি হতে পারে। আমার নিজের ভাইপো, আমার ওপর অভিমান ক'রে ওখানে ঐ কাজ করছে, তা ছাড়া খুব আত্মমর্যাদা জ্ঞান, স্বাবলম্বী—সেই জন্যেই আরও, কিন্তু এ আয়ে সংসার করা সম্ভব নয়, এইভাবেই লিখেছি।'

সুরেন খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল পিসীর মুখের দিকে। তারপর বললে, 'এসব আবার লিখতে গেলেন কেন? শুধু ছুটির কথা লিখলেই হত। কি মনে করবেন, ভাববেন হয়ত আমিই লিখিয়েছি!'

'তাতে কি তোর মাথা কাটা যাবে?' হেমন্ত এবার ঝেঁঝে ওঠে, 'আ গেল যা! আমি যে তোর পিসী। লোকে চাকরির জন্যে কত লোকের সুপারিশ ধরে—পিসীকে ধরলেই যত দোষ!'

'না, তা নয়'—অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুরেন, বলে, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে বড়বাবুটি খাপ্পা হয়ে থাকবেন—শত্রুতা করবেন বাগে পেলেই। বার বার তো অত বড় লোকের কাছে যেতে পারব না।'

হেমন্ত শুধু বলে, 'দ্যাখোই না কি হয়! আমার তো মনে হয় খুব সুবিধে করতে পারবে না কেউ আর।···ভাবছিস বুড়ি নিজেকে মস্ত লাট-বেলাট ভাবে, তা এর আগে তো এমন কথা বলি নি আর কখনও—জাঁক করা স্বভাব এমন তো বলতে পারবি না!'

তারপর, চোখে ওর নিজস্ব বিশেষ কৌতুকের ভঙ্গী ক'রে বলে, 'আজ এই দেখছিস পিসীকে অসহায়, একা—একা চিরদিনই অবিশ্যি—তবু একদিন এই ক'খানা হাড়েই ভেল্‌কি খেলেছে। আজ কি আর সে ক্ষ্যামতার কিছুই নেই?'

আর কিছু বলে না সুরেন।

ঝুঁকি যতই হোক এই অসহায় বৃদ্ধাকে এভাবে ত্যাগ করতে পারবে না সে।

॥ ২৯ ॥

অনেক বেছে অনেক ঘুরে অনেক হেঁটে—সুরেনই এই বাড়িটা পছন্দ করল। মানসরোবরের ঘাটের কাছে, অভয়াচরণ তর্কচূড়ামণির বাড়ি। একেবারে গঙ্গার ওপর নয়, বাঙালীটোলার যেটা বড় রাস্তা, যা কালীতলা থেকে কেদারঘাট পর্যন্ত সোজা চলে গেছে তারই ওপর। তবু গঙ্গা দেখা যায়। ওপরে তিনতলা থেকে তো কথাই নেই, মনে হয় গঙ্গার ওপরই আছি। এদিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ থেকে ওদিকে রামনগর পর্যন্ত দেখা যায়। শুধু ডানহাতি কোণাকুনি একটা বড় বাড়ি থাকায় কাশীনরেশের প্রাসাদটা পুরো চোখে পড়ে না।

দুমহল ঠিক নয়—দুভাগে ভাগ করা বাড়ি। একটাতে তর্কচূড়ামণি নিজে থাকেন, আর একটা ভাড়া দেন। তারই তিনতলা পুরোটা ভাড়া নিল সুরেন। একখানা দেড়খানা ঘরে হয়ত কোনমতে থাকতে পারে হেমন্ত, কিন্তু পাশাপাশি অন্য ভাড়াটে থাকলে বনিয়ে থাকা মুশকিল। তাছাড়া একা নিজস্ব বাড়িতে এতকাল থেকে এসে, এখন পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে বাস করাও সম্ভব নয়। এ গুনতিতে তিনখানা, আসলে আড়াইখানা ঘর। ভাড়াও সে অনুপাতে একটু বেশি। তর্কচূড়ামণি ষোল টাকার এক পয়সা কম নিতেও রাজী হলেন না কিছুতেই। তাও ব্রাহ্মণ বলেই এতটা 'কনসেশন' করছেন তিনি—বার বার শুনিয়ে দিলেন। (ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে দেবেন না সে কথা তো আগেই শুনিয়ে দিয়েছেন—তবে আর কনসেশনের কথাটা উঠছে কেন? তবে সে কথা বলে লাভ নেই বুঝেই সুরেন চুপ ক'রে গেল।)

সুরেন এতদিনে মোটামুটি পিসীর মেজাজ ও রুচি বুঝে নিয়েছে। বাড়ি দেখে আর তাঁকে চিঠি লিখে মত আনাবার জন্যে অপেক্ষা করল না, একেবারেই এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ভাড়া পাকা ক'রে নিল, যদিচ মত আনাবার মতো সময় ছিল হাতে।

সত্যিই পিসীর চিঠিতে আশ্চর্য ফল হয়েছে। এতটা যে হবে তা সুদূর কল্পনাতেও কখনও ভাবে নি সুরেন। নিজে পেঁছিতে পারে নি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে, চাপরাশীকে দিয়েই চিঠিটা পাঠাতে হয়েছিল বটে—কিন্তু চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং, অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যে সম্মান দেন না, ওকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিসীর খবর নিয়েছিলেন। হঠাৎ এভাবে সংসার গুটিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন—কারণটা জিজ্ঞাসা করাতে সব খুলে বলতেও হয়েছিল—শুনে খুব দুঃখ প্রকাশও করেছেন। অতঃপর নিজে ওকে দিয়ে তখনই দরখাস্ত লিখিয়ে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর ক'রে বার বার বলে দিয়েছেন যে, দরকার হলে স্বচ্ছন্দে আরও দু'চার দিন দেরি করতে পারে। পিসীকে ভালভাবে থিতু না ক'রে যেন আসে না।

তারপর সুরেনের খবর নিয়েছেন।—কোন ডিপার্টমেণ্ট, কী কাজ করে। শুনে বলেছেন, 'ও, বগলাবাবুর সেকশ্যন? এই রে, মানুষটি ভাল নয়—বেগ দেবে

তোমাকে।···ঠিক আছে, আমি অর্ডার লিখে দিচ্ছি, ফিরে এসে তুমি আমার খাস আপিসে কাজ করবে, তোমাকে অন্য কোন সেকশ্যনে যেতে হবে না। মাইনেও বেড়ে যাবে অটোমেটিক্যালি !'

তারপর একটু থেমে বলেছেন, 'তোমার হাতের লেখা তো ভালই। কথাবার্তা কয়ে মনে হচ্ছে কিছু লেখাপড়াও করেছ। যদি কাজ চলে, মনে হচ্ছে চলবে—তাহলে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজটা তোমাকে দিতে পারি। এখন যিনি আছেন তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, কেবলই কামাই করেন—বড় অসুবিধে হয়। তাঁকে অন্য একটা কাজে বসিয়ে তোমাকে নিয়ে নোব। হাউ এভার, তার আগে আমার আপিসে তো কাজ করো কিছুদিন, কাজটা বুঝে শিখে নাও, তারপর দেখা যাবে। নইলে ঠিক পেরেও উঠবে না।'

এ সবই সদয়, সহৃদয় কথা। অন্তরঙ্গতার সুর। আত্মীয়ের মতো, অভিভাবকের মতো ব্যবহার। সাধারণ নিচুদরের কেরাণীর কাছে সুদুর্লভ সৌভাগ্য। এও একরকম পিসীর কাছেই উপকৃত হওয়া। তবে সেটা তত গায়ে লাগল না—তার বদলে সেও কিছুটা কাজে আসতে পারল বলে।···

হেমন্তও বাড়ি দেখে খুশী হল। বললে, 'এই জন্যেই তোকে পাঠিয়েছিলুম। এমন মনের মতোটি আর কেউ বেছে নিতে পারত না। সবদিক দিয়েই সুবিধে হল। কাছেই তো দেখছি বাজার বসে, আনাজ বেচতেও যায় মাথায় ক'রে। আমার তো আর মাছের চিন্তা নেই, বাজার যেতে হবে না। সামনে গঙ্গা, কাছেই কেদার। এক বিশ্বনাথ একটু দূরে পড়লেন—তা হোক, পালে-পাব্বনে এইটুকু হেঁটে যেতে পারব অনায়াসে। গলি দিয়ে গলি দিয়ে যাওয়া—রোদ্দুরের ভয় নেই। এই বেশ হয়েছে।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তা সবই তো ভাল, এমন খাসা তোর পছন্দ, বুদ্ধি-বিবেচনা সবই তো ভাল,—এইবার নিজে দেখে একটি বিয়ে কর। যা হোক, মাইনেও তো বাড়ল কিছু !'

'যা হোক নয় পিসীমা, আমার হক্কে পনেরো টাকা মাইনে বাড়া—এ তো আশার অতীত ঐশ্বর্য। কিন্তু তেমনি ধীরুরটা একেবারে বাদ চলে গেল যে ! খরচা ওদিকে বেড়েই যাচ্ছে। দাদার দু'তিনটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল। আয় তো আর বাড়ছে না। বাবার ঐ শরীরের অবস্থা—ডাক্তার-বদ্যির খরচ তো লেগেই আছে।···বাবা অবশ্য খরচ করতে দিতে চান না, কিন্তু আমরা দেখেশুনে চুপ ক'রে থাকি কি ক'রে ? তবু তো ছোটকার ভারটা বইতে হল না—নিভারা সে দায়টা তুলে নিলে পুরোপুরিই—আর শুনছি বেশীদিন তাদেরও বইতে হবে না। তবু খরচেরও তো অন্ত নেই।'

বলতে বলতেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল সুরেন। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তাছাড়া এখনকার মেয়ে, দেশে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকবে, সংসারে খাটবে, আমি মাসে একদিন যাব—এতে কেউ রাজী হবে না। দেখছি তো চারদিকেই। মহা অশান্তি হবে সে একটা। অথচ এই মাইনেতে যদি বৌ নিয়ে কর্মস্থলে বাস করতে হয়—এক পয়সাও পাঠাতে পারব না।···না পিসীমা, ও আশা ত্যাগই করুন। দাদার ছেলে হয়েছে, বংশরক্ষের জন্যে ভাবতে হবে না।···আর, আমার ঠিক ইচ্ছেও আর নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল দু'জনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ রে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব—? ইচ্ছে নেই কেন, সে কি বৌমার জন্যে ?'

'তীর্থস্থানে বসে, তায় আপনি গুরুজন সামনে—মিথ্যে কথা বলব না, সেদিকে যে মনটা একটু না টলেছিল তা নয়, দিনকতক খুবই কষ্ট হয়েছিল, তারও জীবনটা হয়ত আমার জন্যেই নষ্ট হয়ে গেল, সে ভেবেও কতকটা—তবে সে ভাবটা এখন কেটে গেছে, সত্যিই বলছি। কখনও-সখনও তাকে মনে পড়ে যে বুকের মধ্যেটায় একটু কেমন ক'রে ওঠে না তা নয়—তবে সে কদাচিৎ। তাছাড়া এটুকু বুঝে নিয়েছি, এদের বাইরেটা যার যতই চকচকে হোক—ভেতরটা ভাল নয়। খুব কম পুরুষের জীবনেই শান্তি আনতে পারে এরা।'

খানিকটা তেমনি স্থির হয়ে বসে থেকে হেমন্ত বলে, 'তোর দিকে ওর মনটা ঝুঁকেছিল ঠিকই, সে ঝোঁকটা এখনও বোধহয় যায় নি। আরও সেই জন্যেই হয়ত বরকে মনে ধরে না।...তোরা যাকে প্রেম বলিস, নবেলে নাটকে যা লেখে—সে প্রেমটা তোর দিকেই। নইলে ষোড়শীবাবু-টাবু—'

বলতে গিয়েও যেন হঠাৎ চুপ ক'রে যায় হেমন্ত।

সুরেন মুখ তুলে চায় না, কিন্তু তার নত দৃষ্টিটা ভ্রূকুটিবদ্ধ হয় একটু। হেমন্ত সেটা লক্ষ্য করে।

সুরেন বলে, 'ষোড়শীবাবু—কি হয়েছে—?'

এধরনের কৌতূহল সুরেনের স্বভাববিরুদ্ধ। কোনরকম নোংরা কথার ধারে-কাছেও যেতে চায় না সে। তাই হেমন্ত একটু অবাকই হল ওর প্রশ্নে। বলল, 'ও, তুইও সন্দেহ করেছিলি তাহলে ! তবে ওটা আমি ভেবে দেখেছি, এমন কিছু দুষ্য ব্যাপার নয়। ষোড়শীবাবুর টান স্বাভাবিক, সেটা বৌমার মন্দ লাগত না এই জন্যে যে, এতবড় একটা লোক, ধনী, আশ্রয়দাতা—সময়ে অসময়ে এটা-ওটা শখের জিনিস যোগায়—সে ওর জন্যে উৎসুক, ওর কৃপার প্রার্থী—এইটেই ভাল লাগত আর কি ! তার বেশী কিছু নয়। পুজো কে না চায় বল ! না চাইলেও অযাচিত পেলে তো আরও খুশী হয়।...তবে ওর আসল টানটা তোর দিকেই—'

আস্তে আস্তে সুরেন বলে, 'ওকথাটা থাক পিসীমা।...বৌদি বলি, গুরুজন সম্পর্কে এসব আলোচনা না করাই ভাল। লাভও তো কিছু নেই।'

'তা ঠিক।' সায় দেয় হেমন্ত, 'তবে আঘাতটা সেও সামলাতে পারে নি। মেজাজ তো খিটখিটে হয়েছেই—শরীরটাও ভাঙছে। হয়ত খুব একটা মজবুত ছিল না কোনদিনই, তবু—!...যাক গে। সত্যিই, এসব কথা তোর না শোনাই ভাল।'

দারোয়ানকে আগেই মোটা বকশিশ দিয়ে বিদেয় করেছিল, দিন আষ্টেক দেখে সুরেনকেও ছেড়ে দিল, হাতে পাঁচ-ছ'দিন ছুটি থাকতেই। বলল যে, 'থাকতে তো পাস না। দেশেই দু'টো দিন কাটিয়ে যা বরং—'

সুরেন বলে, 'তাই যাব। তবে ইচ্ছে আছে একদিন দু'দিন আগেই জয়েন করব। দরকারের বেশি থাকি নি, এটা প্রমাণ করা ভাল। তারপর—নতুন সেকশ্যান, নতুন কাজ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চোখের সামনে—বুঝে নিতেও দেরি হবে। তবে, হাতের

লেখা দেখে আর দরখাস্তে ভুল হয় নি দেখে—উনি যেন একটু অবাক হয়েই গেলেন। বললেন, আগে জানলে এমনিতেই তোমাকে আমার আপিসে টেনে নিতুম।'

সুরেন চলে যেতে আবারও সেই একা। সেই বিরাট শূন্যতা।।

তবে কলকাতার নিজস্ব বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোয় একা ঘুরে বেড়াতে যেমন হঠাৎ এক-একসময় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করত, এ তেমন নয়। একটা পুরো তলা ঠিকই, তবে বলতে গেলে দু'খানাই মাত্র ঘর, ঘর বলতে যা বোঝায়। আর একটা যা, ছোট্ট এক ফালি অন্ধকার ঘর, তাতে ভাঁড়ার রাখা ছাড়া কিছু করা যায় না—আর একটা রান্নার জায়গা। তাও এর মধ্যে একটা ঘরই যা একটু বড়, তাতেই ওর শোওয়া বসা, ঠাকুর পুজো চলে যায়। একটা ক্যানেস্তারা তাক আছে, তার সঙ্গেই জলচৌকী পেতে, পুজোর উপকরণ গঙ্গাজল, ঠাকুরের পট, গুরুর ছবি সব সাজিয়ে নিয়েছে।

পাশের ঘরটা খালিই পড়ে থাকে, বাড়তি ঘর। যদিই কেউ কোনদিন আসে-টাসে—থাকবে। এই 'কেউ'টা যে কে—তা নিজেকেই প্রশ্ন করতে সাহস হয় না যেন। সে কি সুরেন? নিভা? না মণিকারাই?···কার আসার আশা করছে সে তা নিজেও জানে না। শুধু 'কেউ হয়ত আসবে'—এই অনিশ্চিত অস্পষ্ট একটা ঘটনার ওপর ভরসা ক'রে বর্তমানের নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে চায় হয়ত।···

কলকাতার মতো নিঃসঙ্গ নয়—এই একটা মস্ত সুবিধে।

সেখানে আশপাশের কোন বাড়িতে হেমন্ত যেত না, তারাও আসত না। এখানেও সে বড়-একটা কোথাও যায় না, তবে অপরে আসে। পাশেই বাড়িওলারা থাকেন, এ মহল ও মহলের মধ্যে একটা দরজার মাত্র ব্যবধান, তর্কচূড়ামণির মা বা স্ত্রী দোর ঠেলে খুলিয়ে সময়ে সময়ে আলাপ করতে আসেন।

নিচে এক 'কায়েৎ-গিন্নি' আছেন, ছেলে-বৌদের সঙ্গে বনে না বলে একা পড়ে থাকেন, তিনিও আসেন মধ্যে মধ্যে। একই মুখে ছেলেদের মহিমা কীর্তন এবং অবিবেচনার নিন্দে করেন বসে বসে। সবাই বড় বড় চাকরি করে, করত। বিশেষ যে দু'টি মারা গেছে তাদের তো তুলনাই নেই, রাজা ছেলে। যারা বেঁচে আছে তারাও নিহাৎ কেউকেটা নয়। আবার তারা আসে না খোঁজ নেয় না, হারামজাদী ছোটলোকের বেটি বৌয়েরা গুণতুক করেছে—এখানে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত, এখন উনি মলেই বাঁচে সবাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি এও বলেন।

এছাড়া এ মহল ও মহলের নিচেতলায় অন্ধকার খোপে খোপে অনেক ভাড়াটে। তার মধ্যে স্বামী-পুত্রহীনা পরদয়া-নির্ভর বিধবা বুড়িও আছে, আবার সামান্য কাজ করে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঐরকম একটা অন্ধকার ঘরে কাটায়—এমন লোকও আছে। কেউ বাতাসার কারিগর, কেউ বা মুদীর দোকানে মাল ওজন করে। একজন সন্দেশ রসগোল্লা তৈরী করে কালীতলার মোড়ে কৃত্তিবাসের দোকানে। সামান্য আয়ে অনেকগুলি পেট চালাতে হয়—এই মাসিক আটআনা একটাকা ভাড়ার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই। এও দিতে পারে না বেশির ভাগই—বাড়িওলাও তার জন্যে জুলুম করেন না। আশেপাশে নাকি চার আনা ভাড়ার ঘরও আছে—তবে সে ঘরে থাকলে ছেলেপুলে মরে যাবে এই

ভয়েই যায় না কেউ। বুড়িদের মার্কণ্ডেয়র পরমায়ু, তারা থাকতে পারে।

এরা, এইসব ভাড়াটেরা, নিজেদের গরজে ওপরে উঠে এসে আলাপ করে, ঘন-ঘন কারণে অকারণে প্রণাম করে। কেন না প্রয়োজনে চারআনা আটআনা ধার করতে হয় প্রায়ই। আগে আগে সুদের কথা জিজ্ঞেস করত, বাটি-গেলাস হাতে ক'রে আসত বাঁধা রাখতে—এখন ধমক খেয়ে সেকথা আর তোলে না। তাতেই ভক্তি আরও বেড়ে গেছে। দায়ে অদায়ে এক-আধপলা তেল, দু'খানা তেজপাতা কি দু'টো আলু—এসব তো আছেই। তবে এ আর ফেরৎ নেয় না হেমন্ত। পয়সাটা নেয়। নইলে জানে যে, এ চাহিদা বেড়েই যাবে। শুধু তাই নয়—একেবারের দেনা শোধ না দিলে পরে আর দেয় না, হাঁকিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত এখানেও একটা বাড়ি কিনে ফেলে। পরে আরও।

সস্তায় বাড়ি চলে যাচ্ছে দেখলে—বিশেষ যদি পরে তার বেশী দাম ওঠার সম্ভাবনা থাকে—লোভ সামলাতে পারে না। পূর্ণবাবু বলতেন, চড়ুকে পিঠ—সুড়-সুড় ক'রে ওঠে, চড়ক-সন্নিসীদের মার খাওয়ার নেশার মতো।

কথাটা ঠিকই—হেমন্ত এখন দেখে। প্রথম বাড়ি কেনার পর দায়ে পড়ে মিস্ত্রী খুঁজে বার করে। দাঁড়িয়ে থেকে তদারক ক'রে মেরামতও করায়। সেই সঙ্গে একটু-আধটু পরিবর্তন। ফলে সহজেই বিক্রী হয়ে যায়, লাভও পায় শ'সাতেক টাকার মতো।

তবে এখানে এরকম বাড়ি কম, দেখেশুনে সাবধানেই কিনতে হয়। কখনও বিস্তর কাণ্ড ক'রেও মেহনতই সার হয়, সর্বসাকুল্যে একশটা টাকা হয়ত ওঠে। কি আর একটু বেশী। ছোটাছুটির মজুরী পোষায় না। লোকসান হতে দেয় না অবশ্য। কেনার সময় দেখেশুনে হিসেব ক'রেই কেনে। রাস্তাটাই এখানে বড় প্রশ্ন, বড় রাস্তা থেকে কতদূর—এইটেই সর্বাগ্রে দেখতে হয়—আর মেরামত করলে কিছু বদল করলে লোভনীয় মনে হবে কিনা!···

বাড়ি কেনে অবশ্য বেচবার জন্যেই—নিজে এখান থেকে নড়ে না। ঘরে বসে গঙ্গা দেখা—এ ওর বহুদিনের শখ। সুবিধেও অনেক। কেদারনাথ, বাজার সব কাছে। ইচ্ছে হলে নিত্য স্নান করাও যায়। যদিচ তা সে করে না। বিশেষ বর্ষাকালে—কাদা ঘোলা জল, যত রাজ্যের নোংরা ধুয়ে আসা—স্নান করতে প্রবৃত্তি হয় না তাতে।···এখান থেকে আরও যেতে চায় না দু'টো কারণে। সুরেন সযত্নে সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে, যেখানে যা দরকার—এই তক্তপোশখানা কিনে এনে নিজে বিছানাটি পর্যন্ত পেতে দিয়ে গেছে পরিপাটি ক'রে—মনে হয় তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্পর্শ আছে এ ঘরের সর্বত্র। এখান থেকে গেলে সেটা হারিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণ—দু'বাড়ির নিচের তলায়, আশেপাশে অনেকগুলি হতভাগা জুটেছে—কুপোষ্য—তারা যেন ওরই মুখ চেয়ে থাকে।

এত দীন এত দুঃখী যে মানুষ হয় তা এতকালের জীবনে কখনও জানে নি। কলকাতায় সীমাবদ্ধ জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয় নি।

এখানে সস্তাগণ্ডা ঠিকই—কিন্তু তাই বলে মাসিক দশ টাকা আয়ে যে সংসার চলে—চলতে পারে—তা তো আজও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বুড়ি যারা—তাদের কারও আয়

মাসে তিন, কারও বা চার। যার পাঁচটাকা মাসোহারা—সে নিজেকে এদের তুলনায় অবস্থাপন্ন মনে করে। সেই চালে চলে।

এদের জীবন দেখে আর নিজের জীবনের কথা ভেবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তারও কেউ নেই সত্যি কথা—তবু এরকম নিঃস্ব পরমুখাপেক্ষী তো করেন নি ভগবান। এদের মধ্যে অনেকেরই সন্তান হয়েছিল, হয়ত কারও কারও এখনও আছে—তবু এই অবস্থা। যাদের বেঁচে নেই তাদের তবু একটা সান্ত্বনা—কারও ভাইপো, কারও ভাগ্নীজামাই, কারও বা দূরসম্পর্কের নাতি এই টাকা পাঠায়—হয়ত এইটুকু পাঠাতেই তাদের কষ্ট হয়, হয়ত তাদের বৌরা গঞ্জনা দেয়—এ টাকাটা অসুবিধে ক'রে তাদের ছেলেমেয়ের পেট মেরে পাঠানো হচ্ছে বলে। খোঁজখবর তো কেউ নেয়ই না—সম্ভবত সেখানে বসে অসহিষ্ণুভাবে দিন গোনে—কবে এরা মরবে।

এদের অসুখ-বিসুখে কেউ দেখবার নেই, পাশের ঘরের প্রতিবেশী ছাড়া। তাদের নিজেদের শরীরেরই অপটু অবস্থা, তবু বাধ্য হয়েই—মরে-মরেও করে। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবও নেই তেমন, ফলে সে সেবার মধ্যে তিক্ততাও থাকে যথেষ্ট।

হেমন্ত এই ভারটাই নিজের হাতে তুলে নেয়।

কাউকে ডাকতে হয় না, এদের কারও অসুখ হয়েছে শুনলে নিজেই এগিয়ে যায়, প্রাণপণে সেবা করে, 'গুয়ে-মুতে করা' যাকে বলে তাই। তার জন্যে কোন কৃতজ্ঞতাও আশা করে না, ও জিনিসটা আশা করতে সে ভুলেই গেছে বহুকাল। ওর প্রাক্তন বৃত্তির কথাটা কিভাবে জানাজানি হয়ে গেছে, হেমন্ত নিজেই হয়ত বলেছে—সে ওসব ঢাকাঢাকি পছন্দ করে না—এত সেবা এবং সাহায্য করলেও বিধবারা ওর হাতে কেউ খেতে চায় না। ওরই মধ্যে, নিজেদের সুবিধামতো একটা শাস্ত্রও বার ক'রে নিয়েছে—সাবু-বার্লি পর্যন্ত নাকি ওর হাতে চলে, এমন কি লুচি-হালুয়াও, 'আতুরে নিয়মো নাস্তি'—তবে সে বাক্যের দোহাই দিয়েও ভাত খাওয়া নাকি চলে না। ভাতেই সমস্ত জাতধর্ম বাঁধা তাদের।

তা হোক, তার জন্যে কোন দুঃখ কি অভিমান নেই হেমন্তর। বরং সে হাসিমুখেই নিরিমিষ ঝোল বা সুক্তোটা রান্না ক'রে দিয়ে যায়—পাশের ঘরের কেউ ভাতটা রাঁধে।

দুঃখ হয়েছিল অন্য কারণে। প্রথম প্রথম খুবই আঘাত পেয়েছিল, ক্রমে সেটাও সয়ে গেল।

যারা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে—প্রায়-অনাহারশীর্ণ তাদের ছেলেমেয়েদের অসুখ লেগেই থাকে, সেজন্যে—ঔষধপথ্যের প্রয়োজনে—ওর কাছেই ছুটে আসে। সে দেনাও নয়, দানই। হেমন্ত ইচ্ছে ক'রেই দেয়, বলে এ আর শোধ দিতে হবে না। কিন্তু তারাই, যখন হেমন্ত ছুটে যায় সেই সব রুগ্ন ছেলেমেয়েদের সেবা করতে—তখন বিরক্ত হয়। আগে সেটা বুঝতে পারত না। কেমন একটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব, নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, বিরসকণ্ঠে বলে, 'থাক থাক, আপনি আর কেন এসব—আমরাই তো আছি—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' সেবা-বিদ্যা যে শিখেছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান যার অধিগত—তার পক্ষে চোখের সামনে অনাচার অনিয়ম হতে দেখলে চুপ ক'রে দেখা শক্ত বলেই, আগে আগে ওদের ধমক দিয়ে জোর ক'রেই সেবা করত, কিন্তু পরে ওদের অনিচ্ছার কারণটা জেনে নিরস্ত হল।

ওর ঝি-ই প্রথম বলল ওকে। এখানে এসে সারাদিনের লোকই রেখেছে। বামুনের মেয়েই একটি—দরকার হলে যাতে রান্নাও করতে পারে। তবে ঘরমোছা বাসন-মাজা সব কাজই করে—শরীর খারাপ না হলে রান্নাটা হেমন্ত নিজেই ক'রে নেয়। সেই ঝি-ই বললে একদিন, 'আপনি কেন মিছিমিছি ভূতের বেগার দিতে যান মা, ওরা সব যা-তা বলে। যাদের জন্যে এত করেন তারাই যখন তার মম্ম বোঝে না, তখন কী দরকার আপনার জোর ক'রে যাওয়ার ?'

'যা-তা বলে! কী বলে রে ?' প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু কি বলে নিজের মধ্যেই যেন তার একটা আভাস পায়, ওর উত্তর পাবার আগেই।

'সে আমি বলতে পারব না মা আপনাকে।'

অনেক পীড়াপীড়িতেও বলল না সে।

শেষে একদিন নিজেই শুনল হেমন্ত, নিচের যে ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগছিল, তার মা বলছে, 'বুড়ী ডাইনী, নিজের সাতকুল খেয়ে বসে আছে, এখন আমার বাছার ওপর নজর পড়েছে।...এ এক হয়েছে জ্বালা। এ বাড়ি ছাড়তে না পারলে একটাকেও রাখতে পারব না!'

সেই দিনটাতেই খুব মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিল, বহুদিনের জ্বলে-যাওয়া চোখে আবারও নেমেছিল জলের ধারা—তবে সে সাময়িক। বিধাতার নিষ্করুণ পাঠশালায় সব আঘাত সামলে নেবারই শিক্ষা হয়েছে তার, সেই সঙ্গে অপরের দিকটাও দেখতে শিখেছে। কী বা ওদের শিক্ষা, ওদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী বিবেচনা আশা করাই তো নির্বুদ্ধিতা। আবারও সেই কালীয় নাগের কথাই মনে পড়ে—'ভগবান, তুমি আমাকে বিষই দিয়েছ, বিষ ছাড়া আর কি আশা করো আমার কাছ থেকে ?'

তবে ক্ষমা করলেও—ওদের সাহায্য-দানে বিরত না হলেও—নিজে সেধে গিয়ে আর সেবা করতে বসে না। অন্তত ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখে নয়।

এক-একবার মনে হয়—ঈশ্বর এইসব প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে তার সংসারের প্রবল নেশা কাটিয়ে দিচ্ছেন, তার মনকে—বিরূপতা কাটিয়ে নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার পর বিশেষ ক'রে—মনে মনে একটা ধারণা হয় যে, এতদিন পরে সে নেশা কেটেই গেছে। কিন্তু ভগবান আবারও বুঝি হাসেন। কঠিন কৌতুকের হাসি। আরও আকর্ষণ আরও আঘাত দেবার জন্যে তৈরী হন।

॥ ৩০ ॥

আর যা-ই হোক—এ খবর, এ পরিস্থিতির জন্যে হেমন্ত প্রস্তুত ছিল না। এখানে এসে পর্যন্ত সে নিমাইদের কোন খোঁজ নেয় নি, চিঠি লেখে নি। চিঠি নিমাই-ই লিখত মধ্যে মধ্যে, তার কোন জবাব যেত না। শুধু পুজোর সময় যখন মণিকা চিঠি লিখত—ইদানীং বড় ছেলে গোবিন্দও আঁকাবাঁকা হরফে প্রণাম জানাচ্ছে, তখন ওদেরই আশীর্বাদ জানাত, গোনা দু'টি ছত্র। তার মধ্যে নিজেরও কোন সংবাদ থাকত না, নিমাইয়ের সম্বন্ধেও কোন কুশল-প্রশ্ন না। নিমাই যে আছে—তেমন কোন আভাস পর্যন্ত যেত না হেমন্তর সেই আশীর্বাদী চিঠিতে।

তবু নিমাই মধ্যে মধ্যেই চিঠি লিখত। পোস্টকার্ডে—বানান ভুলে ভর্তি, অর্ধেক অক্ষর ও শব্দ ছাড়—প্রায় অপাঠ্য হাতের লেখায়। একেবারে না পড়ে ফেলে দিত না হেমন্ত—একবার চোখ বুলিয়ে উনুনের পাশে ঘুঁটে রাখবার খাঁজে ঢুকিয়ে রেখে দিত, পরের দিন উনুন ধরাবার প্রয়োজনে লাগবে বলে।

এবারে চিঠি এলো খামে। হাতের লেখাটা দেখে বুঝল নিমাইয়ের চিঠি। কিন্তু খামে কেন? এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও তো খামে চিঠি দেয় নি নিমাই। খোলবার আগেই অমঙ্গলের আশঙ্কা মনে এল।

আবার পরক্ষণেই মনে হল—হয়ত সংসার চালাতে পারছে না, তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে আবারও নতুন ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হল একবার। তা যদি হয়—ভবিষ্যতে আর কোন চিঠি পড়বেও না—দেখামাত্র ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু চিঠি পড়ে দেখল আশঙ্কাই সত্য। তবে আর যা-ই হোক—এই দুঃসংবাদের কথাটা ভাবে নি সে। একেবারেই অভাবনীয়।

মণিকা মারা গেছে।

মাত্র সাত-আট দিনের জ্বর। প্রথম দু'দিন ডাক্তার দেখানো হয় নি, সর্দি জ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জা ভেবেছিল সবাই। তারপর রকম-সকম ভাল নয় দেখে নিমাই পাড়ার চারুবাবু হোমিওপ্যাথকে ডেকে আনে। তিনি দিন-দুই দেখে রুগী ছেড়ে দেন। তখন পাড়ার ননী ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। দু' টাকা ফীয়ের ভাল পাসকরা ডাক্তার। কিন্তু আসলে তিনি রোগ ধরতে পারেন নি। তিনি ম্যালেরিয়া ভেবে চিকিৎসা করে-ছিলেন, কুইনাইন ইঞ্জেকশ্যনও দেন। নাকি তাতেই রোগটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ভয় পেয়ে—বাড়িওলার পরামর্শে আট টাকা ফীয়ের এক ডাক্তারকে ডাকে নিমাই, তিনি এসেই নাক সিঁটকেছেন, বলেছেন—'এ তো রুগী শেষ ক'রে আমাকে ডাকা হয়েছে। হয়েছে। টাইফয়েড—তার ওপর গাদাখানেক কুইনাইন খাওয়ানো হয়েছে, ইঞ্জেকশ্যনও পড়েছে। এখন আর চিকিৎসার এলাকায় নেই—এখন বাঁচাতে পারেন এক ভগবান।' তবুও তিনি ওষুধ দিয়েছেন কিছু কিছু—নিরাশার আশা হিসেবে—কিন্তু কোন ফলই হয় নি। কোন ওষুধেই কোন ফল হয় নি। হার্ট নাকি খারাপ ছিল, দিন-দুই পরেই সব শেষ হয়ে গেছে।

সংবাদ শেষ ক'রে নিমাই লিখছে ঃ—

'কি বলব জ্যাঠাইমা, অমন দাবদলনী যুবতী ভার্জা আমার, যেন তৈলহীন পিদীপের মতো দেখিতে দেখিতে নির্ভিয়া গেল। কোন প্রেকার নাড়াচাড়া করা গেল না, সেবাযত্ন হইল না। আমি আমার খমতা মতো যতটা পারিয়াছি ঔষধপত্যের কোন ট্রুটি করি নাই। ডাক্তারও তো তিনজনকে দেখাইলাম। তথাপি যে এত সত্তর তিনি চলিয়া যাইবেন তাহা কে বুঝিয়াছিল?—কাহাকেও খবর দেওয়া গেল না, উঁহার বাপের বাড়িতেও একটা খবর পাঠানো হয় নাই। মিত্যুকালে মা বাবা এমন কি আপন মায়ের অধিক আপনাকে পজ্জন্ত দেখিতে পাইল না—এই আমার সবচেয়ে বড় আফ্‌সোস। আপন মা তো ছাই, জম্মে এক নাইন পত্তর দিয়া উদ্দীশ লইত না, এক পয়সার বাতাসা লইয়াও কোনদিন কেহ

আসে নাই। ইদানীং আপনার মর্ম্ম আমার পরিবার খুব বুঝিয়াছিল, কেবল বলিত, চলো একবার মার পায়ে গিয়া সকলে আছড়াইয়া পড়ি, তা আপনার অপ্রিতীভাজন হওয়ার ভয়েই সে সাহস করি নাই।

'কী বলিব জ্যাঠাইমা, বোধহয় সেই মনানলে দগ্ধ হইয়াই বৌটা আমার এমনভাবে মরিয়া গেল। ডাক্তার বলিল, এ রুগীর বাঁচারও তেমন ইচ্ছা নাই। এ যেন মরিতেই চাহে। এ রুগীকে বাঁচানো ঔষধের কর্ম্ম নয়। আমার তো মনে হয়—আপনার সহিত যে অসদ-বেবহার করিয়াছিল তাহার ফলেই তার মনের এই আবস্তা। আপনি এখ্খনে যদি নিজ গুণে খমা না করেন তাহা হইলে সে বেচারী বোধহয় সগ্গে গিয়াও সুস্তির হইতে পারিবে না। আপনি দয়া করিয়া তাহাকে মাপ করুন, বাবা বিশ্বনাথকে জানান যাহাতে সে পরলোকে সুখ পায়!

'পরিশেষে নিবেদন এই যে, জ্যাঠাইমা, আমার মনে আর এক বিন্দু সুখ নাই। মন সব্বদাই হুহু করিতেছে। সংসার যেন বিষ মনে হইতেছে। কেবলই মনে হইতেছে ভগবান যদি বা মনের মতো বৌ দিলেন—তবে আবার কাড়িয়া লইলেন কেন? আমার পাপেই কি এমন হইল? তবে কি তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, আমি ছেলেপিলে লইয়া সুখে ঘর সংসার করি?…যাহা হউক, এখ্খনে আপনার কাছে একটি ভিখ্খা—আপনি অনুমতি করুন ছেলেমেয়ে তিনটাকে আপনার পাদপদ্মে ফেলিয়া দিয়া যেদিকে দু চখ্খু যায় চলিয়া যাই। সন্নিসী হওয়াই আমার কপালের লিখন, আপনার কি খমতা তাহা খণ্ডাইবেন? মিথ্যাই বিবাহ দিয়াছিলেন।

'যাহা হউক, সে ভুল শুদ্রোইবার এই সময়। আপনি সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। নিবেদন ইতি—অধম সেবক হতভাগ্গ নিমাইচরণ।'

চিঠি শেষ ক'রে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল হেমন্ত। আবেগ দুঃখ অনুশোচনা শোক এসব বহুকালের বিস্মৃত অনুভূতি ওর কাছে, অনেকদিনের ভুলে যাওয়া জিনিস। তবু আজ, এতকাল পরেও বুকের মধ্যে এ একটা কিসের তুফান! কিসের আলোড়ন! বুকের মধ্যেটা এমন ব্যথা-ব্যথা করছে কেন? মণিকা ভাল মেয়ে নয় তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি, তার সম্বন্ধে বিদ্বিষ্টই ছিল বরং—তবু সে যে এমনভাবে টপ্ ক'রে স্বামী-পুত্র-কন্যা ভরা সংসার রেখে মারা যাবে, তা কে ভেবেছিল! হতভাগী মেয়েটা—ঈশ্বরদত্ত অনুপম লাবণ্য নিয়ে এসেও জীবনে এতটুকু সুখ পেল না। না পেল মনের মতো বর—না পেল নিজের মতো ঘর। তার সংসারে প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু সুখ ছিল না—এটা হেমন্তও মানতে বাধ্য। যেখানে কোন নিজস্ব অধিকার নেই—প্রতি মুহূর্তে যেখানে পরের মন যুগিয়ে থাকতে হয়, সর্বদাই ভয় কখন কোন ব্যবহারে রেগে যাবে আর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—যেখানে হাজার ভোগে থাকলেও কেউই সুখে থাকে না। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা—এ অবস্থা বাড়ির পোষা কুকুরের চেয়েও খারাপ। কুকুরেরও একটা জোর থাকে—অধীন হলেও—এদের সেটুকুও নেই।

এ মণিকারই কপাল। আপন হতেও পারল না, নিমাইয়ের মতো সয়ে থাকতেও না। অথচ ঈশ্বর জানেন এই অপূর্ব রূপসী কিশোরী মেয়েটি যেদিন গাড়ি থেকে নেমে তারই

পাঠানো গোলাপী বেনারসী পরে দুধে-আলতায় দাঁড়িয়েছিল, সেদিন হেমন্ত সর্ব অন্তঃকরণ চেয়েছিল ওকে আপন করতে—আপন ক'রে নিতে। মন যেন সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, চেয়েছিল বুকে টেনে নিতে। ওর পাশে নিমাইকে দেখে হেমন্তই মনে মনে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিল, অনুতপ্ত হয়ে বার বার প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে স্নেহে ভালবাসায় এই অভাবটা এই খামতিটা পুরিয়ে দেবে সে। স্বামী না পাক মনের মতো, ওর সন্তানকে দিয়ে যাতে এ অভাববোধ দূর হয় —এ দুঃখ ঘোচে—সেই ব্যবস্থাই করবে, সেইভাবে মানুষ করবে, মানুষের মধ্যে একজন হয়ে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে যে।

মেয়েটাই পারল না। সম্ভব হতে দিল না এই স্বপ্ন। দুর্গ্রহই ওর স্বভাবকে চির-অসন্তুষ্ট ক'রে রাখল—নিজের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে দিল না। তবু বেঁচেও থাকত যদি। যাই হোক, যেভাবেই হোক নিজের মতো ক'রে ঘর-কন্না গুছিয়ে নিয়েছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে একরকমভাবে সংসার করছিল—হয়ত ক্রমে ওর এই অশান্তি অতৃপ্তিও কমে আসত একদিন। একদিন এই ছেলেমেয়েদের মধ্যেই তৃপ্তি আর শান্তি খুঁজে পেত। ভগবান সে সুযোগটুকুও দিলেন না ওকে!

নিমাই লিখেছে, 'সেই মনানলে দগ্ধ হইয়াই আমার বৌটা মরিয়া গেল।' সেই মনানল—মানে হেমন্ত সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে অনুতাপ। হেমন্ত এত নির্বোধ নয়—আর নিমাই নিজেও না ; সেও জানে হেমন্ত এ টোপ গিলবে না, এত বোকা নয় সে। তবু কোন কোন বোকা লোকও এক-একটা জায়গায় খুব চাতুরীর পরিচয় দেয়। নিমাইও এটা বেশ হিসেব ক'রেই লিখেছে। এই রকম শোকাবহ সংবাদে মনটা অবশ্যই একটু নরম হয়ে আসবে—আর সেই সুযোগে পুরোটা না বিশ্বাস করুক, খানিকটা হয়ত করতে পারে। আর তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে।

সে যাই হোক—এর মধ্যে মনানলটাই সত্যি। অতৃপ্তি আর অনুযোগ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর অভিমান কে জানে কেন কিছুতেই পারল না সহজ হতে, তিন-তিনটে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও স্বামীকে ভাগ্যকে মেনে নিতে—নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না কেন? বেচারী—কল্পিত ক্ষতির কথা ভেবে, কী পেতে পারত সেই চিন্তায় —যা পেয়েছে, হাতের মধ্যকার লাভ যেটা—সেটার দিকে ফিরে তাকাতে পারল না কোনদিন। না-পাওয়া সুখের নেশায়—হয়ত বা আশায়—করায়ত্ত সুখ দু' পায়ে দলে গেল চিরদিন।

অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল হেমন্তর। বহু যুগ, মনে হয় যেন জন্মান্তরের কথা, তবু মনে আছে।

কমলাক্ষ বলেছিল কথাটা, হয়ত বা সেই জন্যেই মনে আছে।

বলেছিল—বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর কপালে নিজের গালটা চেপে ধরে বলেছিল, 'তোমার মনটি ভারী রোমান্টিক—তোমার ঐ রকম ঘরে পড়া ভগবানের একটা প্রচণ্ড ঠাট্টাই বলতে পারো।'

কথাটা বোঝে নি হেমন্ত। মানে জিজ্ঞেসা করেছিল। এক কথায় কোন মানে কমলাক্ষও বোঝাতে পারে নি। বলেছিল, 'এমনি ভালবাসা, মানে রোমান্টিক ভালবাসা

যে চায় জীবনে—ঐ দ্যাখো, আবারও সেই শব্দটাতেই চলে এলুম। মানে কি জানো, শুধু ভালবাসার জন্যেই ভালবাসা, পার্থিব—এইসব সংসারের কথা ভুলে গিয়ে লাভ-লোকসান ইহকাল-পরকাল সব চিন্তা ছেড়ে নিজেদের স্বার্থের কথা না ভেবে মানুষ যে ভালবাসে আর ভালবাসা চায়, শুধুই সেই ভালবাসা—দৈহিক সম্পর্কটা যেখানে বড় কথা নয়, প্রতিদিনের জীবনের চিন্তা-ভাবনা যেখানে তুচ্ছ—এমন জীবন কাটাতে চায় একজনের সঙ্গে, যা পাচ্ছে কল্পনায় তার চেয়েও বেশী কিছুর স্বাদ উপভোগ করে—এমনি একটা রোমান্স, প্রেম, ভালবাসা—কী বলব—সে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না হিমু—তুমি যে ইংরিজী জানো না ছাই।'

ইংরেজী জানত না ঠিকই, মানে—অতটা জানত না, তবু বুঝেছিল।

আজ মণিকার কথা ভাবতে গিয়ে সেই কথাটাই মনে পড়ল। হয়ত এমনি একটা রোমাণ্টিক মনই ছিল, সে তার হাত নয়—ভগবানই তাকে তৈরী করেছিলেন ঐরকম ক'রে তাই নিমাইয়ের মতো স্বামী অত খারাপ লেগেছিল; তাই বিবাহিত কয়েক সন্তানের পিতা যোড়শীবাবুর সকাম ক্লেদাক্ত আকর্ষণও তত খারাপ লাগে নি, উদ্দেশ্য ভাল নয়, ভবিষ্যতে কোন আশা নেই জেনেও সে স্তুতি সে মুগ্ধতাকে অবহেলা করতে পারে নি। তাই সুরেনকে পুজো করতে গিয়েছিল মনে মনে, তৃষ্ণার্ত অন্তরে ছুটে গিয়েছিল একটি দরদী, সহানুভূতিশীল, ভদ্র—এবং হয়ত বা রোমাণ্টিকও—মনের দিকে। সেইজন্যেই ইহসংসারের কিছুতে তার মন ভরল না, এমন কি সন্তানেও না! সেই প্রেম, ভালবাসা—লেখাপড়া না জানলেও, এমন ক'রে গুছিয়ে ভাবতে না পারলেও—সেই রোমান্সের জন্যই মনটা উৎসুক পিপাসু হয়ে ছিল—আর বোধহয়, সে আশা রইল না, সে অমৃত বা সুধা পাবার—এই কথাটা যেদিন বুঝল সেই দিনই মনটা ভেঙে গেল, জীবন ভবিষ্যৎ সব বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল।...

আবারও ভগবানের সম্বন্ধেই অভিযোগ বা বিদ্বেষ ফেনিয়ে ওঠে—হেমন্তর মনে। যদি কেউ থাকেন এমন অস্তিত্বে, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা—তিনি ভারী নিষ্ঠুর, অকারণেই নির্মম। মানুষকে নিয়ে নিয়ত একটা অকারণ কৌতুকের খেলা তাঁর। হেমন্তকে তিনি সারাজীবন বঞ্চিত করেছেন এরকমভাবে—আবার এই মেয়েটাকে সব দিয়েও অন্যরকমে চিরবঞ্চিত করলেন।

হেমন্তর কিছুই রইল না—এর সামনে হাতের কাছে সম্ভোগের সমস্ত উপকরণ সাজানো থাকতেও তার মন ভরতে দিলেন না—চির বঞ্চিত রাখলেন।

কে জানে, এমন কত প্রাণ নিয়ে নিরন্তর এই হৃদয়হীন নিষ্করুণ খেলা খেলছেন তিনি!...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল—হেমন্ত সেইভাবেই স্থির হয়ে বসে রইল। চিঠিটা এসেছিল বেলা তিনটে নাগাদ। তখন থেকেই সেই একভাবে চিঠিটা কোলে নিয়ে বসে আছে সে, বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে পাথরের প্রতিমা। বুকে যে বিপুল ঝড় উঠেছে, মনের মধ্যে বহুদিনের স্মৃতি তার সহস্র দুঃখ সহস্র ব্যর্থতা, নিষ্ফলতার সেই সহস্র অনুভূতি নিয়ে রক্ততরঙ্গে তুফান তুলেছে—বাইরে তার লেশমাত্র

চিহ্ন ছিল না।

ধীরে ধীরে বাড়ির পিছন দিকটাতে, পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়লেন, ঘাটের ওপরের বাড়িগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ঘাটের ধারে বহুদূর পর্যন্ত গঙ্গার জলকেও ছায়ান্ধকার ক'রে তুলল। প্রমোদভ্রমণকারীদের নৌকোর সংখ্যা বাড়ছে একটি একটি ক'রে। ওপারে রামনগরের খরমুজের ক্ষেতে ঘূর্ণি বাতাস লেগে ছোট ছোট বালির স্তম্ভ উঠছে মধ্যে মধ্যে। পড়ন্ত রোদে সোনালী দেখাচ্ছে বালিগুলো। নিচে পথচারীদের ভিড় বাড়ছে —তাদের কথাবার্তার একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখানে বসেই। নিচের কায়েৎ-গিন্নী কাকে পাকড়াও করেছেন, তার কাছে সোৎসাহে নিজের বিগত জীবনের ঐশ্বর্য-সমারোহের বর্ণনা করছেন—তার একটা একটা শব্দ বা বাক্য মধ্যে মধ্যে বেশ সরব হয়ে উঠছে ঃ 'বললে বিশ্বেস করবে না ভাই। আমার জ্যাঠামশাই হুকুম করলে তাবড় তাবড় সায়েবদের সুমুখে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

সবই শুনছে, সবই দেখছে—কিন্তু কোনটাই ঠিক তাকে যেন স্পর্শ করছে না। এসবের কোন কিছুই তাকে আজ উত্তেজিত সক্রিয় ক'রে তুলতে পারছে না। এ যেন কী এক জড়তায় পেয়ে বসেছে তাকে—তার স্বভাব-বিরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায়। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না তার, হাতটা পা-টা নাড়তেও না।

শোক ?

দুঃখ ?

অনুতাপ ?

কিছুই না। নিজের ব্যর্থ নিষ্ফল জীবন দিয়ে আর একটা হতভাগ্য পীড়িত সর্ব-বঞ্চিত জীবনের হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে শুধু, নিজে নিজেই কান পেতে শুনছে নিজের বুকের বিক্ষুব্ধ স্পন্দন। আর কিছু নয়।...

অবশেষে ঝিয়ের ডাকে সম্বিত ফিরল হেমন্তর। সে বেচারী ভয় পেয়ে গেছে। এমন তো কখনও হয় না, কোনদিন তো দেখে নি এভাবে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে। ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই—। তবে কি ও চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ আছে ? কারও মৃত্যু-সংবাদ ? কিন্তু তাহলে তো ডাক ছেড়ে না কাঁদুক চোখ দিয়ে জল পড়ত অন্তত। এ তো শোকের কোন বহিপ্র্রকাশই নেই কোথাও।

অনেক ভেবে অনেক ইতস্ততঃ ক'রে কাছে গিয়ে ডাকল, 'মা !'

যেন ঘুম ভেঙে চমকে উঠল হেমন্ত, 'কী গা বদ্যিনাথের মা ? কী হয়েছে ?'

'না, মানে—সন্ধ্যে হয়ে গেল, অমন একভাবে ঠায় বসে আছেন—কী জানি শরীর-টরীর খারাপ লাগছে কিনা—ও কার চিঠি মা, চিঠিটা পাবার পর থেকেই—চিঠিতে কোন অন্য খবর আছে নাকি মা ?'

'সন্ধ্যে হয়ে গেল ? তাই তো, ও ঘরটা তো বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে ! তা আলো জ্বালো নি কেন ?...বাবা, এতক্ষণ বসে আছি ! খবর—হ্যাঁ, খারাপ খবরই আছে একটু। আমার দেওর-পো-বৌ মারা গেছে ! অশৌচ পড়ল। এখনও শ্রাদ্ধশান্তি হয় নি।—চলো দিকি একটু দাঁড়াবে—গঙ্গাচানটা ক'রে আসি।'

তারপর যেন কতকটা অর্ধস্বগতোক্তি ক'রেই বলল, 'আমিই অনেক খুঁজে বিয়ে দিয়ে

এনেছিলুম—সরস্বতীর মতো রূপ ছিল। আবাগীর বরাত খারাপ—তিনটে অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে মরে গেল। স্বামী যা—তিনমাসের মধ্যে আর একটা বে করবে বোধহয়।'

'কী হয়েছেল মা?'

'বলছে তো টাইফয়েড।'

আর কথা বাড়তে দিল না সে? উঠে তরতর ক'রে নেমে পেল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

রাত্রে আহ্নিক ক'রে উঠে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল হেমন্ত।

লিখতে হবে—কিন্তু কী লিখবে?

সন্ধ্যা থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলছে মনে।

আবার সেই সংসার, আবার ছেলে মানুষ করা?

বুদ্ধি-বিবেচনা বলে, 'না না, আর নয়—অনেক হয়েছে, ও পাপে আর দরকার নেই। এতদিনেও শিক্ষা হল না? আরও কত লাঞ্ছনার সাধ আছে? এ দায় ঘাড়ে না নিলে কেউ তোমাকে দোষ দেবে না, কেউ কিছু বলবে না। সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে কবে, পরের ছেলে মানুষ করার আর বয়স নেই।'

কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত একটা বস্তু আছে—অন্তর। অত্যন্ত অবুঝ, অত্যন্ত যুক্তিবধির। সে চুপি চুপি বলে, 'মেয়েটা সারাজীবন মন গুমরে-গুমরে গেল, দুঃখই পেল জীবনভোর। যেখানে যেখানে তার সান্ত্বনা থাকতে পারত—একটু শান্তি—সে সব পথ তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছিলে! তার একটা ছেলেও যদি মানুষ হয় তবু পরলোকে গিয়েও সে শান্তি পাবে একটু। এটুকু থেকে তাকে আর বঞ্চিত ক'রো না।'

আরও গভীরে—মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কোথায় চির-অমর, চির-অপরাজেয় আশা বাস করে, সে কানে কানে বলে, হয়ত এই সর্বশেষ পর্বে, জীবনের এই পশ্চিম দিগন্তে এসে বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন। হয়ত এতদিনের বিরূপতা ঘুচেছে এবার। সেই জন্যেই এখানে এনে ফেলেছেন। সমস্ত পরিচিত লোক থেকে দূরে, ওদের আত্মীয়-স্বজনের আওতার বাইরে—নিজের কাছে রেখে নিজের মতো ক'রে মানুষ করতে পারলে হয়ত মানুষ হতে পারে—এতকালে মুখে জল দেবার মতো লোক, সত্যিকারের আপনার লোক।

যুক্তি বাধা দিতে আসে বৈকি! কিন্তু যে শুনতে চায় না—তাকে কে শোনাবে!...

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর—আবারও ঝিয়ের আহ্বানেই সম্বিৎ ফেরে, 'মা, ভেবে আর কি করবেন! জগতের নেয়মই এই। যাদের ভরা সংসার তাদেরই ভগবান আগে টেনে নেন। আর এই যমের অরুচি আমরা পড়ে থাকি—আমাদের যমেও পোঁছে না।...তা মা—এবার একটু উঠুন। রাত দশটা বাজে! এর চেয়ে বেশী রাত ক'রে খেলে আপনার অসুখ করবে যে। যতক্ষণ শরীরটা আছে ততক্ষণ তাকে দেখতে হবে তো!'

'হ্যাঁ, এই যে উঠি বদ্যিনাথের মা। যাচ্ছি, তুমি জায়গা করো।

তারপর দৃঢ়হস্তে কলম ধরে পরিষ্কার স্পষ্ট হরফে সংক্ষিপ্ত চিঠি শেষ করে।

'তোমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে, যদি মনে করো—তো আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পারো—তবে নিঃশর্তে। বাকী দু'জনের ভার লইতে আমি অপারগ! আমার অনেক

বয়স হইয়াছে, বোধ করি তাহা তোমার স্মরণ নাই। তোমার এখনও বিবাহের বয়স পার হয় নাই, গরিবের ঘরের একটি মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করো,—সে-ই ছেলেমেয়েদের দেখিতে পারিবে। ইতি—'

॥ ৩১ ॥

চিঠি পাবার পর আর একদিনও দেরি করে নি নিমাইচরণ। যা মানুষ—মেজাজ ঘুরে যেতে কতক্ষণ? কালই হয়ত বলবে—'নেহি মাংতা! এনো না।'...সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে যে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়—যথা-লাভই শ্রেয়, এটা সংসারেরই শিক্ষা, লেখাপড়া না শিখলেও এটুকু জানতে অসুবিধে নেই! নিমাইচরণও তা জানে, সে আর কাল-বিলম্ব না ক'রে বড় দু'টোকে তাদের মাসির বাড়িতে রেখে ছোটটাকে নিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেল। চলেই তো গিছিল বিষয়টা—গিছল কেন, গেছেই ধরে রাখা ভাল—আবার যদি এই ক্ষীণসূত্রটুকু ধরে কিছুটা আসে, সে-ই মহালাভ! এ ব্যাপারে দেরি করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখানে এসেও কিছুটা শোকার্ত (শোকটা যথার্থ—সেটা হেমন্ত বুঝতে পারে), কিছুটা অনুতপ্ত, এই ভাব নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বিষণ্ণ বদনে দু'টো দিন থেকে, যাওয়ার সময় অনেক ইতস্তত, অনেক ভণিতা ক'রে মাথাটা চুলকে আবার একবার কথাটা পাড়তে যায়।

'যদি দয়া করো, ঘাট করো—ও দুটোকেও তোমার চরণে ফেলে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চেন্ত হই। বড় সাধ ছিল তার—ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, কেবলই বলত—চলো, মার পায়ে গিয়ে একবার পড়ি, নইলে এ সাধ আমার অপূন্নই থেকে যাবে। ও হো হো! ওঃ!'

কঠিন কাটা-কাটা উত্তর আসে ওদিক থেকে, 'হ্যাঁ, তোমার উপযুক্ত কথাই বটে। আমি আকন্দের ডাল মুড়ি দিয়ে মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে বসে আছি কিনা—তোমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে দিয়ে যাব, তোমরা নিশ্চিন্তি হয়ে সুখ করবে! আমার চরণে অত জায়গা নেই বাবা, চরণের অত শখও নেই। কেটে পড়ো দিকি, যে ক'টা দিন আছি এটাকে দেখবার চেষ্টা করব। তাও কতটা পারি, ক'দিন পারি তা জানি না। একেবারে নিশ্চিন্তি থেকো না বুড়ো-মড়ার ওপর সব দায় চাপিয়ে, মধ্যে মধ্যে খবর নিয়ো।'

আর কিছু বলবার ভরসা হয় নি, কেটেই পড়েছিল নিমাইচরণ।...সে বেচারী সত্যিই অসুবিধায় পড়েছে। এমন যে হবে একবারও ভাবে নি। এরকম অবস্থায় দিদিমারাই এগিয়ে এসে নিয়ে যায়—তার কপালে সব উলটো, তাঁরা একটা চিঠিতে শোক প্রকাশ ছাড়া কিছু করতে পারেন নি। গিয়ে ফেলে দিয়ে এলে কি হবে বলা যায় না অবশ্য, আর, যা-ই হোক—তাই দিয়ে আসতে হবে আপাতত। মাসে মাসে খরচ দিলে হয়ত এটুকু ভার নেবেন। গোপালের মাসির যা অবস্থা, একখানা ঘরে থাকে ভায়রাভাই সপরিবারে—তাকে বলাও যায় না কিছু।...দেশে পাঠাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার চেয়ে গলা টিপে মেরে ফেলাই ভাল।

বিয়েই করতে হবে আবার—কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ !···

আবার শুরু হয়ে যায় সেই বহু পরিচিত কাজের পুনরাবৃত্তি। ছেলে মানুষ করা। কিন্তু এ খাটুনী গায়ে লাগে না, বরং যেন মনে হয় হেমন্তর দেহ থেকে অন্তত কুড়ি বছর বয়সের ভার খসে পড়ে গেছে, নতুন ক'রে প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে সে। নতুন উৎসাহ আর আশা পেলে মানুষের কর্মক্ষমতা যেমন বেড়ে যায়, তেমনিই বেড়ে গেছে হেমন্তরও। তার পরিশ্রম করার শক্তি দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। বাড়ি-ওলার মা বলেন, 'তোমার এই দৌড়-ঝাঁপটা এতদিন কোথায় ছিল দিদি ? মনে হত তো যে আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই তোমার, ইচ্ছেও নেই—সংসারেই বিতৃষ্ণা। আবার এ নতুন জোয়ার এল কি ক'রে ?' হেসেই বলেন ভদ্রমহিলা, তামাশা ক'রে।

হেমন্তও হেসেই নাতিকে দেখিয়ে দেয়—'এই যে, বাবা বিশ্বনাথ নতুন চাঁদ পাঠিয়ে দিলেন, পুরনো মজে-যাওয়া নদীতে জোয়ার আনবার জন্যে।'

ছেলেটা খুবই ফুটফুটে দেখতে—আরও উৎসাহ সেই জন্যে—মনে হয় সত্যিই চাঁদ নেমে এসেছে। মায়ের মতোই মুখ-চোখ পেয়েছে, হেমন্তর মনে হয় বরং আরও ভাল, আরও সাকারা, কাটা-কাটা চোখ-মুখ। রঙও একেবারে দুধে-আলতা। নিমাইয়ের ছেলে মনেই হয় না। ওরা কি একটা সুবীর না সুজিৎ নাম রেখেছিল—মণিকার পছন্দমতো, হালফ্যাশানের নাম, সে নাম পাল্টে দিয়েছে হেমন্ত, নতুন নামকরণ করেছে বিশ্বনাথ। 'বাবা বিশ্বনাথই আমার ওপর দয়া ক'রে এসেছেন এইবার।' বিশ্বনাথ পোশাকী নাম—বিশুই বলে সবাই, হেমন্ত মাঝে মাঝে চাঁদা বা চাঁদু বলেও ডাকে। তর্কচূড়ামণির মায়ের জোয়ারের উপমাটা ওর খুব ভাল লেগেছে। তারকই বলেছিল একবার—অনেক দিন আগে, হেমন্ত জানত না—যে চাঁদের টানেই সমুদ্রে জোয়ার আসে, আর সাগরের জল ফুলে ওঠে বলেই গঙ্গায় কি অন্য নদীতে জোয়ার লাগে। সাগর থেকে কিছু দূরে গেলে আর জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায় না।···অনেক দিনের কথা বলেই মনে আছে।

ছেলে মানুষ করার তোড়জোড়ের কোন ত্রুটি ঘটে না। একটা হিন্দুস্থানী ঝিও রাখে বাসন-মাজা ঘর-মোছা এই সব, তা ছাড়া বাজার-হাট বাইরের কাজের জন্যেও—বদ্দিনাথের মাকে সম্পূর্ণই ঘরকন্না দেখতে হয়—রান্নাবান্না তো বটেই। ছেলের 'কন্না'ও অনেক। হেমন্তই করে, তবে সব পেরে ওঠে না একা।

ঘড়ি ধরে খাওয়ানো নাওয়ানো অন্যান্য পরিচর্যা কোনটারই কোন ত্রুটি হতে দেয় না। বছরখানেক পরে পড়াশুনোর প্রশ্নও ওঠে। অনেক খুঁজে একটি মেয়ে বের করে। অল্পবয়সী বিধবা, বাংলা লেখাপড়া জানে। সে-ই এসে পড়ায়। এটুকু হেমন্তই পারত, ভালই পারত, কিন্তু তার আর অত ধৈর্য থাকে না। তাছাড়া—যা মনে হচ্ছে ছেলেটার মাথা তত সাফ নয়—এখন থেকেই বকতে হয় অনেক বেশী। এখানে চিন্তামণির বাংলা ইস্কুলে দেওয়ার কথা বলেছে অনেকে—পাঠশালাতেও দিতে বলেছে কেউ কেউ—কিন্তু এইটুকু ছেলেকে সে কোথাও পাঠাবে না।

এর মধ্যে নিমাই বিয়ে করেছে একটি, ছ' মাস না যেতেই। অবশ্য নাকি না করে

উপায়ও ছিল না, নিমাই লিখেছে। ছেলেমেয়েকে দিদিমার কাছে রেখে দিয়ে সে মাসে মাসে কুড়ি টাকা ক'রে পাঠায়, সে টাকা তাঁদের সংসারেই চলে যায়—ছেলেমেয়েরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না, দু'বেলা শুধু দু'টো ভাত আর এক গাল ক'রে মুড়ি—এছাড়া কোন খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, ছেলেমেয়ে দু'টো তিনমাসেই আধখানা হয়ে গেছে।

নতুন বৌকে নিয়ে বিয়ের পর নিমাই কাশীতে এসেছিল একবার। বৌ দেখাতে আসাটাই আপাতকারণ—আসল কারণ হেমন্ত জানে—ছেলেকে দেখতে আসা। অর্থাৎ ছেলে কি হালে মানুষ হচ্ছে। দেখে যেন একটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই পড়ল নিমাইয়ের। এই রাজার হালের সঙ্গে নিজের এবং বড় দু'টো ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রার মান তুলনা ক'রে। বললে অনেকেই শিউরে উঠবে—কিন্তু হেমন্তর মনে হল ছোট ছেলের 'হাল' দেখে সে একটু ঈর্ষিতই। হয়ত অনুতপ্তও—মৌখিক অনুতাপ তো অনেক বারই প্রকাশ করেছে, যথার্থ অনুতপ্ত—তখন ঐ হঠকারিতাটা প্রকাশ করার জন্যে।

এ বৌটিও ভাল দেখতে। 'ছোঁড়ার কপালটাই ভাল' মনে মনে বলে হেমন্ত। মণিকার মতো অত চটক নেই হয়ত—তবে মণিকার ছবিটা এখনও চোখের সামনে না থাকলে আশাকেও সুন্দরী বলতে বাধত না। রঙ্ ফর্সা, খুবই ফর্সা, চোখও বড় বড়—এক ঢাল চুল—কেবল থাইমুখটা যা একটু বড়। তবে তেমন ত্রুটি মণিকারও বিস্তর ছিল, এর সেটা নেই। কি নেই তা ধরতে পারে না ঠিক। চটকটাই নেই হয়ত। পুরুষের বুকে অকারণ দোলা-লাগানোর মতো শক্তি।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সাতক্ষীরের ওদিকে বাড়ি। লেখাপড়া বিশেষ জানে না, বাংলা একটু পড়তে পারে এই পর্যন্ত, চিঠিও দু' লাইন লিখতে পারে—হাতের লেখা মন্দ নয়। তবে যত কমই বিদ্যে হোক, নিমাইয়ের কাছে সিংহবাহিনী। একখানা চিঠি দেখল, বরের মতো অত বানান ভুল তার হয় না।

ঠান্ডা স্বভাবের স্বল্পভাষিণী মেয়ে। ছেলেমেয়ে দু'টোকেও যত্ন করে। অন্তত এখানে যা চার-পাঁচ দিন দেখল। লোকদেখানো আতিশয্য নেই, তবে নজরটা আছে ঠিক, পরিচর্যার কোন ত্রুটি হয় না। যাবার আগের দিন আশা ওর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমি থেকে যাই না মা, আপনার কাছে, অন্তত আরও ক'টা দিন ? উনি না হয় যান, ওঁর আপিসের যদি ক্ষেতি হয়— ?'

জোর আলো নেই ঘরে, তবু হেমন্ত তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করে, আশা নিজে থেকে বলছে, না কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। কেউ আর কে—নিমাই। কিন্তু খানিকটা ভাল ক'রে দেখে মনে হল যে, শেখানোর মতো নয়, এমনিই বলছে, হয়ত সাধারণ সৌজন্য হিসেবেই।

সে একটু যেন শিউরে উঠল, আশার মাথায় হাত রেখে বলল, 'না মা। ওকথা আর মুখে এনো না। এ নিয়ে অনেক কান্ড অনেক অশান্তি হয়ে গেছে। হয়ত—হয়ত এ হলে তোমার দিদি এত তাড়াতাড়ি মরত না, আমার কাছে থাকলে। অবশ্য নিয়তি ঘনিয়ে এলে যাবেই, আমি যা ভাবছি আমার এটা অহংকারের কথাই—তবু কথাটা ভুলতেও পারি না। তুমি মা স্বামীর ঘর করো মনের সুখে, তোমার নিজেরও যেটের দু-একটা হবে, নিজে সুখী হও, ওদের সুখী করো—এই আশীর্বাদ করি।

আমার সংস্পর্শে না থাকাই ভাল।'

কথাটা তোলে নিমাইও, যাওয়ার দিন সকালে কতকটা যেন মরীয়া হয়েই বলে, 'বলছিলুম কি, যে ও যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, সবই তো করছ—তা ও দু'টোকেও অমনি এই সঙ্গে রেখে যাই না— ?'

'কেন আমার আময়দা পয়সা আর নিকড়ে গতর পেয়েছ ? অক্ষয় পরমায়ু ?···ঢের হয়েছে, তোমার ঝাড় আর গুচ্ছের এখানে ঢোকাতে চাইনে, শখ মিটে গেছে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'চিরকাল বুদ্ধির দোষেই লাথি-ঝ্যাঁটা খেয়ে গেলে। নতুন বৌ এসেছে ঐ মেয়েটা, ওর সামনে আর বাপগুষ্টি তুলতে চাইনে—কিন্তু মানুষের ঘরে জন্মালে আর একটু অন্তত বুদ্ধি থাকত। ওদের রেখে যেতে চাইছ, আমি তো মরার বয়েস পার হয়ে এসেছি কবে—জাঁকড়ে আছি বলতে গেলে, আর দু' বছর কি তিন বছর বড় জোর—এখন ওদের রেখে গেলে তোমার বৌও ওদের আপন ভাবতে শিখবে না, ওরাও তোমার বৌকে মা বলে চিনবে না। তখন হঠাৎ গিয়ে পড়লে আশাও বিষ-চোখে দেখবে—এরাও পর হয়ে থাকবে। ঐ একটাকে পুষছি, তাই হয়ত অন্যায় হচ্ছে। এর পর আমার কিছু হলে তোমাদের সংসারে গিয়ে খাপ খাওয়াতে পারবে না।'

আর কিছু বলতে পারে নি নিমাই। রাগের কথা বা অভিমানের কথা নয় এসব—নিতান্তই যুক্তির কথা।

আশা যাওয়ার সময় বার বার বলে যায়—'একবার আপনি আমাদের ওখানে চলুন মা, নিদেন দু'টো দিনের জন্যেও। একখানা ঘরে বাস ঠিকই—তবু আপনার কোন অসুবিধা হতে দোব না। একবার চলুন—দয়া ক'রে, দু'টো দিন সেবা করি, নইলে বুঝব আমাকে আপনি মেয়ের মতো নেন নি।'

হাসে হেমন্ত, বলে, 'তোর বাবা উকিল ছিল বুঝি ! খুব তো কথা শিখেছিস !'··· তারপর বলে, 'বলতে পারি না মা, ভগবান কাকে দিয়ে কখন কি করান, হয়ত বাধ্য হয়েই যেতে হবে একদিন—তবে কলকাতাতে যাওয়ার আর আমার ইচ্ছে নেই মা। তাছাড়া কি জানো, চিরকাল স্বাধীনভাবে থেকে এসেছি, সেই শ্বশুর বাড়ির ক'টা বছর ছাড়া—তা সেও তো ধরো নিজের বাড়িই, আপনার জন সবাই—কখনও পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে এক কল-পাইখানা সরি নি। ও আর পেরে উঠব না। তাছাড়া বয়েস হয়েছে, একটু আচার-বিচারও মেনে চলি—তোমাদের ঐ একখানা ঘরে গিয়ে শুধু শুধু অশান্তি বাড়ানো।···তুমিই বরং এসো, ছেলেপুলে হলে, শরীর যদি খারাপ মনে হয়—এখানে এসে দু-একমাস থেকে যেয়ো। নিমে খরচ করতে না পারে—আমি গাড়িভাড়া যাতায়াতের টাকা পাঠিয়ে দোব। কিছু মনে করো না মা, লক্ষ্মীটি।'

ম্লানমুখে চলে যায় আশা। কে জানে কেন, তার এই চার-পাঁচ দিনেই বৃদ্ধার ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে। এমন কি, ওঁর এই অতিরিক্ত স্পষ্ট ভাষণও ভাল লেগেছে তার। নিমাই কেন যে পছন্দ করে না তা বুঝতে পারে না।

অবশ্য নিমাই কতকটা নিশ্চিন্তই থাকে। মনে হচ্ছে ভাগ্য তাকে খানিকটা ভয় দেখিয়ে—কিছুটা শাসন ক'রেই আবার তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। গুরুজনরা যেমন ছোটদের কোন অন্যায় দেখলে বলেন, 'যা, আজ তোর খাওয়া বন্ধ,' কি, 'বাড়ি থেকে দূর

ক'রে দিলুম!' কিন্তু তারপর নিজেই আবার কোমল হয়ে বলেন, 'আচ্ছা যা, এবারের মতো মাপ করলুম, আর কখনও করিস নি।' অদৃষ্টও বোধহয় তার সঙ্গে সেই রকমই কতকটা করল। ভয়টা অবশ্য সাংঘাতিক দেখিয়েছিল, তবু বিষয়টা যে আবার তার লাইনেই চলে আসছে—এটা তো নিশ্চিন্ত। হয়ত একা ওকেই দিয়ে যাবে—বিশুকে—তা দিক, বুড়ি আর ক'দিন? তখনও বিশু নাবালক থাকবে নিশ্চয়, আর বাবা ছাড়া নাবালকের গার্জেনই বা কে হবে! হাতে পেলে—নিজের সুবিধেমতো ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবে নিশ্চয়ই। ও ছেলেমেয়ে দুটোর আখের তো বটেই, আরও যারা আসছে তাদেরটাও গুছিয়ে দিতে পারবে।

ভাবতে ভাবতে এত খুশী হয়ে ওঠে নিমাই—যত ভাবে ততই ভবিষ্যৎটাকে উজ্জ্বলতর মনে হয়—যে, নিজের মনের মধ্যে কথাটা আর চেপে রাখতে পারে না, কথায় কথায় আশাকেও বলে ফেলে।

আশা বলে, 'তুমি কি গো, তাঁর মরণ টাঁকছ বসে বসে—?'

অপ্রতিভ নিমাই বলে, 'বাঃ, মরণ টাঁকছি কৈ? বলছি মরবেই তো—এতখানি বয়েস হল। এ বয়স অব্দিই বা ক'টা লোক বাঁচে! মরার পরের কথা বলছি—আমি কি আর মরতে বলছি তাড়াতাড়ি!'

তবু তো আর একটা কথা আশাকে বলে না, ইদানীং যে কথাটা প্রায়ই তার মনে হয়। মণিকা মরে তার এই সুবিধেটা ক'রে দিয়ে গেল—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নইলে বুড়ি এটুকুও নরম হত না। লোকে যে বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে, তার ক্ষেত্রে অন্তত কথাটা ফলে গেল।

তবে প্রতি সোনালী স্বপ্নের পিছনেই নাকি একটা আসন্ন বিপদের কালো ছায়া উঁকি মারে—নিমাইচরণেরও ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে একটি বিঘ্ন দেখা দিল। গলায়-বেঁধা কাঁটার মতো, খেতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু খচ্‌খচানিতে অস্বস্তি হতে থাকে।

বিশু কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হবার বছর-দুই পরেই এই ব্যাঘাত এসে জুটল—দুশ্চিন্তার এই কাঁটা ও তজ্জনিত একটা খচ্‌খচানি। বছরে একবার ক'রে আসে নিমাই, কোনমতে আসার গাড়িভাড়া যোগাড় ক'রে—অবস্থা বুঝে ফেরার গাড়ি-ভাড়াটা হেমন্তই দিয়ে দেয় আশার হাতে—সেবার এমনিই এক নিশ্চিন্ত সুখযাত্রায় এসে—সুখযাত্রা তো বটেই, অঢেল মাছ আর অঢেল মিষ্টি, দই, রাবড়ি, রামনগরের বেগুন, কাশীর বিখ্যাত কপি, এক বছর ধরে স্বপ্ন দেখার মতোই খাওয়া-দাওয়া—দেখল একটি কে হিন্দুস্থানী ছেলে বিশুর সঙ্গে পড়ছে এবং প্রায় ওর মতোই সুখে ও আদরে এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে! 'মতো,' এইজন্যে যে, রাতটা এখানে থাকে না, মায়ের সঙ্গে ঘরে যায়, কিন্তু সে ঐ রাতটুকুই, ভোর না হতে হতেই এখানে এসে হাজির হয়—দিনভর এখানেই থাকে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনো সব কিছু। পোশাক-আশাকের অবস্থা দেখেও মনে হয়, সে হেমন্তরই প্রতিপাল্য বা পোষ্যভুক্ত হয়ে গেছে।

বিশুরই বয়িসী হবে ছেলেটা, কি সামান্য দু-চার মাসের ছোট। দেখতে-শুনতে

মন্দ নয়—বিশুর পাশে দাঁড়াবার মতো নয় অবশ্যই, তবে একেবারে কালো ভূতও নয়। মুখ-চোখ ভালো, মাজা-মাজা রঙ, স্বাস্থ্যটিও চমৎকার, গোলগাল।

পরিচয় নিয়ে জানা গেল হেমন্তর হিন্দুস্থানী ঝি মুনিয়ার ছেলে ও। ছেলেটার নাম ভোলা। হেমন্তই নাম রেখেছে নাকি ভোলানাথ, ওর মার রাখা নাম সরযূপ্রসাদ—ডাকত সুরেজু বলে। ও এখানে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (ক্রুদ্ধ নিমাই-এর ভাষায় 'গেড়ে বসা') উপলক্ষটা শোনা গেল বদ্যিনাথের মার মুখে। ছেলেটা প্রতিদিনই মায়ের সঙ্গে আসে এখানে, মা কাজ-কর্ম করে, ও চুপ ক'রে বসে আপন মনে এটা-ওটা বিশুর পরিত্যক্ত জিনিস নিয়ে খেলা করে। কখনও বা, বিশুর সময় থাকলে, কাঠের ব্যাট আর বল নিয়ে তার সঙ্গে ব্যাট-বল খেলা করে। আসল কথা খাওয়া—এখানে এলেই বদ্যিনাথের মা দু'খানা-একখানা রুটি কি অন্য কোন খাবার থাকলে দিয়ে দেয়—বসে বসে একঘণ্টা ধরে একটু একটু ক'রে খায়, তাতেই অনেকটা সময় কেটে যায়, কাজ-কর্মের অবসর পায় মুনিয়া। সকালের জলখাবারটা নিশ্চিত এবং দুপুরের খাওয়াটাও প্রায়-দিনই এখানে সারা হয়ে যায়, সেই লোভেই মুনিয়া এখানে নিয়ে আসে। নইলে মুনিয়ার মাসী আছে পাশেই, স্বচ্ছন্দে সেখানে রেখে আসতে পারে।

আরও পরিচয় পাওয়া গেল, মুনিয়ার স্বামীর ঔরসজাত ছেলে এ নয়—(এটা বদ্যিনাথের মা চোখ-টিপে ফিসফিস ক'রে জানায়) মুনিয়ার মরদ আজ আট বছর নিরুদ্দেশ! মুনিয়া এক বাঙালীবাবুর বাড়ি কাজ করত, ব্রাহ্মণ, ইঞ্জিনীয়ার না কি —সেইখানেই গর্ভবতী হয় মুনিয়া। এ নিয়ে গোলমাল করা বা চেঁচামেচি করার কথা ওরা ভাবতেও পারে না, দোষটা বরং নিজেদেরই ভেবে চোর হয়ে থাকে। বাবুর স্ত্রী ব্যাপারটা বোঝামাত্র ঝাড়ু মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য সে বাবু নাকি মধ্যে মধ্যে টাকাটা সিকেটা দেয়—পথে-ঘাটে দেখা হলে।

তবে এ পরিচয় জানা সত্ত্বেও কিছু আটকায় নি—এখানে, এ বাড়ির ছেলের মতো মানুষ হতে থাকায়।

ঘটনাটা সামান্য। যেমন একা বসে খায় তেমনিই খাচ্ছে, উঠোনের মাথার ওপরে জাল দেওয়া আছে বলে বানরের উপদ্রব নেই। নিশ্চিন্ত হয়েই বসে খাওয়া চলে। সেদিন কে বোধহয় ছাদের দরজা খুলে রেখে এসেছিল, কিংবা পাশের বাড়ি—অর্থাৎ বাড়িওলার বাড়ি দিয়েই এসেছে। এক বিরাট গোদা বানর এসে উপস্থিত, লক্ষ্যটা সামনেই ভোলার হাতে ধরা দু'খানা রুটি। ঠিক সেই সময়টায় হেমন্ত পুজো সেরে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ছেলেটা বানর দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে 'মায়ী গে'—বলে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে—হেমন্তকে। সেখানে মুনিয়াও ছিল, কলতলায় বসে বাসন মাজছিল, তার কাছে না গিয়ে হেমন্তকে এসে জড়িয়ে ধরল, এবং 'মা' বলে—সে-ই ওর সৌভাগ্যের সূত্রপাত। বদ্যিনাথের মায়ের মতে, ওর সুগ্রহই ওকে দিয়ে এটা করিয়েছে। 'ওর ললাটের লেখন, সুখভোগ আছে অদেষ্টে, ঝিয়ের ঘরে জন্মালে কি হবে, বেজন্মা হলেই বা কি হবে—বিধেতা-পুরুষ হাত ধরে এখানে এনে ফেলেছে, বিধেতা-পুরুষই ঐ বাক্যি বলিয়েছে ওকে দিয়ে—কাউর কিছু করবার নেই তো!'

এসব কথা বিশ্বাস করে না নিমাই। দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে, 'বিধেতা-পুরুষ না ছাই, ঐ হারামজাদী মাগীই শিখিয়ে দিয়েছে। নইলে নিজের মা থাকতে আর একটা ভিনজাতের বুড়িকে কেউ মা বলে ?'

তবে বাদ্যনাথের মায়ের কাছে যা-ই বলুক, হেমন্তকে সোজাসুজি কিছু বলতে সাহস হয় না। আবার একেবারে চুপ ক'রে থাকতেও পারে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে বলে।

'যতই হোক, ছোটলোকের ছেলে তো, ঝিয়ের ছেলে—তায় খোট্টা—এতটা নাই দেওয়া বোধহয় ভাল হচ্ছে না।' তারপরই সামলে নিয়ে বলে, 'অবিশ্যি তোমাকে বলতে যাওয়া ব্রেথা, তুমি আমাদের থেকে ঢের বেশী বোঝ এসব—তবু—'

হেমন্তর মুখ সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হয়ে ওঠে, বলে, 'ছোট-লোকের ছেলে বলছ কাকে ? তোমাদের গুষ্টির মতো ছোটলোক ভূ-ভারতে কোথাও আছে নাকি ? তোমার ছেলেকে যদি মানুষ করতে পারি—মানুষ নয়, মানুষ হবে না তা জানি—বড় করা, এ যদি পারি, ওকে মানুষ করার চেষ্টা করব—এ আর বেশী কথা কি ?'

তারপর, নিমাইয়ের মুখের উপর কঠিন ভ্রূকুটি-বদ্ধ দৃষ্টি স্থির রেখে বলে, 'তবে যদি মনে করো—এখানে ওর সংস্পর্শে থাকলে তোমার ছেলের ক্ষতি হবে—স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো, পোশাক-আশাকসুদ্ধ সব গুছিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। তাই বলে, তুমি কি ভাববে—তোমার ছেলের ভাগে কতটা কম পড়বে বলে তোমার কি দুশ্চিন্তা হবে—বলে, যাকে ভেবে বুঝে আশ্রয় দিয়েছি তাকে ত্যাগ করতে পারব না, কোন দোষ না দেখে।'

এর পর পালিয়ে আসা ছাড়া পথ থাকে না।

পথে আসতে আসতে আশা তিরস্কার করে—'কেন তুমি ওসব কথা তুলতে গেলে ? বুড়ির এখনও যা বুদ্ধি, আমাদের এক হাটে বেচে আর এক হাট থেকে কিনতে পারে। ওকে জ্ঞান দিতে যাও তুমি ! দিলেও নেবে কে ?'

তারপর বলে, 'ভোলা ছেলেটা কিন্তু ভাল। হাজার হোক বাঙালী ভদ্দরলোকের জম্মিত তো, এরই মধ্যে বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে উঠেছে, না ?'

নিমাই ধমক দিয়ে ওঠে, 'ছাই হয়েছে, তুমি আমার যা হয়েছ না—প্যাজ পয়জার গুনগার। কাঠ বোকা। তোমার সঙ্গে যে দু'টো পরামর্শ করব সে জো-ও নেই।'

আশা ম্লানমুখে চুপ ক'রে যায়। সে ভাল মানুষ। দ্বিতীয় পক্ষের দর্প ও তেজ প্রকাশ করতে তো পারেই না, মণিকার যে জোর ছিল সেটুকুও দেখাতে পারে না। এমন কি দোজবরের বিশেষ আদরটাও ভোগ করা হয়ে ওঠে না, ফী হাত শুনতে হয় যে, মণিকা ঢের বেশী রূপসী ছিল, লেখাপড়া জানত, গান জানত। বড়লোকের ঘরে গেলেও মানিয়ে নিতে পারত।

শোনে আর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আশা।

ওদের অবস্থা খারাপ, এই পাত্র পাওয়াই দুরাশা ছিল। ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে—এই জেনে-বুঝেই সে এসেছে। দুঃখ করা ছাড়া অন্য উপায় কি ?

জোর করা কি ঝগড়া করার সাহস তার নেই।

ভাগ্যবানের বৌ মরে—সেটা কিছু মর্মান্তিকভাবেই নিমাইয়ের জীবনে সত্য হয়ে যায়।

মণিকা নিজে মরে জ্যাঠাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের সেতু রচনা ক'রে তার যে কত উপকার ক'রে দিয়ে গেছে, সেটা ক্রমশঃ আরও বেশী ক'রে বোঝে নিমাই।

যুদ্ধ বেধেছে অনেক দিনই—কিন্তু সে যুদ্ধের ঢেউ এখানে এমনভাবে এসে লাগবে, এখানের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত ক'রে দেবে—তা ভাবে নি কেউ। কোথায় কোন মুলুকে, বিলেতে না আমেরিকায় লড়াই হচ্ছে—তাতে আমাদের কি? নিমাই রাজনীতি অত বোঝে না, নিজে খবরের কাগজও পড়ে না, যা আপিসে সহকর্মীদের মুখে শোনে তাই পথে-ঘাটে বা ঘরে বৌয়ের কাছে এসে সাড়ম্বরে, কিছু বা রঙ চড়িয়ে বলে নিজের প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। তাদেরই সমীক্ষা নিজের বলে চালিয়ে দেয়, মনকে প্রবোধ দেয়—তাতে দোষই বা কি—যদি কিছুটা নিজের লেখাপড়ার ও বুদ্ধির অভাব ঢাকা পড়ে?

আপিসে শুনেছিল ইংরেজ আর ক'দিন,—দ্যাখো না—জার্মানী সাত দিনের মধ্যে দেবে ঠান্ডা ক'রে, খাস বিলেতটাই দখল ক'রে নেবে। তারপর ইংরেজ বাছাধনরা যাবেন কোথায়? এদেশে থেকেও পাত্তাড়ি গুটোতে হবে না? আরে, নিজেদের দেশই যদি যায়, এদেশ রাখবে কি ক'রে? জার্মানরা তো আমাদের বন্ধু, খুব ভক্তি করে, আমাদের শাস্ত্র রামায়ণ মহাভারত কালিদাস সব ওদের মুখস্থ, মোক্ষমুলের সংস্কৃত জেনেই তো অত বড় পন্ডিত হয়েছিল। ওরা আমাদের অধীনে রাখবে না এটা ঠিক—এদেশে এসে আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে—সুভাষ বোস হবে প্রেসিডেন্ট। কিংবা গান্ধী প্রেসিডেন্ট, সুভাষ বোস প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে যে বিরাট লড়াই হয়ে গেছে—নিমাই তখন ছেলেমানুষ, তবু সেকথা মনে আছে। কাপড়ের খুব দর হয়েছিল—বিলেত থেকে কাপড় আসত না বলে, নুনেরও খুব অসুবিধা গেছে। অন্য জিনিসপত্রের দামও কিছু কিছু বেড়েছিল, দু-একটা জিনিস পাওয়াই যেত না। তারপর লড়াই থামতে তেমনি হু-হু ক'রে নেমে গেল দর। লোকের কাজ নেই, জিনিস কিনবে কে? লড়াইয়ের জন্যে অনেক বাড়্‌তি কাজ পাওয়া যাচ্ছিল, সে-সব পাট উঠে গেল। আবার যে-কে সেই। আমেরিকায় না কোথায় একমাসে বুঝি এক লাখ লোক 'আপ্তঘাতা' হয়েছিল কাজ না পেয়ে।

সুতরাং খুব ভয়াবহ অবস্থা হবে এমন ভাবে নি কেউ। বরং মুখরোচক আলোচনা করার মতো খোরাক পেয়ে খুশী হয়েছিল। বোমার হিড়িকে সবাই যখন পালায় তখন একটু মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ঠিকই—তবে নিমাই কোথাও পালায় নি, সে অবস্থা ছিল না। জায়গা ছিল, কাশীতে পাঠানো চলত, কিন্তু টাকা? এত টাকা হাতে জমে নি যে, এতজন দুম ক'রে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আপিসে ছুটিও গেল বন্ধ হয়ে, তাদের নাকি 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিস', ছুটি হবে না। তাতে একটু ভয়ে ভয়ে শুকিয়ে থাকতে হয়েছিল ঠিকই, সন্ধ্যের সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে গা ছম ছম করত, রাত্রে ডিউটি পড়লে সন্ধ্যের আগে থাকতে আপিসে গিসে বসে থাকত। কিন্তু সে যা-ই হোক, এমন

ভাবে পেটে টান পড়ে নি। হঠাৎ সেইটেতে হাত পড়তেই চিন্তিত হয়ে উঠল। চাল চড়তে চড়তে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর টাকা মণ হয়ে গেল, যে চাল সে তিনটাকা মণ দরে কিনেছে ঊনিশশো শো ঊনচল্লিশেও। জ্যাঠাইমা বেশী দামের চাল খেত, পাঁচটাকা সওয়া পাঁচটাকায় চামরমণি চাল আসত, নিজের হাতে সংসার পড়ে তিন সওয়া তিনের ওপর ওঠে নি নিমাই। সত্তর, শুনেছে কোথাও কোথাও আশিতে পর্যন্ত উঠেছে। ওদের বাজারের মালই রইল না—উধাও হয়ে গেল একেবারে। তবু তখনও অন্য জিনিসের দর অত বাড়ে নি—ভাত কাপড় চিনি কেরোসিন তেল—এইতেই প্রথম টান পড়ল। সরকারী কর্মচারীদের জন্যে আগেই রেশনের ব্যবস্থা হল বটে, তবে তা হতে হতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল নিমাই। স্ত্রীর গায়ে সোনারত্তি বলতে কিছু রইল না, এমন কি কমলা হবার পর হেমন্ত যে হার-বালা দিয়েছিল, সেগুলো পর্যন্ত চলে গেল এই হিড়িকে। কাপড়-জামা পোশাক-আশাক বহুকালই কেনা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন তো প্রায় উলঙ্গ অবস্থা সকলকার। রেশনে যেটুকু কাপড় বরাদ্দ হয়েছে তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। এত লাইনেই বা দাড়ায় কে? গোপালের পৈতে দেবে বলে গোপনে কিছু সরিয়ে রেখেছিল আশা, তাও ধুয়ে বেরিয়ে গেল বলতে গেলে।

এ অবস্থায়—উপোস ক'রে মরা এবং বেইজ্জৎ হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাবার আর কোন পথ না দেখে—শেষে কাশীতেই চিঠি লিখল। লিখতে হল। নিজে লিখল না—আশাকে দিয়ে লেখাল। 'এই অবস্থায় ছেলেমেয়ে লইয়া অনাহারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি—এক্ষণে আপনি যদি কিছু দয়া করেন তবেই এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষা পায়।'

দয়া করেছিল হেমন্ত। চিঠির উত্তর দেয় নি, তবে চিঠি পাওয়ামাত্রই আশার নামে মণিঅর্ডার ক'রে একশ' টাকা পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ ক'রে পাঠায়। তাতেও হেমন্তর লোকসান নেই, এই মাগ্‌গীগণ্ডা মন্বন্তরের ফলে নিমাইয়ের কাশীতে আসা বন্ধ হয়েছে, ওরা এলে যে খরচটা হত সেইটেই পাঠাচ্ছে সে মাসে মাসে ভাগ ক'রে। হয়ত হিসেব ধরলে ঠিক এতটা যায় না—তা হোক, ঝঞ্ঝাটটা অনেক কম। তাছাড়া, ঐ বছরে একবার আসাতেই বিশুর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

আর তা হতেই পারে। এখানে কতকটা বন্দী হয়ে থাকা, দু'টো বুড়ির মধ্যে, নিচে যে ভাড়াটে সেও বুড়ি। একতলায় অনেক অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে আছে বটে—তবে হেমন্ত তাদের সঙ্গে বেশী মিশতে দেয় না বিশুকে। দেয় না—কারণ এরাই কিছুদিন আগে, এদের ছেলেমেয়েদের যখন উপযাজক হয়ে দেখাশুনো করতে যেত, রোগে সেবা করা কি পথ্য যোগানোর জন্যে—তখন ওকে ডাইনী বলেছে, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও আয়ু সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, অথচ এখন বিশু আসতে তাদের ছেলে-মেয়েদের আর আগের মতো খাবার ওষুধ কি কাপড় জামা দেবে না—এই অনুমান ক'রে তারাই দস্তুরমতো ঈর্ষিত। কে জানে—শেষ পর্যন্ত যদি ছেলেটার কোন অনিষ্ট করে?

অবশ্য খেলার সাথী একজন বাড়িতেই আছে, ভোলা। প্রায় সমবয়সী। ভোলা এক ক্লাস নিচেয় পড়ে, তার কারণ সে অন্য ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী বয়সে অ-আ-ক-খ থেকে পড়তে শুরু করেছে। তাতে খেলুড়ে কি বন্ধু হতে আটকায় না। কিন্তু

কে জানে কেন—বিশু ভোলাকে কেমন যেন বিদ্বেষের চোখে দেখে, ভাল ক'রে মিশতে চায় না, বন্ধুর মতো তো নয়ই। বরং—ওদের যে সাংসারিক পদমর্যাদা সমান নয়, ভোলা ঝিয়ের ছেলে, বিশুর চাকর হওয়ারই কথা তার, বড়জোর ওর ব্যক্তিগত ভৃত্যের পদবী দাবী করতে পারে—এই ইঙ্গিতটাই ওর আচারে-আচরণে কথায় বার্তায় অহরহ প্রকাশ পায়। স্পষ্ট ক'রে তেমন কিছু বলতে পারে না হেমন্তর ভয়ে—তবে শব্দের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বলা ছাড়া, সব রকমেই তা জানিয়ে দেয়।

হয়ত সহজাত ঈর্ষা, স্বভাবটাই ঐ রকম, কিন্তু হেমন্তর বিশ্বাস এর মধ্যে নিমাইয়ের কিছু হাত আছে। সে যে আগে বছরে বছরে আসত পাঁচ-সাতদিনের জন্যে, তার মধ্যেই এই বিষটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সেদিক দিয়েও ওদের আসা বন্ধ হওয়াতে হেমন্ত খুশী অনেকটা। সেই জন্যেই—সে আসবার ভাড়া পাঠাতে পারে—এমন আভাস পর্যন্ত দেয় না আশার চিঠিতে।

বিশুকেও সোজাসুজি শাসন করতে পারে না। কেন না—যে অপরাধ প্রত্যক্ষ নয়, তার জন্যে প্রকাশ্য বিচার করা বা শাস্তি দেওয়া যায় না। তা ছাড়া আর সব রকমেই এই অবজ্ঞার মনোভাব বদলের চেষ্টা করে। তবে তাতে যে বিশেষ ফল হয় না—হতাশ-ভাবে সেটাও লক্ষ্য করে। জোর ক'রে পাশাপাশি বসিয়ে খেতে দেয়, একরকমের জামা-পোশাক কিনে দেয় পুজোর সময়—ফল হয় বিপরীত, আরও বিরূপ হয়ে ওঠে বিশু।

অবশ্য একটা কাজ করে নি হেমন্ত, মার কাছ থেকে কেড়ে ভোলাকে স্থায়িভাবে এ বাড়িতে এনে তোলে নি। মুনিয়ার তাতে আপত্তি ছিল না, হয়ত ইচ্ছাই ছিল। মুখে বলেওছে বার বার, কিন্ত হেমন্ত তা করতে দেয় নি। স্পষ্টই বলেছে যে, 'যে যা—তাই থাকাই ভাল। অন্তত সে জ্ঞানটা থাকা দরকার। গোড়াটাকে যে ঘেন্না করতে শেখে তার আর ওপরে ওঠা হয় না। তোমার ঘরের ছেলে, কী ভাবে তুমি থাকো, কত কষ্ট ক'রে ওদের মানুষ করেছ—সেটা জানা দরকার। মায়ের ওপর থেকে ভক্তিছেদা না চলে যায়। তাছাড়া মার কাছ থেকে ছেলে কাড়া আমি পছন্দ করি না। নিজের মাকে যে আপন ভাবতে শিখল না, ভালবাসল না—সে আমাকে আপন ভাববে?…তাই কখনও হয়!…ওতে ক'রে আত্মসম্মানহীন স্বার্থপর অমানুষ তৈরী হয়। না, তোর জিনিস তোর কাছেই থাক, তোকে, তোর মাসীকে, তোর অন্য ছেলেকে আপন ভাবতে শিখুক, সে যে ওদেরই একজন এইটে যেন মন থেকে না যায়। আমি ওর কেউ নয়—সেই বোধটা জন্মালেই ভাল। কতজনের কাছে কত স্নেহ-ভালবাসা পেলুম—তাই আবার ওর কাছ থেকে আশা করব!! হায় রে! নাঃ, এতকাল পরে মরবার বয়স পার হয়ে সে লোভ আর নেই।'

লোভ থাক বা না থাক, আশাতীতই পায় কিছু কিছু। হয়ত লোভ বা আশা নেই বলেই পায়।

ভোলা ছেলেটা যে এদের মতো—ওর শ্বশুরগুষ্ঠির মতো নয়, সেটা মনে মনে ক্রমশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম সে সম্বন্ধে সচেতন হল হেমন্ত, নিজের একটা অসুখের সময়। সামান্যই

অসুখ,সর্দি জ্বর, গায়ে ব্যথা—আগে এরকম জ্বরে উঠে ঘর-সংসারের কাজ করেছে, এমন কি স্নান করতেও আটকায় নি। এখন এতখানি বয়স বলেই কাবু হয়ে পড়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল তিন-চারদিন। ভোলা এই ক'টা দিন ওর ঘর ছেড়ে, বিছানার পাশ ছেড়ে কোথাও নড়ে নি। কে ওকে বড়মা বলতে শিখিয়েছিল, 'বড়মা' বলেই ডাকে ভোলা। কেবলই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে, 'জল খাবে বড়মা? বড়মা, বাতাস করব? এখন কেমন আছ বড়মা, শির-দরদ কমেছে? জলপট্টি লাগাব? পিসিমাকে ডাকব বড়মা, বাহার যাবে?'

আগে হেমন্ত ভেবেছিল মুনিয়াই বুঝি এটা শিখিয়ে দিয়েছে—এই অষ্টপ্রহর মুখের কাছে বসে থাকা—কিন্তু পরে বদ্যিনাথের মার মুখে শুনল যে, ঘটনাটা কিছু অন্য রকমই—মুনিয়া গোপনে বরং ওকে এজন্যে শাসন করারই চেষ্টা করেছে, 'ইনফ্লু বেমারি হয়েছে মা-জীর, ভারী ছোঁয়াচে রোগ—তুই কেন ওখানে বিছানায় মুখ দিয়ে পড়ে আছিস? তোর বুখার হলে কে দেখবে?'—ইত্যাদি বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভোলাকে নড়াতে পারে নি কিছুতেই, কোন কথাই শোনে নি সে। বলেছে, 'তোর ঐ বেমারি হলে আমাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতিস? না আমিই পালাতুম? বড়মা বুড়ো মানুষ, যদি বুখার খুব বেড়ে যায়? চেঁচাতে পারবে না, কত তকলীফ হবে বল দিকি? তুই যা বাড়ি যা, আমি ঠিক আছি।'

বাড়িও যায় নি, ইস্কুলেও না। হেমন্ত নিজেও বকাঝকা করেছে এ জন্যে, 'ওকি রে, ইস্কুল যাবি নি কি রে? শুধু শুধু ইস্কুল কামাই, পড়ার ক্ষতি করবি?...এই তো বদ্যিনাথের মা আছে, তোর মা আছে—আমাকে ওরা দেখবে। তুই যা—'

ভোলা যায় নি তবুও। বেশী বকাবকি করতে কাঁদতে শুরু করেছে। বদ্যিনাথের মা বলে, 'ও আর-জন্মে তোমার কে ছেল মা, নইলে তোমারই বা এত টান কেন, আর তোমার না হয় হল,—তোমার মায়াবী শরীর—ওরই বা এতখানি টান এল কোথা থেকে? কী-ই বা বয়েস, দশ-বারো বছর হবে বড় জোর, এমন কিছু বুদ্ধিবিবেচনা হয় নি। তাছাড়া এরকম বয়েসের ছেলে অসুখের কাছে ঘেঁষতে চায় না বড় একটা, আপন মা-বাপের অসুখেই থাকে না—ফাঁক খোঁজে কেবল, কখন বাইরে যাবে—কোন্ ছুতোয়, ইয়ার বক্‌শী নিয়ে খেলে বেড়াবে। এ ছেলে একেবারেই দলছাড়া বাপু, যা-ই বলো। এর টানটা আন্তিরক, দেখলেই বোঝা যায়।'

হেমন্তর চোখে জল এসে যায়। সেই সঙ্গে বহুদিনের ভুলে যাওয়া একটা হৃদয়াবেগে রুগ্ন মস্তিষ্ক কেমন যেন ঝিম-ঝিম ক'রে ওঠে। এই জীবনে কোন আন্তরিক ভালবাসা, সত্যিকারের টান আর পাওয়া সম্ভব, অযাচিত নিঃস্বার্থ ভালবাসা—এ যে বিশ্বাসই হয় না। এমন কোন যত্ন-আদরের আতিশয্য সে দেখায় নি, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়াবাড়ি করেছে বিশুকে নিয়ে—সে তো দিব্যি খেলেধুলে বেড়াচ্ছে, বরং চোখে চোখে রাখার লোক নেই বলে আরও বেশী বেপরোয়া—আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। সে তো এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসে না, 'ঠাকমা কেমন আছে' দিনান্তেও একবার এ প্রশ্ন করে করে না।

তবে কি—সত্যি-সত্যিই পূর্বজন্মের সংস্কার? বদ্যিনাথের মা যা বলছে তাই?

গতজন্মে কেউ ছিল ছেলেটা ?

যে চিন্তাটা মনে আনতে সাহস হয় না, সেইটেই আপনা থেকে মনে এসে যায়—বাধা দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও—তবে কি এতকাল পরে তারকই এল আবার, মধ্যে অন্য একটা জীবন সেরে ?···সে জন্মের কোন দুষ্কৃতির ফলেই নীচ কুলে হয়েছে, কিন্তু তার আগের জন্মের সংস্কার ভুলতে পারে নি, অথবা সেই স্নেহের ঋণ, সেবার ঋণ শোধ করতে এসেছে ?

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে যেন, 'ষাট ষাট ! এসব কি ভাবতে বসলুম ! ওর মার বাছা বেঁচে থাক, আমার ছেলে হয়ে আর কাজ নেই । ও আমার সইবে না সে বেশ জানি । অনেকবারই তো দেখলুম ! ষাট ষাট !···তারকের আর এসে কাজ নেই সে তো থাকতে আসবে না, আবারও জ্বালিয়ে চলে যাবে ।···না, একা আছি এই ভাল । আর কারও টানে জড়াতে চাই না ।'

দুর্বল শরীরে মনের চিন্তাটা অর্ধ-স্বগতোক্তি হয়ে বেরিয়ে আসে । বিড়বিড় ক'রে বলে কথাগুলো । তর্কচূড়ামণির স্ত্রী সেই সময়টাতে দেখতে এসেছিলেন, তিনি ভুরু কুঁচকে হেঁট হয়ে কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করেন, 'কী বলছেন ? ও কাকীমা ? কাকে কি বলছেন ?' তারপর বেরিয়ে গিয়ে বদ্যিনাথের মাকে বলেন, 'অ খোকার মা (বৈদ্যনাথ তার মামাতো ভাশুরের নাম), ইদিকে এসো না একবার । এ যে পূর্ণ বিকার বলে মনে হচ্ছে, ভুল বকছে যে !'

'সে কি ! জ্বর তো ছিল না, কৈ, বেশ জ্ঞান, সহজ মানুষ, এই তো আমি কথা বলে এলুম এক্ষুণি—'

বদ্যিনাথের মা ছুটে আসে ।

হেমন্ত হেসে বলে, 'ও কিছু নয় । অ বৌমা, এসো এসো । বসো । বুড়ো মানুষ মা আমরা, মনে মনে কিছু ভাবতে থাকলে সেটা অনেক সময় আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় । তোমার শাশুড়িকে দ্যাখো নি, একা হলেই আপন মনে হাত-পা মুখ নাড়ত, যেন কার সঙ্গে কথা কইছে কি ঝগড়া করছে—? এসব বয়সের দোষ মা । এসো, এসো, বসো এখানে ।'

তর্কচূড়ামণির স্ত্রী ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে বসে বলেন, 'তাই বলুন, সর্বরক্ষে । আমি সত্যিই কিন্তু ভয় পেয়ে গিছলুম !'

'না না ভয় নেই । ভাল আছি আজ । নইলে ভোলাটা আমার বিছানার ধার ছেড়ে নড়েছে ! ভাল আছি দেখেই না—'

কেমন একরকম গর্বমেশানো হাসি ফুটে ওঠে হেমন্তর দন্তহীন মুখে ।

'তা ঠিক', ভদ্রমহিলাও সায় দেন, 'ও সত্যিই আর-জন্মে আপনার কে ছিল মা । নইলে এ বয়সে এমন টান হয় না ।'

আবারও সেই কথা । ষাট ষাট ! বিশ্বনাথ ওকে রক্ষে করুন । মা সংকটা রক্ষা করুন ।

ভোলার সম্বন্ধে বিশুর বিরূপতা ও বিদ্বেষ কিন্তু বেড়েই যায় ক্রমে ক্রমে ।

ছোটবেলায় যেটা অত চিন্তার কারণ ছিল না, বড় হতে সেটাই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে ওঠে। কারণ এখন—অন্য ভাল দিকে না হোক—বুদ্ধি খুলেছে, সে বুদ্ধি বিরূপতা প্রকাশ করার বা আঘাত দেওয়ার সহস্র পথ খুঁজে বার ক'রে দেয়ও। হেমন্তর সামনে অতটা নয়। সামনে নয় বলেই হেমন্ত শাসন করতে পারে না। কারণ সে জানে, বিশু এই সুযোগই খুঁজছে, বলবে—'আমার নামে তোমার কাছে এসে কুট-কুট ক'রে লাগায়, কী রকম শয়তান এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।' তবে চোখ এবং কান খোলা থাকায় হেমন্তর কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না। সে চিন্তিত হয়ে ওঠে—অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না।

বিদ্বেষের কারণ অনেক।

এখন যেটা প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে—বিশুর লেখাপড়া হয় না, ভোলার হয়। ভোলা যে প্রতিবারেই ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় ক্লাসে—তেমন কিছু নয়, কিন্তু সব বিষয়েই মোটামুটি ভাল নম্বর পেয়ে পাস করে। বিশু ক্লাস ফাইভ থেকেই এটা-ওটা নানা বিষয়ে ফেল করছে। 'পাস' যাকে বলে তা করে না, হেডমাস্টারমশাই 'প্রমোটেড' বলে ক্লাসে তুলে দেন।

হেমন্ত বিশুকে বাড়িতে পড়াবার জন্যে মাস্টার রেখেছিল। ভোলা নিজে নিজে এক পাশে বসে লেখাপড়া করত। বড়ই বিসদৃশ দেখায় বলে একদিন মাস্টারমশাইকে বলল, 'ওকেও একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন, যদি দরকার হয়। আমি বরং তার দরুন পাঁচটা টাকা বেশী দোব।'

আজকাল সব জিনিসেরই দাম চড়েছে, প্রাইভেট টিউটরও অল্পে হয় না আর। আগে এখানে নাকি চার-পাঁচ টাকাতে ভাল মাস্টাররা ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতেন। তর্কচূড়ামণির স্ত্রী বলেন, 'বাড়িতে গিয়ে পড়ে এলে এক টাকা, নয় তো বড়জোর দু' টাকা ক'রে রেট ছিল। তা এখন সব দিকেই আগুন লেগেছে, মাস্টারদের মাইনেও বাড়বে বৈকি। আর ওদেরও তো খেতে হবে, সত্যিই—চলে কিসে বলুন!'

হেমন্তও তা বোঝে, সেও অযথা কৃপণতা করে না। ডাক্তার উকিলের বেলাতেও তেমনি—দু-চার টাকার জন্যে সস্তা খুঁজলে আখেরে ঠকতে হয়।

মাস্টার অবশ্য ভালই পেয়েছে, ঐ ইস্কুলেরই শিক্ষক, যত্ন ক'রেই পড়ানোর চেষ্টা করেন। হেমন্তর সামনে বসে পড়াতে হয়—ফাঁকি দেবার সুবিধেও হয় না বিশেষ। কিন্তু তিনিও মানুষ, যে ছাত্রের মাথাতে কিছুই ঢোকে না, তার থেকে যার পেছনে অল্প পরিশ্রম করলেই ভাল ফল হয়—তার দিকে আকৃষ্ট হবেন এ তো স্বাভাবিক। এটাও বিশুর অসহ্য লাগে। একদিন রাগ ক'রে বইখাতা ফেলে উঠে এসে বলে, 'আমাদের আলাদা আলাদা পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। এরকম একসঙ্গে বসলে পড়া হবে না।'

'কেন?' হেমন্ত প্রথমটা অত বুঝতে পারে না।

'মাস্টারটা যা-কিছু ঐ ভোলাকে পড়ায়, আমার বেলায় একেবারে ফাঁকি দেয়, কিচ্ছু বোঝাতে চায় না। ঐ জন্যেই আমার রেজাল্ট্ ভাল হচ্ছে না।'

এবার হেমন্ত জ্বলে ওঠে।

'তোমার রেজাল্ট কেন ভাল হচ্ছে না তা আমি বেশ জানি, সেটা তোমার মাথার

দোষ, বংশের ধারা।…আর মাস্টার নয়—মাস্টারমশাই, পড়ায় নয়—পড়ান। ফের যদি কখনও ঐ রকম অসভ্যর মতো কথা শুনি জুতিয়ে খাল খেঁচে দোব। জানোয়ার কোথাকার! উনি কাকে কতটা পড়ান তা আমি জানি, পাশের ঘর থেকে সব কানে আসে, লক্ষ্য করি। কাজেই সেকথা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই না। তোমার পেছনে মাস্টার রাখাই আমার ভুল হয়েছে—আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না সে তো জানা-কথাই।…কচুর বেটা ঘেঁচু—বড় জোর মান।…যা আমার সামনে থেকে! পড়াশুনোর নামে সম্পর্ক নেই, মাস্টারমশাইয়ের নামে নালিশ করতে এসেছে! দূর হয়ে যা! আপদ বালাই কোথাকার!'

বিরোধ ও বিরূপতা চরমে পেঁাছল যখন ভোলা তৃতীয় হয়ে ক্লাস এইট-এ উঠল এবং বিশু চারটে বিষয়ে ফেল ক'রে সেই ক্লাস এইট-এই রয়ে গেল। এবার আর কোন-মতেই ক্লাসে তুলে দিতে পারলেন না হেডমাস্টারমশাই।

প্রথমটা ভয়েই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল বিশু। ঠাকুমা যতই ভালবাসুক, রাগলে যে সে-সব কোন বিবেচনা থাকে না—এটা এতদিনে ভাল রকমই বুঝেছে সে। হয়ত মার-ধোর দেবে। তার এক জ্যাঠতুতো ভাইকে নাকি বেশ বড় বয়সেই ন্যাংটো ক'রে চাবুক মেরেছিল, বাবার মুখেই শুনেছে। কি করবে কে জানে—কী তার অদৃষ্টে আছে: তাই বলির পাঁঠার মতোই বাড়ি ঢুকেছিল কাঁপতে কাঁপতে।

কিন্তু কে জানে কেন—হেমন্ত সামান্য একটু ধিক্কার দেওয়া ছাড়া এমন কোন বকা-ঝকা কি চেঁচামেচি করল না, মার-ধোর তো নয়ই। আসলে তার মনটা অন্য এক আনন্দে ভরপুর ছিল। ভোলা সম্বন্ধে তার হিসেব ভুল হয় নি, ভোলা তার মান রেখেছে। তাই বিশুর কথা ভাসা-ভাসা ছাড়া ভাবতেই পারে নি, এ ক্ষতি মনে লাগে নি।

সেবার সেই অসুখের পর থেকে হেমন্ত ভোলাকে একটু দূরে দূরেই রাখার চেষ্টা করে। কেন—সেটা মুনিয়া বা ভোলা কেউই বুঝতে পারে না, ভাবে কোথাও কোন অপরাধ ঘটল কিনা। কেমন একটা ভয়ই হয়ে গেছে হেমন্তর, অকল্যাণের ভয়, কেবলই মনে হয় জীবনের এই শেষ পাওনা, এ ভালবাসাও বোধহয় তার অদৃষ্টে সইবে না। বেশী আপন হলেই ভগবান কেড়ে নেবেন। কিন্তু বাইরে যত দূরে ঠেলতে গেছে ততই বেশী ক'রে মনের কাছে এসে পড়েছে ছেলেটা, হেমন্তর মন আরও যেন আঁকড়ে ধরেছে ওকে। সর্বদা একটা চোখ ও একটা কান ওর দিকেই অতন্দ্র থাকে। একটা সম্ভ্রমের ভাব তো আছেই—হেমন্ত দূরে রাখতে চেষ্টা করে দেখে একটা ভয়ও—তৎসত্ত্বেও ভোলা তাকে ভালোবাসে এটা ছাপা থাকে না। ভারী ভদ্র মিষ্ট স্বভাবের ছেলে হয়ে উঠেছে, তেমনি বিনত, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সদা-সচেতন, চাল বিগড়োতে দেয় না। সেই জন্যেই—ভোলা যে বিশুকে হারিয়ে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠে গেছে—এতে একটা অনাবিল অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করছে সে। বিশু ফেল করাতে তার যতটা দুঃখ বা ক্ষোভ হওয়া উচিত—তার কিছুই হয় নি বলতে গেলে।

মুশকিল হল এই—বিশুর এই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বোঝার কথা নয়—বুঝলও না।

এমন কিছু মহাপ্রলয় ঘটল না দেখে তার সাহস বেড়ে গেল। সেদিন আর কিছু বলল না, পরের দিন মুখ গোঁজ ক'রে গিয়ে বলল, 'ও ইস্কুলে আমি আর পড়ব না, আমাকে অন্য ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও।'

বিগত দিনের অননুভূতপূর্ব (এবং বিস্ময়করও—নিজের মনোভাব দেখে আনন্দের সঙ্গেই একটা প্রবল বিস্ময়ও বোধ করছে সে) মাধুর্য-অবগাহনের সুখানুভূতির রেশ তখনও বুঝি একটু ছিল। সেটা যেন একটা কুশ্রী রূঢ় আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল মন ও কণ্ঠ—দুই-ই।

'কেন ?'

'আমি ফেল ক'রে ঐ ক্লাসে থেকে যাব—আর ঐ ভোলাটা টেক্কা মারবে—সে আমি সহ্য করব না। এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়তে পারব না ওর সঙ্গে।' বেশ একটু যেন মেজাজের সঙ্গেই বলল। যেন ওটা এদেরই ষড়যন্ত্র—এই ফেল করাটা।

আর সহ্য হয় না হেমন্তর। এই মধুর প্রভাত, মধুরতর আনন্দ-স্মৃতি নষ্ট ক'রে দেওয়ার জন্যই উষ্মা দেখা দিয়েছিল মনে—সবে এখন স্নান সেরে সংকটমোচনে পুজো দিতে যাবে ভাবছিল—তার ওপর এই অসহনীয় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতায় যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। টেনে একটি চড় কষিয়ে দিল বিশুর গালে।

এর জন্যে বিশু প্রস্তুত ছিল না, বিশেষ এখনও পর্যন্ত যে এই পরিমাণ শক্তি আছে বুড়ির হাতে—সে হিসেবটাও ধরা ছিল না। সে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল। হয়ত পাঁচ আঙুলের ছাপই পড়ে থাকবে গালে। অন্তত শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত পেঁছিল, সেই শব্দ শুনেই ওদিক থেকে বদ্যিনাথের মা ও ছাদ থেকে মুনিয়া ছুটে এল।

'হারামজাদা, শুয়ারকা বাচ্ছা! তুমি আমার কাছে এসেছ মামদোবাজি করতে! আমাকে চেন নি এখনও! আব্দার! ফেল ক'রে মাথা কিনেছ কিনা—তাই যা হুকুম করবে তাই শুনতে হবে আমাদের! ইস্কুল বদলাব কিরে হারামজাদা—ঐ ক্লাসে ঐখানেই পড়তে হবে—যদি আমার এখানে থাকতে হয়। তাতে হয়েছে কি, ফের যদি ফেল করো ঐ ভোলাকে দিয়ে কান ধরিয়ে উঠবোস করাব তবে ছাড়ব।...না হয়, সিধে রাস্তা পড়ে আছে, সটান বেরিয়ে চলে যাও—কোথায় কোন্ বাবা, ক'টা বাপ আছে—তাদের কাছে।...তোর বাবাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি—তা তুই তো ছেলেমানুষ! বাঁদরামির জায়গা পাও নি, ফেল ক'রে কালামুখ নিয়ে বাড়ি এসেছিস, আবার আব্দার—অন্য ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও: কেন, তার আগে মণিকর্ণিকায় গিরে শুয়ে ভর্তি হতে পারো নি! নাৎখোর বেশরম কাঁহিকা।'

আজকাল বয়স হয়ে—এ ধরনের প্রচণ্ড রাগ সহ্য করতে পারে না, দুই চোখ জবা-ফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে, হাত-পা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। বদ্যিনাথের মা ভয় পেয়ে জোর ক'রে বসিয়ে মাথায় মুখে জল থাবড়ে দেয়—মুনিয়া বাতাস করে।

খানিকটা পরে একটু শান্ত হয়ে বদ্যিনাথের মাকে বলে, 'ও যেখানে খুশি যেতে পারে মেয়ে, ওকে বলে দাও। তবে আমার কাছে থাকতে গেলে ওসব আব্দার চলবে না, ঐ ইস্কুলে ঐ ক্লাসেই পড়তে হবে। নইলে বাপের কাছে চলে যাক—মাস্টারমশাইকে বলে দোব, কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আসবে।'

এইটেই সম্ভব নয়—বিশু তা জানে। এই জোরটা তার একেবারেই নেই।

প্রতি মাসেই কাঁদুনিভরা চিঠি আসে ঠাকুমার কাছে। কোন মতেই সংসার চালাতে পারছে না তারা। গোপালকে ইস্কুল ছাড়িয়ে একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বাবা, সেই খবর পেয়ে ঠাকুমা এখান থেকে যে টাকাটা পাঠাত সেটা বন্ধ করেছে। কাঁদুনিটা বোধ হয় আরও সেই জন্যেই।

তবে যে-সব ফিরিস্তি দেয় বাবা—সেগুলোও অবিশ্বাস্য নয়। না খেয়ে খেয়ে নিমাইয়ের শরীর ভেঙে পড়েছে, ডাক্তার বলেছে টনিক খেতে দুধ খেতে—কিন্তু ছেলে-মেয়েদেরই দুধ দিতে পারে না—দু'বেলা ভাত যোগানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে, জল-খাবারের পাট তো ঘুচেই গেছে—নিমাই টনিক দুধ খায় কোথা থেকে? ইস্কুলে ফ্রী পড়ে ছেলেমেয়েরা, তাও বইয়ের অভাবে পড়া বন্ধ হয়ে আছে একরকম। বিশুর নতুন-মার শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেছে, খেটে-খেটে আর ভুগে-ভুগে—নিমাইয়ের এমন সাধ্য নেই যে, একটা বাসনমাজার লোক রাখে। যেদিন শয্যাগত হয়ে পড়ে সেদিন কমলা রান্না করে—নিমাই এসে বাসন মাজে, ইত্যাদি—

শেষ চিঠিতে বিস্তৃত একটা হিসেবও পাঠিয়েছিল আয়-ব্যয়ের। সেই চিঠি পেয়ে ঠাকুমা একশোটা টাকা পাঠিয়েছে আর লিখেছে আশাকে কী ওষুধ খেতে বলেছে ডাক্তার জানালে সে টাকা নয়—এখান থেকে ওষুধই পাঠানোর ব্যবস্থা করবে, ছেলেমেয়েদের বই-খাতাও।

এরপর আর সেখানে গিয়ে সেই অর্ধভুক্ অনাহারক্লিষ্টদের দলে নাম লেখাতে সাহস হয় না, তাই চড় ও অপমান দুই-ই হজম ক'রে নীরবে সামনে থেকে সরে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত। এবং পরের দিন পুরনো বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে সেই পুরনো ক্লাসেই নতুন ছেলেদের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হয়।

॥ ৩৩ ॥

অবশ্য ভোলার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ার দুঃখ এক বছরের বেশি সহ্য করতে হল না বিশুকে। কারণ পরের বছরও বিশু ফেল করল এবং ভোলা সগৌরবে সেকেণ্ড হয়ে ক্লাস নাইন-এ উঠে গেল। এতে বিদ্বেষ আরও বাড়লেও মাথাটা একটু হেঁট করতেই হল। হেমন্ত যথেষ্ট কটূক্তি করল—মর্মভেদী ব্যঙ্গোক্তিও—কিন্তু পড়া ছাড়াল না। তবে বলে দিল, 'এই আর একটা বছর দেখব, বার বার তিনবার—তাতেও যদি না পারো, তাহলে ঐখানেই ইতি মনে রেখো। যা বাপ-দাদা করেছে তাই করবে—বিড়ি খেয়ে ভ্যাগাবেনের মতো ঘুরে বেড়াবে। বিড়ি পাকিয়েই খেতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

বলল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, বছরের শেষ দিকে—বড়দিনের পর থেকে আরও একজন টিউটরও ঠিক করল। শুধু অঙ্কটা দেখবেন তিনি। ঐ ইস্কুলে ই মাস্টার কমলবাবুও। তিনি বললেন, 'মা,বলছেন আমি আসব, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—আপনার কাছ থেকে মাইনে নিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে, কেন না—ওর কিছু উন্নতি করতে পারব সে ভরসা বিশেষ নেই। আসলে ওর মাথাও নেই—মনও নেই আর পড়াতে। বরং এই দোষটাই বেশী, যেটুকু মাথা আছে, সেটুকুও এদিকে দেয় না।'

এই রকম কথা এর আগেও কে বলেছিল না ?

কার সম্বন্ধে যেন—?

খানিকক্ষণ ভাবতে হয়। আজকাল সহজে কিছু যেন মনে পড়ে না।...একটু পরেই স্মরণ হয় অবশ্য। গোরা—গোরার কথাই বলেছিলেন সেখানের মাস্টারমশাই।

হবেই তো। একই ঝাড়ের বাঁশ যে।

গোরারই আপন খুড়তুতো ভাই।

তবে—ব্যতিক্রমও আছে বৈকি! নিমাই লিখেছিল যে, গোপালের নাকি পড়াশুনো ভালই হচ্ছিল আর একটা বছর পড়লেই পাস দিতে পারত। অভাবের জন্যেই ছাড়িয়ে নিতে হল। ওকে পড়াতে গেলে নিচেরগুলোর কিছুই হয় না। তাছাড়া সংসারেরও অভাব। যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সেভাবে আয় বাড়ছে না। মানুষও বেড়েছে ঢের আগের চেয়ে। এ পক্ষেও একটা মেয়ে, দু'টো ছেলে।

এর মধ্যে আনুষঙ্গিক দোষও কিছু কিছু ঢুকেছে বৈকি বিশুর।

বার্ডসাই খেতে শিখেছে (হেমন্তদের প্রথম বয়সে বার্ডসাই বলত, যে বার্ডসাই নিজে কাগজে পাকিয়ে খেতে হত—সেই থেকে পাকানো সিগারেটকেও ওরা বার্ডসাই বলেই জানে)। অভাবে বোধহয় বিড়িও খায়।

গন্ধ পায় হেমন্ত ঠিকই। এখনও কোন ইন্দ্রিয়ই দুর্বল হয় নি, না চোখ না নাক না কান। সেইটেই বুঝতে পারে না ব্যাটারা। ভাবে অন্তদন্তহীন বুড়ি—ও কিছু টের পাচ্ছে না। বুড়োবুড়িদেরও যে এককালে অল্প বয়স ছিল, যৌবনকালটা পার হয়েই এসেছে তারা—সে কথাটা এই আহাম্মুকগুলোর মনে থাকে না।

পয়সা দু-চারটে এদিক-ওদিক থেকে পায়—তা জানে।

আজকাল বাজারে যায় মধ্যে মধ্যে। আগে মুনিয়াই বাজার করত—এখন ভোলা করে। ছুটিছাটায় বিশু নিজে যায় জোর ক'রে। হেমন্ত বোঝে যে, পয়সার দরকার। টিফিন বাবদও দু-চার পয়সা দেয় হেমন্ত। তা ছাড়া আজ পুজোর চাঁদা, কাল কারও ফেয়ারওয়েল—এসব তো আছেই। তা ছাড়াও পায়—বন্ধুবান্ধব জুটেছে অনেকগুলি। সুন্দর দেখতে, তায় বড়লোকের ছেলে (এটা খুব রটেছে—বুড়ির হাতে অনেক পয়সা, তারই পুষ্যি ; এ-ই সব পাবে)—'মোসায়েব' 'ইয়ারবগ্‌গ' জোটাই স্বাভাবিক। তার মধ্যে দু' একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেও আছে—ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে, তারা সকলেই লেখাপড়ায় যত না হোক, বিড়ি-সিগারেটে পরিপক্ক, ভাঙ্ জর্দা এসব তো খেলার জিনিস। তারাও কতক কতক নেশার রসদ যোগায়, কিছু কিছু অন্য সুবিধার পরিবর্তে।

প্রথম প্রথম বকাবকি করত, চড়চাপড়ও দিয়েছিল—তার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'আগ-ন্যাংলা যেমনে যায়, পেছ-ন্যাংলা তেমনে ধায়'—এ তো কথাই আছে। বাপ জ্যাঠা কাকা দাদা—সকলেই পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে বিড়ি তামাক—এমন কি গাঁজা পর্যন্ত খেতে শিখেছে—ও-ই কি আর অন্যরকম হবে ?...মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, অমন সুন্দর মুক্তোর মতো দাঁত—ছোঁড়ার চেহারার অহঙ্কারে তো মাটিতে পা পড়ে না—ঐ দাঁত কালো ঝিঙেবীচির মতো হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। পুরুষই হোক মেয়েই হোক,

দাঁতটা সৌন্দর্যের প্রধান অঙ্গ।

একজন শিক্ষক রেখে যা হয়েছিল—দু'জন রেখেও তার থেকে বেশী হল না।

ঠিক সেই গোরার ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। তিনটে বিষয়ে ফেল, একটায় পরীক্ষাই দেয় নি। সুতরাং এবারও ক্লাস এইট-এর গণ্ডী পার করানো গেল না।

এবার আর হেমন্ত বকাবকি করল না। ভোলা স্কুললিভিং পরীক্ষা দেবে, এই আনন্দেই সে মশগুল। মুশকিল হয়েছে যে, এ আনন্দ প্রকাশ্যে করতে পারে না, ভোলাকে নিয়ে ঠাকুরমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে পারে না। লোকে বলবে বাড়াবাড়ি। বিশুর চোখে আরও বিষ হয়ে যাবে ভোলা—এমনিই যা হিংসে, বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। তা ছাড়াও, নিজেরও আতংক একটা আছে। যে ভাল, যাকে নিয়ে সুখী হতে পারবে—সে ওর কপালে সইবে না। ভোলার পাছে কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্যেই আরও পারে না বেশী আনন্দ-সমারোহ করতে।

পরীক্ষার ফল বেরুনোর দিন বিশু ইস্কুলে যায় নি, ফল কী হয়েছে জানত বলেই বোধ হয়। ভোলার মুখেই শুনল এই অ-ফল এবং বিশুর অনুপস্থিতির কথা—দুই-ই। সবই শুনল, কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই। সে ভাবছিল অন্য কথা, পুজো দেওয়ার কথা। ঠাকুরদেবতা যে সে খুব বিশ্বাস করে তা নয়—তবে যদি থাকেন তাঁরা—তাঁদের প্রসন্ন করলে যদি এদের উপকার হয় তো হোক, এই জন্যেই পুজো দেওয়ার জন্যে এত ব্যস্ততা।

নিজে আর গেল না, টাকা দিয়ে ভোলাকেই পাঠাল—সংকটমোচনে পুজো চড়িয়ে আসতে। নিজে সামনের শুক্রবারে কোন এক ছুতোয় বেরিয়ে সংকটার পুজো দিয়ে আসবে। বৈশাখ মাস, গঙ্গার জল অনেক নেমে গেছে—নৌকো ক'রে পঞ্চগঙ্গার ঘাট পর্যন্ত গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা, সংকটা যাওয়ার সোজা পথে এখন আর যাওয়া যাবে না, পারবে না সে অত সিঁড়ি ভাঙতে। নইলে তো কাকে-বকেও টের পেত না। অনেক চেনা নাওওয়ালা আছে, ঘাটিয়াল পাণ্ডা তো সর্বদা তটস্থ থাকে সে গেলে—বছরে বছরে ছাতা দেয়, মেয়ের বিয়েতে সেদিনও একশো টাকা দিয়েছে, ঐ বাধাটা না থাকলে চান ক'রে পাণ্ডার কাছে ভিজে কাপড়টা রেখে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত—আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারে ফিরে আসত। এখন এই নব্বুই বছরে অত সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না। (নব্বুই হয়েছে? না আরও বেশী? কে জানে এখন অত হিসেব আর মনেও থাকে না) গাড়ি ক'রেই যেতে হবে—চক দিয়ে ঘুরে। তাই যাবে চুপিচুপি—সামনের শুক্রবার।…

বিশু ফিরল সন্ধ্যার পর, ঠাকুমা যখন ঠাকুরঘরে পুজোয় আটক থাকবে—সেই সময়টা হিসেব ক'রে। শুকনো মুখে অন্ধকারে গিয়ে বারান্দায় বসল।

কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা চোখে পড়েছে হেমন্তর—পুজোর আসন থেকেই। অনাহারক্লিষ্ট মুখ নয়। কোথাও কোন বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে ঘুমিয়ে—তবে এসেছে। ফল কী হবে তা তো জানতই, হয়ত বন্ধুদের সঙ্গে সকালেই কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল কিংবা সাঁতরে ওপারে গিয়ে রামনগরের খরমুজ ক্ষেত থেকে খরমুজ চুরি করেছে।

পুজো সেরে এ ঘরে এসে প্রতিদিনের মতো হিসেবের খাতা নিয়ে বসতে দরজার কাছে এসে অপরাধীর মতো দাঁড়াল বিশু।

এই সময়টার জন্যে বহুক্ষণ থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে সে। তিরস্কার গালাগালি তো বটেই—মার-ধোর খাওয়াও বিচিত্র নয়। পরীক্ষা যে আদৌ দিতে যায় নি সেটাই বড় অপরাধ বলে গণ্য হবে—হেমন্তকে সেকথা জানায় নি বলে।

কিন্তু দেখা গেল তেমন কোন তুফান উঠল না।

হেমন্তই মুখ তুলে দেখে প্রথম কথা কইল। বলল, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায় ? বন্ধুর বাড়ি ? দিব্যি তো খেয়ে ঘুমিয়ে এসেছ। তা তার কি দরকার ছিল ? এতটাই করতে পেরেছ যেকালে—সেকালে তুচ্ছ এটুকু চক্ষুলজ্জা কেন ?…এ তো ভালই হল, বাঁচালে আমাকে। মিছিমিছি এক কাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছিল মাস মাস—ন দেবায় ন ধর্মায়, একটা ভবিষ্যতের চিন্তাও ছিল। এ নিজের ভার নিজের হাতে তুলে নিলে—আমি অব্যাহতি পেলুম। আর বয়েসও তো আঠারো পেরিয়ে গেল, সাবালক তো হয়েই গেছ। এখন তো আর কারও কিছু বলবার নেই, গার্জেনকে থোড়াই কেয়ার !…তা তবে, যদি একেবারেই পড়বে না জানো, পড়ার ইচ্ছে নেই—আধেক দিন ইস্কুলে যাও না, পরীক্ষা দাও নি, এ তো ফেল করবারই চেষ্টা—এইটে পষ্টাপষ্টি এবারের গোড়াতেই বলে দিলে হত। আমারও এতগুলো টাকা খরচ হত না—তোমারও এই বুড়ো বয়েসে ক্লাস এইট-এ তিনবার ফেল—এ লজ্জাটাও নিতে হত না।…এটুকু বুদ্ধি থাকা উচিত ছিল অন্তত !'

দরজার কাছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বদ্যিনাথের মা, নিচের কায়েৎ-গিন্নি। না জানি কি প্রলয় কান্ড ঘটে আজ—সেই ভাবনা। ভোলা তো ওকে আসতে দেখেই পালিয়েছে—পাছে তার সামনেই মার-ধোর করে। এই অস্বাভাবিক শান্ত ভঙ্গীতে সকলে অবাক হয়ে গেল। কায়েৎ-গিন্নি আড়ালে বদ্যিনাথের মাকে বললেন, 'এখন হয়েছে কি, এই সবে শুরু। ধাপে ধাপে উঠবে।…আসলে মোক্ষম কোন মার মারবে বলে তৈরি হচ্ছে, ঝড়ের আগে যেমন বাতাস শান্ত হয়ে যায়,—দ্যাখো নি ?…সত্যি বাপু মাগীরও কপাল, কী কান্ডটাই না করলে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে ! কত ভাল ছেলেপিলের দ্যাখো পয়সার অভাবে সুবিধের অভাবে পড়াশুনো হচ্ছে না, আর এর সব থাকতেও, সব পেয়েও হেলায় হারাল। মাগী যে আবার এক রকম—নইলে আমার সেজ নাতিটাকে এনে রাখলে তার লেখাপড়াটা হত। পয়সার অভাবে গোমুখ্যু হয়ে রইল।… দ্যাখো না, ঐ ঝিয়ের ছেলেটা—কোন শৌখীন শখের ঝি তো নয়—বাসনমাজা ঘরমোছা ঝি—তার ছেলে কীরকম চালাক, একমনে নিজের কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে, দিন কিনে নিচ্ছে !'

বদ্যিনাথের মা চুপি-চপি বলে, 'অতি-ভক্ত আদরেই গেল মাসিমা, সত্যি যা বলব। মাওড়া ছেলে, গরিবের ঘরের—বলি নোয়া-কাটা মিস্তিরি ছাড়া তো নয় বাপটা—তাকে একেবারে অমন সিরাজুদ্দৌলার নাতির মতো মানুষ করলে কি হয় ? চাল বিগড়ে গেল যে। ভাবলে কে না কে আমি—লাট-বেলাট, ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা মা, যেন আমি ওরই ঝি, ওই আমাকে মাইনে দেয়।

যার খাচ্ছ সে আমাকে মেয়ে বলে ডাকে—মিথ্যে বলব কেন, কখনও একটা কুবাক্য বলে নি মুখে, তুমি ছাড়া তুই বলতে জানে না—ইনি সে জায়গায়—বলে কি না ঝি ঝিয়ের মতো থাকবে ! ঐ তো ভোলাটা, খোট্টার ঘরের ছেলে হলে কি হবে, দিদি, দিদিজী ছাড়া ডাকে না।...'

বিস্ময়ের সীমা ছিল না বিশুরও।

আর যা-ই হোক, সে এত মোলায়েম অভ্যর্থনা আশা করে নি। তার ফলে সেও তখন দাঁড়িয়ে ঘামছে আর ভাবছে যে, আসল মারটা কখন কীভাবে পড়বে না জানি। এটা যে তারই প্রস্তুতি—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, বলির আগে মোষের গর্দানে মাখন লাগানোর মতো।

কিন্তু হেমন্ত সহজভাবেই আবার হিসেবের খাতায় মন দিয়েছিল। সেটাকে যে এরা চরম আঘাতের উপক্রমণিকা ভাবছে, তাও অত খেয়াল করে নি। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চেয়ে—বিশু তখনও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললে, 'যাও, আর অমন মিথ্যে লজ্জা দেখাতে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ? চান-টান যা করবার সেরে নিয়ে বামুন মেয়েকে অব্যাহতি দাও, সে মানুষটা তোমার জন্যে আর কতক্ষণ বসে থাকবে ?...নাকি, এ বেলাটাও কোন ইয়ারবকশীর বাড়ি থেকে সেরে এসেছ, না সারতে যাবে ?'

বিস্ময়ের ঘোরটা তবু যেন কাটে না বিশুর।

বরং আরও যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে।

আসল কথাটা কি বুঝতে না পেরে তেমনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার হেমন্তর মাথাতে যায় ব্যাপারটা। বলে, 'ভয় নেই, শাসন করার এক্তিয়ার যতদিন ছিল ততদিন যা হয় করেছি। আর কিছুই বলব না। সাবালক স্বাধীন হয়েছ—নিজের পথ নিজে দেখতে শিখেছ—আর কেন কথা কইব আমি ?'

তারপর একটু থেমে বলে, 'আজ এখন চান-খাওয়া ক'রে নাও। কাল আমাকে জানিও, কী করবে। আমার পয়সায় দিব্যি বসে খেয়ে ফুর্তি ক'রে বেড়াবে—অতটা এখানে হবে না। লেখাপড়া যা শিখেছ তাতে দুটো দরজা খোলা আছে—বামুনের ছেলের ন চ বিদ্যা উনুনে ফুঁ—তা তাও তো পারবে না, হয় কোন কারখানায় ঢুকে কুলীর কাজ করা, নয়তো বিড়ির দোকানে গিয়ে বিড়ি পাকাতে শেখা। এর কোন্‌টা করবে, কোন্‌টা পছন্দ—মন ঠিক ক'রে ফ্যালো। যদি কারখানায় ঢুকতে চাও—কালই টিকিট কেটে দিচ্ছি, বাপের কাছে চলে যাও, তোমার দাদাকে যেমন ঢুকিয়ে দিয়েছে তেমনি কোথাও কারও হাতে-পায়ে ধরে ঢুকিয়ে দেবে—নইলে এখানে থেকে যদি কোন কাজ-কারবার করবে ভেবে থাকো, নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছ, নইলে লেখা-পড়া ছাড়লে কিসের ভরসায়, কী ভেবে—তা সেটাও পষ্ট ক'রে খুলে বলো। যা করবে এখনই লেগে যাও। নামকাটা সেপাই হয়ে দাগাষাঁড়ের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, আমার ভুজ্যি ধ্বংস করবে আর নেশা-ভাঙ্‌ করবে, সে হবে না। এখানের নবাবী এবার ঘুচল। খাটো খেতে পাবে, নইলে পথ দেখতে হবে !'

মুখে যা-ই বলুক একটা কিছু কাজ-কারবারের ব্যবস্থায় হেমন্তকেই উদ্যোগী হতে হয়। ভেবে একটা বারও করে। আর একটু আপন হলে সে বাড়ির ব্যবসাটাই বুঝিয়ে দিত—বাড়ি বেচা-কেনা কাশীতে এসে কিছু কিছু করেছে নিজে, তাতে লাভও হয়েছে। একটা বাড়ি ছাড়া সব বাড়িই তাকে কিছু না কিছু দিয়েছে। একটায় কিছু লোকসান গিছল, বাইরেটা দেখে অতটা বুঝতে পারে নি, মেরামত করাতে গিয়ে দেখল বাড়িতে কিছু নেই, রাণী ভবানীরও আগের আমলের বাড়ি, মাটির গাঁথুনি, কড়ি-বরগাগুলো পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য, যেখানে হাত দিতে যায় সেখানটাই ঝরঝর ক'রে খসে পড়ে। যা ভেবেছিল তার থেকে ঢের বেশী খরচ করতে হল সে বাড়ির পিছনে।

তবে সে আর কত, মোট যা লাভ হয়েছে, লোকসান তার তুলনায় কিছুই নয়। বিশ-ভাগের এক ভাগ হবে বড় জোর। এখন করতে পারলে আরও লাভ। দিন দিন বাড়ি জমির দাম বাড়ছে হু-হু ক'রে। কিন্তু এখন আর নিজে পারে না অত ঘোরাঘুরি অত পরিশ্রম করতে। ক্রমশই স্থাণু হয়ে পড়ছে। তাছাড়া বেশী বকাবকি চেঁচামেচি করলে, কি বেশী হিসেবের কাজ দেখলে—আজকাল শরীর বড় খারাপ লাগে।

যদি কিছুটাও মানুষ হত বিশু। বোকা হোক—কাজে আগ্রহ আছে, উন্নতির ইচ্ছা আছে, খাটতে পারবে—এরকম জানলেও নিজে হাতে ক'রে কাজ শেখাত। কিন্তু এদের বংশকে সে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছে, সত্য-পথে থেকে বিশ্বস্তভাবে কাজ করা—যথার্থ উন্নতির চেষ্টা করা—এদের রক্তে নেই। তাছাড়া একে তো দেখছেই, মিথ্যা কথা বলা ফাঁকি দেওয়া আজ থেকে শুরু হয় নি, এতদিনে পাকা হয়ে গেছে। আড্ডা দেওয়াটাই চায়, আর চায় বড়মানুষী দেখাতে। আরাম আর আয়েসের ওপর প্রচণ্ড লোভ। হাতে টাকা পেলেই উড়িয়ে দেবে, বদ-খেয়ালের কিছু বাকী থাকবে না। আখেরের কথা ভাবার মতো বুদ্ধি ওকে ভগবান দেন নি!

না, বিশু তার মন থেকে গেছে। এখন কোনমতে ভালয়-ভালয় ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই বাঁচে। ওর বাপের কাছ থেকে ওকে যেচে নিয়েছিল—ছোট থেকে কাছে রাখলে মানুষ করতে পারবে এই আশায়। আক্ষরিকভাবে সে প্রতিশ্রুতি না দিলেও সেই রকম আশ্বাসই একটা ছিল কথার ভাবে। এখন সেই রুগ্ন, প্রায়-অসমর্থ লোকটার কাছে মিস্ত্রি কি কুলীর চাকরির জন্যে ফেরত পাঠাতে মন চায় না, ভাবলেও মাথা কাটা যায়।

অনেক ভেবে শেষপর্যন্ত অল্প পুঁজির একটা কারবার ঠিক করে। অনেকদিন ধরেই এদিকে নজর ছিল তার, অনেকবার ভেবেছে নিজেই করবে। সাইকেল রিক্শার ব্যবসা। কাজ এমন কিছু নয়, কতটা টাকা বার করতে পারবে বা করবে সেইমতো পাঁচ সাত বা দশখানা রিক্শা কেনা। তারপর দৈনিক ভাড়া বন্দোবস্ত ক'রে চালকদের কাছে ছেড়ে দেওয়া, সন্ধ্যায় ও ভোরে সেই পয়সা বুঝে নেওয়া—এবং গাড়ির ছোটখাটো মেরামত দরকার থাকলে সেদিকে নজর রাখা, ভারী রকমের জখম হল কিনা কোথাও সেদিকেও হুঁশ রাখা। চালকের দোষে—তার অসাবধানতায় জখম হলে তার কাছ থেকে খরচা আদায় করতে হবে।

সব রকম মেরামতিই তার করার কথা—তবে সেটা প্রায় দুঃসাধ্য, সে খরচ আদায় করা। দৈনিক ভাড়াই সহজে দিতে চায় না, নানা অজুহাত দেখায়, ডুবই মারে এক-একসময়—গাড়িসুদ্ধ। সেই জন্যেই এমন একটি লোক দরকার, যে ঘোরাঘুরি করতে পারবে, ধরে-পাকড়ে ভাড়া আদায় করবে—দরকার হলে কিছু গালিগালাজ ও গায়ের জোরও প্রয়োগ করতে পারবে। সেই জন্যেই হেমন্ত এতকাল এ ব্যবসা করতে পারে নি। এখন তাই—বিশুর জন্যে কী করা যায় ভাবতে গিয়ে আগেই এইটের কথা মনে পড়ল। হিসেব-টিসেবগুলো সে নিজেই দেখতে পারবে—বাইরের ঘোরাঘুরির কাজটা যদি ওর দ্বারা অন্তত হয়।

বিশুকে ডেকে আগে প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে বলে। বলে, 'এই শেষ, এইটুকু ক'রে দিতে পারি। চারখানা রিক্‌শা কিনে দোব, ঠিক মতো চালাতে পারো হেসেখেলে রোজ আট-দশটাকা হাতে পাবে। এখানে কোন খরচ নেই তোমার—কিছু কিছু জমাতে পারো, ঐ টাকা থেকেই আরও রিক্‌শা কিনতে পারবে, আর আয়ও বাড়বে। আর যদি উড়িয়ে দিতে চাও তাও দিতে পারো। তবে সে নিজের আখের ভবিষ্যৎই উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমার কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য পাবে না—সেই বুঝে কাজ করবে, আমায় তো জানোই, যে কথা সেই কাজ!'

প্রস্তাবটা যে খুব ভাল লাগল না বিশুর, তা সেই ম্লান আলোতেও বুঝতে অসুবিধা হল না হেমন্তর। সে নিজেকে একটা বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী বলেই জেনে এসেছে এতদিন, বুড়ি মলেই সে যথেচ্ছ আমোদ ফুর্তি করবে—সেই স্বপ্নই দেখেছে। সেই জন্যেই আরও, লেখাপড়া ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করতে মন চায় নি—অধীর আগ্রহে সেই সোনালী ভবিষ্যতের ছবি দেখেছে, প্রতীক্ষা করেছে ভাগ্যনির্ধারিত সেই দিনটির। দু'হাতে সরিয়ে দিতে চেয়েছে বর্তমানের সময়টাকে—ঐ বুড়ির অকারণ দীর্ঘ পরমায়ুকে।

(একথা—এ হিসেবটা একবারও মাথায় যায় নি তার যে, বুড়ির পরমায়ু এত দীর্ঘ না হলে, সাধারণ হিসেবে সে মারা গেলে বিশুর জন্মের আগেই চলে যেত, এ সম্ভাবনাও থাকত না।)

সেই মানসিক উচ্চ স্বর্গ থেকে এ কী শোচনীয় অধঃপতন! ঐ 'ছোটলোক' রিক্‌শাওলাদের (তার মতে) পিছু পিছু ঘুরে ওদের সঙ্গে ছোটলোকমি কাজিয়া ক'রে গলায় গামছা দিয়ে এক-এক বেলার জন্যে একটাকা-পাঁচসিকে আদায় করা। এই ছিল তার অদৃষ্টে!

এ ছাড়াও কথা ছিল, সে খবরটা হেমন্ত জানত না। এসম্বন্ধে তার কোন ধারণাও নেই—কারণ জিনিসটা তার হৃদোর মধ্যে পড়ে না—তার চেনা ও জানা জগতের বাইরে এটা।

বিশু খুবই সুশ্রী—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি বা সে সম্বন্ধে কারও কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে—বিশু নিজে অন্তত সে দলের মধ্যে পড়ে না। তার ধারণা—বদ্যিনাথের মা, নিচের কায়েৎগিন্নি, একতলার ভাড়াটেরা—এবাড়ি ওবাড়ি আশপাশের বাড়িরও—প্রভৃতি তার পরিচিত জগতের অধিবাসীরা এবং তার মাথা-

খাওয়ার জন্যে যারা নিরন্তর ব্যগ্র সেই বন্ধুর দল—সে ধারণা অবিরত বাড়িয়েই দিয়ে গেছে অকারণ ওর রূপের স্তুতিতে—তার মতো সুন্দর চেহারা পৃথিবীতে কারও নেই। এবং সেই কারণেই—বন্ধুরা তো বলেইছে, তার নিজেরও বিশ্বাস একবার বোম্বাই কি কলকাতায় পেঁছিতে পারলে ওখানের ফিল্ম ডিরেক্টররা তাকে লুফে নেবে। তবে সবদিক ভাবতে গেলে বোম্বাই-ই ভাল—পয়সা আছে সেখানে, কলকাতায় সব 'মক্ষীচুষের দল'।

কিন্তু যে তথ্যটা জানত না, যে কথাটা তাকে কেউ বলে নি, সেটা হচ্ছে এই—তার সৌন্দর্যটা মেয়েলি ধরনের, মার মতোই দেখতে হয়েছে সে, রঙটা হয়ত আরও চড়া, এ চেহারাতে গোঁফ কামিয়ে যাত্রার দলে কি য়্যামেচার থিয়েটারের দলে নায়িকা সাজা যায়—ক্যামেরার সামনে 'হিরো' সাজা কঠিন। বোধহয় কোন ডিরেক্টারই তা নেবে না। বিশেষ গলাটাও মেয়েলি ধরনের। সেই জন্যেই বন্ধুমহলে তার এত সমাদর—বিকল্প হিসেবেই—এটাও সে জানে না সম্ভবত।

এই কথাটা জানত না বলেই আরও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল বুড়ির সরে পড়বার—মৃত্যুর। হাতে টাকা পেলেই বোম্বে যাবে, সেখানে কোন বড় হোটেলে উঠবে, ডিরেক্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যদি তেমন হয়—তারা খুব উৎসাহ না দেখায়—বিশু কারও খোশামোদ করবে না, নিজেই টাকা দিয়ে ছবি তোলাবে একটা, তাতে হিরো সেজে ওদের দেখিয়ে দেবে নিজের দাম।

এই যার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—তাকে চারখানা রিক্শা দিয়ে নিজের জীবিকার চেষ্টা করতে বলা—মর্মান্তিক প্রস্তাব বৈকি, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

তবে—এটুকুও এতদিনে বেশ চিনেছে সে হেমন্তকে—এখন রাজী হলে হয়ত ভবিষ্যতে সবদিক বজায় থাকবে, এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত থাকলে—বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা যখন বলছে না, বরং বলছে যে, 'তোমার এক পয়সা খরচ নেই,' তার মানে থাকা-খাওয়াটা এ বাড়িতে হবে, বলেই দিচ্ছে—বুড়ির হঠাৎ 'ভালমন্দ' কিছু হলে এ সবই সে পেতে পারবে—অনায়াসে ও সহজেই। জীবন কল্পনা-মতোই উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু, রাজী না হলে, হয়ত—এই মুহূর্তেই লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

আইনকানুনের জ্ঞান অবশ্যই তার নেই, এসব বাত্লে দেবার লোকও তার আশপাশে কেউ নেই। কোন উইল ক'রে না গেলে সব যে সে পেতে পারে না—সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। তার বিশ্বাস সে-ই যখন একমাত্র এখানে 'পুষ্যিপুত্তুরে'র মতো প্রতিপালিত হচ্ছে—এরা সবাই সেকথা জানে—তখন বুড়ি চোখ বুজলেই এই কুবেরের ঐশ্বর্য তার হাতে এসে পড়বে—যথেচ্ছ খরচ করার কোন বাধা থাকবে না।

অগত্যা ঢোক গিলে, শুকনো মুখেই বলল, 'তা—তা বেশ তো। তুমি যা ভাল বোঝ।...হ্যাঁ, তা আর পারব না কেন, সকাল-সন্ধ্যেয় একটু ওদের সঙ্গে খেচাখেচি করা—এই তো!' যেন নিজেকেই বোঝায় সে।

হেমন্ত আর কিছু বলে না। এ যে অনেকখানি আশাভঙ্গ—তা সেও কিছু বোঝে। এর চেয়ে বেশী উৎসাহ সে আশাও করে নি।

তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। রিক্‌শা পেতে, চালু অবস্থায় পেতে মাস দুই দেরি হয়, লাইসেন্স পেতে আরও কিছু দিন। তাও হেমন্তর এখানেও এতদিনে অনেক চেনাশুনো হয়ে গিয়েছিল—অনেকেই মান্য করে—তার তদ্বিরেই তবু কিছুটা তাড়াতাড়ি হল। ইতিমধ্যে এই সময়টা, সে হেমন্তর প্রস্তাবে রাজী হয়েছে—এরই মূল্যস্বরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে আড্ডা দিয়ে, সিনেমা দেখে ও সিগারেট খেয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু অবশেষে একদা সে দুর্দিনও এসে গেল। রিক্‌শা এল, রিক্‌শাওলাও এল। তাদের সঙ্গে দরদস্তুর, শর্ত ঠিক করা—হেমন্তই সব ক'রে দিলে, কে সকালে নেবে, কে রাত্রে—তাও ঠিক হল। খাতা ক'রে দিলে, কেমন ক'রে হিসেব রাখবে প্রত্যহের আদায়—রিক্‌শাওলাদের নামে নামে আলাদা ক'রে,—সব দেখিয়ে দিলে। আরও শিখিয়ে দিলে ভাড়া আদায় না হলে এদিক-ওদিক ওদের সন্ধানে ছুটোছুটি করার কোন দরকার নেই, দেঁড়শিকে পুল অর্থাৎ বিশ্বনাথের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই সব রিক্‌শাওলাকে ধরতে পারবে। যে যেখানেই পালাক, ওখানে আসতেই হবে—কখনও না কখনও!...

মাসখানেক চালালও বিশু কোনমতে, চোখ-কান বুজে—ওষুধ-গেলার মতো ক'রে। এর মধ্যেই অনেক বাকী পড়ল। 'বেটারা মহা শয়তান, কিছুতে ভাড়া দিতে চায় না। তবে আমিও দেখে নোব—এখন ক'দিন নতুন নতুন—' ইত্যাদি বলে কোনমতে এড়িয়ে এড়িয়ে যেতে লাগল। সত্যি-সত্যিই রিক্‌শাচালকদের পিছু পিছু ঘুরে তাদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি ক'রে টাকা আদায় করার জন্যে কি ভগবান তাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন?

শেষে হেমন্তও যখন আদায়ের জন্যে চাপ দিতে লাগল—হঠাৎ একদিন আর রাত্রে বাড়ি ফিরল না বিশু। তখন সন্দেহ হতে খোঁজ ক'রে দেখা গেল ট্রাঙ্কের মধ্য থেকে ছ'শ টাকা উধাও হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরের দিন সকালে জানা গেল, এছাড়াও—হাড়ার বাগের বাড়ির ভাড়াটের কাছ থেকে হেমন্তর নাম করে পঞ্চাশ টাকা ধার ক'রে এনেছে। একশো টাকাই চেয়েছিল, ভদ্রলোকের হাতে ছিল না বলে দিতে পারে নি। সেই বাকী পঞ্চাশ টাকা নিয়ে দিতে আসাতেই জিনিসটা ধরা পড়ে গেল।

ভোলা ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ ক'রে আনল। বিশু একা যায় নি, ত্রিপুরাভৈরবীতে ওর যে হিন্দুস্থানী বন্ধু থাকে কমলেশ্বর বলে—সেও গেছে। কমলেশ্বরও বাড়ি থেকে মার গহনা নিয়ে পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিয়ে প্রায় হাজার টাকার মতো নিয়ে গেছে। কমলেশ্বরের বাবার ধারণা দু'জনেই বোম্বে গেছে, ঐদিকেই তাঁর ছেলের ঝোঁক, তা তিনি জানেন। তবে সে যে এত নির্বোধ হবে ঠিক—কত তাও তিনি বুঝিয়ে বলেছেন, বেশির ভাগই ছেলে এমনি 'স্টার' হবার আশায় পালিয়ে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে—দুর্দশার শেষ থাকে না, ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হয় কীভাবে—তাও উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, জানাশুনোর মধ্যে থেকে নাম ক'রে ক'রে, তা সত্ত্বেও সে যে এমন বেকুফি করবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

যা হোক্, তিনিও ছাড়ার লোক নন, তিনি আজই বোম্বে রওনা হয়ে যাচ্ছেন। বিশুর কথা তিনি বলতে পারবেন না, তবে কমলেশের কান পাকড়ে ধরে আনবেন

ঠিকই। খুঁজে বার করবেন যেমন ক'রেই হোক। 'ফিকির না করো।' বার বার বলেন।

সব জানিয়ে ভোলা বলল, 'আমি কি একবার বোম্বে যাব তাহলে বড়মা?'

'পাগল! ও চেষ্টাই করিস নি। আমি বেঁচেছি। কী ক'রে ঘাড় থেকে নামাব তা-ই তো ভাবছিলুম। গেছে না মুক্তি দিয়েছে। ধরে এনে কি করব? তাকে দিয়ে কোন্ কাজ হবে?…ঐখানেই কোন হোটেলে চায়ের কাপ ধোবে, কি কারও বাড়ি চাকরের কাজ করবে, ও-ই তার ভাল।…আমার খালি নিমেকে একটা চিঠি লিখতে হবে। সে দুয়ো দেবে—সেই যা ভাবনা। মাথা হেঁট হল। নইলে আর কোন দুঃখ নেই আমার। এই ভাল হয়েছে।'

॥ ৩৪ ॥

স্কুললিভিং পরীক্ষাতেও—হেমন্ত অত বোঝে না, বলে এণ্ট্রেন্স—ভোলা পাস ক'রে বেরিয়ে গেল? স্কলারশিপ পেলে না, তবে প্রথম বিভাগেই পাস করল। হেমন্ত বলল, 'কলেজে যা, ফর্ম নিয়ে আয়।'

ভোলা কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখায় না, চুপ ক'রে থাকে।

'কিরে, চুপ ক'রে আছিস কেন? কলেজে ভর্তি হবি না?'

ভোলা একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলে, 'ইচ্ছে নেই খুব।'

'সে কি! ভালভাবে পাস করলি, কলেজে পড়বি না? ছেলেদের—ছেলে কেন আজ-কাল মেয়েদেরও তো খুব শখ শুনেছি, একখানা খাতা নিয়ে কলেজ যাবে। তোর ইচ্ছে হয় না? কেন রে, ইচ্ছে নেই কেন?' সস্নেহে উদ্বেগের সঙ্গে শেষের প্রশ্নটা করে হেমন্ত।

'পড়তে খুব যে অসাধ তা নয়। তবে কি জানো, ভাইটা মানুষ হল না, মার যে দুঃখ সেই দুঃখই রয়ে গেল। এভাবে আর কতদিন টানবে মা? তোমার পয়সাতেই বা কত নবাবী করব? সত্যি কথা বলতে কি, তুমিই বা ক'দিন আর? তার চেয়ে আমি যা-হোক কিছু কাজ-কর্ম করছি, রোজগারপাতি করছি, মা একটু বিশ্রাম পাচ্ছে এইটে দেখে যেতে পারো—সে-ই ভাল না?…আর তা ছাড়া, তুমিই তো বলো, যে যেমন সে তেমন থাকাই ভাল! আমি যে ঘরের ছেলে—আমার হয়ত একটা পাস করাই উচিত হল না, চাল বিগড়ে যাবে কিনা কে জানে!'

হেমন্ত চুপ ক'রে ভাবল একটু। তারপর বলল, 'তা বটে! ভেবেছিলুম, ভালভাবে বি-এ এম-এ পাস ক'রে উকিল হবি কি ডাক্তার—। তা সেও ঠিক, আমার আওতায় থেকে আমার আশা-মতো মানুষ হলে টিকবে না! আমার যে কপাল।'

আর একটু চুপ ক'রে থেকে, আরও আস্তে বলে, 'ঐ জন্যেই তো এ বাড়িতে এনে রাখি না। আমার আপন কেউ হবে না, হলেও সইবে না—এ-ই বিধাতার লিখন। মিছিমিছি সে চেষ্টা আর করি না তাই। তা তাই কর, তুই তোর মতো যা হোক কিছু রোজগারপাতির চেষ্টা দেখ।…সত্যিই তো, তোর মা আর কতকাল এমন পরের দোরে ঝাঁট দিয়ে চালাবে? তাছাড়া—তুই কলেজে পড়বি, কে কোথায় বলবে তোর মা লোকের

বাড়ি কাজ করে, কে হয়ত ঠাট্টা-তামাশা করবে তাই নিয়ে—শুনেছি ছড়া কাটায় এসব ক্ষেত্রে—মিছিমিছি একটা আঘাত। ছোটবেলা থেকে ঐ ইস্কুলে পড়ছিলি—কেউ আর নতুন ক'রে কিছু ভাবে নি তোর সম্বন্ধে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখানে আবার—! তা তোর দাদাটা কোথায়? তার বাবার মতো হয়েছে বুঝি? মদ-ভাঙ্ খায় খুব?'

'তা খায়। কিছু যদি ভাল কাজ-কর্ম করত সেই সঙ্গে তো বুঝতুম। কী যে করে তাও ঠিক জানি না। ভয় হয়, গুণ্ডামি ক'রে বেড়ায় কিনা!···তবে আমার মা লোকের বাড়ি কাজ করে এটা জানতে পারলে কে কি বলবে—সে আমি পরোয়া করি না। ইস্কুলেও তো জানত, বিশুর দয়ায় কি আর জানতে কারও বাকী ছিল, না কেউ তা নিয়ে টিটকিরি দেয় নি? ও আমি গ্রাহ্যও করি নি কোন দিন। বলেছি, হ্যাঁ তাই। তার পর? আমার সঙ্গে মিশতে ঘেন্না হয়, মিশো না। এসব ব্যাপারে কি জানো বড়মা, লজ্জা পাচ্ছি কি ঢাকতে চেষ্টা করছি এটা বুঝলে লোকে আরও রগড় পেয়ে যায়, আরও বেশী লাঞ্ছনা শুরু করে।'

হেমন্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভোলার দিকে। চমৎকার ছেলে, ছেলের মতো ছেলে। দেখতেও তেমনি। এরই মধ্যে তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছে? এই বুকের ছাতি, কোমরের কাছ সরু—পুরুষের মতোই চেহারা। খাটেও খুব, মাকে সাহায্য করে যতটা সময় পায়—কে জানে হয়ত ব্যায়ামও করে কিছু কিছু। হাতের, কাঁধের গঠন দেখলে তাই মনে হয় অন্তত। একেই বলে সুন্দর। রঙ ফরসা নয়, মুখ-চোখও খুব একটা যে সাকারা তাও না—চোখটা আর একটু বড় হলে মুখখানা সুশ্রী দেখাত হয়ত—তবু দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় যেন! পুরুষ মানুষের এমনি চেহারা হওয়াই উচিত। নেশা করতে শেখে নি। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো সাজানো, ধপধপ করছে সাদা—আর তেমনি, এখনও এমন ছেলেমানুষের মতো হাসে, ভারি মিষ্টি লাগে।

দেখতে অত বড়টা হলে কি হবে—ছেলেমানুষই আছে এখনও, সব দিক দিয়েই। বাতের শরীর হয়ে গেছে, পুজোর আসনে বসে জপ-আহ্নিক ক'রে ওঠার সময় হেমন্তকে অনেক চেষ্টা ক'রে বেঁকে-চুরে উঠতে হয়। এক-একদিন ভোলা সামনে থাকলে টপ ক'রে কোলে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়, নয়তো পা টেনে কোমর ডলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সক্রিয় ক'রে তোলে। হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে হেমন্ত, 'এই, তোর কী কাপড় তার ঠিক নেই, রাস্তা বেড়ানো নিশ্চয়—আমাকে ছুঁয়ে দিলি!'

'বেশ করেছি। তোমার তো পুজো হয়ে গেছে। আর শুদ্ধ কাপড় পরে আছ তো!'

সত্যিই আপন মনে করে হয়ত—নইলে এমন জোর খাটাতে পারত না।

এখনও, সেই ছেলেবেলার মতো হেমন্তর এতটুকু অসুখ করলে আর বিছানার ধার ছেড়ে নড়ে না, হাঁ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ইস্কুলে পর্যন্ত যায় না। 'তোমার মাথা টিপে দোব—বড়মা?' 'বড়মা—হাওয়া করব?' 'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বড়মা?' 'কিছু খাবে না—খেতে ইচ্ছে করছে না?' অবিরাম এই ধরনের প্রশ্ন করে বসে বসে। এই সময়গুলোয় আনন্দে চোখে জল এসে যায় হেমন্তর; কে জানে, তারক বেঁচে থাকলে, তার আপন নাতি হলেও এমন করত কিনা!

[সঙ্গে সঙ্গে একটা অবান্তর কথাও মনে হয়। তারকের ছেলেও এত দিনে বুড়ো হয়ে যেত! তার নাতিই এত বড় হত হয়ত।]

শেষ—গত শ্রাবণ মাসের জ্বরটাতে একেবারেই উত্থানশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল—এই ছেলেটাই কোলে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে নর্দমায় বসিয়েছে, শৌচ পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছে। খুব স্বাভাবিক-ভাবেই করিয়েছে। এতটুকু ঘেন্না করে নি, এতটুকু ইতস্ততঃ করে নি। নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেছে। বদ্যিনাথের মা কি নিজের মাকেও আসতে দেয় নি। কেবলই মনে হয়েছে হেমন্তর তখন—এত সুখ ওর কপালে কি সইবে? বাচ্ছাটার না কিছু খারাপ হয়!...

একদৃষ্টে চেয়েই আছে ভোলার দিকে—মন চলে গেছে কোন সুদূরে—সাধারণ চলচ্চিত্রের চেয়ে ঢের দ্রুত, গত প্রায় এক শতাব্দীর ছবি, ভাগ্যের কাছে বার বার মার খাওয়ার ইতিহাস সরে সরে যাচ্ছে মনের সামনে দিয়ে—হঠাৎ ভোলার হা হা হাসিতে চমক ভাঙল, 'অমন অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে কি ভাবছো বলো তো? চোখটা আছে কিন্তু মনটা নেই—তা চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি!'

'ভাবছি?...না রে ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি যে, বিশেটা গিয়ে তো ঐ রিক্শার পিণ্ডি আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে, ফেলতেও পারছি না গিলতেও পারছি না—এই অবস্থা, ঐটের ভার বরং তুই নে না, এমন তো কিছু কাজ নয়। সকাল-সন্ধ্যে একটু হারামজাদা-গুলোকে সামলানো, তোর সাইকেল আছে—সেটা খুব শক্ত হবে না। টাকাপয়সা আদায়, গাড়িগুলো আছে না ভেঙেচুরে রেখেছে সেইটে দেখা, আর রোজ হিসেবটা রাখা। ওর যা আয় হবে, সবই তোর, ও আমি তোকে দানই করলুম, আরও দু'টো কিনে দোব বরং—দু'টো বা চারটে—সংসার চালিয়েও কিছু বাঁচবে, সময়ও থাকবে, তুই কলেজে ভর্তি হয়ে যা—'

'তোমার খুব ইচ্ছে—বড়মা? আমি কলেজে পড়ি?' বিচিত্র উৎসুক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে ভোলা।

'না, তা নয়। তুমি কলেজে পড়ে আর আমার কি চোদ্দপুরুষের মাথা কিনবে! তবে—পড়াশুনো হচ্ছে, কত ছেলের পিছনে তো কত চেষ্টা ক'রেও হয় না, মিছিমিছি বন্ধ করবি কেন? এই আর কি, এই জন্যে বলা। একটা তো মাস্টারও লাগে নি তোর—এমনভাবে পাস করলি। মাস্টার রাখতে চাইলুম, তখন বারণ করলি—রাখলে জলপানি পেতে পারতিস।'

'তা যদি তুমি বলো তো ভর্তি হব। রিক্শাও দেখব, তবে দান করতে হবে না। অর্ধেক তুমি নিও, অর্ধেক আমাকে দিও। আমিই বা বিনিপয়সায় খাটব কেন, তুমিই বা শুধু শুধু অতগুলো টাকার কারবার ছাড়বে কেন? তাছাড়া—বিশু যখন ফিরবে—ফিরতে একদিন হবেই—'

'উঁহুঁ, সে হবে না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলে হেমন্ত, 'তাকে আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে দোব না, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। সে পাট চুকে গেছে। এখানেই আসুক কি যমের বাড়িই যাক—আমার তা দেখার দরকার নেই।—আমি ওকে চিনি বিলক্ষণই, বিশ্বাস করি নি কোনদিনই, ও ঝাড়ের কাউকেই আমার বিশ্বাস নেই।...তাই

গাড়ি কিনেছি আমার নামে, লাইসেন্সও আমার। তুই নিলে তোকে লিখেপড়ে দোব।'

'সে যাক। এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। দ্যাখো আমিই বা কি দাঁড়াই—কী মূর্তি ধারণ করি! আমাকেই বা এত কিসের বিশ্বাস?'

'তা বটে!' হাসে হেমন্ত। বলে, 'তবে পরে কি মূর্তি দাঁড়াবে তার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। যা পেয়েছি তাই আমার ঢের। তোকে থিতু ক'রে যাওয়াই আমার শেষ কাজ।'

আরও একটি বিয়োগান্ত ঘটনার আঘাত অদৃষ্টে ছিল হেমন্তর।

নিমাই।

নিমাই যে এমন হঠাৎ যাবে—চাকরি করতে করতেই—তা কেউ ভাবে নি। রিটায়ার করার সময় হয়ে গেছে কবেই, ওপর-ওলাদের হাতে-পায়ে ধরে একস্‌টেনশ্যন নিয়েছিল। এই ক'টা মাস গেলে কী খাবে ছেলেপুলে, এই কথাই লিখত সে বার বার। গোপাল আর কতই বা আনতে পারবে। বিশুটাও যদি এই সময় মাথা দিয়ে দাঁড়াত সংসারে। কোথায় যে গেল হতভাগাটা!

এর প্রচ্ছন্ন অভিযোগটা বোধহয় হেমন্তর ওপরই। শুধু যে মানুষ করতে পারে নি তা-ই নয়, এমন যে নষ্ট হয়ে গেল, হারিয়ে গেল, সে জন্যেও সে-ই দায়ী।

ওদের দিক থেকে বলারও কিছু ছিল। ভোলা ঠিকই ধরেছিল—বছর দুয়েক বাদে বিশু ফিরেছিল এখানে। কঙ্কালসার চেহারা, অমন গোলাপী রঙ পুড়ে তামাটে দাঁড়িয়েছে, রুক্ষ চুল তাও বেশির ভাগই যেন উঠে গেছে, গাল চড়িয়ে রগ সুদ্ধ ভেতরে ঢোকা—মনে হল যেন, কোন রাক্ষসের পুরে গিয়ে পড়েছিল, ভেতরের রক্তমজ্জা সব তারা শুষে নিয়েছে। ছেঁড়া ময়লা কাপড়জামা পরে দীনভাবেই এসে ঢুকতে গিয়েছিল—মাথা হেঁট ক'রে, কিন্তু হেমন্ত ঢুকতে দেয় নি, দরজার কাছ থেকেই একরকম দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বদ্যিনাথের মা বলতে গিয়েছিল, 'তা বাপু একটু না হয় চান ক'রে দু'মুঠো খেয়েই যেত, এত বেলায় এইভাবে চলে যাবে—গেরস্তর একটা কল্যেণ-অকল্যেণ তো আছে—'

হেমন্ত জবাব দিয়ে দিয়েছিল, 'আমি কল্যেণ-অকল্যেণের বার হয়ে আছি অনেকদিন বদ্যিনাথের মা, আমার আর কিছু বাকী নেই—মরা ছাড়া।...চান ক'রে খেয়ে একবার গেড়ে বসলে তুমি তাড়াতে পারতে? এমনিতেই চোর ছিল, চুরি ক'রে বেরিয়ে গেছে—চুরি জুচ্চুরি দুই-ই—এতদিন কোথায় আরও কি শিক্ষা ক'রে ডাকাত খুনে হয়ে এসেছে কিনা জানো তুমি?...তোমার আর কি, শুকনো সোহাগ দেখিয়ে খালাস, যদি গলা টিপে খুন ক'রে রেখে যথাসর্বস্ব নিয়ে যায় তো আমারই প্রাণটাই যাবে। না, ও দায়িত্ব নিতে পারব না, যার শখ হয়েছে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে!'

সে শখ মেটাতে কারও সাহসে কুলোয় নি—বলা বাহুল্য। সেদিন বেরিয়েই যেতে হয়েছিল বিশুকে। বদ্যিনাথের মার তো আলাদা বাসাই নেই, সে নিয়ে যাবে কোথায়?

তবে এদের কারও আশ্রয় দেবার উপায় না থাকলেও সেদিনের মতো দুর্গতিটা

নিবারিত হয়েছিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে সেই অবস্থাতেই গিয়ে সোনারপুরার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল—ইচ্ছে ক'রেই খুব সম্ভব—ভোলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! ভোলা আগেই মান-সরোবরের বাড়িতে গিয়ে পড়ে সব শুনেছে, সে কতকটা ওর খোঁজেই বেরিয়েছিল। ভোলাই টেনে নিয়ে গিয়ে একটা হোটেলে খাইয়েছে, সেখানেই জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছে সব কথা। বোম্বেতে ফিল্ম-স্টার তো নয়ই—অন্য কোন জীবিকারও কোন ব্যবস্থা হয় নি, কমলেশ্বরের বাবা তাকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশু আসে নি। তখনও তার মোহভঙ্গ পুরোপুরি হয় নি। আরও যত দিন পেরেছে বোম্বেতেই থেকেছে, শেষে এক চায়ের দোকানে ক'দিন কাজ করে, সেখান থেকে একজনের বাড়িতে বাসন-মাজা কয়লা-ভাঙার কাজ—তারপর এক সার্কাসওলার দলে ভিড়ে যায়।

খেলা শেখাবার নাম ক'রে নিলেও, সেখানেও বেশির ভাগ সময়েই ম্যানেজারের তাঁবুতে চাকরের কাজ করতে হত—মাতাল হয়ে মারধোরও করত, এক-একদিন সারা রাত জেগে দৈহিক সেবা করতে হত। অনেক রকমের সেবা। তবু উপায় ছিল না বলেই ছাড়ে নি, পাঁচজনের খোশামুদি ক'রে কিছু কিছু খেলাও শিখেছিল। এইভাবে তাদের সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে কোচিনে এসে রক্তআমাশা ধরে—তাতেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। কোম্পানীর অন্যত্র বায়না ছিল ওকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে তারা চলে গেল। মাইনে কিছু ঠিক হয় নি, কথা ছিল কাজ শিখলে মাইনে ধার্য হবে। তারা টাকা-কড়ি কিছুই দিয়ে যায় নি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে একরকম ভিক্ষে করতে করতে এত দূরে এসেছে। হাতে এমন একটিও পয়সা নেই যে, এক কাপ চা কি একটা বিড়ি খায়।

ভোলা হোটেল থেকে নিয়ে গিয়ে জামা-প্যাণ্ট কিনে দিয়েছে, গেঞ্জি জুতো—মায় গামছা পর্যন্ত। নিজের বাড়িতে রাখতেও চেয়েছিল, বিশু রাজী হয় নি। বলেছে, 'যেখানে রাজত্ব করেছি সেখানে ভিখিরি সেজে থাকতে পারব না। আর বামুনের ছেলে ঝিয়ের বাড়ি থাকব কি : তুই আমাকে কলকাতায় যাবার গাড়ি-ভাড়াটা ধার দে, আমি এসব পরে কড়ায়-ক্রান্তিতে শোধ দোব। মনে করিস নি আমাকে ভিক্ষে দিচ্ছিস!'

আরও হয়ত কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন আর বলে নি। টাকাটা হাতে পেয়ে বলেছে, 'টাকা হলে দোব ঠিক! তুই জুচ্চুরি ক'রে ঠাকমাকে তেলিয়ে আমার রিক্শাগুলো নিয়েছিস, আরও কত আদায় করছিস মাথায় হাত বুলিয়ে কে জানে! আমারই হক্কের পয়সা—তা হলেও এভাবে নোব না। টাকা ফেরত পাবি জেনে রাখিস। আমরা ভিক্ষে দিতেই শিখেছি—নিতে নয়।'

ভোলা এই ইতর আঘাতের বদলে কোন প্রত্যাঘাত করে নি, হেসেছে শুধু—ওর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি। বলেছে, 'থাক না ভাই, এই তো ক মিনিটের দেখা, আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। মিছিমিছি এইটুকুর জন্যে এসব কথা তুলে লাভ কি? রিক্শা তোমারও নয়, আমিও নিই নি। বড়মার রিক্শা তাঁরই আছে—প্রত্যহ তাঁকে হিসেব বুঝিয়ে দিই। তিনিই আমাকে যেটুকু পারিশ্রমিক দেবার সেইটুকুই দেন। তার বেশী আমার দরকারও নেই। এও আমি চাই নি, তিনিই দেন।'

তার জবাবে মুখ ভেঙিয়ে বলেছে বিশু, 'থাক না চাঁদু, ও সব কাকে শেখাচ্ছ! আমি

সব জানি। ছোটবেলা থেকে বুড়ির খোশামোদ ক'রে ক'রে আর আমার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে কাজ গুছনো হয়েছে। তোমার শয়তানী আমার জানতে বাকী নেই।'

বলতে বলতেই একটা রিক্‌শায় উঠে পড়েছে, 'সিকরোল চলো' বলে।

কিন্তু কলকাতায় যায় নি। হেমন্তর নির্দেশমতো ওর জবানীতে আশাকে একটা চিঠি দিয়েছিল ভোলা। তার উত্তরে ওরা উৎকণ্ঠিত হয়ে জানিয়েছিল যে, বিশু আসেও নি, কোন খবরও দেয় নি। তার কোন খবরই এতাবৎ পাওয়া যায় নি কোথাও থেকে।

খবর পেয়েছে অনেক দিন পরে। বিশুরই আর এক বন্ধু গৌতম এলাহাবাদ গিছল বোনের শ্বশুরবাড়ি, সেখানে দেখেছে বিশুকে, কোন এক হোটেলের হয়ে স্টেশনে ট্রেন 'য়্যাটেন্ড' করে—প্যাসেঞ্জার পেলে ধরে নিয়ে যায়। তারা শুধু থাকতে আর খেতে দেয়, লোক নিয়ে যেতে পারলে বিলের ওপর একটা কমিশন, তাও নামমাত্র।

তার কিছু দিন পরে অন্য একজন কে এলাহাবাদ গিছল—ভোলার চেনা লোক, ভোলা তাকে খবর নিতে বলেছিল। সে প্রথমে স্টেশনেই খুঁজেছে। সেখানে না দেখতে পেয়ে পরে এক সময়ে হোটেলেও খোঁজ করেছে। হোটেলের ম্যানেজার কিছু বলেন নি, এক 'বয়' খবরটা দিয়েছে। কি একটা সার্কাসের দল এসেছিল এলাহাবাদে—ওর সে আগেকার দল নয়—তবে আগে সার্কাসের দলে কাজ করেছে শুনে তারা নিতে রাজী হয়েছে—তাদেরও নাকি লোক দরকার ছিল—তাদের সঙ্গেই চলে গেছে রাজস্থানের দিকে।

তার পর থেকে এরাও আর কোন খবর পায় নি বিশুর।

প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য অভিযোগ যা-ই হোক, হেমন্ত গ্রাহ্য করে না।

এখানেও যে মেয়েমহলে অনুযোগ একটু না উঠেছিল তা নয়, 'কি কাঠ প্রাণ বাবা, সেই এতটুকুনটি থেকে মানুষ করলে—ছেলের মতো, কত আদর-যত্ন-আদিখ্যেতা ত্যাখন, অমনি এক কথায় চিত্তির এত চটে গেল যে, পথের ঘেয়ো কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিলে! আজকালকার ছেলেপিলেরা অমন কত কি করছে, মা-বাপের বাক্স ভেঙে পালানো—এ তো আকছার। তাই বলে কে আর অমন ক'রে তাড়াচ্ছে!···নিজের ছেলে হলে কি আর ও-ই পারত!···অমন ছেলেটা রাজপুত্তুরের মতো—জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল হয়ত।'

এসব কানে আসে বৈকি। এই ধরনের নানা কথা।

ভোলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দোব নাকি বড়মা?'

'কেন, পয়সা খুব সস্তা হয়েছে—না কামড়াচ্ছে? বিজ্ঞাপন দিয়ে কি করবি? ফিরে এলে রাখবি কোথায়? আমি এখানে আর ঢুকতে দোব না এটা নিশ্চিত জেনো। শ্বশুরের বংশের নেশা আমার ছুটে গেছে। ওদের হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি—সব এক ক্ষুরে মাথা কামানো। ওরই মধ্যে দৈত্যকুলের পেল্লাদ যা নিমেই বরং—চোর-জোচ্চোর নয়, এটা বলব হক কথা। হয়ত সবটা পাবার লোভেই ছোট ছোট লোভ সামলে ছিল, তা সেটুকু ধৈর্যও তো ওদের গুষ্টির আর কারও দেখলুম না।···না, ও আমার মন থেকে চলে গেছে। ঢের করেছি, আর না। লোকের আর কি—লোকে অনেক কথা বলে। যার নিজের বাজে সে-ই জানে কতটা বাজল। অপরের ওপর দিয়ে আহা-উহু করা খুব সোজা।···তুই সেই কথামালার গল্প পড়িস নি—লোকের কথা শুনতে গিয়ে সেই বাপ-বেটার কি হয়েছিল?—সেই যারা গাধা নিয়ে হাটে যাচ্ছিল বিক্রী করতে? কথামালাই

তো? কে জানে ঠিক মনে নেই কোন্ বই, তবে পড়ানো হয়—পড়ে সবাই। এ গল্পগুলো ছোটবেলায় পড়ানো হয় জীবনে কাজে লাগবে বলে—অমনি অমনি নয়। সংসারে ঢুকলে পদে পদে ঠেকতে হবে, তখন ঐ সব দৃষ্টান্তের কথা ভাবিস—রেহাইয়ের পথ পেয়ে যাবি।'

আর কিছু করা হয় নি। অন্য কোন খোঁজ-খবরের ব্যবস্থা!

তারপরই এই খবর।

কিছুদিন ধরেই ভুগছিল নিমাই। আজ আমাশা, কাল বাত—বাতই বেশী। বাতে শয্যাগতও থেকেছে ক'দিন ধরে। মধ্যে একবার নাকি নিমোনিয়াও হয়ে গেছে—অর্থাৎ শরীর ভেঙে এসেছিল। কিন্তু ঘরে বসে বিশ্রাম করার উপায় ছিল না, ও পক্ষের দু'টি এ পক্ষেও তিনটি ছেলেমেয়ে। কমলা মাথায় মাথায়—বিয়ের বয়স পেরিয়েই গেছে বলতে গেলে, পরের মেয়েটিও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে অনেক দিন। লেখাপড়া শেখাতে পারে না। হেমন্ত কিছুদিন সাহায্য করেছিল, মধ্যে বন্ধ ক'রে দেয়—এখন আবার কিছু কিছু দিচ্ছে। সে টাকা ছোট দু'টোর পড়ার খরচেই বেরিয়ে যায়।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন আপিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সবাই ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল, ডাক্তারও ডাকা হল তখুনি—দেখা গেল প্রচণ্ড ব্লাড প্রেসার। ওর যে এত প্রেসার আছে, এত প্রেসার হতে পারে তাই কেউ ভাবে নি। আজকাল তো খেতেই পায় না বলতে গেলে, রোগা চিমড়ে চেহারা, তার হাই প্রেসার কি ক'রে হয় কে বুঝবে! ইদানীং মাঝে মাঝে বলত, 'বিকেলের দিকে বড় মাথার যন্ত্রণা হয়—বোধহয় চশমাটা পাল্টাতে হবে—কি যে করি, কোন মাসেই তো আর হাতে কিছু থাকছে না।' কিন্তু প্রেসারের কথা কারও মনে হয় নি। বরং এর ঠিক আগে দু' দিন মাথা ঘুরেছে, আপিসে সবাই বলেছে, 'লো প্রেসার, ভাল খাওয়া-দাওয়া করো। ডিম মাংস খাও।'

ডাক্তার দেখিয়ে জ্ঞান হয়েছে, ওষুধ ইঞ্জেকশ্যন পড়েছে—আপিস থেকে আজকাল চিকিৎসার খরচ পাওয়া যায় কিন্তু সে পরে হিসেব ক'রে নিতে হয়, এখন কে করে? তবু আপিসের বন্ধুরা, এই বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা—কিছু কিছু চাঁদা তুলে সব ব্যবস্থাই করেছে; সবাই ভাবল এ যাত্রা সামলে গেল।

কিন্তু হঠাৎ দিন তিনেক পরে একদিন ভোরবেলা বলেছে, 'বুকটায় বড্ড ব্যথা করছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো!' আশা ভয় পেয়ে তখনই গোপালকে ইশারা করেছে, গোপালও খালি-পায়ে খালি-গায়ে—যেমন ছিল তেমনি দৌড়েছে ডাক্তার ডাকতে—কিন্তু ডাক্তার এসে পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

আশা আগে একটা টেলিগ্রাম করেছিল, পরের দিন চিঠি লিখেছে। লিখেছে বোধহয় কমলা—আশার জবানীতে, আশার হাতের লেখা নয়, এ চিঠি তার পক্ষে লেখা সম্ভবও নয়, এত তাড়াতাড়ি—কিন্তু শেষ যে করুণ ক'টি ছত্র, সে আশারই আঁকাবাঁকা লেখা, এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে, অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করে হেমন্ত।

লিখেছে, 'একবারটি আসুন মা, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি। এ বিপদে কেহ

একটা উপদেশ কি পরামর্শ দিবে এমন লোক নাই। এই সব অপোগণ্ডর দল আমার মুখ চাহিয়া আছে, প্রতি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমি কাহার কাছে যাই, কি করি? এমন অসহায় কখনও বোধ করি নাই, মাথার উপর এমন একজনও নাই যে, এ বিপদে বুক দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। পাড়ার লোক আপিসের লোক অনেক করিতেছে—তবে পরে আর কত করিতে পারে, তাদেরও তো অবস্থা ভাল না। বাপের বাড়ির দিকে এমন কেহ নাই যে, আসিতে পারে—বা আমি গিয়া দাঁড়াই। এ বিপদে ত্যাগ করিবেন না মা, টাকা নয় শুধু, আপনি না আসিলে চলিবে না। একবারটি আসুন, দোহাই আপনার।'

চিঠি পড়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল হেমন্ত।

অপরাহ্ণ তখনও ম্লান হয় নি—বেলা দু'টো কি আড়াইটে হবে, গঙ্গাবক্ষ জনহীন, নৌকাহীন। নিচে ঘাটের দিকেও বিশেষ কেউ নেই। ওপারে রামনগরের চড়া প্রখর সূর্যালোকে ঝকঝক করছে, সেদিকে চেয়ে থাকলে একটু পরে চোখে লাগে। বাতাস বিশেষ নেই, সামান্য এক এক ঝলক যা আসছে মধ্যে মধ্যে—গরম।

কিন্তু এসব কিছুই দেখতে পেল না হেমন্ত।

না, দৃষ্টিশক্তি এখনও তেমন ক্ষীণ হয় নি, দূরের জিনিস স্পষ্ট না হোক, ভালই দেখে। এমনিই, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে বলেই কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সব যেন লেপে-মুছে একাকার হয়ে গেছে, বাইরের জগৎ তো বটেই—মনের মধ্যে স্মৃতিগুলোও বুঝি সেই সঙ্গে।

দুঃখ নিমাইয়ের জন্যে তত নয়—তবে কিছুটা হচ্ছে ঠিকই। শ্বশুর বংশের যাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের মধ্যে নিমাই-ই তবু কিছুটা মানুষের মতো। ভুল করেছে বোকা বলে—খুব একটা অসৎ বা কর্মবিমুখ নয়। তবু—দুঃখ আজ বেশী হচ্ছে আশাটার জন্যেই। এ যে কি অসহায় অবস্থা মেয়েদের, কি সাংঘাতিক বিপদ তা হেমন্ত বেশ জানে।

আশার চিঠিটা পড়ে, আজ এত কাল পরে—এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ কি আরও একটু বেশী পেরিয়ে এসে নিজের এই দিনের কথা মনে হচ্ছে। ঠিক এমনি অসহায় বোধ হয়েছিল। না, আরও বেশী, তার চারিদিকে নির্মম শত্রুই ছিল সেদিন, মিত্র একটিও নয়—আশাকে তবু পাড়া-প্রতিবেশীরা সাহায্য করছে, আপিসের বন্ধুরাও। অন্তত মরণ টেঁকে কেউ বসে নেই। তাছাড়া—আশার সে বয়সও নয়, যে বয়সে হেমন্ত এমনি পথে বসেছিল।

তা হোক, তবু নিজের অবস্থা দিয়েই অবস্থা বুঝেছে। আর সেই জন্যেই দীর্ঘ দিনের ক্ষয়ে-যাওয়া শুকনো চোখ দু'টো আবার ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে বার বার, কিছুতেই যেন চোখের জল সামলানো যাচ্ছে না।

ভোলা চুপ ক'রে পিছনে বসে ছিল। চিঠিটা সে পড়েছে। অথবা বলা উচিত সে-ই পড়েছে, পড়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় বড়মার মনের ভাব কি হচ্ছে তা তার বুঝতে বাকী নেই। তেমনি এও জানে যে, এখন বাজে কথা বলার কি বাজে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করাও—শুধু বৃথা নয়, এ মানুষের কাছে বিরক্তিকর।...

অনেকক্ষণ সময় লাগে নিজেকে সামালে নিতে, তারপর চুপি চুপি প্রায় বুজে-আসা গলায় বলে, 'তাহলে তো যেতে হয় রে একবার, কি বলিস ?'

'হ্যাঁ, চলো তাই যাই। তাড়াতাড়িই তো যাওয়া দরকার তাহলে, দশ দিন তো অশৌচ তোমাদের—তার মধ্যে চার দিন তো কেটেই গেল। টিকিট নিয়েই হবে মুশকিল। দেখি আমার এক বন্ধুর দাদা আছেন, বাবুলালদা—তাঁকে ধরে যদি পাই—'

'চলো মানে, তুই যাবি নাকি ?' যেন চমকে ওঠে হেমন্ত, শুধু বিস্ময়ে নয়—আনন্দের আঘাতেও খানিকটা। নতুন একটা আশার আনন্দ।

'ওমা, তা তোমাকে কি একলা ছেড়ে দোব নাকি ? এই অবস্থায় ?'

'না, তা নয়, মানে ভাবছিলুম যে তুই যদি তুলে দিতিস এখান থেকে, একটা রাত্তিরের তো মামলা—ওখানে গোপালকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলে সে নামিয়ে নিত—'

'সে হবে না। তোমাকে একলা আমি যেতে দোব না। এক রাত্তিরও অনেক সময়। তাছাড়া সে ঠিক সময়ে তার পাবে কিনা, এসে খুঁজে পাবে কি না।—ওকথা বাদ দাও।'

'তবে চ'। তুই গেলে তো ভালই হয়। আমি কি খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলুম ? তা নয়। তুই সঙ্গে থাকলে তো নিশ্চিন্ত, তেমন কিছু হলে তুই-ই আমার মুখে জল দিতে পারবি। তবে, এখানের কথাও ভাবছি। বদ্যিনাথের মাও নেই। যা দিনকাল। কে দেখবে—!'

'সে তো বাড়িওলারাই আছেন। ওঁদের তো একপাল ছেলে—কেউ এসে শুতে পারবে না ? না হয় আমার মা-ই থাকবে ক'টা দিন। এমনি দিনের বেলা তো থাকবেই—'

'তবে তাই হোক, তুই এখনই চলে যা—টিকিটের চেষ্টা দেখ গে। দুখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করবি—'

'দু'খানা কেন—তোমার একটা করি, আমি থার্ড ক্লাসে দিব্যি চলে যাব।'

'উঁহু। তা হবে না। গেলে একসঙ্গেই যাব। এক গাড়িতে যদি না রইলি তাহলে আর সঙ্গে থেকে কি লাভ হল ?'

হা-হা ক'রে হেসে ওঠে ভোলা, 'বদলা নিচ্ছ বুঝি ? কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে আমি শুতে পারব ? সইবে ?'

'খুব সইবে। বিধাতা তোর কপালে অনেক দিয়েছেন—আমি বলে যাচ্ছি। আমার দয়া নিতে হবে না তোকে, তুই নিজেই নিজের উন্নতির পথ ক'রে নিতে পারবি। দেখে নিস একদিন বুড়ির কথা সত্যি হয় কিনা।'

ভোলা হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেয় একবার।

॥ ৩৫ ॥

হেমন্ত আগে ভেবেছিল শ্রাদ্ধশান্তি চুকলেই কাশীতে ফিরে যাবে—কিন্তু তা হল না। আশা এত কান্নাকাটি করতে লাগল, তাদের এমনই অসহায় অবস্থা যে, সে দেখে আর ফেলে যেতে পারল না। ভোলাকেই পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, 'আমি চিঠি লিখলে কি

তার করলে এসে নিয়ে যাস।'

ভোলার অবশ্য বড়মাকে এভাবে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরাও মাত্র দেড়খানা ঘরে বাস করে, এতগুলি প্রাণী—এর মধ্যে অপরিচিত ও আপাত-পরিচয়ে-হিন্দুস্থানী জোয়ান ছেলেকে কোথায় রাখে, কোথায় শুতে দেয়। যে দু'দিন ছিল, বাড়িওলাদের বলে ছাদে শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল আশা, কিন্তু সে খোলা ছাদ, মশারি টাঙাবার কোন উপায় নেই, দু'রাতই মশার কামড়ে চোখে-পাতায করতে পারে নি বেচারী। তবু সে নিজে থেকে যেতে চায় নি। হেমন্তই বুঝিয়ে বলে ফেরত পাঠাল।

এদের যে অবস্থায় ফেলে গেছে নিমাই তা অবর্ণনীয়। মাইনে—মাগ্গীভাতা সব জড়িয়ে মাস গেলে গোপাল পায় মাত্র একশো ত্রিশটি টাকা। সর্বদিন ওভারটাইম হয় না—হলে আর কিছু বেশি। এ-ই এদের একমাত্র ভরসা। আর কোথাও কিছু নেই—পোস্ট-আপিসে বোধহয় গোটা চল্লিশ টাকা পড়ে আছে, সেও নিমাইয়ের নামে, সে এখন বিশ হাত জল। গহনা বলতে আশার হাতে ব্রোঞ্জের ওপর সোনা-বাঁধানো তিনগাছা ক'রে চুড়ি, চারগাছা ক'রেই ছিল—অতবড় মেয়ে কমলা শুধু হাতে ঘুরে বেড়ায় বলে তাকে একগাছা ক'রে পরিয়ে দিয়েছে।···ভাল খবরের মধ্যে এ পক্ষের বড়ছেলে আশিস এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে—যতদূর যা মনে হয়—অন্য পরীক্ষার ফলাফল দেখে—পাসও করবে। তারপর দু'টি ছেলেমেয়ে—মেয়েটি ক্লাস এইট, ছেলেটি সেভেন্-এ পড়ে।

আশিসের আর পড়া হবে না—নিমাইয়ের বন্ধুরা আশ্বাস দিয়েছে যে—তারা 'সায়েব'কে বলে রেখেছে (এখনও আপিসের ওপরওলা মাত্রেই সাহেব)—নিমাই বেচারী পেন্সন্ গ্র্যাচুইটি কিছুই পেল না, এতকাল কাজ ক'রে গেল—সেই হিসেবেই ইউনিয়নের অনুমতি নিয়ে তিনি ওকে একটা চাকরি দেবেন, আপাতত অস্থায়ী—তারপর লোক-দেখানো একটা পরীক্ষায় বসিয়ে পাকা ক'রে দেবেন। এ সুযোগ কোনমতেই ছাড়া উচিত নয়, জিনিসটা পুরনো হয়ে গেলে এর কোন গুরুত্বই থাকবে না ; নিমাইয়ের কথা ভুলেই যাবে হয়ত—আজ যারা এত চেষ্টা করছে তাদেরও উৎসাহ জুড়িয়ে যাবে, এ সাহেবও হয়ত বদলি হয়ে যাবেন। ইউনিয়নের কে নতুন সেক্রেটারী হবে—সেও তখন বাগড়া দিতে পারে, আজকের সহানুভূতির আবেগ তাকে স্পর্শ করবে কেন ? সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্।

এদিকে কমলার একটা সম্বন্ধ অনেকদূর এগিয়ে আছে, মেয়ে সুশ্রী দেখে তারা অল্পেই রাজী হয়েছে। ছেলেটি গোপালের কারখানাতেই কাজ করে, অনেক আগে ঢুকেছে—একটা পাস—মোটামুটি শ' তিনেকের মতো পায়, আগড়পাড়ায় নিজেদের বাড়ি আছে। পাঁচশো টাকা নগদ, হার-চুড়ি—তা চুড়ি ব্রোঞ্জের ওপর হলেও চলবে—বাকী যা সাধারণ দান, বরের আংটি বোতাম ইত্যাদি। ঘড়ি দিতে হবে না, বর নতুন ঘড়ি কিনেছে সম্প্রতি। তাহলেও—সব সুদ্ধ, ঘরখরচা ধরে হাজার তিনেকের কম নয়। যার হাতে এক পয়সা নেই, সে এ সম্বন্ধ করছিল কী ভরসায় কে জানে—হয়ত হেমন্তরই ভরসায়। সবাই মিলে গিয়ে পায়ে পড়বে ভেবে রেখেছিল।

এখন সব শুনে হেমন্ত আশাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কি বুঝছিস, ছেলে ভাল ?'

আশা মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিল, 'যতদূর শুনেছি—খুবই ভাল। খোকার সঙ্গে এসেও ছিল দু'একবার, কথাবার্তা তো মন্দ নয়। দেখতেও মোটামুটি ভালই, কমলার সঙ্গে বেমানান হবে না।'

'তবে দ্যাখ—বিয়ের দিন ঠিক কর।'

'এখনই—?' চমকে ওঠে আশা, 'কালাশৌচ চলছে তো, তা ছাড়া—এই মনের অবস্থা—'

'আমার সাহায্য যদি পেতে হয় তাহলে আর দেরি করা চলবে না।' স্পষ্টভাষণই করতে হয় হেমন্তকে। আশা এত ভেঙে পড়েছে—দেহে ও মনে দুই-ই যে, এখন এধরনের কথা বলতে কষ্টই হয়—তবু, ওরও আর সময় নেই। একটু থেমে তাই আবার বলে, 'আমার বয়েসের অবস্থাটা ভেবেছিস ? তাছাড়া—মন খারাপ, চুপ ক'রে বসে থাকলে আরও খারাপ লাগবে, আরও মুষড়ে পড়বি। আমার কথাটা ভাব দিকি, যেমন আমাপা পরমায়ু দিয়েছেন বিধাতা—তেমনি শোকও যুগিয়ে রেখেছেন ছালা বোঝাই ক'রে। কতগুলো শোক পেলুম বল দিকি জীবনে! ও কিছু না, কাজ করতে হবে, ছেলে-মেয়েদের মানুষ ক'রে সংসার দাঁড় করাতে হবে—এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন ?··· এদের ওপরই তো ভরসা। তোরও একটা গলার কাঁটা রয়েছে—সেটা ওলাবার কথাও তো ভাবতে হবে, তার বে-র কথা। এটাকে পার না করলে চলবে কেন ? লেখাপড়া শিখলেও না হয় চাকরি-বাকরি ক'রে খেতে পারত। এমনি দুম্বো মেয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখলে···শেষে হয়ত একটা রিকশাওলার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। না না, এসব কোন কাজের কথা নয়, তুই পুরুত ডাক। আমি যতদূর জানি বে-র ব্যাপারেই কালাশৌচ কাটিয়ে নেওয়া যায়—আগাম সপিণ্ডিকরণ করিয়ে। তা যদি হয়, সামনের কেষ্টপক্ষে একটা একাদশী দেখে সেরে নিক গোপাল। বসে বসে কাঁদলে চলবে না এখন, কান্না তো পড়েই রইল জীবনভোর।'

হেমন্তর মনের জোর ওদের ঠেলে নিয়ে যায়! সক্রিয় হতে বাধ্য হয় ওরা। এইটুকু জায়গার মধ্যে থাকা, পাঁচটা ভাড়াটে, ক্যালব্যাল করছে ছেলেমেয়েরা খুবই কষ্টকর, কিন্তু এদের একটা কিছু সুব্যবস্থা না ক'রে যেতেও পারে না, আরও আশার মুখ চেয়ে। আশাটা যেন কী পেয়ে বসেছে ওকে। ছোট্ট মেয়েরা অপরের কাছে মার খেলে বা ভয় পেলে যেমনভাবে মাকে জড়িয়ে ধরে—তেমনিভাবে যেন আঁকড়ে ধরেছে ওকে।···যাকে বিয়ে দিয়ে এনেছিল, সে কখনও এমনভাবে ওর ওপর নির্ভর করতে পারল না—যে কখনও দেখে নি ওকে, বোধহয় হাতে গোনা যায় সব সুদ্ধ ক'দিনের পরিচয়—সে-ই আপন ক'রে নিল অনায়াসে। একেই বোধহয় বলে প্রারব্ধ—পূর্ব-জন্মের সংস্কার।

যত তাড়াতাড়িই করুক—কমলার বিয়ে চুকতে প্রায় তিনমাস গড়িয়ে গেল। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ ছাড়া বরপক্ষ রাজী হল না। তাদের বড় ছেলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবে না, বৈশাখ ছেলের জন্মমাস।

অগত্যা থাকতে হল হেমন্তকেও।

খুব খারাপও লাগে না বোধহয়।

আশা খুবই যত্ন করে। জীবনে এমন সেবা কখনও পায় নি সে। এমনি যতই অসুবিধে হোক—এই লোভেই আরও থেকে যায়। রোজ রাত্রে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে পা টিপে ঘুম পাড়ায়। পাখা নেই বাড়িতে, রাত্রে উঠে উঠে গায়ে হাত দিয়ে দেখে ঘাম হচ্ছে কিনা, তা বুঝে বসে বাতাস করে হাতপাখা দিয়ে।

অবশ্য একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই এই তিনমাস।

ব্যাপারগতিক দেখে কী করতে হবে আগেই মনস্থির ক'রে ফেলেছিল। আশিস তখনও আপিসে ঢোকে নি—যে-সব পুরনো দালাল কাজ-কারবার করত ওর সঙ্গে—ঠিকানা দিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছিল তাদের খোঁজে। দেখা গেল, সবাই মরে গেছে—এক যাদুবাবু ছাড়া। যাদুবাবু যখন প্রথম ওর সঙ্গে কাজ করে, একটা জমি বিক্রী করিয়ে দেয়—তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ, এখন ষাট পেরিয়ে গেছে। তবু হেমন্তর নাম করতেই এসেছে সে এতখানি পথ পাতিপুকুর পর্যন্ত।

কার জন্যে কী জন্যে তখনও বলে নি কাউকে। যাদুগোপালকেও বলল না। শুধু বলল, 'কাশীপুর অঞ্চলে কি দমদমে—যদি খাস কাশীপুরে না পাওয়া যায়—একটা ছোট বাড়ি দেখে দিতে পারেন? এমনভাবে বাড়ি হবে—হয় ওপরে থেকে নিচে ভাড়া দেওয়া যাবে, নয়তো—একতলা হলে—একদিকটা অন্তত তিনখানা ঘর দরকার। দেখে দিতে পারেন?'

'টাকা? কত টাকার মধ্যে হবে—কিছু বাঁধাবাঁধি আছে?' যাদুগোপাল জিজ্ঞাসা করে।

'যতটা কমে হয়। এ তো সোজা কথা। যে কিনবে সে চাইবে কম দিতে, যে বেচবে সে চাইবে যতটা বেশী পাই—এই তো? তবে তিরিশের মধ্যে হলেই ভাল হয়।'

'উঁহু! হবে না। এখন অত্যাধিক দাম জমিবাড়ির, সেদিন আর নেই। দর দিন দিন হু-হু ক'রে বাড়ছে।'

'নেই সে আমিও জানি। নইলে তিরিশ বলব কেন, দশই তো বলতুম। তা দেখুন কতয় পান। তবে কোন গোলমাল না থাকে, কিংবা একশো বছরের পুরনো না হয়।'

দু' একটা খবর নিয়ে এল যাদুগোপাল দু-চার দিনের মধ্যেই—কিন্তু কোনটা জুৎ লাগল না। তার ভাষাতে 'অত্যাধিক' দাম, 'অত্যান্ত' বেশী। যেটা দাম কম—একটু খোঁজ নিতেই দেখা গেল ওয়ারিশন নিয়ে গোলমাল।

শেষে, দিন পনেরো পরে একদিন এল লাফাতে লাফাতে।

'পাওয়া গেছে মা, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন। বামুনের গরু একেবারে যাকে বলে। কাশীপুরে হল না, এ সিঁথির মধ্যেই—একটু ভেতর দিকে, মানে বড় রাস্তা থেকে খানিকটা যেতে হয়—তবে বেশ পাড়াগাঁয়ের মতো। রিক্‌শা যায় ভেতরে, বাড়ির দোর পর্যন্ত, সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধে নেই। পনেরো বছরের বাড়ি, মাল মেটিরিয়েল ফার্স্ট কেলাস, বলেছে ভাল ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে দেখাতে পারেন, যদি খারাপ বলে তার খরচা আমি দোব। একতলা বাড়ি, দোতলার ভিত—চাই কি হালকা ক'রে তেতলাও উঠবে। খালি জমি পড়ে আছে সেও পেরায় ধরুন দেড়কাঠার মতো, দু'টো নারকোল গাছও আজ্যোছে ভদ্দরলোক। বাড়িওলা থাকে দু'খানা ঘর নিয়ে, একটা বেশ বড়—

মাঝে পার্টিশান দিলে দু'টো মাঝারি ঘর বেরোবে, তাছাড়া রান্নাভাঁড়ার আছে, ন্যাসবেস্টশের চাল, সেও স্বচ্ছন্দে রান্নাঘরে ভাঁড়ার রেখে একটা শোয়ার ঘর ক'রে নেওয়া যায়। রাস্তার দিকে এক ফালি বারান্দাও আছে, সেও ধরুন ঘিরে নিতে পারেন। যেদিক দিয়ে যাবেন—ফার্স্ট কেলাস একেবারে !'

'আর ? আমি যা চেয়েছিলুম ?' হেমন্ত প্রশ্ন করে।

'আছে, সেও আছে। বলছি। সবদিক না দেখে কি আর ঊর্ধ্বশ্বাসে এইছি ? দেড়টা ট্যাকাই খরচা হয়ে গেল এখেনে আসতে।···একদিকে একখানা ঘর, একটা ছোট রান্নার জায়গা, আলাদা কল-পাইখানা নিয়ে একঘর ভাড়াটে আছে, ষাট টাকা ভাড়া দেয়। হিন্দুস্থানী, কোথায় কি কারবার আছে, স্বামী স্ত্রী, একটা বাচ্ছা—কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খুব ভাল ভাড়াটে ওঁরা বললেন, কোন মাসে দু'-তারিখ হয় না ভাড়া দিতে। বললে, সময় দিলে ওঁরা ভাড়াটে তুলে দিতে পারবেন—তবে লাভ কি ? বাড়িওলারা বললেন, ভাড়াই যখন দেবেন তখন এমন ভাড়াটে তুলবেন কেন ? এখানে একখানা ঘরে কে এত ভাড়া দেবে ? নিহাৎ ওর এইখানে দোকান, তাই—।'

'তা বাড়িওলা বেচছে কেন ?'

'ছেলের দিল্লীতে চাকরি হয়েছে, পাকা চাকরি, সেইখানেই থাকতে চায়। একই ছেলে। তাই ইচ্ছে এদিকের সব বেচে-কিনে সেখানেই একটা কিছু করে, মাথা গোঁজবার জায়গা। দিব্যি বাড়ি মা, কী বলব, নিজেরা থাকবে বলে শখ ক'রে করেছে, দক্ষিণ খোলা, একটু বাগান-মতোও রয়েছে, আর চাই কি ?'

'তা দক্ষিণে কত ?' একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করে হেমন্ত।

'ঐখানেই যা একটু গোলমাল। পঁয়ত্রিশ হাজারের এক পয়সা কমে দেবে না। লোকটা একটু রোখা আছে। বলছে, দর করার হলে খদ্দের আনবেন না, এই দামে কেনবার হিম্মৎ থাকলে আনবেন, পছন্দ হলে নেবে, নয়ত নেবার দরকার নেই।'

বলে যাদুগোপালই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাত কচলাতে থাকে।

'কথা শুনে তো মনে হচ্ছে লোকটা ভাল।' হেমন্ত বলে, 'আমি রোখা লোকই পছন্দ করি। কিন্তু তুমি কি বলো ? অত ভেতরে—সে হিসেবে দামটা একটু বেশী হচ্ছে না ?'

'ভেতরে বলেই এত কম, ঐ বাড়ি কালীচরণ ঘোষ রোড কি সাউথ সিঁথি রোডের ওপর হলে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের কম হত না মা !'

'বেশ চলো, একটা রিকশা ডাকো, দেখে আসি।'

'এখনই যাবেন ? এক্ষুণি ?' যাদু যেন একটু হকচকিয়ে যায়।

'হ্যাঁ। তা কি ? এখন এমন তো কোন রাজকার্য করছি না। আর এটাও তো কাজ, যা করতেই হবে তা সেরে ফেলাই ভাল। শিয়রে শমন এসে দাঁড়ানো—দেখতে পাচ্ছ না, তুমি যখন ছেলে-মানুষ আমাকে বুড়ি দেখেছ, তুমিই বুড়ো হয়ে গেলে। আমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে ? নাও, নাও—চলো। রিক্‌শা ডেকে আনো।'

তাড়া লাগিয়ে ওঠে হেমন্ত।

বাড়ি দেখে পছন্দ হল। পছন্দ হবার মতোই বাড়ি, বেশ খোলামেলা। ভাড়াটে বৌটির সঙ্গেও আলাপ হল, তার বাপের বাড়ি গাজিপুর জেলায়। বেনারসী বুলি শুনে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, দেশী মানুষ ভেবে। একটা তারের ফাইল খুলে পর-পর ভাড়ার রসিদ দেখালে, পয়লা দোসরা তারিখের রসিদ সব, এমাস পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া আছে।

তখনই বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলে এল, ভাল দিন দেখে বায়না করবে। বায়না য়্যাটর্ণীই করবেন, তাঁর কাছেই কাগজ-পত্র দিতে হবে। সার্চ শেষ হলে তিনিই দিন বলে দেবেন—কবে রেজেস্ট্রী হবে।

বাড়িওলা বললেন, 'সার্চ করার কোন দরকার ছিল না—তবে সে আপনার যেমন অভিরুচি।'

হেমন্ত বললে, 'এ তো সব বাড়িজমির মালিকই বলে থাকেন—কিন্তু কে সত্যি কথা বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন তা তো বোঝার উপায় নেই। যাদুগোপালের কাছে শুনলুম আপনি স্পষ্ট কথা শুনতে কইতে ভালবাসেন—কিছু মনে করবেন না আশা করি, বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস নিজের ছেলেকেও নেই। এতগুলো টাকার জিনিস, গোলমাল বেরোলে আপনাকে কোথায় পাব বলুন! আপনি তো বেচে দিয়ে সরে পড়বেন। শেষে—আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে—সেই অবস্থা হবে তো আমার!'

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

পরের দিন যাদুকে নিয়েই খুঁজে খুঁজে য়্যাটর্ণী আপিসে গেল হেমন্ত। ধন্নুবাবুর ছেলে এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তবু চিনতে পারল, উঠে এসে প্রণাম করল।

হেমন্ত বাড়ির বিবরণ এবং কেনার অভিলাষ জানিয়ে বললে, 'আমার এটুকু আসতেই দম বেরিয়ে গেছে, আমি আর ছুটোছুটি করতে পারব না। সই-সাবুদ যদি আমার কিছু করার থাকে তুমি করিও। এই বাড়ি, পঁয়ত্রিশ হাজার দাম—নিমের বৌ আশার নামে কেনা হবে—আশালতা চাটুয্যে। বায়না করা সার্চ করা—সব তোমার ওপর ভার—মায় রেজেস্টারী পর্যন্ত। টাকা—এখানের ব্যাংকে যা আছে তা থেকেই নিতে হবে, কবে কোথায় সই করতে হবে বলো, একদিন মরিবাঁচি ক'রে এসে না হয়—'

'না না। তার দরকার নেই। এই ভদ্রলোক যদি আসেন—সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে আপনি যেখানে আছেন আমি গিয়ে করিয়ে আনব। আপনার এভাবে আসা উচিতই হয় নি।'...

এরা কিছুই জানত না, য়্যাটর্ণীপাড়া থেকে ফিরে এসে আশাকে খবরটা দিল হেমন্ত।

একটা বাড়ি দেখেছে, ছেলেদের একটু হয়ত অসুবিধে হবে,—বাস-এর পথ বড়রাস্তা থেকে একটু দূর—কিন্তু সব দিকে তো আর সুবিধে হয় না। ভাল বাড়ি, সে হিসেবে দাম কম—বামুনের গরু, এমন আর কোথায় পাওয়া যাবে? বড়রাস্তার ওপর হলে এ বাড়িরই ঢের দাম হত।

বাড়ির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে, মায় ভাড়াটের কথা সুদ্ধ জানিয়ে বলে, 'বাড়ি তোর নামে কিনতে বলেছি। ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌ-নাতি নিয়ে থাকবি বৈকি, আশীর্বাদ করি শান্তির

সংসার হোক—কিন্তু খবরদার, কোন কারণেই বাড়ি ছেলেদের নামে লিখে দিস নি কি বিক্রী ক'রে টাকাটা ওদের হাতে দিস নি। যদি বলে যে, আরও ভাল বাড়ি কিনবে এই বাড়ি বেচে—সে বাড়ি নিজে দেখে, দর-দস্তুর ক'রে, এ বাড়ি বেচার দরকার হলে সে টাকা নতুন বাড়িওলাদের ডেকে এনে সোজা তাদের দিবি। অনেক দেখলুম সংসারে—বুড়ো বয়সে দুর্গতির শেষ থাকবে না—বেটা-বোয়ের এন্তাজারী হলে। বাড়িখানা থাকলে তবু ওর লোভেও কেউ দেখবে। জ্যান্তে ছেলেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রেও দিস নি—মরার পর যা হয় ওরা করুক গে—চুলোচুলি। আর এই ভাড়ার টাকাটা নিজে রাখবি—স্বাধীন। এখন তো জমাতেই হবে মেয়ের বে পর্যন্ত, তার পরও জমাবি, সংসারে যেন ঘুষ দিস নি। এখন তো দু'ছেলের রোজগার হল—যেমন চলে ঐতেই সংসার চালাবি। আরও একটা কথা বলে যাই, ছোট মেয়েটার বিয়ে না হলে যেন আহ্লাদ করে গোপালের বিয়ে দিয়ে বসো না। বিয়ে হলেই বোয়ের অধীন। ছেলের নিজের ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারবে না।'...

এসব উপদেশে আশার কান ছিল কিনা কে জানে, তার দুই চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রু-বিকৃত স্বরকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এদান্তে প্রায়ই বলত, আমি যদি এই বেলা মরতে পারি তবু তোমাদের একটা হিল্লে হয়ে যায়। জ্যাঠাইমা তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে দেখবে। আমিই বিষ-নজরে পড়ে আছি, সেই জন্যে কিছু হচ্ছে না।...আমি বলতুম, দেখছেন না আর কোথায়—এই তো যখনই যেদিকে জল পড়ছে সেদিকে ছাতা ধরছেন। বুড়ো মানুষ তিনি, আর কত দেখবেন, এখন তো উল্টে আমাদেরই তাঁকে দেখা উচিত, খাওয়ানো উচিত। তা বলত, তুমি জানো না, আমার একটু ভুলেই সর্বস্ব ক্ষোয়ালুম। নইলে আমি তো রাজা। আবার বিশেটাকে দিলুম, সেও জীবনটা ছারেখারে দিলে।...বলত আর চোখের জল ফেলত।'

হেমন্ত ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'একটা কথা ভুল বলেছে মা, শুধু ও বিষ-নজরে পড়ে নি, সমস্ত শ্বশুর-গুষ্টির ওপরই আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। ঝাড়ে-বংশে বেইমান ওরা, বেইমান আর বদ। তার ওপর বোকা—নিজেদের পায়ে চিরকাল কুড়ুল মারে।...যেখানে এদের এক ফোঁটা রক্ত আছে সেখানেই অশান্তি, সেখানেই আহাম্মুকি। ওরা জানেই না কাউকে আপন করতে, ভালবাসতে। নিজেদের স্বার্থটা বোঝে, অথচ সেজন্যে যে একটু মেহনৎ করতে হয়—একটু বুঝে-সমঝে চলতে হয়—কি অপরের মন যুগিয়ে সেটা আদায় করতে হয়—এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান ওদের নেই, অত ধৈর্যও নেই। তাই তো তোকে বলছি, খুব সাবধান, ছেলেদের ওপর একতিল ভরসা করিস নি। ঐ ঝাড়েরই বাঁশ ওরা!'

তারপর একটু দম নিয়ে বলে, 'তবে এও সত্যি, তোর টানেই এসেছি। তোর জন্যেই যেটুকু চিন্তা। তোকে না পথে বসে ভিক্ষে করতে হয়, আমার সাধ্যমতো সেইটুকু ক'রে যাব। তবে এর বেশী নয়। তাহলেই তো ঐ ছেলেরা হাল ছেড়ে দিয়ে আরাম করতে নবাবী করতে শুরু করবে। বেশিতে দরকার নেই, মাথা গোঁজার একটা আস্তানা ক'রে দিয়ে গেলুম, তোর একটা পেট—বিধবার খরচ—বুঝে চলতে পারলে

ঐতেই চলে যাবে। তারপর তুই বোকামি করে স্কোয়াস—তুই-ই পথে বসবি।'

কমলার বিয়ের আগেই চিঠি লিখে ভোলাকে আনিয়ে ছিল। বিয়ের পরদিন বরকনে চলে যাবে, সেও গাড়িতে উঠবে। অনেক বলে আশা সেটা বন্ধ করল। 'অন্তত ফুলশয্যের ঝঞ্ঝাটটা চুকে যাক, তারপর যাবেন মা, একটা-দুটো দিনে আর কী এমন এসে যাবে! ভোলাও আপনার থাক না, এ ক'টা দিন তো জায়গার অসুবিধে নেই!'

এতে আর 'না' বলতে পারল না। এই শেষ, আর আসবে না—আসা হবে না—এক রকম নিশ্চিত, আর সত্যিই, এতদিনই রইল, দু'টো দিনে আর এমন কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে!

জায়গারও অভাব ছিল না। পাড়ার লোকের দয়াতেই সে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। সকলেই খুব করছে এদের বিপদে। করছে—হেমন্ত যা বুঝল—আশার জন্যেই। তার স্বভাবের জন্যেই সকলে তাকে ভালবাসে। ভাগ্যক্রমে সামনের বাড়ির নিচের তলার ভাড়াটে সেই সময়ই উঠে যাচ্ছে, নতুন ভাড়াটে অবশ্য প্রস্তুতই ছিল। পাড়ার লোকেরা ভদ্রলোককে ধরে—চার-পাঁচটা দিনের জন্যে আটকাল বাড়িটা। বর্ষাকাল, ম্যারাপ করতে অনেক খরচা পড়বে গরিব মানুষদের, তাও অসুবিধে, বাসরঘর, ভাঁড়ার, আত্মীয়-কুটুমদের থাকার ব্যবস্থা—সবই তো দরকার। বরং উনি যদি কিছু ধরেও নেন সে বাবদ—তো এদের লাভ।

বাড়িওলা অবশ্য কিছুই নিলেন না। হেমন্ত নিদেন চুনকামের খরচটা দিতে চেয়েছিল, তিনি তাতেও হাত জোড় করলেন। বললেন, 'চুন তো আমাকে দেওয়াতেই হত—সেটাই না হয় দু'দিন পরে দেওয়াব। ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার হচ্ছে, অনাথা মেয়ে—এতে যদি এটুকুও না করতে পারি তো কী করলুম জীবনে!'

বিয়ে নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। জামাইকে দেখেও ভাল লাগল হেমন্তর। তবে এ দেখার কোন মূল্য নেই তাও সে জানে। কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না, মেয়ের কপালে কী উঠল লটারীর ফল।

হেমন্ত উপস্থিত থাকাতেই আরও—বিয়ে বেশ ভালভাবে মিটল। মেয়েকে ব্রোঞ্জের নয়—সোনার চুড়িই গড়িয়ে দেওয়া হল, উপরন্তু বারোমাস পরে থাকার মতো মাঠাবালা এক জোড়া। ফুলশয্যার তত্ত্বও অল্পের ওপর বেশ গুছিয়ে দিল হেমন্ত, কোন খুঁৎ থাকতে দিল না।

ফুলশয্যের তত্ত্ব সঙ্গে নিয়ে সবাই রওনা হয়ে গেলে মোটামুটি ঘরদোর গুছিয়ে আশা হেমন্তর কাছে এসে বসল। চোখে জল টলটল করছে তার, আগেই টিকিট কাটা হয়ে আছে, পরের দিন বেনারস এক্সপ্রেসে যাওয়া। সেইটেই যত ভাবছে তত যেন নিজেকে নতুন ক'রে অসহায় বোধ করছে আশা, কথাটা ভাবতেই বার বার চোখে জল এসে যাচ্ছে। নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করা পর্যন্ত থাকতে বলেছিল, হেমন্ত রাজী হয় নি। সে আরও পনেরো-কুড়ি দিন দেরি হবে—ততদিন এখানে থাকতে রাজী নয়।

সকাল থেকেই বিয়েবাড়ির কাজে মন নেই আশার, কেবল যেন শাশুড়ির পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। হেমন্তই ধমক দিয়েছে সে জন্যে, 'মর আবাগী—থৈ-থৈ করছে লোক, অসুমর কাজ পড়ে, তুই বাড়ির গিন্নি, কেবল আমার সেবার তদ্বির করার জন্যে

ঘুরছিস কেন? আমারটা আমি ঠিক করিয়ে নোব, তুই অন্য দিকে মন দে—'

এখন এসে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কেঁদেই ফেলল আশা।

'আবার কবে আসবেন মা?'

হেমন্ত হাসল। ম্লান হাসি। এই সেবা এই আন্তরিকতা কি তার মনেও দোলা লাগায় নি, আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তা কি তার মনকেও একটু ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে নি?

হয়ত সেই জন্যেই তার এত ব্যস্ততা, এমন দাঁড়িছেঁড়া ক'রে চলে যাওয়া।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আর আসব না। অন্তত আসার আর ইচ্ছে নেই।'

'আর কোনদিনই আসবেন না? সে কি? আপনার গোপাল কি শুভার বিয়েতে?'

'এলে তোর টানেই আসতুম পাগলী। কিন্তু তুইও যে আমার শ্বশুরকুলেরই একজন। এবার এই চিরদিনের মতোই এদিকের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেলুম। অবিশ্যি চিরদিন আর ক'দিন আমার! ভোলা বলে ওভারডিউ—আমার আর একজন্মও ঘুরে ফের মরার বয়স হয়ে গেল।···তবে যদ্দিনই বাঁচি—আর না। অনেক হয়েছে। নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার, তা আমি তো অনেকবারই গেলুম, আর কেন?'

'তাহলে আর দেখা হবে না কোনদিন!' যেন আর্তস্বরে প্রশ্ন করে আশা।

'কী লাভ আর চোখের দেখা দেখে—এই তো এতদিন রইলুম। আমার কি আর মরার সময় হয় নি? ধরে নে মরেই গেছি।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে চোখের জল ফেলল আশা। তারপর বলল, 'আমি—আমি যদি কাশীতে যাই, তাড়িয়ে দেবেন?'

আবারও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল হেমন্ত, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তাড়িয়ে দোব না, তবে না গেলেই ভাল হয়। আর পেছনের দিকে তাকাস নি মা, সামনের দিকে তাকা, ছেলেমেয়েদের দিকে মন দে, ওরা যাতে মানুষ হয়, সুখী হয়—সেই দিকে দ্যাখ। আমার সংস্পর্শে বিষ আছে, আমার এ টাকাও অভিশপ্ত। এদিকে তাকিয়ে থেকে ওরা কেউ সুখী হল না, বরং জ্বলে-পুড়ে মল আরও। নিজেদের মতো থাকলে হয়ত একরকম কাটিয়ে যেতে পারত। সেইজন্যেই তোকে বেশী টাকা দিলুম না, এই যে দিলুম—তাতেই ভয় হচ্ছে—হয়ত তোর অশান্তির কারণ হয়ে রইল।'

তারপর একটু থেমে গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'মেয়েছেলের—বিশেষ আমাদের হিন্দু-ব্রাহ্মণের ঘরে—স্বামী চলে গেলে সুখের কথা বলা বিড়ম্বনা—তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তাও হয়ত উচিত হচ্ছে না, ভগবান আমার কোন কথাই শোনেন না—তবে তোর মন ভাল, দয়ামায়া আছে, হয়ত তোর ভাল হবে; তুই সুখী হ' শান্তি পা—আমার কথা আর ভাবিস নি। আমি মরেই গেছি এইটে ভেবে নে। চিরদিন জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেলুম মা, আমার নজর থেকে আমার নিঃশ্বাস থেকে দূরে থাকাই ভাল। ছোটবেলায় শাশুড়ি বলতেন পিশাচে-পাওয়া—কে জানে কথাটা সত্যিই কিনা! আমার সংস্রবে এসে কেউ সুখী হয় নি। সেইজন্যেই চিরদিনের মতো দূরে সরে যেতে চাইছি।'

আশা আর শুনতে পারল না—হেমন্তর কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে যেন হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল, 'আমারও যে আর কেউ নেই মা, আমার মুখের দিকে চাইবার কেউ যে রইল না!'

।। ৩৬ ।।

কথাটা মনে এসেছে কমলার বিয়ের সময়ই। ভোলা মাত্র আগের দিনই এসেছে, কিন্তু সে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার ছেলে নয়—আসামাত্রই অনায়াসে গোপাল আশিসদের দলে মিশে গেছে। বিয়ের দিন বেলা তিনটে নাগাদ মনে হল যে, ভোলারই বোনের বিয়ে—সে-ই এ বিবাহের কন্যাকর্তা। সব জায়গায় সব কাজে অগ্রণী।

চেহারা হিসাবেও ওকেই মানায় কর্তা বলে। গোপালের রঙটা মায়ের মতো ফরসা হলেও চেহারার আড়াটা দাঁড়িয়েছে এখন অনেকটা নিমাইয়ের মতো—অর্থাৎ কোন আসর বা মজলিসে পাত্তা পাওয়ার মতো নয়। আশিসকে তো আরও ছোট, আরও ছেলে-মানুষ দেখায়। তাছাড়া তারা কখনও ভার নিয়ে অগ্রণী হয়ে কোন কাজ করে নি—তাদের এখানে এমন কোন আত্মীয়ও নেই যাদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে-থা কাজে-কর্মে খাটা-খাটুনি করবে। সুতরাং এ-বিষয়ে দুজনেই অনভিজ্ঞ ও অপটু, বাকীরা তো নিতান্তই ছোট। যা করছে প্রতিবেশীদের উপদেশ ও নির্দেশে। তাতে গোলমালও হচ্ছে—কারণ একজন একটা পরামর্শ দিচ্ছেন, পরক্ষণেই আর একজন সেটা উড়িয়ে অন্য রকম করতে বলছেন।

ভোলাকে দেখে কিন্তু মনে হল নেতৃত্বটা যেন তার সহজাত। সেও কখনও একাজ করে নি, বিশেষত তার এ সমাজ নয়—বাঙালীর বাড়ির—আরও ব্রাহ্মণদের, ক্রিয়া-কলাপ কিছুই জানে না কিন্তু কিছুটা এদের কথাবার্তায়—কিছুটা হেমন্ত ও আশার কাছ থেকে শুনে অতি সহজে এবং অনায়াসে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তারপর থেকে কিছুই বলতে হল না, দেখতেও না। শুধু পূজা-অনুষ্ঠান, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেগুলো তথ্যের ব্যাপার—সেগুলো মেয়েদের জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছিল।...

ওকে দেখাচ্ছিলও বড় চমৎকার। সাধারণ মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা আর একটা গেঞ্জি—সন্ধ্যার সময় তার ওপর একটা সাধারণ পাঞ্জাবি চাপিয়েছিল—তাতেই যেন চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। সহস্র কাজ সহস্র কথাবার্তার মধ্যে হেমন্ত ওকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিল এবং অবসরমতো চেয়েই থাকছিল। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ—তাতে গেঞ্জিটা আঁট হয়ে বসা, আরও ঘামে ভিজে গিয়েই গায়ের সঙ্গে বসে গেছে—তাতে দেহের নিখুঁত রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে; উত্তেজনা ও ছুটোছুটিতে ওর উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছে—তার মধ্যে সব সময় সব অবস্থাতেই মুখে অভ্যস্ত হাসিটি; মধ্যে কাশীর রেওয়াজ মতো পান-জর্দা খাওয়া ধরেছিল, হেমন্তর কাছে বকুনি খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে, সুতরাং এখনও নিষ্কলঙ্কই আছে হাসি, কালো ছোপপড়া দাঁতে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে নি; রঙ ফরসা বা মুখ-চোখ কাটাকাটা না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সবচেয়ে সুন্দর লাগছিল, কেবলই মনে হচ্ছিল হেমন্তর—ভোলা

যদি তার সত্যিকারের ছেলে বা নাতি হত তাহলে এতদিনের সব ক্ষোভ সব দুঃখ শোধ হয়ে সুখের পাত্র উপচে পড়ত জীবনে।

আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে, তা যে হয় নি সে-ই ভাল, আপনার নাতি হলে ঐ বিশুর মতো বাঁদর—বাঁদরও না, তাদের তবু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে কিছু—আস্ত শুয়োর একটা তৈরী হত। সম্পর্কে আপন নয় বলেই যথার্থ আপন হয়ে উঠতে পেরেছে।··· বেঁচে থাক, সুখী হোক—রক্তের সম্পর্কে আর দরকার নেই।

ওর দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতে থাকতেই মনে হয়েছে কথাটা। বিশেষ শুভদৃষ্টি স্ত্রী-আচারের সময়, বরের পিছনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি—হাসাহাসি করছে যখন—মনে হয়েছে এই ভোলার সঙ্গেই কমলার বিয়ে দিলে হত, ভারী চমৎকার মানাত! এ পাত্রের চেয়ে অনেক ভাল পাত্র হত ভোলা, শুধু চেহারায় নয়—মানুষ হিসেবেও। হেমন্ত জোর করলে আশা বোধহয় অমত করত না।

তখন অবশ্য এসব ভেবে লাভ ছিল না। তাছাড়াও, পরে মনে হয়েছে, সে কথা যে মাথায় যায় নি বা সে চেষ্টা করে নি, এটা ভগবানেরই অনুগ্রহ। ওর ওপর, ভোলার ওপরও। ঐ ঝাড়েরই মেয়ে তো কমলা, বাপের বংশের বদবুদ্ধি ও মায়ের বদমেজাজ যদি পেয়ে থাকে তো যেখানে যাবে তাদের জীবন সংসার নষ্ট ক'রে দেবে। বাপ রে, ভোলার অমন দুর্গতি ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে!

কিন্তু কথাটা মাথাতে ছিল সেই থেকেই।

কাশীতে ফেরার পর—এতদিনের পরিশ্রম, পথকষ্ট ও মানসিক উত্তেজনা আবেগের ধকলে ক'দিন খুব শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল, চুপ করে শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারে নি। মুনিয়া আর ভোলা স্নান প্রভৃতি প্রাত্যহিক কাজগুলো করিয়ে দিয়েছে, মুখ ধুইয়ে দিয়েছে—বাড়িওলারা নারায়ণের অন্নপ্রসাদ দিয়ে গেছেন। তিন-দিনের দিনই অবশ্য মুনিয়া একটা রান্নার লোক এনে দিয়েছে, নইলে কতদিন ওঁদের সাহায্য নিতে হত তার ঠিক নেই। জ্বরজারি কিছু নয়, পেটের গোলমাল তো নয়ই —শুধুই ক্লান্তি আর অবসাদ। গত তিন-চার মাসে দেহের থেকে মনের ওপর দিয়ে ঝড় অনেক বেশী বয়ে গেছে, এ তারই প্রতিক্রিয়া।

দিন-সাতেক পরে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে আবার। সন্ধ্যার পর কাছে বসিয়ে বলে, 'ভোলা, তুই বিয়ে কর, ভাল মেয়ে দেখি একটা। তোদের হিন্দুস্থানী মেয়ে যদি চাস তো তাই চেষ্টা করি। তবে ও বাড়িতে কি এখানে থাকা চলবে না। আলাদা বাসা ক'রে থাকবি বৌকে নিয়ে, মুনিয়া তো এখানেই থাকে বেশির ভাগ— তোর দাদা তো থাকেই না—ও বাসা তুলে দে।'

ভোলা চমকে ওঠে যেন, 'বিয়ে? না না, তোমাকে কে দেখবে তাহলে? ওসব হাঙ্গামা বাধিও না বলে দিচ্ছি। বিয়েতে আমার দরকার নেই। কে আসবে কেমন মেয়ে— তোমাকে কি চোখে দেখবে—না, সে হবে না! তোমাকে পর করতে পারব না।'

দু' চোখে জলের বন্যা নামে হেমন্তর। বহুদিনের শুষ্ক চোখের কোল বেয়ে বাধা-বন্ধহারা জলের স্রোত ঝরতে থাকে।

আনন্দের অশ্রু এই বোধহয় জীবনে প্রথম।

আছে, এখনও কিছু পাওনা তাহলে আছে।

বোধহয় ভগবান এইটুকুর জন্যেই এই একশ' বছর বাঁচিয়ে রেখেছেন; অথবা একশ' বছর ধরে পরীক্ষা ক'রে জ্বালিয়ে গালিয়ে পাপের খাদ শূন্য ক'রে নিলেন এই পুরস্কারের জন্যে।

মনে হল এতকাল পরে তারকই কথা কয়ে উঠল এই হীনজন্ম ছেলেটার মুখ দিয়ে। ঝিয়ের ছেলে, তায় সম্ভবত জারজ।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে ওঠে, একটা হিম আশঙ্কা বোধ করে।

তারক ওকে এমনি ভালবাসত, সে বাঁচে নি। ওর যা কপাল, যদি এও যায়? ভগবান তার আগে ওকে কেন নিচ্ছেন না, আরও কি কাজ বাকী আছে তাঁর? আরও কত শাস্তি কত আঘাত দিতে চান? আরও কত পোড়ানো দরকার মনে করেন।

অন্ধকারে বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। গঙ্গার ওপরের বারান্দা। নিচে ঘাটের দু একটা আলো আর রাস্তার ক'টা আলোর যা সামান্য আভা এসে পড়েছে—তাতে চোখের জলটা দেখতে পাবার কথা নয়, দেখতে পায়ও নি বোধহয় ভোলা, তবে হয়ত ঐ ধরনের কিছু অনুমান ক'রে থাকবে—তাই সে চুপ ক'রেই রইল।

অনেকক্ষণ বসে রইল এমনিই, তরঙ্গাঘাতে ভেঙে যাওয়া আলোর টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে। দূরে কোথায় কোন দেবালয়ে আরতির শব্দ হচ্ছে; নিচে পথের ওপাশে কে একটি হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে কর্কশকণ্ঠে ঝগড়া করছে সম্ভবত তার মেয়ের সঙ্গেই—খিস্তি ক'রে বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে তাকে; মিষ্টির দোকানে ভোলানাথবাবু নেতাজী যে বেঁচে আছেন তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন—সবটা জড়িয়ে এটা যেন তাদের চিন্তার একটা পৃষ্ঠপট রচনা করেছে, এই মিলিত কোলাহল ও গঙ্গার বুকে ভেসে যাওয়া আলোর প্রতিবিম্বগুলো। এ দৃশ্য বা শব্দ কোনটাই তাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হচ্ছে না, দু'জনেই নিজেদের মনের গহনে ডুব দিয়েছে।

অবশেষে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে গাঢ়কণ্ঠে হেমন্ত বলে, 'তাই বলে তুই বিয়ে করবি না! না-ই বা সে দেখল আমাকে!...আমার এতকাল কাটল কি তোর ভরসায়? তাছাড়া সেইজন্যেই তো দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি, আমার কপালে সেবা-যত্ন সয় না রে! তোর কোন কিছু—কোন, মানে বিপদ-আপদ ঘটবার আগে তুই সরে যা, সেই ভাল!'

অকস্মাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভোলা ওকে কচি মেয়ের মতো কোলে টেনে নিয়ে বলে, 'আমার কিচ্ছু হবে না। আর তুমি বা কদ্দিন? সত্যিই তো অমর নও! যে ক'টা দিন আছ, আমি থাকি না তোমার কাছে! তুমি গেলে আমি ঠিক বিয়ে করব—তোমাকে জবান দিচ্ছি!'

'কিন্তু সে বিয়ে সে বৌ তো তাহলে আমি দেখতে পাব না!

'না-ই বা দেখতে পেলে! কত বিয়ে কত বৌ তো দেখলে আজ-তক্। তাতে কি চারটে হাত বেরোল তোমার?'

আর কথা বাড়ায় না হেমন্ত। ছোট মেয়ের মতো এই বলিষ্ঠ পুরুষ-দেহের আদর উপভোগ করে। আবারও আনন্দে চোখ সজল হয়ে আসে তার।

কিন্তু কৈ, আরও একটা বছর কেটে যায়, সে বহু প্রতীক্ষিত মৃত্যুর তো দেখা মেলে না!

শুধু শরীরটাই ক্রমশ আরও অথর্ব, একেবারে অচল হয়ে আসে, ক্রমশ যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। এখন আর কেউ ধরে না নিয়ে গেলে কলঘরেও যেতে পারে না। রান্নার শখ এত, খুন্তি ধরতে গেলে হাত থেকে খসে পড়ে, সাঁড়াশি আর কড়া নামানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

এবার এই প্রথম যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে কি এইভাবেই শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকবে নাকি—দু'চার বছর? কে দেখবে তাকে এখানে? দেখার লোক আছে অবশ্য, ভোলাই তো আছে। মুনিয়া গুছিয়ে সেবা করতে পারে না, তার দিকে অতটা আন্তরিক টান থাকারও কারণ নেই। পুরনো ঝি, এই মাত্র। তবে ভোলা একাই একশ'। কিন্তু ঠিক এইটেই চায় না সে, ভোলাকে জড়াতে চায় না এমনভাবে, তার জীবনটা বিড়ম্বিত করতে চায় না। কতকাল আরও বাঁচবে তার ঠিক কি, ভগবান তার কপালে মৃত্যু লিখতেই বোধহয় ভুলে গেছেন—এইভাবে তাকে নিয়ে পড়ে থাকবে ছেলেটা, ওর কাজ-কর্ম, উন্নতি, গার্হস্থ্য জীবন—সব থেকে বঞ্চিত হয়ে? তাছাড়াও তার জীবনের অভিশাপ তো আছেই, কেবলই ভয় হয়, তাকে যে ভালবাসবে, তাকে যে দেখবে সে আর বাঁচবে না।...

না, আর নয়, এখান থেকে পালাতে হবে।

কাশীতে মৃত্যু মণিকর্ণিকা-প্রাপ্তি তার কপালে লেখেন নি ভগবান। অবশ্য ভগবান কিছুই ভাল লেখেন নি তার কপালে, কোন সাধই তার পূর্ণ হবে না—তা সে জানে। এখন আর তার সে ঝোঁকও নেই। এ একটা কথার-কথা মাত্র তার কাছে, বহু দিনের সংস্কার এই পর্যন্ত। মণিকর্ণিকায় দেহটা ভস্ম হলেই চতুর্ভুজ হয়ে শিবলোকে চলে যাবে—এমন ধারণা তার এখনও গড়ে ওঠে নি মনে। অথবা একটু একটু ক'রে—বার বার ঘা খেয়ে—এই ধরনের ভক্তি-বিশ্বাস—যেটুকু বা ছিল, কমেই যাচ্ছে, কমে গেছে।

সুতরাং এবার—কোথাও মরতে যাওয়া দরকার। সেই সঙ্গে দরকার টাকাগুলোর সংগতি করা—আর তার আগে ভোলার স্নেহের ঋণ শোধ ক'রে যাওয়া। অনেকদিন আগে একটা উইলের মতো লিখে রেখে ছিল য়্যাটর্ণীর কাছে—কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আর নেই। নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। সোজা হচ্ছে ভোলাকে দিয়ে যাওয়া, লোভও খুব—তবে তা দেবার সাহস নেই। হয়ত মনের ভুল, তবু যে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে তাকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে নির্মূল করা যায় না। কেবলই মনে হয় এই টাকার জন্যে বহুলোকের নিঃশ্বাস পড়েছে, বহুলোকের লুব্ধ প্রত্যাশা ছিল, এ টাকায় অভিশাপ লেগে আছে। ভোলার জীবনটাই হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে সে নিজে চেষ্টা ক'রে বড় হচ্ছে সেই ভাল।

কাকে দেবে আর কোথায় যাবে?

দীর্ঘকাল ধরেই ভাবছে কথা দু'টো। এক আশার কাছে যেতে পারে, সে মাথায় ক'রে রাখবে। কিন্তু তারও যা শরীর, সেখানে গিয়ে পড়া মানে তার ওপর অত্যাচার করা। তাছাড়া, তার ছেলেমেয়েরা কী চোখে দেখবে কে জানে!

সুরেন? সে এ টাকা নেবে না। দাদার কোন ছেলেমেয়েই নেবে না। তাদের ঠাকুর্দার নিষেধ। বড় ভাইপোও মারা গেছে। তার স্ত্রীকে কখনও দেখে নি পর্যন্ত। পাকিস্তান হওয়ার পর সুরেন দেশে গিয়ে বসেছে, তার ভাইপো-ভাইঝি—ছোট ভাই—এদের সংসার। সুরেন বিয়ে করে নি, কেন করল না শেষ পর্যন্তও—সেটা হেমন্ত কতকটা আঁচ করতে পারে—বোধহয় সেই জন্যেই তার শরীরও ভেঙেছে। শেষ যেবার কাশী এসেছিল, সেবারই দেখেছে হাঁপানির মতো। দীর্ঘকাল কষ্ট ক'রে ক'রে শরীরের যন্ত্রগুলো এমনিতেই বিকল হয়ে এসেছে, তার ওপর মনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চেপে রাখার ফলেই সম্ভবত—একেবারেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে। চিকিৎসার নাম ক'রে কিছু দিতে চেয়েছিল হেমন্ত—সুরেন তাও নেয় নি; হাসিমুখে এড়িয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'সবই তো আপনার দৌলতে পিসীমা, এত বড় চাকরি কি আমার পাবার কথা? যা দু-চার টাকা জমেছে সেও তো একরকম আপনারই দেওয়া।...ওঁরা এখানে কল খুলেও আমাকে ডেকেছিলেন, দু' বছর কাজও করেছি, সেও অনেক দিয়েছেন। আর কেন—মিছিমিছি?'

অর্থাৎ মিছিমিছি বাপের হুকুমটা অমান্য করি কেন?

তাকে আর বলে বা অনুরোধ ক'রে কোন লাভ নেই। তাহলে বাকী থাকে নিভা।

নিভাদেরও বিপর্যয় বড় কম হয় নি। ওদের সম্পত্তি বলতে জমি-জমাই বেশী ছিল, গুরু-পুরুতের বংশ, বাসন-কোসনই তিন-চার সিন্দুক, নগদ টাকার জোর খুব একটা কোন কালেই ছিল না। আয় মন্দ ছিল না হয়ত, কিন্তু ওর শ্বশুর গুরুদাসবাবুর হাত ছিল দরাজ---সবই খরচ ক'রে গেছেন, পয়সা জমাবার কথা কোনদিন ভাবেন নি। জমেও নি। তাই, পাকিস্তান হবার পরও অতুল বা নিভার শাশুড়ি এখানে আসতে রাজী হয় নি প্রথমটায়। ওখানেই টিকে ছিল কোনমতে। কে ওদের বুঝি বুঝিয়েও ছিল যে, ওদিকটা ভারতেই এসে যাবে, পাকিস্তানে যেতে পারে না।

আগে এলে সব না হোক, অনেক আনতে পারত। সম্পত্তি বদল করলেও ভাল সম্পত্তি পেত। কেউ কেউ পাঁচ-সাতখানা বাড়ি পেয়ে গেছে ওখানের জমির বদলে। ওরা যখন মনস্থির করল যখন আর কোনমতেই থাকা সম্ভব হল না, তখন একরকম সব ফেলেই চলে আসতে হল। ভাগ্যে ছিল তাই---গুরুদাসবাবুর অনেক দানপুণ্য ছিল—একেবারে শেষ মুহূর্তে এইটুকু সম্পত্তি বদলে পাওয়া গেল। যা ফেলে আসতে হল তার তুলনায় কিছুই নয়—তবু একটা পাকা বাড়ি, বিঘে তিনেকের বাগান, বিঘে দুই জলকর আর দশ-এগারো বিঘের মতো ধানজমি। এও ভাগ্য বলতে হবে—এ ভদ্রলোক একটা পাকাপাকি দখল চাইছিলেন তাই, নইলে ওরা যখন এসেছে তখন আর ওখানে কেউ হিন্দুর বাড়ি দাম দিয়ে কিনছে না, জানে সবই তো মুফতে আসবে।

খুবই কষ্টে দিন যাচ্ছে ওদের। চিরদিন সচ্ছলতার মধ্যে কাটিয়ে এসে পাই-পয়সার হিসেব ক'রে সংসার চালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ এখন তাই করতে হচ্ছে ওদের। অতুল একবার এসেছিল এখানে। বাপ-মার 'গয়া' করতে এসেছিল—সেই সময় কাশীতে এসে দেখা ক'রে গিয়েছিল। এই ক' বছরের মধ্যেই যেন খুব বুড়ো হয়ে গেছে বেচারী। তার মুখেই শুনল—গাছের নারকোল কি আম-কাঁঠাল ছেলেমেয়েরা খেতে পায় না—

জমা ধরিয়ে দিতে হয়েছে, নইলে নগদ টাকা হাতে আসে না। তবু অতুল এখানেও একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিয়েছে, তবে সেও ঐ স্থানীয় ইস্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ানো ক'টা টাকাই বা পায়!

বড় ছেলেটিকে সম্প্রতি কি একটা কারখানায় ঢুকিয়েছে—অতুল বিনয় ক'রে বলল, সেও একরকম হেমন্তরই দয়ায়। কারণ সুরেন তার মনিবকে দিয়ে আর একজনকে সুপারিশ ধরিয়ে এটা ক'রে দিয়েছে। নইলে ওর মতো ছেলের, বিশেষ এত বয়সে এ চাকরি নাকি হবার কথা নয়। সুরেনের জন্যে যে এত করেন ভদ্রলোক—সে নাকি এই বর্তমান মালিকের বাবা হেমন্তর বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন বলে, হেমন্তর ভাইপো বলেই সুরেনের এত খাতির।...

নিভার কাছেই যাবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

নিভা তাকে ফেলবে না। অতুলও না।

অতুল তিন-চারদিন ছিল, ভাল ক'রেই লক্ষ্য করেছে, মানুষটা যথার্থ ভদ্র এবং ভাল মানুষ। আর ওদের কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হয়েছে—তারাও ভদ্র হবে, এইটেই আশা করা যায়।

তবে নিভা কি টাকাকড়ি নিতে রাজী হবে? ওর কোন বাধা নেই—কিন্তু এমনিতে কিছু নেয়ও না—কখনও কিছু পাঠালে তার দু'গুনো ফেরত পাঠায় কোন-না-কোন ছলে। সেইজন্যেই আজকাল আর কিছু দেয় না হেমন্ত।

ওকেই একটা চিঠি লিখে দেখবে নাকি?

যদি অন্তত খরচাটুকুও নেয়!

অনেক ভেবে অনেক চিন্তা ক'রে শেষ অবধি নিভাকেই একটা চিঠি লেখে। এখন আর কলমও যেন ধরতে পারে না, হাত কাঁপে! তবু হাতেরলেখা একেবারে যে দুষ্পাঠ্য হয় নি এই তো আশ্চর্য।

নিভার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই সে এধারে কাজে লেগে যায়। ভোলাকে গৃহী ক'রে না গেলে তার কর্তব্যে প্রত্যবায় ঘটবে।

সব বেচে দিয়ে এখনও ওর কাশীতে দু'খানা বাড়ি আছে, একটা খুব ছোট বাড়ি—পাতালেশ্বরে, আর একটা একটু বড় লক্ষ্মীকুণ্ডর কাছে, মিছরিপোখরায়। এই বাড়িটায় ওপর-নিচে দু-তিন ঘরভাড়াটে ছিল—সম্প্রতি তেতলা খালি হয়েছে, ভোলাই মেরামত করিয়ে চুনকালি ফিরিয়ে দিয়েছে, ভাড়াটেও হাঁটাহাঁটি করছে, কিন্তু হেমন্ত ভাড়া বসাতে বারণ করেছে এখন।

কেন বারণ করেছে, তা ভোলাকে কিছু বলে নি। আসলে এই বাড়ি খালি হওয়ার প্রসঙ্গেই কথাটা মনে পড়েছে তার, এটাকে ভগবানের নির্দেশ বলেই মনে হয়েছে।

পাতালেশ্বরের বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক থাকেন, অনেকদিন ধরেই দেখছে ওঁকে, আগে সিমন চৌহাট্টায় ওর যে বাড়ি ছিল সেখানেই ইনি প্রথম ভাড়া আসেন—ইস্কুল মাস্টারী করতেন, রিটায়ার করেছেন, এখন দুটো-তিনটে টিউশনী ক'রে সংসার চালান। দু'টি ছেলেমেয়ে ছিল ভদ্রলোকের, ছেলেটি বি-এ পাস ক'রে একটা চাকরিও

পেয়েছিল, সেই সময় স্নায়ু শুকিয়ে আসা রোগ ধরে। ভদ্রলোক সাধ্যের অতীত চিকিৎসা করিয়েছিলেন। ইস্কুল থেকে যা পেয়েছিলন, যা হাতে ছিল, মায় স্ত্রীর ধুলিগুঁড়ি যা গহনা ছিল—সব বেচে দিয়েও সে ব্যয় বহন করেছিলেন, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারেন নি। এখন শুধু সন্তান বলতে ঐ একটি মেয়ে রমা, উনিশ কুড়ি বছর বয়স, স্কুলের পড়া শেষ করেছে, অর্থাভাবেই কলেজে দিতে পারেন নি তপনবাবু। বেশী বয়েসে বিয়ে করেছেন, ওঁর নিজেরই এখন চৌষট্টির কাছাকাছি বয়স, এ বয়সে আর এর চেয়ে রোজগার ক'রে টাকা জমিয়ে যে মেয়ের বিয়ে দেবেন তা সম্ভব হবে না, এ তিনি বোঝেন। অথচ কী করবেন তাও জানেন না, শুধুই বিলাপ করেন আর কপাল চাপড়ান।

ভাড়া ছিলেন ভদ্রলোক কুড়ি টাকায়—কিন্তু তাও দিতে পারেন না সব মাসে। হেমন্ত চায় না, ভোলাকেও তাগাদা করতে বারণ করে। দিতে হবে না, একথা বলতেও সঙ্কোচে বাধে। ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করতে পারেন। দেওয়া-না-দেওয়া মিলিয়ে চলছে। দিতে এলে 'না' বলে না, না দিলেও চায় না।

তপনবাবুর স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন কয়েকবারই, মধ্যে মধ্যেই আসেন। যখন বুকটা ফেটে যাবার মতো হয়—তখনই ছুটে চলে আসেন হেমন্তর কাছে—ব্যথার ব্যথী বলে। রমাকে ভাল ক'রেই দেখেছে হেমন্ত, ভারী শান্ত ও ভদ্র মেয়েটি। সুন্দরী বলা চলে না কোনমতেই—খারাপ দেখতেও নয়। মোটের ওপর হেমন্তর ভালই লাগে। তপনবাবুরা ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী উপাধি—শাণ্ডিল্য গোত্র। আগে চব্বিশপরগণার হরিনাভির কাছে দেশ ছিল, বহুকাল হল সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, সেখানে কে আছে আর কি আছে তাও জানেন না।

এই তপনবাবুকেই একদিন লোক দিয়ে ডেকে পাঠাল হেমন্ত। বলে দিল বিকেলের দিকে আসতে, তিনটে-চারটের সময়। এই সময়টা ভোলা কোনদিনই বাড়ি থাকে না—ভোলা আজকাল এই বাড়িতেই থাকছে, রাত্রেও কাছে শোয়, কারণ এক-একদিন ওঠা তো দূরের কথা, পাশ ফিরিয়ে দেবার জন্যেই লোক ডাকতে হয়।

তপনবাবু এসে বসতে মুনিয়াকে একটা অছিলায় বাইরে পাঠিয়ে দিল। যে বুড়ি রান্না করে সে এই সময়টায় পাঠ শুনতে যায় রাণীভবানীর গোপালবাড়ি—বাড়ি খালিই থাকে।

হেমন্ত কোনরকম ভণিতা না ক'রে সোজাসুজিই প্রশ্ন করে, 'রমার বিয়ে দেবেন?'

ভদ্রলোক রীতিমতো থতমত খেয়ে যান। তিনি ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, বোধহয় অনেক টাকা বাকী পড়েছে বলেই খোদ মালেকা ডেকে পাঠিয়েছেন। আর যা-ই হোক এমন অনুকূল অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আমতা আমতা ক'রে বলেন, 'দেওয়াই তো উচিত, মানে, দিতে পারলে তো বেঁচে যাই, কিন্তু সামর্থ্য যে একেবারেই নেই—সেই জন্যে কোন চেষ্টাও করি না।'

'যদি সামর্থ্যে কুলোয়? তেমন পাত্র যদি থাকে—দেবেন? একটু সাহসের পরিচয় দিতে হবে কিন্তু!'

'আমার যে একেবারেই কিছু নেই। কিছু নয় কিছু নয় ক'রেও কোন না দু-তিন হাজার খরচ হবে—'

'সে ব্যবস্থাও যদি হয় ?'

'তাহলে তো বেঁচে যাই মাসীমা। সত্যি বলছি, এই দুর্ভাবনায় আরও পাগল হতে বসেছি—'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, হেমন্ত শেষ করতে দেয় না, পুনশ্চ সোজা প্রশ্ন করে, 'আমার ভোলার সঙ্গে দেবেন ?'

'কে ?' চমকে ওঠেন তপনবাবু, 'কার সঙ্গে ? ভোলা—মানে, ঐ যে ভাড়া নিতে যায় ?'

'হ্যাঁ। ও-ই।'

'ও, মানে—ও তো এদেশী হিন্দুস্থানী—তারপর ও তো মানে—'

'আমার ঝিয়ের ছেলে। হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তপনবাবু, ও বি-এ পাশ করেছে। রিক্‌শার ব্যবসা করে। আমি ছ'খানা রিক্‌শা দিয়েছিলুম, সেই আয় থেকে আরও আটখানা করেছে। এখানের হিন্দী কাগজে কি কাজ করে, সেখান থেকেও দু'শো টাকার মতো পায়, তা বাদে আরও কোন কোন কাগজে রিপোর্টারের কাজ করে, সেখান থেকেও কিছু কিছু পায়। এখন আমার এখানে থাকে—প্রতিদিনের বাজার খরচা ও দেয়, আমার পয়সায় খায় না। স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী—সে তো নিজের চোখেই দেখেছেন। অমন চরিত্র আজকালকার দিনে লাখে একটাও মেলে না, সেগুলোও হিসেবে ধরুন।'

'তা ঠিকই। সবই তো বুঝছি। তবু সমাজ বলে একটা জিনিস আছে তো! আমরা ব্রাহ্মণ—'

'ভোলারও শুনেছি ব্রাহ্মণেরই ঔরসে জন্ম, তবে বৈধ নয়। আমি কোন কথাই গোপন করতে চাই না তপনবাবু, কিন্তু আপনি নিজের কথাটাও ভাবুন। এই মেয়ে যদি একটা ভাঙ্গী কি চামার ছেলের সঙ্গে প্রেম ক'রে রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে করত—কী করতেন ? এই কাশী শহরেই এমন বিয়ে ক'টা হল তার খবর রাখেন ?...আপনি তো নিজেই বলছেন যে, এক পয়সা খরচ করার ক্ষমতা নেই আপনার। তাহলে কি করবেন ? মেয়েকে তো একটা চাকরিতেও ঢোকাতে পারেন নি, এই বাজারে আর যে পারবেন বলেও মনে হয় না। আপনার এই বয়স আর এই শরীর—শোকাতাপা মানুষ, আপনি আর ক'দিন এইভাবে ছেলে পড়িয়ে সংসার টানতে পারবেন বলে মনে করেন ? আপনি অপারগ হলে কি মারা গেলে রমা আর রমার মার কি হবে ভেবেছেন ? তখন হয়ত—মেয়েদের যে দুর্গতি কল্পনা করলেও পাপ হয়—মেয়ের সেই দুর্গতিই দাঁড়াবে, সেই পথেই নামতে হবে, একথা ভেবে দেখেছেন কি ?'

ভেবেছেন বৈকি তপনবাবু, তবে বেশী ভাবতে পারেন নি। যখনই ভবিষ্যৎ ভাবার চেষ্টা করেন বুকের মধ্যে কেমন করে, সারা শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে—তখনই ও চেষ্টা ছেড়ে দেন, বাবা বিশ্বনাথের ওপর দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

আজও এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার ফলে তপনবাবু ঘেমে উঠলেন, আজও তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। জলে ডোবার মতো হলে মানুষ যেমন আঁকু-পাঁকু ক'রে ওঠে, এবং বিরাট হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে—তপনবাবুও

কতকটা সেইভাবেই আকুলিবিকুলি ক'রে উঠলেন ; ব্যাকুলভাবে কী যেন বলবারও চেষ্টা করলেন খানিকটা, তারপর বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে অন্যাদিনের মতোই হাল ছেড়ে দিয়ে করুণভাবে হেমন্তর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

হেমন্ত কিন্তু নির্মম। সে ওঁকে বৃথা-চিন্তার ঘরে—যে চিন্তায় কোন ফল হয় নি আজ পর্যন্ত এবং হবার কোন উপায়ও নেই—হাতড়াতে দিল না ; তেমনি বলেই চলল, 'আপনার আর ছেলেপুলে নেই যে, তাদের বিয়ের সময় এ প্রশ্ন উঠবে, আর ওদের ছেলেমেয়ের যখন বিয়ের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন এত খবর বোধহয় কেউ নেবেও না, তারা নিজেরাই নিজেদের বিয়ে ঠিক করবে হয়ত—ভোলার পদবী রায় বলেই চলে, রায় সব দেশেই আছে, সব জাতেই আছে, আমার নাতি বলে পরিচয় দেবে। ওর যে জন্মদাতা সে শুনেছি মুখুয্যে, ভরদ্বাজ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র বলেই চালাবে। এমন কত চলছে তার খবর রাখেন? এই কাশী শহরে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে যারা বাস করে—তাদের ক'জন বিবাহিত—তা কেউ জানে? দেখুন, এখানে আমারও অনেকদিন কাটল, অনেক দেখেছি। কলকাতা শহরেও ঢের দেখেছি, বিয়ের সম্বন্ধর সময় বংশ-পরিচয় নিয়ে একটু চাপ দিলেই বহু লোক আমতা আমতা করে।'

তারপর গলার সুর একটু নামিয়ে বলে, 'ওসব রেখে দিন। শুনুন, এ বিয়েতে রাজী হলে আমি ঐ বাড়ি রমার মাকে দান নয়—সাফ বিক্রীকোবালা লিখে দোব—দান বিক্রী যাকে যা খুশি করতে পারবেন, আপনার অবর্তমানে ঐ বাড়ির যা সামান্য ভাড়া ওঠে তাইতে সে চালিয়ে নিতে পারবে। আর মিছরিপোখরায় বাড়ি রমা-ভোলা দু'জনের নামে লেখাপড়া ক'রে দোব—রমাকেই দিতুম, আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই—নাতি-নাতবোয়ের বিয়ের যৌতুক। ওর তেতলা খালি হয়েছে, ঐখানেই সংসার পেতে দোব ওদের। ভোলার মা অনেকদিন ধরেই তীর্থে যেতে চাইছে, বৃন্দাবনে থাকতে চায়—সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে দোব, তবে মা বলে পরিচয় দেবে না তা নয়—অসুখ-বিসুখ হলেও অবশ্য ভোলার কাছে এসে থাকবে। মাকে দেখবে না কি মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করবে—সে শিক্ষা ভোলার নয়।...এখন ভেবে দেখুন কী করবেন। বরং রমার মার সঙ্গেও পরামর্শ করুন।...তবে আমার আর সময় নেই, উত্তর আমার কালকের মধ্যেই চাই।'

।। ৩৭ ।।

উত্তর আশানুরূপই পাওয়া যায়। দু'দিনের মধ্যেই দু' দিক থেকে দু'টি উত্তর আসে, হেমন্তর ভবিষ্যতে যবনিকা টেনে দিতে।

তপনবাবুদের রাজী হওয়াতে একটু বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। হেমন্ত খুশীই হল সে খবরে। মনে হল ভোলার সঙ্গে যাকে জন্মের মতো গেঁথে দিচ্ছেন—সে হয়ত একেবারে অনুপযুক্ত হবে না, ভোলার মূল্য বুঝবে।

তপনবাবুর স্ত্রী এই সম্বন্ধের প্রস্তাবে ঝুঁকে পড়লেও, তপনবাবুর প্রাচীনপন্থী ইস্কুল মাস্টারের মন শেষ পর্যন্তও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এ ধরনের মন বর্তমান বা ভয়াবহ

ভবিষ্যৎ—কোনটাই দেখতে পায় না, দেখে না—একটা অতীত সংস্কারের কংকালকে জড়িয়ে থাকে। সেও একটা আবছা অস্পষ্ট ধারণাতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। সে সংস্কারের যথার্থ মূল্যায়ন করার সামর্থ্য বা সময়ও নেই, বিধি-নিষেধের অর্থও বোঝার চেষ্টা করে না—বিচার বা যাচাই তো নয়ই। যে কায়া কবেই অন্তর্হিত হয়েছে, তার ছায়া—ছায়াও নয়, ছায়ার স্মৃতিটাকেই কর্তা বলে জেনে আসছে, সেইখানেই ধুনো-গঙ্গাজল ছড়াচ্ছে।

তপনবাবুর মন এই বদ্ধ সংস্কারের বন্ধন থেকে কিছুতেই হয়ত নিজেকে মুক্ত করতে পারত না, যদি না তাঁর স্ত্রী—নির্বোধ, যুক্তিবধির, তথ্যান্ধ স্বামীকে বোঝাবার সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষীণ সূত্র, সুদূর আশাকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন। বোধ হয় হঠাৎই মনে এসেছিল তাঁর কথাটা, হয়ত ভবিতব্যই যুগিয়ে দিয়েছিল—বলেছিলেন 'আচ্ছা, বেশ তো, মেয়েকেই একবার জিজ্ঞেস করো না, দ্যাখো না ও কী বলে!'

তপনবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ও আবার কী বলবে, ও কি বোঝে!'

'তা কেন বুঝবে না?' জবাব দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, 'একেবারে তো আর ছেলেমানুষ নয়। তাছাড়া ওকেই তো বুঝতে হবে। বলা যায় না, তোমারই যদি কোন ভালমন্দ হয়, এই তো লো প্রেসারের রুগী, না একটু ওষুধ, না একটু ভালমন্দ খাওয়া—তখন তো ওকেই দাঁড়াতে হবে, মাথার ওপর আর তো কেউ নেই দাঁড়াবার মতো।'

কী বুঝেছিলেন তপনবাবু কে জানে, বোধ হয় ভেবেছিলেন মেয়ে তাঁর মতেই মত দেবে—তিনি উদাসীনভাবে বলেছিলেন, 'তা দ্যাখো, তুমিই জিজ্ঞাসা ক'রো।'

ওঁরা ঘরের ঠিক বাইরে বসে কথা বলছিলেন, রমা ঘরে ছিল, সবই শুনেছে সে, সুতরাং নতুন ক'রে কোন প্রশ্ন করতে হল না। মা ঘরে ঢুকতে সে নিজেই সে-কথার সূত্র ধরলে, 'আমাকে বেহায়া ভেবো না মা, নিজের বিয়ের কথায় কথা বলছি বলে, তোমরা জিজ্ঞেস করলে তাই, নইলে হয়ত নিজেকেই কথাটা পাড়তে হত—লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, সেইটেই ভাবছি কাল থেকে—। শুধু তো আমার ভবিষ্যৎ নয়—তোমারও ভবিষ্যতের প্রশ্ন আছে—হয়ত বাবারও। বাবাও কত দিন বাঁচবেন—কীভাবে বাঁচবেন, কেউ বলতে পারে না।···আমার তো মনে হয়, বাবা যদি আমাকে কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাস করাতে পারেন, কিংবা এই বিদ্যেতেই একটা চাকরি ক'রে দিতে পারেন—যত অল্প টাকারই হোক—সে আলাদা কথা, নইলে এখানে বিয়ের কথাতেই রাজী হওয়া উচিত। বাবা কি মনে করেন উনি কোনদিন সঘরের একটা চলনসই পাত্র দেখেও বিয়ে দিতে পারবেন, না, দৈবাৎ কোন মোটা টাকা এসে পড়বে বলে ভাবছেন? ওঁর যা শরীর, বেশী দিন তো এমনভাবে ছুটোছুটি ক'রে খাওয়াতেও পারবেন না আমাদের। তার পর কী হবে? সেটা কি ভেবে দেখেছেন? আমি তো টিউশনীরও চেষ্টা করেছিলুম, তাও তো সবাই বি-এ বি-এস-সি পাস চায়—আর পাচ্ছেও তো—আমাকে কেন দেবে?'

কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলেছিল রমা, তপনবাবুর শুনতে কোন অসুবিধা হয় নি। কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন তিক্ততা ছিল, তাও তাঁর কান এড়ায় নি। এর পর, আর কিছু বলতে না পেরে, কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বলেছিলেন, 'কিন্তু এ তো

একরকম মেয়ে বিক্রী করাই হল মা।'

'দোষ কি বাবা? আগে যে লোকে পুষ্যিপুত্তুর দিত সেও তো শুনেছি—এই রকম কিছু কিছু সুবিধে বা টাকার বদলেই। তুমিও তাই মনে করো না। এমনিও তো—আমারই খাওয়ানো উচিত রোজগার ক'রে—তাই ধরে নাও।'

তবু, মজ্জমান ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের মতো, শেষ ক্ষীণ চেষ্টা করেন একটা তপনবাবু, স্ত্রীর প্রচেষ্টার পালটা হিসেবে, বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ছেলেটাকে তো তুই দেখেছিস। তুই পারবি ওকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে? লজ্জা করিস নি—বড় হয়েছিস, এত কথা বললি বলেই জিজ্ঞাসা করছি—'

এবার একটু দেরি হল উত্তর দিতে। এই বিলম্বতে তপনবাবুর মনে কোন আশার সঞ্চার হয়েছিল কিনা কে জানে—যদি বা হয়ে থাকে সমূলে বিনাশ ক'রে, মেয়ে ঈষৎ লজ্জিত, অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেছিল, 'কেন, অপছন্দ করার মতো কি শ্রদ্ধা না করার মতো তো কিছু মনে হয় না আমার!'

এর পর আর তপনবাবু অমত করতে বা অন্য কোন বাধা সৃষ্টি করতে ভরসা পান নি।

তপনবাবুর কাছ থেকে কথা পেয়ে এইবার ভোলাকে বলল হেমন্ত।

ভোলা একেবারে লাফিয়ে উঠল, 'না-না, এ কী করেছ! না না, এ হতে পারে না। আমি তো তোমাকে বলেইছিলুম। না, ছিঃ! এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি, আর ওঁরা—সত্যিই তো বাঙালী ব্রাহ্মণ, এ কখনও ওঁরা রাজী হন—'

হেমন্ত অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে ওঠে, 'তুই থাম দিকি! তারা রাজী হয়েছে—তুই এখন সেই চিন্তা করছিস! এখন থেকে আর অত ওদের দিক টানতে হবে না।'

চোখে তার প্রসন্ন কৌতুকের আভাস, অনেক দিন পরে।

কেমন যেন বোকা হয়ে যায় ভোলা। তারপর মুখ গোঁজ ক'রে বলে, 'সে আমি অত জানি না। আমি তো বিয়ে করব না বলেছি, সেটার কি?'

'উঁহু, বিয়ে করবি না বলিস নি, বলেছিলি আমি মলে তবে বিয়ে করবি। নইলে আমাকে যদি সে বৌ না দেখে—এই তো? কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে আমার। উল্‌টে বলেছিলি, আমি মলে নিশ্চয় বিয়ে করবি। জবান দিয়েছিলি আমাকে, ইয়াদ আছে?'

'আছে। তা তুমি বেঁচে থাকতে তবে সে-কথা উঠছে কেন?'

'বেঁচে থাকতে উঠছে না। এবার মরতেই যাচ্ছি যে। আমার সেবার ভাবনা—দেখার ভাবনার দায়িত্ব থেকে তোকে ছুটি দিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্যে কত দিন তোর বিয়ে আটকে রাখব বল্‌!'

'তার মানে? তার মানেটা কি কিছুই তো বুঝছি না। হেঁয়ালি ছেড়ে পরিষ্কার ক'রে বলো দিকি!'

এবার ভোলার অসহিষ্ণু হবার পালা।

হেমন্ত আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'আমি যে এখান থেকে

চলে যাচ্ছি রে, চিরদিনের মতো। আর থাকব না এখানে, আসবও না। ভাইঝির কাছে চলে যাচ্ছি। সেই যে নিভা, কত তো গল্প করেছি তোর কাছে—সেইখানেই চলে যাচ্ছি।'

'সে কি! না, সে হবে-টবে না। না, আমার চোখের বাইরে যেতে দোব না।' দরকার হয় তো সেই ভাইঝিই এখানে আসুক। তুমি যাবে কেন? না, সো নেহি হোগা!'

বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভোলা।

আবারও শুষ্ক কুঞ্চিত-চর্ম চোখের কোলে এক ঝলক তপ্ত অশ্রু উছলে ওঠে। আনন্দের, সুখের অশ্রু।

'দূর ক্ষ্যাপা! সে আসবে কি, তার জাজ্বল্যমান সংসার। শোন, পাগলামি করিস নি। দেখছিস তো ক্রমশ আমি ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছি। কেউ ধরে না তুললে আমি উঠতে পারি না। এক উপায়, এখানে দিন-রাত নার্স রেখে থাকা। তা সে আজকালকার নার্স তো দেখছি, সব ফাঁকিবাজ। তা ছাড়া এক তুই—তোর কাজ-কর্ম ফেলে দিন-রাত পাহারা দেওয়া তো আর তোর সম্ভব নয়, এই জোয়ান বয়েস, উন্নতির সময়; ভূতের মতো খাটবি এখন—একটা মড়া বুড়িকে আগলে বসে থাকবি কেন?'

পিঠের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে দেয় রাগ ক'রে, বলে, 'না না, তা হোক। কেন, তারাই আপনার লোক—আমি কেউ নয়! তুমি আমার নিজের ঠাকুমা হলে কি করতে? না কি আমিই ফেলতে পারতুম? সে হবে না, তাহলে আমাকেও সেখানে যেতে হয়।'

'তা হয় না।' এবার হেমন্তর কণ্ঠস্বরেও অভ্যস্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, 'তোর কাছ থেকে দূরে থাকব বলেই আমি এই নির্বাসনে যাচ্ছি। ওরে, ছেলেকে হারিয়েছি—সে আজ ষাট বছরের কথা—তার পর আর তোর মতো এত আপন, এত বুকের ধন আর কাউকে পাই নি। তোর যদি কোন ভাল-মন্দ হয়—সে আমি সইতে পারব না। বুড়ো বয়সে—গঙ্গায় গিয়ে ডোববার শক্তি নেই, মেঝেতে মাথা ঠুকে মরতে হবে।'

ভোলা বলে উঠতে যায়, 'যত সব বাজে কথা আর বাজে ভাবনা তোমার—'

ওর মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে হেমন্ত বলে, 'হয়ত বাজে, কিন্তু জানিস তো বুড়ো মানুষের মাথাতে একটা কথা ঢুকলে আর সহজে যেতে চায় না। তাছাড়া—জীবনের শেষ সাধ আমার—তোর বৌ দেখে তোকে থিতু দেখে যাব। কোন সাধই তো মিটল না জীবনে—ভেবেছিলুম টাকা হাতে এলে সব হবে। টাকাটাই আরও অভিশাপ হয়ে উঠল। এই শেষ সাধটা মিটিয়ে দে। দুঃখ করিস নি—তোর কাছ থেকে এই জীবনের শেষে যা পেলুম, আর কারও কাছ থেকেই পাই নি। কে জানে তারক বেঁচে থাকলে বিয়ে-থা করলে কী মূর্তি ধরত!···তোর হাসিমুখ দেখে নিজেও হাসিমুখে সরে যাই—তুই আর বাধা দিস নি।'

ভোলার চোখও জলে ভরে ওঠে, সে হেমন্তর কোলে মাথাটা গুঁজে দিয়ে বলে, 'কেন আমাকে এমন ক'রে পর ক'রে দিচ্ছ বড়মা, কেন কেন? কী করলুম আমি তোমার? এই সময় চলে যাচ্ছ, কোথায় কখন মরে যাবে—টেরও পাব না, না না। সে ভাল নয়। বিয়ে না হয় করছি—তুমি এখানে থাকো লক্ষ্মীটি!'

'মরার সময় যদি খবর না পাস, আমি জনে জনে বলে যাব—মরার খবর যেন তোকে

অতি অবিশ্যি দেয়, তুই এখানে আমার পিণ্ডি দিস, সেই আমার আসল পাওনা।…যদি পরলোকে স্বর্গ বলে কিছু থাকে—তোর পিণ্ডি আমি হাত পেতে নোব।'

নির্জন ঘরে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে। যেন অন্ধকার নেমে আসে এমনি ক'রে একটি অতি প্রবীণ ও একটি অতি নবীন জীবনেও…

ঘরে আলো রইল কিনা, আলো জ্বলল কিনা—এদের কেউ টের পেল না, চোখ চেয়ে দেখলও না। দু'জনের মনের কথা দু'জনের চোখের জলেই প্রকাশ পেল শুধু। আর কারও কিছু বলার প্রয়োজন রইল না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে হেমন্তই জোর ক'রে ওর মুখখানা তুলে ধরে, প্রাণপণে লঘু হবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'অমন করিস নি পাগল, এই সময় তুই কোথায় আমাকে মনের জোর যোগাবি মদত দেওয়া না কি যেন বলিস তোরা—না তুই-ই কেঁদে ভাসাচ্ছিস…বড্ড বুড়ো হয়েছি রে, তুই সাহায্য না করলে তো যাওয়ার আগে এত কাজ সেরে যেতে পারব না।…অনেক, অনেক কাজ যে, এতদিন ফেলে রাখাই উচিত হয় নি। এবার চটপট সেরে নিতে হবে, তুই একটু শক্ত হয়ে দাঁড়া, নইলে আমি এসব করব কী করে?'

সত্যিই অনেক কাজ। আরও কাজ বাড়ল। বাড়িয়ে দিল নিভাই।

নিভার চিঠিটা এসেছে দুপুরে। তপনবাবু তাঁর বার্তা জানিয়ে যাওয়ার খানিকটা আগে।

বুক যে এখনও অনেক শক্ত আছে, স্নায়ু যে পেশীর থেকে এখনও অনেক বলবান, আজ তা আর একবার নতুন ক'রে বুঝল হেমন্ত।

নিভার চিঠিতে বুকে যে প্রলয়ের ঝড় উঠেছিল—আবেগ-স্মৃতি-বেদনা-হতাশা—সব মিলিয়ে, সে একটা সব অনুভূতি একাকার-করা তুফান, সাইক্লোন বললেও বুঝি তাকে বোঝানো যায় না। তাও তো শান্ত হয়ে, নিথর হয়ে বসে থেকে সহ্য করল। কৈ, হার্টও তো ফেল করল না, আজকাল যাকে স্ট্রোক বলে তাও তো হল না! বহু আঘাত সহ্য করারই বুঝি ফল এটা! পাথর হয়ে গেছে বুক, অসাড় হয়ে গেছে অনুভব শক্তি।

তার পর আবার তপনবাবুর এই খবর।

আনন্দ? হ্যাঁ, আনন্দই তো হবার কথা। যা চেয়েছিল, তাই পেল, তাই হল। আনন্দ হবে বৈকি!

কিন্তু,—একটা জিনিস কখনই করে নি হেমন্ত এতখানি জীবনে, সেটা হচ্ছে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভাবের ঘরে চুরি করা, নিজেকে ঠকানো—এটা তার ধাতে সয় না। এক-আধবার করতে গিয়ে দেখেছে ওর ভেতরে অতিজাগ্রত, অতিসচেতন যে ব্যক্তিসত্তা আছে—বা বিবেক, কী বলবে?—তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি।

তপনবাবুর এই সম্মতি জানানোতে, বিশেষ রমার বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, তার ভোলার দিকে ঈষৎ আকর্ষণের আভাস পেয়েও খুশী হবার কথা, হয়েছেও; কিন্তু তার মধ্যেই যে কোথায় একটা বেসুরও বেজেছে, কোথায় একটা আশার-পিছনকার-আশাভঙ্গ হওয়ার সামান্য একটু হতাশাবোধ, শেষ অবলম্বন হারিয়ে যাওয়ার উদ্বেগও—

সেটাই বা অস্বীকার করে কী ক'রে ?

বুকের মধ্যে একটা হিম হিম ভাব, সেই সঙ্গে একটু যেন—কী বলবে হেমন্ত—ঈর্ষা কি ?—ঈর্ষা বললে হয়ত ঠিক বোঝানো যায় না, অথচ আর কোন সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় না—একটা বিরূপ অনুভূতিও কি বোধ করে নি ? যখন তপনবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে যুক্তি দিয়ে লোভ দেখিয়ে প্রস্তাবটা পেড়েছিল তখন কি মনের অগোচরে তাহলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল সেই সঙ্গে যে, তপনবাবু হয়ত রাজী না-ও হতে পারেন ? আর তাহলে অন্তত—মেয়ে খোঁজার অজুহাতে আর ক'টা দিন সময় পাওয়া যাবে ?···এখন আর কোন ছুতো কোন অজুহাতই রইল না—তাই কি এই একটা সর্বস্ব হারাবার ভাব বুকের মধ্যে ?···এটা কি ভোলা পর হয়ে যাবারই আশঙ্কা, তাকে চিরদিনের মতো হারাবার ভয় ?···সত্যিই তাহলে পর হয়ে গেল ?···জীবনের এই শেষ অবলম্বন ছেড়ে তার সেই কোন্ সুদূরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে আর কোন বাধা রইল না ?···

কিন্তু সে যা-ই হোক, সময় আর মোটে নেই।

সত্যিই অনেক কাজ তার, অনেক দায়িত্ব !

এ কাজের বোঝা নিভাই চাপিয়ে দিয়েছে—তার চিঠিতে।

চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দিয়েছে, সাগ্রহে। আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু তার ভাইঝি তার ভাইঝির মতোই জবাব দিয়েছে।

লিখেছে—

'এতদিন পরে তোমার চিঠি পাইয়া যেমন আনন্দও হইল, তেমনি কিছু দুশ্চিন্তাও যে না হইতেছে তা নয়। কথাটা অনেক দিন ধরিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে, প্রায়ই আলোচনাও করি। মেজদা (সুরেনদা)-ও এই বাড়িতে আসিয়াই কথাটা বলিয়াছিলেন, "পিসীকে এখানে রাখা যায় না ? তাহলে খুব ভাল হয়। কোথায় পড়ে আছে, অনাত্মীয়দের মধ্যে ! বিশ্বনাথের ওপর ভরসা ক'রে ছিলুম, সে-ও তো গোরার পথই ধরল। পিসীর বয়সও বোধহয় একশো পেরিয়ে গেল, এখন আপনার লোকের কাছেই থাকা দরকার। অন্তত মরার সময় একটু জল, মরার পর আগুন দেবার জন্যেও।"

'তা তবু আমরা ভরসা করি নাই। অবস্থায় আগের সচ্ছলতা নাই, তাহা তো তুমি জানই। কোনমতে সংসার চলিয়া যাইতেছে—এই মাত্র। বাড়িটা পুরানো আমলের, পাড়াগাঁয়ের বাড়ি, মোটা মোটা মাটির গাঁথুনি দেওয়াল। দর-দালানে ঘেরা বাড়ি। সেজন্য একটু স্যাঁৎসেঁতে ভাব, চারিদিকে বাগান থাকা সত্ত্বেও ঘরে যেন তেমন হাওয়া খেলে না। এখনও ইলেক্‌ট্রিক আসে নাই, তবে শুনিতেছি দুই-চারি দিনের মধ্যেই আসিবে, টাকা জমা লইয়াছে। মা গঙ্গাও এখান হইতে অনেক দূরে, মরিলে গঙ্গায় দেওয়া বোধ হয় হইবে না। তবে জ্যান্তে তো অনেক গঙ্গা-স্নান করিলে, বোধ করি হাজার বার পুরাইয়া গেল—মরার পর দেহটা, দেহের ছাইটা গঙ্গায় গেল কিনা, অত দেখার প্রয়োজন বা কি !

'এসব অসুবিধা জানিয়াও যদি আসো—আমরা মাথায় করিয়া রাখিব। যতদিন আমরা দুই বুড়োবুড়ি আছি, যত্নের অভাব হইবে না। কবে নাগাদ আসিতে পারো জানিলে তোমার জামাই গিয়া লইয়া আসিবে। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বলিয়া

রাখিতেছি—খরচপত্র দিবার চেষ্টা করিও না, তোমার কাছ হইতে এক পয়সাও লইতে পারিব না। যদি আত্মীয়ের মতো, গুরুজনের মতো আসিয়া থাকিতে চাও তো এসো—আবারও বলিতেছি, মাথায় করিয়া রাখিব, সাধ্যমতো নগেন বাঁড়ুয্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করিব।

'একটা কথা বলি, কিছু মনে করিও না। টাকার অহঙ্কার বড় বেশী তোমার। তুমি সর্বাগ্রে টাকা দিয়া মানুষকে কিনিয়া নিতে, তাহাকে বিনত করিতে চেষ্টা করো—সেই জন্যই জীবনে বার বার ঘা খাও। আমি বলি কি, ও পাপ চুকাইয়া দিয়া চলিয়া এসো। টাকার চিন্তা থাকিলে মরিয়াও সুখ হইবে না। টাকার জন্য যাহারা আত্মীয়তা করিবে তাহারা কেহ আত্মীয় নয়। অনেক দিন তো হইল, আর কতকাল ও বোঝা টানিবে? যাহাকে হোক দিয়া দায়মুক্ত হইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এসো। ঐ বোঝা নামিয়া গেলে অনেক শান্তিও পাইবে।

'অনেক কিছু হাবড়হাটি বকিয়া গেলাম। নিজগুণে ক্ষমা করিও। আমাদের সকলের প্রণাম লইও। ইতি— সেবিকা নিভা।'

বুকের মধ্যে যে ঝড় ওঠে তা যত বড় ঝড়ই উঠুক, ভেতরে উঠে ভেতরেই মিলিয়ে যায়। শক্ত হতেই হবে, এতকাল এত ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে এসে আজ আবেগের কাছে হার মানবে না—এটা ঠিক। গোটা নাটকটা পেরিয়ে এসে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে খুঁৎ রাখা চলবে না। দর্শকদের বাহবার মধ্যে বিদায় নেওয়া চাই।

অবশ্য অন্যদিক থেকে জোরও পেয়েছে খানিকটা।

নিভার চিঠিটা তার গুরুমন্ত্রের কাজ করেছে। মুক্তির, মোক্ষের সন্ধান দিয়েছে। আশ্চর্য, একথাটা এতদিন কেউ বলে নি কেন?

সত্যিই তো এই টাকাটা, এই বিষয়টাই পায়ে বেড়ির মতো পেছনে বাঁধা পাথরের মতো তাকে বেঁধে রেখেছিল। এই টাকার অহঙ্কার, টাকার শক্তি সম্বন্ধে একটা অতি উচ্চ অপ্রাকৃত ধারণা তার জীবনে বহু অশান্তি এনেছে, তাকে বেঁধে মেরেছে। অথচ এ টাকায় সে কাউকেই আপন করতে পারে নি। যে কিছুটা আপন হয়েছিল—সে সুরেন তার এক কপর্দকও আশা করে নি, নেয় নি। ভোলা যে আপন হয়েছে তার পিছনে একটু স্নেহ একটু উৎসাহ ছাড়া সে প্রায় কিছুই খরচ করে নি।

শুনেছে আগে নাকি চন্দননগরে—ফরাসীদের রাজত্ব ছিল, তখন কেউ মাতলামি বা অন্য কোন ঐ ধরনের অপরাধ করলে 'তুড়ুম ঠুকত'। একটা তেকোণা কাঠের বেড়ি-মতো ফ্রেম গলায় পরিয়ে হাতটা ওপরে বেঁধে দিয়ে ঐ কাঠের ফ্রেমের তিনটে কোণ থেকে তিনটে পাথর বা লোহা ঝুলিয়ে তাকে রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হত, প্রতি পদে ঐ পাথরগুলো এসে হাঁটুতে লাগত, অথচ বেচারীরা থামতেও পারত না, চলতেই হত। যত আস্তে যত সাবধানেই চলুক না কেন—ঐ আঘাত থেকে অব্যাহতি ছিল না। তা ওরও এই সম্পত্তি চিরদিন পদে পদে তাকে আঘাতই দিয়ে যাচ্ছে—রেহাই পায় নি একটি মুহূর্তও।

এতদিনে ভুল ভেঙেছে—আর দেরি করবে না সে।

এবার সে ছুটি নেবে। নিঃস্ব, রিক্ত হবার পরম শান্তি উপভোগ করতে চায় সে।

তার জীবনে এ হবে এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

শুরু করল এক অদ্ভুত ব্যাপার দিয়ে। ভোলার সঙ্গে কথা হওয়ার পরের দিনই সে পাড়ার পণ্ডিতমশাই জ্যোতি কাব্যতীর্থকে ডেকে পাঠাল। কোন মেয়ে-ইস্কুলে পণ্ডিতি করেন ভদ্রলোক, অবসর সময়ে কিছু কিছু যজমানিও করেন, তবে সে খুব সীমাবদ্ধ ক'টি ঘরে! তাঁকে দিয়ে দু'-একটা কাজ করিয়েছে হেমন্ত, অক্ষয়-তৃতীয়ার কলসী-উৎসর্গের ব্রত ইত্যাদিতেও তাঁকেই ডেকেছে। বিশুর পৈতেও দিয়েছেন তিনি।

তাঁকে ডেকে ভোলার বিবাহের একটা দিন দেখতে বলল, খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে চায় সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শমন শিয়রে তার—শিয়রে বলা বোধ হয় ভুল—পায়ে ধরেছে তার, চলৎশক্তিরহিত ক'রে দিয়েছে প্রায়। সময় আর মোটে নেই। এখন ওর যা জ্ঞাতব্য—পণ্ডিতমশাই এ-বিয়ে দেবেন কি?

পণ্ডিতমশাই লোভ ও সংস্কার দুইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দোল খেয়ে বললেন, 'না-ই বা দিলুম মা! আমি বরং অন্য ভাল লোক দেখে দিই—?'

'দিলেনই বা!' হেমন্তর শাণিত কণ্ঠ যেন ওঁর গলায় কেটে কেটে বসে 'আপনি যত বিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতমশাই, সকলেরই কি ঠিকুজী-কুলুজী উলটে দেখতে গিয়েছিলেন—তারা সবাই বৈধ সন্তান কিনা? না তাদের সকলের বাপ-মার বিয়েতে আপনি উপস্থিত ছিলেন?···পণ্ডিতমশাই, দিন-কাল বড় আজব পড়েছে---আপনিও মেয়ে ছেলে নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর করেন, আপনার নাতি বা নাতনী যে নিজের জাতেই বিয়ে করবে তা আপনি জোর ক'রে বলতে পারেন? আপনার পাশের বাড়িতেই তো শুনেছি সেদিন বদ্যির ছেলের সঙ্গে শুঁড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে!'

পণ্ডিতমশাই ভাঙেন তবু মচকান না, কাষ্ঠহাসি হেসে বলনে, 'না, সে কোন কাজের কথা নয়। তবে আপনি বলছেন যখন—তখন দোব।'

'তাহলে দিন দেখুন একটা। আর একটা কথা, খুব গরিবের মেয়ে, পয়সার জন্যে বিয়ে হচ্ছে না, এমন আপনার সন্ধানে আছে? যথার্থ দুঃস্থ? মানে টাকা দিলে বিয়ে হয় এমন? তাহলে—যদি এর মধ্যে মানে এই মাসখানেকের মধ্যে বিয়ে ঠিক করতে পারে—খরচা যা লাগে আমি সব দোব!'

কথাটা নিচের তলার ভাড়াটে মহলে, আশপাশেও বলে দেয় সবাইকে।

অনেকেই হাঁক-পাঁক করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটির বেশি পাকা সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এমন আবুহোসেনী খেয়ালের জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না, যারা অতি দরিদ্র, তারা কেউ মেয়ের পাত্র খোঁজও করে না, দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। যে তিনটি পাওয়া গেল—তিনজনেরই পাত্রী ও পাত্রপক্ষকে ডাকিয়ে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ ক'রে পুরো খরচা দিয়ে দিল, মায় সম্ভাব্য তত্ত্ব-তাবাসের খরচা সুদ্ধ।

যত তাড়াই করুক, দেড়মাস সময় লেগে যায় সব গুছিয়ে নিতে।

অনেক কাজ সারতে হয়েছে এর মধ্যে।

রমার মাকে ও ভোলাদের—বাড়ি দু'খানা লেখাপড়া ক'রে দিয়েছে। ওদের বিয়ের

সব কাজ উৎসব সারা হয়ে গেছে। একদিন চেয়ারে ক'রে তেতলায় উঠে ওদের সংসারে কাটিয়েও এসেছে, রমাকে দিয়ে রাঁধিয়ে সেখানে বসে খেয়েছেও সেদিন। ওদের সংসার গুছিয়ে দিতেও কম সময় লাগে নি। আগেকার দিন হলে নিজেই রিক্‌শা ক'রে সমস্ত শহর চষে ফেলত, এখন ফি-হাত ভোলার শরণাপন্ন হতে হয়। এবিষয়ে স্বভাবতই ভোলার একটা কুণ্ঠা আছে, সেজন্যে লোক ডাকিয়ে এনে বাড়িতে বসে ফরমাস দিতে হয়। মনের মতো বেছে দেখে নিতে পারে না বলে ছটফট করে, সময়ও লাগে।

খাট-বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, বসার চেয়ার, সোফা, বাসন, মীটসেফ—তা ছাড়া গহনা। খুব আতিশয্য করে নি—ঐশ্বর্যের শেকল আর কাকেও পরাবে না, জড়োয়া গহনা একখানিও দেয় নি—তবু গা-সাজানো সবরকম—সেও তো কম নয়।

ভোলা বলেছিল, 'বাসন-কোসন তো তোমারই একগাদা রয়েছে। এত ছিষ্টি খরচ করছ কেন—মিছিমিছি?'

তাতে হেমন্ত জবাব দিয়েছে, 'এই তো প্রথম খরচ ক'রে সুখ হচ্ছে রে। তাছাড়া—সবই পড়ে থাকবে, আমি চলে গেলে যদি কিছু রাখতে চাস রাখিস। তবে আমি বলি কি, আমার কোন জিনিস নিয়ে দরকার নেই। অবশ্য স্মৃতি হিসেবে যদি রাখতে ইচ্ছে হয়—যা খুশি রাখিস, সব রাখলেও ক্ষতি নেই। তোর যা ইচ্ছে হয় করিস।'

মুনিয়ার নামে দু'হাজার টাকা পোস্ট-অফিসে জমা ক'রে দিয়েছে। বলে দিয়েছে, 'এটা তোর অসুখ-বিসুখের জন্যে রইল—যদিও এতেও না কুলোয়, ছেলে তো রইলই, ছেলে দেখবে। তবে মনে হয় এতেই তোর চলে যাবে।'

আরও একটা ব্যবস্থা সে ক'রে দিয়েছে মুনিয়ার, বৃন্দাবনে একটি মঠে হাজার-তিনেক টাকা দিয়ে লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছে—যতদিন মুনিয়া বাঁচবে তাঁরা একটা ঘর দিয়ে রাখবেন এবং দু'বেলা প্রসাদ দেবেন। সব ব্যবস্থা ক'রে মঠের লোকের সঙ্গে মুনিয়ার মোকাবেলা করিয়ে মুনিয়াকে বলে দিল, 'তাই বলে তোকে জোর ক'রে পাঠাচ্ছি না—যখন খুশি যতদিন খুশি এসে ছেলের কাছে থাকিস, তবে তুই বৃন্দাবনে থাকতে চেয়েছিলি—সেই জন্যেই পাকা বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম। আর কি জানিস, বেটা-বৌয়ের সংসারে চিরদিন না থাকাই ভাল। ওতে বড় অশান্তি হয়। মাঝে মাঝে আসবি, আদর খেয়ে চলে যাবি সেই ভাল।'

আরও কিছু কিছু খুচরো খয়রাতের কথাও মনে ছিল তার। এই দু'বাড়ির নিচের তলার যত দরিদ্র ভাড়াটের দল, আশপাশের কিছু-কিছু হতভাগ্য গৃহস্থ; বাকী যা কিছু থাকবে—উকীলের প্রাপ্য এবং আইনের খরচা বাদে—শহরের ক'টি হাসপাতালে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। অযোধ্যার এক হাসপাতাল এসে ধরেছিল এই দান-ছত্রের খবর পেয়ে—তাদেরও কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করল—তারা তারক আর কমলাক্ষর নামে দু'টি ব্লক ক'রে দেবে সেখানে।

তবে এসব হিসেব-নিকেশ লেখা-পড়ায় কিছু সময় লাগবে। অতদিন থাকবে না সে। প্রতি রাত্রেই বৌকে সেখানে ফেলে ভোলা এ-বাড়ি এসে শোয়—কারও কোন কথাই শোনে না। এতে আনন্দও যতখানি, দায়িত্বও সেই পরিমাণে বেশী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটি দেওয়া ও নেওয়া দরকার। বিয়ের চার-পাঁচটা আর অষ্টমঙ্গলার দিন

ভোলা থাকতে পারে নি, হেমন্তই দেয় নি থাকতে—ও নিজেই বলে 'মড়া আগলে বসে থাকা'—কিন্তু সেই ক'টা দিনেই যে অসহায় ভাব বোধ করেছে সে, মনের গোপন প্রকোষ্ঠে ক্ষতি-বোধের বেদনা ও অকারণ সূক্ষ্ম একটা অভিমান—তার পর আর নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। দ্রুত সরে যেতে হবে তাকে, যত দ্রুত হয়। সই-সাবুদ সব ক'রে দিয়েছে, এখন যেটুকু কাজ বাকী আছে—উকীল করবে। ঠিক ঠিক করে কিনা দেখবার ভার রইল ভোলার ওপর। একটা আম-মোক্তার-নামাও ক'রে দিয়েছে ভোলার নামে—যদি কোন দরকার পড়ে শেষ মুহূর্তে। আর, সব ফেলে মুক্ত হয়েই যখন যাচ্ছে—তখন পেছনে কী হল তা দেখার অত মাথা-ব্যথাও নেই।

এবার যাত্রার পালা।

ভোলাকে বলে, 'অতুলকে তো সব বলাই আছে। একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে এবার, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন এসে নিয়ে যায়।'

'দাঁড়াও, ভট্টাচার্যিমশাইকে পাঁজি দেখতে বলি—দিন দেখি!'

'দূর বোকা! আমি যাব তার আবার দিনক্ষণ কি! মরতেই তো যাচ্ছি। মরার বাড়া তো গাল নেই।'

'মরার বাড়াও গাল আছে বৈকি। একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে যদি হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকো—কী প্যারালিসিস হয়—তখন?···না না, অদিনে অক্ষণে যাওয়া হবে না।'

'ঐ ক'রে তুমি যাওয়াটা পিছিয়ে দিতে চাইছ, না? সে ওষুধও আমার আছে। পাঁজী দেখতে ভটচার্যিকে ডাকতে হবে না। দিন আমিই দেখে নিচ্ছি। আমি জানি—'

'কিন্তু অতুলবাবুকেই বা আসতে লিখছ কেন? বুড়োমানুষ আবার এত দূর—?'

'সে-ই তো নিয়ে যাবে রে!'

'সে কিসের জন্যে নিয়ে যাবে! আমিই যখন যাচ্ছি, তখন আর তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?'

'তুই কোথায় যাবি?' হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'না না, দরকার নেই। সে-ই আসবে বলেছে—মিছিমিছি—'

'উ-সব বাত ছোড় দেও মাজী।···সো নেহি হোগা। আমি গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসব—এক বাত। নইলে যাওয়া হবে না।' ভোলাও দৃঢ়স্বরে বলে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে হেমন্ত। অতুলকে আসতে বলা মানে তার খানিকটা খরচান্তও বটে। এ গাড়িভাড়াও সে নেবে না। নিভাকে লিখেছিল যে, 'কিছুই কি নিয়ে যাব না? শ্রাদ্ধের খরচটা অন্তত রাখ?' তাতে সে উত্তর দিয়েছে, 'শ্রাদ্ধ আমরা যেমন পারি তেমনিই করব—তার জন্যে তোমার টাকা লাগবে না। ক'টা তোমার উপযুক্ত বেটা আছে শুনি যে, দানসাগর কি বৃষোৎসর্গ করতে হবে? যতটুকু যা হওয়া দরকার —আশা করছি সেটুকু করতে পারব।' সুতরাং অতুলের গাড়িভাড়া যে সে নেবে না, এও জানা কথা।

সে বলল, 'বেশ, তুই-ই চ সঙ্গে। তবে একটা কথা—তুই হাওড়া থেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে আসিস। এটা আমার হুকুম।···সেখানে—সেখানে কেমন ঘর-বাড়ি,

কী অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ব—সে তোর না দেখাই ভাল। মিছিমিছি হয়ত দুঃখ পাবি। আর সেখানে যদি তেমন ভাল না লাগে, তুই চলে আসার সময় আমারও কষ্ট হবে, ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।···কী লাভই বা? সে অবধি না-ই গেলি!'

ভোলা যেন হঠাৎ বড় বেশী নির্বাক হয়ে যায়। প্রাণপণে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে শুধু বলে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

তা বলে সে যে ঠিক এমন কান্ড করবে, তা কে জানত!

ট্রেন থেকে নামতে অতুল নিভা, নিভার দুই ছেলে যখন এসে প্রণাম করছে, কুশল-প্রশ্ন ইত্যাদিতে কয়েক মিনিট ব্যস্ত থাকবে হেমন্ত—এ-তো স্বাভাবিকই, তার পরই এদের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আর ভোলাকে দেখতে পেল না। মালও নামানো হয় নি গাড়ি থেকে—ভোলা কোথায় গেল? প্রথমটা ভেবেছিল বাথরুমে গেছে হয়ত, কি এদিক-ওদিকে কী কাজে গেছে, কিন্তু বেশ খানিকটা অপেক্ষা ক'রেও তার দেখা পাওয়া গেল না, প্ল্যাটফর্ম ক্রমশঃ জনবিরল হয়ে এল।

এরা সকলেই বিস্মিত, উদ্বিগ্নও।

নিভার ছোট ছেলে বলল, 'কী রকম দেখতে—মানে মোটামুটি—বলুন না! তাহলে খুঁজে দেখি।'

হেমন্ত তখন একটা বাক্সর ওপর বসে পড়েছে।

অকস্মাৎ আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে পা-দু'টো। বুকটাও বড় খালি-খালি, কেমন যেন কাঁপছে—

সে চোখ বুজেই অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'না ভাই। তাকে আর খুঁজে লাভ নেই। চলো আমরা চলে যাই—'

নিভা একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

হেমন্ত বিশ্বাসঘাতক চোখদু'টোকে সামলাতে না পেরেই বোধহয় চোখের পাতা বুজে ব.স ছিল প্রাণপণে, এখন হাসির একটা চেষ্টা ক'রে আস্তে আস্তে এক রকমের বিকৃত-কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'ওকে বলেছিলুম হাওড়া থেকেই তুই ফিরে আসিস, ওদের জিম্মে ক'রে দিয়ে—ওদের বাড়ি পর্যন্ত তোকে নিয়ে যাব না—একটু জোর ক'রেই বলেছিলুম—সেই জন্যেই, সেই অভিমানেই বোধহয় সরে পড়েছে।'

তারপর আরও আস্তে, কতকটা যেন আপন মনেই বললে, 'কিম্বা, কিম্বা বলে-কয়ে যেতে পারবে না বলেই—। তোদের সামনে অতবড় ছেলেটা চোখের জল ফেলে ব্যাভ্রম হতে চায় না—। কিম্বা আমাকেই কষ্ট দিতে চায় নি।···তা ভালই তো। ভালই করেছে। এ-ই ভাল হল।'

তারপর—ঈষৎ উৎসুক, কেমন যেন ছেলেমানুষের মতোই নিভাকে বলে, 'সেই ঠিকানাটা তোকে লিখে পাঠিয়েছিলুম, রেখে দিয়েছিস তো, যত্ন ক'রে? আমি ম'লে ওকে অতি অবশ্য খবরটা দিস। আমি কাশীতে বসে কথা দিয়ে এসেছি—বাক্যদত্ত।'

বলে নিজেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে অভ্যাসমতোই হাতটা বাড়ায়—এসব ক্ষেত্রে

ভোলাই প্রয়োজন বুঝে চট ক'রে এসে ধরে তোলে, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে দীর্ঘকাল —এখন সে অবলম্বন না পেয়ে বসে পড়ে আবার।

আবারও আপন মনেই যেন চুপি চুপি বলে, 'বেশ করেছে। ভালই করেছে। এই তো ভাল, এই ভাল হল।'

—শেষ—

পৌষ ফাগুনের পালা

দ্বিতীয় খণ্ড

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অনেক আশা করে ঐন্দ্রিলাকে চিঠি দিয়েছিলেন শ্যামা। ভেবেছিলেন এত বড় প্রলোভনের পর সে আর একদিনও দেরি করবে না—চলেই আসবে। তিনি তাঁর মাপেই অর্থের মূল্য নির্ধারণ করেন। তাই মাসিক তিন-চার টাকা তাঁর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য মনে হয়েছিল। যদিও মনে মনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করে রেখেছিলেন, সে সব মাসে নিয়মিত ও টাকাটা না দিলেও চলবে—'দিই দিচ্ছি' করে ওটা মধ্যে মধ্যে ফেলে দিলেই হবে। সেখানে তো আর কিছু জলে পড়ে নেই মেয়ে—শ্বশুরবাড়ি আছে, দুবেলা দু মুঠো ভাতও জুটছে—আর চাই কি পরনে একেবারে কিছু না থাকলে ন্যাংটো করেও রেখে দিতে পারবে না, নিজেদের লজ্জা নিজেদেরই ঢাকতে হবে। তাছাড়া—ঠিক অত দুঃখ কষ্ট হলে—মেয়ে পড়েই বা থাকতে চায় কেন? শ্বশুরবাড়ি থেকে নড়তে চায় না যখন, তখন সেখানে মাঝারি রকমের একটা কিছু ব্যবস্থা আছেই নিশ্চয়।

কিন্তু এ সব হিসেবই তাঁর কতকটা কালনেমির লঙ্কা ভাগ হয়ে দাঁড়াল। এক এক করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল—না এল ঐন্দ্রিলা আর না এল তার কাছ থেকে কোন চিঠি। এইবার চোখে যেন অন্ধকার দেখলেন একেবারে। এত বড় বাড়ি, বাগান, পুকুর সামলানো—একাধারে ঝি রাঁধুনীর কাজ, এই বয়সে আর যেন চলে না। খুব মনের জোর তাই একটা ধাধসের ওপর—দেহটাকে যেন চাবুক মেরেই চালান কিন্তু নিজেই মনে মনে বেশ বুঝতে পারেন যে এভাবে মুমূর্ষু ঘোড়াকে জোর করে চালালে এক সময়ে সে এমন মুখ থুবড়ে পড়বে, যখন সহস্র চাবুকেও আর চালানো যাবে না। এমনিতেই তো দীর্ঘকালের দুঃখ দুশ্চিন্তা উপবাস আর কিছু করতে না পারলেও তাঁর কোমরটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে চিরকালের মতো, এখন আর সোজা হয়ে হাঁটতে কি দাঁড়াতে পারেন না। বেশ খানিকটা বেঁকে হুমড়ি খেয়ে চলতে হয় তাঁকে। সে সময় তাঁর পিঠটা ছিলে-চড়ানো ধনুকের মতোই দেখায়। সেভাবে চলা যদি বা যায় —কাজ-কর্ম করা খুব কষ্টকর। মধ্যে মধ্যে পিঠের নীচে একটা হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন পিঠটা ছাড়িয়ে নিতে চান তাও ঠিক পারেন না। এঁকে-বেঁকে মুখটা বিকৃত করে অর্থাৎ বহু কষ্টে যা দাঁড়ায় সেটা ছিল ত্রিভঙ্গ গোছের একটা বাঁকাচোরা চেহারা। এমনি বেঁকে চলতেও কোমর ব্যথা করে কিন্তু আবার ঐভাবেও বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না—শিরদাঁড়ায় কেমন একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি আবার বেঁকে পড়েন স্বাভাবিক অবস্থায়।

তবুও এক রকম করে চলত হয়ত—যদি শুধু তাঁর আর কান্তির সংসার হ'ত। তরু আর তার দামাল ছেলেকে নিয়েই হয়েছে যত মুস্কিল। সবচেয়ে তরুকে সামলানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে। দুর্দান্ত পাগল কিছু নয়—চেঁচামেচি বা ভাঙ্গাচোরা কিছু করে না কিন্তু একটু নজরের আড়াল করলেই বা একটু ফাঁক পেলেই চোখের নিমেষে এবং নিঃশব্দে একটা অকর্ম করে বসে। কাঁহাতকই বা অষ্ট-

প্রহর চোখ রাখেন তার ওপর। দেহের এই অবস্থায় সংসারের কাজ সারতেই অনেক সময় চলে যায়। আজকাল তাঁর অত সাধের বাগানে জঙ্গাল জমে থাকে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে পাতা—তাই একটু হাত দেবার সময় পান না।

তবু ঐন্দ্রিলাকে গোড়াতেই কিছু লেখেন নি। মেয়েকে চেনেন ভাল রকমই—তার কাছে একবার 'নিনু' হলে আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে মাথার ওপর চড়ে বসবে সে। তার চেয়ে কনক অনেক ভাল। তাই কনককেই মিনতি করে চিঠি লিখেছিলেন একখানা। কনক এসেও ছিল—চিঠি পাওয়া মাত্রই। সে সময়টা সত্যি সত্যিই যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন শ্যামা। কনক নিজের ছেলে সামলেও রান্নাবান্না পাগল সামলানো সব করত—উনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরের কাজ নিয়ে থাকতেন।

কিন্তু কনক মাস দুইয়ের বেশী থাকতে পারে নি। না পারার কারণ অনেক। কনক অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে—সেটা জানতেন না শ্যামা। তাঁকে কেউ বলে নি। এখানে আসবার পর টের পেলেন। জেরা করে জানলেন যে বেশ কয়েক মাস এগিয়ে গেছে ব্যাপারটা। অর্থাৎ এখানে বেশী দিন থাকলেই সাধ দেবার প্রশ্ন উঠবে। তারপরই দেখা দেবে প্রসবের নানাবিধ খরচা এবং ঝঞ্ঝাট। কে সে সব করবে এখানে! সেখানে নাকি হাসপাতালে ভাল ব্যবস্থা আছে—ওখানকার সকলে নাকি এ অবস্থায় হাসপাতালেই যায়। সেখানে এক পয়সা খরচ নেই, লোকজনেরও দরকার হয় না। এখানে যদি বা ঝঞ্ঝাট তিনি ঘাড়ে করতে চান—টাকা কি আর হেম বাড়তি দেবে এক পয়সাও? কনক আর তার ছেলে রয়েছে—কিছু তো বেশী খরচ হচ্ছেই, তার জন্যেও তো কিছু ধরে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে ধার দিয়েই হাঁটে না হেম, আগেও যা দিত এখনও তাই পাঠায়। শ্যামার সেটা খুবই অন্যায্য বলে মনে হয়। এটা তাঁর কিছুতেই মনে পড়ে না যে, ওরা যখন সবাই এখানে ছিল তখনও হেম এই টাকাই দিত মাসে। বাইরে চলে গেছে বলে কমায় নি একটা টাকাও। বরং তারই উচিত,খানিকটা ফেরৎ পাঠানো কিম্বা কম পাঠাতে বলা। সে কথা যে শ্যামার মনে পড়ে না শুধু তাই নয়, ছেলের অবিবেচনার কথা নিয়ে প্রকাশ্যেই গজগজ করেন, কনককে শুনিয়ে শুনিয়ে—। কনক অবশ্য উত্তর দিতে পারত, দিলে শ্যামা বিব্রত বোধ করতেন এটাও ঠিক, কিন্তু সে কখনই কিছু বলে নি, আজ তার স্বামীর টাকা পাঠানো নিয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করবে—তা সম্ভব নয়।

অবশ্য এসব ছাড়াও অন্য কারণ দেখা দিল।

হেমকে সেখানে হাত পুড়িয়ে খেতে হচ্ছে। কনক আসবার সময়ে পাশের কোয়ার্টারের মুখুজ্যেবাবুকে বলে এসেছিল, তাঁরা দেশে যেন কার শক্ত অসুখের খবর পেয়ে চলে এসেছেন, এখন শোনা যাচ্ছে আর যাবেনও না, এইখান থেকেই বদলীর ব্যবস্থা করছেন। হেম এধারে যতই দুঃখ-কষ্ট করুক, সংসারের কাজ তাকে কিছু করতে হয় নি কোন দিন—এসব আদৌ অভ্যস্ত নয়। তার খুব কষ্ট হচ্ছে, অর্ধেক দিন নাকি খাওয়াই হয় না। ছাতু গুলে খেয়ে থাকে। ফলে পেট খারাপ হচ্ছে প্রায়ই। এখানে ছেলেটারও পেট ভাল থাকছে না। পশ্চিমের জল-হাওয়ায় অভ্যস্ত শিশুর শরীর এখানের এই জল আর শাকপাতা খাওয়ায় টিকছে না। তার চেহারা দেখে শ্যামাই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এর মধ্যেই দু'তিন দিন ফকির ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে—আরও যদি খারাপ হয়ে পড়ে তখন বড় ডাক্তার ডাকতে হবে। এত কাণ্ড করে কে! অগত্যা তাঁকেই বলতে হ'ল 'যাও'। কনকও ছেলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিল—ছেলে আর স্বামী দুজনের জন্যেই—সেও আর দ্বিরুক্তি করল না। আবারও শ্যামা একা পড়লেন।

বরং আরও বেশী একা। কান্তি এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে নিজেই একটা কাজ যোগাড় করেছে। ছাপাখানার কম্পোজিটারী কাজ—হরফের বিভিন্ন খোপ থেকে হরফ বেছে নিয়ে পর পর সাজিয়ে দেওয়া, যাতে তা থেকে ছাপ উঠলেই বইয়ের মতো পড়তে পারে লোকে। কান্তিরই কে এক পুরনো সহপাঠীর বাবার প্রেস, সেই ক'রে দিয়েছে—নইলে এও ওর পাবার কথা নয়। সেও কাজ জানে না কিছুই. কখনও চোখে দেখে নি পর্যন্ত। সব নতুন করে শিখতে হবে। বন্ধ কালা লোককে ইশারা ইঙ্গিতে শেখাবে এত গরজ কার? কান্তির বন্ধুর জিদেই এটা সম্ভব হ'ল। তাও প্রথম দু'মাস নাকি কিছুই দেবে না। তারপর থেকে চার মাস ট্রেনের মান্থলি টিকিটের ভাড়াটা পাওয়া যাবে শুধু। ছ'মাস পরে, যদি মোটামুটি কাজ শিখে নিতে পারে তো দশ টাকা মাইনে হবে। ওপর-টাইম খাটতে পারে তো ঐ হিসেবেই আর কিছু পাবে।

শ্যামা খুঁত্ খুঁত্ করেছিলেন, এই সামান্য আয়ের জন্যে ছ'মাস ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—কী লাভ এতে! তিনি শুনেছেন যে সীসের হরফ ঘাঁটতে ঘাঁটতে নাকি অনেকের শক্ত ব্যারাম জন্মে যায়। লাভের মধ্যে কি একটা ব্যারাম নিয়ে ঘরে ফিরবে?...কিন্তু কান্তি অনুনয়-বিনয় করে রাজী করাল তাঁকে। এতটা বয়স হয়ে গেল,—এক পয়সা রোজগার করতে শিখল না। বিধবা মেয়ের মতো ঘরে বসে খাচ্ছে—এমন ক'রে আর কত কাল চলবে। মা যতদিন আছেন ততদিন তবু দাদা টাকা পাঠাচ্ছে—এর পর ? সে তো কোন লাইনেরই কাজ শেখে নি, রোজগার করবার তো কোন সম্ভাবনাই নেই কোন দিকে, এ যে একটা কাজ শিখতে পারছে এই তো বড় লাভ। ওর বন্ধুর কাছ থেকে ভাল ক'রেই খবর নিয়েছে সে—ভাল ক'রে কাজ শিখতে পারলে এ লাইনেও ভাল রোজগার হয়। ওদের প্রেসেই এক-একজনের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে আছে, ওপর-টাইম নিয়ে তারা ষাট সত্তর টাকা রোজগার করে মাস গেলে।

এসব কথার ওপর আর কিছু বলতে পারেন নি শ্যামা। ফলে এখন কান্তিও ভাত খেয়ে পৌনে সাতটার গাড়িতে বেরিয়ে যায়, ফেরে এক-একদিন রাত আটটা সাড়ে আটটায়। সে মাইনে করা লোক নয়, ওপর-টাইম খাটবার কথা নয় তার—কিন্তু কান্তি রাত অবধি থাকে নিজের গরজেই। যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শেখবার সুযোগ, বিশেষত রাত্রের দিকে 'কেস' খালি পাওয়া যায় অনেক। সবাই তো ওপর-টাইম করে না, তাদের টুলে বসে কাজ করতে পারে। আগে আগে কেউ কাজ শেখাতে চায় নি, বরং যথেষ্ট অসুবিধেই সৃষ্টি করেছিল কিন্তু কান্তির বিনয়ে আর নেটি-পেটি ভাবে অনেকেরই মায়া পড়েছে এখন। তাছাড়া সে নির্বিচারে সকলের ফাই-ফরমাশ খাটে—চা আনা, বেগুনি কিনে আনা, এটা ওটা হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া—কিছুতেই 'না' বলে না। সে যেন সকলেরই চাকর। তাছাড়া সে ইতিমধ্যে প্রুফ তোলার কাজটা শিখে নিয়েছে বলে দু'মাস পরে শুধু টিকিট ভাড়া নয়—পুরোপুরিই পাঁচ টাকাই বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন মালিক।

কিন্তু সে যা-ই হোক, শ্যামার কাছে ক্রমশঃ দুঃসহ হয়ে উঠেছে এই একান্ত নিঃসঙ্গতা। শুধু একা থাকা একরকম—তাঁর দু'দিন না খেলেও চলে যায়, কিন্তু আরও তিনটি প্রাণীর খাওয়ার প্রশ্ন আছে। আর রান্না খাওয়া থাকলে তার সঙ্গে রকমারি কাজও থাকবে। তার ওপর পাগল-চরানো। মল্লিক-গিন্নী বলেন, ছেলেটার বিয়ে দাও। মেয়ের অভাব হবে না—অমন অনেক গরীব-দুঃখী মেয়ে আছে যাদের বাপ-মা ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচে।

মেয়ের অভাব হবে না তা শ্যামাও জানেন। তবু মন সায় দেয় না তাঁর। এখনও যে বলতে গেলে কিছুই রোজগার করতে শিখল না, তার মাথায় একটা সংসার চাপিয়ে ন্যাঙ্গারি ক'রে দেওয়া—মা হয়ে শত্রুতাই করা বলতে গেলে। তাছাড়া সে কান্তিও রাজী হবে না কিছুতে। সেটুকু ছেলেকে চেনেন ভাল রকমই।...

না, সে কোন কাজের কথা নয়।

কাজের কথা যেটা—সেই মতোই কাজ করেছিলেন তাই। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক হিসেব ক'রে ঐন্দ্রিলাকে চিঠি লিখেছিলেন। সাধারণত ঐন্দ্রিলা চিঠি লেখে না তাঁকে—পুজোর সময় ছাড়া। এবারেও লেখে নি। লিখেছিল মহাশ্বেতাকে, অরুণের সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল সেই খবরটা দিয়ে। মহার কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে শ্যামাই তাকে চিঠি দিয়েছিলেন—উপযাচক হয়ে। এটা তাঁর নিজের কাছেই অঘটন বলে মনে হয়েছিল—অপমানও বোধ হয়েছিল খুব, নিতান্ত বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়েছিল—কোন দিকে কোন উপায় ছিল না বলেই।

ঐন্দ্রিলার কাছ থেকে যখন কোন উত্তর এল না—প্রায় তিন-চার সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে দেখে সীতাকে একটা চিঠি লিখলেন শ্যামা। সব অবস্থা খুলেই লিখলেন। এককালে তো এখানে সে যথেষ্ট আদর-যত্ন পেয়েছে, এখন তাঁর বিপদের দিনে কয়েকটা মাস এসে কি থাকতে পারে না সে? তিনি ওর চিঠি পেলেই আসবার গাড়ি-ভাড়া পাঠিয়ে দেবেন কিম্বা বুড়ো-কেষ্ট কাউকে পাঠাবেন—এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন। এবারেও তাঁর মনে হ'ল যে তাঁর তরফ থেকে এতখানি বদান্যতার প্রস্তাব যাবার পর আর সীতা না এসে পারবে না।

কিন্তু দেখা গেল যে, আবারও হিসাবে ভুল হ'ল তাঁর।

সীতা এল না। তবে তার কাছ থেকে জবাবটা পাওয়া গেল। সে-ই মার অসুখের খবর দিল। ডাক্তারবাবু তাকে চিঠি দিয়েছেন—বিশেষ কিছু লেখেন নি, শুধু খুব অসুস্থ, উত্থানশক্তি-রহিত এইটুকু জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে, উতলা হবার কোন কারণ নেই, সে-রকম বুঝলে তিনিই জানাবেন। টেলিগ্রাম করবেন বা লোক পাঠাবেন। তবে মনে হয় যে তেমন কোন অবস্থা দেখা দেবে না, রোগী এখন আস্তে আস্তে ভালই হয়ে উঠছে।

মার খবর দিয়ে নিজের কথা লিখেছে সীতা। না আসবার কারণ জানিয়েছে খোলাখুলিই। লিখেছে—

'এখন ইহারা আমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করিতেছে না, বরং ভালই করিতেছে। আমার ছেলেকেও পাঠশালে ভর্তি করিয়া দিয়াছে! অবশ্য মার টাকাতেই আমাদের জামা-কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় বাহিরের খরচা চলে। কিন্তু মার টাকা আসার তো কোন স্থিরতা নাই। মাঝে মাঝে দীর্ঘদিনই বন্ধ থাকে, সে সব সময়ে ইহাদের দয়াতেই দিন চলে। সে অবস্থায় এ আশ্রয় ছাড়া উচিত নয়। একবার চলিয়া গেলে—আর কোন দিন ঢুকিতে পাইব কি না সন্দেহ। বিশেষ যখন আপনার দুই-চারি দিনের ব্যাপার নহে, হয়ত বেশ কিছুকালই থাকিতে হইবে—তখন ইহাদের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়াই যাইতে হইবে বলা যায়। আপনি আমাদের ভার লইতে চাহিয়াছেন কিন্তু আমার ছেলের লেখাপড়া শিখাইবার ভার কি আপনি লইবেন? এখানে থাকিলে—লেখাপড়া না শেখাক, ইহারা নিজেদের গরজেই একটা কোন রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আপনার ওখানে সেটুকুও হইবে না। তারপর—কিছু মনে করিবেন না—আপনি আর কদিন—পরে মামারা যদি দুইটা প্রাণীর ভার না বহিতে পারেন?...অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার এখান ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয় কেন-

মতেই। আপনার কাছে আমাদের অনেক ঋণ, আপনার দুঃসময়ে কোন কাজে আসিতে পারিলাম না, সে জন্য লজ্জার সীমা নাই—কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আমাকে এখানে থাকিতে হইতেছে। সকল দিক ভাবিয়া আপনি আমাকে মাপ করিবেন।' ইত্যাদি—

আঁকা-বাঁকা লেখা, বানান ভুলে ভর্তি, কিন্তু বক্তব্যে কোন জড়তা কি অস্পষ্টতা নেই। বরং অদ্ভুত একটা দৃঢ়তাই লক্ষ্য করলেন শ্যামা। অমন ভালমানুষ ভীতু-ভীতু মেয়েটার মধ্যে এত শক্তি এত বুদ্ধি বিবেচনা কোথা থেকে এল কে জানে। বেশ একটু অবাকই হয়ে গেলেন শ্যামা ওর চিঠিটা পড়ে !...

কিন্তু মূল সমস্যাটা থেকেই গেল। হয়ত তার সমাধান কোনদিনই হয়ে উঠত না—অন্তত শ্যামার দ্বারা তো হ'তই না, কথাটা ভাবতেও পারতেন না তিনি—যদি না তাঁর গর্ভের সর্বাপেক্ষা নির্বোধ সন্তানটি এ-বুদ্ধিটা তাঁকে না দিত।

অনেকদিন এ-বাড়ি আসে নি মহাশ্বেতা। সেই অভয়পদর ভরাডুবি হবার পর থেকে বহুকাল আসে নি। মা টিট্‌কিরি দেবে, এই লজ্জাটাই সবচেয়ে প্রবল তার। 'শত্তুর হাসবে', 'শত্তুরের কাছে চিরকালের মতো মুখখানা পুড়ল'—এই আপসোস-টাই তার সবচেয়ে বেশী। সে 'শত্তুর'টা যে কে—অনেক ভেবেও এক শ্যামা ছাড়া কাউকে খুঁজে পেত না ওর ছেলেরা। সেই শত্তুরের কাছে টিটকিরি খাবার ভয়েই মহাশ্বেতা এ দিক মাড়াত না। শেষে একদিন নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন শ্যামা। ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাজায় লেগেছিল খুব। ওঠবার সামর্থ্য ছিল না। সেইদিনই রাত্রে কান্তিকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলেন মহাকে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল, দুদিন ছিলও—তবে ঐ গোনা দুদিনই। শ্যামা একটু ওঠবার মতো হ'তেই আর থাকে নি।

বাপ্‌রে—কী বলছ! গুষ্টিটার ধকল কি কম! আমি না থাকলেই বৌটোর প্রেহারী, ওকে দিয়ে দু'টো লোকের কাজ করিয়ে নেবে। বলবে তোর শাশুড়ী নেই তো আমরা কি করব—সে যায় কেন! নাও দিকি—আমি যেন ওদের চোদ্দগুষ্টির পিণ্ডি জোগাবার ইজেরা নিয়ে রেখেছি। আর মুখপোড়া বৌটাও হয়েছে তেমনি বোকা, কাজে না বলতে জানে না। কত শিখিয়ে দিই—তেমন তেমন দেখলে পেট কামড়াচ্ছে বলে গিয়ে শুয়ে পড়বি কিম্বা বলবি বড্ড মাথা ধরেছে—বলি পেট কামড়ানো কি মাথাধরা এ তো ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই যে বলে হয় নি। এ তো আর রবারের নল-টিপে দেখার রোগ নয় গো—তা কে কার কড়ি ধারে। সেই ভূতের মতো খাটবে, বারোমাস তিনশ' প'য়ষট্টি দিন—'

তারপর থেকে অবশ্য আসে মধ্যে মধ্যে। স্বামীর নির্বুদ্ধিতার জন্য বিলাপ করে, শাপ-শাপান্ত করে—যদিও সেটা কার উদ্দেশ্যে করা হয় তা ভালো বুঝতে পারেন না শ্যামা, তবে তার গূঢ়ার্থটা যে অভয়পদর কাছেই পৌঁছয় এ কথাটা বোঝাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়, আরও চেঁচিয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ করে। তাই আর ওকে বিশেষ ঘাঁটান না শ্যামা, 'শত্তুর হাসা'র কথা তিনিও শুনেছিলেন তাই এ কথাটাও মনে করিয়ে দেন না যে তিনি আগেই ওকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন বার বার। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন আর বলে লাভ কি। আবার হয়ত আসা বন্ধ করবে। এলে উপকার বই অপকার নেই, যতটুকুই থাকুক—পাঁচটা কাজ টেনে ক'রে দিয়ে যায়। শ্যামার কাছে এখন সেইটুকুই লাভ, নিজেকেই বোঝান মাঝে মাঝে —'ভাঙ্গা ঘরে জ্যোচ্ছনার আলো, যদ্দিন যায় তদ্দিন ভাল! যেটুকু করে তাই আমার উপ্‌সার।'

মহাশ্বেতাই একদিন এসে বুদ্ধিটা দিলে। অন্য দিনের মতো নয়—সেদিন এল সেই আগেকার মতো—যেন লাফাতে লাফাতে। দূর থেকে আসার ধরন দেখেই বুঝেছিলেন শ্যামা যে আজ কোন বিশেষ বক্তব্য আছে। হয় কোন 'মজার ঘটনা ঘটেছে' (অন্তত মহাশ্বেতার কাছে মজার) কোথাও—নয় তো তাঁকেই কোন বুদ্ধি দিতে আসছে সে। সাধারণত এই বুদ্ধি দিতে আসাটা নিতান্ত বোকার মতোই হয়, সেই অভিজ্ঞতাতেই শ্যামা নিজেকেই একটু কঠিনভাবে প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু মহাশ্বেতার বক্তব্য শুনে এই প্রথম 'তাঁকে স্বীকার করতে হ'ল যে তাঁর বড় মেয়ে ভাল মতলবই দিয়েছে!

মহাশ্বেতা এসে বাইরের রকে বসে ভাল ক'রে দম নেবার আগেই কথাটা পাড়ল, 'বলি তুমি এত বোকা কেন গা! এই তো বুদ্ধি যোগাও এত লোককে—নিজের বেলা মাথাটা খোলে না। একা এক হাতে নাটা-ঝামটা খাচ্ছ—মুখের রক্ত তুলে মরে যাচ্ছ—বড় মাসীদের আনিয়ে নাও না, তা'হলেই তো সব গোল চুকে যায়।'

'বড় মাসীমাদের—?' কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন না শ্যামা, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে।

'ওমা, ও বাড়ি তো ওদের ছাড়তে হবে, শোন নি? বাড়িও'লারা তো বাড়ি বেচে দিয়েছে, নোটিশ হয়েছে ওদের ওপর ঘর ছাড়তে হবে! নতুন বাড়িও'লাদের বেরৎগুষ্টি, গোটা বাড়িটা না হলে সম্পষ্যি হবে না তাদের। এখন তো হন্যে হয়ে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে বড়দা। তা ও ভাড়াতে আর কোথায় ঘর পাবে বলো, এতকাল ছিল কখনও তো এক পয়সা ভাড়া বাড়ায় নি, এখন যেখানেই যাচ্ছে শুনছে এতটি ভাড়া। অথচ আপিসেও নাকি টলোমলো অবস্থা, লোকজন সব ছাড়িয়ে দিয়েছে, কাজ কম—মাল বিক্কিরি হয় না, ওদের লাইনে নাকি আরও ভাল ভাল লোক এসেছে—তাদের জিনিস এদের থেকে ঢের ভাল। এদের এখন সে জিনিস করতে গেলে আরও এতটি টাকা ঘর থেকে ঢেলে নতুন নতুন যন্তরপাতি আনাতে হবে, তা ছেলেটা পেরস্তুত, বাপ মিন্‌সে রাজী নয়, বলে, যা করেছি এখন বসে খেতে পারব—ঘরের টাকা সব বার ক'রে দিয়ে যদি আর না তুলতে পারি? যদি নতুন মালও না চলে! এহকাল পরকাল দুই-ই যাবে! টাকা তো সব বাপ মিন্‌সের হাতে, সে সই না করলে তো উঠবে না, তাই ছেলেটাও কিছু করতে পারছে না। বড়দাকেও তো বলেছে যে, তুমি যদি ভাল চাকরি পাও অন্য কোথাও, খুঁজে নিয়ে সরে যাও—আমি তোমার ক্ষেতি করব না। কিন্তু বড়দাই বা আর এই বুড়ো বয়সে কোথায় যায় বলো! মাইনে কমিয়ে নিতে রাজী হয়ে চাকরিটা টিকিয়ে রেখেছে।...ওর সঙ্গে আজকাল যে আপিসে এসে প্রায়ই দেখা করে। ইচ্ছেটা যদি ওদের আপিসে ঢুকতে পারে কোনমতে, হাজার হোক সাহেবের আপিস, এ কোন কালে উঠবে না। কিন্তু এখন আর ও ঢোকাবে কী ক'রে বলো, এখন সব এল-এ বি-এ পাশ করা লোক ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে চোদ্দ গণ্ডা, তাদের ফেলে ওকে নেবে কেন। বলি দাদা তো আর গিয়ে নোয়া পিটতে পারবে না এই বয়সে। দিলে নেখাপড়ার কাজই তো দিতে হবে! তাছাড়া, এই ব্যাপারটার পর তোমার জামাইয়ের মুখটাও খুব আর নেই আপিসে!'

এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মতো দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে, বোধ করি দম নেবার জন্যেই থামে মহাশ্বেতা। শ্যামাও এই প্রথম ফাঁক পান একটু তলিয়ে বুঝতে।

এ সবই শুনেছেন তিনি। দিদি চিঠিতেও লিখেছেন তাঁকে। বাড়ি ছাড়তে হবে অথচ বেশী বাড়িভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই—সংসারই অচল হয়ে উঠেছে দিনকে-

দিন—তাও লিখেছেন। কিন্তু তবু—

মহাশ্বেতা অবশ্য বেশীক্ষণ সময় দিল না তাঁকে। আবারও বলল, 'কালই এসে ওকে বলেছে নাকি বড়দা যে, তোমাদের ওদিকে পাঁচ-সাত টাকায় যদি একটা ছোট-খাটো বাড়ি পাওয়া যায় তো তাই নয় দ্যাখো, না হয় ডেলি প্যাসেঞ্জারী করব তোমাদের মতো। কলকাতায় এখন দশ-পনেরোটা টাকায় যে ঘর পাওয়া যায় সে একেবারে শুয়োর খোঁড়—তাতে ভদ্দরলোক থাকতে পারে না, ছেলেমেয়েগুলোও মরে যাবে সে সব ঘরে থাকলে।...কথাটা শুনেই তো মতলবটা মাথায় গেল গো, বলি ভাড়া নিতে চাও তাও নিতে পারো—নইলে তোমার বাড়ি তো পড়েই আছে, না হয় থাকলই এসে, পর তো নয়। এলে তোমার অন্তত পাগল সামলাবার কাজ তো হবে। বড়-মাসী আর কিছু করতে পারুক না পারুক বসে মেয়েটাকে তো আগলাতে পারবে।'

হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসেন শ্যামা, গলার আওয়াজটা তাঁর নিজের কাছেই তীক্ষ্ণ শোনায়, 'একত্তরে?'

'একত্তরে কেন গো—অতবড় রান্নাঘর পড়ে আছে তোমার, দাদা তো এন্তক নাগাদ শুয়ে গেল ওখানে—সেখানে আর একটা উনুন জেবলে তাদের রান্না তারা করতে পারবে না? তারা তাদের মতো খাবে, তোমরা তোমাদের মতো, তা'হলে তো আর কোন গোল থাকবে না। শুধু থাকবে এক জায়গায় এই যা। তাতে তো তোমারই লাভ বেশী, বড়-বৌ থাকলে সে কি আর এক আধ দিন ছড়া-ঝাঁটগুলো দেবে না—না, ঘর দোরগুলো মুছবে না?'

চুপ ক'রে বসে ভাবেন শ্যামা অনেকক্ষণ। মতলবটা মন্দ লাগে না বটে—তবে অসুবিধেও হবে কিছু কিছু! মেয়েগুলো বড় হয়েছে, কলকাতার মেয়ে, গাছপালা ছিঁড়েখুঁড়ে ফল-ফুলুরি তুলে নষ্ট করবে ঢের। তবু, সুবিধাটা তাঁর দিকেই বেশী। চাই কি তিনি না চাইলেও ভাড়া বলে কিছু দিতে পারে গোবিন্দ। আর যদি এক সংসারে খায়—খোরাকি বলে যত টাকাই ধরে দিক—তার মধ্যে থেকে কিছু বাঁচাতে পারবেনই তিনি।

তবু বলেন, 'কিন্তু এই তো একটা ঘর, কোথায় সব থাকবে তাও তো বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বড়দা বৌদি এই বাইরের ঘরে থাকবে। কান্তিকে বরং রান্নাঘরে ব্যবস্থা ক'রে দাও। ঘরে তরু যেমন থাকে থাকবে, তুমি তো দালানেই থাকো নাতিকে নিয়ে, সেখানেই বড়মাসী শোবে এখন। জায়গার আবার অভাব, কলকাতায় কীভাবে আছে সব গিয়ে দ্যাখো না একবার।'

আরও কিছুক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া করবার পর পরামর্শটা ভালই লাগে শ্যামার। তিনি বলেন, 'তা তুই না হয় তাহলে জামাইকে বলেই দে, তাদের যদি কোন অসুবিধে না হয় তো এসে থাকুক। ভাড়া-ফাড়া দিতে হবে না, ঢের খেয়েছি দিদির, আজ আর এই আধখানা ঘরের জন্যে হাত পেতে ভাড়া নিতে পারব না। সেই টাকাটা জমিয়ে যদি গোবিন্দ এখানে মাথা গোঁজার একটা জায়গা করতে পারে তো করুক।'

মার এতটা সুমতি আশা করে নি মহাশ্বেতা, সে খুশী হয়ে তখনই উঠে পড়ল, 'দেখি বলি গে আজ তোমার জামাইকে, পারে তো কালই গিয়ে খবরটা দিয়ে আসুক!...ওকে আজকাল নড়ানোই মুশকিল, ঐ সর্বনাশের পর থেকে কোথাও যেতে চায় না—আমিও বলি না, যা পোড়ানো পোড়ালে মুখখানা—আর ও মুখ না দেখানোই ভাল। ছি ছি! আমারই কি এ মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে, জীবনেই যেন

ধিৎকার এসে গেছে। রাস্তা দিয়ে আসি, মনে হয় রাস্তার লোক আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বুদ্ধি, তোমরা সবাই বলতে বড় জামাইয়ের এ্যাতো বুদ্ধি ত্যাতো বুদ্ধি! বলে না—অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—তা ওরও হ'ল তাই! হাত্তোর কপাল রে!'

বিলাপ করতে করতে চলে যায় সে। কিন্তু শ্যামা স্থির হয়ে বসেই থাকেন। কে জানে ভাল করলেন কি মন্দ করলেন। আবার হয়ত কী একটা নতুন ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ছেন মিছিমিছি—কিন্তু তিনিও আর পারছেন না, এটাও ঠিক। ঐন্দ্রিলাকে মেয়ের খরচ সুদ্ধ দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন—সে খরচটা তো ষোল আনাই বাঁচবে চাই কি হাতে কিছু আসতেও পারে। এখন তো মনে হচ্ছে সুবিধে তাঁর দিকেই বেশী। তারপর কী দাঁড়ায় কে জানে। তাঁর যা ভাগ্য, শিব গড়তে গেলে বাঁদরই হয় বরাবর—এও হয়ত তাই হবে।

রানী-বৌকে তাঁর ভালই লাগে, ভাল মেয়ে। এলে উপকারই হবে। মধ্যে যে তার সম্বন্ধে বিদ্বেষ এসেছিল মনে, সে শুধু নিজের ছেলের জন্যেই। হেম যদি বড়-বৌদিকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি না করত তাহলে বলবার কিছু ছিল না। রানী-বৌয়ের দোষ তত নয়—যতটা দোষ তাঁর ছেলের। ছেলে এখন নেই—এই একটা সুবিধে, নইলে এখনও ভরসা পেতেন না। রানীর রূপ এখনও অগ্নিশিখার মতো আর তেমনি বুদ্ধি। তার কাছে কনক? চাঁদের কাছে জোনাকি!

আবার অবচেতনে একথাও মনে হয় এক-একবার, মন্দ হয় না, ভাতার-সোহাগী হয়ে বড্ড অহঙ্কার হয়েছে, থোঁতা মুখ যদি আর একবার ভোঁতা ক'রে দিতে পারেন তো খুব জব্দ হয়ে যায়!

অপরাহ্ণ গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে গাছে-পালায় আবছা হয়ে, তবুও শ্যামা বসে থাকেন সেই এক ভাবে।

॥ ২ ॥

রানী-বৌকে অনেকদিন পরে দেখলেন শ্যামা। তার রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে পূর্বেকার ছবিটাই মনের মধ্যে ছিল, এখন তাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে তা শুনেছিলেন, মহাশ্বেতা না কে যেন বলছিল তাঁকে, 'সে দাব-দলনী বড়বৌকে আর চিনতে পারবে না এখন দেখলে,' সে কথাটা যে এমন মর্মান্তিকভাবে সত্য, তা কল্পনা করতে পারেন নি তিনি।

অমন ভরা-যুবতী মেয়েটা যেন আধপোড়া চেলা কাঠ হয়ে গেছে একেবারে। তেমনিই শীর্ণ, তেমনিই শ্রীহীন। সবচেয়ে অমন বসরাই গোলাপের মতো রংটা—কী কালিই মেড়ে দিয়েছে সে চামড়ার ওপর। তিনিও এককালে ঐ রকমই ফরসা ছিলেন, এখন কালোও হয়ে গেছেন এটা ঠিক—তবু সে কতখানি বয়সে এবং কত দুঃখকষ্টে, দেহের ওপর কতখানি অত্যাচারে। এ বয়সে অন্তত এ 'ছিরিমূর্তি' হয় নি তাঁর। শুধু দাঁতগুলো এখনও তেমনি আছে, তেমনি সাজানো সুন্দর—আর থাকার মধ্যে আছে চোখ দুটো, তাতে যেন এখনও তেমনি ভেলকি খেলে। মুখের সেই হাসিটুকুতে আর চোখের চাউনিতে শুধু ধরা যায় যে এ সেই রানী-বৌ, নইলে চেনবার আর কোন উপায় নেই তাকে।

প্রথম দেখে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন শ্যামা, কোন প্রশ্ন করা তো দূরে থাক, মুখ দিয়ে কথাই সরে নি। রানী যখন হেসে প্রণাম করে

জিজ্ঞাসা করল, 'কী মাসীমা—চিনতে পারছেন না?' তখন যেন সম্বিৎ ফিরল তাঁর। তিনি চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন ক'রে বললেন, 'সত্যিই চিনতে পারি নি মা, এ কী হাল হয়েছে তোমার!'

রানী ম্লান হাসল একটু। জবাব দিল না।

পরে কমলার মুখে কারণটা শুনলেন শ্যামা। এই ছেলেটা হবার পর থেকেই নাকি ভুগছে রানী-বৌ। কিছু হজম হয় না, হাগা-রোগ ধরেছে, তার ওপর প্রায়ই একটু-আধটু জ্বর হচ্ছে ইদানীং। তাইতেই দিন দিন অমন শুকিয়ে খুঁকাঠ হয়ে যাচ্ছে।

শুনে শ্যামা শিউরে উঠলেন, 'তা হ'লে তো সুতিকা হয়েছে বলো! কোন ডাক্তার দেখাও নি?'

কমলা কপালে একটা হাতের ঘা মেরে বললেন, 'ডাক্তার! এক কথায় পনেরো টাকা মাইনে কমে গেল, খেতে দেব ওদের না ডাক্তার দেখাব? তবু তো একটা বাঁচোয়া—বৌমার দূর দূর আঙা, এতদিনে মোটে তিনটি, নইলে তেমন হ'লে তো এতদিনে এক ঘর ছেলে-মেয়ে হবার কথা।..না, ডাক্তার-ফাক্তার দেখানো হয় নি—ঐ পাড়ায় এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছে, এক আনা করে এক পুরিয়া ওষুধ নেয়, তাই এনে খাওয়ানো হয়েছিল কদিন—তা তাতে তো কিছুই হ'ল না। আর কি করব বলো!'

শ্যামা বললেন, 'তা হাসপাতালে-টাসপাতালে নিয়ে গেলেও তো পারতে—কিম্বা ঝামাপুকুরের সেই কবিবাজখানায়? তারা খুব ভাল ওষুধ দেয় শুনেছি। এ সব ব্যারামে তো কবিরাজীই ভাল—সবাই বলে!'

'সে তো বলে। কিন্তু নিয়ে যায় কে সেই তো কথা! আমি ওসব চিনিও না, তাছাড়া আমার ওরকম হুট্ করতে বেরোনো অব্যেসও নেই কোন কালে। এখন তো এমনিও পারব না, হাত-পা যেন সর্বদা কাঁপে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাতে থাকে একটু চললেই। আবার বছর কতক ধরে শুরু হয়েছে, বর্ষা হলেই হাত-পা ফোলে একটু একটু—সে সময়টা বুক-ধড়ফড়ানিটাও বাড়ে। তা আমি তো ধরো কাজের বার সব দিক দিয়েই। কে নিয়ে যাবে, হাসপাতালে তো আর এক-আধ মিনিটে হবে না। তোমার খোকাটা থাকলেও হ'ত। হেম থাকলে তাকে বলতে পারতুম, সে একদিন আপিস কামাই করেও দেখিয়ে আসত!'

শ্যামা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেন, 'তা আসলে যার করবার কথা—সে কি করে, তোমার গোবিন্দ!'

'গোবিন্দ! তবেই হয়েছে। ওর আপিস সেই হয়েছে যাকে বলে—ভাত দেবার ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—তাই! এধারে মাইনে কমল, ওধারে কাজ বাড়ল। লোক তো বেশির ভাগই ছাড়িয়ে দিয়েছে—যা ঐ পুরনো আর বুড়ো-হাবড়া কজন আছে—জানে যে এরা কোথাও নড়বে না, কিম্বা নড়লেও কাজ পাবে না কোথাও। তাই তাদের নিশ্চিন্তি হয়ে দু'পায়ে থ্যাঁৎলাচ্ছে এখন। গোবিন্দ তো যায় আজকাল সেই সকাল আটটায়, ওর কাছেই চাবি থাকে, গিয়ে আপিস খুলতে হয়, আর একে-বারে চাবি দিয়ে বাড়ি আসতে পায়—যার নাম ধরো সেই রাত সাড়ে আটটা নটায়। কাজ নেই নেই শুনছি, অথচ রোজই ওপর-টাইম। লোক কম বলেই নাকি ওপর টাইম দিতে হয় রোজ! এই তো ছেলের হাল—বলে সময়ের অভাবে বাজারই করতে পারে না—ডাল ডালের বড়া দিয়ে ভাত ঠেলতে হয়। ঐ করেই তো বৌটার আরও শরীর যেতে বসেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা প্রশ্ন করেন, 'তা অন্য কোথাও কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারছে না?'

'কৈ আর পারছে। চিরদিনই তো জান—কুনো-মতো স্বভাব। মানুষজনের সঙ্গে ভাব-আলাপ থাকলে তো কাজ-কম্মের চেষ্টা হবে—সে রকম জানাশুনো লোকই বা কই?'

চুপ করে যান শ্যামা। তবে মনটা তাঁর খারাপ হয়েই থাকে।

এক সময় এই বড়বৌ সম্বন্ধে তাঁর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। ছেলেকে পর ক'রে নিচ্ছে ছলাকলায় ভুলিয়ে—এই কারণেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব এসেছিল। সে ভাবটা আর নেই, সেদিক দিয়ে সব গ্লানি পরিষ্কার হয়ে গেছে তাঁর। বরং ছেলে এখন বৌয়ের কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁর মনে হয় যে, এককালে বড়বৌদির বশ ছিল সেটা তবু শোভা পেত, সেইটেই স্বাভাবিক। কিসে আর কিসে। মার বহু-ব্যবহৃত উপমাটা মনে পড়ে তাঁর এই প্রসঙ্গে—শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার লেজে! ছিঃ! ছেলের প্রবৃত্তিতে ঘৃণা বোধ হয় তাঁর। মনে হয়—রানীর মতো মেয়ের দ্বারা অভিভূত হ'লে কোন পুরুষকেই দোষ দেওয়া যায় না। তবে তাকে যে দেখেছে, তাকে যে ভালবেসেছে, সে আবার কনকের মতো বৌকে মাথায় তুলে নাচে কী ক'রে?

না, রানী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আর নেই তাঁর এখন। বরং সেই ফুটফুটে দেবীপ্রতিমার মতো ছোট্ট বউটি আর তার মুক্তোঝরা হাসি দেখে অকারণেই যে স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল একদা—সেই স্নেহেরই যেন খানিকটা আজ অনুভব করেন আবার। দুঃখ বোধ করেন, উদ্বেগ বোধ করেন বৌটার জন্যে। একথাও মনে হয় এক একবার, উদ্বেলিত স্নেহবোধের সেই সব দুর্বল মুহূর্তে যে, ক্ষমতা থাকলে তিনি নিজেই পয়সা খরচ করে বড় ডাক্তার দেখাতেন। অবশ্য সে ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণাটাও তাঁর খুব অস্পষ্ট, কত টাকা জমলে সেরকম ক্ষমতা হয়েছে তাঁর এটা স্বীকার করবেন, তা কখনও ভেবে দেখেন নি, এ রকম ক্ষমতা যে—তাঁর যতই কেন না টাকা জমুক হাতে—কখনই আসবে না, সেটাও বুঝতে পারেন না। দেখালে এখনই দেখাতে পারেন স্বচ্ছন্দে, বছরে অন্তত ত্রিশ-বত্রিশ টাকা সুদ তাঁর মারাই যায়; আসলও ডোবে গড়ে ঐ পরিমাণই।

যাই হোক—টাকা খরচ সম্ভব নয়, কারুর জন্যেই। যেটা সম্ভব সেইটেই করেন। সূতিকার অনেক টোটকা-টুটকি জানা আছে অনেকেরই—নিজে উদ্যোগী হয়ে পাড়া-ঘরে খোঁজ-খবর করে মাদুলি এবং খাওয়ার ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। গোটা দুই-তিন মাদুলি পরিয়েও দেন। মাকড়দায় কে একজন স্বপ্নাদ্য ওষুধ দেয়—কেষ্টকে পাঠিয়ে তাও আনিয়ে নেন। আর, মনে হয়—কোন্‌টায় কতটা তা বলা মুশকিল—তবে—এ সবগুলো জড়িয়ে একটু উপকারও হয়। ওরই মধ্যে একটু যেন সুস্থ বোধ করে রানী, আগের লাবণ্যের শতাংশ না হ'লেও একটু চেকনাই ফিরে আসে আবার।

রানী তাঁকে আরও মুগ্ধ করে গুণে। ওর এ দিকটা জানা ছিল না শ্যামার। শরীর এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সে এসেই বহু কাজ টেনে নিয়েছে শ্যামার হাত থেকে। ঘর দালান মোছা, উঠোন ঝাঁট, রান্নাঘর, রান্নাঘরের দাওয়া নিকোনা—কোনটাই করতে হয় না আর। সবচেয়ে বড় উপকার সে করেছে—তরুর জন্যে আর মোটেই মাথা ঘামাতে হয় না তাঁকে। তার ভার সম্পূর্ণই নিয়েছে রানী। তাকে জোর করে তুলে মুখ ধোওয়ানো, কাপড় ছাড়ানো, স্নান করানো, খাওয়ানো

—সবই সে করে। সেদিক দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছেন শ্যামা। আগের মতো চোখ রাখতেও হয় না সদা-সর্বদা। সেটা দিদি এবং বড়বৌই করে। মেয়েগুলোও খানিকটা সেয়ানা হয়েছে, তারাও একটু গোলমাল দেখলেই শোরগোল তোলে।

অবশ্য টাকার দিক দিয়ে কোন সুবিধা হয় নি। নগদ কিছু হাতে পান নি শ্যামা। একত্র রান্না করার প্রস্তাবে গোবিন্দ রাজী হয় নি। সে বলেছে, কতকটা শ্যামাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছে যে, 'এক তরকারী খাই, শুধু আলু ভাতে ভাত খাই সেও ভাল—আতেলা আঝালা তিরিশ ব্যান্ননে আমার দরকার নেই। তাছাড়া মাসী কস্মিনকালে আলু কিনবে না—আলু ছাড়া আমার মেয়েরা এক গাল ভাতও মুখে তোলে না, সে তো জানই। না, ও যার যা তার তা থাকাই ভাল। এতকাল পরে খাওয়া নিয়ে অস্‌সরস করতে রাজী নই আমি।'

সুতরাং—সেই প্রথম দিনটা যা ও'র সংসারে খেয়েছিল ওরা, তারপরই আলাদা উনুন পেতেছে রানী। কয়লার উনুন পেতেছে—পাতার জ্বাল কি কাঠের জ্বাল ওরা দিতে পারবে না। মাসে দু'মণ কয়লাই লাগে। গা-করকর করে শ্যামার—এই একটা টাকা তাঁকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে পাতা জ্বালাতে পারত ওরা!

তবে কয়লার উনুন জ্বলে অনেকক্ষণ। ওদের রান্না হয়ে গেলে যা আঁচ থাকে তাতে প্রায়ই এটা-ওটা করে নেন শ্যামা। নিজেকে আর বেলায় নতুন করে পাতার উনুন জ্বালাতে হয় না। তবুও, ওরা যে মধ্যে মধ্যে ও'র পাতা কাঠ বেলদো ব্যবহার করে উনুন ধরাবার জন্যে—সেটা লক্ষ্য করে একটা অকারণ উষ্মাও অনুভব করেন। অত পাতা যে কখনও তাঁর শেষ হবে না, তা তিনি মানতে প্রস্তুত নন। যদি তিন বছর তিনি বিছানায় পড়েই থাকেন, কে অত গরজ করে পাতা কুড়িয়ে জড়ো করবে? জড়ো করেন বলেই এত দেখায়—নইলে কলসীর জল গড়িয়ে খেলে কদিন থাকে?

খাওয়া-দাওয়া একত্র হ'লে যে টাকাটা জমতে পারত সে টাকার ভরসা আর রইল না। শেষ একটু ক্ষীণ আশা ছিল, মাসকাবারে ভাড়া বলে অন্তত পাঁচটা টাকাও গোবিন্দ দিতে আসবে তাঁকে। উনি নিতে চাইবেন না অবশ্য, তবে গোবিন্দ হয়ত জোর করেই রেখে যাবে। কিন্তু গোবিন্দ সে দিক দিয়েই গেল না। মাস-কাবার হয়ে গেল, মাইনে যে পুরো না পেলেও কতক কতক পাচ্ছে (চিরদিনই তিন-চার কিস্তিতে মাইনে পায় সে—তা শ্যামা শুনেছেন, তবে প্রথম কিস্তিটাই বেশী)—তা ওদের বাজার-হাট, মাসকাবারী উটনো তোলা দেখে আঁচে-আন্দাজে বুঝতে পারেন। অবশেষে যখন পরের মাসের অর্ধেকও কাবার হয়ে গেল গোবিন্দ কোন উচ্চবাচ্য করল না, তখন তিনি বাইরে প্রকাশ না করলেও মনে মনে অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'কেন রে বাপু, খুব তো সাউখুড়ী করে বাড়িভাড়া করতে যাচ্ছিলি—তা সে টাকার গরম আমার বেলা বুঝি একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল! বলিহারী কপাল আমার। বিচার-বিবেচনা আমার বেলাই দেখি লোকের উঠে যায়!' মনে মনে বলেন শ্যামা।

তবে ভেতরে ভেতরে যা-ই হোক বাইরে এ আশাভঙ্গজনিত অপ্রসন্নতা এমন কি ইশারা-ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন না তিনি। দিদিরা আসতে যে সুবিধাটুকু হয়েছে তাঁর, তার মূল্যও কম নয়—ওরা বাড়ি ভাড়া করে অন্যত্র চলে গেলে তাঁর এক পয়সাও আয় বাড়বে না—বরং এই সুবিধা-সুযোগটুকু থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন—এ ব্যব-হারিক জ্ঞান তাঁর খুব আছে। তরুর দিকটা ছাড়াও, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও অনেক সুবিধা হয়েছে তাঁর। কান্তি ডালের বড়া পোস্ত-চচ্চড়ি ভালবাসে—শ্যামা একা এ সব ঝঞ্ঝাট কোন দিনই পেরে ওঠেন না—এখন ওদিকে হ'লে তার জন্যে তোলা

থাকে। এমন কি শ্যামাও পান কিছু কিছু। প্রথম প্রথম ওটা ছিল নৈমিত্তিক—পরে নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। শ্যামা যেটুকু তরকারী রাঁধতেন সেটুকুও কমিয়ে দিলেন। আনাজের জন্যে চিন্তা নেই, থোড় ডুমুর ডাঁটা কাঁচকলা—এ তো বাগানে আছেই—শুষুনি কলমীশাক আমড়া এরও অভাব নেই। কিন্তু শুধু আনাজ দিয়েই তরকারি হয় না, তেলমশলা লাগে। যত কমই দিন, ফোড়ন চোঁয়াবার মতো একটু তেল আর অন্তত হলুদ-বাটা—এটা লাগেই। তরকারি কম রাঁধতে হ'লে সেইটেই লাভ। বরং সেই জন্যে, প্রসন্ন মনেই সে সব শাক-ডুমুর-ডাঁটা-আমড়া এদের ঘরে তুলে দেন। রবিবারে কান্তি বা গোবিন্দ বাড়ি থাকলে তিনি নিজেই গরজ ক'রে ছিপ নিয়ে বসতে বলেন, যা দু-একটা মাছ ওঠে। জানেন যে উঠলে এবং ওদিকে রান্না হ'লে তাঁর ছেলে বা নাতি বঞ্চিত হবে না। মাছ তুললে খরচা নেই তাঁর—পাড়ার লোক তো নিত্য চুরি করে বলতে গেলে—ফাঁক পেলেই—কিন্তু মাছ রাঁধতে গেলে এক গাদা তেল লাগে। সে তেল সাত আনা দরে কিনতে হয়।......বরং এই সব সময়ে কান্তি যখন বড়মাসিমার দেওয়া তরকারি ও মাছ দিয়ে তৃপ্তি ক'রে খেয়ে ওঠে—তখন তাঁর ছোট ছেলেটার কথা মনে হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। কোথায় যে গেল হতভাগা ছেলেটা! বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। মরে গিয়ে থাকে সে একরকম, কতগুলোকেই তো যমের মুখে দিলেন তিনি—অর্ধেকেরও বেশী দিয়েছেন ঠিক ঠিক হিসেব ধরলে—কিন্তু বেঁচে থেকে কোথাও চাকরের কাজ করছে কিম্বা চুরি ক'রে জেল খাটছে কিনা—সেই চিন্তাই তাঁর বড়।......

লাভ-লোকসান দুটো পাল্লা মিলিয়ে অনেকবার হিসেব ক'রে দেখেছেন শ্যামা, এরা আসাতে অনেক দিক দিয়েই সুবিধা হচ্ছিল তাঁর। সেই মনে করেই ছোটখাটো অসুবিধাগুলো গায়ে মাখছিলেন না, হাসি-মুখটা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে তাঁর চিরশত্রু মেয়েটা আবার হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হয়ে সব গোলমাল ক'রে দিল।

সেই প্রথম চিঠি লেখার পর ঐন্দ্রিলার আর কোনও খবর তিনি করেন নি। সীতার কাছ থেকে চিঠি পেয়েও—সত্যিই খুব ভারি কোন অসুখ করেছিল ওর, এ তিনি বিশ্বাস করেন নি। মেয়ের না আসবার গা—এইটেই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর, যত অসুখই করুক, এতদিন ধরে ভুগছে, এ তিনি একবারও ভাবতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, ভাল চাকরী পেয়েছে সুখে আছে, তাই আর আসতে চায় না। তিনিও আর চান নি যে ও আসুক। বরং ওকে লেখাটাই একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর—এইটেই মনে করতেন ইদানীং। সত্যি সত্যিই এসে গেলে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে যেত হয়ত—অসতর্ক মুহূর্তের নির্মিত খালে যে শেষ পর্যন্ত কুমীর ঢোকে নি, এতেই ধন্যবাদ দিতেন নিজের অদৃষ্টকে।

তবু দীর্ঘ দিন পর্যন্ত একটা আশঙ্কা ছিল, একেবারে সম্প্রতি, এই মাসখানেক হ'ল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সে যে এত কাল পরে সেই পূর্ব পত্রের সূত্র ধরে এসে হাজির হবে একদিন, তা একবারও মনে করেন নি। বিশেষত সে যেভাবে কাপড়-চোপড়ের বেশ একটি ডাগর পুঁটুলী নিয়ে এসেছে তাতে স্থায়ীভাবে ঢোকবার মতলব বলেই মনে হ'ল। তাতে আরও গা জ্বলে গেল তাঁর।

মেয়ের প্রণামের বদলে বেশ একটু তীক্ষ্ন কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন তিনি, 'তারপর? হঠাৎ—? কী মনে করে?'

মার কাছ থেকে খুব হৃদ্য অভ্যর্থনা পাবার আশা অবশ্যই করে নি ঐন্দ্রিলা—

কিন্তু তাই বলে এমন আক্রমণাত্মক প্রশ্নের জন্যও সে প্রস্তুত ছিল না। সে একটু থতমতই খেয়ে গেল। তারপর বলল, 'তার মানে? তুমিই তো—বা রে!'

'ও, সেই চিঠি পেয়ে এ্যাদ্দিন পরে তুমি মায়ের উগ্‌গার করতে এসেছ।...ওরে আমার গোপাল রে!...বলে, এখন মরে লক্ষণ ওষুধ দেবে ঠিক-দুপুর বেলা! চিঠির উত্তর নেই কিছু নেই—আঠারো মাস পরে উনি এলেন আমার মাথা কিনতে!'

'চিঠির উত্তর দেব কী করে—আমি বলে মরা মরা বাঁচলুম। চিঠি পেয়েই তো চলে আসছিলুম—আসব বলেই তো কোন জবাব দিই নি—হঠাৎ অমন শক্ত অসুখটা ধরে গেল বলেই—'

'তা সে তো আর আমি এখানে বসে হাত গুনব না বাছা!' শ্যামার কণ্ঠে তিক্ততা যেন আরও উগ্র হয়ে ওঠে, 'না কি আমার বিপদটা তোমার অসুখ জেনে চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে!'

ঐন্দ্রিলা যেন হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় বোধ করে নিজেকে। মায়ের মতলবটা ঠিক ধরতে পারে না। সত্যি সত্যিই তাড়িয়ে দেবেন নাকি ওকে?

'তার মানে—তুমি সে সব কথা এখন উলটে দিতে চাও বলো!...আমি যে সোনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

'তোমার চাকরী সোনার কি রুপোর তা তো আমি জানি না বাছা, অত খবরে আমার দরকারও নেই। সোনার চাকরী ছেড়ে আসবেই বা কেন আমার কাছে পেট-ভাতায় খাটতে? আর তা তুমি ছেড়ে আসও নি—এত বোকা তুমি নও। এলে তখনই আসতে, এই এ্যাদ্দিন পরে উদয় হ'তে না। আসলে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে তাই মায়ের কথা মনে পড়েছে আবার!'

'তাড়িয়ে দিয়েছে!' অমরবাবুর অসহায় মুখখানা মনে পড়ে যেন চোখে জল এসে যায় ঐন্দ্রিলার, 'তেমন লোক নয় তাঁরা। দেবতার মতো মনিব আমার, আসবার সময় চোখের জল ফেলেছে। আমিই বলে তোমার এমন ধারা শুনে তাদের দিকে না তাকিয়ে চলে এলুম। সেইটে আসাই দেখছি অন্যায় হয়েছে। তারা যে সেবা আর চিকিচ্ছে করেছে—'

'তা তোমার অন্যায়ই হয়েছে বাছা। একশ'বার হয়েছে। তোমার মতো ঝগড়াটে কুচক্কুরে লোককে যখন অমন হ্যাংগালি-জ্যাংগালি করে চিঠি দিইছি আসতে তখনই তোমার বোঝা উচিত কী রকম আতান্তর অবস্থা আমার! সে অবস্থাতে—একটা খবর পর্যন্ত না পেয়ে, তুমি চার মাস পরে কি চল্লিশ মাস পরে তোমার মর্জি মতো দয়া করে কবে একদিন আসবে, সেই ভরসায় বসে থাকব তোমার জন্যে—এটা ভাবা খুব অন্যায় হয়েছে!'

'তা আমি কি মিথ্যে বলছি আমার অসুখের কথাটা? হয় না হয় জিগ্যেস করবে চলো না!'

'আমার কী এত গরজ!' শ্যামার কণ্ঠ তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে, আর সত্যি-মিথ্যের কথা উঠছেই বা কেন? যদি সত্যিই হয়—তোমারও তো ভাবা উচিত ছিল যে, এতদিন পরে তাদের অত দরকার এখনও আছে কিনা একখানা পোস্টকার্ড লিখে অন্তত উদ্দেশ করি!'

'তা হলে তুমি সে সব যা বলেছিলে কিছুই দেবে না বলো!'

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ঐন্দ্রিলা।

'দোবই না তো! কিসের জন্যে দোব শুনি! তখন এলে সে কথা থাকত। তোমার মেয়েকেও তো চিঠি দিয়েছিলুম—তাদের দু-দুটো প্রাণীর ভার নিতে চেয়ে-

ছিলুম জন্মকালের মতো...তা তার পছন্দ হ'ল না, ঝেড়ে জবাব দিলে। ব্যাস্‌ চুকে গেল ন্যাটা! আমারও সম্পর্কের ঐখানে ইতি। আর কি তাদের মুখ দেখব ভেবেছ?...তোমরা মায়ে-ঝিয়ে এলে না বলে তো আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না আর। আমাকে তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে! এদের সে বাড়ি ছাড়িয়ে সংসার-টাই টেনে আনতে হ'ল এখানে, আবার আমি তোমার পেছনে এতটি খরচ করতে যাব কী জন্যে শুনি!'

মেয়ের চিঠির কথাটা ঐন্দ্রিলা জানে। সে ওখান থেকে সিধে মেয়ের কাছেই গিয়েছিল। সেখানে কদিন থেকে এখানে এসেছে সে। মেয়ের কাছে তাকেও চিঠি লেখার খবরটা শুনেই আরও নিশ্চিত হয়েছিল। মায়ের দরকারটা খুবই বেশী, নইলে সীতার সব ভার নিতে চেয়ে আসতে বলতেন না।...এর মধ্যে বড়দাদা সংসার তুলে এখানে আসবে তা ভাবে নি সে।...

ঐন্দ্রিলা পাথরের মতো সেইখানেই বসে রইল—অনেকক্ষণ। একবার মনে হ'ল সে মেদিনীপুরেই ফিরে যায়। তা গেলে চিরকালের মতোই হিল্লে হয়ে যেতে পারে, তারও—মেয়েরও। কিন্তু সে ঐ একবারই। সংগে সংগেই মনকে শাসন করল সে। না, আর না! সে সম্ভব নয় আর। যা আছে অদৃষ্টে হবে, না হয় চাকরিই একটা খুঁজে নেবে সে। তার অদৃষ্টই এই—মাঝে কটা মাস সুখভোগ, ওটা স্বপ্নে-দেখা ঘটনা বলে ধরে নেওয়াই উচিত।

শ্যামা হ্যাঁ না আর কিছুই বললেন না। মহাশ্বেতার ভাষায়—আবাহনও না, বিসর্জনও না। ঐন্দ্রিলাকে চলে যেতেও বললেন না, ঘরের মধ্যে আসতেও বললেন না। ব্যাপারটা বিশ্রী দাঁড়াচ্ছে দেখে কমলাই এগিয়ে এলেন এবার। জোর করে ওকে ঘাটে পাঠালেন কাপড় কেচে আসতে। নিজেই গুড় গুলে একটু শরবত ক'রে দিলেন। তারপর চুপি চুপি ইশারা করলেন একেবারে কাজে লেগে যেতে। সে উদ্যোগী হয়ে রান্নাবান্না শুরু করলে শ্যামা আর কী বলবেন?

ঐন্দ্রিলাও সে ইঙ্গিতটাও বুঝল। নিজেই উঠে চাল মেপে নিয়ে ঘাটে চলে গেল ধুতে।

॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রিলা এবার একটু ঘটা ক'রেই কাজকর্ম শুরু করল। রানীকেও কিছু করতে দেয় না সে, বলে, 'ওমা, কেন, আমি থাকতে—। তোমার তো এই শরীরের হাল। ঘরটা দালানটা মোছা কি ঝাঁট দেওয়া, এটা আর আমার দ্বারা হবে না!'

রান্নাবাড়া ঘরের বাসি পাট সেরেও আজকাল সে এটা-ওটা ক'রে দেয় মায়ের। বাগানে ঠেকো দেওয়া, দু-একটা চারা নেড়ে বসানো, মাচা-টাচাগুলো মেরামত করা—এ সব আগে সে একদমই হাত দিত না, এখন নিজেই ঘুরে ঘুরে করে বেড়ায়। মনে হয় পাতা কুড়োতে বা নারকেলের-পাতা চাঁচাতেও তার আপত্তি নেই—নিহাৎ বড় স্পষ্ট তোষামোদ হয়ে পড়ে বলেই নিজে থেকে এগোয় না, শ্যামা একবার নিজে থেকে বললে তাও করতে পারে।

কিন্তু শ্যামা সেদিক দিয়েই যান না। মেয়েকে তিনি চেনেন, তাকে একবার তাঁর তরফ থেকে তুচ্ছতম কাজে লাগালেও জোর পেয়ে যাবে সে। সেই একটা যে-কোন সুযোগেরই অপেক্ষা করছে, তাও তিনি জানেন। সেই সুযোগটাই তিনি

দিতে রাজী নন। তার উপস্থিতিটাই যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চান তিনি। একেবারে নিশ্ছিদ্র রকমের উদাসীন থাকেন কন্যা সম্পর্কে। স্নান করে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মেয়ে যদি ঠাঁই করে ভাত বেড়ে না রাখে তাহলে নিজেই সে ভাত বেড়ে নেন, মেয়েকে বলেন না বেড়ে-দিতে, অথবা রানী কি কমলাকে দিয়েও বলান না।

তাঁর এতদূর কাঠিন্যের আরও কারণ ছিল। মেয়ের তরফ থেকে শুধু দাবী বা জোর পেয়ে যাওয়াই সব নয়।

সেটা কমলা বুঝতে পারেন না কিন্তু রানী বোঝে। বলেও সে বুঝিয়ে শাশুড়ীকে। যদিও এত ছোট কথা বলতে তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কমলা দরিদ্র কিন্তু ছোট নন, রানীও তাই এত সঙ্কীর্ণতাতে অভ্যস্ত নয়।

ঐন্দ্রিলা আসার পর থেকে এদিকে পুরোদমে রান্নাবান্না শুরু হয়েছে। ইদানীং দুপুরে রান্নার পাট তুলেই দিয়েছিলেন শ্যামা; কান্তি ভোরে ভাত খেয়ে যায়, সেই সময়েই একেবারে ভাত রান্না করে নেন সকলের মতো। সে অবশ্য ভাতে-ভাতই খায় বেশির ভাগ, কোন দিন একটা তরকারি হয়ে যায়। তাই দিয়েই তরু আর তার ছেলেকে খাইয়ে দেন সকাল সকাল। নিজে যখন খেতে বসেন তখন ওদের উনুনে আঁচের অবস্থা দেখে একটা তরকারি কি একটু বাটি-চচ্চড়ি বসিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে তাই থেকেই একটুখানি ঢেলে রেখে দেন বিকেলের জন্যে। অর্ধেক দিন সেটাও চড়াতে হয় না। কমলাদের হেঁসেল থেকে যা পাওয়া যায় টুকটাক্ তাইতেই চলে যায়। রাত্রেও, ওদের রান্না সকাল করে চোকে। কান্তি আর তার নাতি বলাইয়ের সওয়াখানা প্রাণীর ভাতটা—এতটুকু ডাল কি একটা কাঁচকলা ভাতে দিয়ে ওদেরই মরা-আঁচে বসিয়ে দেন। অনেক সময় সে বসিয়ে দেবার কাজটাও রানীই সেরে দেয়। তরকারী সকালের না থাকলে আর করবার চেষ্টাও করেন না—ওধার থেকে কান্তির জন্যে যা তোলা থাকে—তাই ঢের। বৈধব্যের অজুহাতে তরুকে রাত্রে কিছুই খেতে দেন না প্রায়, নিজের সঙ্গে ওকেও তেল হাত বুলিয়ে চালভাজা বা ক্ষুদ ভাজার নাড়ু—এই দেন, সে কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না। সব ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ঐ ডবকা মেয়েটা অমন টাঙ্গিয়ে থাকে—তার সামনে নিজে রুটি নিয়ে খেতে বসতে কমলার লজ্জাই করে। তিনিই প্রায়ই বলেন 'ওকে দুটো ভাত দিলেই পারো. পাগলের আর বিধবা সধবা কি, এমনি তো যার-তার পাত থেকে তুলে খাচ্ছেই—মিছিমিছি খাড়া উপোস দিয়ে রাখা—

শ্যামা সে কথা কানে তোলেন না। বেশি বললে জবাব দেন, 'সে নিজে থেকে তুলে খায় আমাদের অজান্তে—সে আলাদা কথা। কিন্তু তাই বলে বামুনের ঘরের বিধবা—তার পাতে আমি ভাত বেড়ে দিতে পারব না। আর লোকে জানলে কি বলবে, সে ভারী নিন্দে হবে পাড়া-ঘরে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলা আসাতে সব উল্টেপাল্টে গেছে। এখন রীতিমতো দুবেলাই রান্না হয়। ডাল হয় একদিন-দুদিন অন্তরই। তাছাড়া তরকারিও—যতই সেদ্দপক্ক রান্না হোক—থোড়-সড়সড়ি, শুষুনি শাকের ডালনা আর কচুর শাক—এক-আধ ফোঁটা তেল লাগেই। তাছাড়া ঐন্দ্রিলা খুব কমিয়েও শ্যামার মতো মিতব্যয় করতে পারে না। এর ওপর, আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে চাল-ডালের ক্ষুদ ভিজিয়ে সরু-চাকলি করে সে—আসলে পরের বাড়ি থেকে রাত্রে খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে—শুধু দুগাল মুড়ি চিবিয়ে থাকতে পারে না। এ সবই বাজে খরচ মনে হয় শ্যামার। একটা মানুষ আসাতে একটা মানুষের অনুপাতে খরচা বাড়ে নি, অনেক বেশী বেড়েছে। হেঁসেলে রীতিমতো দুবেলা রান্না হচ্ছে দেখে ও হেঁসেল থেকেও বিশেষ

কিছু আর আসে না—বরং ওদের, বিশেষত দিদিকে কিছু কিছু দিতেই হয়। অর্থাৎ ডবল লোকসান। এই সব নানা কারণেই বিরক্ত হয়ে থাকেন শ্যামা, মেয়ের উপস্থিতিটা একটুও পছন্দ হয় না তাঁর।...

শ্যামার এই কঠিন হয়ে থাকার কারণ সবটা না বুঝলেও—কিছু কিছু বুঝেছে ঐন্দ্রিলাও। সে এদিকের এত ছোট ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে নি, বহু দিনের অনুপস্থিতিতে মার স্বভাবের অনেকগুলো কথা ভুলেও গেছে হয়ত। সে ভেবেছে যে সীতার জন্যে মাসকাবারে পাছে সে টাকা চেয়ে বসে—এই ভয়েই তিনি কিছুতে আমল দিতে চান না ওকে।

সেও কঠিন হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। সহজে ছাড়বে না সেও. এস্পার-ওস্পার দেখে নেবে। যদি যেতেই হয়, যদি চাকরি নিতেই হয় আবার—এদিকে একটা চূড়ান্ত কিছু করে যাবে।

কথাবার্তা দুজনে নেই বললেই হয়, যদিচ সেটা এমন কিছু নিয়মবাঁধা বা প্রতিজ্ঞা করা নয়। ঐন্দ্রিলা কথা কইলে শ্যামা জবাব দেন—যতটা সম্ভব সংক্ষেপে। ঐন্দ্রিলার এখানে আসবার ঠিক এক মাস পূর্ণ হতে সে গিয়ে বিনা ভূমিকাতেই কথাটা পাড়ল মার কাছে, 'সে টাকাটা তো এবার দিতে হয়—। পাঠাতে হবে আমাকে।'

তখনই তেতে ওঠেন না শ্যামা। তাঁর মুখের শিরাও কাঁপে না একটি। খুব সহজভাবেই প্রশ্ন করেন, 'কিসের টাকা?'

'ঐ সীতির জন্যে যেটা দেবে বলেছিলে—চার-পাঁচ টাকা। কিছুই হবে না তাদের—তবু, ওটুকুও না পাঠালে আতান্তরে পড়বে।'

'সে তো তোমাকে সেই প্রথম দিনই বলে দিয়েছি বাছা যে, যে-সময়ে যে-অবস্থায় বলেছিলুম, সে সময়ে সে অবস্থায় এলে দিতুম। তুমি তা আসো নি, কখন আসবে—আসবে কিনা—তাও লেখো নি। তার জন্যে আমাকে অন্য পথ খুঁজতে হয়েছে। কাজেই সে কথা আর এখন তুলে কোন লাভ নেই। আর এ সমস্তই তো পরিষ্কার করে প্রথম দিনই বলে দিয়েছি। এক কথা একশোবার তুলে লাভ কি?'

শ্যামা স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বললেও কোন উষ্মা প্রকাশ পায় না তাঁর কার্যে। তিনি জানেন টাকা তাঁর সিন্দুকে, জোর করে কেউ নিতে পারবে না। মিছিমিছি মাথা গরম করবেন কেন?

কিন্তু ঐন্দ্রিলাও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে বলে, 'অন্য উপায় তো তোমার বড়মাসীদের আনা। সে ওদের ওবাড়ি ছাড়তেই হ'ত, অন্য বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না—এসে উঠেছে। তোমার জন্যে তারা কোন ক্ষতি স্বীকার করে আসে নি। আমি সব শুনেছি—একেবারে তো ছেলেমানুষ নই, অত সহজে আমাকে ভোলাতে এসো না!'

শ্যামা বলেন, 'আমার কাউকেই ভোলাবার দরকার নেই বাছা, তেমনি আমাকেও না কেউ ভোলাতে আসে। আমি এক পয়সা দোব না। তোমাকে সেদিনই সে কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলুম। তার জন্যে সতেরো গণ্ড কৈফিয়ৎ এখন তোমার কাছে দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

এর পর ঐন্দ্রিলার পক্ষে নিজ-মূর্তি ধারণ করাই স্বাভাবিক, আর তা-ই করে সে। কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে লাফিয়ে মাথা খুঁড়ে শাপশাপান্ত করে হুলুস্থুলে কাণ্ড বাধিয়ে বসে। বহুদিন পরে আবার এ বাড়িতে লোক জড়ো হয়। কমলা তো কাঠ, রানীও অপ্রস্তুত। একবাড়ি বাইরের লোকের সামনে এই বিসদৃশ কাণ্ডতে সে যেন লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। এতকাল শুনেই এসেছে কিন্তু কোন ভদ্রলোকের

মেয়ে যে এমন করতে পারে তা তার ধারণা ছিল না। হাজার হোক তারা ওর আত্মীয় —একথা পাড়ার সবাই জানে। আরও বিচলিত হয় এই কারণে যে, ঐন্দ্রিলার কঠিন কঠিন অভিসম্পাতগুলো নির্বিচারে তার বাচ্ছাদের উদ্দেশেও বর্ষিত হচ্ছে। এরা যেন জেনেশুনে ষড়যন্ত্র করেই ওর মেয়ের সর্বনাশ করতে এসে বসেছে। পয়সাওলা মাসীর মন যোগাচ্ছে। তবে ঐন্দ্রিলাও দেখবে কে কার ধন ভোগ করে। সেও সহজে মরছে না। মরবার হ'লে এবারেই মরে যেত, সেই ব্যামোই হয়েছিল তার। ভগবান অনেক রঙ্গ দেখাবেন বলেই সারিয়ে তুলেছেন!...ঐ সর্বনাশী বুড়ির ধন কাউকেই ভোগ করতে হবে না, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী জামাই-বৌ—যে যেখানে আছে গুষ্টিসুদ্ধ খেয়ে পয়সায় গেরো বেঁধে থাকবে যক্ষিবুড়ি। যদি এরা মনে করে থাকে যে মন যুগিয়ে এক পয়সাও ঐ গেরো খুলে বার করতে পারবে তো প্রকাণ্ড ভুলই করেছে! উল্টে এই মতলব নিয়ে যারা তার অবীরে ছেলেমানুষ মেয়ে আর বাচ্ছা নাতিটার ন্যায্য পাওনা কেড়ে নিতে এসেছে—তাদের সর্বনাশ আগে হবে। ইত্যাদি—

কিন্তু এরা যতই বিচলিত হোক, যাঁর সর্বাধিক লাগবার কথা তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্বিকার থাকেন। শ্যামার হাতের কাজ বন্ধ হয় না। এমন প্রশান্ত মুখে কাজকর্ম সব করে যান যেন তাঁর ধারে-কাছে কোথাও কোন চেঁচামেচি হচ্ছে না, যেন তাঁর বাড়িতে অন্তত কুড়ি-পঁচিশজন লোক এসে জড়ো হয় নি।

সেদিন ঐন্দ্রিলা রাঁধল না, সংসারের কোন কাজকর্ম, এমন কি বাসি পাটও করল না। করবে না তা শ্যামাও জানতেন। মরে মরে নিজেই সব সেরে নিলেন তিনি। পুরুষরা কাজে চলে যাবার পর ঘটনাটা ঘটেছিল, কান্তির ভাত তিনিই রেঁধে দেন চিরকাল। আজও রেঁধে দিলেন. তবে আজকাল বেলায় পুরো এক প্রস্থ রান্না হয় বলে আর সকলের ভাত সেই সাত-সকালে করে রাখেন না। তাই আজ স্নান করে এসে ভাতও চাপাতে হ'ল। অবশ্য ভাতে-ভাতই চাপালেন একেবারে। ছোট মেয়ে নাতিকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে চলে গেলেন। ঐন্দ্রিলার ভাতও নিয়েছিলেন, তবে ভাত বেড়ে ডাকতে গিয়ে গাল-বাড়িয়ে চড় খাবার মতো বোকা তিনি নন—হাঁড়িতে ভাত পড়ে রইল, ইচ্ছে হ'লে সে বেড়ে খেতে পারবে—এই পর্যন্ত।

ঐন্দ্রিলা অবশ্য উঠলও না, খেলও না অনেকটা চেঁচামেচি করার ফলে—তখন কিছু টের না পেলেও—পরে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাইতেই ভয়ে সে চুপ করে গিয়েছিল একেবারে। আবার যদি সেই রকম হয়—ডাক্তার দেখানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, এখানে এমন কেউ নেই যে গরজ করে হাসপাতালেও দিয়ে আসবে! হাসপাতালে দিলেও বাঁচবে কি না সন্দেহ।

সারা দিন না খেয়ে বসে থাকার পর কমলাই জোর করে হাত ধরে পুকুরে নিয়ে গেলেন, নিজে মাথায় জল ঢেলে দিলেন। তারপর গিয়ে ভাতেও বসালেন। ভাত খেয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ঐন্দ্রিলা, তখনও তার মাথা ব্যথা করছে।

পরের দিন সকালে উঠে কিন্তু অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করল আবার। কমলারা মনে করলেন সুবুদ্ধি হয়েছে, মিছিমিছি ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ নেই বুঝতে পেরেছে—কিন্তু শ্যামা অত সহজে ভুললেন না। তিনি জানতেন এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী তাঁর মেয়ে নয়। হাল ছাড়লে চলবে না ওর। নিশ্চয় বৃহত্তর কোন সংগ্রামের জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি শঙ্কিত হয়েই রইলেন একটু।

আর, দু-একদিন যেতে না যেতে দেখা গেল তাঁর আশঙ্কাই ঠিক। এবার মাকে আঘাত করবার পরোক্ষ কিন্তু অব্যর্থ পথটাই বেছে নিল ঐন্দ্রিলা। একেবারে যাকে

বলে আদাজল খেয়ে লাগল কমলাদের পিছনে!

কমলা এসবে আদৌ অভ্যস্ত নন। তাঁরা বাড়িওলাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল এক বাড়িতে বাস করেছেন, সেখানে তাদেরও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি বা দেইজি-ঘাঁটা কচকচি না হ'ত, নয়—কিন্তু এ রকম অশান্তির অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। এতটা অশান্তি যে একটা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে এ তাঁদের কল্পনার বাইরে। কথায় যে এত ধার থাকে, তাও জানতেন না।

সত্যিই এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উত্তর তিনি দিতে পারতেন না। দিতে পারত রানী—দু-একবার মোক্ষম উত্তরই দিয়েছে সে কিন্তু যুক্তি-তর্কে হার মানলে ঐন্দ্রিলা মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করত—চিৎকার ও গালিগালাজ। রানী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-মতী মেয়ে. কথা সেও সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারে কিন্তু ইতরতায় সে পেরে ওঠে না ঐন্দ্রিলার সঙ্গে। কখনই করে নি. কমলার কাছে থেকে থেকে—ভুলেই গেছে সে যে, মানুষ এমন চিৎকার গালিগালাজ ও শাপ-শাপান্ত করতে পারে নিকট-আত্মীয়কে।

আগে পুরুষদের বাড়ি থাকার সময়টা শান্ত হয়ে থাকত একটু, কিন্তু পরে সে সংযমও রইল না। গোবিন্দ ঠিক হেম নয়—চুলের ঝুঁটি ধরে দু-চার ঘা দেবে কি বাড়ি থেকে বার করে দেবে—সে ক্ষমতা তার নেই। ক্রমশ দিন এবং রাত্রি—দুই-ই দুর্বিষহ করে তুলল সে ওদের।

খবর পেয়ে একদিন মহাশ্বেতাও এল। আগে কোন্ দিন ওর কোন্ ছেলে যেন নিজে দেখে এবং শুনে গেছে এ বাড়ির অশান্তি, মাকে গিয়ে সে-ই বলেছে, 'ওরে বাপরে, সে কী রৈরক্কার কান্ড! মেজমাসী দিন-রাত যেন দশবাই চন্ডী হয়ে ধেই ধেই নাচছে! বড় দিদ্‌মা তো ঐ ভালমানুষ. সে ভয়ে মরে—এক কোণে বসে চোখের জল ফেলছে, বড়মামী সুদ্দু ঘরের কোণে কাঠ হয়ে বসে। সবচেয়ে দুদ্দশা মেয়ে-গুলোর, ভয়ে পাঙাশপানা হয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে শুধু। বড়মামী বলে ছেলেটা নাকি দিনে-রেতে একটি বার চোখের পাতা বুজুতে পারে না মাসির চিচ্‌কারের ঠেলায়!

'তা মা কিছু বলতে পারে না?' মহাশ্বেতা ছেলের ওপরই তেড়ে ওঠে কতকটা, 'অন্য সময়ে অন্যের বেলায় তো মার মুখ ছোটে খুব! ঢিট করতে পারছে না সে মেয়েকে?'

'তুমি রেখে বসো দিকি! ঢিট করবে! মেজমাসীর যা অবস্থা—তেমন কিছু বলতে গেলে চিবাচিবিয়ে দেবে দিদ্‌মাকে। সেখানে আর দিদ্‌মার দাঁত ফোটাতে হচ্ছে নি। কুটুস কুটুস বাক্যি ঝাড়তে দাও—সে বেলায় দিদ্‌মা খুব আছে. এর সঙ্গে কী করবে? তুমিও যেও নি বাপু—অনত্থক চাট্টি গাল খেয়ে আসবে!'

সুপরামর্শ সন্দেহ নেই!...কিন্তু মহাশ্বেতার পক্ষে এই ধরনের পরামর্শ শুনে চুপ করে বসে থাকা হাত-পা গুটিয়ে—সম্ভব নয়। সে পরের দিনই মার বাড়ি ছুটল এবং বুঝিয়ে বলতেও গেল ঐন্দ্রিলাকে। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত, ঐন্দ্রিলা একেবারে ফেটে পড়ল যেন. 'অ. বড্ড প্রাণে লেগেছে. না? আমার মেয়েটা মরে যাক. শোকে দুঃখে আত্মহত্যে করুক. আর আমি নাতির হাত ধরে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াই—এই চেয়েছিলে. না? সেই জন্যেই কুটনী-গিরি করে শত্তুরদের এনে বসিয়েছ! তোমাকে আমি চিনি না. মুড়কীমুখী শয়তান! বাইরে অমনি তোমার মতো ভালমানুষ ভিজেবেড়াল—ভাজা-মাছটি উল্‌টে খেতেও জানি নি—এমনি সেজে থাকতে পারি না বলেই তো আমরা মন্দ সকলের কাছে। তুমি কি কম কুচক্কুরে?

তোমাকে আমি দস্তুরমতো চিনে নিয়েছি। মেয়েটার বে থেকে শয়তানী খেলছ আমার সঙ্গে। তোমাদের ও রাবণের ঝাড় গিয়ে দাঁড়ালে ওদের সাধ্যি কি ছিল ঐ ঘাটের মড়ার সঙ্গে বে দেয়! তা তো নয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিলে! বেশ জব্দ হচ্ছে, হোক!...কেন, তোমাদের কী এত শত্তুরতা করেছিলুম আমি, কী এমন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলুম? নাকি বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিলুম তোমাদের!—যে বার বার আমারই সব্বনাশ করতে চাইছ! এত দেখেও আশ মেটে নি, পাছে আমি একটু আশ্রয় পাই, পাছে অবীরে মেয়েটার একটু হিল্লে হয়—তাই এই কুন্‌কে শত্তুরদের এনে ঢুকিয়েছ কোটনা-গিরি করে!...ভাল হবে না, ভাল হবে না—এই বলে দিলুম। আমার সব্বনাশ করে মজা দেখবে ভেবেছিলে, নিজের সব্বনাশ তো তার আগে দেখতে হ'ল! এখনও চন্দ-সুর্যি উঠছে!ভেবে রেখো, পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়! বলি, এতটি তো ডুবল! বড়লোক হবে ভেবেছিলে, সব তো গব্‌ভস্রাবে দিয়ে বসে রইলে! ওতেও হবে না, আরও বাকী আছে বলে দিচ্ছি! আমার মতো হাত হয়ে আমার মতো কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে রাস্তায় রাস্তায়!'...

'ষাট! ষাট! ওমা এ কী সর্বনেশে কান্ড গো! কী হবে মা, হে মা সিদ্ধেশ্বরী রক্ষে করো মা! হে বাবা কুন্ডুদের ঠাকুর, মা রাজাদের অন্নপূর্ণো—বাচ্ছাদের বাঁচিয়ে রাখো মা। হাতের নোয়াটুকু বজায় রাখো মা! বৌটাকে দিয়ে নিত্‌সিঁদুরের বেরতো নেওয়াবো মা।...রাম রাম। বাবা, ঝকমারী হয়েছিল আমার এখানে আসা—'

বলতে বলতেই পা পা করে পিছিয়ে বেরিয়ে যায় মহাশ্বেতা। তার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, তবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়তেই শুরু করে বলতে গেলে—একেবারে সিদ্ধেশ্বরীতলায় গিয়ে প্রথম দম নেয়।

সেখানে অনেকবার নিজের নাক-কান মলে, মন্দিরের রকে নাক-খত দিয়ে কেঁদে পুজো মানসিক করে তবে খানিকটা সুস্থ হয় সে। বাড়ি যেতে যেতে বহুবার আপন মনে প্রতিজ্ঞা করে নেয়, 'বাবা, এই নাক কান মলা, খেঁদি থাকতে আর যদি কোন দিন ওবাড়িমুখো হই! এবার গেলে আমার নাম বদলে রাখে যেন সকলে!'

॥ ৪ ॥

অবশেষে রানী নিজেই ঘর খুঁজতে বেরোয়। মাত্র কিছুদিন আগেই হেমের চিঠি পেয়েছে সে ; হেম খুশী হয়ে লিখেছে, 'তুমি এসে আমাদের বাড়িতে আছ, এ যেন ভাবতেই পারছি না! মনে হচ্ছে এতদিনে আমাদের বাড়ি কেনা সার্থক হ'ল।' বড়মাসিমার অনেক খেয়েছি অনেক নিয়েছি আমরা,—অসময়ে যে এইটুকুও কাজে আসতে পারলুম—এইটেই ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। তোমাদের চিঠি পেয়ে পর্যন্ত ছটফট করছি, এক-বার সকলে মিলে থাকব কটা দিন—তা কিছুতেই ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না। বহু লোক এ সময়ে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে, আর কাউকে ছুটি দিতে চাইছে না শালারা।'...আরও অনেক কথা লিখেছে। চিঠি পড়তে পড়তে রানীর মনটা চলে গিয়েছিল সেই সুদূর অতীতে, তার প্রথম বিবাহিত জীবনে, মুগ্ধ ভক্ত যখন নিঃশব্দে নীরব দুটি চোখে প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে থাকত শুধু, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রেম?...না, প্রেম নয় তা রানী জানে। শুধুই মুগ্ধতা, শুধুই তন্ময়তা। সেইটেই আরও ভাল লেগেছিল সেদিন। আজ শরীর ভেঙে আসছে যখন—আরও বেশী করে যেন মনে পড়ছে হেমের কথাটাই। অমনি একটি চিরন্তন ভক্ত দরকার

এখন—যার ওপর ভরসা করা যায়, যে স্বার্থের বা প্রয়োজনের খাতিরে ভালবাসে নি, ভাল লেগেছিল বলেই ভালবেসেছিল।

হেমের বাড়ি, তাদের আশ্রয়ে থাকতে পারলে বোধ হয় ভালই হ'ত। রানীদের যা অবস্থা, তাতে পাঁচ-সাতটা টাকা ভাড়া বাঁচলেও যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু তা হ'ল না, হওয়া সম্ভব নয়। এখানে থাকলে তার ছেলেমেয়েরা বাঁচবে না। ঐন্দ্রিলার যা বিষ তাদের সম্বন্ধে—ও সব করতে পারে! বিদ্বেষে আর ঈর্ষায় যেন পাগল হয়ে গেছে। মাসী কিছু বলছেন না, ভালই করছেন—যদি একটা কথাও বলেন তাদের দিক টেনে, কি ওকে বকাবকি করেন, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা তোলেন—তাহলে নির্ঘাৎ ও বিষ দেবে রানীর বাচ্ছাদের।

বাপ রে! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে!...

গোবিন্দকে দিয়ে কিছুই হবে না। অনেক বলেছে রানী, কান্নাকাটিও করেছে কিন্তু কিছু ফল হয় নি। গা-ঝেড়ে উঠে কষ্ট করে বাড়ি খোঁজা—তার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। এক মধ্যে দুটো রবিবার রানী ওকে ঠেলে বিকেলে বাইরে পাঠিয়েছিল, ঘোষালদের বাড়ি আর চৌধুরীদের বাড়ি বসে আড্ডা দিয়ে ফিরে এসেছে, বলেছে, 'ওদের সব বলে রেখেছি, তেমন সুবিধে-মতো পেলেই খবর দেবে।' সুতরাং ওর ভরসায় থাকা বৃথা। ও বাড়ির বড় ঠাকুরজামাই ওদের চিরকালের ভরসা, আগে হ'লে মুখের কথা খসালেই হ'ত, এতদিনে বাড়ি খুঁজে ওদের বসিয়ে দিয়ে আসতেন সেখানে—কিন্তু ইদানীং বড্ড ভেঙে পড়েছেন যেন—তাঁকে ফরমাশ করতেই মায়া হয়।

না, রানীকেই এ ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে করাও সুবিধা, এ কলকাতা শহর নয় যে, পাড়া-ঘরে বেরোলে নিন্দে হবে। সেখানে পথ-ঘাটও চেনা যায় না, হকচকিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া আলাপই বা কার সঙ্গে ছিল তাদের? এখানে—সকল বাড়ি বয়ে সেধে এসে আলাপ করে যায়। আলাপ করে গেছেনও অনেকে—চটখণ্ডী-গিন্নী, মল্লিক-গিন্নী, জীবন চাটুয্যের মা, অনেকেই দুবার-তিনবার এসে গেছেন এর মধ্যে। এখন তাঁদের বাড়ি একবার বেড়াতে যেতে কোন বাধা নেই, বরং যাওয়াই উচিত।

সে একদিন দুই মেয়েকে শাশুড়ীর হেপাজতে রেখে ছেলে কোলে করে বেরিয়ে পড়ল। কমলা খুবই বিস্মিত হলেন—এ রকম দুঃসাহস তাঁর ধারণারও অতীত—কিন্তু বাধাও দিলেন না। শ্যামাও আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন—সঙ্গে সঙ্গেই এ বেড়াতে যাওয়ার আসল কারণটা অনুমান করে নিলেন তিনি, মনও খারাপ হয়ে গেল খুব—কিন্তু তবু লজ্জায় কোন প্রশ্ন করতে পারলেন না। অথচ এ যা হাড়াই-ডোমাই কাণ্ড নিত্য চলেছে বাড়িতে—তার পর যদি ওরা অন্যত্র উঠে যাবার কথা ভাবে তো ও'দের দোষ দেন কী করে? অনেক ভেবেছেন শ্যামা, ক'দিন ধরেই ভাবছেন, অথচ এই কাণ্ড বন্ধ করারও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। একমাত্র ভরসা সেই আশার আলোটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন তিনি—টাকার অভাব হ'লে ওকে চাকরি খুঁজতেই হবে। এবং চাকরি পেলে চলে যেতেও হবে। মেয়েকে টাকা না পাঠালে চলবে না অন্তত ঐন্দ্রিলা না পাঠিয়ে থাকতে পারবে না। চাকরি ছাড়া সেই নগদ টাকা পাওয়ার অন্য পথও কিছু নেই। এই একটি মাত্র সুযোগ ওর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার যাতে কোনমতে না ফসকে যায়, সেজন্যে শ্যামার হুঁশিয়ারীরও শেষ নেই। আজকাল কোমরে একটা ঘুনসী করেছেন। সিন্দুকের চাবি সেখানেই বেঁধে রাখেন দিন-রাত। ও যা মেয়ে, চুরি করার চেষ্টাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয় ওর পক্ষে।

রানী প্রথম দিন বেরিয়েই বাড়ির সন্ধান করল একটা। ভাড়া একটু বেশী, দশ

টাকা চাইছে—তবে ছোট হ'লেও প্রায় নতুন বাড়ি। এখান থেকে কাছেও বটে, এই দক্ষিণ পাড়ায়। কিন্তু তার চেয়েও একটা ভাল সন্ধান দিলেন চটখণ্ডীগিন্নী, ঐ দক্ষিণপাড়াতেই একটা ছোট্ট বাড়ি বিক্রী আছে। গোটা দুই ঘর, একটা চালা রান্নাঘর জমি অবশ্য খুবই কম, চার-পাঁচ কাঠার বেশী হবে না, কিন্তু একটা পুকুরের একটু অংশ আছে ঐ সঙ্গে, আয় তার যেমনই হোক। বছরে একবার মাছ তুললেও খাজনাটা চলে যাবে—ওদের একটা কাঁচা ঘাট আছে ওদের দিকে, সেইটেই বড় লাভ। পুকুর-সরা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। দাম কম, হাজার টাকা চাইছে, হয়ত তাড়াতাড়ি বায়না করলে আট-নশ'তেও হয়ে যেতে পারে। কারণ ওপক্ষে একটু গরজ আছে! বাড়িটা অবশ্য নতুন নয়—তবে একেবারে ভাঙা-ঝরঝরেও নয়, এখন একটু চুনকাম করিয়ে নিয়েই বসবাস করতে পারবে ওরা, বছর দু-তিনের মধ্যে হাত না দিলেও চলবে।

রানী আশা-নিরাশায় কণ্টকিত হয়ে ফিরল সংবাদটা নিয়ে। এত সস্তায় বাড়ি এ তাদের কল্পনাতীত। এও যদি না হয় তাহ'লে এ কাঠামোতে আর হবে না। কিন্তু এই টাকাটাও কি তোলা যাবে? হাতে তো ওদের কিছুই নেই, তবু এ প্রলোভন ছাড়তেও যেন ইচ্ছে করে না। মনে হয় এ দৈবের যোগাযোগ, নইলে আজই বেরিয়ে এ খবরটা পাবে কেন?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কথাটা তুলল। কমলাও ছিলেন। সব শুনে গোবিন্দ হতাশাব্যঞ্জকভাবেই ঘাড় নাড়ল, 'নাঃ, ও আর ভেবে লাভ নেই, অত টাকা কোথায় পাব? কে দেবে?'

ব্যাকুল হয়ে ওঠে রানী, 'ওগো অত সহজে হাল ছেড়ো না। তুমি যেন একে-বারেই এলিয়ে দিয়ে আছ। এই তো অবস্থা—একটা মাথাগোঁজার জায়গা থাকলেও তবু বল-ভরসা থাকে খানিকটা। হঠাৎ যদি তোমার চাকরি যায়—কি কোন বিপদ-আপদই হয়, মাসকাবারে বাড়ি ভাড়া টানতে না পারলে তো মাল-পত্তর ক্রোক করে রাস্তায় বার করে দেবে, সেটা ভেবে দেখেছ? এ তবু বুঝলুম, খাই না খাই বুকে হাত দিয়ে পড়ে রইলুম, কেউ বলবার নেই।...একটু ভাবো!'

'কী ভাবব বল', গোবিন্দ একটু ঝেঁঝেই ওঠে, 'আমার হাতে পাই-পয়সাও নেই—পোস্টাপিসের একটা খাতায় বোধ হয় একটা টাকা পড়ে ছিল, সে কী হয়েছে তাও জানি না। ধারও কেউ দেবে না। এখন তোমরা পারো, হাতে কিছু থাকে ভাবো ভেবে দ্যাখো ভাল করে!'

কোনপ্রকার অপ্রীতির সূত্রপাত দেখলেই কমলা সিঁটিয়ে ওঠেন। তিনি একটু ভয়ে ভয়েই বললেন, 'তা হ্যাঁরে, আমার সেই টাকাটা—তার কি কোন গতি হবে না?'

এই টাকাটার ইতিহাস আছে। বিধবা হবার পর প্রায় ষোলশ' টাকার মতো—সব গহনা ও জিনিসপত্র বেচে—কমলা গোবিন্দর মনিবের কাছেই জমা রাখেন, টাকাটা খাটিয়ে মাসে মাসে সুদ হিসেবে তিনি যে টাকাটা দিতেন তাইতেই সংসার চালাতেন কমলা। অবশ্য তখনও তিনি মনিব হন নি, গোবিন্দর বন্ধুর বাবা, এই হিসেবেই জমা দিয়েছিলেন। তারপর গোবিন্দ চাকরিতে ঢোকার পর বিয়ে-থা ব্যাপারে কিছু কিছু আসলও নিয়েছে—কিন্তু কতটা কি নিয়েছে তার কোন ভাল হিসেব বোধ করি কোন পক্ষেই নেই। সে সুদও বন্ধ হয়ে গেছে দীর্ঘকাল। সুদে মাইনের মিশে সবটাই তালগোল পাকিয়ে গেছে।

গোবিন্দ মুখ কালি করে অন্যদিকে ফিরে জবাব দেয়, 'সে রকম তো কোন লেখা-পড়া করে রাখো নি, একটা হাতচিটে কি খত—ওরা বলে সব শেষ হয়ে গেছে। অথচ

আমার যা হিসেব মনে পড়ে—যত দফায় যা নিয়েছি, তাতে এখনও পাঁচশ'র ওপর পাওনা। সুদের কথা তো বাদই দাও, সুদ তো বলতে গেলে আমার মাইনে বন্দোবস্ত হবার পর থেকেই আর দেয় নি। আমি নিজে একদিন কর্তাকে বলেছিলুম, তিনি বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে কিছু পাওনা নেই, তবু একবার মনে করে দেখব। আর সুদ বাপু, সত্যি কথা বলতে কি, সুদ ধরেই তোমার মাইনে বন্দোবস্ত করে-ছিলুম, নইলে কি তোমার অত টাকা মাইনে হয় তখন!...এরপর আর কি বলব বলো!'

'ওমা, তা বলবি নি—অতগুলো টাকা জলে যাবে?'

'জলে তো গেছেই, লেখা নেই পড়া নেই—কী নিয়ে লড়ব!'

চুপ করে থাকে সকলেই। একটা হিম হতাশা অনুভব করে রানী, বুকের মধ্যে-টায় যেন কেমন ব্যথা করতে থাকে তার। আশাভঙ্গে এমন দৈহিক কষ্ট হয় তা এর আগে সে কোন দিন অনুভব করে নি।

খানিকটা পরে বলে, 'আচ্ছা, আমার এই গহনাগুলো বেচলে কত হবে? সবই যদি খুলে দিই—হাতের পেটিজোড়াটা রেখে?'

'ছাই হবে? কীই বা আছে। কত কাল ভাঙ্গা হয় নি, সবই তো ক্ষয়ে ঝিঁঝির-পাত হয়ে গেছে। সব গলালেও দশ ভরি হবে কিনা সন্দেহ!'

'তা দশ ভরির দাম কত? সেদিনও তো নিতাই সেকরা এসেছিল মার সঙ্গে দেখা করতে—বলে গেল বাইশ টাকা ভরি।'

'হ্যাঁ—বাইশ টাকা কিনতে। বেচতে গেলে আঠারো টাকার বেশী কেউ দেবে না।'

আবারও সেই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

কমলা, কতকটা ভয়ে ভয়েই বলেন শেষ পর্যন্ত, 'তা ওদের কাছে ধার বলে চাইলেও কি কিছু দেবে না? হিসেবটার কথা তোল্ না আর একবার। এধারে তো মাইনে দিলে কমিয়ে—অথচ মুখের রক্ত তুলিয়ে ছাড়ছে! তোরই কি এত গরজ, তুই গেলে তোর মতো অত বিশ্বাসী লোক ঐ মাইনেয় পাবে ওরা?'

'দেখি। একবার বলব না হয়।' কতটা মুখ গোঁজ করে উত্তর দেয় গোবিন্দ।

পরের দিন দুপুরে রানী বলে, 'মা, ও'র দ্বারা ওসব বলাবলি হবে না। মানুষ চিনি তো। একের নম্বরের মুখচোরা। আপনি একবার কর্তার কাছে যান!'

'ওমা, আমি যাব কি সেখানে।' চমকে যেন ভয় পেয়ে ওঠেন কমলা।

'তাতে দোষ কি। এখন আপনিই তো প্রায় বুড়ো হয়ে গেছেন—তিনি তো আরও বুড়ো শুনেছি। একদিন তো নিজে গিয়েই টাকা দিয়ে এসেছিলেন। আপনি গিয়ে জোর করে বলবেন যে আমার হিসেবে ছশ' টাকা পাওনা হয়, এত বছরের সুদ. সব মিলিয়ে আটশ' টাকা করে দিন! আমি শোধ বলে লিখে দিয়ে যাচ্ছি।...ও'র দ্বারা এক পয়সাও আদায় হবে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কমলা বলেন, 'সে হয়ত গোবিন্দ রাগ করবে কি—কি করবে। রাজীও হবে না হয়ত—গেলে তো ওকে নিয়েই যেতে হবে—'

'না, তাহলে আপনার যাওয়াই হবে না। আমি ও বাড়ির ঠাকুরজামাইকে গিয়ে বলে আসব। তিনিই নিয়ে যাবেন। আর দেরি করবেন না মা—আপনার পায়ে পড়ি। এখন ভাড়াবাড়িতে উঠে গিয়ে দশ টাকা করে ভাড়া গুণলে—আর এমন টাকা জমাতেও পারবেন না যে, কোনদিন মাথা গোঁজার মতো একটু কিছু করবেন।'

'কিন্তু—,' কেমন এক রকম ভীত অসহায়ভাবে পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে কমলা বলেন, 'তাতে কোন দোষ হবে না তো?'

'দোষ হওয়া-হওয়ির কি আছে। আপনার হকের পাওনা আপনি চাইতে যাচ্ছেন। দেওয়া না-দেওয়া তাঁদের ভদ্রতা। তা বলে আপনি কি ছোট হচ্ছেন? ও কারুর কথা শুনবেন না। উনি হয়ত রাগ করবেন কিন্তু টাকাটা—যদি দুশোটা টাকাও উশুল হয়—সেও ও'রই উপকার। আপনি রাজী হোন মা। দোহাই আপনার।'

অগত্যা কমলাকে রাজী হতে হয়। কোনদিনই কারুর কোন অনুরোধ-উপরোধ ঠেলতে পারেন না তিনি। আর এ তো নিজের ছেলের বৌ। ঘরণী গৃহিণী বলে নয়—বৌয়ের বুদ্ধি দূরদৃষ্টি এবং বিচার-বিবেচনার বহু পরিচয় বহুবারই পেয়েছেন তিনি। ও যা বলে ভালর জন্যেই বলে, আর তাতে ভালই হয়—এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

রানী সত্যিই একদিন খুঁজে খুঁজে মৌড়ী চলে গেল। বিকেলের দিকে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেল, সন্ধ্যের মধ্যে ন্যাড়ার সঙ্গে ফিরে এল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনই গোবিন্দর রাত হয়েছিল ফিরতে—এ ব্যাপারটা সে টেরও পেল না।

সব শুনে অভয়পদ রাজী হয়েছে কমলাকে নিয়ে যেতে। বৃহ ছুটি তার পচে যায়, একদিন ছুটি নিয়েই সে যেতে পারবে, কোন অসুবিধা হবে না। রানী ফিরল প্রায় লাফাতে লাফাতে। অভয়পদ অফিস কামাই করে এ কাজ করবে তা কেউ আশা করে নি।

পরের দিনই কমলা গেলেন। একে তো অত বড় জামাইয়ের সঙ্গে যাওয়া—তায় অপরিচিত বাড়িতে, অপরিচিত একটা লোকের কাছে। গোবিন্দর মুখেই শুনেছেন যে বুড়ো কর্তা আজকাল অফিসে বড় একটা আসতে পারেন না। বাড়িতেই বসে হিসেব-নিকেশ দেখেন। অফিস হলেও না হয় কথা ছিল, বাড়িতে যদি মেয়েরা বেরিয়ে আসে, তারা যদি বলে, কি দরকার, কেন, কি বৃত্তান্ত? কি জবাব দেবেন তিনি। যাবার সময়-বরাবর ভয়ে যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি, একবার বলেই ফেললেন, তুমিও না হয় চলো বৌমা, আমি—আমি যদি না সব গুছিয়ে বলতে পারি?'

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন তা সম্ভব নয়। রানীও সেই কথা বলল। সেটা ভাল দেখায় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের দেখবে কে। অভয়পদর আসবার কথা—একেবারে কিছু না-বলা ভাল দেখায় না বলে—গত রাত্রে শ্যামাকেও একটু আভাস দিয়েছে রানী, তাতে শ্যামা আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন। তাঁকে ছেলেমেয়ে দেখতে বলার সাহস আর ওর নেই।

অবশ্য কমলা যতটা ভেবেছিলেন ততটা কিছু হ'ল না। কমলাকে এতকাল পরে নিজে আসতে দেখে বুড়ো কর্তা একটু অপ্রস্তুতই হয়ে পড়লেন। আর সেই অবস্থাতেই কিছু পাওনা আছে, সেটা একবার স্বীকার করে ফেললেন। তারপর অবশ্য কতকটা সামলে নিলেও বলা কথা ফেরাতে পারলেন না—সুদ আর আসল হিসেবে মোট তিনশ টাকা তিনি দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তবে কমলাকে লিখে দিতে হবে যে আর কোন দাবীদাওয়া তাঁর থাকবে না।

রানী আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল, এরপর কমলা আর দুশোটি টাকা ধার দেবার কথা তুললেন। গোবিন্দ লেখাপড়া করে দেবে—সুদ তারা দিতে পারবেন না, তবে মাসে মাসে গোবিন্দর মাইনে থেকে দশ টাকা করে কাটিয়ে দেবে। কী ভেবে তাতেও রাজী হয়ে গেলেন কর্তা, কথা রইল যেদিন দরকার তার আগের দিন খবর দিলে টাকাটা তিনি পুরোপুরি গোবিন্দর হাতে দিয়ে দেবেন।

গোবিন্দ প্রথমটা শুনে বিশ্বাস করতে পারে নি। তার মার এত সাহস হবে এবং বুড়ো কর্তাও এত সহজে টাকা দিতে রাজী হবে—এর কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু যখন বুঝল কথাটা সত্যি তখন সেও একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। রানীর

সব গহনা খুলে দিল সে, সোনা-বাঁধানো এক জোড়া পাতলা পেটি ছাড়া, এটি তার মার চিহ্ন বলেই শুধু খুলল না; নইলে তাও দিত হয়ত। সব গহনা গালিয়ে দেখা গেল, গোবিন্দর অনুমানের চেয়ে কিছু বেশীই ছিল ওজনে, সব সুদ্ধ তিনশ টাকার মতোই পাওয়া গেল।

রানী ইতিমধ্যেই চটখন্ডীদের গিন্নীকে নিয়ে সে বাড়ির মালিকের কাছে গিয়েছিল। অনেক টানা-হেঁচড়া অনেক দরদস্তুরের পর আটশ' টাকাতেই রাজী হয়েছেন তিনি। একরকম অসাধ্যসাধনই বলতে হবে—চটখন্ডী-গিন্নীর বাক-চাতুর্য এবং রানীর মিষ্টি হাসি ও অনুনয়-বিনয়েই এটা সম্ভব হল। তবে তিনি একটি শর্ত করলেন, দুদিন পরেই ভাল দিন আছে, সেইদিন অন্তত দুশ'টি টাকা দিয়ে বায়না করতে হবে। তবেই ও দামে ছাড়বেন তিনি। রানী তাতেই রাজী হয়ে এল। কর্তাকে বলে টাকা আনতে দেরি হবে, গহনা বেচার টাকা থেকেই সে বায়নার টাকা দিয়ে এল। বায়না লেখাপড়া করিয়ে দিলেন মল্লিক-গিন্নীর মেজ ছেলে। গিন্নী নিজেই বললেন, 'তুমি ভেবো না বৌমা, ও আমার উকীল নয় বটে তবে তাবড়-তাবড় উকীলের নাক কাটতে পারে। ওকেই বলেছি, সার্চ করিয়ে রেজেস্টারি করিয়ে সব ঠিক করে দেবে। বলি মল্লিকদের এতবড় সম্পত্তিটা ওই বজায় রেখেছো তো গা। আইন-কানুন সব ওর হাতের তেলোয়!'

অবশ্য মল্লিক-গিন্নীই বাড়িটা সম্বন্ধে একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন প্রথমটায়। ও বাড়ি নাকি তাঁর দেখতাই এই তিনবার হাতবদল হ'ল। যে যে নিয়েছে কারুরই ভাল হয় নি। এর আগের লোকটি বাড়ি কেনার সঙ্গে সঙ্গে বৌ একটা ছেলে মরেছিল। তারপরেও অবিশ্যি তিন-চার বছর ছিলেন তিনি কিন্তু কাজ-কারবারে কী গোলমাল হয়ে শেষে বেচে যেতে বাধ্য হলেন। অথচ এখন নাকি তাঁর আবার খুব বোলবোলাও হয়েছে। বিয়েও করেছেন আর একটা। এ লোকটার অনেক বিষয় ছিল, রেস খেলে সব উড়িয়েছে। এইটি ছিল, তাও তো গেল।...ও বাড়ি নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে তাদের?

রানী উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা, 'জুয়াড়ী রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়েছে, এটাও নষ্ট করবে, এ তো জানা কথা মাসীমা, তার জন্যে বাড়ির দোষ কি! আর বৌ মরা—', একটু মুচকি হেসে বলেছে, 'সে তো ভাল কথাই, আপনারা দাঁড়িয়ে আর একটা বিয়ে দিয়ে দেবেন। ভাগ্যবানের বৌ মরে মাসীমা, তার জন্যে আপসোস কি? তবু মাথাগোঁজার জায়গাটা তো হয়ে রইল!'

'ষাট! ষাট! ও কথা ব'লো না মা, বৌ মলে ঘাটের মড়ারও বে হয় জানি—কিন্তু তোমার মতো বৌ আর পাবে কি আমাদের ছেলে!'

আট শ' টাকা বাড়ির দাম, আট শ' টাকার মতো অবশ্য সংস্থান হয়েছে। কিন্তু আরও কিছু চাই। সার্চ করার খরচা আছে, রেজেস্ট্রী আছে, বাড়ি চুনকামের খরচা আছে। খুব কম করেও অন্তত আর একশ'টি টাকা প্রয়োজন। এটা আসবে কোথা থেকে?—গোবিন্দ প্রশ্ন করল। শেষে কি ঘটিবাটি বেচতে হবে? তাতেও এত টাকা উঠবে কিনা সন্দেহ। বাসন বেচতে গেলে সিকির সিকি দামও মেলে না।

রানী অবশ্য আগেই জানে। টাকা তো আরও লাগবেই ঢের। কথাটা নিয়ে অনেক ভেবেওছে সে। একটা জোর তার ছিলই মনে মনে—সেই জোরেই এতদূর এগিয়েছে। কিন্তু কাউকেই বলে নি সেটা, নিজের অন্তরের নিভৃততম কোণে সেই আশ্বাসটিকে লালন করছিল সযত্নে। হেম—হেমকে সে লিখলে নিশ্চয়ই টাকাটা দেবে

সে—এটা রানী জানত। কিন্তু অতটা জানত বলেই বোধ হয় শেষ মুহূর্তে কেমন একটু সঙ্কোচে বাধল। ওটা তো আছেই—কিন্তু অন্যত্র চেষ্টা শেষ করার আগে ওদিকে সে হাত বাড়াবে না।

এবার রানী বলতে গেলে চরমতম দুঃসাহসেরই পরিচয় দিলে। শ্যামাকে গিয়েই ধরলে সোজাসুজি, বাড়ি কেনার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে জানিয়ে একশটি টাকা ধার চাইলে। একেবারে গোড়াতেই বলে দিলে, 'শুধু হাতে ধার নিচ্ছি মাসীমা, আপনি বরং দেড় টাকা করেই সুদ নেবেন।'

প্রথমটা শ্যামা মনে মনে বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। ওরা বাড়ি করে চলে যাওয়া মানে তাঁর আবার সেই দুরবস্থা। ঐন্দ্রিলার কবলে গিয়ে পড়া। তখন হয়ত সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে তাকে আটকাতে হবে। নিজের অনিষ্ট যাতে হবে তার খরচ তিনি কেন যোগাবেন শুধু শুধু? থাক না—যেখানে পারে নিক না! তিনি কেন নিজের ক্ষতির পথ নিজে প্রশস্ত করে নেবেন?

কিন্তু তারপরই বুঝলেন—এ মেয়ে সহজ নয়। যখন এত কাণ্ড করে বাড়ি এবং বাড়ি কেনার টাকা যোগাড় করতে পেরেছে তখন একশ'টা টাকার জন্যে কিছু ওর সব আটকে থাকবে না। যেমন করেই হোক যোগাড় করে নেবে। মাঝখান থেকে তিনি কেন অপ্রিয় হন—? আর সুদটাও খুব কম দিতে চাইছে না। কী লাভ অসরস ক'রে—মনকে বোঝান নিজেই।.....

চুপ করে আছেন শ্যামা, মনে মনে তোলাপাড়াই করছেন। রানী সেটাকে ভুল বুঝল। সে একেবারে ওঁর একটা পা চেপে ধরল, 'দোহাই মাসীমা, ইনিও আপনার সন্তান, আপনিও এককালে পরের দোরে কম দুঃখ পান নি, আপনি বুঝবেন। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করা—যদি একটু মাথা গোঁজার জায়গা হয় আপনার দয়ায় তো আপনার একটা সৎ কাজই হয়ে থাকবে।'

'ওমা ছি ছি, এর জন্যে পায়ে হাত কেন মা!' একটু যেন অপ্রতিভই হয়ে পড়েন শ্যামা, 'ধার দিচ্ছি, সবাইকেই দিই—তোমাদের কেন দোব না?...তা নয়, তবে আমার তো নিজের কিছু নেই মা তা তো জানই, যা নাড়াচাড়া করি—দুই মেয়ের টাকা। গোবিন্দকে ব'লো একটা হ্যাণ্ড নোট যেন দেয়—আর বাড়ি রেজেষ্টারী হয়ে গেলে পাটাখানা যেন আমার কাছেই রেখে দেয়, যতদিন না টাকাটা শোধ হয়।'

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল রানী। শেষ অবধি যে হেমের কাছে হাত পাততে হ'ল না—এইটেই পরম লাভ মনে হচ্ছে। যে ভালবাসে সত্যি-সত্যিই, তার কাছে হাত পেতে টাকা নেওয়া? ছিঃ, সে বড় অপমান।......

প্রথমটা ঐন্দ্রিলা অতটা বুঝতে পারে নি। কি একটা ব্যাপার চলছে এই পর্যন্ত। তারপরই, যখন জানল যে ওরা বাড়ি কিনছে—দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গেছে তখন থেকেই আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। সে ঝগড়াঝাঁটি গালাগালি—কিছুই রইল না আর, যেন সে মানুষই নয়। শেষের দিকে—বাড়ি সার্চ করা, রেজেস্ট্রী করানো, মেরামত ইত্যাদিতে প্রায় দেড় মাসেরও বেশী সময় লেগে গেল ওদের— ঐন্দ্রিলা আবার গায়ে পড়েই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিল—এমন কি নিজে সেধে ওদের অর্ধেক কাজ ক'রে দিতে লাগল। গৃহপ্রবেশের দিন নিজেই ভোরবেলা উঠে গিয়ে পুজোর যোগাড় ক'রে দেওয়া, রান্না করা, ওদের খাওয়ানো—সব কাজ একা হাতেই করল একরকম।

ওর এই পরিবর্তনের কারণটা স্থূল—বুঝতে না পারার কথা নয়—এরাও বুঝল—শ্যামাও বুঝলেন। চলেই যখন যাচ্ছে—যখন তার জেদই বজায় রইল, তখন আর

শত্রুতা কি? এবার তো মার আর গতি রইল না তাকে ছাড়া। তাকেই ধরে রাখতে হবে—হয়ত সীতার জন্যে কিছু টাকা দিয়েও।

কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে যে শ্যামার তখনও কিছু চিনতে বাকী ছিল—সেটা বুঝলেন তিনি রানীদের গৃহপ্রবেশের কদিন—সাতদিন না আটদিন পরে। যেভাবে সে এসেছিল সেইভাবেই হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তার নিজস্ব পোঁটলাটি বগলে ক'রে বাইরের রকে যেখানে শ্যামা বসে পাতা চাঁচছিলেন সেইখানে এসে বলল, 'তাহলে চললুম। সুখে থাকো। আপদবালাই ঝগড়াটী অলক্ষ্মী বিদেয় হয়ে যাচ্ছি। ভগবানকে বলো আর যেন এমুখো না হতে হয়।...কাছেই রইলুম অবিশ্যি, এই হাওড়ায় বাজে-শিবপুরে চৌধুরী-গিন্নীর ভাগ্নীজামাইয়ের বাড়ি।... ঠিকানার দরকার হয় তো ওখানেই পেতে পারবে।'

এই বলে, স্তম্ভিত শ্যামা ব্যাপারটা কি ঘটছে তা ভাল করে বোঝবার আগেই, দূর থেকে রকে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম ক'রে ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল সে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১॥

ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার খবর কমলারা পেলেন আরও চার-পাঁচ দিন পরে। এই কদিন ঘর-সংসার গুছিয়ে নিতেই কোথা দিয়ে সময় চলে গেছে তা যেন টের পান নি ও'রা। কমলারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী, তাঁর স্তিমিত জীবনে যেন নব উদ্যমের আর আশার জোয়ার লেগেছে—একা তিনজনের খাটুনি খাটছেন। শরীরটা কলকাতা থেকে আসবার পর আরও খারাপ হয়েছে—আজকাল পেটটা আদৌ ভাল থাকছে না —জ্বরও হচ্ছে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই, তবু খেটে যাচ্ছেন ভূতের মতো। এতদিন পরে, এই জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যে অন্তত নিজেদের বাড়ি বলে একটা জায়গা পেয়েছেন—সেখানে এসে পড়তে পেরেছেন এতে তাঁর তৃপ্তির শেষ নেই যেন। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন বৌকে। বলেন, 'তবু যে শেষ নিঃশ্বেসটুকু ফেলবার মতো একটা জায়গা হ'ল বৌমা—এতেই শান্তি। উনি বলতেন না, ভাড়াটে বাড়িতে থেকে নিশ্চিন্তে খাবি খাবারও জো নেই, তখনও হয়ত দেখ গে বাড়িওলা এসে ভাড়ার তাগাদা দিচ্ছে।...তারপর যদি বোঝে যে বাড়ির কর্তা গেল, রোজগেরে কেউ নেই—তাহলে আর চোখের জল ফেলবারও সময় দেবে না, অশৌচের মধ্যেই বাড়ি ছাড়বার নোটিশ এসে যাবে!...ঝ্যাঁটা মারো, বহু জন্মের পাপ থাকলে তবে লোকে পরের দোর ঝাঁট দেয়!'

অভিজ্ঞতাটা এদের সকলের কাছেই অভিনব। হোক ছোট বাড়ি, মোট দুখানা ঘর, তবু নিজের। সামান্যই জমি—তবু এরই মধ্যে রানী রাজ্যের গাছ এনে পুঁতেছে। সব চাই তার—কলা, পেয়ারা, আম, কাঁঠাল, বাতাবি-লেবু—নারকেল সুপুরি ছিলই দুটো দুটো, তাও আবার এনে পুঁতেছে—এদিকে তো ফুলের গাছ যেখানে যত মনে পড়েছে আর পাড়াঘর ঘুরে যত যোগাড় করতে পেরেছে। মল্লিকগিন্নী তো দেখে হেসেই খুন, 'অ আবাগের বেটি, এ করেছিস কি! এত ঘন ঘন বসালে গাছ-গাছালি থাকে কখনও। একটু বড় হ'লেই তো আওতায় আওতায় নষ্ট হয়ে যাবে। এতগুলো গাছ বাঁচাতে হ'লে অন্তত দু বিঘের বাগান চাই। একটা আম গাছ কাঁঠাল

গাছ কতটা জায়গা নেয় দেখছিস না?'

সবই দেখেছে রানী, জানেও সব—কারণ তারও পাড়াগাঁয়েই বাপের বাড়ি, তবু আশ মেটে না বলেই তথ্যের দিকে, অভিজ্ঞতার দিকে চোখ বুজে থাকে। মনে হয় হয়ত সবগুলোই লেগে যাবে। এসব গাছ তো চাই-ই, নিজেদের বাড়িতে আম জাম কাঁঠাল গাছ একটা ক'রে না থাকলে চলে!...

এমনি স্বপ্নের মধ্য দিয়েই দিন এবং রাত কাটছিল—তবু তার মধ্যেই একদিন মনে পড়ল, ও বাড়ি থেকে সেই মালপত্র নিয়ে আসার পর থেকে আর একদিনও যাওয়া হয় নি। কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে—অপর কেউ এ ব্যবহার করলে তাঁরাও একে বেইমানী আখ্যাই দিতেন। অবশ্য ওরাও কেউ আসতে পারত। গৃহপ্রবেশের পর একটি দিন মাত্র ঐন্দ্রিলা এসেছিল, সেও আর আসে না। কমলা বললেন, তুমি একবার যাও মা, দেখে এসো গে। আমার শরীরটা ভাল নেই, কাজও ঢের—আমি বরং মেয়ে দুটোকে সামলাব—তুমি খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো!'

খবরটা অবশ্য যেতে যেতেই পাওয়া গেল মল্লিকগিন্নীর কাছে, তিনিও দক্ষিণপাড়ায় বেড়াতে আসছিলেন, বললেন, 'ওমা, শোন নি? খেঁদি তো চলে গেছে। এখন তো গিন্নী একা। পাগল মেয়ে আর নাতি নিয়ে সেই হাবুডুবু শুরু হয়েছে!'

'চলে গেছে? সে কি! অত কাণ্ড ক'রে আমাদের তাড়ালে, নিজে পাকাপাকি বসবে বলে—আবার কি হ'ল?'

রানীর যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না কথাটা!

'কিছুই নাকি হয় নি—গিন্নী যা বললেন, একেবারে তলে তলে চাকরী ঠিক করে যাবার সময় বলে গেছে। এই কাছেই নাকি কোথায় আছে, হাওড়ায় কোথায়—চৌধুরীগিন্নীর কে কুটুমের বাড়ি। আসলে কি জানো বৌমা, যে লোকগুলো বদ হয় তারা মন্দ করতে চাইলে অনেক সময় ভালো লোকের উপকারই হয়ে যায়। ও অমন ক'রে আদাজল খেয়ে না লাগলে বোধহয় তোমাদের এ বাড়ি কেনার এত চাড় হ'ত না। ও একদিক দিয়ে তোমাদের উপকারই করেছে। বরাতে ছিল বলেই বোধহয় ওর মাথায় ছেমো চেপেছিল।'

তা বটে। হয়ত সত্যিই তাই। তবু রানী যেন ঐন্দ্রিলার মনের তল খুঁজে পায় না। শ্যামার জন্যে মন খারাপ হয় খুব। আহা বেচারী—অসময়ে ওদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এটা তো ঠিক, অনেকগুলো টাকা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আবার সেই একা একহাতে নাটা-ঝামটা খাওয়া!...

শ্যামা রানীকে দেখে প্রথমটা গম্ভীর হয়েই ছিলেন। ঐন্দ্রিলা চলে যাওয়ার পর আরও যেন বেশী ক'রে রাগটা গিয়ে পড়েছিল এদের ওপর। পড়েছিল কতকটা অবুঝের মতোই। ও'র মনে হচ্ছিল, 'সেই তো চলে গেল সে, মধ্যে তো বেশ ঠাণ্ডাও হয়ে এসেছিল, এত একেবারে উতলা হবার কী ছিল! আর যাবে না তো কী, যেতে তো তাকে হ'তই—সে তো জানা কথাই! মাঝ-খান থেকে আমারই এখানে ব'সে বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে সব সরে পড়ল!'

তিনি জানেন যে তাদের যাওয়া স্থির না জানলে মেয়ের রাগারাগি কমত না, উনি জানেন যে তার যাওয়ার স্থিরতা সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না—তবু রাগ করেন, জোর ক'রেই যেন সত্যগুলোর দিকে চোখ বুজে থাকেন তিনি।

অবশ্য রাগ বেশীক্ষণ রাখতেও পারেন না। রানী এসে যতটা পারে কাজকর্ম টেনে ক'রে দেয়। তরুকে জোর ক'রে ধরে চুলের জট ছাড়িয়ে চুল বেঁধে দেয়, পুকুরে নিয়ে গিয়ে গা ধুইয়ে আনে, ছেলেটাকেও পরিষ্কার ক'রে দেয়। ঘরদোর

ঝাঁট দিয়ে অনেকখানি সংসার করে দেয় শ্যামার। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বলতে হয়, 'তুমি একটু এবার বসো বৌমা, ছেলেটা ধুলোকাদা ঘাঁটছে, ওকে একটু ধরো।' সেই এসে পর্যন্তই তো খাটছ তোমারও তো শরীর ভাল নয়! আর একদিনে তুমি কত-টাই বা আসান করবে মা—ও তো আমার নিত্যকার সমিস্যে। আমার কর্মফল আমাকে ভুগতে হবেই—কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'

রানী অবশেষে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে ও'র কাছে এসে একটু বসে পা ছড়িয়ে। ঐন্দ্রিলা যাবার আগের দিন ক্ষুদভাজার নাড়ু ক'রে রেখে গিয়েছিল গোটাকতক, এখনও সব ফুরোয় নি, শ্যামা তাই দুটো বার ক'রে ওদের হাতে দিলেন। বাড়িঘরের কথা, বোন-বোনপোর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'আমার তো আর নড়বার পথ রইল না মা, বন্দী একেবারে। রবিবারে কান্তি বাড়ি থাকে বটে, তাও সব রবি-বারে নয়, একো-একোদিন বেরোতেও হয়—আর তাও, না বেরোলেই বা কি, ও বদ্ধ কালা মানুষ, ওর ভরসায় কি পাগলকে রেখে যেতে পারি!...তোমরাই মধ্যে মধ্যে খবর নিও—মলুম কি বাঁচলুম। এ যা হয়েছে—একটা কারও যদি অসুখ হয়ে পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাক্তারখানায় যেতে পারব না। কত মাসের যে সুদ বাকী পড়েছে চারিদিকে—তাগাদা করবার পথ পর্যন্ত বন্ধ!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে রানী বলে, 'একটা কাজ করবেন মাসীমা, আমার সন্ধানে একটি ভাল মেয়ে আছে, কান্তি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে দেবেন?'

'ওর বিয়ে দেব কি মা, ওর আয় কত যে বিয়ে দেব? ভূতের খাটুনি খেটে-- দিন নেই রাত নেই শরীর পাত ক'রে বলতে গেলে—নাকি লাফিয়ে উন্নতি হয়েছে, তাও কিনা যতদিন পরে হবার কথা ছিল তার আগেই হয়েছে—দশ টাকা মাইনে। ...একটা চাকরের মাইনে। ওপরটাইম হ'লে কিছু বেশী পায় তা সেও তো ঐ মাইনের হিসেবেই। দশ টাকা মাইনে আর দু পয়সা জলখাবার। তার এক পয়সা তো খেতেই চলে যায়, বারো চোদ্দ ঘণ্টা পরে বাড়ি আসে, মধ্যে যদি এক পয়সার মুড়িও না খায় তো বাঁচবে কী ক'রে বলো? যা পায় তা থেকে মাসিক টিকিটভাড়া দিয়ে দশ-এগারো টাকার বেশী হাতে দিতে পারে না। এর মধ্যে বৌ এনে খাওয়াবো কি?'

'সে যা হয় হয়েই যাবে মাসীমা,' রানী জেদ করে, 'আপনার ভাত-হাঁড়ির ভাত দুবেলা দুমুঠো খাবে—কেউ টেরও পাবে না। আপনিই তো চালাচ্ছেন, কেউ এসে পড়লে তো দুটো ভাত দিতে কোনদিন আপনাকে কাতর দেখি নি। মনে করবেন যে আপনার সেই মেয়েই এসে আছে। আর আপনি তো বড়লোকের মেয়ে আনবেন না যে রোজ মাছের মুড়ো দিয়ে খেতে দিতে হবে—গরীবের মেয়ে না হ'লে এ পাত্তরে দেবেই বা কেন? আসবে খাটবে খুটবে খাবে। যেমন আপনারা খাচ্ছেন— তেমনিই খাবে।'

তবু শ্যামা মন স্থির করতে পারেন না, বলেন, 'আমার যা বরাত, বৌ এনেই কি সুখ হবে! ঐ তো এক বৌ ছিল, ঘরকন্না সব বুঝেও নিয়েছিল, রইল কি. মুখে লাথি মেরে ভাতারকে নিয়ে সুখভোগ করতে চলে গেল। আজকালকার সব মেয়েই চায় একলা ঘরের গিন্নী হ'তে—মাগটি আর ভাতারটি থাকবে, জোড়ের পায়রার মতো দিনরাত্তির বসে শুধু বক-বকুম করবে, আর কেউ থাকবে না মাথার ওপর আলশোল।'

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে তাঁর, কনক সম্বন্ধে বিষের পাত্র উপ্‌চে ওঠে যেন গলাতে।

রানী একটু চুপ ক'রে থেকে খুব ঠান্ডা গলায় বলে, 'সে বৌ গেছে. তার বরের কোমরের জোর ছিল ধরুন—একে আনার তো সেই সুবিধে, আপনার তাঁবে থাকতেই হবে তাকে। ঐ আয় যার সে তো আর ঘর ভাড়া ক'রে গিয়ে আলাদা থাকতে পারবে না।...আপনি ধরুন মেজ-ঠাকুরঝিকে সব খরচ দিয়ে উল্টে মেয়ের জন্যে কটা টাকা দিয়েও আনিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, তার চেয়ে একটা বৌ আনলে কী বেশী খরচ হবে বলুন?'

তা বটে। বড় বৌয়ের কথায় যুক্তি আছে—তা মানতেই হয় শ্যামাকে মনে মনে। এইজন্যেই তিনি এত পছন্দ করেন বৌটাকে। রূপেগুণে সমান! তেমনি মিষ্টি স্বভাব। কাজকর্মও যেন হাতে পায়ে লাগে না। আর এই বুদ্ধি। পরিষ্কার কথাবার্তা কয়—সর্বদিকে আটঘাট বেঁধে। যত দেখছেন বৌটাকে তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এ মেয়ে গোবিন্দর চেয়ে ঢের ভাল পাত্রে পড়া উচিত ছিল, তাঁর মনে হয় এক-এক সময়।

খানিকটা চুপ করে থেকে বলেন, 'কান্তি কি রাজী হবে?'

'সে ভার আমার মাসীমা, সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে রাজী করাব। নিদেন হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও—।'

'তা দ্যাখো—', শ্যামা যেন কতকটা অভিভূতের মতোই হয়ে যান, এমন ভাবে কথাগুলো কখনও ভেবে দেখেন নি, এখন যত ভাবছেন ততই ভাল লাগছে তাঁর প্রস্তাবটা, কথাটা এইভাবে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে করতেই জবাব দেন, 'তা দ্যাখো না হয় একটা মেয়েটেয়ে, খোঁজে থাকো না হয়!'

'মেয়ে একটি খোঁজে আছে মাসীমা, ঠিক যেন আপনার মাপেই ভগবান যুগিয়ে রেখেছেন। আমার এক কাকার ভায়রাভায়ের ভাইঝি। সে ভাই নেই, বিধবা ঐ মেয়েসুদ্ধ ঐ ভায়রাভাইয়ের ঘাড়ে পড়েছে। তিনি কী এক সামান্য চাকরী করেন কোন্ মাড়োয়ারীর গদীতে, খুবই কম মাইনে—নিহাৎ নিজের বৌদি আর ভাইঝি বলেই ফেলতে পারেন নি, নইলে সেরকম অবস্থা নয়। তার ওপর তাঁর নিজেরও ঘেটের চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সবাইকেই বলে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। এখানে আসবার আগে যে একবার বাপের বাড়ী গেছলুম, সে সময়ই কাকা বলেছিলেন, দ্যাখ্ না তোদের পাড়াঘরে। দিতে তো কিছুই পারবে না—তবে ওদের তেমনি কোন আহিষ্কেও নেই, দোজবরে তেজবরে পেলেও দিয়ে দেবে।'

'একেবারে কিচ্ছু দেবে না?' শ্যামার কণ্ঠে হতাশার সুর, সঙ্গে সঙ্গে যেন ঈষৎ বিরূপতারও।

'না, সে বলতে গেলে কিছুই না। মার নাকি একটি জোড়া বালা আছে ভরি পাঁচেকের মতো—তাই ভেঙ্গে রুলি হার ক'রে দেবে শুনেছি—আর কাকা ভিক্ষে দুঃখু ক'রে, যা দানসামিগ্‌গির বরাভরণ না দিলে নয়, তাই দেবে। তার বেশী তার ক্ষমতা নেই। তবে ধরুন—মেয়েকে আমি দেখেছি, মেয়ে দেখতেও খুব ফেল্‌না নয় —হতচ্ছিরি তো নয়ই! এধারেও বেশ গ্যাট্টাগোট্টা আছে, খাটতে পারে নাকি মোষের মতো।...আপনি বরং একবার দেখুন মাসীমা—একেবারে অমত করবেন না।'

শ্যামার মনে হয় বুড়োর বৌয়ের কথা। মেয়েটা না কাজ ক'রে যেন থাকতে পারে না। আজকাল তো যত ভারী কাজ গিন্নীরা ঐ বৌটাকে দিয়ে করায়। দমাদম বাটনা বাটছে জল তুলছে, টিন টিন ক্ষার কাচছে—সব তো ঐ বৌ। ওরকম হ'লে সত্যিই মন্দ হয় না। টাকা কিছু খরচ হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি।...একে ঐ বন্ধ কালা ছেলে তায় এই উপার্জন, শুধু তাঁকে দেখে কে আর পাঁচশ হাজার দিয়ে বিয়ে

দেবে এ পাত্রে।

সেই কান্তি। তাঁর গর্ভের সেরা সন্তান। আশা ছিল কান্তির রাজার ঘরে বিয়ে হবে।...আর সত্যিই, ঐ রূপবান ছেলে—লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হ'লে নিশ্চয়ই বড় বড়' জমিদারের ঘর থেকে, রাজার ঘর থেকে সম্বন্ধ আসত, কত হাতীঘোড়া এসে দাঁড়াত তাঁর এই কুঁড়েঘরের সামনে। হয়ত সে বৌ এসে তাঁর পুকুর সরত না—তাঁর ঘর করত না, তবু একটা বলবার মতো সম্বন্ধ হ'ত তো! তার জায়গায় এই!

একটা অর্ধোদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস কষ্টে দমন করেন শ্যামা। অনেকক্ষণ পরে মুখে বলেন শুধু, 'তা দ্যাখো না হয়। সেই মেয়েই কি আর বসে আছে এতদিন?'

দেখা গেল যে সে মেয়ে বসেই ছিল। শ্যামা দেখতে যেতে পারবেন না ব'লে তারাই এসে মেয়ে দেখিয়ে গেল। খুব ফরসা নয়, তবে ময়লাও নয় একেবারে। মাজামাজা রঙ, গড়নপেটনটা একটু যেন কেমন মদ্দাটে গোছের মনে হ'ল শ্যামার, তবে মুখশ্রী মন্দ নয়। মুখে চেহারার দৈন্য মানিয়ে যাবে। যেখানে স্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই, ধারণার প্রশ্ন—যেখানে আর ও গড়নপেটনের প্রশ্নটা তুলে লাভ নেই। তাছাড়া, শ্যামার মনে হ'ল, ওটা হয়ত ছেলেবেলা থেকে খাটাখাটুনির জন্যেই হয়েছে, শারীরিক শক্তি ও কর্মদক্ষতারই পরিচায়ক ওটা। তিনি মেয়ে পছন্দ করলেন। ছেলেও তাদের পছন্দ হয়েছিল, যারা তেজবরেতে পর্যন্ত বিয়ে দিতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে আর ছেলে খারাপ কি। এক যা কানে শুনতে পায় না—তা মেয়ের কাকা বললেন, 'আমাদের মেয়ে ওখানকার মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে, একেবারে ক-অক্ষর-গোমাংস তো নয়—ও চিঠি লিখে কথা কইতে পারবে!'

তবু শ্যামা ভদ্রতার খাতিরে একবার বললেন, 'মেয়েকে বলে-কয়ে এ কাজ করছেন তো, লুকোচাপা করছেন না তো? শেষে এসে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে না তো?'

'না না—সব বলেই নিয়েছি। এমন সুন্দর বর পাচ্ছে, এ তো ভাগ্যের কথা ওর। এই তো আশার অতীত। আমাদের ঘরে যখন জন্মেছে তখন কী আর রাজপুত্তুর পাবে! আপনারাই একটু দয়া ক'রে মানিয়ে টানিয়ে নেবেন, অনাথ মেয়েটা—'

পাত্রপাত্রী পছন্দর পর দেনাপাওনার প্রশ্ন ওঠে। রানী অবশ্য বলে রেখেছিল যে ওরা এক পয়সাও দিতে পারবে না—কিন্তু শ্যামা সুকৌশলে বেয়াইকে দিয়ে 'যৎসামান্য' দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে' নিলেন। সে যৎসামান্যটা কত তা নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করলেন না, রানীকে আড়ালে বললেন, 'যতই কম দিক, একশ টাকার কম তো আর দিতে পারবে না—আমি এখন তাই ধরে রাখছি। যথা লাভ! কিছুই তো আশা ছিল না, সে জায়গায় পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা জোটে তাই ভাল।'

শুধু যৎসামান্য নগদের কথাই নয়—আরও একটি কথা পাকা ক'রে নিলেন, গায়ে হলুদের তত্ত্ব এ'রা করবেন না, শুধু নিয়মরক্ষার মতো মাছ, হলুদ, একটু মিষ্টি, আর লালপাড় শাড়ি। ও'দেরও ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাতে হবে না। মেয়ে-জামাইয়ের কাপড়, ক্ষীরমুড়কী বাটিসুদ্ধ, আর ফুল মিষ্টি—এই পাঠালেই চলবে।

কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। শুধু এখন হেমের কাছে খবর পাঠানো যা বাকী, তার ছুটি পাবার সময়টা জানতে পারলে এ'রা পাকা দেখা ও বিয়ের দিন ঠিক করবেন, হেমই এসে আশীর্বাদ করবে, সেই সঙ্গেই বিয়ে সেরে চলে যাবে।...

দীর্ঘদিন পরে ছেলেকে বিস্তৃত চিঠি লিখলেন শ্যামা। ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে, রানীর আত্মীয়ই বলতে গেলে, রানীই জেদ্ ক'রে এ বিয়ে দেওয়াচ্ছে, সে-ই কথাবার্তা

ঠিক করেছে—তারই পীড়াপীড়িতে শ্যামাকে রাজী হ'তে হয়েছে—ইত্যাদি খবর দিয়ে, অর্থাৎ চিঠির মধ্যে 'তোমার বড় বৌদি' শব্দকটি অন্তত পনেরো-ষোলবার ব্যবহার ক'রে, 'যৎসামান্য'র কথাটা বেমালুম চেপে গিয়ে লিখলেন, 'উহারা এক-পয়সাও খরচ করিতে পারিবে না, সে সামর্থ্যও উহাদের নাই। থাকিলে আমার ঐ ছেলেকেই বা মেয়ে দিতে রাজী হইবে কেন? অথচ এধারে সত্যই আমারও দিন চলে না। এবম্বিধায় আমাকে রাজী হইতে হইল। নমো নমো করিয়া সারিলেও দুশ-আড়াইশটি টাকা খরচ হইবে কমপক্ষে। অবশ্য আমিও কিছু খরচ করিব, তবে তোমার নিকট হইতে অন্তত একশটি টাকার ভরসা রাখি। আশা করি তোমার অশক্ত অক্ষম ছোট ভাইয়ের জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না।' ইত্যাদি—

কান্তিকে রাজী করানো যতটা সমস্যা হবে ভেবেছিলেন শ্যামা, এবার তা আদৌ হ'ল না। হয়ত সে-ও সংসারের সমস্যা ও মায়ের কষ্ট দূর করার একটা উপায় চিন্তা করছিল, বড় বৌদি সেই দোহাই নিয়ে কথাটা পাড়তে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল। এবং, রাজী হওয়ার পর থেকে যেন একটু উৎসুকভাবেই সেই অভাবনীয় ঘটনাটার অপেক্ষা করতে লাগল। নিজের আগ্রহ দেখে তার নিজেরই অবাক লাগত এক একদিন।

অবশ্য বিয়ের বয়স তার হয়েছে। বরং অনেক আগেই সে বয়সে পৌঁছে গেছে সে, আরও আগে হওয়াই হয়ত উচিত ছিল। কিন্তু বয়সের প্রশ্ন ছাড়াও অভিজ্ঞতার প্রশ্ন আছে। যে বাঘ নররক্ত পান করেছে, সে নররক্তের জন্য অধীর এবং লোলুপ হয়ে উঠবে এইটেই স্বাভাবিক। রতনদিকে আর যেন খুব ভাল ক'রে মনে পড়ে না—একটা বেদনা-বিজড়িত মধুর স্মৃতিতে মাত্র পরিণত হয়েছেন তিনি, এমন কি তাঁর মুখচোখের ছবিটাও যেন ক্রমশ ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে মনে—তবু সেই সুরনারী-দুর্লভ দেবাকাঙ্ক্ষিত বরতনু আলিঙ্গন ও সম্ভোগের স্মৃতি—তার দৈহিক ছবিটা মন থেকে মুছে গেলেও—স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে আজও, ওর প্রতিটি রক্তকণা সে রভসস্মৃতিতে উন্মত্ত অধীর বুভুক্ষু হয়ে ওঠে। ছবিটা মনে নেই, কিন্তু অনুভূতিটা আছে। সেই অনুভূতির পুনরভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা ওকে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে। লজ্জায় কাউকে প্রশ্ন করতে না পারলেও ঘটনাটা ঘটতে কত দেরি আছে এখনও—পরোক্ষে সেটার খোঁজ করে। আজকাল প্রায়ই খেতে বসে মাকে প্রশ্ন করে, 'দাদার চিঠি-টিঠি পাচ্ছ?' এখন যে দাদার ছুটি পাওয়ার ওপরই সবটা নির্ভর করছে—এটুকু সে জানে। আর প্রশ্নটা যে সেইজন্যেই তা শ্যামাও বোঝেন—তিনি মুখ টিপে হাসেন শুধু। পরিতাপও করেন মনে মনে—'কী না পেতে পারত, বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে পায়ে লোটাত এতদিনে—নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করলে। এখন ঐ হাঘরের ঘরের শাঁকচুন্নির জন্যেই লালায়িত। হায় রে!'

অবশ্য হেমের ছুটি পেতে খুব দেরি হ'লও না। অনেকদিন ধরেই ছুটির তাগাদা দিচ্ছিল সে। রানীবৌদিরা এত কাছে এসেছে—বাড়িতে যতদিন ছিল আসা তো হ'লই না, তবু এখনও খুব দূরে নেই. এপাড়া ওপাড়া—সবাই মিলে একসঙ্গে দিনকতক হৈ-চৈ করবার জন্যে মনটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে কবে থেকে। সেই ছুটির তাগাদাই কাজে লাগল, বড়বাবু এবার ছাড়লেন ওকে। পাঁজি দেখে বিয়ে বৌভাত পাকা দেখার দিন হিসেব ক'রে তেরদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এল—রবিবার আর অন্য কী একটা ছুটি মিলিয়ে যাতে ষোল সতেরো দিন পুষিয়ে যায় এইভাবেই ছুটিটা নিলে।

রানীকে দেখে ওদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। হেমেরও, কনকেরও। কনক খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমাদের সঙ্গে জামালপুরে চলুন দিদি, টানের

জায়গা, মাসখানেক থাকলেই সেরে যাবেন। চলুন—'

ম্লান হেসে রানী বলে, 'আর আমার এইসব জেয়োঢাক্‌না, এরা? এদের কে দেখবে এখানে?'

'ওমা, ওদেরও নিয়ে যাবেন বৈকি! ছেলেমেয়ে ছেড়ে কি যেতে বলছি।'

একটু চুপ করে থেকে রানী বলে, 'না ভাই, সে হবে না। মারও শরীর খারাপ, ওঁকে ফেলে আমি যদি যাই সে বড় খারাপ দেখাবে, আর ওঁরও কষ্ট হবে খুব। একা একটা বাড়ি পাট করা, ভোরে ভাত দেওয়া, পেরে উঠবেন না।...চারিদিকে দেনা, একটা ঠিকে ঝিও তো রাখতে পাচ্ছি না, সবই তো করতে হয়।'

'তা আপনিই বা এই শরীরে কতদিন বইবেন? শয্যাগত হয়ে পড়লে তখন?'

'তখন তুমি আছ। তোমাকে লিখব—এসে সেবা করবে!' বলে কনকের গাল দুটো টিপে দেয় রানী।

'না দিদি, ও আপনি কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন।...একটু ভেবে দেখুন. জল-হাওয়া খুব ভাল ওখানকার। জিনিসপত্তরও সস্তা, তিন আনা সের মাছ, চার আনা সের মাংস। চলুন, আমি বরং মাসীমাকে বুঝিয়ে বলি!'

'না না। তাহলে মা ভাববেন যে আমি বলাচ্ছি তোমাকে দিয়ে। বরং মা যদি দিন-কতক থেকে সেরে আসতেন তারপর আমি যেতুম তো ভাল হ'ত।...তা কি আর মা রাজী হবেন? দেখি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।'

তারপর একটু হেসে বিচিত্র দৃষ্টিতে কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে 'আমাকে যে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিস, ভয় করছে না?'

'না দিদি, একটুও না।' স্থির দৃষ্টি রানীর দৃষ্টির ওপর নিবদ্ধ করেই জবাব দেয় কনক।

'কেন রে, এমনি বিচ্ছিরি হয়ে গেছি বলে? তাই আর ভয় করে না?'

'না দিদি, তা নয়। আপনিও যেমন খোলাখুলি বলছেন আমিও তেমনি খোলা-খুলিই জবাব দিচ্ছি, ভয় যখন ছিলও—সে আপনার রূপের জন্যে নয়। আপনাকে যে ভালবাসবে সে রূপগুণ মিলিয়েই ভালবাসবে। আমার মানুষকে আমি চিনে নিয়েছি—সত্যিকার খারাপ চোখে সে কোনদিনই চায় নি আপনার দিকে। আর আপনার কথাও ওঁর মুখ থেকে অনেক শুনেছি, আপনার দ্বারা আমার যাকে অনিষ্ট বলে তা কখনও হবে না—এ জোর খুব আছে মনের মধ্যে!'

চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে রানীর। সে কনকের দুটো হাত চেপে ধরে বলে, 'বাঁচালি ভাই, এ যে কী দুশ্চিন্তা ছিল, কেবলই ভাবতুম না জানি আমার সম্বন্ধে কত কী খারাপ ভেবে বসে আছিস। কিন্তু সত্যিই বলছি, এই বামুনের মেয়ে এয়োস্ত্রী তুই—তোকে ছুঁয়ে বলছি, আমার মনে কোন অনিষ্ট চিন্তা কখনও আসে নি।'

'সে আমি জানি দিদি!' হেঁট হয়ে আর একবার পায়ের ধুলো নেয় কনক।

দুটো চোখ মুছে রানী আবারও কেমন একরকমের গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি কিন্তু তোমার ওপর অনেক ভরসা করে বসে আছি বোন, তুমি আমাকে কথা দাও—বিপদের দিনে কোনদিন, যদি সত্যি সত্যিই তোমাকে ডাকি, তুমি চলে আসবে ঠিক, আমাকে ত্যাগ করবে না!'

'ওমা, তা করব কেন! কিন্তু এসব কথা কেন বলছেন দিদি?' একটু উদ্বিগ্ন-ভাবেই প্রশ্ন করে কনক।

না, ও কিছু না।' রানী উড়িয়ে দেয় কথাটা। জোর করে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে,

জামালপুরের কথা তোলে।

বসে গল্প করার খুব সময়ও ছিল না অবশ্য। রানী বিয়ে উপলক্ষে কদিন—রাতটুকু ছাড়া—এ বাড়িতে এসেই ছিল। সংসারের গৃহিণীর যা কিছু করণীয় বলতে গেলে সে-ই একা সব করেছে।

ওকে যত দেখছেন তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন শ্যামা। সবই করছে কিন্তু খরচপত্রের হাত যতদূর সম্ভব টেনে—আর কোন খরচটাই শ্যামাকে না জিজ্ঞাসা করে করছে না। কনকও অবাক হয়ে যাচ্ছে, গুণের মেয়ে তা সে শুনেছিল কিন্তু এত গুণের তা ধারণা ছিল না। এই শরীরে কী খাটুনিটাই না খাটছে, মনে হয়, একটা মানুষ চারখানা হয়ে বিয়েবাড়ির সর্বত্র একই সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের সেটা হ'ল ওর মেজাজ। এবাড়ির সমস্ত লোকগুলির ওপর, সমস্ত ঘটনা ও ক্রিয়াকর্মের ওপর ওর মধুর স্বভাবের আশ্চর্য প্রসন্নতা যেন একখানি স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে রেখেছে সর্বদা, আর সে ছায়া একটি অতি মিষ্টি সুরের আমেজ এনে দিয়েছে সকলের মনে, কোথাও কোন তালভঙ্গ হবার অবসর দিচ্ছে না।...খাটছে সবাই, কিন্তু তার পিছনে আবহসঙ্গীতের মতো তার হাসি, ঠাট্টা, তামাশা ও আন্তরিক সহানুভূতি অহরহ প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

এমন আর কখনও দেখে নি কনক, কখনও কল্পনা করে নি। হেমের কোন দোষ দেওয়া যায় না—মনে মনে বরং বাহবাই দিল হেমকে, এই মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে। অবশ্য তারপরই মনে হ'ল—এই মেয়েই সে মায়া কেটে দিয়েছে। নিজে স্বেচ্ছায় জাল কেটে না দিলে পাখী কোনদিনই উড়তে পারত না, উড়তে চাইতও না।

॥ ২ ॥

কান্তির বৌয়ের নাম নাকি বিনতা—কিন্তু দেখা গেল নত সে কোনখানটাতেই নয়। তার বয়স অল্প—আর কিছুই অল্প নয়। জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা—এ বোধ হয় বয়স্কা মেয়েছেলের মতোই।

বিয়ের কনে পাল্কী থেকে নেমে কড়ি-খেলাটেলা নিয়মকর্মের পরই—রানী যখন তাকে কাপড় ছাড়াতে নিয়ে যাবে—সে চুপি চুপি বলার চেষ্টায় ফ্যাশ ফ্যাশ করে বললে, 'চলো না অমনি একেবারে পুকুর ঘাটটা ঘুরে আসি। দেখে-শুনে নিই, একশ'বার কী আর পরের খোশামোদ করব? শুনেছি তো এখানে কলতলা নেই আমাদের খিদিরপুরের মতো, পুকুরেই যা কিছু!'

যেন গালে একটা চড় খেল রানী। কী সর্বনাশ! এ কাকে নিয়ে এল সে! এই যদি ওর স্বরূপ হয়, তাহ'লে তা প্রকাশ পেতেও দেরি হবে না, মাসীমা কী বলবেন ওকে?

রানী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিনতাই আবার বলে, 'ওমা কী হল, খারাপ কিছু বললুম নাকি? বলি এই ঘরই তো করতে হবে, সব দেখে শুনে নেওয়া ভাল না? ঐ পুকুরই তো সরতে হবে দুবেলা, তা সেটা দেখে নেওয়া আবার দোষের নাকি? আর যদিই দোষের হয়—তুমি তো আমাদের আত্মীর—তুমি তো বলে দেমে সেটা।'

'না দোষ আর কি। চলো পুকুরেই যাই।' রানী কোনমতে সামলে নেয়

নিজেকে। একে তো মেয়েটার গলার আওয়াজ কেমন আধো-আধো—হয়ত আল-জিবের বা জিবেরই কোন দোষ আছে, অল্পবয়সের খুকী হ'লে এ গলা মানায়, এই বয়সের মেয়ের গলায় ঐ রকম স্বর শুনতে বড় খারাপ লাগে ; তার ওপর ঐ গলায় এই রকম পাকা পাকা কথা—আরও অসহ্য।

পুকুরে যেতে যেতে কতকটা কথার পৃষ্ঠে কথা বলার মতোই রানী জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার ডাক নাম কি ভাই? বিনতা নামটা বড্ড ভারী না? সব সময় ব্যবহার করা যায় না।'

'হ্যাঁ, বিচ্ছিরি নাম। বাবার কে এক বেহ্ম বন্ধু ছিল, সে-ই রেখেছে। কী আর করব, এত বয়সে তো আর নাম বদলানো যায় না। কিন্তু ডাক নামটা আরও খারাপ। মা ডাকে বাঁদী বলে। সে নাম কি কাউকে বলা যায়—বলো না! তা তোমরা বাপু বরং বিনু বলেই ডেকো না কেন। বিনতা থেকে বিনু—মন্দ কি! আমি অনেক ভেবেছি, ঐটেই আমার পছন্দ!'

ততক্ষণে পুকুর ঘাটে পৌঁছে গেছে ওরা। একবার ভ্রূ কুঁচকে ঘাটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওমা ঘাটের ওপর কোন গাছপালা নেই যে একটু ছায়া হয়! এত তো বনজঙ্গল দেখছি এধারে, ঘাটের ওপর বুদ্ধি ক'রে কেউ একটা বড় গাছ দিতে পারে নি?...এ বাড়িতে তো ঝি নেই শুনেছি, আমাকেই তো বাসন-কোসন ছিষ্টি মাজতে হবে, আমি বাপু তা বলে ঠেকো রোদে বসে বাসন মাজতে পাবর না। সেই বিকেলে ছায়া পড়লে তবে—'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে রানী, 'এখনই তো তোমাকে কেউ বাসন মাজতে বলছে না, এই বিয়ের আটদিন মাজতে হবেও না। পরের কথা পরে। আর কখানাই বা বাসন, মাজতে চাও সন্ধ্যেবেলাই মেজো না।...আমরা অবিশ্যি দুপুরেই মেজেছি, কই পুড়েও তো যাই নি—তবে তুমি কাজ করবে, তোমার সুবিধে মতোই করবে বইকি! মাকে বলে নিও—'

'হ্যাঁ, তাই যা হোক একটা করতে হবে কিছু!......তবে তুমি আবার বলছ সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলা তো বাবুরা বাড়ি ফেরে, তখন বুঝি কেউ বাসন-কোসন নিয়ে জুবড়ে পড়ে থাকে! সন্ধ্যের আগে কাজকম্ম সেরে না নিলে কখন মাথা বাঁধব গা ধোব! তোমার যা বুদ্ধি!

রানীর আর সহ্য হয় না। বলে, 'নাও-নাও, যা করবে সেরে নাও। আর দ্যাখো, বিয়ের কনে পাল্‌কী থেকে নেমেই এত কথা বলতে নেই, ওতে বড় নিন্দে হয়।'

'তা বটে।' তৎক্ষণাৎ সায় দেয় বিনু। বলে, 'মাও সেই কথা একশ'বার বলে দিয়েছে পই পই করে। আমার যে কী এক পোড়া স্বভাব, থাকতে পারি নে চুপ করে।'.....

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে শরবৎ খাইয়ে রানী তাকে ঘরে বসিয়ে চলে এল। মন যতই খারাপ হয়ে থাক, ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, থই থই করছে লোক চারিদিকে, অসংখ্য কাজ পড়ে—মন খারাপ করে বসে থাকবার অবসর নেই।

কিন্তু বিনতাও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবার মানুষ নয়। সে একটু ইতস্তত ক'রেই ঘরের বাইরে দালানে এসে দাঁড়াল। কুশণ্ডিকা কাল রাত্রেই সারা হয়ে গেছে ওখান থেকে, সন্ধ্যারাত্রে লগ্ন ছিল বলে হেমই বলেছিল কথাটা, ওদের কটা টাকাও ধরে দিয়েছিল সব যোগাড় করে রাখতে। আজ তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত, এখনই কোন ঝঞ্ঝাট করতে বসতে হবে না। দালানে তখন কনক আর মহাশ্বেতা বসে কুটনো কুটছে। মহাশ্বেতাও তেমনি, ওকে দেখে বলে উঠল, 'কী লো, কাজ

খ‍ুজে বেড়াচ্ছিস? আয় না, বসে যা না। আমরাই বা একা তোর বিয়ের কুটনো কুটে মরি কেন? কী বলিস ভাই বৌদি?'

বিনুও তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে সেখানে, 'দিন না, কুটনো কোটা তো ভারী কাজ! ও আমার খ‍ুব অব্যেস আছে।'

'থাক, থাক,' কনক ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'ওমা, তুমি বিয়ের কনে এসেই কুটনো কুটতে বসবে কেন ভাই—আমরা এত লোক থাকতে! আঙ্গুলে দাগ হয়ে যাবে—কী আঙ্গুলে কেটেই ফেলবে হয়ত। তুমি এমনিই বসো, গল্প করো বরং। তোমার বাপের বাড়ির গল্প বলো—'

'বাপের বাড়ির ছাই গল্প। বাপই নেই তার বাপের বাড়ি—আপনি তো আমার বড় জা? এখানকার কথা একটু বলুন দিকি। আপনি তো সব জানেন শোনেন, আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি তো দুদিন বাদেই ড্যাং করে চলে যাবেন—আমাকেই তো তখন এই ঘরকন্না করতে হবে। বুঝে নেওয়া ভাল আগে থাকতে!'

কনক অবাক হয়ে গেল। এ ধরণের কথা কনে-বৌয়ের মুখে—তার কাছে কল্পনাতীত। সে যেন থতমত খেয়ে গিয়ে ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মহাশ্বেতা কথাগুলো ভাল শুনতে পায় নি। ইদানীং সেও একটু কম শুনছে কানে। যদিও সে নিজে সেটা মানতে চায় না। ওর ছেলেরা বলে, 'চেঁচো চেঁচো মায়ের কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে। যা চেঁচান চেঁচায় দিনরাত!'...সে কনকের দিকে ফিরে বললে, 'কী হ'ল গো—তোমার হাত আবার থেমে গেল কেন! কী বলছে নতুন বৌ ফিস ফিস করে?'

বিনু আর একটু গলা নামিয়ে বলে, 'ইনিই আমার বড় ননদ না? সেবার মেয়ে-দেখা দিতে এসে দেখে গিছলুম। কানে কম শোনেন বুঝি? তাহ'লে কালার বংশ বলো! বাঃ, বেশ বে হ'ল আমার। যত রাজ্যের কালা আর পাগলকে নিয়ে কারবার, জম্মে বরের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে পারব না।...তা হ্যাঁ দিদি, আমার একটি পাগল ননদ আছে শুনেছি—সেটি কোথায়?'

তরু তখন দালানেরই একটা জানলার ওপর বসে ছিল চুপ করে—কনক নিঃশব্দে আঙুল দেখিয়ে দিল।

'ওমা, ওই নাকি? তা কৈ পাগলের মতো তো মনে হচ্ছে না। বেশ তো ভাল মানুষের মতো চুপচাপ বসে আছে। ওকেই বোধহয় গুম্-পাগল বলে—না?'

'না না, ছোট্ ঠাকুরঝি তেমন পাগল কিছু নয়। অতিরিক্ত শোকেদুঃখে অমনি জবুথবু হয়ে গেছে, জোর করে না নাওয়ালে নায় না, না খাওয়ালে খায় না—এই! চেঁচামেচি করা কি ভাঙ্গাচোরা—সে সব কিছু না!'

'সব্বরক্ষে! আমার যা ভয় হয়েছিল, পাগল শুনে। বলি কি না কি, মারধোর করবে কি ঘুমের মধ্যে গলাটাই টিপে দেবে—'

'ষাট! ষাট! ওসব কি অলুক্ষণে কথা। আজকের দিনে ওসব বলতে নেই। ছি!'

'না, তাই বলছি।' একটু অপ্রতিভভাবে জবাব দেয় বিনতা।

ফুলশয্যায় আড়ি পাতবার উৎসাহটা রানীরই বেশী। সে-ই দল পাকিয়েছিল। কনক আগেই বলেছিল, 'একজন তো কানে শুনতে পায় না, কথা আর কী হবে, হয় লিখে বলতে হবে নয় তো ঠারে-ঠোরে—আড়ি পেতে কি লাভ দিদি?'

কিন্তু রানী সেসব কথা কানেই তোলে নি। বাইরের ঘরে ওদের ফুলশয্যা হবার কথা। সে বিকেল থেকে অনেক যত্ন অনেক তম্বির করে একটা জানলার নর্দমা

পরিষ্কার করে চেঁচে বাড়িয়ে চোখ চলবার মতো করে নিয়েছিল। আর একটা জানলায় এমনিই ফাঁক একটু বেশী—সেখান থেকে একজন দেখতে পারে। এদিকে—অর্থাৎ রাস্তার দিকের রক থেকেও যাতে দেখা যায় সেটার জন্যে হেমের শরণাপন্ন হ'ল শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যের দিকে, 'হেই ঠাকুরপো, একটা কিছু করে দাও ব্যবস্থা!'

হেম বলে, 'বেশ লোক তুমি! ভাই-ভাদ্রবৌয়ের ফুলশয্যেয় আড়ি পাতার ব্যবস্থা করবে ভাসুর! লোকে শুনলে বলবে কি!'

'আরে তুমি তো পাতছ না, পাতব তো আমি। তুমি শুধু একটা দোর-জানলার খাঁজটাঁজ ঠিক করে দেবে—এই কথা!'

'ও সব হবে-টবে না আমার দ্বারা। আমার ঢের কাজ আছে এখন, এখনই সব লোকজন এসে পড়বে।'

অগত্যা রানী নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেয়। ঠিক হয়, সে, কনক এবং ও বাড়ির মেজগিন্নী প্রমীলা আড়ি পাতবে, আর কারুর অত উৎসাহ ছিল না—মহাশ্বেতা একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, তা তাকে হেম ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দিল।

খাওয়াদাওয়া চুকে হাতের সুতো খুলতেই রাত দেড়টা বেজে গেল। তারপর ওদের শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে সব বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল প্রকাশ্যে— কিন্তু তারপরই ওরা তিনজনে আড়িপাতা ফোঁকরে চোখ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে বাগানের দিকে রইল রানী আর প্রমীলা, বাইরের দিকে কনক।

ওরা দোর ভেজিয়ে চলে আসবার পর প্রথমটা দুজনেই চুপচাপ পড়ে রইল—বর এবং কনে। বেশ কিছুক্ষণই। এরা যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছে তখন বিনতা হঠাৎ উঠে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিঃশব্দে এসে কপাটটায় খিল দিয়ে দিলে। তারপর জানলার কাছে এসে বেশ একটু শ্রুতিগম্য স্বরেই আপন মনে বললে, 'যে বেটাবেটিরা আজ আড়ি পাতবে তারা কিন্তু ঠকবে—নিজেদেরই ঘুম মাটি। এ তো আর গল্প করার মতো বর নয় যে কথা-বার্তা কইব—শুনবে! আর দেখবারই বা আছে কি প্রেথম রাত্তিরে?'

ঘরে আলো রাখা নাকি নিয়ম—এরা হ্যারিকেনটাই কমিয়ে এক কোণে রেখে এসেছিল। বিনতা সেখান থেকে সেটা তুলে পলতেটা বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে বিছানার পাশে এনে রাখল। তারপর বুকের জামার মধ্যে থেকে একটা পাট করা কাগজ আর এক টুকরো ছোট পেন্সিল বার করে খস্‌খস্‌ করে কি লিখে কান্তির দিকে এগিয়ে দিল। বিস্ময়ে কান্তিরও চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল—বিস্ময়ে আর প্রশংসায়। বধূর বুদ্ধি এবং কর্ম-তৎপরতা লক্ষ্য করে বুঝি আশ্বস্তও হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সেও উজ্জ্বল মুখে কাগজটা টেনে নিয়ে বৌয়ের লেখাটুকু পড়ে তার নিচে কি লিখে আবার তার দিকে ঠেলে দিলে।

এই ভাবেই চলল ওদের প্রথম প্রেমালাপ। আড়ি যারা পাততে গিয়েছিল তাদের কারুরই আর রুচি ছিল না বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার। তারা যেন অদৃশ্য এক-একটা চড় খেয়েই অপমানে মাথা হেঁট করে সরে এল আস্তে আস্তে। এখন লজ্জাটা তাদেরই।

নিঃশব্দেই এসে উঠোনে দাঁড়াল তিনজন। মুখে কথা ফুটছে না যেন কারও। কথাটা কেউই কাউকে বলতে চাইছে না আসলে—আঘাত দেবার এবং পাবারও ভয়ে। শেষে প্রমীলাই কতকটা সামলে উঠে বলল, 'কখন ঐ কাগজ আর পেন্সিলটা যোগাড় করে জামার মধ্যে রেখে দিয়েছে ভাই, আশ্চর্য! আমরা কেউ টের পেলুম না! বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে সব গুছিয়ে তোরঙ্গের মধ্যে করে নিয়ে এসেছিল

একেবারে!'

রানী প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'খুব শিক্ষা হয়ে গেল আমার! আর যদি কারও বিয়ের কথায় থাকি কোনদিন! লোকের ভিড়ে গোলমালে এখনও অতটা লক্ষ্য করতে পারেন নি মাসীমা, কিন্তু কাল-পরশুই বুঝতে পারবেন, তারপর আমি মুখ দেখাব কি করে! ছি-ছি!'

'আপনি ভুল করছেন দিদি,' ওকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে কনক বলে, 'ওর এমনি বৌই দরকার ছিল। বৌ নয়—ছোট ঠাকুরপোর একটা গার্জেনই দরকার, তাই পেয়েছে। ঐ হাবা কালাকে নিয়ে সংসার করা, বৌ শক্ত না হলে চলত কি করে!'

হয়ত সারারাতই জেগে চিঠি লেখালেখি করেছে ওরা,—কিম্বা বিনতার বাপের বাড়ি থেকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অন্তত প্রথম প্রথম খুব ভোরে উঠতে হয়, গুরুজনদের ওঠবার পর ঘরের দোর খুলে বেরোনো বড় লজ্জার কথা—ছোটবৌ খুব ভোরেই উঠোনের দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু উঠোনে পড়তেই তার নজরে পড়ল যে তরু তারও আগে উঠে পড়েছে এবং কি একটা করছে। আর একটু কাছে আসতে—কী করছে তাও বুঝতে পারল। আগের দিন রাত্রে অভ্যাগতদের পাতা থেকে নিহাৎ কামড়ানো-চট্‌কানো টুকরো টাকরা বাদে অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টগুলো একটা ঝুড়িতে তুলে রাখা হয়েছিল—সকালে ভিখারী কাঙ্গালীদের দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে। তরু তারই মধ্যে থেকে বেছে বেছে মাছগুলো তুলে খাচ্ছে!

'ওমা, ওমা, কি হবে মা! এ কি কাণ্ড!' ছোটবৌ শোরগোল তুলে দিল একেবারে 'বিধবা মানুষ, তায় বামুনের বিধবা মাছ খাচ্ছ কি! তায় সজ্জিকজাতের এঁটো। জাতজন্ম রইল কি তোমার? বলে পাগল না ছাই সেয়ানা পাগল—বোঁচকা আগল! পাগলই যদি তো অন্য কিছু না খেয়ে মাছ খাবে কেন। মাছের সোয়াদটি তো ঠিক জানা আছে! বলি ও ছোট ঠাকুরঝি—ই কি কাণ্ড তোমার? এত নোলা!'

গুঁতোগুঁতি ক'রে অল্প জায়গায় শোওয়া—ঘুম ভাল ক'রে কারুরই হয় নি। এই চেঁচামেচিতে প্রায় সকলকারই ঘুম ভেঙ্গে গেল। হেম বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। কনক রানী এরাও ছুটে এল। শ্যামার কোমরটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠতে একটু দেরি হয়—তিনি যখন বেরোলেন তখন হেম হাত ধরে টেনে তরুকে সরিয়ে দিয়েছে, কনক নিয়ে যাচ্ছে ঘাটের দিকে মুখ হাত ধোওয়াতে। ঘটনাটা যাই হোক, নতুন বৌ—বিশেষত ফুলশয্যার কনেবৌকে এতটা চেঁচামেচি করতে নেই,—উপস্থিত সকলকারই এই কথাটা প্রথম মনে হয়েছিল, তরুর আচরণের থেকে ওর আচরণটাই দৃষ্টিকটু শ্রুতিকটু দুই-ই লেগেছিল। কিন্তু শ্যামা সেটা লক্ষ্য করলেও, নতুন বৌয়ের সামনে তরুর এই কাণ্ডতে অপমান-বোধ এবং লজ্জাটাই প্রবল হয়ে উঠল। তাঁর যেন মাথা কাটা গেল এই ব্যাপারে। হয়ত তরুর জন্যেই সবচেয়ে বেশী বিব্রত থাকতে হয়েছে এই ক'মাস, মেজমেয়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েছে অযথা—এই সব কারণে একটা অসহায়, প্রতিকার-হীন বিক্ষোভ মনে জমছিল বহুকাল থেকে ; এই উপলক্ষে সেইটেরই বিস্ফোরণ ঘটল একেবারে। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে দু হাতে ঠাস ঠাস ক'রে গোটাকতক চড় কষিয়ে দিলেন তরুর দুই গালে। বললেন, 'হারামজাদী শুধু আমাকে জ্বালাতে পোড়াতে এসেছিল পেটে! জন্মভোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিলে একেবারে! এত খাও তবু নোলা যায় না! সব্বস্ব খেয়ে বসে আছিস্—এখনও

খাওয়ার এত লালসা! যত অলক্ষুণে আর যত অমঙ্গুলে কাণ্ড ক'রে যাচ্ছ! আর কী বাকী আছে, ঐ ছেলেটা তো? তা তাই না হয় তার মাথাটা কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খা। খেয়ে আমাকে অব্যাহতি দে। তুইও বাঁচ আমিও বাঁচি!'

কনক রানী দুজনে মিলে ধরে তাঁকে সরাতে পারে না। বলছেন আর পাগলের মতো মেরেই চলেছেন। কনক বলল, 'ছি মা, ওর কী জ্ঞানবুদ্ধি আছে যে, ওকে অমন ক'রে মারছেন! একটু হুঁশ থাকলে ও কি আর এটা করে। এমনি তো দেখেন জোর ক'রে না খাওয়ালে খেতেই চায় না। একে লোভ বলছেন কেন! আপনিও কি পাগল হয়ে গেলেন। কাকে মারছেন আপনি, ও কি কিছু বুঝছে! সরুন—ওর হাত ধুইয়ে নিয়ে আসি!'

এবার শ্যামা সমস্ত আবেগ নিঃশেষ ক'রেই বোধ হয় কেঁদে ফেললেন, 'না মা, আমার আর সহ্যি হয় না। তোমরা বিষ এনে দাও, খেয়ে আমি শান্তি পাই। এ জ্বালানি পোড়ানি কতকাল ভুগব আর।'

ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে নতুনবৌ বলল, 'সত্যি দিদি, আপনি বলছেন বটে হুঁশ-পব্ব নেই—কিন্তু মুখের তারটি তো ঠিক আছে—কই, কুমড়োর ঘ্যাট তো খায় নি, ঠিক মাছটিই বেছে বেছে মুখে দিয়েছে।'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল যেন কনকের ; সে একটু কড়া সুরেই বললে, 'তুমি চুপ করো! তুমি কনেবৌ—সব তাইতে তোমার কথা বলার দরকার কি!...এক বাড়ি গুরুজনের মধ্যে তোমার এত কথা বলতে লজ্জা করে না!'

এতক্ষণে শ্যামারও যেন খেয়াল হ'ল তাঁর নবনীতা পুত্রবধূর অশোভন আচরণ। অথবা সক্কালবেলাই এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা ঘটে যাওয়াতে তাঁর মনে ইতিমধ্যে যে অনুতাপ আর অপ্রতিভতার ভাব দেখা দিয়েছিল—তার সম্পূর্ণ চোটটা গিয়ে পড়ল—এই সমস্তটার জন্য দায়ী ঐ মেয়েটির ওপরই। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বললেন, 'তোমাকেও আমি এই সাবধান ক'রে দিচ্ছি ছোটবৌমা—নোলা দু রকমের আছে, এক বেশী খাওয়া আর এক বেশী কথা বলা। ও কোন নোলাই ভাল না। এক ফোঁটা মেয়ের এত কিসের থগবগানি সব তাইতে? ফের যদি ছোট মুখে এমনি বড় বড় কথা শুনি তো সকলের সামনে সাঁড়াশি পুড়িয়ে ঐ নোলা টেনে ছিঁড়ব। তোমার কোনও কাকা এসে রক্ষে করতে পারবে না বলে দিলুম!'

তাঁর ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে, এবং কিছু পূর্বের চড় মারার দৃশ্য মনে পড়ায়, ভয় পেয়ে গেল বিনতা। সে দ্রুত পিছন ফিরে তাদের ঘরে ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বারে! সব্বাই এখন আমার ওপরই ঝাল ঝাড়তে শুরু করল! যত দোষ এখন আমারই। বেশ তো!'......

এতদিনের এত কথা, এত তিরস্কার এত বকুনি এত অনুরোধ উপরোধ মিষ্ট বাক্যেও তরুর স্তম্ভিত ভাবটা কাটানো যায় নি! মনে হ'ত কিছুই তার কানে যায় না, কিছুই তার প্রাণে লাগে না। তার চিত্ত এবং বুদ্ধি দুই-ই বুঝি জড় হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে ওর মুখ ধোওয়াতে ধোওয়াতে—গালের ওপর যেখানে শ্যামার কর্মকঠিন আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল—সেইগুলোই জল ঘষে দিতে দিতে হঠাৎ নিজের হাতের ওপর গরম গরম কয়েক ফোঁটা কি গড়িয়ে পড়ায় কনক চমকে চেয়ে দেখল, তরুর দুই চোখের কোল উপ্‌চে তপ্ত অশ্রুই ঝরে পড়ছে। কনক তখনই কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না, শুধু নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে তুলে নিয়ে গেল। যেতে যেতে কেবল একবার বললে, 'শোকেতাপে নানা কারণে মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই ঠাকুরঝি, তুমি মনে কিছু নিয়ো না, লক্ষ্মীটি!'

কথাগুলো তরু ঠিক বুঝতে পারল কিনা, ওর জড়ত্ব সম্পূর্ণ কেটেছে কিনা বোঝা না গেলেও কনক মনে মনে একটু আশ্বস্তই হয়ে উঠল। কারণ তরু কোন উত্তর না দিলেও বা কথা না কইলেও এবার নিজেই নিজের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো শুকনো করে মুছে নিল। কনক এরকম এর আগে শুনেছে তার বাবা-কাকার মুখে। এই ধরণের গুম পাগল, যারা কোন মানসিক আঘাতে এমনি জড়ভরত হয়ে যায়—তারা আবার কোন কঠিন আঘাতেই নাকি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। ওর মনে আশা হ'ল সম্ভবত তরুও এবার সুস্থ হয়ে উঠবে আপনা-আপনিই।

সে আশা আরও বাড়ল তার দুপুরবেলা, যখন ভাত খাওয়াবার জন্য ওকে নিতে এল কনক। বহু দিন পরে তরু কথা কইল, সামান্য দুটিমাত্র শব্দ—'ভাল লাগছে না, এখন থাক!' কনক ওকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর ক'রে শেষ পর্যন্ত খেতে নিয়ে গেল, বললে, একটা শুভদিন, এখনও চারদিকে লোকজন—তোমার ছোট ভায়ের বিয়ে, এই দুপুরবেলা যদি না খেয়ে পড়ে থাকো, তাদেরও যেমন অকল্যেণ, মার মনেও তেমনি লজ্জার শেষ থাকবে না, ভাববেন তাঁর জন্যেই তুমি খেতে চাইছ না। তিনি তো তোমাদের জন্যে অনেক করেছেন, তাঁকে একটু মানিয়ে মাপ ক'রে নিতে পারছ না?'

আর কোন কথা বলে নি তরু, শান্তভাবেই গিয়ে খেয়েছে, খাওয়া হ'লে বহুকাল পরে নিজেই এ'টো বাসন নিয়ে গিয়ে পুকুরে ভিজিয়ে রেখে মুখ ধুয়ে এসেছে। এ ঘটনাটা আরও অনেকেরই চোখে পড়ল, মহাশ্বেতা আগের দিন রাত্রে এ বাড়িতে থেকে গিয়েছিল, সে শ্যামাকে খুঁজে বার ক'রে উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'বলি তোমার দাওয়াই তো খুব ভালই ঝেড়েছ দেখছি। তরোর তো রোগ সেরে গেল।... হুঁশ তো বেশ খানিকটা ফিরে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে। তোমার কেটো হাতের চড়ের গুণ আছে দেখছি!'

শ্যামা অবশ্য উত্তর দিলেন না, সকালের ব্যাপারটার জন্য তাঁর অনুশোচনার সীমা ছিল না। সত্যিই তো—বেচারী জন্মঅভাগী, তাঁর কোলে এসে জন্মে জীবন-ভোর দুঃখই পেয়ে গেল......ওর আর দোষ কি, গ্রহেই করাচ্ছে বৈ তো নয়! তাঁরও গ্রহ, মেয়েরও। না, মারাটা ঠিক হয় নি অমন ক'রে! ...

ইচ্ছে হয়েছিল অনেকবারই, গিয়ে একটু কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে আসেন, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসে কেমন একটা আড়ষ্টতা এসে গেছে কোথায়, সেটা আর সম্ভব হবে না বুঝে নিরস্ত হলেন। স্বাভাবিক যে কোমলতা থাকলে অনুতাপের এই বহিপ্র্রকাশে লজ্জা আসে না—সে কোমলতাকে উনি অনেক দিন পিছনে ফেলে এসেছেন, এখন নারী-সুলভ যে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করতেই যেন বাধ-বাধ ঠেকে।......

খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে মহাশ্বেতা নিজের বাড়ি চলে গেল। রানীরাও। বাইরের লোক বলতে আর কেউ ছিল না। কিছু বেঁচে-যাওয়া মিষ্টি নিয়ে আর রানীর ছেলেটাকে কোলে ক'রে হেম গেছে রানীদেরই পোঁছে দিতে। বাসন-কোসন মাজামাজি ক'রে কনকও ক্লান্ত হয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এক জায়গায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। শ্যামা তার অনেক আগেই শুয়েছেন এসে, সন্ধ্যাবেলা বাড়িটা শুধু নিস্তব্ধ নয়—নির্জনও ছিল। কান্তি গিয়েছিল মুদীর দোকানে বাড়তি ময়দা প্রভৃতি ফেরৎ দিয়ে তাদের হিসেব মিটিয়ে আসতে। ছোটবৌ নিজের ঘরে বিছানাপাতা চুলবাঁধা টুকিটাকি কাজ শেষ ক'রে সেইখানেই বসে ছিল। এরই মধ্যে কখন তরু চুপিসাড়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, তা কেউই লক্ষ্য করে নি।

প্রথম হ্ঁশ হ'ল কনকেরই। হেম ও কান্তি ফিরল প্রায় এক সঙ্গেই। উঠে ওদের খেতে দিতে গিয়েই তার লক্ষ্য পড়ল।

'মা, ছোট্‌ ঠাকুরঝি কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!'

শ্যামা তখনও অত কিছু ভাবেন নি। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'ঘরে নেই? জানলায়? দ্যাখো, হয়ত বাগানে গেছে কি ঘাটে। লম্পটা কোথায়? লম্প নিয়ে যায় নি?'

'কৈ, না তো! বাগান—মানে পাইখানাও দেখে এলুম, কৈ ঘাটেও তো নেই!'

কেমন যেন একটা আশঙ্কার আকুলতা ফুটে ওঠে কনকের কণ্ঠে, ঘুমের ঘোরে শ্যামার কানে সেটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

'কী সর্বনাশ! তাহলে কোথায় গেল সে।' শ্যামা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন।

প্রথমে বাড়িটাই খোঁজা হল তন্নতন্ন ক'রে। কোথাও পাওয়া গেল না। তখন কান্তি ছুটল বড় মাসিমাদের বাড়ি, হেম গেল বাজারের দিকে। চেনা দোকানদার-দের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে—কারও নজরে পড়েছে কিনা। মহাদের বাড়িতেই যাক, আর খালের দিকেই যাক, ঐ একই রাস্তা।

কিন্তু অত দূর যেতে হ'ল না। সিদ্ধেশ্বরীতলা পর্যন্ত যাবার আগেই খবর পাওয়া গেল। খবর দিতেই আসছিল তিন-চারজন।

নতুন বামুনদের পাগলী মেয়েটা রেলে কাটা পড়েছে।

এই সন্ধ্যের বোম্বে মেল দুখানা ক'রে কেটে দিয়ে গেছে তাকে।

তবে দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা—সেইটেই শেষ পর্যন্তও জানা গেল না। কেউ বললে, লাইন পার হচ্ছিল গাড়ি এসে পড়েছে; কেউ বললে, না ইচ্ছে ক'রেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সামনে।

॥ ৩ ॥

সেদিনের রাত্রিশেষটা বোধ হয় কারুর পক্ষেই সুপ্রভাত হয় নি।

অনেক দিন পরে বাপের বাড়ি থেকে খুশী মনেই ফিরছিল মহাশ্বেতা। সে অতশত বোঝে না, নতুন বৌয়ের কথাবার্তাও বিশেষ তার কানে যায় নি; হাবাকালা ভাইটার একটা সম্গতি হ'ল—সেইটেই তার কাছে বড় কথা। বৌ এমন কিছু খারাপ দেখতেও নয়, বেশ নতুন-বৌ নতুন-বৌই তো দেখাচ্ছিল ছুঁড়িকে বাপু।

আরও খুশী হবার কারণ তরুর হুঁশজ্ঞান ফিরে আসবার লক্ষণটা। আহা, যদি ভাল হয়ে যায় মেয়েটা সত্যি সত্যিই—ওরও শান্তি, মায়েরও শান্তি। অনেক তো কষ্ট পেলে, এবার কিছুদিন শান্তিতে থাক। 'যে যেখানে আছে ভাল থাক।' এইটেই বলতে বলতে এসেছে সে প্রায় সারা পথটা।

বাড়িতে পৌঁছেও সে অতটা কিছু লক্ষ্য করে নি। 'মহারাণী'র সঙ্গে তার খুব সম্প্রীতি নেই দীর্ঘকালই—তবু আজ বাড়িতে ঢুকে তাকে সামনে পেয়ে তার কাছেই হাত-পা নেড়ে গল্প করতে লেগে গেল। বৌভাতের গল্প, কতটি লোক খেয়েছে (যেন ওরা কেউ যায় নি!), কী কী রান্না হয়েছিল—ইত্যাদি; মার কৃপণতা যে দিন দিন বাড়ছে তার কতকগুলি সদ্য-দৃষ্টান্ত; দাদা কীভাবে সারাক্ষণট বড়বৌদির পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করেছে ('এখনও বাপু টানটা যায় নি যে যতই বলো!') তারই রসালো বিবরণ এবং সর্বোপরি মার তিন-চারটি চড়ে কেমন করে তরুর

চৈতন্যোদয়ের লক্ষণ দেখা দিল তারই বিস্তৃত ইতিহাস সালঙ্কারে ও এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করছিল, হঠাৎ অনেকক্ষণ একতরফা বকে যাবার পর একসময় তার খেয়াল হ'ল যে, তার শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা সকলেই কেমন অস্বাভাবিকভাবে চুপ করে আছে, সকলেরই মুখেচোখে কেমন থমথমে ভাব।

প্রথম যা মাথায় ঢুকতে দেরি—তারপর জিনিসটা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। মেজবৌয়ের ভাবভঙ্গীর হদিস মহা কোনদিনই ভাল পায় না —ওর কথা না হয় ছেড়েই দিল—কিন্তু ছোটবৌয়েরও বিষণ্ণ গম্ভীর ভাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। খানিকটা বোকার মতো এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে ছোটবৌকেই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, কী হয়েছে রে, তোরা অমন মুখ অন্ধকার ক'রে আছিস কেন? সবাই ভাল আছে তো? কোথাও থেকে কোন খারাপ খবর-টবর আসে নি?'

বলতে বলতেই লক্ষ্য হ'ল মানুষটাকে! রোদ এখনও ও-বাড়ির পাঁচিলের মাথায় —এমন সময় তো কোনদিন ফেরে না। সে মেজ ছেলের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁরে, এই, অ ন্যাড়া। তোদের গুষ্টি আজ এরই মধ্যে বাড়ি ফিরেছে যে? এতক্ষণ ঠাওর করি নি। এত সকালে বাড়ি ফিরল, শরীর ভাল আছে তো? তোরা খবর-টবর নিয়েছিলি একটু?'

এই প্রথম বোধ করি তার ছেলেদেরও চপল ও বাচাল রসনা স্তব্ধ রইল। ন্যাড়া কেন, তার পরের আরও দুটো ভাই উপস্থিত ছিল, কিন্তু কারও মুখে কোন কথা সরল না। ন্যাড়া মাথা হেঁট করে বসে মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল।

ওদের ভাবভঙ্গীতে মহাশ্বেতার উত্তরোত্তর ভয় বেড়ে যাচ্ছিল, সে প্রায় কান্নার মতো ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, 'আ মর, তোরা অমন করে মুখে গো দিয়ে রইলি কেন সকলে মিলে। ভেঙ্গে বলবি তো কি হয়েছে। আমার যে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে তোদের রকমসকম দেখে......বল না মুখপোড়ারা কী হয়েছে।'

এইবার মেজবৌই কথা বললে, তার স্বভাবসিদ্ধ লঘুভঙ্গী ত্যাগ ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'বটঠাকুরের চাকরি শেষ হয়ে গেল আজ থেকে, তাই সকাল করে ফিরে এসেছেন!'

'কী—কী হয়ে গেল বললি?' বিশ্বাস হয় না নিজের কানকে। অভয়পদর কোন-দিন চাকরি না থাকতেও পারে—একথাটা এতকাল বোধ হয় এ বাড়ির কারও মাথাতে যায় নি। তাই মহাশ্বেতার কণ্ঠ তীক্ষ্ম হয়ে উঠলেও তেমন করুণ শোনাল না। দৃঢ় অবিশ্বাসই বেশী সে কণ্ঠে। নিজের কানকেই অবিশ্বাস......অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

'ও'র নাকি যতদিন চাকরি করার কথা—তার চেয়ে বেশী দিন হয়ে গেছে, তাই ও'কে সাহেবরা বসিয়ে দিয়েছে। বলেছে যে, আর কতকাল টুল জোড়া ক'রে বসে থাকবে? নতুন লোকদেরও তো ক'রে খাওয়া দরকার। আর ঢের দিন তো হ'ল—অনেক দিন তো খাটলে, এবার কিছুদিন আরাম করো গে!'

এবার আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অবিশ্বাসেরও না। এমন কথা নিয়ে কিছু তামাশা করবে না মেজবৌ। বিশেষ বড়কর্তার কথা নিয়ে তো করবেই না। তাছাড়া, কিছু একটা হয়েছেই নিশ্চয়—নইলে এমন সময় বাড়িতেই বা ফিরবে কেন? এতকালের মধ্যে, আঙুলে গুনে বলে দিতে পারে মহাশ্বেতা, চারদিন না পাঁচদিন সকাল করে ফিরেছে সে। সেও কোন 'বিপুর্যেয়ে' কাণ্ড কোথাও হয়েছে, সেই জন্যে অফিসই সকাল করে বন্ধ হয়েছে—তবে! তাছাড়া চুপ ক'রে রকের ধারে বসে আছে

—কোন কাজকর্মে হাত না দিয়ে—এটাও একটা নিয়মের প্রচণ্ড ব্যতিক্রম।.....

লক্ষণ সমস্তই মন্দের। আর মন্দটাই বেশী ফলে—এটা মহাশ্বেতা তার গণ্ডী-বন্ধ জীবনেও অনেকবার দেখেছে। যে কথা রটে, যেটা লোকে অনুমান করে—তার মধ্যে যা ভাল, তা কদাচ কখনও সত্য হয়, কিন্তু খারাপ যেগুলো, সেগুলো ঠিক সত্যি হয়ে বসে থাকে।

তবু চাকরিটা সত্যিই নেই, আজ থেকেই নেই—সেটা যেন এখনও বিশ্বাস হয় না।

হয়ত নোটিশ দিয়েছে, হয়ত সময় একটা বেঁধে দিয়েছে। সেটাও যথেষ্ট খারাপ খবর, তবু আজ থেকেই—? না না, তা কখনও হ'তেও পারে? হ'লে যে তাদের চলবে না, তাদের এতবড় সংসার অচল হয়ে যাবে! এত বড় 'বেরং গুষ্টি' খাবে কি? এই জন্যেই মন বিশ্বাস করতে চায় না বোধ হয় চরম দুঃসংবাদটা। মনে মনে কোথায় একটা অস্তিত্বহীন আশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

অভয়পদ অবশ্য নাগালের বাইরে কোথাও নেই—সামনেই বসে আছে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। সে স্ত্রী, তার তো ষোল আনা অধিকারই আছে জিজ্ঞাসা করবার। তবু যেন সাহসে কুলোয় না মহাশ্বেতার। অনেকক্ষণ পরে পা পা ক'রে গিয়ে পেছনে দাঁড়ায় শুধু—কোন প্রশ্ন মুখ ফুটে করতে পারে না।

আজ কিন্তু—বোধ করি এই প্রচণ্ড আঘাতেই—অভয়পদরও একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে মনের মধ্যে। সে-ই খানিকটা পরে, পিছনে না ফিরেও স্ত্রীর উপস্থিতিটা অনুভব করে বলল, 'সত্যিই ছুটি হয়ে গেল এবার—। আজ থেকেই।'

'আজ থেকেই একেবারে—?' কোন মতে ফিসফিস ক'রে বলে মহাশ্বেতা।

'হ্যাঁ। আরও তিন মাসের মাইনে পাব অবশ্য, তবে আপিসে আর যেতে হবে না। শুধু সাত দিন পরে একবার যেতে হবে হিসেবটা চুকিয়ে নিয়ে আসতে।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহাশ্বেতা, কোন প্রশ্নই করতে পারে না।

অভয়পদই একটু পরে আবার বলে, তেমনি ধীরে ধীরে, ভাবলেশহীন কণ্ঠে—'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু এও তো এক রকমের মৃত্যুই—পুরুষ মানুষ ঘরে এসে বসব হাত পা গুটিয়ে—এ আর মৃত্যু ছাড়া কী?—তা সবই সেই লোভ থেকেই হ'ল আর কি! বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর চাকরি হ'ল—বোধ হয় আরও বেশিই হ'বে, আমার হিসেব নেই অত—অফিসেরও সে সব খাতা নষ্ট হয়ে গেছে—তা সবাই মিলে, আমাদের বড়বাবুই উয্যুগী হয়ে বলেছিল, যা হোক দু-চারটে টাকা করেও অন্ততঃ পেনসন দিতে, কিন্তু সাহেবরা কেউ রাজী হ'ল না।...আসলে সেই সাহেব দুটো যে বেইজ্জৎ হ'ল—ওদের জাতের মুখ ডুবল—সে কথাটা ওরা ভুলতে পারছে না। আমার ওপর একটা আক্রোশ পড়েছে ওদের। ওদের মনে হয়েছে যে আমি কসাইয়ের মতো সুদ আদায় ক'রে ক'রে তাদের রক্ত মাংস মায় হাড় কখানা পর্যন্ত চুষে খেয়েছি। আমি অমনভাবে টাকা না যোগালে নাকি তারা অতটা অধঃপাতে যেতে পারত না। তাছাড়া আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি, এও ওরা মানতে চায় না। ওরা স্পষ্টই বলেছে যে, আমি নাকি অনেক টাকা গুছিয়ে নিয়েছি চড়া সুদ খেয়ে খেয়ে। আমার যা ডুবেছে তা নাকি লাভের তুলনায় কিছুই নয়। তাই ওরা কোন রকম দয়া-ধর্ম করতে রাজী হ'ল না কিছুতেই।...প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা অনেকখানিই তো তুলে নিয়েছিলুম—এখন সব মিলে যা পাব, হয়ত হাজার টাকারও কম দাঁড়াবে।'

'তাহ'লে এখন উপায়?'

অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে উচ্চারণ করে মহাশ্বেতা কথাগুলো।

'উপায় ভগবান!' শব্দগুলো অভয়পদর পক্ষে স্বাভাবিক—কিন্তু এই প্রথম, তার অভ্যস্ত শান্ত উদাসীন কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর ধরা পড়ে একটু। একটা নিঃশ্বাসও পড়ে কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে।

সারা বাড়িটার সেই থমথমে স্তব্ধ আবহাওয়া একটা প্রবল দমকা বাতাসে আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। কান্তি খবরটা নিয়ে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। তরু আজ সন্ধ্যেয় রেলে কাটা পড়েছে, ওদের কারুর একবার যাওয়া দরকার এখনই। দাদা একা—কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বড়দা আজই কোথায় গেছে থিয়েটার দেখতে—কোথায় গেছে কখন আসবে, তা কেউ জানে না। মা খবর শুনে পর্যন্ত চৌকাঠে মাথা ঠুকছেন—বৌদি তাঁকে সামলাবে, কি ছেলে দেখবে ভেবে পাচ্ছে না। পাড়ার লোকে কেউ কেউ এসেছে বটে—কিন্তু এরা না গেলে দাদা জোর পাচ্ছে না।

ছেলেরা তখনই হৈহৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল। অম্বিকাপদ একবার দাদার মুখের দিকে আড়ে চেয়ে নিয়ে দুর্গাপদকে বললে, 'তুমিও একবার না হয় যাও—ছেলেরা যতই করুক, পাকা মাথা কেউ থাকা দরকার।'

অভয়পদ তখনও পর্যন্ত রকের ধারের সেই জায়গাটিতে চুপ ক'রে বসে ছিল। তার ঐ একভাবে বসে থাকাতে সকলেই একটা অস্বস্তি বোধ করলেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে নি। বোধ হয় কী বলবে, কী বলে সান্ত্বনা দেবে তাও ভেবে পায় নি। মহাশ্বেতা অনেকক্ষণ কাছে বসে ছিল চুপ করে, তারপর সেও উঠে গেছে। সংসারের কর্মচক্রে আবর্তিত হওয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আর সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, তাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর ও আর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে নি। তার নিজের ভাষাতেই 'অসুমর' কাজ পড়ে চারিদিকে, দেখে-শুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।

সে চলে যাবার পরে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে, অভয়পদকে আচ্ছন্ন ক'রে ঘনীভূত হয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও অভয়পদ ওঠে নি, নড়ে নি। এইবার প্রথম, সে শুধু নড়লই না, উঠে দাঁড়াল। বলল, 'না দুগ্‌গো থাক বরং, আমিই যাচ্ছি। আমারই যাওয়া দরকার। পুলিশের ব্যাপার একটা আছে বোধ হয়—ওরা ছেলেমানুষ সামলাতে পারবে না।'

তার এই মানসিক অবস্থায় এসব ব্যাপারে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে উপস্থিত সকলের মনেই প্রবল সন্দেহ দেখা দিল, মেজবৌ কী একটা ফিসফিস ক'রে বললও অম্বিকাকে—বোধহয় নিরস্ত করারই কথা—কিন্তু অম্বিকা কিছু বলতে পারল না শেষ পর্যন্ত। বহুদিন ধরে এ-বাড়িতে অভয়পদরই সর্বশেষ কথা বলার অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে প্রায় নির্বিচারেই, আজও তাই কেউ কোন কথা বলতে পারল না তার ওপর।...

অভয়পদর সঙ্গে মহাশ্বেতাও যাবে, এইটেই সকলে ধরে নিয়েছিল। স্বাভাবিকও সেটা। কিন্তু বিকেলের ঐ আঘাতের পর এখনই আবার এই আঘাত তাকে একেবারে অনড় ক'রে দিল। সে যেন খুব চীৎকার ক'রে কাঁদতেও পারল না—প্রথমটা একবার জোরে কেঁদে উঠেই বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব ক'রে দু'হাতে বুক চেপে শুয়ে পড়ল। ছোট-বৌ তরলা ছাড়া সেটা তখন কেউ লক্ষ্যও করে নি। সংবাদটার অপ্রত্যাশিততা ও আকস্মিকতায় বিস্ময়-বিমূঢ় সকলে সংবাদদাতাকেই ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কৌতূহলী হয়ে। তরলাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তড়িৎকে মাথায় বাতাস করতে বলে নিজে তার বুকে তেল-হাত বুলিয়ে চুঁচে দিল খানিকটা। তাতে

একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেও পায়ে বল ফিরে এল না। তার চোখের সামনে দিয়েই ছেলেরা, কান্তি—সবাই চলে গেল, অভয়পদও। সে যেতে পারল না।

অভয়পদ যখন যায়—একবার কাঁদো-কাঁদো গলায় সে বলেছিল অবশ্য, 'ওগো. তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ওগো আমার মা যে সেখানে দহড়া পিটছে গো একা একা—আমি না গেলে কে তাকে দেখবে।...আমি ঠিক যাবো—আমার কিছু হবে না। আমার মিত্যু নেই। নইলে কোলের বোনটা চলে গেল, ছোট ভাইটা নিখোঁজ হ'ল—দ্যাখো আমি এখনও ঠিক বেঁচে আছি। আমি বেশ যেতে পারব ছোট—আমাকে যেতে দে তোরা!'

বলছিল, কিন্তু উঠতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠতে পারে নি।

হাঁটুটায় কোন জোর ছিল না, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারল না কিছুতেই।

ছেলেরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল,—মেজকর্তার একটি আর ছোট কর্তার একটি ছাড়া। আজ বড়দের কারও খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই মানসিক অবস্থায় ভাত গলা দিয়ে নামবে না কারুরই। শুধু ছোট দুটোকে আর বুড়োর বৌকে ধরে জোর ক'রে যা হয় এক-এক গাল খাইয়ে দিল প্রমীলা। ছোট কর্তাকেও বলেছিল—কিন্তু সে কিছু খেতে রাজী হয় নি। তরলা মহাশ্বেতাকে নিয়ে মহার ঘরে—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মাথায় বাতাস ক'রে সুস্থ করার চেষ্টা করছে। অনেকটা শান্ত ক'রে এনেছেও কিন্তু এখনই তাকে ফেলে ওঠা উচিত নয়।

অগত্যা মেজকর্তা আর মেজ-বৌকেই রান্নাঘর সারা, বাসনপত্র দালানে এনে রাখা, খিড়কীর দোর সদর দোরে চাবি দেওয়া, গোয়াল দেখা প্রভৃতি করতে হ'ল। ওরা কখন আসবে তার ঠিক নেই কিছু। সম্ভবতঃ রাত ভোর হয়ে যাবে। ওদের ভরসায় জেগে বসে থেকে লাভ নেই। কেউ আগে ফেরে, খেতে চায়—হাঁড়িতে ভাত, ঢাকার নিচে ডাল-তরকারি সবই রইল কিছু কিছু—খেতে পারবে।......

সব কাজ সেরে, তালাগুলো বার বার টেনে দেখে, বেঞ্চির তলা, তক্তপোশের তলা 'লম্প'র আলো ফেলে ফেলে দেখে অম্বিকাপদ নিজের ঘরে শুতে গেল। ইদানীং এই 'বাই'টা তার বেড়েছে। সর্বদাই চোরের ভয়। ভেতর থেকে সব দোরে তালা দেওয়া হয়, শুধু খিল-ছিট্‌কিনিতে বিশ্বাস নেই তার। দালান আর নিচের ঘর-গুলোর জানালাতে শক্ত মজবুত জাল পরানো হয়েছে। প্রতি দরজায় ডবল ছিটকিনি। অর্থাৎ বাড়িটাকে যতটা সম্ভব দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য ক'রে তুলতে যত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু তাতেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, খাট-চৌকীর তলাগুলো না দেখা পর্যন্ত। তার বিশ্বাস, সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা অবধি এই যে তিন-চার ঘণ্টা সময়, এর ভেতর কেউ যদি কোন বদ মতলবে এসে চৌকী কি খাটের তলায় ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে চায় তো তার সুযোগ-সুবিধার অভাব হবে না। বহু অসতর্ক মুহূর্তে দরজা খোলা হা-হা করে—নিচের তলা বা ওপরের দালানে কেউ থাকে না। হয় নিজের নিজের ঘরে কি ছাদে কি বাগানে থাকে—নয় তো রান্নাঘরে বসে জটলা করে। এর ভেতর অমন দশ-বিশটা লোক এসে বিভিন্ন ঘরে তক্তাপোশ-খাটের নিচে ঢুকে যেতে পারে। তারপর সকলে ঘুমোলে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ? আর সেরকম ক্ষেত্রে ভেতর থেকে তালাই দাও, ছিটকিনিই দাও—যথা-সর্বস্ব বার ক'রে নিয়ে যেতে তাদের কোনই অসুবিধা নেই। এমন কি—জান-প্রাণও নিরাপদ নয় তেমন কান্ড হ'লে। কথাটায় যুক্তি যতই থাক, ছেলেদের হাসি পায় কথাটা শুনলে। কিন্তু কারও ঠাট্টা-তামাশা-পরিহাস গ্রাহ্য করবার মানুষ অম্বিকাপদ নয়, নিজে তো যতটা পারে দেখেই—যেটা পারে না, যেমন ভাদ্র-বৌ কি ভাইপো-

বৌয়ের ঘর—বার বার করে বলে দেয় দেখে শুতে।

তবু, এত করেও যেন স্বস্তি পায় না আজকাল। ন্যাড়ার কথা যদি সত্যি বলে ধরতে হয় ইদানীং মেজকর্তা নাকি রাত্রে ঘুমোয় না ভাল করে...প্রায়ই উঠে উঠে নিঃশব্দে বাড়িটা ঘুরে দেখে যায়। ন্যাড়াই ব্যাখা করে কারণটা, নিজের মনের মত করেই করে অবশ্য। বলে—'পোষ্টাপিসে ব্যাঙ্কে যা টাকা রেখেছে মেজকা, সেটা লোক-দেখানি বৈ তো নয়—তার অন্তত দশগুণ টাকা দ্যাখো গে যাও ঘরে রেখে দিয়েছে। ওর ঘরের দ্যালে আর মাটির ইঁট ক'খানা আছে সবই তো টাকা আর সোনার বাট দিয়ে গাঁথা গো! চুরি-বাটপাড়ির টাকা ব্যাঙ্কে-পোষ্টাপিসে মানে সদুরে রাখতে তো সাহস হয় নে—কোন্ ভরসায় রাখবে বলো—তাই অমনি করে রাখা। আর সেই জন্যেই অত পাহারা দেওয়ার বাই! বুঝলে না?......'

আজ আবার ছেলেরা কেউ নেই, বাড়িতে লোকজন কম বলে আরও বেশী সময় লাগল অম্বিকাপদর সব দেখে-শুনে শুতে। সে ওপরে উঠে যাবার পর নিচের দালানের ছোট টিনের দেওয়াল-আলোটা যথাসম্ভব কমিয়ে (এ বাজে খরচটাও ইদানীং করা হচ্ছে অম্বিকাপদর নির্দেশে) প্রমীলা এসে মহাশ্বেতার দোরের সামনে দাঁড়াল। মহাশ্বেতা এতক্ষণে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়—কিন্তু তরলা এখনও বসে বসে বাতাস করছে। প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেও প্রমীলার উপস্থিতি টের পেল তরলা, সে পাখাখানা নামিয়ে রেখে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। চুপিচুপি বলল, 'এই সবে ঘুমিয়েছে। কিন্তু আজ কি আর ওকে এখন একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে? ......আমি বরং থাকি, আপনি আপনার দেওরকে একটু বলে দিন, দোর দিয়ে শুয়ে পড়তে!'

প্রমীলা সে কথার কোন উত্তর দিল না, অল্প কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে কেমন একরকম দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শোন, আমার সঙ্গে একবার ওপরে আয়, একটা মজা দেখবি!'

সামান্য আলো, তবু তার বিচিত্র দৃষ্টিটা তরলার চোখ এড়ায় নি। তার মনে হল প্রমীলার দুই ওষ্ঠের প্রান্তে একটা কৌতুকের হাসি, চাপবার চেষ্টা করছে সে। অকারণেই তার বুকটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু প্রমীলা তাকে কিছু ভাববার সময় দিল না। তার একটা বাহুমূল ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল ওপরে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ-দিকে তরলাদের ঘর, কিন্তু সে দিকে গেল না প্রমীলা, ডান দিকে মোড় নিয়ে একেবারে দালানের সর্বশেষ প্রান্তে বুড়োর ঘরের সামনে গিয়ে থামল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল তরলার—যা কিছু দেখবার। যা দেখাতে চায় প্রমীলা, যা দেখাতে এনেছে।

ঘরের মধ্যে আলো থাকে না সাধারণত, কিন্তু আজ ছিল। বোধ হয় ছেলে-মানুষ একা থাকবে বলেই মেজ-বৌ বলে দিয়েছিল হ্যারিকেনটা কমিয়ে রাখতে—কিম্বা তখনও শুয়ে পড়ে নি বলেই জেলে রেখেছিল তড়িৎ।

মশারীর বাইরে দাঁড়িয়ে তড়িতের একটা হাত ধরে টানছে দুর্গাপদ, তড়িৎ চেষ্টা করছে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। সম্ভবত মশারীর মধ্যেই ছিল সে—দুর্গাপদই তাকে বাইরে টেনে এনেছে, অন্তত অবস্থা দেখে তাই মনে হয়। কারণ তড়িতের গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক অসম্বৃত না হ'লেও অবিন্যস্ত, তার কপালের কোলে কোলে

ঘাম জমে উঠেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সে বেঁকে-চুরে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

ওরা কেউই লক্ষ্য করে নি এদের। প্রমীলাই জানিয়ে দিল নিজেদের উপস্থিতিটা। নিঃশব্দে চলে যাবে বলে সে আসে নি. এক ঢিলে অনেক পাখী মারবার ব্যবস্থা তার। সে একটা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল যেন, হাসতে হাসতেই তরলার একটা হাত ধরে বলল, 'হ'ল তো? চ, এবার নিচে যাই।'

হাসি যতই চাপা হোক, তার শব্দ মাত্র হাত-তিনেকের ব্যবধানে না পৌঁছবার কথা নয়। দুজনেই শুনতে পেল। দুর্গাপদ হঠাৎ বিছে-কামড়ানোর মতোই তড়িতের হাতটা ছেড়ে দিল, কিন্তু তখনই কোথাও পালাতে কি আত্মগোপন করতে পারল না, যেন পাথর হয়ে গেল সে। শুধু তড়িৎ ছুটে বাইরে এসে প্রমীলাকে জড়িয়ে ধরল, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল. 'নিত্যি এমনি ফাঁক পেলেই টানাটানি করবে ছোট্-কা। আমি লজ্জায় বলতে পারি না কাউকে, কিন্তু আমার আর ভাল লাগে না বাপু—রোজ রোজ এই জ্বালাতন পোড়াতন। ওকে বললেও যা, না বললেও তাই—দাঁত বার ক'রে হাসে শুধু।......তুমি তো এবার নিজে-চক্ষে দেখে গেলে—যা হোক একটা বিহিত করো মেজকাকী।'

॥ ৪ ॥

দুর্গাপদর জীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল। ওর বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণ ভাবে সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে এবং বিশেষ ক'রে নিজের স্ত্রীকে চেনা ওর শেষ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, স্ত্রীর সঙ্গে এই গত উনিশকুড়ি বছর ঘর করেছে সে—তাকে চিনতে এখনও অনেক বাকী।

শুধু দুর্গাপদই নয়, অবাক হয়ে গেল অনেকেই। কারণ তরলা তখন যে শুধু কোনরকম কটূক্তি বা মন্তব্য না ক'রে নিঃশব্দে নিচে নেমে এসে আবার পাখাটা হাতে ক'রে মহাশ্বেতার বিছানার পাশে বসেছিল তাই নয়— পরের দিনও তার নিত্যকার কাজে কি কথাবার্তায় আচারে-আচরণে কোন বৈলক্ষণ্য টের পেতে দিল না কাউকে, যেন এ রকম কিছুই ঘটে নি. অথবা ঘটলেও তরলার কিছু আসে-যায় না তাতে। তবু প্রমীলা অপেক্ষা করেছিল দুপুরটার জন্যে। খাওয়ার সময় ভাতে বসে কিনা সেইটেই বড় প্রশ্ন, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে কত শক্ত মেয়ে সে, কতটা মনের জোর। কিন্তু দুপুরেবেলা খেতে ডাকতেই—নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে বসল তরলা ; যেমন অন্যদিন এসে বসে। বরং তড়িৎই যেন মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না ছোটকাকীর দিকে। সত্যিই তার কোন দোষ নেই—এ বাড়িতে তাকে ধরে টানাটানি করাটা বহু-কাল থেকে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্তত মেজবৌয়ের তাই বিশ্বাস —তবু, তরলার এই নিঃশব্দ ঔদাসীন্যেই সে যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল তরলার কাছে অপরাধী মনে করছিল নিজেকে।

অবশ্য খেতে বসলেও, খেল খুব সামান্যই। কিন্তু এমন কম নয় যে বিশেষ কারও চোখে পড়ে। এক প্রমীলা ছাড়া সেটুকু চোখে পড়লও না কারও। দুপুরে রাত্রে সহজভাবেই এসে খেতে বসতে লাগল সে—শুধু দুবেলা জল-খাবারটাই ছেড়ে দিল। অবশ্য এ বাড়ির গিন্নীরা কেউ বিকেলে কি সন্ধ্যায় ওপাট রাখে না. কারণ দুপুরের খাওয়া চুকতেই বেলা তিনটে বাজে. সন্ধ্যা পর্যন্ত অম্বলেই ছটফট করে বড় আর

মেজগিন্নী। কোন সুদূর-সম্ভাবিত অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে দুবেলাই দুটি দুটি চাল বেশী নেওয়ার প্রথা আজও এ বাড়িতে অব্যাহত আছে, বোধহয় ক্ষীরোদার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থাকবেও। ফলে সে ভাত প্রায় দুবেলাই পান্তা হয়ে থাকে, আর তা এদেরই খেতে হয়। আর সেই কারণেই এদের এত অম্বল এবং বদহজম। অবশ্য রাত্রে না হ'লেও—সকালে মুড়ি, নারকেল, বাতাসা কি গুড়, দুটো গাছের কলা —এ খাওয়ার রেওয়াজটা আছে এখনও, বস্তুত ছোটবৌয়ের বিয়ের পর থেকেই এটা চালু হয়েছে—কিন্তু সেটা খুব নিয়মমতো কেউই খায় না—হয়ত সময়ই হয়ে ওঠে না এক-এক দিন, তাই সেটা বন্ধ হ'ল কিনা তাও লক্ষ্য করবার কথা নয় কারও। প্রমীলাই শুধু লক্ষ্য করল, জলখাবার বাদ দেওয়া এবং দুবেলা আহারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া—দুটো মিলিয়ে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠল একটু।

তরলার তা'হলে মতলবটা কি?

ও কি এমনি ক'রে আস্তে আস্তে নিজেকে ক্ষয় ক'রে আনতে চায় নাকি?

দিনকতক দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। এতখানি দায়িত্ব নিজের ওপর রাখা উচিত নয়। সে এক ফাঁকে ছোট কর্তাকে নিভৃতে ডেকে বলল, 'কী করছ কি, যাহয় ক'রে মিটিয়ে নাও। বৌটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ—কী হয়ে যাচ্ছে?'

ক'দিন ধরে দিনরাত একটা অস্বস্তি অনুভব করলেও এ দিকটা জানা ছিল না দুর্গাপদর। বস্তুত স্ত্রীর মুখের দিকে সে তাকাতেই পারে নি, আর পাছে সে না-পারাটা কারও কাছে ধরা পড়ে, তাই চোখাচোখি হওয়ার সম্ভাবনাগুলোও এড়িয়ে গেছে সে প্রাণপণে। কী খাচ্ছে না খাচ্ছে তাও অত লক্ষ্য করা হয়ে ওঠে নি। সেই জন্যে—দুবেলা খেতে বসছে ঠিক-ঠিক, সেইটে আড়ে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে শুধু, আর তাতেই কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। প্রমীলার কথায় সে তাই রীতিমতো চমকেই উঠল। বলল, 'কেন—খাচ্ছে না?...বসে তো দেখি—'

'হ্যাঁ বসে কিন্তু কী খায় কতটুকু খায় তা দ্যাখো কি? নামমাত্তরই বসে। ও খাওয়ায় মানুষ বাঁচে না, বিশেষ অমন সাজোয়ান সাণ্ডোল মেয়ে-মানুষটা! জোর করে জীবনটা নিলে পাছে চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে যায়, একটা কেলেঙ্কার হয়—তাই আস্তে আস্তে চুপি চুপি পাত করছে নিজেকে। ও কি কম চাপা মেয়ে!'

'তুমিই তো এই কাণ্ডটা করলে। বিশ বছরের আকোচটা মেটালে!'

'এ কাণ্ড না করলে কি তুমি শায়েস্তা হ'তে—না তোমার আক্কেল হ'ত? সে যে আরও একটা বড় কেলেঙ্কার হয়ে বসে থাকত—তোমাকে যে গলায় দড়ি দিতে হ'ত সে ক্ষেত্তেরে। তোমাকে বাঁচাতেই এটা করেছি মনে রেখো।'

'হ্যাঁ—তা আর নয়! আমার ওপর কত টান তোমার।...আসলে তোমার রীষ! ...তোমাকে আমি চিনি না—কত বড় হারামজাদা মেয়ে-মানুষ তুমি!'

প্রমীলা কিন্তু এ বিশেষণে রাগ করল না, বরং মুখ টিপে হাসল একটু। বলল, 'তাই যদি জানো তো বিশ বছর ধরে একটা আকোচ বুকে ক'রে রেখেছি তাই বা ভাবো কেমন করে?...ওগো ঠাকুর, তোমাকে জব্দ করতে—নাকের জলে চোখের জলে করতে আমার একদিনও লাগত না। তুমি আমার হাতের মধ্যেই আছ। তোমার এত দিকে কালি যে—আর ষড় ক'রে কালি ছিটোতে হয় না।...তা নয়, এ-সব আড়ি-আকোচের কথা নয়, যা করতে যাচ্ছিলে তা যে কত গর্হিত কাজ তা তুমি সহজে বুঝতে না—সে চীজই নও তুমি।. আজ বলে তো নয়—তোমার ওপর নজর আছে আমার চিরকাল—আমার চোখের আড়ালে যাবার সাধ্যি নেই তোমার। বাড়াবাড়ি

করছিলে বলেই একটু জব্দ ক'রে দিলুম। তা সে যাক—এখন যা বলছি তাই শোন, যেমন করে হোক হাতে-পায়ে ধরেও অন্তত রাগারাগিটা মিটিয়ে নাও গে।'

অন্যদিকে চেয়ে মুখটা গোঁজ ক'রে বলে দুর্গাপদ, 'রাগারাগিটা কোথায় তাই যে বুঝতে পারি নি—তা মিটিয়ে নেব কি বলো!...কথাও কয় সবই করে—'

'কথা কয়?...সহজভাবে কথা বলে?' এবার বিস্মিত হবার পালা প্রমীলার। বিশ্বাস হ'তে চায় না তার কথাটা।

'বলে বৈকি। নিজে থেকে বলে না। তবে আমি যেচে কথা বললে জবাব দেয় তো দেখি—'

'তাই তো!' আরও কি বলতে যাচ্ছিল প্রমীলা কিন্তু ছেলেরা দু-তিনজন এসে পড়ায় আর বলা হ'ল না। শুধু যেতে যেতে বলে গেল, 'তবু নিজে থেকেই ওপর-পড়া হয়েও কথাটা পাড়ো অন্তত। এ সব্বনাশ ফেলে রেখে দিও না—'

বিস্ময়টা দুর্গাপদরও বড় কম নয়। সে ভেবেছিল আর যাই করুক, বাইরে যত স্বাভাবিক আচরণই বজায় রাখুক, কথা সে কইবে না স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই। অন্তত বেশ কয়েকদিন কঠিন হয়ে থাকবে, হয়ত ঘরেই আসবে না, দালানে কি ছাদে গিয়ে শুয়ে থাকবে কোথাও, সাধ্যসাধনা ক'রে কথা বলাতে হবে রাগ ভাঙ্গাতে হবে। কিন্তু সে সব কিছু হ'ল না। যেমন ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সে নিচে বিছানা ক'রে শোয় তেমনিই শুলে পরের দিন, এমন কি কোথাও কোন অস্বাভাবিক কাঠিণ্যও প্রকাশ পেল না তার চলা-ফেরায় কি ব্যবহারে। বরং দু-তিন দিন দুর্গাপদই সঙ্কোচে বা ভয়ে কথা কইতে পারে নি। শেষে একদিন, এ নীরবতা তার নিজের ছেলেমেয়ের কাছেই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে উঠছে দেখে—মরীয়া হয়েই কতকটা—কি একটা প্রশ্ন করেছিল সে। প্রশ্ন করার সময় সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবার আশা আদৌ করে নি—কিন্তু খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিয়েছে তরলা সঙ্গে সঙ্গেই। সংক্ষেপে হয়ত—তবে নিঃসঙ্কোচে। এত-সহজে উত্তর পেয়ে চমকে উঠেছিল দুর্গাপদ—যেমন এই মাত্র সে সংবাদে প্রমীলা চমকাল।

তারপরও দু-একটা কথা কয়েছে দুর্গাপদ—উত্তরও পেয়েছে। এমন কি ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনে নিজে থেকেও কথা কয়েছে তরলা। সে সময় তার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠস্বর আরও মৃদু হয়েছে বা তাতে কোন ক্ষোভ কি উষ্মা কিম্বা ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে—তাও বলতে পারবে না দুর্গাপদ।

তবে এও ঠিক যে, অস্বস্তিটা তার কাটে নি। কেন কাটে নি তা হয়ত সে বোঝাতে পারবে না। অস্বস্তিটা অকারণ না হলেও আকারহীন—সেইটেই (যুক্তি দিয়ে কাউকে বোঝানো যাবে না সেটা) হয়েছে তার মুশকিল।

ব্যাপারটা যে ঠিক স্বাভাবিক নয়, এটা বোঝবার মতো সাংসারিক জ্ঞান দুর্গা-পদর আছে। নিজে থেকে, নিষ্প্রয়োজনে কথা কয় নি তরলা একটিও। নিতান্ত খোশগল্পের অবসর অবশ্য কম এবাড়িতে—তার স্বভাবটাও সে রকম নয়, স্বভাবতই স্বল্পভাষী সে, এমন কি স্বামীর কাছেও—তাই শুধু প্রয়োজনমতো কথা বলাটা আর কারও কাছে তত অস্বাভাবিক ঠেকে নি—কিন্তু দুর্গাপদর কাছে এই সামান্য তফাৎ-টুকুও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

অথচ সে করবেই বা কি—তাও তো ভেবে পায় না।

এর মধ্যে, সাত-আট দিন কেটে যাবার পর, একদিন রাত্রে তাকে শয্যার দিকেও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে দুর্গাপদ, তাতেও বাধা দেয় নি তরলা, তবে স্বেচ্ছাতেও আসে নি। আকর্ষণেই এসেছে শুধু, জড় কোন বস্তুর মতো। এসেছে, বসেওছে

বিছানায়। বসেও থেকেছে কিছুক্ষণ—কিন্তু সে সময় ওকে, কাঠের পুতুলও নয়—দাঁড়ায় নি। হয়ত শেষ পর্যন্তও কোন বাধা দিত না। কিন্তু সেটা পরখ ক'রে মড়ার মতোই মনে হয়েছে তার। তবে বাধা দেয় নি সে কোনও সময়, শক্ত হয়ে বে'কেও দেখতে আর ভরসায় কুলোয় নি। নিজের আচরণ নিজের কাছেই লজ্জাজনক বলে মনে হয়েছে। যা-হোক একটা কিছু বোঝাপড়া হেস্তনেস্ত হয়ে জীবনযাত্রাটা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়ে না এলে এদিকে এগোনোও যাবে না বুঝেছে সে...স্ত্রীর গায়ে জড়ানো হাত শিথিল হয়ে এসেছে তার নিজে থেকেই। যেন কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা ভয়েই ছেড়ে দিয়েছে সে।

তরলা কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বসে ছিল সেখানে, স্বামীর শয্যায়। তারপর আবার সহজভাবেই এসে নিচের বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। কিছুই বলে নি, কোন মনোভাবই তার আন্দাজ করা যায় নি।

বুঝতে পারছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না দুর্গাপদ। হয়ত সেদিন ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি, হয়ত তরলাও তা আশা করে নি—কে জানে! হয়ত সাহস ক'রে আর একটু এগোলেই সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সেদিনও কুলোয় নি, তার পরেও না! কী হবে—কী এবং কতটা প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, কোন্ দিকে যাচ্ছে তরলা—আসলে তার মতলবটা কি, তাই যে বুঝে উঠতে পারছে না!

যে কুরূপা স্ত্রীকে সে দীর্ঘদিন অবহেলা করেছে, আদৌ তাকে কোনদিন জীবন-সঙ্গিনী, শয্যাসঙ্গিনী করবে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ ছিল বহুকাল—সেই স্ত্রীর সামান্য একটু মনোযোগ যে ওর কাছে এমন আরাধনার বস্তু হয়ে উঠবে—তার মনোভাব জানবার জন্যে যে ওর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না—তা কে ভেবেছিল!

অদৃষ্টের পরিহাস—না কী একটা কথা আছে না—নাটকে-টাটকে প্রায়ই ব্যবহার হয়—এও বোধহয় তাই। একেই বোধহয় অদৃষ্টের পরিহাস বলে—মনে মনে ভাবে দুর্গাপদ।

এমনিই যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করছিল, প্রমীলা সচেতন ক'রে দেবার পর থেকে সেটা সত্যিই দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল। আরও দিন দুই ভেতরে ভেতরে ছটফট করবার পর সে স্থির করল যে, মেজবৌয়ের পরামর্শই সে নেবে, ওপরপড়া হয়েই স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট করবে।

সেই দিনই রাত্রে, বাড়িটা মোটামুটি নিস্তব্ধ হয়ে এলে খাটের বিছানা থেকে নেমে এসে স্ত্রীর বিছানার পাশে, মেঝেয় বসল। তরলা জেগেই ছিল, স্বামীর এ নিঃশব্দ ও গোপন সঞ্চার সবই টের পেল সে। হয়ত সে অন্ধকারে চেয়েই ছিল এদিকে!

সে যে জেগে আছে দুর্গাপদও তা জানত। আজকাল অনেক রাত অবধি যে তরলা জেগে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সেটা অজানা ছিল না ওর কাছে। তবু তখনই সাহস হ'ল না কথা কইতে। অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ ক'রে বসে রইল সে! কথাটা অপর পক্ষ থেকে শুরু হ'লে বেঁচে যায়। কিন্তু তা হ'ল না। তখন—বেশ কিছুটা সময় চুপ ক'রে বসে থাকবার পর—অতি সন্তর্পণে তরলার গায়ে একটা হাত রাখল। কোথায় হাত রাখবে—সেও একটা সমস্যা। একেবারে পায়ে হাত দিতে লজ্জা করে, অথচ সে যে ক্ষমাপ্রার্থী—তা ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশে হাত দিলে সেটা বোঝবার সম্ভাবনা কম। অনেক ভেবে সে হাঁটুর কাছটাতেই হাত দিল।

'এই শুনছ, জেগে আছ?'

হাতটা সরিয়ে দিল না তরলা, নিজের পাও সরিয়ে নিল না। খুব আস্তে হলেও—খুব স্পষ্টভাবেই উত্তর দিল, 'কি?'

ছোট ছেলে আর মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ—তবু তাদের দিকে, অন্ধকারেই যতটা সম্ভব, তাকিয়ে দেখে নিয়ে তেমনি চুপিচুপি বলল, 'আমাকে—আমাকে এইবারটি মাপ করো, আর কখনও এমন হবে না। এইবারটি শুধু বিশ্বাস করো আমাকে।'

প্রায় মিনিটখানেক চুপ ক'রে রইল তরলা। এসব ব্যাপারে অনভ্যস্ত দুর্গাপদর মনে হ'ল এক যুগ। গোটা বাড়িটা তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এত নিস্তব্ধ যে নিচে মহাশ্বেতার সামান্য নাক-ডাকার শব্দও এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আরও নানা বিচিত্র শব্দ হচ্ছে চারিদিকে—ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক, দূরে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে তার একটানা আওয়াজের সঙ্গে ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ—এতকাল পরে এই যেন প্রথম শুনল দুর্গাপদ। গভীর রাত্রেও এত যে কোলাহল হয় চারিদিকে—তা তো সে জানত না!

কিন্তু তরলা চুপ ক'রে ছিল এক মিনিটই। তারপর কেমন যেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কেন, তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে?'

এ আবার কি কথা! কী কথার কি জবাব এটা!

রাগ করলে, অভিমান প্রকাশ করলে, তিরস্কার করলে বুঝতে পারত দুর্গাপদ—কিন্তু এ ধরণের কথার সুদূর গূঢ়ার্থ বোঝা তার সাধ্যাতীত। সে যেন বেমে উঠল দেখতে দেখতে।

অনেকবার এদিক-ওদিক চেয়ে, বারকতক মাথা চুলকে, খানিকটা আমতা-আমতা ক'রে বলল, 'না তা নয়—মানে সুবিধে অসুবিধে আর কি—আমরা ধরো অত কিছু অসুবিধে সুবিধের ধারও ধারি না—। তবে, মানে—অত রাখা-ঢাকা ন্যাকামির দরকারই বা কি, সবই তো বুঝতে পারছ, কাজটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, তা আমিও মানছি—অবশ্য করে ফেলেছি একটা ঝোঁকের মাথায়—তবু হাজার হোক আমি তোমার স্বামী তো—এইবারটির মতো আমাকে মাপ করো, এই তোমার পায়ে ধরছি!'

'ছিঃ!' এবার দুর্গাপদর হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে তরলা, 'পায়ে হাত দিও না, ছেলেমেয়ের অকল্যেণ হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—তোমার খুব দোষও দিই না। দোষ আমার অদৃষ্টের—সেইটেই বড়, মানুষের দোষ ধরতে গেলে আমার বাপ-মায়ের দোষ, তোমার বৌদিদের দোষ। আমার মতো কালো কুচ্ছিতকে এনে তোমার পাশে দাঁড় করানোই উচিত হয় নি তাঁদের। রূপের আশা মেটে নি বলেই ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াতে হয়—যেখানে সেখানে হ্যাংলাবিত্তি করতে যাও। ..আগে থেকেই করছিলে, মেজদি জানতেনও—জেনে-শুনে, তাঁর রূপে-গুণে যে মজেছে, তার বৌ ক'রে আমাকে আনা তাঁর উচিত হয় নি। হয়ত ইচ্ছে ক'রেই এনেছেন, তুমি চিরদিন হাতে থাকবে বলেই—কিন্তু আমিও তো মানুষ, আমার কাছে আমার জীবনের, আমার সুখ-দুঃখের দাম আছে। সেটা উনি ভেবে দেখতে পারতেন। কালো কুচ্ছিত বলে স্বামীর ভাগ ছেড়ে দেব—এটা ভাবা ও'দের উচিত হয় নি।... সব সময় কিছু আয়নাও বাঁধা নেই মুখের সামনে যে নিজের চেহারার কথাটা অষ্টপ্রহর মনে পড়বে!'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল তরলা। বোধ হয় অবাধ্য চোখের জল সামলে নিতেই। এই স্বামীর সামনে কোন প্রকারে দুর্বল হয়ে পড়া, ভেঙ্গে পড়া চলবে

না। তার চেয়ে লজ্জার বা ঘেন্নার কথা আর কিছু নেই।...

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কণ্ঠস্বরটা আগের মতোই আবার নির্লিপ্ত ও ভাবলেশহীন করে নিয়ে বলল, 'যাও, তুমি শুতে যাও।...ভয় নেই—আমি এখনই মরছি না। প্রাণের মায়া নয়—যাদের এ সংসারে এনেছি তাদের অন্তত একটুখানি বড় ক'রে দিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলেই মরব না। বেঁচেও থাকব, তোমার সংসারের কাজকর্মও করে যাব ঠিক ঠিক, কোন হুকুম থাকলে জানিও—তাও তামিল করব, কিন্তু তার বেশী আর কিছু আশা ক'রো না। ভালবাসা—? আমার মনে হয়—স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় স্ত্রী যদি স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে না পারে তো সেখানে ভালবাসা সম্ভব নয়, অন্তত স্ত্রীর দিক থেকে তো নয়ই। আর সবই তোমাকে দিতে পারব—কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধা আলাদা জিনিস, সেটা মন থেকে আসে। সেটা বোধ হয় আর আসবে না। আজ এই কান্ডটা ঘটেছে বলে নয়, বহুকালের বহু আচরণে সে ভক্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছ তুমি।...তবে তুমি তো কখনও এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাও নি, আজই বা ঘামাতে যাচ্ছ কেন? প্রয়োজনের সময় কাছে টেনেছ, প্রয়োজন হ'লেই আবার টেনো—কিছু অসুবিধে হবে না।......তোমার খাচ্ছি পরছি, তোমার কাজে ত্রুটি হ'লে চলবে কেন?'

কথা শেষ করে সে এবার খুব সহজভাবেই, ছেলের যে হাতটা এদিকে এসে পড়েছিল সেটা সরিয়ে দিয়ে—তার দিক ফিরেই শুয়ে পড়ল। চিরদিনই কাপড়জামা গুছিয়ে জড়িয়ে শোওয়া অভ্যাস তার, আজও তাই শুয়ে ছিল, তবু একবার হাত বাড়িয়ে পায়ের দিকের কাপড়গুলো টেনে নামিয়ে দিল—কিন্তু তারপরই একেবারে নিথর হয়ে গেল। ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে, তা বোঝবার কোন উপায় রইল না।

দুর্গাপদ হতভম্বের মতো সেইখানেই বসে রইল অনেকক্ষণ। প্রথমটা সত্যিই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তরলা যে এত কথা বলবে, এত কথা যে বলতে পারে—সেইটেই আশা করে নি সে। এ ধরণের বক্তব্যও তার কাছে একেবারে নতুন, অপ্রত্যাশিত। এর পুরো অর্থটাও তার বোধগম্য হ'ল না হয়ত। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটতেই সে জায়গায় দেখা দিল অপারিসীম ক্রোধ। মুখের ওপর যেন চাবুক খেয়েছে সে—সত্যি সত্যিই যেন তেমনি জ্বালা করছে মুখটা। স্ত্রীর কাছ থেকে এ রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় সে, এরকম কথাতেও না। অপমানের আঘাতে তাই দারুণ রোষই সৃষ্টি হবার কথা। এক এক সময় মনে হ'তে লাগল যে ঐ মুখখানা নোড়া দিয়ে কিম্বা লাথি মেরে ভেঙ্গে দেয় সে—এই তেজের উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেয় এখনই।

'ওঃ—', মনে মনে বলতে লাগল সে, 'একটু এদিক-ওদিক কি করেছি তো মহা-ভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে। পুরুষমানুষ অমন কত কী করে। সেকালে যে বামুনের ঘরে পঞ্চাশ-ষাটটা সতীন নিয়ে ঘর করতে হ'ত—তার বেলায়! তেজ, তেজ দেখাতে এসেছেন আমার কাছে, এখনও ইচ্ছে করলে আমি ওর মতো বৌ দুশো-পাঁচশটা এনে জড়ো করতে পারি তা জানে না! মেয়েছেলে হ'ল জুতোর জাত, পায়ের নিচে না রাখলে ঢিট থাকে না। হুঃ!'

কিন্তু মনে মনে যতই গজরাক, মুখে একটি কথাও বলতে পারল না সে। মুখ ভেঙ্গে দেওয়া তো দূরের কথা, গায়ে হাতটা পর্যন্ত রাখতে পারল না আর। কেন যে পারল না, কী যে হ'ল তাও বুঝতে পারল না। কোথায় একটা সঙ্কোচ, নাম-না-জানা একটা সমীহের ভাব তাকে অনড় ক'রে রাখল।

খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে দুর্গাপদ এক সময় গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের

বিছানায়। তখনও তার রাগটা কমে নি, রুদ্ধ আক্রোশে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল যে, যার জন্যে এত কাণ্ড, এবার থেকে তাই করে বেড়াবে সে। যা-খুশি করবে, যেখানে খুশি যাবে। রীতিমতো বেলেল্লাগিরিই করবে সে. দরকার হয় তো বেশ্যাবাড়িও যাবে. দেখবে কে ঠেকায়। কী করতে পারে তার ও মাগী. দেখে নেবে সে।...

বহুরাত অবধি তারও ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে তেমনি নিষ্ফল শব্দহীন আস্ফালন ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু যতই ভেতরে ভেতরে গজরাক সে, যতই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের সংকল্প নিক—মনের মধ্যে যেন কিছুতেই কোন জোর পেল না। বাইরে চলে গেছে, দয়ার পাত্রী কেমন ক'রে দয়াধাত্রীর আসনে উঠে গেছে—কিছুতেই আপাতবাধ্য শান্ত সহিষ্ণু স্ত্রী তার যেন হঠাৎ কেমন ক'রে হাতের বাইরে নাগালের আর যেন তার ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানে এটা কেমন ক'রে হ'ল।

সেই সমস্যাটাই সমস্ত ব্যর্থ আস্ফালনের পিছনে মনের অবচেতনে তাকে পীড়িত করতে লাগল. বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না দুর্গাপদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১॥

অনেক দুঃখেই কথাটা বলেছিলেন শ্যামা। বোধহয় না বলে থাকতে পারেন নি বলেই।

বিনতা পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল নিতান্ত সাধারণভাবেই—শুধুমাত্র সামনের ব্যক্তিটিকে শোনাতে—কিন্তু তাতেই তার কথাগুলো যে সামনের অন্তত দু বিঘের বাগান ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। চেঁচিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে ছাড়া যেন সে কথাই কইতে পারে না।

'এসম্বন্ধে বহুবার তাকে সতর্ক করেছেন শ্যামা, তিরস্কার করেছেন, কঠিন ব্যঙ্গে বিঁধতে চেয়েছেন—কিন্তু কোন ফল হয় নি। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল মেয়েটা বুঝি শুধুই 'বক্তার' অর্থাৎ বেশী কথা বলে, বা সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে কথা না কয়ে থাকতে পারে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল গলাও তার কম নয়। আর নতুন বৌয়ের যে অত চেঁচানো বা অত কথা বলা অশোভন—একথাটাও তার মাথায় যায় না কিছুতে।

সেদিনও একটু আগেই শ্যামা বলেছেন. 'আমি তো নশো পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে নেই বৌমা—সামনেই আছি, তবে অত গলা বার করছ কেন?...নতুন বৌয়ের গলা পাশের লোকও ভাল শুনতে পাবে না—এই ছিল আগেকার নিয়ম। বৌয়েরা শ্বশুর-বাড়ি এসে একটু চড়া গলায় কথা বললে তার নিন্দে হত, বেহায়া বলত সকলে। ...এখন অবিশ্যি অতটা নেই, তবু এত বাড়াবাড়িও কেউ বরদাস্ত করে না। এরই মধ্যে পাড়ায় বেহায়া নাম রটে গেছে তোমার। কেন—একটু আস্তে কথা বললে কী হয়? আমাকেই তো বলছ, ও পাড়ার ভগবতী গয়লাকে তো বলছ না বাছা।'

'ওমা দুটো কথা কইব—তাও বর নয়, কোন পরপুরুষ নয়—শাশুড়ীর সঙ্গে বসে কথা বলা—অত চেপেই বা বলব কিসের জন্যে? বলি অন্যায় অপরাধ তো কিছু করছি না। এতে আবার বেহায়া বলাবলির কি আছে! আর বলে—যে বেটা-বেটিরা

বলবে তারা নিজেদের মুখেই পাইখানা বসাবে। তাদের কথা আমি গেরাহ্যি করি না।

বলা বাহুল্য এবার গলা বরং আরও চড়া। যেন সে বেটাবেটিরা পথের ওপারে কোথাও বসে আছে—তাদের শুনিয়েই বলতে চায় সে।

একটু দম নিয়েই সে আবারও বলল, 'আপনি কিন্তু বেশ বলেন মাইরি। হি হি, হাসি পায় আমার শুনলে! বললেন কিনা, নতুন বৌ কথা বলবে পাশের লোকও শুনতে পাবে না। হি হি—তবে আর কথা বলাই বা কিসের জন্যে, পাশের লোকও যদি না শুনতে পায়? কাউকে না কাউকে শোনাবার জন্যেই তো বলে মানুষ!...সেকালের লোকগুলো অমনি বোকা ছিল সব!'

তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ ক'রে হাই তুলে বলল, 'আর নতুনই বা কি, দেখতে দেখতে তো পেরায় এক বছর ঘুরে এল, এখন তো আমি পুরনোর সামিল, আমার তো ঘর-সংসার বুঝে নেবার কথা এতদিনে!'

হাল ছেড়ে দেন শ্যামা। হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিনই। অনেক বৌ-ঝি দেখেছেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে তাঁকে—তার মুখের কাছে দাঁড়াতে তো বোধহয় স্বয়ং নারদমুনিও ভয় পায়—কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখেন নি। এ বৌ সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। এর সঙ্গে তিনি যেন কিছুতেই পেরে ওঠেন না। ঝগড়া করলে তার সঙ্গে ঝগড়া করা যায়, তর্ক করলে যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডন করা চলে; এ সে সব কিছুই করে না, একেবারে সোজাসুজি যেন উড়িয়ে দেয় তাঁকে, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। আর এমন ভাবেই করে যে মুখের কথাতে আর ওকে শাসন করা যায় না সে সময়। ওর একমাত্র ওষুধ হ'ল সেই সময় ঘা-কতক দেওয়া বা মুখখানা নোড়া দিয়ে থেঁতো করে দেওয়া। কিন্তু সেটা ঠিক ইচ্ছে করে না। চক্ষুলজ্জায় বাধে। অভ্যাসও তত নেই তাঁর, চট ক'রে হাত-পা চলেও না। নিজের ছেলেমেয়েদের গায়েই কখনও হাত দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না তেমন। দিলেও খুব অল্প, কদাচিৎ কখনও। তাছাড়া খোকা আর তরু তাঁকে চিরদিনের মতো ছেড়ে গেছে এই উপলক্ষ করেই। কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে তাঁর, আর কারুর গায়ে হাত তুলতে যেন সাহস হয় না।

আরও একটা কথা। একবার একদিন শাসন করলে বাগ মানবে—তেমন মেয়ে নয় এ। প্রতিদিন দিনরাত কিছু কেজিয়া করা যায় না। ছোটলোকদের ঘরেও তা করে না কেউ, করলে তাদের ঘরেও নিন্দে হয়। তাঁর এ তো বামুনের ঘর, ভদ্রলোকের ঘর।

তাই কীল খেয়ে কীল চুরি করার মতোই সব অসৈরণ হজম করতে হয়। আজও আর বেশী ঘাঁটালেন না শ্যামা। আপন মনে কাজ ক'রে যেতে যেতে এক সময় নিতান্ত ভালমানুষের মতো প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা বৌমা, তোমার নাড়ী কেটে-ছিল কী দিয়ে জানো?'

'নাড়ী কেটেছিল? আমার? কি দিয়ে—তার মানে?...আপনি কী সব মজার মজার কথা বলেন না এক একসময়! আমার নাড়ী কেটেছিল কি দিয়ে তা আমি কেমন ক'রে জানব বলুন। তখন কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি কিছু হয়েছে যে দেখে রাখব।'

'তা বটে। সত্যি কথাই তো।...না, তাই জিগ্যেস করছিলুম।' আরও নিরীহ-কণ্ঠে বলেন শ্যামা।

কিন্তু ততক্ষণে বিনতার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে। সে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'কেন বলুন তো মা? ব্যাওরাটা কি?'

'না, ঐ যে বলে না—', পাতা চাঁচতে চাঁচতে বঁটির দিকে নজর রেখেই উত্তর দেন

শ্যামা, 'যে চ্যাঁচারি দিয়ে নাড়ী কাটলে খুব চাঁচা-ছোলা পরিষ্কার গলা হয়। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। কথাটা মনে পড়ে গেল তাই—'

'ও, আমার গলার কথা বলছেন! সব্বরক্ষে! আমি বলি কী না কি ব্যাপার! ...তা কে জানে বাপু কী দিয়ে চেঁচেছিল,—মা জানতে পারে হয়ত। আমি কোনদিন মাকে জিজ্ঞেসও করি নি।'

বলতে বলতেই কী একটা কথা মনে পড়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে যেন 'ওমা, সে বুঝি জানেন না—অনেককাল, বোধ-হয় অমন চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কথাই ফোটে নি যে! ওরা তো ভয় পেয়েই গেছল যে বোধহয় বোবাই হবো, জন্মে আর কথা ফুটবে না মুখে। মা নাকি খুব কান্নাকাটি করত সে জন্যে। তারপর মার কান্না দেখেই হোক আর নিজের ধম্ম ভেবেই হোক, কাকা কোন এক বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, সে ডাক্তার এসে গলার মধ্যেটা কম্‌নে কি চিরে দিতে তবে বুলি ফুটল!'

'তাই নাকি! তা সে কে ডাক্তার বৌমা, তার নাম কি?'

'কে জানে বাপু, অতশত আমি খবর রাখি না। জিজ্ঞেসও করি নি কখনও। কাজ হয়ে বয়ে চুকে গেছে কবে—নিশ্চিন্তি। অত—কী কী বিত্তেন্ত তার চোদ্দ-পুরুষের নিকেশে আমার কি দরকার!'

'তা তোমার মার মনে নেই? কী তোমার কাকার?...একটা চিঠি লিখে দ্যাখো না!...নাম ঠিকানাটা কি. আর এখনও বেঁচে আছেন কিনা!'

'তা লিখতে পারি। কিন্তু সে ডাক্তার দিয়ে আবার আপনার কি হবে! কাকে দেখাবেন—বলাইকে?'

'না, বলাইকে দেখাব কেন, তোমাকেই দেখাব—।'

'আমাকে?'

ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় সে। এতক্ষণে বুঝি কি একটা সংশয় ঘনিয়ে আসে বিনতার মনে।

'দেখাব এই জন্যে যে. যিনি তোমার গলা চিরে বোল ফুটিয়েছিলেন, তিনিই এখন দেখে-শুনে সেটা সেলাই ক'রে আবার বোল বন্ধ করতে পারেন কিনা! তার জন্যে এমন কি যদি ষোল টাকা ভিজিট নেন্ সে ডাক্তার তো আমি দিতে রাজী আছি!'

দেখতে দেখতে ভীষণ আকার ধারণ করল বিনতার মুখ। গলা আরও এক পর্দা চড়িয়ে তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে উঠল. 'কেন বলুন তো আমার বুলি বন্ধ ক'রে দেবেন' কিসের জন্যে!...এসব কি অলুক্ষুণে কথাবার্তা! আমি আপনার কী পাকাধানে মই দিয়েছি তাই শুনি!...আমার কথা যদি এত খারাপ লাগে—আমার সঙ্গে কথা কইতে আসেন কেন? কাল থেকে আর কথা কইবেন না—আমার কথা শুনতেও হবে না... বলে—না যাবে নগর না হবে ঝগড়!...তাও অসহ্যি লাগে ভেন্ন ক'রে দিন না। আপনার খারাপ লাগে বলে আমায় কি মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে নাকি?...ইল্‌লো!... আবদার মন্দ নয়। উনি যেন সাক্ষাৎ ভগবান এলেন একেবারে, কিম্বা খড়দর মা-গোঁসাই!...ও'কে তুষ্টি করতে জিভ কেটে দেব আমি!...কেন, আমার গলার ওপরই বা এত নজর কেন. নিজের মেয়েদের গলা কি কিছু কম নাকি?...বট-ঠাকুরঝির গলা তো শুনি সেই রাস-তলা থেকে শোনা যায়! মেজ-ঠাকুরঝি যখন আসে তখন তো শুনেছি আরও এক কাঠি সরেস—কাক-চিল বসতে পায় না বাড়িতে।—ওগো, শুনেছি সব—চক্ষে নাই বা দেখলুম. কন্যেদের গুণ শুনতে আর আমার বাকী নেই এর মধ্যে কিছু।......তাব বেলা তো কিছু বলবার সাধ্যি হয় না। সে বুঝি সব ভাল। নিজের ময়লায় গন্ধ নেই—না? যত চোর দায়ে ধরা পড়ল বৌবেটি হতচ্ছাড়ী!...বাঃ, বেশ তো,

বেশ বিচের যা হোক!'

আরও অনেক কথা বলে যায় সে, ঠিক প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষে সে গালাগালও দেয় ছড়া বেঁধে। বলতে বলতে গলার পর্দাও চড়ে, ক্রমশ যেন রণ-রঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে সে। তার দিকে চেয়ে এমন কি শ্যামাও একটু ভয় পেয়ে যান যেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, মুখের দুই কষে ফেনার মতো কী জড়ো হয়েছে—এমন কি, চুল-গুলোও যেন খানিকটা খাড়া হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। ভদ্রঘরের মেয়ের এমন উগ্র মূর্তি কখনও দেখেন নি শ্যামা—বস্তি-টস্তিতে ঝগড়া বাধলে হয়ত এই রকম দৃশ্য নজরে পড়ে।

ভয় পেলেও—বেশীক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। শেষে থাকতে না পেরে এক-সময় তিনি বলেন, 'তা বেশ তো, সে ফিরে আসুক, সেই কথাই ব'লো না বরকে। ভেন্ন হয়ে যেতেই ব'লো। তোমারও হাড় জুড়োয় আমারও হাড়ে বাতাস লাগে। তাছাড়া—সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু সুবিধেও হয়— তোমাদের দুজনকে খাওয়াতে পয়সাও তো কম খরচ হচ্ছে না আমার!'

'অ! জানেন সে অক্ষ্যাম, জানেন সে ভেন্ন হয়ে মাগ-ছেলে পুষতে পারবে না, তাই বুঝি এত টিটকিরি মারছেন!' ভীষণতর হয়ে ওঠে বিনতার কণ্ঠ, 'তা এত অক্ষ্যামই যদি জানেন, তবে বে দিয়েছিলেন কেন ঐ হাবাকালা ছেলের! যার এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই তার বে দিয়ে বৌ আনবার শখ জেগেছিল কেন প্রাণে।...না কি ভেবেছিলেন অক্ষ্যাম ছেলে কোনদিন কোথাও চলে যেতে পারবে না—তার বৌকে দু-পায়ে থ্যাঁতলাবেন মনের সুখে!...হুঃ! স্বপ্নেও ভাববেন না আমি সেই বান্দা! খাওয়া! ভারী তো খরচ করছেন খাওয়াবার জন্যে। জেলের কইদীরা এর চেয়ে ভাল খায়। দুবেলা দুমুঠে ভিক্ষের ভাত দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন একেবারে। সেই ভয়ে আমায় মুখে কুলুপ এ'টে থাকতে হবে!...কেন, কিসের জন্যে! অত সুখে আর রাধামণি বাঁচে না!...যদি ভেন্ন হই তো এটি জেনে রাখবেন যে সহজে ছেড়ে দোব না আমি, দস্তুরমতো খোরাকী আদায় ক'রে ছাড়ব। না দেন—জোর করে আদায় করব। দরকার হয় আদালতে গিয়ে দাঁড়াব—ছেলে চাকরী করে বলে ঠকিয়ে বে দিয়েছেন!'

শ্যামা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অসহ্য একটা ক্রোধে তাঁর হাত-পা কাঁপছে ভেতরে ভেতরে—কিন্তু কী করবেন, কি করে বাধা দেবেন একে, সত্যিই দু-চার ঘা কষিয়ে দেবেন কিনা—কিছুতেই ভেবে পেলেন না তিনি। এ যা মেয়ে, এ সব করতে পারে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এই প্রথম তিনি ঐন্দ্রিলার আগমন প্রার্থনা করতে লাগলেন মনে মনে। একমাত্র সেই বোধহয় পারে—এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করতে।

কিছুই বলতে পারলেন না শ্যামা, কোন প্রতিকারই তাঁর মাথায় এল না। এ ধারে কৌতূহলী প্রতিবেশীরা ইতিমধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে—কেউ কেউ সোজাসুজি বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এদিকে। ঐন্দ্রিলার কল্যাণে চেঁচামেচি ঝগড়া এ বাড়িতে নতুন নয়, তবু—এখন যে সে নেই তাও অনেকে জানে। বৌ আর শাশুড়ী থাকে শুধু—বলতে গেলে নতুন বৌ—সুতরাং এখনকার চেঁচামেচি কিছু মুখরোচক নিশ্চয়ই। এ কৌতূহলও তাই নিতান্ত স্বাভাবিক। ওদের দোষ দেন না শ্যামা। আর এও তিনি জানেন যে সে কৌতূহল বেশীক্ষণ দূরত্ব ব্যবধান বজায় রাখতে দেবে না। এখনই হয়ত বেড়ার আগড় ঠেলে কেউ কেউ ভেতরে ঢুকবে ব্যাপারটা ভাল ক'রে উপভোগ করতে। তাঁকে এবং বৌকে নানাবিধ উপদেশ দিতে

শুরু করবে তারা এখনই। তাদের সেই বিদ্রূপ-শাণিত দৃষ্টি এবং আপাত-আন্তরিক সহানুভূতি থেকে আত্মরক্ষা করতেই যেন শ্যামা হাতের কাজ সরিয়ে রেখে পিছন দিককার বাগানে চলে গেলেন—একরকম রণে ভঙ্গ দিয়েই। আশা যে, এই বিজয়-গৌরবের তৃপ্তিতে এবং একা একঘেয়ে বকে যাবার ক্লান্তিতেই এবার চুপ করবে বৌ।

সত্যিই বিনতা চুপ করতে বাধ্য হ'ল তখনকার মতো। যতবড়ই যোদ্ধা হোক—প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। কিন্তু সেটা শুধুই নিরুপায়ের শান্তি। মনে মনে একটা ভয়ঙ্করতর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। কান্তি বাড়ি ফিরলে সে একটা হেস্তনেস্ত বিহিত যা হোক করবেই—এই স্থির প্রতিজ্ঞা তার।

কিন্তু তার সব প্রতিজ্ঞা এবং প্রস্তুতি ভেঙ্গে দিল কান্তিই।

সে বাড়ি ফিরল প্রবল জ্বর এবং মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। কাজ করতে করতেই জ্বর এসেছে, তার ওপর জোর করে কাজ করতে গিয়ে বেড়ে গেছে আরও। আর সেই জন্যেই বোধহয় এত যন্ত্রণা। তখন মালিক জোর ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে। ছাপাখানারই একজন সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। গাড়িভাড়ার পয়সা তিনিই দিয়ে দিয়েছেন—'উদিগের টেরাম ভাড়া সুদ্দু'। ফেরার পয়সাও হিসেব করে দিয়েছেন। আর কিছু লাগবে না।

কান্তির বরাত ভাল। বদ্ধ কালা হয়েও মনিবের সুনজরে পড়ে গেছে,—ওর সহকর্মীর কণ্ঠে সেই প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাটুকুও চাপা রইল না।

তা সে যাই হোক—ঝগড়াটা তখনকার মতো মুলতুবী রাখতে হ'ল বিনতাকে। কারণ জ্বরটা খুবই বেশী। শ্যামা যখন কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বরের পরিমাণটা অনুমান ক'রে নিয়ে মাথা ধুইয়ে দেবার আয়োজন করলেন, তখন তাকে ভালমানুষের মতো জল-গামছা-কলাপাতা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সাহায্যও করতে হ'ল যথাসম্ভব।

কান্তির জ্বর পরের দিনও কমল না, তার পরের দিনও না।

তখন চিন্তিত হয়ে শ্যামা ফকির ডাক্তারকে ডাকতে বাধ্য হলেন। ফকির এসে মিক্‌স্‌চার এবং কী একটা পুরিয়ে দিয়ে বলে গেলেন, 'সাবধানে নজর রাখবেন, জ্বরটা বাঁকা দাঁড়াতে পারে।'

এবার বিনতারও মুখ শুকোল। যার জোরে তার জোর—সে-ই যদি অসহায় হয়ে পড়ে থাকে এমন ক'রে, তাহ'লে আর বিক্রম দেখায় কোথায়? সে অন্যলোকের অভাবে ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে বোধ করি বাসনগুলোকেই শুনিয়ে শুনিয়ে আপসায়, 'যার কপাল খারাপ হয় তার দেখি সব দিকেই মন্দ। অসুখ-বিসুখ জ্বরজারি হয় লোকের—দুদিন খাড়া উপোস দিয়ে পড়ে থাকে—জ্বর ছেড়ে যায়, নিশ্চিন্ত! এঁর যখনই হবে বাঁকা!...একবার তো শুনেছি এই জ্বর থেকেই কান দুটো গেছে—এবার বোধহয় চোখ দুটোও যাবে! ব্যস্—তবেই আর কি, সুখের ওপর স্বর্গবাস হয় একেবারে! ভরাভরতি চোদ্দ পোয়া ভাগ্যি উপ্‌চে পড়ে। ঐটুকু শুধু বাকী আছে দুদ্দশা পুরো হ'তে।...ঝাড়ু মারো বরাতের মুখে—কেন, আমার বরাতেই বা এমন বে হবে কেন? কৈ আর কারুর তো এমন বে হ'তে শুনি নি। ভারী তো ভাতার—পনেরো টেক্‌লো মাইনের চাকর—তাও গোটা একটা আস্ত মনিষ্যি পেলুম না গা! মুখে আগুন বরাতের, জ্যান্ত নুড়ো জেবলে দিতে হয় এমন বরাতের মুখে। এবার আর একটা অঙ্গ পড়লেই তো বুঝতে পাচ্ছি মালা হাতে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে!'

শ্যামা ছেলের কাছে বসেছিলেন, অতটা শুনতে পান নি, ওধারের ঘাট থেকে মহাদেবের মা শুনতে পেয়ে ধমক দিয়ে উঠল, 'ওকি হচ্ছে গা বৌদি, ঘরে রোগা ভাইটা আমার পড়ে ছটফট করছে, আর এখানে বসে বসে তুমি তার ষাট বাচাচ্ছ! ওসব কি অলুক্ষুণে কথাবাত্তারা!'

অপ্রতিভ হয়ে তখনকার মতো চুপ ক'রে যায় বিনতা।...

জ্বর পাঁচ-ছ দিন পরে একটু নরম হয়ে আসে। ফকির ডাক্তার অভয় দিয়ে যান, 'না, যা ভেবেছিলুম তা নয়—টাইফয়েড-টয়েড কিছু নয়। হয়—ওরকম হয়। আজকাল আকছার হচ্ছে এই রকম একজ্বরী-মতো। যাই হোক—এবার আস্তে আস্তে ছাড়বে। তবে ছাড়বার মুখটাতে একটু হুঁশিয়ার থাকবেন, দুর্বল শরীর তো, হঠাৎ সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে। সেই সময়টায় একটু গরম দুধ কি একটু গরম চা—নিদেন গরম চিনির জল খাইয়ে দেবেন—'

ফকির ডাক্তার পাশকরা ডাক্তার নন, এক বড় ডাক্তারের কাছে কম্পাউণ্ডারী করতে করতে ডাক্তারখানা খুলে বসেছেন। তা অবশ্য হয়েও গেল অনেক দিন। আগে আদৌ ভিজিট নিতেন না, পরে আট আনা করেছিলেন, এখন নাকি এক টাকা ভিজিটের কম কারও কাছে যান না। তবে শ্যামা বহুদিনের মক্কেল বলে এখনও আট আনা নেন, তাও সব দিন দিতে পারেন না শ্যামা, দুদিন ভাঁড়িয়ে একদিন দেন। কিন্তু ফকির কিছু বলেন না—ডাকলেই আসেনও। ওষুধের দাম ও'র কাছেই সবচেয়ে কম। অনেক ভেবেই তাঁকে ধরে আছেন শ্যামা।

লোকমুখে খবর পেয়ে বিনতার মা একদিন এলেন জামাইকে দেখতে। এর আগে আর কোন দিন আসেন নি তিনি। শ্যামা অবশ্যই যত্ন-আত্তির ত্রুটি করলেন না, বাজার থেকে বলাইকে দিয়ে মিষ্টি আনিয়ে দিলেন, মায় চা-খাবার অভ্যাস আছে শুনে এক পয়সার গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট আনিয়ে বিনতাকে দিয়ে চা করিয়েও দিলেন।

অত দূর থেকে খুঁজে খুঁজে নতুন জায়গায় আসতেই ভদ্রমহিলার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগেই মাত্র এসে পৌঁচেছেন তিনি। তাই সন্ধ্যার পর বিদায় নেবার প্রস্তাব করতেই শ্যামা সরাসরি তা নাকচ ক'রে দিলেন।

'তা কখনও হয়! এই অন্ধকারে অজানা অচেনা জায়গায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি কখনও।...ও বাড়ির কোন নাতিটাতি এসে পড়লেও না হয় সঙ্গে দিতুম, কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসত।··আর তার অত দরকারই বা কি, গরীব বেয়ানের কাছে এসে পড়েইছেন যখন—তখন কষ্টসৃষ্ট ক'রে একটা রাত না হয় কাটিয়েই যান না!'

অগত্যা বিনতার মাকে রাজী হ'তে হ'ল। তবে তিনি হাতজোড় ক'রে বললেন, 'কিন্তু ভোরবেলাই ছেড়ে দেবেন বেয়ান, মানে এখানে তো আর—'

'সে আমি জানি। নাতি হয় নি এখনও—এখানে ভাত খেতে বলবই বা কেন?'

কুটুম্ব মানুষ—এই প্রথম এসেছেন। তাঁকে আর কিছু ক্ষুদ-ভাজা কি চাল-ভাজা খাইয়ে রাখা যায় না। অগত্যা শ্যামাকে গিয়ে উনুন জ্বেলে রুটি গড়তে বসতে হ'ল। রুটি আর ভালরকম একটা কিছু তরকারি, ডালনা জাতীয়। বিনতা রাঁধে মন্দ নয়, কিন্তু বৌয়ের মায়ের জন্যে তাঁর সামনেই বৌকে রাঁধতে পাঠানো অনুচিত, তাছাড়া তাদের চিরদিন কয়লার জ্বালে রাঁধা অভ্যাস—কাঠ কি পাতার জ্বলে রুটি ভাল গড়তে পারেও না সে। রুটির পাটও কম এ বাড়িতে—শেখার সুযোগও মেলে নি। সুতরাং শ্যামাকে নিজেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে। বিনতাকে এই অবসরে ঘরদোরের পাট সেরে নিতে বললেন, বিছানা একটা বাড়তি চাই আজ, বেয়ানের জন্যে। আজ আর ছেলের কাছে বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিতেই সে অনেকটা ভাল

আছে আজ, তার ওপর শুশ্রূষা করার লোকও আছে আর একজন। তার শাশুড়ীই কাছে বসে বাতাস করছেন, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মিছিমিছি আর একটা লোক সেখানে জোড়া হয়ে বসে থেকে লাভ কি?...

শ্যামা একমনে বসে রান্না করছেন, হঠাৎ বিনতা এসে পিছন থেকে দারুণ উত্তেজিতভাবে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে উঠল, 'আমি এ সব কিন্তু ভাল বুঝতি না মা, আপনি দা হয় এর একটা বিহিত করুন!'

বিনতার উচ্চারণ এমনিই কেমন একটু আধো-আধো—উত্তেজিত হ'লে আরও জড়িয়ে যায় কথাগুলো। সে উত্তেজনার কারণও যে খুব বেশী—তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ বিছানা করতে করতেই ছুটে এসেছে—হাতে তার এখনও বিছানাঝাড়া খ্যাংরাটা ধরা।

শ্যামা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী ভাল বুঝছ না বৌমা, কী হয়েছে?'

'না, না, মা-ই হোক আর যা-ই হোক, সত্যি কথা বলব তার অত ঢাকাঢাকি কিসের। মার কি উচিত অত বড় জামাইয়ের মশারীর মধ্যে ঢুকে তার মাথা টিপে দেওয়া? হ'লই বা শাশুড়ী—এমন কি বয়স হয়েছে মার!...না না, আপনি বারণ করুন মা!'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শ্যামা। এ বধূ সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়ের বোধ করি শেষ হবে না। বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা নমস্কারের ভঙ্গী করে বললেন, 'ধন্যি মা ধন্যি, তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!...আমার গলা কেটে ফেললেও আমি গিয়ে এমন কথা তোমার মাকে বলতে পারব না, বলতে হয় তুমিই বল গে।...ওঃ, আমার কান্তির বরাতকেও বলিহারি যাই—কোন্‌ নির্জনে বসে এমন বৌয়ের জন্যে তপস্যা করেছিল!'

মেঘের মতো অন্ধকার মুখ ক'রে বিনতা চলে গেল দুপ দুপ ক'রে পা ফেলতে ফেলতে, 'বলবই তো, বেশ—না হয় আমিই বলব। অত ভয় কিসের? নিজের সোয়ামীর ভাল-মন্দর কথা যেখানে, সেখানে অত ঢাক্‌-ঢাক্‌ চক্ষুলজ্জা করতে গেলে চলে না। খারাপ দেখায় বলেই বলা! তা নয়—সবই আমার দোষ। ভাল কথা বললেও দোষ।...তপিস্যে—কী তপিস্যের বর রে আমার!'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাপা গলায় গজগজ করে সে। তবে শেষ পর্যন্ত—কে জানে কেন—কান্তির ঘরের দিকে আর যায় না, ও ঘরে গিয়েই বিছানা করতে শুরু করে আবার।

॥ ২ ॥

অভয়পদর পরে অম্বিকাপদর পালা। অভয়পদর চাকরি যাবার মাসকতক পরে তাকেও হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ঘরে এসে বসতে হ'ল। রিটায়ার করার কথা তার নাকি আরও আগেই—বহু কৌশল ক'রে নানা ব্যক্তিকে ধরে-পাকড়ে, ক্ষেত্রবিশেষে দু'চার টাকা ঘুষ খাইয়ে এতকাল টিকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আর তা কিছুতেই বাঁচানো গেল না। এবার সত্যিসত্যিই গেল চাকরিটা।

অবশ্য তাতেও কোন সান্ত্বনা পেল না মহাশ্বেতা। কারণ চাকরি যাবার কিছুদিন আগেই মেজকর্তা তার বড় ছেলেটিকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এখন শোনা গেল মেজটিরও একটা হিল্লে হবে। খোদ ছোটসাহেব নাকি কথা দিয়েছেন—

কোথাও একটা টুল খালি হলেই বসিয়ে দেবেন তাকে।

সুতরাং জ্বালা বেড়েই গেল বরং। মহাশ্বেতার একটি ছেলেরও হিল্লে হয় নি আজ পর্যন্ত। কেষ্টপদর বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে প্রস্তাবটা মুখে আনতে পারে নি মহাশ্বেতা। শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উচ্চ ধারণা থাকলেও এটা সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার বা তার স্বামীর হাতে যখন একটি পয়সাও নেই, তখন তার তরফ থেকে আর কোন খরচা বাড়ানোর কথা মুখে আনা উচিত নয়।

সে অম্বিকাপদর প্রথম ছেলেকে চাকরিতে ঢোকাবার সময় 'শয়তান', 'কুচক্কুরে', 'একচোখো' প্রভৃতি বলে গালাগাল দিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিল, কিন্তু পরেরটির আসন্ন চাকরির সংবাদে একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। তার মানে ওরা সব দিক দিয়েই গুছিয়ে নিলে। চাকরি—তা সে যেমনই হোক—মহাশ্বেতার কাছে চাকরি মানেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান—চাকরি মানেই—নিরাপদ নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছন্দ জীবন; বিয়ে, ছেলেপুলে হওয়া, আবার তাদের মানুষ হয়ে ওঠা—একটার পর একটা আপন নিয়মেই চলবে।

ওদের সব হ'ল—তারই কিছু হ'ল না। কেন হ'ল না তা অবশ্য প্রথম প্রথম যথেষ্ট বোঝাবার চেষ্টা করেছে অম্বিকাপদ। তার ছেলেরা তবু কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ম্যাট্রিক পাশ করতে না পারুক, ঘষে ঘষে কোনমতে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত উঠেছে, ইংরেজী হরফ চেনে, সাধারণ দু'-একটা কথার মানে বোঝে—ইংরেজী হরফে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারে। মহার ছেলেরা কিছুই জানে না, বাংলাও পড়তে পারে না ভাল করে। ওদের মধ্যে একমাত্র ন্যাড়াই যা চার-পাঁচ ক্লাস পড়েছিল ইংরেজী ইস্কুলে। এ অবস্থায় ওদের কোন অফিসে চাকরি হওয়া অসম্ভব। বড়বাবুই হোক আর খোদ সাহেবই হোক—এখন আর কারুর দ্বারাই সম্ভব নয় এমন অঘটন ঘটানো। এক বেয়ারার চাকরি হ'তে পারে, পনেরো টাকাতে ঢুকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত মাইনে—ওতেই জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু তাও, অম্বিকাপদ যেখানে সসম্মানে এতদিন 'বাবু'র কাজ ক'রে এসেছে, যেখানে তার ছেলেরা 'বাবু'র কাজে বসেছে বা বসবে,—সেখানে নিজের ভাইপোদের সাত্তিকজাতের এঁটো গেলাস ধোবার জন্যে বেয়ারার কাজে লাগাতে পারবে না সে।

কিন্তু এসব কথা মহাশ্বেতার বোঝার কথা নয়। তখনও বোঝে নি, এখনও বুঝল না। তখন নিষ্ফল আক্রোশে গজরেছিল এখন কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। জিতে গেল ওরা, জিতে গেল! একপুরুষেই নয়, পুরুষানুক্রমেই ওদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে তাকে বা তাদের। বড় হয়েও কোনদিন বড়র সম্মান পেল না সে। আর কোনদিন পাবে না। কোথায় একটা ব্যর্থ আশা পোষণ করেছিল মহাশ্বেতা এতদিন যে, একদিন না একদিন এই অবিচারের প্রতিকার হবে, একদিন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে সে, নিজের প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কি ক'রে সেটা ঘটবে তা সে জানে না, কখনও তলিয়ে ভেবে দেখে নি, যা হোক ক'রে হবেই কোন উপায়—এই আশ্বাসটুকু ধরে ছিল শুধু। সেই আশাতেই আরও সে পাগলের মতো টাকা ধার ক'রে এনে অভয়পদর হাতে তুলে দিয়েছিল অপরকে ধার দেওয়ার জন্য, অকল্পিত সুদের লোভে। অন্তত টাকাও যদি খানিকটা হাতে আসত তা হ'লে দেখে নিত সে ওদের সামনে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে পারত। তাও হ'ল না, ভগবান চিরদিনই ওদের দিক টেনেছেন, আজও টানছেন।

এক-একবার এই অসহায় নৈরাশ্য—এই দিকদিশাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা

যেন নিজে আর বইতে পারে না মহাশ্বেতা--ছুটে যায় স্বামীর কাছে, 'ওগো এদের কথাটা কি ভাবছ? কি গতি হবে এদের? চিরকালই কি ভিক্ষের ভাত খেয়ে কাটাবে? সেও যতদিন তুমি আছ, তারপর তাও জুটবে কি?'

অভয়পদ আজকাল অনেকটা সামলে উঠেছে, প্রথম দিককার মতো স্থবির হয়ে আর বসে থাকে না--বাগানে টুকটাক এটা-ওটা ক'রে বেড়ায়। বলতে গেলে সারা দিনটাই বাগানে কাটায়, সন্ধ্যার পর এসে নিজের চিরাভ্যস্ত বোঁচকাটাতে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারেই শুয়ে থাকে। তবে ঘুমোয় না যে—সেটা টের পায় এরা। বহু রাত অবধিই ঘুমোয় না। হয়ত বা সারারাতই জেগে থাকে এক একদিন।

স্ত্রীর আকুল প্রশ্নেও তার অবিচল স্থৈর্য নাড়া খায় না। উদাস স্তিমিত চোখ দুটো অপর কোন বস্তুর ওপর নিবদ্ধ ক'রে জবাব দেয় সে, 'কী জানি। আমি আর কি করব বলো, আমার আর কি হাত!'

'তাহ'লে কি এরা উপোস ক'রে মরবে?'

'ভাগ্যে থাকে তাই মরবে। আমি আর কি তাতে বাধা দিতে পারব? ভাগ্যই সব। মানুষের চেষ্টাতে যে কিছু হয় না তা তো দেখলেই।'

'তা কোন কারখানা-মারখানাতেই না হয় ঢুকিয়ে দাও না। মেজকত্তা তার নিজের আপিসে ছেলেকে ঢুকিয়ে ব্যবস্থা করে তবে বেরুলো। তোমাদের তো আসলে কারখানাই--তুমি তো সেখানে ছিলে এতকাল--সেখানে ঢোকাতে পারবে না? আজ-কাল তো অনেক ভদ্দরঘরের ছেলে শুনেছি লোহাপেটার কাজ করছে!'

'সে আগে চেষ্টা করলে হ'ত। আমি থাকতে থাকতে বললে হয়ত এক-আধটাকে ঢোকাতে পারতুম। তাও ওরা পারত না অবিশ্যি। লোহা পিটিয়ে খেটে খাবার ক্ষমতা ওদের নেই। তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারত। কিন্তু এখন আর আমার কোন হাত নেই। আমার পুরনো সাহেবরা সবাই চলে গেছে। তারা থাকলে আমার চাকরিই বা যাবে কেন? পুরনো বড়বাবুরাও কেউ আর নেই। যারা আছে তারা আমার কথা রাখবে না।'

বক্তব্য শেষ ক'রে নিতান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবেই আবার নিজের কাজে মন দেয় অভয়-পদ। যেন আর কোন স্বল্পপরিচিত কারও ভবিষ্যতের কথা, কোন পরস্যাপি পরের প্রসঙ্গ তুলেছিল মহাশ্বেতা। চিরদিন এই রকম। কখনও ওর দিকে, ওর ছেলেদের দিকে তাকাল না মানুষটা। কখনও ওদের কথা ভাবল না। স্ত্রী না হয় শত্রু, না হয় মনের মতো হয় নি—এরা তো নিজের ছেলে। কে জানে, কোনদিনই স্বামীর মনের তল পেল না সে।

নিজের মনের তল অভয়পদই পেয়েছে কি কোনদিন?

ভবিষ্যতের চিন্তা তার স্বভাববিরুদ্ধ, কোনদিনই করে নি—আজ নতুন করে শুরু করবে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু অতীতের চিন্তাও তো আগে কোনদিন করে নি, সেটা কেন এখন নতুন করে পেয়ে বসল তাকে?

এক একসময় নিজেই অবাক হয়ে যায়—নিজের মনের চেহারা দেখে। গীতা পড়ে নি সে বহুদিন অবধি, গীতা কেন—কোন বই-ই বিশেষ কখনও পড়ে নি—পরে এক-আধদিন দু'চারজনের কাছে গীতার কথা শুনে একটা বাংলা পদ্য গীতা যোগাড় ক'রে পড়েছে, এখনও পড়ে মধ্যে মধ্যে। না, সে সব কিছু নয়।

—নিজের মনে মনে, কবে যেন কোন্ সুদূর কৈশোরে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল সে, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নির্লিপ্ত জীবন যাপন করবে। সংসারে থাকবে কিন্তু তাতে বদ্ধ হবে না। পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। হাঁস যেমন জলে থাকে অথচ জল তার

দেহের কোথাও লাগে না—তেমনই থাকবে সে সংসারের সহস্র আসক্তির মধ্যে।

এ কি কারও কথা শুনে কি কোন উপদেশে হয়েছিল? কে জানে, আজ আর তা মনেও নেই। সম্ভবত কারও মুখে এক সাধুর উপদেশের কথাই শুনেছিল সে। তবে সে কোন্ সাধু তা বলতে পারবে না। পরমহংস ঠাকুর কিংবা আর কেউ। তবে ঠিক সেই উপদেশেই এটা হয়েছে কিনা তারই বা ঠিক কি। আজ সবটাই যেন গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে, কিছুই পরিষ্কার মনে পড়ে না। হয়ত কোন একজনের কথায় হয়ও নি। ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে সঙ্কল্পটা মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাতেই বা লাভ কি হল? পারল কি সেদিনের সে প্রতিজ্ঞা পালন করতে? সে সংকল্পে অবিচল থাকতে? আসলে সে শক্তি ওর কোন দিনই ছিল না। একটা মিথ্যা অহঙ্কারকেই বুঝি এতকাল মনে মনে লালন করেছে—নিজেকে স্তোক দিয়েছে। কিছুই হয় নি তার, সাধনার সিদ্ধি মেলা তো দূরের কথা। যা মিলেছে তা হচ্ছে তার স্পর্ধার উত্তরে বিধাতার পরিহাস।

কৈ, দুর্দান্ত অর্থলোভ তো ছাড়তে পারে নি সে। কিসের নিরাসক্তি যদি ঐ স্থূল লোভটাই না ত্যাগ করতে পারল। ঐ লোভই তো তাকে কত না দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত করাল, শেষ অবধি সেই লোভের কাছেই চরম মার খেতে হ'ল তাকে। একেই হয়ত ব'লে ভগবানের মার, বিধাতার বিচার!

অহঙ্কার! আসলে সে অহঙ্কারের সাধনা করেছে বসে বসে। এখনও তার চৈতন্য হয় নি—বসে বসে আহত অহঙ্কারটাকেই সযত্নে লালন করছে সে।...

কাজ করতে করতে হাত থেমে যায় তার, মন অতীতের রোমন্থনে মগ্ন হয়ে পড়ে। সে মূর্খ, লেখাপড়া শেখে নি ; কারখানায় কাজ করা যাকে বলে—হাতে-কলমে যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা—তাও খুব বেশীদিন করে নি সে—সাহেবদের স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে 'স্টোরে' চলে গেছে সে কবেই। বাবুও নয় বেয়ারাও নয়—এমনি একটা কাজে রেখে দিয়েছিলেন সাহেবরা। পদটা যা-ই হোক, শেষ অবধি কার্যত সে-ই স্টোরের সর্বেসর্বা ছিল আর সেই সুযোগেই যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা রোজগারও করতে পেরেছিল।

সে কথা থাক। তখনকার দিনে সাহেবরা যোগ্যের মর্যাদা বুঝতেন। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ক-খ পড়া না থাকলেও যন্ত্রবিদ্যায় অভয়পদর একটা স্বভাবজ জ্ঞান ছিল ; ওদিকে মাথা খেলত তার অসম্ভব। শুধু নক্সা দেখে দেখে অনেক জিনিস শিখে গিয়েছিল সে। জটিল যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার ঠেকত। একদিন দৈবাৎ সেই পরিচয় পেয়েই ওদের এক সাহেব কারখানায় কাজ করার দায় থেকে অব্যাহতি দেন ওকে। তিনি ঝোঁকের মাথায় কোম্পানীর খরচে ওকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন—কিন্তু অভয়পদই রূঢ় তথ্যের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে শেষ পর্যন্ত। যে ইস্কুলেই পড়ে নি বলতে গেলে—তাকে ইঞ্জিনীয়ার করা দু-এক বৎসরের কাজ নয়।

তারপর বহুদিন বহু সাহেবই ওকে নিজেদের কামরায় ডেকে পাঠিয়েছেন—নক্সা খুলে দেখিয়ে ওর পরামর্শ চেয়েছেন। সঙ্গে ক'রে যন্ত্রশালায় নিয়ে গেছেন—অচল যন্ত্রের কোথায় কি গোলমাল ঘটেছে বুঝিয়ে দিয়েছে সে। নক্সার ভুলত্রুটি ধরে দিয়েছে, দুর্বোধ্য অংশ বুঝে নিতে সহায়তা করেছে। এই তো সেদিনের কথা, হাওড়ার ভাঙ্গা পুল মেরামত করার ঠিকা নিয়েছিল তাদের কোম্পানি। বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার এসে দেখে গিয়ে নক্সা পাঠিয়ে দিয়েছিল, সে নক্সা এদের মাথাতে

ঢুকছিল না। তখন অভয়পদ পিঠে ,একটা প্রকাণ্ড কার্বাঙ্কল হয়ে শয্যাশায়ী, ডাক্তার এসে কেটে দিয়ে গেছে—চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে বলেছে। সাহেবরা স্ট্রেচার আর গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন অফিসে, যে অংশটা এখানকার আট-দশ জন মিলেও বুঝতে পারছিল না—সেই অংশটা ওকে দেখাবামাত্র বুঝিয়ে দিয়েছিল সে, বড়সাহেব খুশী হয়ে ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে—বকশিশ।

সেই কারণেই কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, যতদিন জীবিত থাকবে সে, ততদিন তার চাকরি যাবে না এ আপিস থেকে। আর যদিই কোনদিন অথর্ব হয়ে পড়ে ছুটি চায় তো সাহেবরা তার একটা পেন্সনের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন —কিম্বা একটা মোটা গোছের থোক টাকা দিয়ে বিদায় দেবেন। এমন দিয়েছেনও ইতি-পূর্বে—কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে। কিন্তু কিছুই পেল না সে, কিছুই মিলল না। এই দীর্ঘদিন সেবার কোন স্বীকৃতিই মিলল না। বরং কেমন যেন রূঢ় হস্তেই— আবর্জনার মতো সরিয়ে দেওয়া হ'ল তাকে।

এও সেই লোভ। অতিরিক্ত লোভের জন্যই এমন হ'ল। বহুদিন আগেই অবসর নিতে পারত সে। পুরো মাইনের মায়ায় প্রাণপণে চাকরিটা আঁকড়ে ধরে ছিল। তদ্বির করেছে যাতে তার এই দীর্ঘকাল চাকরির কথাটা সাহেবদের কানে না যায়। সে মায়া যদি না করত, পুরনো সাহেবরা থাকতে থাকতে যদি অবসর চাইত, তা'হলে কিছু একটা সুব্যবস্থা তাঁরাই করে দিতেন। এখন নতুন আমল, নতুন লোক। তারা একটা লোককে এতকাল চাকরির সুযোগ দেওয়ার জন্যে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। পুরনো সাহেবদের নির্বোধ খেয়াল বলে ধরে নিয়েছে এরা। কোন এক বৃদ্ধ কর্ম-চারী অভয়পদর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের কথা বলতে গিয়েছিল—তারা হো হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'তখনকার দিনে যে-সব সাহেব এসেছে, তারা নিজেরাও কেউ লেখাপড়া জানত না—তাই ঐ মূর্খ বৃদ্ধকে নিয়ে নাচানাচি করেছে। এটা ইংরেজ জাতি এবং সমগ্রভাবে শিক্ষারই অপমান। 'আমাদের কোন দরকার নেই ঐ ফসিলকে, আমরা যথেষ্ট পড়াশুনো ক'রে এসেছি।'......

শুধু তাই নয়—টাকা ধার-দেওয়ার ব্যাপারেও তারা সমস্ত অপরাধ অভয়পদর ঘাড়েই চাপিয়েছে, একজন স্থানীয় লোকের লোভের ফলে একটি ইংরেজের অকাল-মৃত্যু হ'ল—এ চিন্তাও তাদের কাছে অসহ্য।...আরও শুনেছে তারা, গত যুদ্ধের সময় স্টোরের বহু মাল পাহারার মধ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথাও কানে গেছে তাদের। এসব জেনেও আগের সাহেবরা ওকে তাড়িয়ে দেন নি—এইতেই বিস্মিত বোধ করেছে। এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছে যে—হয়ত ওর সঙ্গে তাঁদের কোন ভাগের বন্দোবস্ত ছিল নইলে এটা বরদাস্ত করেছিলেন কী ক'রে? তাই কোম্পানীর দেহে পুরাতন বিষাক্ত ক্ষত মনে করেই ওকে সরিয়ে দিয়েছে তারা, ঘৃণা ও অবজ্ঞায়। কোন সহানুভূতি কি বিবেচনার পাত্র মনে করে নি।......'দ্যাট্ ওল্ড্ মিসচিভাস্ ম্যান'—দীর্ঘদিন চাকরির পর নিজের সম্বন্ধে ওপরওলাদের এই ধারণা ও অভিযোগ নিয়ে নিঃশব্দেই সরে আসতে হয়েছে ওকে—কোন প্রতিবাদ কি প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় নি।......

অপরিসীম আত্মগ্লানিই বোধ করার কথা। নিজেরই অসংখ্য নির্বুদ্ধিতার গ্লানি আর অনুশোচনা। করছেও তাই। আর বোধ করি সেটা থেকে অব্যাহতি পেতেই তার মন বরাবর চলে যাচ্ছে সেই দূর অতীতে, সেই অহঙ্কারের ক্ষেত্রগুলিতে—যখন বহু শত এমন কি সহস্রাধিক টাকা বেতনের সাহেব মনিবরা উদ্বিগ্ন মুখে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন, আর ও স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ অভিভাবকের মতোই মধুর হাস্যে

তাঁদের বরাভয় দিত আর—শিশুদের অকারণ উদ্বেগ যেমন সস্নেহে ও সপ্রশ্রয়ে অথচ অতি সহজে দূর করে দেন তার পিতা-পিতামহরা—তেমনি ভাবেই দূর করে দিত তা। সে সময় বিনয়-হাস্যের মধ্যেও অহঙ্কারের পরিতৃপ্তিতে মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠত ওর।

ন্যাড়ার বিয়ের কথাটা মেজকর্তা নিজেই তুলল। একেবারে হঠাৎ! এ নিয়ে যে কোন কথাবার্তা চলছে বা ছেলে-মেয়ে দেখাদেখি হচ্ছে তা কেউই জানত না—বোধ হয় মেজগিন্নীও না। একেবারেই না-বলা-কওয়া সেদিন মহাশ্বেতাকে ডেকে বলল অম্বিকাপদ, 'ন্যাড়ার জন্যে মেয়ে মোটামুটি আমি একটা দেখে পছন্দ করেছি—তোমরা কেউ দেখতে চাও? কিম্বা আর কাউকে দেখতে পাঠাবে?'

কথাটা বুঝতে অনেক দেরি লাগল মহাশ্বেতার, সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেওরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কতকটা অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করল, 'কি দেখবে বলছ—? মেয়ে? মানে বে?......কার বে?'

'কার আবার—ন্যাড়ার বে গো, ন্যাড়ার। ও ছাড়া এখন বের যুগ্যি আর কে আছে বাড়িতে?'

'ন্যাড়ার বে? এখন? বলি আমি তো আর পাগলও হই নি, আর ছন্নও হই নি এখন ওর বের কথায় নেচে উঠব! বে ক'রে খাওযাবে কি ন্যাড়া মাগ ছেলেকে তাই শুনি? একা একটা পুরুষমানুষের দিন চলে যাবে, নিদেন মোট বয়েও খেতে পারবে, কিন্তু যার এক পয়সার রোজগার নেই সে বে করবে কি অনথক ন্যাঙ্গারি হয়ে শুকিয়ে মরবার জন্যে?—না নিজের ছেলেমেয়ে একটা একটা ক'রে চোখের সামনে না খেয়ে মরবে—সেইটে বসে দেখবে বলে?'

'কেন? বুড়োর বৌ কি খেতে পাচ্ছে না?' অম্বিকাপদ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ—তা পাচ্ছে। মানছি! কিন্তু সে তো তোমার দয়া বই নয়। দয়া ক'রে দিচ্ছ তাই। তবে সে হয়ত একটা বলেই দিচ্ছ—গুষ্টিসুদ্ধকে যে তুমি এমনি চারকাল বসে খাওয়াবে—তার কোন লেখাপড়া আছে! পয়সা তো তোমার, তোমাকেই তো বুক-পোঁতা ক'রে দিয়েছে। এখন তুমি দোব না বললে জোর তো কিছু নেই!...তাছাড়া জীবন-মরণের কথাও আছে একটা। তুমি দিচ্ছ—তোমার ছেলেরা যদি না দেয়?... না, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—এর একটা কিছু হিল্লে না হ'লে ওকাজে যেতে দোব না।......তোমার এত মাথাব্যথা তো তোমার ছেলের জন্যে, আমি বলছি তুমি তোমার বেটার বে দাও গে, তাতে কিছু দোষ হবে না। আমি কোন দোষ ধরব না অন্তত! যে যেমন বরাত নিয়ে এসেছে তাকে তাই ভোগ করতে হবে—মিছিমিছি পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না অম্বিকাপদ। বুড়োর বিয়ের কথা মহাশ্বেতাই তুলেছিল, তোলাই শুধু নয়, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উত্ত্যক্ত ক'রে মেরেছিল সকলকে। এত হিসেব-নিকেশ তখন শোনা যায় নি। এ ধরনের কথা ওর মুখে একেবারে বেমানানও।

অম্বিকা জানে না, জানতে পারে নি—মহাশ্বেতা এই গত কমাসে অনেক শিখেছে। এতদিন যে জ্ঞানটা তাকে কেউ দিতে পারে নি—সেটা আপনিই তার মনে উদয় হয়েছে। চারদিক অন্ধকার ঠেকতে নিজে-নিজেই বুঝেছে সব। আগে জানবার চেষ্টা করে নি বলেই জানে নি। এখন ছোটবৌকে আড়ালে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে

নিয়েছে। ওদের সম্পত্তি বলতে এই বাস্তু ছাড়া তাদের মোট ষোল বিঘে ধান-জমি আছে আর একখানা বাগান।...তার তিন বখরার এক বখরা পেতে পারে তার ছেলেরা। ছ'জন ছেলের পাঁচ বিঘে জমি—ভরসার মধ্যে তো এই। বাকী যা সবই মেজকর্তার। কোথায় একটা বাড়ী কিনেছে—সে মেজগিন্নীর নামে। ভাগের ভয়েই স্ত্রীর নামে কিনেছে। টাকা কম নেই তো হাতে। বড় ছোট চিরকাল সবই এনে ওকে ধরে দিয়েছে। ছোটর অবশ্য আলাদা কিছু আছে, চাকরি ছাড়লেও মোটা টাকা পাবে আপিস থেকে। তারাই শুধু নিঃস্ব।

অবশ্য, ছোটবৌ যা বলে, মেজকর্তা নিজে টাকা বাড়িয়েছেও ঢের। এদিকে ওর মাথা খুব। তেজারতি তো আছেই, ইদানীং আর একটা কারবার ধরেছে, বাড়ি বেচা কেনার কারবার। পুরনো বাড়ি কম দামে কিনে সারিয়ে-সুরিয়ে চকচকে ক'রে অনেক বেশী দামে বেচে দেয়। বলে, 'এতে লোকসান যাবার ভয় নেই, বসে তো থাকে না—সুবিধেমত দাম পাই ভাল—না পাই ভাড়া বসিয়ে দেব। তাতেও লাভ।' আরও বলে 'শেয়ারের বাজারে ফাটকা খেলে, কি দাদার মতো চড়া সুদের লোভে শুধু-হাতে টাকা দিয়ে হঠাৎ নবাব হ'তে চাই না আমি। তার চেয়ে এ অল্প লাভের কারবার আমার ঢের ভাল!'

মহাশ্বেতা প্রতিপক্ষের অভাবে তরলার ওপরই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'বলি তাতেও তো পয়সা লাগে লো! এ তো সব কারবারই—যা যা বলছিস—মোটা টাকার খেলা। সে টাকা তো আর কেউ যোগায় নি। এই বড়কর্তাই এনে হাতে তুলে দিয়েছে। তাতে তো কোন সন্দ নেই আর।...তবে? ওর উচিত নয় এর ছেলেদের ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া—কি এদের নামে কোন সম্পত্তি ক'রে দেওয়া?'

তরলা কোন উত্তর দিতে পারে নি। শুধু ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলেছিল, 'তা উনি তো তেমনি গোটা সংসারটা টেনেই যাচ্ছেন—বিয়ে পৈতে সব খরচাই তো কর-ছেন, কারও কাছে তো কিছু চান নি কোনদিন'

'হ্যাঁ তা করছেন কিন্তু সে তো ভিক্ষে। আমাদের হক্কের ধন যা তার জন্যে ওদের হাত-তোলায় থাকব কেন আমরা—কিসের জন্যে?'

এ সবই পুরনো কথা, পুরনো যুক্তি।

নতুন যা—তা নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। তাইতেই তার কণ্ঠে এই অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ফোটে আজ।

অম্বিকাপদ একটু অসহায় ভাবেই বলে, 'তা কেন। সে আমার ছেলের বে দু বছর পরে হ'লেও চলবে। একেবারে তো অরক্ষণা হয়ে পড়ে নি। ন্যাড়ার কথাই ভাবছি, বয়স তো ওর ঢের হয়ে গেল। আর কবে বে করবে বলো!'

'তা হোক। বয়স যতই হোক, কিছু একটা না হ'লে—অন্তত মাসে দশটা টাকাও আমদানীর পথ না হ'লে ছেলের বে দিতে দোব না আমি—এই সাফ বলে দিলুম!'

বোধ করি এই দৃঢ়তাতেই খানিকটা কাজ হয়।

দিন-আষ্টেক পরেই একদিন দাদার কাছে এসে কথাটা তুলল অম্বিকাপদ, মহা-শ্বেতা সামনেই ছিল, তার শোনবার কোন অসুবিধে নেই দেখেই সে কথাটা সেই সময় পেড়েছিল—নিহাৎ সোজাসুজি বৌদির কাছে কথাটা পাড়তে বোধহয় আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে ব'লেই। বলল, 'খটির বাজারে একটা ঘর দেখেছি দাদা, মনে করছি এদের একটা ছোটখাটো ডাল-মশলার দোকান ক'রে দেব। ইচ্ছে হ'লে চালও রাখতে পারবে। বুড়ো, ন্যাড়া, ধনা—এরা তো দিনরাত বসেই থাকে, সবাই মিলে যদি লাগে—বাড়তি লোকও লাগবে না, চুরিরও ভয় থাকবে না।'

অভয়ের মুখে কোন ভাব পরিবর্তন হয় না এ প্রস্তাবে। শুধু বলে, 'পারবে কি চালাতে? শুধু শুধু কতকগুলো টাকা নষ্ট করবে না তো? সব জিনিসেরই শিক্ষা দরকার, ব্যবসা করতে গেলেও সেটা শেখা দরকার। ওরা তো কিছুই শিখল না—'

'না, আমি মনে করছি এখন খুব কম টাকা ঢালব, ছোটখাটো দোকান— আমাদের এ বাজারে অশ্বিনী যেমন দোকান করেছে তেমনি। শ'পাঁচেকের মতো খরচ করব আপাতত। তারপর—তেমন বুঝলে, ওদের যদি সে রকম আগ্রহ দেখি, আর কিছু দিলেই হবে। তাছাড়া হিসেব-পত্রগুলোও আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখতে পারব—একেবারে নয় ছয় করতে পারবে না!'

'দ্যাখো—যা ভাল বোঝ করো গে। আমি আর কি বলব।'

সংক্ষেপে এইটুকু বলেই সব দায়িত্ব নামিয়ে দেয় অভয়পদ।

মহাশ্বেতার কাছে প্রস্তাবটা এমনই অভিনব, এমনই অকল্পিত যে প্রথমটা সে কোন কথাই বলতে পারে নি। এইবার সে একটু ক্ষীণ আপত্তির সুরে বলে, 'মুদিখানা! ভদ্দরলোক বামুনের ছেলে মুদির দোকান দেবে!'

অম্বিকা জবাব দেয়, 'ভদ্দরলোক বামুনের ছেলেকে তো লোহাপেটা কারখানায় দিতে চাইছিলে, তার চেয়েও কি এ কাজ খারাপ? এ তো স্বাধীন ব্যবসা। লেগে থেকে চালাতে পারলে ঐ থেকেই লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে পারবে!'

কথাটা অবিশ্বাস্য, সে বরাত তার নয়— তা মহাশ্বেতা ভাল রকমই জানে। লাখে দরকার নেই, এখন কোনমতে দিনগুজরানের মতো কিছু হলেও তো হয়। তা-ই হবে কি? পারবে কি ব্যাটারা চালাতে?

তবু সংশয়ের মধ্যেও কোথায় যেন আশা ও আশ্বাসের আভাস পায়। কিছু তো একটা হচ্ছে। যাই হোক—তবু তাদের নিজস্ব কিছু।

সে মনে মনে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে পুজো মানত করে। যেদিন দোকান খোলা হবে সে দিন সে আলাদা পুজো দেবে। পুজো আর হরির লুট!

॥ ৩ ॥

রানীর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে সেটা সবাই লক্ষ্য করলেও ঠিক যে এতটা খারাপ হয়েছে তা কেউ বুঝতে পারে নি। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে সকলকার খেয়াল হ'ল।

আসলে রানীই বুঝতে দেয় নি কিছু, যতটা পেরেছে যতক্ষণ পেরেছে সংসারে খেটে গেছে। এবার আর পারল না--একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল।

কমলা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরও শরীর ভেঙ্গেছে দস্তুর মতো। বর্ষা পড়লেই পেট ছেড়ে দেয়, হাত-পা ফুলে ওঠে। এই বৌই তম্বির-তদারক করে টোটকা-টুটকি খাইয়ে কোন মতে সারিয়ে তোলে। শীতকালটা ভাল থাকেন তিনি গরমটাও কোন মতে কাটে—বর্ষা পড়লেই আবার যে-কে সেই। কিন্তু ভালই থাকুন আর মন্দই থাকুন, খাটবার শক্তি তাঁর একেবারেই চলে গেছে। নতুন বাড়িতে এসে উৎসাহের প্রাবল্যে দিনকতক খুব খেটেছিলেন—এখন আর মোটেই পারেন না। কোন মতে বসে রান্না করতেও কষ্ট হয় তাঁর। এই বৌয়ের ওপরই ভরসা। বৌয়ের চেহারা যে দিন দিন শুকিয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে তা তিনিও দেখেছেন—শ্যামা তো বহুবারই বলেছেন তাঁকে, কিন্তু তিনি কি করবেন—কীই বা করতে পারেন! তাঁর

যতটুকু সাধ্য—সামান্য সামান্য চিকিৎসা করিয়েছেন, য়্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, টোটকা, দৈব। সাধ্যে আর সময়ে যতটুকু কুলিয়েছে।

গোবিন্দ কিছুই পারে না। তার আপিসের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ভরসা করে ওখানটা ছাড়তে পারলে হয়ত অন্য কোথাও কাজ পায় এখনও—কিন্তু সেই ভরসাটাই ওর নেই। চিরদিন, বলতে গেলে বাল্যকাল থেকে, এক জায়গায় কাজ করে এসে—অন্য কোথাও যে কাজ পাওয়া সম্ভব, বা সে কাজ পাওয়ার জন্যে কীভাবে চেষ্টা করতে হয়—সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তার। এ চাকরিও পেয়েছে সে বিনা-তদ্বিরে, না চাইতেই ; বন্ধু এসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে, কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লোকমুখে শুনেছে, নিতাই শোনে যে, চাকরির বাজার খুব খারাপ। ভয়ও হয় তার—এই বাজারে কোথায় আবার চাকরি খুঁজতে বেরোবে সে, কার কাছেই বা যাবে! সুতরাং সেইখানেই পড়ে আছে সে—কাজ কমে নি, মাইনে বরং আরও কমেছে।

না, চাকরি ছাড়তে পারে নি সে। যেটা পেরেছে সেটা হ'ল এক বইওলার কাছে উপরি কিছু কাজ যোগাড় করতে। তাঁদের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া, প্রুফ দেখা, কপি-বুকের নক্সা করা—মায় ভূগোলের বইয়ের ম্যাপ আঁকা—সবই করতে হয় তাকে প্রয়োজনমতো—তার জন্য পারিশ্রমিক মেলে মাসিক কুড়িটি টাকা, তাও তিন-চার কিস্তিতে। গোবিন্দর হাতের লেখা ভাল—ম্যাপের কাজ করে করে খুব পরিষ্কার লিখতে শিখেছে, ছাপাখানা সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান আছে, সব মিলিয়ে ওকে পেয়ে তাঁদের সুবিধা হয়েছে ঢের, হয়ত চেপে ধরলে তাঁরা আর কিছু বাড়িয়েও দিতে পারেন—কিন্তু সেটুকু জোর করবারও সাহস নেই ওর।

তবু এটা মন্দের ভাল। মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে, পেট বেড়েছে, শুধু খাই-খরচাই কত। এই বাড়তি টাকাটা পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের টানাটানিটা কমেছে, দু টাকা মাইনে দিয়ে একটা ঝিও রাখতে পেরেছেন বাসন মাজার—কিন্তু ঐ থেকে আবার ঘটা করে কারও চিকিৎসা চালানো অসম্ভব। তাছাড়া গোবিন্দর সময়টাও একেবারে কমে গেছে। সকালে স্নানাহার সেরে আটটা আঠারোর ট্রেন ধরতে হয় তাকে —পৌনে আটটায় না বেরোলে গাড়ি ধরা যায় না। ঐ ট্রেনে গিয়েও তার নাকি দেরি হয়ে যায়, লোকজন এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দুটো চাকরি সেরে ফেরে একেবারে শেষ গাড়িতে—বাড়ি পেঁছিতে এগারোটা বেজে যায়। শুধু শনিবারটাতে একটু আগে ফেরা হয়—আটটা দশ কি আটটা চল্লিশের ট্রেন ধরে।

এর মধ্যে তো নিঃশ্বাস ফেলবারই অবকাশ নেই। ছুটি বলতে এক রবিবার-- কিন্তু সেদিন আর নড়তে চায় না গোবিন্দ। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কি আড্ডা দিতে যাওয়া তো দূরের কথা—বাজার-উটনোই আনতে পারেন না কমলা। গোবিন্দরও বয়স হয়ে আসছে, এত খাটুনি তার পোষায় না আর, নিতান্ত বাধ্য হয়েই যেটুকু করতে হয়—তার বেশী কিছু করতে চায় না।

তবু রানী একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে তারও টনক নড়ে। মরীয়া হয়ে পাড়ার চার টাকা ভিজিটের বড় ডাক্তারকেই ডেকে আনে সে। কিন্তু তিনি এসে পরীক্ষা করে দেখে ভুরু কোঁচকান। বাইরে এসে বলেন, 'এ করেছেন কি, এ তো শেষ করে এনে তবে ডেকেছেন আমাকে! কতদিন থেকে এমন হয়েছে তা কেউ লক্ষ্যও করেন নি! যা খেয়েছেন তা কিছুই হজম হয় নি—ও'র দেহ প্র্যাক্‌টিক্যালি কোন খাবারই পায় নি দীর্ঘকাল। লিভার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, হার্টের অবস্থাও খুব খারাপ। বাড়িতে এর চিকিৎসা হওয়া অসম্ভব

আপনাদের সাধ্যে কুলোবে না। এখনই যদি কোন বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারেন তো কিছু আশা আছে—কিন্তু সেও, আপনাকে ওআর্ন করে দিচ্ছি—এক আনার বেশী নয়। বাড়িতে রাখলে আর বড় জোর দিন কুড়ি-পঁচিশ, এর বাইরে যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

দু-একটা দামী ওষুধ লিখে দিয়ে, তাঁর ফী নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। গোবিন্দ কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখলে একেবারে। সর্বনাশ এত আসন্ন তা সে কল্পনাও করে নি। প্রথম কৈশোর থেকেই স্ত্রীর সেবা-যত্নে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। ভাগ্যক্রমে দুটি স্ত্রীই পেয়েছিল সে সুগৃহিণী, কখনও কোন দিকে তাকাতে হয় নি—দৈহিক আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, এই অল্প আয়ের মধ্যে যতটা পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে বেশীই পেয়েছে। আজ এই এতকাল পরে, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে স্ত্রী থাকবে না—তাকে একা সংসার করতে হবে—একথা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

অনেকটা সামলে নিয়েই ঘরে ঢুকেছিল, তবু তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে রানী বলল, 'কী হ'ল—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল তো? তোমার যেমন মাথা খারাপ, মিছিমিছি এক গাদা টাকা দণ্ড!'

নিতান্তই সহজ শান্ত সুর। যেন আর কারও কথা বলছে সে, আর কোনও কথা। নিজের মৃত্যুর কথা নয়!

গোবিন্দ অবশ্য কথাটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে, 'জবাব দেবার কথা আবার কে বললে! এই তো সব ওষুধ দিয়ে গেল। বাইরে নিয়ে গিয়ে বলছিল—হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার কথা। শক্ত অসুখ, দামী দামী ওষুধ লাগবে—পারবেন কি সে খরচা চালাতে—এই বলছিল।'

কিন্তু সহজে বলতে পারে না শেষ পর্যন্ত, গলা কেঁপেই যায়। কান্নার মতো আওয়াজ বেরোয়। রানী কিন্তু আর কিছু বলে না, হাসে একটু। ছেলেমানুষদের কাণ্ডকারখানা দেখলে বয়স্করা যেমন হাসেন তেমনি। খানিকটা পরে একেবারে অন্য কথা পাড়ে, 'হ্যাঁ গো, আমাকে একখানা খাম এনে দেবে—ডাকের খাম?'

অনুরোধটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আকস্মিক। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগহীন। গোবিন্দ ঠিক বুঝতে না পেরে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সন্দেহ হয়—মাথার কোন গোলমাল হ'ল কিনা। ভুল বকছে না তো?

কিন্তু রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সেই মুক্তোঝরা হাসিটা এখনও তার আছে বুঝি। বলে, 'ওমা, জন্মের মধ্যে কম্ম, মরণকালে একখানা খাম চেয়েছি, তাতেই যে তোমার বাক্যি হরে গেল দেখতে পাই। বলি কোনকালে কি খামের নাম শোন নি—না নশো পঞ্চাশ টাকা খরচের কথা ভাবছ। আমার কি কাউকে একখানা চিঠি লিখতেও নেই?'

'তা কেন। তা বলছি না। হঠাৎ এর মধ্যে খামের কথা—। বাপের বাড়িতে লিখবে?'

গোবিন্দ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

'থাক, হয়েছে। একখানা চিঠি লিখব তা কাকে কী বিত্তেন্ত—ছ বুড়ি ছত্রিশ গণ্ডার কৈফেৎ! দেখছি মেয়েটাকেই পাঠাতে হবে। যা পথ—ডাকঘর কি হেথায়—অন্তত একটি ক্রোশ রাস্তা, মেয়ে বড় হয়েছে—অতদূর পাঠাতে ইচ্ছা করে না। দেখি মল্লিকদের ছোট ছেলেটা যদি এনে দেয়—'

শেষের দিকের কথাগুলো যেন আপন মনেই বলে রানী। কথা বেশীক্ষণ ঠিক মতো বলতে পারে না আজকাল। একসঙ্গে দুটো-চারটে কথা কইলেই শেষের দিকে

গলা স্তিমিত হয়ে আসে, শব্দগুলো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। এইতেই আরও ভয় পেয়ে যাচ্ছেন কমলা। লক্ষণ তাঁর ভাল ঠেকছে না আদৌ।

পরের দিন খাম আনিয়ে কোন মতে কনককে চিঠি লেখে একখানা। একেই হাতের লেখা তত ভাল নয়—তাতে দুর্বল হাতে আরও এঁকেবেঁকে যায়, কলম ধরতেই পারে না ভাল করে। তবু মেয়েকে দিয়ে লেখায় না, নিজেই লেখে চেষ্টা করে করে—অনেকক্ষণ ধরে।

লেখে, 'কৈ লো, খুব তো বলেছিলি মরণের সময় অবিশ্যি আসবি। এবার আয়! আর দেরি করলে তো দেখাই হবে না। বড়জোর আর সাত-আটটা দিন আছি। শিগগির চলে আয়। বর না আসতে পারে, অন্য কাউকে নিয়ে একাই চলে আসিস!

ব্যস। ঐ দু ছত্র চিঠি। কোন সম্ভাষণ নেই, কুশল প্রশ্ন নেই। এইটুকু লিখতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল তার। আর লেখার প্রয়োজনই বা কি। সচেতন মৃত্যু-পথযাত্রীর কাছে আজ যেন সব কিছুই অবান্তর, অর্থহীন ঠেকছে।

কনক চিঠিটা পেয়ে প্রথমে মনে করল তামাশা। রানীর স্বভাবজ কৌতুকপ্রিয়তা। তবু অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল একটা। এ আবার কী ধরনের তামাশা। অথচ ঠিক সত্য বলেও ভাবতে পারে না। সত্যি সত্যিই কি মানুষ নিজের মৃত্যুর কথা এমনভাবে লিখতে পারে?..আবার মনে হয় রানী-বৌতে সবই সম্ভব। জীবনটাই তার কাছে প্রকাণ্ড একটা কৌতুক বলে মনে হয়—মৃত্যুটাও হয়ত তাই। তাছাড়া কান্তির বিয়ের সময় গিয়ে ওর শরীরটা খুবই খারাপ দেখে এসেছে, নিয়ে আসতে চেয়েছিল এখানে—তা তো এল না, তারপর যদি সারতে পেরে না থাকে তো, এতদিনে খুবই খারাপ হয়ে পড়বার কথা। আর সারবেই বা কি করে—কি দিয়ে। অবস্থা তো নিজেই দেখে এসেছে কনক।

চিঠি বিলি হয়েছে বেলা বারোটা নাগাদ। অবশিষ্ট সারা বেলাটা ছটফট করে বেড়াল সে। বিকেলে হেম বাড়ি ফিরতে চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল।

'এর মানে কি বলে দাও আমাকে, আমার মাথাতে তো কিছু ঢুকছে না। সত্যি কথাই লিখেছে, না তামাশা?'

হেমও কিছু বুঝতে পারে না। তবু পড়তে পড়তে তার মুখও বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

'কি করে বলি বলো দিকি। লেখা তো খুবই জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে, তবে সে অনভ্যেসেও হতে পারে।......কিন্তু যার সাত-আট দিনের বেশী বাঁচবার মেয়াদ নেই —তার পক্ষে কি নিজের হাতে চিঠি লেখা সম্ভব?'

'তা হ'লে কি করবে?'

'তাই তো ভাবছি। বড়দাকে একটা চিঠি লিখে দেখব?'

'কিন্তু সত্যিই যদি এমন ধারা এখন-তখন অবস্থা হয়—তাহলে কি অত দেরি সইবে......চিঠি যাবে উত্তর আসবে, তারপর তুমি পাস লেখাবে—সে তো অন্তত পাঁচ-ছ দিন!'

'তাহলে চলো। কালকেই পাস লেখাই। যদি তেমন হয় তো তোমাকে রেখে চলে আসব, নয়ত তখনই ফিরব। তিন-চার দিনের ছুটি চাইলে হয়তো পাওয়া যাবে।'

কনক বাইরে বেরিয়ে পুরনো দইয়ের হাঁড়িতে বসানো তুলসীগাছটার কাছে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে জানায়, 'ঠাকুর, এই কটা দিন তাকে বাঁচিয়ে রেখো অন্তত—গিয়ে যেন দেখাটা পাই!' এককালে যে স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে তার ঈর্ষার

অন্ত ছিল না, আজ তার সম্বন্ধে নিজেরই এই আকুলতা নিজের কাছেও আশ্চর্য লাগে।..

কনক ঘরে ঢুকে সেই ফ্যাকাশে চামড়ায়-ঢাকা কঙ্কালটার দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বটে, কিন্তু রানীর মুখে-চোখে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসিই ফুটে উঠল। সেই হাসি—এখনও তেমনি মিষ্টি আছে, আশ্চর্য। যে হাসির দিকে চেয়ে একদা হেমের মনে হ'ত সারা জীবন শুধু এই হাসি দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়; তার চেয়ে বড় সার্থকতার কথা সেদিন ভাবতে পারত না সে। রানী যখনই হাসে কেমন একরকম খিলখিল করে হাসে, যেন একটা আনন্দ সে হাসির সঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অতি মধুর একটা সুরের মতো মিষ্টি শব্দ হয় সে হাসির, কানে গেলে সুগীত সঙ্গীতের মতোই একটা আবেশের সৃষ্টি করে।

আজও সেই হাসি তেমনি অম্লান, তেমনি প্রাণবন্ত আছে। দেখলে মনে হয় জীবনে কোনদিন কোন দুঃখ পায় নি সে, কোন আশাভঙ্গের বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, কোন অপূর্ণতা তার ছায়াপাত করতে পারে নি ওর মনে। এই অবিশ্বাস্য রূপ-গুণ নিয়ে যে অনায়াসে রাজা কি রাজার চেয়েও বড় ধনী কি প্রতিপত্তিশালী লোকের ঘরে পড়তে পারত, কোন সম্ভ্রান্ত বা বিখ্যাত লোকের স্ত্রী হ'লেই যাকে বেশী মানাত, তার অসামান্য রূপ-গুণের প্রকৃত সমাদর হ'ত, কাজে লাগত সেগুলো—সামান্য বেতনের উদ্যমহ্যন নিতান্তই সাধারণ একটি কেরাণীর হাতে পড়ে কোনদিকেই কোন সার্থকতা মিলল না জীবনে—তার এই হাসি দেখলে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে। সে হাসি শুধু অপরেরই দুঃখ ভোলায় না শুধু অপরের মনে স্নিগ্ধমধুর মোহের সৃষ্টি করে না—সে হাসি নিজের জীবনেরও পরিপূর্ণতা ঘোষণা করে। সে সুখী, সে তৃপ্ত—কোনও ক্ষোভ, কোন মালিন্য, কোন দৈন্য, কোন রিক্ততা যেন তার জীবনকে কখনও কিছুমাত্র বিড়ম্বিত করে নি, অথবা করলেও সে কথা ভুলে গিয়েছে সে, তার জন্য কাউকে দায়ী মনে করে না—কোথাও সেজন্য এতটুকু অনুযোগ নেই তার মনে।

হাসিটা সামলে কথা কইতে একটু সময় লাগে রানীর। বোধহয় ঐটুকু হাসতে গিয়ে তার দম ফুরিয়ে গেছে সাময়িকভাবে। কিন্তু পরে যখন কথা কয়, একেবারে ধমক দিয়ে ওঠে সে কনককে, 'আ মর—কেঁদে মরছিস কেন এখন থেকে? এরও কি আগাম বায়না চলে নাকি?...নাকি আমার জন্যে কতটা কাঁদবি এর পরে আমাকে তার নমুনা দেখিয়ে রাখছিস?...শোন, চোখ মোছ—কান্নার ঢের সময় পাবি, এখন তুলে রাখ্ ওটা...এই এখানে কাছে এসে বোস দিকি, এত জোরে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারি না আর। ভয় নেই, ছোঁয়াচে রোগ নয়। কাছে এলে ক্ষেতি হবে না!'

তারপর, কনক একেবারে বিছানার ধারে এসে বসলে, নিজের শীর্ণ কম্পিত হাতখানি কনকের হাতের ওপর রেখে বলে, 'এসে পড়েছিস না আমি বেঁচেছি। যা ভয় হয়েছিল। মনে হচ্ছিল চিঠিটা হয়ত পাবি না, কিম্বা পেলেও এতটা বাড়াবাড়ি বিশ্বাস করবি না। অথচ গোনা দিন কেটে যাচ্ছে, মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে একটি একটি করে নিত্যই। এরপর এলে হয়ত আর কথা কইতে পারতুম না—বেঁচে থাকলেও!'

তারপর খানিকটা দম নিয়ে আবার বলে, 'কেমন আছিস কী বিত্তান্ত পরে হবে। এখন মন দিয়ে শোন—কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস তা তো জানি না, যদি মরা পর্যন্ত থাকতে পারিস তো ভালই, নইলে আগে গেলে আগেই নিয়ে যাস। ছেলেটার কথা বলছি লো, এবার অতি-অবশ্য ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাবি, কারও কোন কথা

শুনবি না। তোকে একেবারে দিয়ে গেলুম, আজ থেকে তোর ওপরই পুরো ভার দেওয়া রইল। তোর ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ করবি—যেমন পারিস। খরচ-পত্তর কিছু দিতে পারবে না তোর ভাসুর, সে ভরসা নেই। তবুও তোকে বলতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ হচ্ছে না, তার কারণ তোকে আমি চিনে নিয়েছি, হয়ত ঠাকুরপোর চেয়েও ভাল চিনেছি। একমাত্র তোকেই এ দায় গছানো যায় অনায়াসে। নইলে আমার বাপের বাড়িতে তো হাটের ফিরিঙ্গি, বোনই রয়েছে একগাদা। তাদের চেয়ে তুই ওকে ঢের বেশী দেখবি তা আমার বিশ্বাস আছে। তাছাড়া ঠাকুরপোও—যত দুঃখীই হোক, পয়সার যত মায়াই হোক ওর—আমার ছেলেকে ও ফেলবে না—আমি জানি।'

আরও খানিকটা চোখ বুজে শুয়ে থাকে রানী—শ্রান্তভাবে, তারপর চুপি চুপি বলে, 'কথা কইতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে আজ। একসঙ্গে এতকথা আজকাল আর বলতে পারি না। তার ওপর তোদের দেখে এত কথা একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করছে বুকের মধ্যে যে—তাইতেই যেন আরও কষ্ট হচ্ছে, হাঁপ ধরছে।'

কনক এতক্ষণ পরে কথা বলার অবকাশ পায়। ব্যাকুল হয়ে বলে, 'থাক না দিদি, এখনই সব বলতে হবে তার মানে কি—? আমরা তো এখনও আছি কদিন!'

'তোরা আছিস, কিন্তু আমি থাকব কিনা, সেইটেই যে ঠিক পাচ্ছি না। কেবলই ভয় হচ্ছে যদি বা দুটো-একটা দিন আরও থাকি—বুলি হয়ত হরে যাবে। জিভটা কেমন এলিয়ে এলিয়ে যাচ্ছে—দেখছিস না?...না বলেই নিই—যা বলবার।'

তারপর কনকের দিকে কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, 'আমার বড্ড ভয় হ'ত যে তুই হয়ত আমাকে ভুল বুঝে বসে থাকবি! আবার ভাবতুম যে আমি যখন বিবেকের কাছে খালাস আছি—তখন এত ভয়ই বা কিসের? ঠাকুরপোকে দিয়ে আমার ভাইয়ের অভাব বন্ধুর অভাব মিটেছিল। তার চেয়ে বেশী কিছু—অন্য চোখে কোনদিন দেখেছি কি অন্যভাবে ভেবেছি বলে তো আমার মনে হয় না। নিজের মন বেশ ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছি—মনের কাছে পোষ্কার আছি আমি, একথা জোরগলায় বলতে পারি। আর ঠাকুরপোও বোধ হয়—ঠিক যাকে কুদৃষ্টিতে তাকানো বলে তা কোনদিন তাকায় নি। আমাকে দেখে ওর চোখ ধেঁধে গিয়েছিল এই পর্যন্ত। কী চায় তা বোধ হয় নিজেও ভেবে পায় নি কোনদিন!'

আবারও হেসে ওঠে একটু, তবে এবার নিঃশব্দে নয়, অভ্যাসমতো খিল-খিল ক'রেই হেসে ওঠে, বলে, 'তবে ভাই আজ মানছি, মরণের দিকে পা তুলে আর মিথ্যে কথা বলব না, দোষও ছিল একটু। তোর যে কী করে দিন কাটছে তা আমি জানতুম। তবু গোড়াতেই কাটান ছিঁড়েন করে দেবার চেষ্টা করি নি, তোর বরকে সরিয়ে দিতে পারি নি। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে, আমার কাছে থাকতে পেলে ও আর কিছু চায় না—এইটেই মিষ্টি লাগত মনে মনে। কে জানে—মেয়ে-জন্মেরই দোষ বোধ হয়, পুরুষ পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে এটা জানতে পারলে আর কিছু চায় না, পুরুষ নাচাতে মেয়েজাতের বড় সুখ। আবার তাতে যদি জানতে পারে সে অপর মেয়ের মনে রীষ হচ্ছে এজন্যে, তো কথাই নেই।...কিন্তু আজ সেজন্যে সত্যিই মনে মনে বড় আপসোস হয়, বিশ্বাস কর! আজ বুঝতে পারি সেদিন কী কষ্ট পেয়েছিস তুই, মনে হয় এটা, খেলার জিনিস নয়। তুই তো মিথ্যে বলে জানতিস না—তোর মনে সেটা সত্যি ছিল,...তবে তাও বলি, তুই বড় বোকাও ছিলি, পুরুষকে জোর ক'রে বশ করতে হয়—কবে তার দয়া হবে বলে বসে থাকতে আছে?··যাক, সে সব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আজ যখন ষোল আনা বুঝে পেয়েছিস তখন মনে

আর কোন দুঃখ রাখিস নি বোন—হয়ত সেইটুকু অন্যায়ের জন্যেই আমাকে, ছেলে-মেয়ে স্বামী, নিজের নতুন বাড়ি, এমন পাতানো সংসার ফেলে এমন অসময়ে চলে যেতে হচ্ছে—কে জানে। অন্তত সেই ভেবেই তুই আমাকে মাপ করতে চেষ্টা করিস, আর কোন অভিমান রাখিস নি!'

'কী বলছ দিদি, ছি! আমার মনে আর কোন ময়লা নেই। যখন ছিলও, তখনও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নি।'

'তা জানি। সেইজন্যেই তো এত লোক থাকতে মরবার সময় তোকেই ডেকেছি, সবচেয়ে ভারী বোঝাটা তোর ঘাড়েই চাপিয়ে যাচ্ছি।'

হেম বাইরে গোবিন্দর সঙ্গে কথা কইছিল। এখন দুজনেই কাছে এসে দাঁড়াল। হেমের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'ঠাকুরপো, তোমাদের হাতে ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছি ভাই, যতটা পারো মানুষ ক'রো। মেয়েরা সেয়ানা হয়েছে—ওদের বিয়ে দিতেই হবে তোমার দাদাকে—যেমন করে হোক, আর বিয়ে হয়ে গেলে ওদের দায়ে নিশ্চিন্ত, যে যার শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। ছেলেটার জন্যেই ভাবনা।'

একটু থেমে—স্বামীর দিক তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে আবার হেমকেই বলল, 'তোমার দাদাকে আবার বিয়ে করতেই হবে, বিয়ে না ক'রে থাকতে পারবে না ও, বৌ একটা অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তো!...তা সে মানুষটার ওপর চিরকালের জন্যে সতীনের একটা বোঝা চাপিয়ে যেতে চাই না!'

গোবিন্দ ম্লান হেসে বললে, 'হ্যাঁ—তা আর নয়! আবার বিয়ে করছে না... পঞ্চাশ অনেকদিন পেরিয়ে গেছে...সে হুঁশ আছে?'

'বড্ড আপসোস হচ্ছে, না? মলুমই যদি সেই তো দু'চার বছর আগে মলুম না কেন?...তা বাপু অত ভেবেচিন্তে দেখি নি—দেখলেও না হয় দু'দিন আগে তৈরী হতুম। সে যাকগে মরুক গে—অপরাধটা ক্ষ্যামাঘেন্না করে নিও; কী আর করবে। তবে বিয়ে তোমাকে করতে হবেই, করবেও—তার জন্যে অনর্থক লজ্জা পেও না। ষোল বছর বয়স থেকে ঘরণী গিন্নী বৌ নিয়ে ঘর করছ—এই বুড়ো বয়সে বৌ ছাড়া থাকতে পারবে না।...মার তো ঐ অবস্থা, তাঁকেই কে দেখে তার ঠিক নেই।...ঠাকুরপো, একটা মেয়ে দেখেশুনে দিও তো ভাই, লক্ষ্মীটি। তবে যেন খুঁজে পেতে আমার চেয়ে সুন্দর একটা ধরে এনো না—তাহ'লে মরেও শান্তি পাব না! রূপের গরবটা যেন থাকে আমার।'

অনেক চেষ্টায় অনেক কথা বলে একেবারেই বুঝি শক্তির শেষ সঞ্চয়টুকু ফুরিয়ে যায় তার। শ্রান্ত হয়ে হঠাৎ চোখ বোজে, আর বুজেই থাকে। চোখও খোলে না বা কথা বলার চেষ্টাও করে না আর।

রানীদি যা আশঙ্কা করেছিল তা যে আদৌ অমূলক নয়—সেটা ক্রমশঃ বুঝতে পারে কনক। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে রানীর নির্ভুল হিসাব দেখে অবাক হয়ে যায় সে। সত্যি সত্যিই বুলি হরে গেল ওর— সেইদিন, সেই মুহূর্ত থেকে। তারপর দুটো দিন দুটো রাত একটাও কথা কইল না, একবারও চোখ খুলল না। অথচ সেটা ঘুম নয়—তাও বুঝতে কোন অসুবিধা রইল না কারও। কারণ কনক যতবার ওষুধ কি পথ্য খাওয়াতে গেল—হাঁ করতে বলতেই হাঁ করল সে। খেলও একটু হয়ত—এক আধ ঢোক। কিন্তু খেতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল তার, একটু খেয়েই শ্রান্তি বোধ করছিল—একবার দুবারের পরই ঘাড় নেড়ে নিষেধ করছিল কিম্বা মুখ বুজে ফেলেছিল। অর্থাৎ সবই শুনছে সবই বুঝছে—শুধু নিছক শারীরিক

দুর্বলতার জন্যেই চোখ খুলতে বা কথা কইতে পারছে না।

যেমন হঠাৎ মুখ বুজে ছিল, তেমনি হঠাৎই ঐ দুদিন পরে আবার মুখ খুলল সে।

সেদিন সকালে কনক ওর বাসি কাপড়টা ছাড়িয়ে যখন একটা কাচা কাপড় পরাচ্ছে—অকস্মাৎ তাকে চমকে দিয়ে চুপি চুপি বলে উঠল, 'দেরাজের মধ্যে একটা লালপাড় ফরাসডাঙ্গার শাড়ি আছে—আমাকে জন্মের ভাত-কাপড় দিয়েছিল এরা—সেইটে বার ক'রে পরিয়ে দে। ঐ কাপড় পরে মরব—অনেকদিনের ইচ্ছে!'

কনক খুব একটা প্রতিবাদ করতে পারল না, কারণ রানীর কোন কথাই উড়িয়ে দেবার মতো নয়—এটা বুঝেছিল, তবু বলল একবার, 'তা যেদিন মরবে সেদিন মরবে—আজ তার কী?'

'ওলো নেকী, আমার কথাটা শোন। যা বলছি জেনেই বলছি।'

তারপর ওর কথার আওয়াজ পেয়েই, গোবিন্দ এসে দাঁড়াতে, চোখ খুলে একবার তার দিকে চেয়ে বলল, 'একবার কাছে এসো তো, এই বেলা জ্ঞান থাকতে ক্ষমতা থাকতে পায়ের ধুলোটা নিয়ে নিই।...অনেক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে গেলুম—না কি যেন বলতে হয় না মরবার সময়? সে সব কিন্তু বলতে-টলতে পারব না আমি। এমন কিছু জ্বালাতন-পোড়াতন করি নি তোমায়।...কৈ গো, পাথর হয়ে গেলে যে একেবারে, এসো এসো, এইখেনে এসে দাঁড়াও! পায়ের ধুলো দেবে বৈ—খরচের ব্যাপার কিছু নয়।...আর মাকেও একবার আসতে বলো, তাঁর পায়ের ধুলোটাও নিয়ে নিই। সত্যি, শাশুড়ী পেয়েছিলুম রে—যদি মেয়েজন্ম আবার নিতেই হয় তো জন্মে জন্মে যেন এমনি শাশুড়ী পাই!'...

আরও খানিক পরে, হেমকে কাছে ডেকে বললে, 'জ্বালাতন বরং তোমাকেই যা একটু করেছি ভাই, পার তো আমাকে মাপ ক'রো। আর মরেই যাচ্ছি যেকালে—মাপ না ক'রে উপায় কি? তোমার একটু দুঃখু হবে জানি।...তবু, তুমিই দাঁড়িয়ে থেকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিও—যাতে শ্মশানেও সকলে তাকিয়ে দেখে।...একটা মজার কথা জানিস কনক, তোর বর জানে, ও ছিল সেখানে—আমার বাবা শ্মশানে দাঁড়িয়েই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল!'

হাসবার চেষ্টা করল সে—কিন্তু হাসির সেই মিষ্টি শব্দটা আর বেরোল না গলা দিয়ে।

একটু পরে আবার হেমের দিকে চেয়েই বলল, 'ছেলেমেয়েগুলোকে সকাল ক'রে খাইয়ে নিয়ে তোমাদের বাড়ি মাসীমার কাছে রেখে এসো গে। মায়ের মৃত্যুটা আর এ বয়সে না-ই দেখল ওরা, শুধু শুধু বিশ্রী স্মৃতি একটা থাকবে।...তোমারাও খেয়ে দেয়ে নাও গে সকাল সকাল। বিকেলের আগেই বাঁশ কাটতে ছুটতে হবে!'

বলতে বলতে কাশির ভঙ্গী হ'ল একটা মুখে। আবার চোখ বুজল।

আবার কথা বলল একেবারে বেলা একটা নাগাদ।

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই—সেটা এরা সকলেই বুঝতে পেরেছিল। ডাক্তারও ডেকে এনেছিল একবার—তিনি অক্সিজেন আনার কথা বলেছিলেন। অবশ্য একথাও বলেছিলেন, কলকাতা থেকে ভাড়া ক'রে আনা পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সে চেষ্টা করা হয় নি। গোবিন্দ ঘটনাটার এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় যেন কেমন জড়ভরতের মতো হয়ে গেছে—তার মাথাতে কিছু আসছেও না। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসবে—তা গোবিন্দ ভাবে নি একবারও। দেখা গেল ডাক্তারের চেয়ে রানী নিজের শরীরের অবস্থা বেশী বুঝেছিল।

একটার সময় কনককে চোখের ইশারায় কাছে ডেকে বলল, 'একবার একটু চুপি

চুপি ভগবানের নামটা শুনিয়ে দে তো ভাই—গুচ্ছের চিৎকার আমার ভাল লাগে না। সব যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, এর পর শোনালেও আর শুনতে পাবো না।...আর অমনি, যদি পারিস একটু তো—ডান দিকে পাশ ফিরিয়ে দে। আমার আবার পোড়া অব্যেস—পাশ ফিরে না শুলে ঘুমটা যেন জমে না। সমস্ত শরীর এলিয়ে ঘুম আসছে—এবার একটু আরাম ক'রে ঘুমুই। কতকাল যে ভাল ক'রে ঘুম হয় নি—'

তারপর মুখ টিপে একটু হেসে চোখে সেই চিরপরিচিত কৌতুকের নৃত্যোচ্ছলতা ফুটিয়ে বলে, 'কেমন লো, এবার যমের মুখে দিয়ে নিশ্চিন্তি তো?'

কনক প্রাণপণে চোখের জল চেপে অস্পষ্ট, প্রায় বুজে-আসা কণ্ঠে তিনবার তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে তাকে আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দেয়। রানীও বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে পাশবালিশটা ভাল ক'রে জড়িয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে শুয়ে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর সত্যি-সত্যিই যেন ঘুমিয়ে পড়ে, গাঢ় নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রায়।

তারই মধ্যে যে কখন শেষনিঃশ্বাসটা পড়ে থেমে যায় সব—সেটা এরা ভালমতো বুঝতেও পারে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

'হিড়িক, বুঝলি—ও অমন এক-একটা আসে মধ্যে মধ্যে। ও আমি ঢের দেখেছি। বলি বয়স তো আর আমার কম হ'ল না। কত হিড়িকই এল গেল—আমি ঠিক আছি। কিছুদিন অন্তর অন্তরই এই রকম এক একটা হুজুগ আসে। যারা পাগল যারা ছন্ন, তারাই ঐ সব হুজুগে ধেই ধেই ক'রে নাচে।...ও সব দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলুম।...তোরা বললি তোমরা চলে যাও, আর অমনি ওরা বাপের সুপুত্তুর হয়ে চলে গেল সব।...ওঁরা খুব বাহাদুর হয়েছেন কিনা, সবাই একেবারে ওঁদের ভয়ে জুজু হয়ে গেছে। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। ইংরেজ একটা বন্দুকের শব্দ করলে বাবুরা কে কোথায় থাকবেন সব তার ঠিক নেই—ওঁরা হুমকি দেবেন আর সেই ভয়ে ইংরেজরা অমনি শ্যালের গত্ত খুঁজবে লুকোবার জন্যে।...সেই সেবার—সেই যখন প্রথম স্বদেশী হুজুগ ওঠে—ব্যাংবাবু না কে এক গান বেঁধে ছিল না, খুব চলত গানটা তখন—বাংলা এবার স্বাধীন হবে বক্তৃতার জোরে, বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে*...সেই বিত্তান্তই তো চলছে দেখছি আজও! কী সমাচার না ওঁরা সব কংগ্রেস-ওলারা অনেক ভেবেচিন্তে বেয়ে চেয়ে দেখে বক্তৃতা দিলেন, ইংরেজ, তোমরা ভারত ছাড়!! ওরা যেন ঐ গান্ধী মুখপোড়ার হুকুমটারই ওয়াস্তায় বসে ছিল এত দিন—মোট-ঘাট বেঁধে জাহাজঘাটায় গিয়ে—হুকুম পাস হয়েছে, সব অমনি দুদ্দাড় পালাবে! রেখে বোস দিকি ওসব কথা!...ঐ ক'রে মাঝে-মাঝে হুজুগ তুলে এক দল লোক নিজের দিন কিনে নিচ্ছে, আর চিরকাল একদল বোকা মুখ্যু আছে তারা মরছে জেল খেটে ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়ে!'

* 'বেজায় আওয়াজ' প্রহসনে গানটি আছে। রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাংবাবু)। দীর্ঘকাল আবুহোসেন গীতিনাট্যের সহিত প্রহসন হিসাবে অভিনীত হইয়াছিল। গানটির পংক্তিগুলি এইরূপ: 'বাংলা এবার স্বাধীন হবে বক্তৃতার জোরে, বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে। বাঙ্গালীর নাইকো একতা, বলো বলে কে একথা? প্ল্যাকার্ড মারো হবে বক্তৃতা, হররঙা পোশাকে অমনি টাউনহল যাবে ভরে।'

অন্য লোকের অভাবে নাতি বলাইকেই হাত-পা নেড়ে বোঝান শ্যামা। এক-এক সময় দীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাকে ধরে। বলাই উপলক্ষ্য, সে এসব কথা বোঝেও না, বোঝার কোন গরজও নেই তার—কিন্তু তাতে শ্যামার কিছু যায়-আসে না, কেউ না থাকলেও আজ-কাল অমনি বকে যান শ্যামা। বয়স বাড়ার জন্যই হোক আর নানা রকম আঘাত সয়ে সয়েই হোক, তাঁর সেই আগেকার স্বভাবগাম্ভীর্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যে বকুনি বা 'থগবগানি' তিনি চিরকাল অপছন্দ করতেন—সেই বকুনি এখন যেন তাঁকেই পেয়ে বসেছে, বকুনি ছাড়া থাকতেই পারেন না আজকাল। কোন কারণ থাকলেও বকেন, না থাকলেও বকেন, কারণ সৃষ্টি ক'রে নেন বকবার জন্যে।

বকুনির মধ্যে আবার গালাগালেরই অংশ বেশী। কাউকে না কাউকে গালা গাল দিয়েই যান। ছেলে-বৌ মেয়ে-জামাই পাড়া-পড়শী—মায় দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতারা পর্যন্ত। শেষে, যখন আর কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকে না তখন গাছপালাগুলোকে নিয়ে পড়েন, 'তোরাই কি কম শত্তুর সব! সব বেইমান, একধার থেকে সবাই বেইমান তোরা।...এত ক'রে কল্পা করছি, একটা ফল দেবার নাম নেই কারুর! খাচ্ছেন-দাচ্ছেন যেন বনবাগে ধাইছেন সবাই। কেন, অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে তো ফল-ফসল ঢেলে দিয়ে আসতে পারো সব!...আমি কী এমন শত্তুরতা করেছি তোদের সঙ্গে যে আমার ওপরই এত আড়ি-আকচ?...মর মর সবাই মর তোরা। দোব নবাবী ঘুচিয়ে একদিন—কাঠওলা ডেকে সব গাছ কাটিয়ে যখন বিক্রী ক'রে দোব—তখন বুঝবেন সব।... কেন, কেন—সুখসোমন্দা আমার মাটি জুড়ে বসে থাকবি শুনি!'...

পাড়ার লোক বলে পাগল। বলে নতুন বামুনদের বুড়িটার শোকে তাপে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলাইয়েরও তাই ধারণা। পাগল সে বেশী দেখে নি বটে তবে পাগলদের কথা শুনেছে সে। এখানে বাজারে যে বুড়ো পাগলটা একেবারে উদোম বসে থাকে ময়রাদের উনুনের ধারে—সেও তো অমনি, দিন-রাত বকে আর গান গায়। এ বুড়ি গান গায়ং না বটে বকে তার চতুর্গুণ।

বলাইয়ের এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করে না এখানে। নিহাৎ কোথাও তার স্থান নেই বলেই পড়ে থাকতে হয়। বড়মাসী আগে আগে বলত তার ওখানে গিয়ে থাকার কথা—কিন্তু এখন আর উচ্চবাচ্য করে না। তাদের অবস্থা নাকি খারাপ হয়ে পড়েছে—মেসো-মশাইয়ের চাকরি চলে গেছে—এক পয়সা রোজগার নেই, গুষ্টিসুদ্ধ মেজ-কর্তার 'হাততোলা'য় দিন কাটাচ্ছে। ও-বাড়ির মেজদার বিয়ের আগে নাকি মেজ-কর্তা ওদের একটা মুদীর দোকান ক'রে দিয়েছিলেন—ওরা সেটা চালাতে পারে নি, হাজার বারো শ' টাকা ঘুচিয়ে আবার ঘরে এসে বসেছে সবাই। কাজেই সেখানে গিয়ে ওঠবার কোন উপায় নেই।

আর হুট বলতে কোথাও যেতে আর ভরসাও হয় না ওর। ইদানীং দিদিমার মেজাজ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর—তেমনি অর্থপিশাচও হয়ে উঠেছে। মেজমাসীর দুর্দশা তো চোখেই দেখল সে। অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে এসে দাঁড়াল—ঠিক রাস্তার কুকুরের মতো দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে দিদিমা। ঝ্যাঁটা মেরে তাড়ানোটা মুখের কথা নয় ওর—সত্যি-সত্যিই ঝ্যাঁটায় হাত দিয়েছিল, যদি আর একটু দেরি করত উঠতে তো হয়ত সত্যিই ঝ্যাঁটা তুলত বুড়ী। বড়মাসীর বাড়ির কেউ বিশ্বাস করে নি কথাটা—কিন্তু বলাই নিজের চোখে দেখেছে। হ্যাঁ, মেজমাসীর দোষ আছে হয়ত—অসময়ে এসে উঠেছে, তারপর সুযোগ পেলেই চলে গেছে, এদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাকায় নি—কিন্তু তবু পেটের মেয়ে তো হাজার হোক—ঐ মড়ার দশা হয়ে এসে দাঁড়াল, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে দিলে না। বাইরে থেকেই বিদেয় ক'রে

দিলে। বাইরের বাগানে বসে পড়েছিল, সেইখান থেকেই উঠে চলে গেল চোখের জল মুছতে মুছতে। শেষ পর্যন্ত সেই বড়মাসীর বাড়ি গিয়েই উঠতে হ'ল তাকে। বরং মেজকত্তা—সে তো পর বলতে গেলে—সে অনেক ভদ্রতা করেছে। পাঁচ-ছ দিন ওখানে রেখে, ছেলেদের দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে, বলে কয়ে একেবারে দশ-পনেরো দিনের মতো ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে ছেড়েছে সে। মায় একখানা নতুন থান ধুতি, মেয়ের বাড়ি যাবার গাড়িভাড়া পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে যাবার সময়। বড়-মাসীকেও মানতে হয়েছে যে, 'হ্যাঁ, মেজকত্তা আমার মানটা রেখেছে বাপু, সেটা গরমান্যি যেতে পারব না।'

বলাই তবু শেষ পর্যন্ত আশা করে ছিল যে দু-চার দিন পরে দিদিমার মনটা নরম হবে, ওবাড়ি থেকে ডেকে পাঠাবে। ডেকে পাঠানো তো দূরের কথা, একটা উদ্দেশও করলে না। বরং মেজদা উপযাচক হয়ে একদিন খবরটা দিতে এলে বলেছিল, 'ওসব কথা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। ওকথা আমি শুনতে চাই নি। আমার মেজ মেয়ে অনেকদিন মরে গেছে, খাল-ধারে গেছে—এই আমি জানি। তার কথা ছাড়া যদি আর কোন থাকে তো বলো!'

এর পর দিদিমার আশ্রয় ছাড়বার কথা ভাবতেও সাহস হয় না বলাইয়ের। দিদিমা যে বলে, 'কাউকে চাই না আমার, কাউকে দরকার নেই। আমার সগুষ্টি মরে-হেজে গেছে এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত আছি'—সেটা কথার কথা নয়। বুড়ি একেবারে একাই থাকতে পারে, সত্যিই হয়ত কাউকে দরকার নেই ওর।

আর গেছেও তো একে একে সবাই চলে—নিহাৎ বলাইয়ের কোন উপায় নেই বলেই যেতে পারে নি—কিন্তু শ্যামা তো ঠিক মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছেন। কাউকে কোনদিন কাকুতি-মিনতিও করেন না এসে থাকতে—কারুর বাড়ি গিয়েও ওঠেন না। নিজের গাছ-গাছালি, তরুকলা আমড়া শসা কলা—নারকেল আর নারকেলের পাতা, ঝাঁটার কাঠি এবং সুপুরি নারকেলের বেল্‌দো—শুকনো বাঁশপাতা আমড়া-পাতা, এই সব নিয়েই দিন কেটে যায় তাঁর। পাঁচটা মানুষের মুখও যে না দেখেন তা নয়, অধমর্ণের দল তো আছেই। নিত্যনিয়তই আসে তারা। সব জড়িয়ে একটা নিরন্ধ্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটে বরং।

ওরই মধ্যে এগারোটায় হোক বারোটায় হোক—অথবা তিনটেতেই হোক, উনুনও জ্বালেন একবার ঠিক। নিহাৎ ভাতে-ভাতও খান না—একটা-দুটো তরকারীও রান্না করেন। কারণ তাঁর ঘরেই রান্নার বহু উপকরণ থাকে। তবে রাঁধেন ঐ একবারই। যা রাঁধেন তাই থেকেই খানিকটা সরিয়ে রেখে দেন বলাইয়ের জন্যে। সে সন্ধ্যার পরই খেয়ে নিয়ে ও-পাট চুকিয়ে ফেলে। একটা ছেলের জন্যে দুবেলা উনুন জ্বালার পরিশ্রম আর করেন না।

তবে এখনও পর্যন্ত—এসব পরিশ্রম ওঁর গায়েও লাগে না। শুধু রান্নাই নয় বা ঘরের কাজই নয়—বাসনপত্রও ওঁকেই মেজে নিতে হয়। একটু ঝুঁকে পড়ছেন আজকাল—ভারী জিনিসপত্র বা বাসন নিয়ে আনাগোনা করতে কষ্ট হয় ঠিকই—কিন্তু করে যান উনি মুখ বুজেই। টাকাখানেক মাইনে দিলেই একটা ঠিকে-ঝি পাওয়া যায়—আজকাল এখানেও ঠিকে ঝিয়ের চলন হয়েছে—কিন্তু শ্যামার কাছে এতটা বাজে-খরচ কল্পনাতীত। একটা টাকা মানে তাঁর কাছে মাসে দু পয়সা হিসেবে সুদ, অর্থাৎ বছরে ছ আনা। তিন বছরেরও কম সময়ে সে টাকাটা দুটো টাকায় পরিণত হ'তে পারে। একটা টাকাও এমন কিছু ফেলনা নয়। টাকা তো টাকা, সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা বেরোয় না। একটা টাকা যদি এতই তুচ্ছ হ'ত

তাহ'লে রাজ্যের লোক সেই এক টাকা ধার করবার জন্যেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত না তাঁর দোরে—তাও ঘর থেকে জিনিস বার ক'রে।

তাছাড়া, দরকারও নেই তাঁর অত সুখে। তিনি বেশ আছেন। ভালই আছেন। একটু ঝুঁকে পড়েছেন বটে, বেশী চলাফেরা বা বেশী কাজকর্ম করলে পিঠটা টনটন ক'রে ওঠে, তখন হাতের কাজ বা বোঝা ফেলে একবার পিঠটা ছাড়িয়ে না নিতে পারলেও চলে না, কিন্তু তাই বলে দিদির মতো একেবারে অথর্ব হয়েও যান নি। হাত-পা এখনও তাঁর তাঁবে আছে। আর তা যতদিন আছে ততদিন কারও সাহায্য চানও না তিনি। বসে খাবার শখ তাঁর নেই। কোন কালেই ছিল না। সুখ যে তাঁর অদৃষ্টে নেই তা তিনি জানেন। অদৃষ্টে না থাকলে সুখভোগ হয় না। ঐ তো দিদিই—ছেলে পর পর তিনটে বিয়ে করল, শেষের বিয়ে তো করল স্রেফ মায়ের দোহাই দিয়েই. কাজ করার লোক চাই এই অজুহাতেই অমন সোনার প্রতিমার আসনে এনে বসালো কালো 'ব্রেষকাট' ঐ মেয়েছেলেটাকে—তাই কি দিদি বসে খেতে পারছে? উঠতে পারে না, পা দুটো পড়ে যাবার মতো হয়েছে—তবু পাছা-ঘষে-ঘষে, হামাগুড়ি দিয়েও রান্নাবান্না কাজকর্ম করতে হচ্ছে। না ক'রে উপায় কি, এ বৌ যা কাজের—দিনান্তে এক গাল ভাত কারুর জুটত কিনা সন্দেহ, দিদি না সঙ্গে থাকলে।... পঙ্গু হয়ে. মরে মরেও সব করতে হচ্ছে দিদিকে. অথচ ঐ দিদি এককালে এক ঘটি জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় নি নিজে হাতে।...

না, সুখ যার অদৃষ্টে নেই তার সুখভোগ হয় না কিছুতেই। তাঁরও তো বাড়-বাড়ন্ত সংসার দেখে মা বিয়ে দিয়েছিলেন। সব যেন উড়ে-পুড়ে গেল—তিনি যেতে না যেতে।...তাও, বহু দুঃখ বহু লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে যদি বা আবার একটা সংসার খাড়া করলেন--ভোগে কি এল? বড় ছেলে, বড় বৌ, নাতি-নাতনী— সবাই তাঁকে এই বনবাসে ফেলে রেখে চলে গেল, পর হয়ে গেল হয়ত বা চিরকালের মতোই। আগে বছরে দু-তিনবার আসত—এখন কালেভদ্রে আসে। বছরে একবারও হয় কিনা সন্দেহ। ও'র এ-বাড়ির খাওয়া খেয়ে নাকি তারা থাকতে পারে না। সেখানে তিন আনা সের মাছ, রোজ মাছ খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে—এখানে থোড়-সড়সড়ি ডুমুরের ঝোল দিয়ে ভাত রোচে না তাদের মুখে। নবাব সব! নবাবপুত্তুর! তার ওপর আবার গোবিন্দর ছেলেটা গিয়ে জুটেছে ঐখানে—তার আরও নবাবী মুখ।—বৌ গিন্নেমো ক'রে নিয়ে গেছেন, কাউকে জিজ্ঞেস নেই, মত নেওয়া নেই। দাসীবাঁদী যা হোক একটা পড়ে আছে তা একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করেন নি। যার সুবাদে সুবাদ সে-ই কিছু টের পেল না, একটা বোঝা চেপে গেল মাথায় চিরকালের মতো। ইচ্ছে করে যেচে সে বোঝা চাপানো হ'ল। আহম্মক সব। আহাম্মক। নইলে ছেলে-মেয়েদেরই কি ঐভাবে তৈরী করে! কত মাইনে পাস রে বাবা—যে মাছ না হ'লে ভাত ওঠে না মুখে! তোদের বাপের যে ঐ ডুমুরের ডালনা শুষুনি শাকের ঝোল দিয়েও ভাত জোটে নি এককালে। একবেলা শুধু ভাত দুটি পেলেও বেঁচে যেত সে তখন।...তাতেও তার যে স্বাস্থ্য ছিল, যে খাটবার শক্তি—তা কি তোরা অত মাছ দুধ খেয়েও পাবি কখনও?...

না, পাঁচটা মানুষের মধ্যে থাকা কি কারও সাহায্য পাওয়া ভগবান তাঁর অদৃষ্টে লেখেন নি যখন- -তখন তিনিও চান না মিছিমিছি টানাটানি করে ছেঁড়া-চুলে খোঁপা বাঁধতে। শুধু বড় ছেলে কেন—ওদের সবাইকেই খরচের খাতায় তুলে রেখেছেন তিনি। নইলে দু-দুটো মেয়ে বিধবা হয়ে শুধু-হাত করে এসে উঠল—তবু, তাদের ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে রাজী হয়েও, তাদের কাউকে ধরে রাখতে পারলেন না কেন,

তারা কেউ কাজে এল না কেন?...একজন তো মরেই গেল—মরার বাড়া গাল নেই—আর একজন 'হুতোশনী' মূর্তি ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাত দোরের লাথি ঝ্যাটা খেয়ে, সেও তার ভাল—তবু মার কাছে সম্মানের ভাত বসে-খাওয়া—তাও ভাল লাগে না। বিনা খাটুনীর রাঁধা ভাত তেতো লাগে তার। তা লাগুক—শ্যামা ঠাকরুনের কিছু এসে যায় না তাতে।...

বেশী কথা কি—কালা-হাবা কাজের-বার ছেলেটার বিয়ে দিলেন—বেছে বেছে যার সাত কুলে কেউ নেই—বাপে-মরা মায়ে-খেদানো মেয়ে দেখে—সেও তেজ দেখিয়ে চলে গেল। তেজ যে দেখাল, দেখাতে পারল সেও বিধাতার বাদসাধা বলতে গেলে। ছাপাখানায় পনেরো টাকা মাইনের চাকরি ক'রে আর বাছাধনকে এই বাজার মাগ-ছেলে পুষতে হ'ত না। কোথা থেকে সেই ছাপাখানার মালিকের বন্ধু এক মাড়োয়ারীর নজরে পড়ে গেল তাই। বন্ধ কালা আর ভালমানুষ-মতো দেখে কী মনে হ'ল—দয়াই হ'ল কিম্বা অন্য কোন মতলব খেলে গেল মাথায়—এক টুকরো কাগজ দিয়ে এক লাইন ইংরিজী লিখতে দিলে। কান্তির হাতের লেখা চিরদিনই ভাল, মুক্তোর মতো—দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। তখনই ওর সেই মনিবকে বলে একেবারে সংগে ক'রে নিয়ে গেল নিজের গদিতে—এক কথায়, সেধে চল্লিশ টাকা মাই-নের চাকরিতে বসিয়ে দিলে সেই দিন থেকে। অফিসে বসে অপর বাবুদের সঙ্গে কাজ করতে হয় না—বাবুর বাড়িতে বসেই কাজ ওর। বিকেলে টিফিন পর্যন্ত দেয় বাবুর বাড়ি থেকে—ফল মিষ্টি নানা রকম ঘিয়ে-ভাজা খাবার। মাড়োয়ারী বাবুটির নাকি কি সব নিজস্ব খাতা লেখার কাজ আছে, সে সব হিসেব আলাদা, বাড়িতে বসেই করতে হয়—সেই জন্যেই খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর, বন্ধ কালা লোক—কারও সংগে চট ক'রে গল্প জমাতে পারবে না, এই দেখেই পছন্দ হয়েছে আরও।

তা সে মাইনে কি আর তাঁর ভোগে লাগল? যেমন চাকরি পাওয়া—সর্বনাশী বৌ যেন টাক করে ছিল ('তা ওরই সিন্নি তো ঠাকুর খেলে বাপু', শ্যামা মনে মনে বলেন, 'ঠাকুর মুখপোড়ারাও তো কম এক-চোখো খোলো নয়!')—সংগে সঙ্গে বরকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। এমন পাকা ঘরে থাকা, এমন নিজের বাড়িতে সম্মানের থাকা ভাল লাগল না তাদের, বালিগঞ্জের দিকে মনোহরপুকুর না কি এক পাড়ায় গিয়ে বস্তিতে উঠেছে—সেইখানেই দু-টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া ক'রে! খুব সুখে আছে। এখানে অর্ধেক কাজ তো শ্যামাই ক'রে দিতেন, উনুনের ধারে তো যেতেই হ'ত না বলতে গেলে—সেখানে জুতো-সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব করতে হচ্ছে। ছেলে হয়েছে—হাসপাতালে গিয়ে খালাস হয়ে এসে সেই অবস্থাতেই—আঁতুড়ের মধ্যেই নাকি রান্নাবান্না সব করছে। সেই ভাত ছেলেও খাচ্ছে। তবু সেও নাকি ওদের ভাল।

অথচ কী যে অনিষ্ট ওদের করছিলেন তিনি, তা আজও ভেবে পান না। বৌকে যে তেমন কোন বকাঝকা করতেন তাও নয়—সত্যি কথা বলতে কি করতে সাহসই হ'ত না—ঝগড়া তো কোন দিন করেনই নি। তাও তার এত অসহ্য হ'ল ? তার চেয়ে ঢের বেশী সয়েছে বড়বৌ—তা মানতেই হবে। আর কান্তি, কান্তিকে তো বুকে করে রেখেছিলেন, যাকে বলে ডানার আড়ালে সেও অনায়াসে এতটা বেইমানী করতে পারল! আশ্চর্য!

আবার ভাবেন, আশ্চর্য হবারই বা কি আছে! বেইমানের ঝাড় যে ওরা। যেমন বংশ তেমনি হবে তো।

তা তিনিও তেমনি—এক মাসের ছেলে নিয়ে দেখাতে এসেছিল ওরা, উনি কোন

কটু কথা বলেন নি বটে, তবে সে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখেন নি! আর দেখবেনও না কখনও, সেটা স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছেন। ও ছেলে তাঁর নাতি নয়, ওকে তিনি পৌত্র বলে স্বীকার করতে রাজী নন।...

এখন বন্ধনের মধ্যে এক বলাই: তবে তার আশাও তিনি রাখেন না আর। বলেন, 'আগ-ন্যাঙলা যেমন গেছে পেছ-ন্যাঙলাও তেমনে যাবে।' ওরা সব বুনো পাখী, খাবে-দাবে বনবাগে ধাইবে।...যে কদিন না খুঁটে খেতে শেখে সেই কদিনই কাছে আছে। তারপর একদিনও থাকবে না আর—তা আমি বেশ জানি।...তাই আশা-ভরসাও ওদের ওপর কিছু রাখি না, মায়া-মমতাও কিছু নেই। নিহাৎ কেষ্টোর জীব পড়ে আছে, তাই দুমুঠো খেতে দিচ্ছি। ঐ পর্যন্ত! মায়া-মমতা কারুর ওপর নেইও, তার কথাও নেই!'

বলাইয়েরও যে ও বস্তুটার জন্যে খুব একটা দুঃখ আছে, তা নয়।

আজন্মই তো বলতে গেলে সে মায়া মমতা স্নেহ-ভালবাসার মুখ দেখে নি। বাপের কথা তো ওঠেই না, মা কিছুদিন ছিল, মায়ের কথা মনেও পড়ে কিন্তু সে থেকেও না থাকারই মধ্যে। মায়ের স্নেহ কাকে বলে তা বলাই জানল না একদিনের জন্যেও। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে আসছে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জড়ভরত। দিদিমার কাছে —কে জানে কেন, সে স্নেহ আশাও করে নি কোনদিন। দিদিমার সঙ্গে জড়িয়ে যেন ও বস্তুটি কল্পনাও করা যায় না। এখানে এসে একটু স্নেহ-ভালবাসা যা পেয়েছে বড়মামীর কাছে—কিন্তু সেও এত দিনের কথা হ'ল যে, তার স্মৃতিটা পর্যন্ত ধূসর হয়ে গেছে মনের মধ্যে। ছোটবেলায় তিন বছরের স্মৃতি ভুলতে তিন দিনের বেশী লাগে না—ও বয়সে মনটাও থাকে সামনের দিকে ঝুঁকে, পেছনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো তার স্বাভাবিক নয়।

সুতরাং, স্নেহ মমতার অভাব নয়—বলাইয়ের দুঃখ অন্যত্র। তার বড় দুঃখ এই বন্দীদশা। এই একটা বাড়ি এবং বেড়া দেওয়া এইটুকু জমির মধ্যে আটকে থাকা। অবশ্য এ বন্দীদশা কতকটা তার স্বেচ্ছাকৃত। সে-ই বেরোতে চায় না ইদানীং। শ্যামা বেরোতে বললে বিদ্রোহ করে, সোজাসুজি অস্বীকার করে বেরোতে। কারণ লজ্জা নিবারণের মতো কোন বস্ত্র তার নেই। এই জন্যেই তার লেখা-পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। যখন খুব ছোট ছিল তখনকার কথা আলাদা। ছেঁড়া পাঁচী ধুতীর ওপর মহাশ্বেতার ছেলেদের পরিত্যক্ত ঢলঢলে পুরনো জামা পরে (তাদের নতুন জামারও যা ছিরিছাঁদ—ভদ্রসমাজে পরে যাওয়ার মতো কিনা, বলাইয়ের আজকাল সন্দেহ হয়) সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে পাঠশালায় পড়তে যেত— সেখানে তত বেমানান দেখাত না সেটা। কিন্তু ইংরেজী ইস্কুলের কথা আলাদা। সেখানে ছেলেরা ফিট-ফাট হয়ে না আসুক, খুব পাগলের মতোও আসে না। অন্তত হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরে আসে একটা করে। পুরানো হলেও তাতে এক-আধটার বেশী সেলাই থাকে না। অথচ বলাইয়ের আগে যাও বা ভদ্রতা রক্ষার মতো সামান্য কিছু ছিল, তাও রইল না ক্রমশ। শ্যামা দিনদিনই খরচের হাত গুটিয়ে আনছেন। বাড়িতে পরার জন্যে ছেঁড়া গামছা বা দুসুতি বরাদ্দ হয়েছে।

এ দুসুতি বহুকাল আগে অভয়পদ দিয়েছে। আগে তাদের অফিসে বস্তা বস্তা আসত এগুলো। কী যেন কলকব্জা মোছা না কী কাজে লাগত। অভয়পদ মধ্যে মধ্যে কতকগুলো করে নিয়ে আসত। সে আনত বাজারের ঝাড়ন বা রান্নাঘরের হাঁড়ি-কড়া মোছবার জন্য। নিয়ে এলে এ-বাড়িতেও খানকতক করে ফেলে দিয়ে যেত। সেইগুলোই পুতুপুতু করে জমিয়ে রেখে দিয়েছেন শ্যামা। গামছা হিসেবে

ব্যবহার করলে গা মোছা যায় হয়ত—কিন্তু পরে লজ্জা নিবারণ হয় না। শ্যামা বলাইকে সেই দুসুতিই মধ্যে মধ্যে একটা ক'রে বার ক'রে দেন। বলেন, 'বাড়িতে তো দ্বিতীয় জনমানিষ্যি নেই—থাকার মধ্যে তো আমি একা, তা আজকাল আমি তো চোখে ভাল দেখতেও পাই না, সব ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখি, কাজকম্ম করি আন্দাজে আন্দাজে—তা এখানে আর অত অ্যালবা-পোশাকে দরকার কি, এ-ই বেশ পরা যাবে। পরে থাক দিকি। অত কাপড় গামছা আমি যোগাতে পারব না। এত আসে কোথা থেকে? তোর বাপ কি জমিদারী রেখে গেছে? আর কী এমন নবাব খাঞ্জা খাঁ তুমি যে সিমলে শান্তিপুরের ধুতি এনে যোগাতে হবে!'

কিছুদিন যাবতই বাড়িতে এই ব্যবস্থা চলছে। আগে কোন খাতকের গলার আওয়াজ পেলে ঘরে ঢুকে বসে থাকত—কিন্তু তাতেও অব্যাহতি মিলত না, ঘরে আছে জেনে শ্যামা ডেকে এটা-ওটা ফরমাশ করতেন—আর ডেকে কোন কথা বললে মুখের ওপর কিছু না বলা যায় না—আর বেরোনো মানেই লজ্জা, মনে হয় এর চেয়ে এই মুহূর্তে মরে যাওয়াও ভাল। আজকাল তাই কাউকে বেড়ার আগড় খুলতে দেখলেই বা কারও গলার আওয়াজ পেলেই একেবারে পিছন দিকের পগারের ধারে গিয়ে বসে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের সঙ্গর থেকে গোসাপ ভাম ভোঁদড়ের সঙ্গও বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

তবু—বাইরে বেরোবার জন্যেও যদি একটা ধুতি দিতেন শ্যামা—অন্তত ওর পড়াশুনোটা বন্ধ হ'ত না। বাপ-মা মরা অনাথ বলে, বিশেষ ওর মা রেলে কাটা পড়ার পর, ওর সম্বন্ধে সকলেই একটু দয়া অনুভব করতেন—প্রথম থেকেই পাঠশালে বা ইস্কুলে ফ্রী পড়ছে। ওর বই-খাতা যা দরকার মাস্টারমশাইরাই চেয়ে-চিন্তে যোগাড় ক'রে দিতেন—পড়াশুনোতেও খুব খারাপ ছিল না—কিন্তু ইস্কুলে যাওয়াই যদি বন্ধ হয় তো লেখাপড়াটা করে সে কী করে!

শ্যামা এ অসুবিধাটা আদৌ বোঝেন না। ও-বাড়ি থেকে কাঁথার নাম ক'রে ছেঁড়া ধুতিগুলো চেয়ে নেন—তাই আবার সেলাই ক'রে তালি দিয়ে পরতে দেন বলাইকে। সেই কাপড় পরে ইস্কুলে যেতে বলেন তাকে। বলেন, 'তুই যে গরীবের ছেলে অনাথ —সবাই তা জানে, তোর অত ভাল ভাল পোশাক না পরলেও চলবে!' কাপড় ও-ই, জামার অবস্থা আরও খারাপ। কারণ মহাদের ছেলেরা বেঁটে ধরনের, কাঁধগুলো চওড়া—বলাই এই বয়সেই বেশ ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠেছে—ঢ্যাঙ্গা আর রোগা—ওদের জামা একেবারেই তার গায়ে লাগে না। তবু প্রথম প্রথম—কতকটা পড়ার উৎসাহে, কতকটা এই শূন্য পুরী থেকে অব্যাহতি পেয়ে মানুষের মধ্যে, মানুষের হাসি-গল্প-কোলাহলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগ্রহে—তাও গিয়েছিল বলাই। বেশ কিছুদিনই গিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ ছেলেদের ঠাট্টা-তামাশা টিটকিরি অসহ্য হয়ে উঠল। শুধু সহপাঠীরা নয়—ইস্কুল সুদ্ধ ছেলেরা ঠাট্টা করে, ক্ষেপায়, হাততালি দেয়। এমন এমন কথা বলে যে, মায়ের মতো রেলে গিয়ে গলা দিতে ইচ্ছে করে বলাইয়ের।

তাদেরও খুব দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অপর ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিজের বেশভূষাটা নিজের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হয়েছে বলাইয়ের। উড়ে পুকুরের ধারে ভাঙ্গা চালাটার মধ্যে যে হাজারী বুড়ি থাকে—দোরে দোরে বাসন মেজে অতিকষ্টে দিন কাটে যার—তার নাতি এককড়িও বলাইয়ের চেয়ে ঢের ভদ্র পোশাকে আসে। খাকী হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি—কিন্তু এই ঢলঢলে অথচ খাটো সাত-তালি দেওয়া জামা আর শতচ্ছিন্ন কাপড়ের চেয়ে তো ঢের ভাল। তাও শ্যামা আজকাল চোখে দেখতে পান না, তালি বাঁকাচোরা বসে, তার ওপর সেলাইয়ের সুতোর রঙের

ঠিক থাকে না। কারণ সুতো সবই ছেঁড়া কাপড় থেকে বার ক'রে নেন শ্যামা, জমির সাদা সুতোর সঙ্গে পাড়ের রঙীন সুতোও মিশে যায়।

যদি সত্যিই না থাকত তো এক রকম। দিদিমারও টাকা খরচ করতে হয় না। বলাই জানে, বড়মামী পুজোর সময় বলাইয়ের নাম ক'রে আলাদা টাকা পাঠান তার কাপড়-জামার জন্যে। সে টাকায় কাপড় কেনা হয় না কস্মিন্ কালে। শ্যামা বলেন, 'গরীবের আবার পুজো কি, পুজো তো বড়লোকের। কাপড় না থাকলে তবেই কাপড় কিনব—যদ্দিন চলে চলুক না। যার বাপ কিছু রেখে যায় নি, নিজে যে লেখাপড়া শিখল না, তার নবাবী অব্যেস করা ঠিক নয়।' মহা মাকে চিনেছে ইদানীং, নগদ টাকা সে দেয় না—যা দিয়েছে দু-একবার কাপড় কিনেই দিয়ে গেছে—কিন্তু সেগুলোও, একবার ক'রে পরিয়েই বাক্সয় তুলে রেখেছেন শ্যামা, শুধু বন্ধ থেকে থেকে সেগুলো বস্তাপচা হয়ে যাচ্ছে। সে কাপড়ের কথা তুললে বলেন, 'থাক না, ওদের তো আর খেতে দিতে হচ্ছে না, অবরে-সবরে কাজে লাগবে এখন। এক-আধটা ভাল কাপড় তুলে রাখা দরকার—নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন খেতে যেতেও তো কাজে লাগে!'...

বলাই জানে যে, 'অবরে-সবরে' তার কোনদিনই কাজে লাগবে না ও কাপড়। নেমন্তন্নই বা তাকে করছে কে? এই এতকালের মধ্যে একবার ও-বাড়ীর মেজদার বিয়েতে যা গিয়েছিল—সে সময় বহুকালের একখানা কাপড় বার ক'রেও দিয়েছিলেন শ্যামা—কিন্তু দীর্ঘকাল আলোর মুখ না দেখার ফলে সে কাপড়ে ভাঁজে ভাঁজে এমন একটা ছোপ ছোপ দাগ পড়ে গিয়েছিল যে তাকে আর যাই হোক ধোপদস্ত কাপড় বলা চলে না কোন মতেই। সকলেই ফিরে ফিরে তার কাপড়ের সেই দাগগুলো দেখছিল বারবার—বলাইয়ের বেশ মনে আছে। তাও, সেই তো শেষ!

কাপড়গুলো নষ্ট হচ্ছে—হয়ে যাবেও, তবু শ্যামা সেগুলো বার ক'রে কোন দিনও পরতে দেবেন না ওকে, তা বলাই জানে। এর কোন প্রতিকারও তার হাতে নেই। এক একবার মনে হয় যে, সে কোথাও পালিয়ে যায়—তার না-দেখা ছোটমামার মতো। কিন্তু সাহস হয় না। সে কিছুই জানে না এ পৃথিবীর—এই ওর পরিচিত দু-তিন ক্রোশ পরিধির বাইরে যে বিপুল জগৎ, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। এত-কালের মধ্যে ট্রেনে চড়ে নি কখনও। কথা বলার লোকের অভাবে, না বলে বলে মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাসটাও গড়ে ওঠে নি ভাল ক'রে। লেখাপড়াও জানে না। কোথায় যাবে সে, কি খাবে, কোথায় কে তাকে আশ্রয় দেবে—অনেক ভেবেও সে ঠিক পায় না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কী ভাবে অন্নসংস্থান করা সম্ভব, তা কল্পনা করার মতো অভিজ্ঞতাও নেই ওর। কারও সঙ্গে পরামর্শও করতে পারে না। ওর পরিচিত মানুষ বলতে ও বাড়ির ছেলেরা। তারা সকলেই ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়—তাছাড়া তারা ওকে জানোয়ার বা অর্ধ-মানুষের মতো কোন প্রাণী মনে করে—ভাল ক'রে কথাই বলে না ওর সঙ্গে। তাদেরও জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি বলাইয়েরও আছে।

এর মধ্যে একবার বড়মামী যখন এখানে আসে তখন কথাটা পেড়েছিল বলাই। অনেক সাহসে ভর করে অনেক কষ্টে বলেছিল, 'আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন মামীমা, আমি—আমি আপনাদের ওখানে চাকরের কাজ করব সেও ভাল, এখানে থাকলে আমার লেখাপড়াটড়া কিচ্ছু হবে না।'

ওর কথাটা বলার অসহায় দীন ভঙ্গীতে কনকের চোখে জল এসে গিয়েছিল—কিন্তু তবু বলাইকে নিয়ে যেতে সে পারে নি। প্রথমত আরও একটা খরচ বাড়াতে

সাহস হয় নি। তার নিজের ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে, তার ওপর গোবিন্দর ছেলের দায় চেপেছে। যত সস্তাগণ্ডার দেশই হোক, হেমের মাইনেও এতদিনে সত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছে। এখানে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে যা থাকে তাতে এতগুলো প্রাণীর খরচা চালাতে প্রাণান্ত হয় কনকের। মাসে আট আনা দিলেও বাসন মাজার একটা ঝি পাওয়া যায়—সেটুকুও বিলাস বলে মনে হয়। সর্বদাই টানাটানি করে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে আরও একটা পেট যোগ হওয়া, তার লেখাপড়ার খরচা—অনেকখানি দায়িত্ব এবং বোঝা। বলাই গেলেও মাসিক টাকাটা কমাতে দেবেন না শ্যামা। দু-একবার যে সে চেষ্টা করে নি হেম তা নয়—কিন্তু প্রস্তাব মাত্রে শ্যামা মাথা খুঁড়ে গালিগালাজ দিয়ে শাপ-শাপান্ত ক'রে এমন পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা করেছেন যে তখন মনে হয়েছে যে-কোন মূল্যেও শান্তি কেনা শ্রেয়। সেদিকে কোন সুবিধেই হয় নি—মাসে মাসে সেই কুড়ি টাকাই টেনে যেতে হচ্ছে।

সুতরাং আয় যেখানে বাঁধা, মোটা ব্যয় কিছু সঙ্কোচ করা সম্ভব নয়, সেখানে আবার একটা খরচের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে সাহস হয় নি কনকের। সেই কথাটাই ওকে বুঝিয়ে বলেছিল কনক। বলাই সব বোঝে নি হয়ত—বিশ্বাসও করে নি। তবে মোটা মোদ্দা কথাটা বুঝেছিল। কনক আরও বলেছিল, 'তা ছাড়া মা এখানে একা—একেবারে দোসর-হীন—তুমি চলে গেলে তো দেখবারও কেউ থাকবে না। বুড়ো মানুষ, দিন দিন অথর্ব হয়ে পড়ছেন- এইভাবে একেবারে একা ফেলে রাখা কি উচিত? মরে দুদিন পড়ে থাকলেও তো কেউ একটা খবর পাবে না। আর মা-ই বা কি ভাবেন! পাড়ার লোকেও ছি-ছিক্কার করবে। মা আমাকেই কতকগুলো গালমন্দ শাপ-মন্যি দেবেন। সে আমি পারব না বাবা। তা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

সে অন্য ব্যবস্থাটা যে কী হ'তে পারে, তা কনকও কিছু বলতে পারে নি অবশ্য। বলাই তো বলতে পারেই নি। জামা-কাপড় চেয়ে কোন লাভ নেই। মিছিমিছি ওদের খরচান্ত করে লাভ কি? সুতরাং সে চুপ করেই গিয়েছিল। ম্লান মুখে নয়—বলাইয়ের মুখ ম্লানও হয় না ইদানীং। কেমন যেন ভাবলেশহীন পাথরের মতো হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারাটা। কতকটা ওর মায়ের মতোই। দেখে বুকের মধ্যেটা ছাঁৎ করে ওঠে কনকের।

তবু কনক ওর সমস্যার কোন মীমাংসাই করতে পারে নি। কোন ব্যবস্থাই হয় নি। যেটা হয়েছে—বলাইয়ের সাধ্যর মধ্যে যেটা—সেটাই সে করেছে। ইস্কুলে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন কী হয়েছে—অকারণ বুঝেই হয়ত—কোন কারণও দেখায় নি। হঠাৎই একদিন বলেছে, 'আর যাব না'—বই-খাতাগুলো তাকে তুলে রেখে দিয়েছে খুব সহজভাবে, খুব ঠাণ্ডা মাথাতে—যেন হিসেব করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছে।

তাতে শ্যামারও বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় নি। দু-একবার খুব মৃদু গোছের একটা অনুযোগ ক'রে একেবারে চুপ ক'রে গেছেন। ও প্রসঙ্গই আর উত্থাপন করেন নি। মনের কোন নিভৃত প্রত্যন্ত দেশে যেন তাঁর একটা আপত্তিই ছিল কোথায় —বলাইয়ের লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধে—একটা অতি ঘোর স্বার্থপর আশঙ্কা। লেখাপড়া শেখার অর্থই হ'ল তাঁর কাছে চাকরি পাওয়া, বিবাহ হওয়া—আবার পাখীর ডানা গজানো। তার-পরই সে পৃথক হয়ে উড়ে চলে যাবে! এ সবই জানা কথা। একটার পর একটা। ছবিটা মনের মধ্যে পর পর যেন আঁকা হয়ে আছে তার মর্মান্তিক সত্য চেহারায়। পরিষ্কার দেখতে পান তিনি সেগুলো, ভৃগুসংহিতার ফলাফলের মতো। তাই তাঁর

অবচেতন মন একান্ত-ভাবে চাইছিল বলাই মূর্খ হয়ে, অপদার্থ হয়ে থাক। জীবন-ধারণের জন্যে যেন সর্বদা তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় ওকে। কোথাও না পালাতে পারে সে কোনদিন। পাখীর পায়ে শিকল দিয়ে রাখলেও কোন দিন সে শিকল কেটে উড়ে পালাতে পারে—কিন্তু যার ডানা কেটে দেওয়া হ'ল বা যার ডানা গজাল না আদবেই—সে কোনদিনই উড়তে পারবে না। এই আশ্বাসটুকুকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান শ্যামা!

বলাই মূর্খ। বলাই অসামাজিক—শহরে-ধরে-আনা বন্য জন্তুর মতোই অসহায় সে—কিন্তু একেবারে নির্বোধ নয়। সহজাত বুদ্ধি কিছুটা তার আছেই। দিদিমার এই স্বার্থপর চেহারাটা তার কাছে ঢাকা থাকে না, এটুকু সেও বুঝতে পারে যে, তিনি ইচ্ছে ক'রেই ওকে অমানুষ ক'রে রাখছেন।

আর কথাটা যখন ভাবে এক-একবার, তখন একটা ব্যর্থ, প্রতিকারহীন অন্ধ রোষে যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে শোধ নিতে ইচ্ছে করে এই অবিচারের। সে সময় ওর মনে হয় এক-একদিন যে—এই বাড়িটায়, তার এই জীবন্তসমাধির জায়গাটায় নিজে হাতে আগুন লাগিয়ে দেয় সে। কঠিনও নয় বিন্দুমাত্র, কোণে কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে থাকা, ঘরে দালানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা পাতার রাশিতে একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে দেওয়ার ওয়াস্তা। চোখের নিমেষে বেড়াআগুন জ্বলে উঠবে চারিদিকে। বেশ হয়—ঐবুড়িটা পুড়ে মরে। আর সে-ও। এ জন্তুর জীবন রেখেই বা লাভ কি, তার চেয়ে তার মা যেমন করেছে—এ জন্মের মতো এ জীবন না হয় নিজেই শেষ ক'রে দেবে সে!

॥ ২ ॥

সেদিনকার সে ঝড়ের মধ্যেও এই মনোভাবটাই বোধ হয় প্রকট হয়ে উঠেছিল বলাইয়ের।

প্রথম যখন ঝড়টা ওঠে, তখন বোঝা যায় নি একটুও যে, কোন অঘটন বা এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। পুজোর সময় বাদ্‌লা তো হয়ই—এই সেই রকম একটা কিছু মনে করেছিল সকলে। সারাদিনটাই মেঘলা মেঘলা, মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি--এই ভাবেই চলছিল, বিকেলের দিকে শুধু হাওয়ার বেগটা একটু বেড়েছিল—এই মাত্র। তবু তখনও ঝড় বলে তাকে বোঝা যায় নি।

সেদিন ষষ্ঠী, শ্যামার উপবাস। নিরম্বু নয়, ষষ্ঠীতে নিরম্বু উপোস করতে নেই পোয়াতীদের—তবে ভাতটাও খেতে নেই। সব ষষ্ঠী শ্যামাদের নেই, কিন্তু 'দুগ্‌গো ষষ্ঠী'টা আছে। যদিও ছেলেদের গাল না দিয়ে জল খান না প্রায় কোনদিনই, ঠাকুর দেবতার কাছে আসছে জন্মে আঁটকুড়ো হয়ে জন্মাবারই প্রার্থনা জানান নিত্য—তবু ষষ্ঠীর উপবাস পালনেও ভুল হয় না কখনও। পাঁচ পয়সার পুজোও পাঠিয়ে দেন সিদ্ধেশ্বরীতলায়। বাড়িতে পুজোর পাট অনেকদিনই উঠিয়ে দিয়েছেন, অত কাণ্ড করে কে, লোক কই তাঁর? সিদ্ধেশ্বরী কালী—ও'র মধ্যেই সব দেব-দেবীর অধিষ্ঠান, তাই ওখানেই যা কিছু পুজো পাঠিয়ে দেন আজকাল। জামাইবাড়ি বিগ্রহ আছে, বারো মাসে তের পার্বন তাদের করতেই হয়—সেখানেও পুজো দেওয়া চলে, কিন্তু জামাইবাড়ি পাঁচ পয়সার পুজো দেওয়া চলে না। সেটুকু চক্ষুলজ্জা এখনও তাঁর যায় নি। সিদ্ধেশ্বরীতলায় অত হিসেব কেউ করবে না, পয়সায় পয়সা মিশে যাবে,

ও-ই তাঁর ভাল। হুঁশও থাকে শ্যামার—ঘরে পাঁজী নেই, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে ষষ্ঠী বা একাদশীর দিনগুলো ঠিক জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন পাড়ার জীবন চাটুয্যেকে।

ভাত খেতে নেই—ময়দা খাওয়াই বিধি, কিন্তু মুখে দেবার মতো একটু কিছু থাকলে আর ওসব হাঙ্গামা করেন না। পাকা কলা প্রায়ই থাকে ঘরে, আর নারকোল। নারকোল কুরে তার সঙ্গে তিন-চারটে কলা চট্‌কে খেয়ে নেন। শেষে একটু গুড় গালে দিয়ে জল খান। ফলের পরই জল খেলে চণ্ডালের আহার হয়, তাই একটু মিষ্টি খাওয়া বিধি। কিন্তু সে যাই হোক, এইতেই চলে যায় তাঁর একটা দিন, এই-তেই চালিয়ে নেনও সাধারণত। এবারে বড় বিপদে পড়েই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কলা পাকে নি আজ একমাসের মধ্যে এক কাঁদিও। পাক্‌ত—রঙ্ ধরব-ধরব হয়েও ছিল—কিন্তু পুরো দুটি কাঁদি কলা 'কোন্ হাভাতের ঘরের বেটাবেটিরা', 'কোন্ আঁটকুড়োর পুষ্যিপুত্তুররা' কেটে নিয়ে গেছে চুরি করে। আর যা আছে নিতান্তই ছোট, অপুষ্ট। কেটে চট জড়িয়ে রাখলেও পাকবে না এখন।

অন্য ব্যবস্থা বলতে রুটি-পরোটা নয় অবশ্য। বাজার থেকে ময়দা-আটা আনিয়ে রুটি গড়তে বসার মানুষ নন শ্যামা। অবশ্য তার একটা অজুহাতও আছে, দাঁত সব থাকলেও জখম হয়েছে একটু—রুটি-পরোটা চিবোতে কষ্ট হয়। আরও কারণ আছে, রুটির সঙ্গে তরকারী চাই। এই সব দিনে যা সাধারণ দস্তুর তাঁর, তাই করেছিলেন। বহুকাল পরেই এ-পাট করলেন তিনি—ক্ষুদের সঙ্গে এক গাল ডাল ভিজিয়ে সরু-চাকলি করেছিলেন খানকতক। তা-ই দুই দিদি-নাতিতে দুপুরবেলা খেয়েছিলেন বাড়তি তিন-চারখানা পড়েছিল বলাইয়ের ও-বেলার মতো।

জিনিসটার ঘটা যত না থাক, ল্যাঠা আছে। এক হাতে চাল-ডাল বাটা, গোলা, আবার একখানি একখানি করে তোলা—এইতেই খেয়ে উঠতে উঠতে বেলা চারটে বেজে গিয়েছিল। তারপর বাসন মেজে, রান্নাঘর আর দাওয়া নিকিয়ে কাপড় কেচে আসতে আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাদিন একটানা খাটুনি আজকাল আর পেরে ওঠেন না—ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যে হলে তো আর যেন বয় না, কেবলই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। শুয়েই পড়েন সাধারণত, তবে ঘরদোর তখন সারা হয় না। বলাইয়ের খাওয়ার সময় একবার লম্প জ্বালাই হয়—সেই সময়ই সেসব সেরে নেন। অবশ্য অন্য দিন ভাতের ব্যবস্থা, রান্না-ঘরেই হাঁড়িতে থাকে—সেখানে গিয়ে ঠাঁই করে বেড়ে দিতে হয়। আজ সেসব কোন পাট নেই, সরুচাকলি চারখানা এক চিল্‌তে কলাপাতার ওপর বাটি চাপা আছে দালানের মধ্যে—যখন হোক বাটি তুলে খেয়ে নিতে পারবে। হাওয়ার গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না, ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি তবু হাওয়ার বেগে ছুঁচের মতো বিঁধছে গায়ে এসে। সন্ধ্যা দেবার চেষ্টা করলেন শ্যামা—প্রদীপ জ্বলল না। ঘরে দ্বিতীয় আলোর ব্যবস্থা বলতে অদ্বিতীয় লম্প—সে-ও এ বাতাসে জ্বলবে না। সুতরাং দিনের আলোর শেষ আমেজটা থাকতে থাকতে বাইরের ঘর, রান্নাঘরে তালা দিয়ে সদর দরজা ভেজিয়ে খানকতক ইট সাজিয়ে তা আট্‌কে (খিল নেই বহুকাল) দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে দালানে এসে আশ্রয় নিলেন।

আলো জ্বলে না কোন দিনই, তাতে কোন অসুবিধাও হয় না। শ্যামা শুয়ে পড়েন বটে সকাল সকাল কিন্তু জেগে থাকেন অনেক রাত পর্যন্ত। তিনিই রাজ-গঞ্জের ভোঁ শুনে শুনে সময় নির্ণয় করেন, যথাসময়ে উঠে খেতে দেন নাতিকে। নিজেরও কিছু খাওয়ার প্রয়োজন থাকলে সেই সময়ই খেয়ে দোর-তাড়া দিয়ে শুয়ে পড়েন। বলাই সন্ধ্যা থেকে—যতক্ষণ না শ্যামা উঠে খেতে দেন—মায়ের মতো দালা-

নের একটা জানলাতে চুপ করে বসে থাকে (শ্যামার ভয় হয় মধ্যে মধ্যে—মায়ের রোগে যাবে না তো শেষ অবধি?)—অন্ধকার-জমাট-হয়ে-থাকা কাঁটাল গাছটার পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিগুলো জবলে আর নেভে, বসে বসে তাই দেখে। বাইরে নক্ষত্রের একটা আলো থাকে, এ-বাড়ির উঠানে তাও নামে না, সে ক্ষীণ আলো এই অসংখ্য গাছপালা পত্রপল্লবের দুর্ভেদ্য অন্তরাল ভেদ করতে পারে না। তা হোক, তবু দালানের খোলা দোরের কাছটাতে একটু আলোর আভাস পাওয়া যায়, দিদিমার বিছানাটাও আন্দাজে আন্দাজে ঠাওর করতে পারে।

আজ কিন্তু দুজনেরই আলোর কথাটা মনে হ'ল। হাওয়া আর জলের ঝাপ্‌টায় জানলা খুলে রাখা গেল না, দরজাও বন্ধ করতে হ'ল। তার ফলে ভেতরের অন্ধকার ভয়াবহ হয়ে উঠল একেবারে—যেন কে গলা টিপে ধরছে ওদের। আলো নিভিয়েই শুয়ে পড়ে অন্যদিন দরজা বন্ধ করে, তবু জানলাটা খোলা থাকে—আজ সবই বন্ধ। শ্যামার নিজেরই হাঁফ ধরার মতো হ'ল—তিনিই বলতে বাধ্য হলেন, 'তা না হয় লম্পটাই জবাল না বাপু একটু—দোর-জানলা বন্ধ আছে, হাওয়ার ভয় তো নেই।'

কিন্তু লম্পটা জবালতে গিয়ে দেখা গেল তাও আছে। পুরনো বাড়ির জানলা-কপাট কম দামেরই ছিল নিশ্চয়, নিবারণ দাসের সঙ্গতি বেশী ছিল না—একেবারে নিরন্ধ্র চাপা নয়। বেশ একটু-আধটু ফাঁক আছে, কোথাও কোথাও আল্‌গাও হয়ে গেছে কাঠ কিছু কিছু। সেই সব সামান্য সামান্য ফাঁক দিয়েই প্রচুর বাতাস আসছে। সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস ঢোকার ফলে একটা শিস্‌ দেবার মতো শব্দ হচ্ছে অবিরাম। সে হাওয়ায় বন্ধ ঘরেও লম্পর শিখা স্থির থাকে না নিভে যাওয়ার মতোই অবস্থা হ'তে লাগল বার বার। বেগতিক দেখে শ্যামা নিজেই কেঁকেচুরে উঠে প্রায় হামা দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি সেটা জলের কলসীর খাঁজে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে নিভে যাওয়াটা বাঁচলেও, শিখার কেঁপে কেঁপে ওঠাটা নিবারিত হ'ল না। আর তার ফলেই ধোঁয়া বেরোতে লাগল প্রচুর, দেখতে দেখতে বিশ্রী কেরো-সিনের গন্ধে ঘর ভরে উঠল। অর্থাৎ নতুন এক উপসর্গের সৃষ্টি হ'ল।

বাইরে বাতাসের শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে ওধারে। ক্কড়-ক্কড়কটাৎ—বাঁশবনে শব্দ হচ্ছে। কট্‌ কট্‌ শব্দ করে বেঁকে বেঁকে উঠছে বড় বাঁশগুলো। বাঁশে বাঁশে ঠোকাঠুকি হচ্ছে অবিরত। রান্নাঘরের মটকাতে চড় চড় করে টান পড়ছে মধ্যে মধ্যে, সমস্ত চালাটা যেন উঠে পড়ছে খানিকটা ক'রে। আরও বারকতক এমন টান পড়লে উড়েই যাবে হয়ত—পুরনো দড়ি, সে প্রবল আকর্ষণ রুখতে পারবে না। ওদের মিষ্টি-আমড়ার গাছটা বোধ হয় পড়ে গেল পুকুরের মধ্যে অন্তত সেই রকমই একটা বিরাট শব্দ হ'ল। গাছ আরও ভাঙ্গছে বোধহয়—মড় মড় ক'রে বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ছে, সে শব্দ এই হাওয়ার শব্দ ভেদ করেও শুনতে পাচ্ছে ওরা। দুম্‌দাম্‌ নারকোল পড়ছে, সুপুরি নারকোলের বড় বড় পাতাগুলো বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে এসে আছড়ে পড়ছে ওদের দেওয়ালে, ওদের ছাদে—অনা গাছের ওপরও। ঝড়ই—এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। রীতিমতো বিরাট ঝড় একটা। শ্যামার মনে পড়ল সেবারের সেই আশ্বিনের ঝড়ের কথা। অস্পষ্ট হ'লেও মনে আছে সে কথাটা। তেমনি প্রলয় কাণ্ড একটা কিছু হবে না তো? আশ্বিন তো শেষ হয়ে আসতে গেল বাপু, আজই বোধহয় সংক্রান্তি কিম্বা আজ কার্তিক মাসের পয়লা। কে জানে বাপু!...

দূরে বোধহয় কার টিনের চালা উড়ে গেল একটা—বিকট ঝনঝন শব্দ হ'তে লাগল কিছুক্ষণ ধরে—গাছে গাছে বা বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে বেধে। গাছও ভেঙ্গে পড়ছে মধ্যে মধ্যে—সে শব্দ ওদের পরিচিত, এখান থেকে ওই ঘরের

মধ্যে বসেই বলে দিতে পারে কত বড় গাছ পড়ল। ইস্—সদর দরজাটাও থাকবে না বোধহয়—শুয়ে শুয়েই বিলাপ করতে লাগলেন শ্যামা—সামান্য দশ-বারোখানা ই'ট এ চাপ আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে?...

ভেতরে কেরোসিনের ধোঁয়া অসহ্য হয়ে উঠছে। ভুষোগুলো বাতাসে উড়ছে ঘরের মধ্যেই—বলাইয়ের মুখে মাথায় এসে পড়ল কতকগুলো। অবশেষে এক সময় 'দুত্তোর' বলে একটা অস্ফুট শব্দ করে দালানের দরজাটা খুলে ফেলল বলাই। দমকা হাওয়ার সঙ্গে জলের ছাট ঢুকে দালানের অনেকখানি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও গেল দপ্ ক'রে নিভে।

'ওকি, ওকি অ মুখপোড়া—আবার দরজা খুললি কেন, যথাসর্বস্ব যে ভিজে গেল—ও আবার কি ঢং? বাগানে যাবি নাকি এত রাত্তিরে আবার? পেট ব্যথা করছে?'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তবে তখনই উঠতে পারলেন না। আজকাল এক বার শুলে ওঠা বড় কষ্টকর তাঁর পক্ষে। বেশ একটু সময় লাগে। শ্যামা শুয়েই পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'কী রে—সঙ্গে যাব? দাঁড়াতে হবে?'

বলাই কোন উত্তরই দিল না। সাবধানে একটা কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রইল সেটা। দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল সামনে।

বাইরে তখন প্রকৃতির একটা বিরাট পাগলামি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগ যথেষ্ট এমনিতেই, তার মধ্যেই আবার বোঁ-ও-ও ক'রে যেন ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠছে এক একবার। সে সময়ে দোর-জানলাগুলো ঝনঝন ক'রে কেঁপে উঠছে। ভাগ্যে অভয়পদ সব জানলাতে দরজায় লোহার আল্‌তারাপ ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিয়ে গেছে, আগেকার জরাজীর্ণ কাঠের ছিট্‌কিনি থাকলে দোর-জানালা বন্ধ রাখা যেত না।

রান্নাঘরের চালাটার অবস্থাই খুব খারাপ—ক্ষ্যাপা হাওয়ার দমকা আঘাতে ফুলে ফুলে উঠছে, বেশ খানিকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে এক-একবার। মনে হচ্ছে এখনই মটকার বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যাবে চালাটা। অথচ ঠিক ছিঁড়ছেও না, শেষ পর্যন্ত শুধু ওর সেই সহস্র নাড়ির পাকে পাকে প্রবল টান পড়ায় চালাটা যেন ককিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠছে সেই সময়টায়।

......দূরে কাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে—বুঝি চেঁচিয়ে কাঁদছে কারা—অবশ্য এই বাতাসের তাণ্ডবে কান্নার মতো শব্দ তো চারিদিকেই—তবু মনে হচ্ছে বাউরীদের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ উঠছে একটা। ওদের টিনের চালা—উড়ে গেছে সম্ভবত, কিম্বা ঘরই ভেঙ্গে পড়েছে সবসুদ্ধ। গাছ-পালা তো বোধহয় কারও বাগানে থাকল না—প্রায়ই মড়-মড়-মড়াৎ শব্দ উঠছে, বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ছে কোথাও না কোথাও। এই বোধহয় প্রলয়—বলাই মনে মনে বলল।

এবার শ্যামা উঠে এলেন বেঁকে চুরে কোমরটা সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ওর পেছনে, 'বলি কী হচ্ছে কি, ঘরে যে নদী নালা বয়ে গেল। এমন ক'রে দাঁড়িয়ে ভিজছিস কেন?'

বলাই যেন এতক্ষণে একটু নড়ে চড়ে উঠল আবার। বলল 'তুমি দোর দাও দিদিমা, আমি বাইরে থাকি, ডাকলে দোর খুলে দিও।'

'আ মর, বাইরে থাকবি কি, চারদিকে পাতা উড়ছে বড় বড়, গাছের ডাল ভেঙ্গে এসে পড়েছে, শেষে কি একটা খুন-খারাপি কাণ্ড হবে?'

'তা হোক। তুমি দোর দাও। আমি রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসছি।'

বলতে বলতেই তরতরিয়ে উঠোনে নেমে গেল সে। যেতে গিয়ে সেই জল-কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লও একবার—'মাগো!' বলে অস্ফুট শব্দও ক'রে

উঠল ভয়ে, কারণ মনে হ'ল কী যেন একটা বিরাট পত্রপল্লবের স্তূপের মধ্যে জড়িয়ে গেল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকে উঠতে আশ্বস্ত হ'ল। কাদের একটা প্রকাণ্ড পেঁপে গাছ—ফুল-ফল সুদ্ধ উড়ে এসে পড়েছে তাদের উঠোনে। তাদের নয়, তাদের এতবড় পেঁপে গাছ নেই। হয়ত মল্লিকদের বাড়ি কিম্বা চাটুয্যেদের বাড়ি থেকে উপড়ে চলে এসেছে ঝড়ের টানে।

শ্যামা নিরুপায় হয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর এ বয়সে এসব দস্যিপানা সয় না। ভিজে জ্বর হয় ও-ই জব্দ হবে, টাঙিয়ে রেখে দেবেন তিনি, একগাল মুড়ি খাইয়ে। আদর সোহাগ ক'রে ডাক্তারও ডাকবেন না, কিম্বা সাগু-বার্লি-মিশ্রি এনে তোয়াজ করে খাওয়াতে বসবেন না। পাগল, ছোঁড়াটাও পাগল হয়ে গেছে। মায়ের রোগে গেছে একেবারে।

দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে এসে আবার শুয়ে পড়লেন। যা হবার হোক গে, তাঁর মাথায় ছাদটা না ভেঙে পড়লেই হ'ল।...

বলাইও পেঁপে গাছ থেকে মুক্তি পেয়ে দুটো বড় বড় নারকোল পাতায় হোঁচট খেয়ে দাওয়ায় এসে উঠল। চালটার গতিক ভাল নয়, মনে মনে হিসাব করতে বসল বলাই, বছর চারেক আগে বড় মামা শেষ চাল বাঁধিয়েছিলেন দাঁড়িয়ে থেকে—সে দড়ি কি এতদিনে পচে যায় নি?...তা যাক গে, চালাটা উড়ে গেলেও দেওয়াল চাপা পড়বে না। পাকা দেওয়াল। তবে তার ভয় করতে লাগল অন্য কারণে। সদর দরজায় কে যেন দুম দুম ক'রে লাথি মারছে। বেশ জোরেই মারছে, ঝন-ঝন ক'রে উঠছে কপাট দুটো। ঘর থেকে শোনা যায় নি এতক্ষণ, এখানে এসে বেশ স্পষ্ট শুনছে। কে এল এই রাত্রে—এই দুর্যোগের মধ্যে? ডাকাত নয় তো? তার দিদিমার ধন-অপবাদ বেশ ভালো রকমই আছে, ডাকাতি করতে হ'লে এই প্রকৃষ্ট অবসর—আজ একটি প্রাণীও বেরোবে না ঘর থেকে, ওদের খুন ক'রে মেরে রেখে গেলেও না। শুনতেই পাবে না কেউ তাদের চিৎকার।

আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে রইল বলাই। ওদিকে লাথি মেরেই যাচ্ছে তারা। এখনই হয়ত কপাটটা ভেঙে পড়বে, বেশ বুঝতে পারছে বলাই। তারপর—

কিন্তু কপাটটা ভাঙল না অনেকক্ষণ অবধি। লাথি চলতেই লাগল সমানে। ক্রমে বলাইও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। লাথি কেউই মারছে না, ওটাও হাওয়ার কীর্তি। হাওয়াতেই ঝন-ঝন ক'রে উঠছে দরজাটা। একটু আশ্বস্ত হ'ল সে। আবার নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশ-ভরা মেঘ কিন্তু তারই মধ্যে কেমন যেন একটা অনৈসর্গিক আলো ফুটে উঠেছে দিক্‌চক্ররেখায়। সে আলো মনে কোন অভয়ের বার্তা আনে না, আতঙ্ক জাগায়। এখান থেকে আকাশটা এতখানি দেখা যায় না অন্য দিন, আজ গাছ-পালা বিস্তর ফাঁক হয়ে যাওয়ায় এতটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাছপালা পড়েই যাচ্ছে বিপুল শব্দ ক'রে। ছোটখাটো গাছ অথবা বড় গাছের ডাল মাটির দিক থেকে বাতাসের টানে শূন্যে উঠে যাচ্ছে, শূন্যেই পাক খাচ্ছে ঘূর্ণি হাওয়ায়, পড়ব পড়ব ক'রেও আবার দূরে সরে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে পড়ছে কে জানে, কোথাও পড়বে কিনা আদৌ তাই বা কে জানে! একটা-দুটো বহুক্ষণ ঘুরে—যেন ক্লান্ত হয়েই—ওদের উঠোনে বা ছাদে এসে আছড়ে পড়ছে, আবার চলেও যাচ্ছে হয়ত খানিক পরে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের সময় বড় বড় গাছের ডালগুলোকে ঘুরপাক খেতে দেখলে যেন কেমন ক'রে ওঠে মনের মধ্যে।

ঝড় বেড়েই চলল রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতি সত্যিই যেন ক্ষেপে গিয়েছে।

বহু হাজার পাগলা হাতি যেন ছেড়ে দিয়েছে কে আকাশে। এমন দাপাদাপি বলাই জীবনে কখনও দেখে নি বা শোনে নি। ঝড় জল বর্ষাকালে হয়ই, কিন্তু সে ঝড় যে এমন প্রলয়ঙ্কর হ'তে পারে—তার সামনে মানুষের সমস্ত শক্তিকে এত তুচ্ছ এত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়—সে অভিজ্ঞতা ওর ছিল না। কেউ ওকে বলে দেয় নি, বললেও এ জিনিস ধারণা করা সম্ভব নয়।

জলে ভিজে ভিজে শীত করতে লাগল বলাইয়ের, দাঁতে দাঁতে লেগে কাঁপুনি শুরু হ'ল—তবু সে ভেতরে গেল না বা দিদিমাকে দোর খুলে দিতে বলল না। বরং কেমন যেন একটু অদ্ভুত আনন্দ বোধ করতে লাগল সে এই কষ্টের মধ্য থেকেই। পিশাচের মতো এই ধ্বংসলীলা দু চোখ, দুই কান ভরে পান করতে লাগল যেন। যত গাছপালা ভাঙে, যত দূরে পাড়ায় পাড়ায় চালা উড়ে যাবার বা বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ হয়, ততই যেন আনন্দ বাড়ে তার। হি-হি ক'রে হাসে সে কাঁপতে কাঁপতেই। আর আপন মনে বলে, 'মর, মর, সবাই মর। সবাই মিলে সপুরী এক গাড়ে যা। কাল সকালে কেউ না বেঁচে থাকে আর। পড়ুক না, সব বাড়িগুলো ভেঙে পড়ুক—ত'হলে আমি হরির নোট দিই—সব যাক। সব যাক্!'

পরের দিন সকালেও সে ঝড় থামল না। ঝড়ও না, জলও না। ঘর থেকে বেরোতেই পারে না কেউ। বারোয়ারীতলার ঠাকুর নাকি গলে গেছে জল পড়ে পড়ে. মহাদেবের মা ভিজতে ভিজতে এসে খবর দিয়ে গেল, 'এমন অলুক্ষুণে কাণ্ড জম্মে দেখি নি মা, কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে বাঁচাব কেমন ক'রে তাই ভেবে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।...তা এই কি তা'হলে কলিযুগের শেষ হ'ল— হেই বামুন মা?'

সে তথ্য শ্যামাও যোগাতে পারেন না। সকালে উঠে বাগানের চেহারা দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেছে। ফলন্ত গাছ সব—কোথায় যেন কী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। কার একটা নারকেল গাছের মাথা এসে পড়েছে তাঁর পুকুরের জলে, তাঁরও একটা নারকেল গাছ পড়ে গেছে। লোকসান যা হবার তা তো হয়েছেই—এখন এই জঞ্জাল তিনি মুক্ত করাবেন কাকে দিয়ে—কত দিনে? পয়সা খরচ ক'রে লোক লাগাতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত? এসব যে তাঁরা দিদি-নাতিতে পারবেন বলে মনে হয় না!...

রাত্রে জেগে থাকব মনে ক'রেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শ্যামা। শেষরাত্রে হঠাৎ চমক ভেঙে গাঢ় অন্ধকারে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন একবার, কারণ তখনও সে গর্জন সমানে চলছে বাইরে, দাপাদাপি গর্জনের কিছুমাত্র বিরাম নেই।...তার পর একটু সামলে নিয়ে ব্যাপারটা মনে করবার চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল বলাইয়ের কথা। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অল্প অস্পষ্ট ভোরাই আলোতে দেখলেন সে তখনও দাওয়ায় বসে বসে ভিজছে আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। অগত্যা শ্যামাকেও ভিজে ভিজে নেমে আসতে হয়েছিল, তিনিও হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন একবার পেঁপে গাছটায়—তবে তাঁর খুব লাগে নি—উঠে বলাইয়ের কনুইটা ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন।

'আপদ বালাই! সাত জন্মের আপদ বালাই সব! যত রাজ্যের আপদ-বালাইরা আমার কাছে মরতে আসে একধার থেকে। আর কোথাও তো যেতে পারে না, আর কোন চুলো মনে পড়ে না তো! যেন সার বেঁধে বসে থাকে সব আমাকে জ্বালাবে-পোড়াবে বলে।'

বকতে বকতে ওর কাপড় ছাড়িয়ে গা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন কাঁথা

চাপা দিয়ে। বলাইও কোন প্রতিবাদ করে নি, কাঁপতে কাঁপতে তখন রীতিমতোই কষ্ট হচ্ছিল তার, বিছানার উষ্ণতার মধ্যে আসতে পেয়ে বেঁচে গেল সে।

সেই থেকেই সে ঘুমোচ্ছে। কত বেলা হচ্ছে তা শ্যামা ঠাওর পাচ্ছেন না। রাজগঞ্জের ভোঁ-ও বোধহয় বন্ধ আছে—কিম্বা এই আওয়াজে শুনতে পাচ্ছেন না।...

শ্যামা আর এর ভেতরে ঘর-দোর মোছা বাসি-পাটের চেষ্টা করলেন না। অবিরাম আবর্জনা বাড়ছে, কত করবেন তিনি? ঘরের বাইরেই বেরনো যাচ্ছে না, ভিজে ভিজে এসব করতে পারবেন না।

আজ সপ্তমী পুজো—আঠা-নষ্টির মধ্যে দুটি ভাত ফুটিয়ে খেলে খাওয়া যেত—বলির হাঁড়িতে খেতে নেই, তা বলে কি ভোরবেলা হয়? ওসব মানেন না শ্যামা, সকাল ক'রে দুটো খেয়ে নিলেই হ'ল, তাতে বলির হাঁড়ির দোষ হবে কেন!—তা আজ আর সে ব্যবস্থা করা গেল না। কত বেলা তা-ই তো ঠাওর হচ্ছে না। মনে পড়ল বাসি সরুচাকলি ক'খানা পাতাতে বাটি-ঢাকা পড়ে আছে, বলাই খায় নি—হয়ত এলিয়ে নাল কেটে গেছে একটু একটু—তা হোক্, ঐগুলোই তিনি খাবেন'খন বলাইকে এক গাল ডাল-ভাতে দিয়ে দুটো ভাত খাইয়ে দেবেন, যখন হোক। বলাই উঠুক। রান্নাঘরের মধ্যেই পাতার জ্বালে তিজেলটা ক'রে ভাত চাপিয়ে দেবেন তখন।

শ্যামাও স্তব্ধ হয়ে বসে বসে প্রকৃতির এই অভাবনীয় তাণ্ডব দেখতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিক থেকেই একটু-একটু করে কমে এল ঝড়-জলের দাপট। পুরো দুদিন ধরে অশোভন মাতামাতি করার পর যেন শ্রান্ত হয়ে পড়লেন প্রকৃতি। অষ্টমীর দিন ভোর থেকে নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল চারিদিক। একটু একটু ক'রে পৃথিবী আবার তার স্বাভাবিক জীবন-স্পন্দন খুঁজতে শুরু করল, থেমে-যাওয়া নিঃশ্বাসটা ভরসা ক'রে টানতে আরম্ভ করল আবার।

কিন্তু এ স্তব্ধতা শ্মশানের স্তব্ধতা। যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্ষতিই চোখে পড়ে শুধু। যা কিছু শোনা যায়—শুধু মানুষের সর্বনাশের বিবরণ। বিশেষত গরীব মানুষের। তাদের ঘর গেছে, বাড়ি গেছে, গরু গেছে, ছাগল গেছে, ধান গেছে, চাল গেছে—প্রাণও গেছে বহু জায়গায়। মা এবার এসেছেন যেন শ্মশানবাসিনী ভৈরবীর বেশে, পুত্র-কন্যা নয়—ডাকিনী-যোগিনীদের সহচরী ক'রে। তাদেরই তাথিয়া তাথিয়া নাচে পৃথিবী টলমল করেছে দুদিন, প্রলয়ের আভাস ঘনিয়ে এসেছে তার বুকে। আজ তারা বিদায় নিয়েছে কিন্তু শ্মশানই করে রেখে গেছে চারিদিক।...

তবু তখনও সর্বনাশের পরিমাণটা পুরো জানা যায় নি। কারণ জানার উপায় ছিল না। খবর পাওয়া গেল কদিন পরে। সত্যি-সত্যিই সর্বনাশ হয়ে গেছে মেদিনীপুরে। সেই চীনাসাগরের হারিকেন বা টাইফুন যেন পথ ভুলে এসে হাজির হয়েছিল বঙ্গোপসাগরের কালো জলে। সে তার চিহ্ন রেখে গেছে মৃত্যুতে আর ধ্বংসেতে। সমুদ্র থেকে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠে বড় বড় দোতলা তেতলা বাড়ি ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, সে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আতঙ্কে মূর্ছাতুর হয়ে পড়েছে অধিকাংশ প্রাণী, প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে হাত-পা ওঠে নি তাদের। এ-রকম যে হয় তাই কারও জানা ছিল না, স্মরণকালের মধ্যে এরকম মূর্তি সাগর-জলের তারা দেখে নি। সাইক্লোন তারা জানে, ঝড় এর আগেও বড় বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এর চেহারা একেবারে আলাদা, এ একেবারে ভিন্ন জাতের। সাগরের জল বহুদূর পর্যন্ত জনপদের মধ্যে চলে এসেছে, সচল পর্বতের মতো ঢেউ এসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের। জল যখন সরে গেছে তখন শুধু সার সার শবদেহই নজরে পড়েছে। জীবিত

প্রাণী বিশেষ নয়। কত দেহ ভেসে গেছে তাও কেউ জানে না, কত দেহ পাঁক-কাদা ঘেঁটে বার করতে হয়েছে। এরকম সাংঘাতিক ধ্বংসলীলা এ জেলার লোক কেউ কখনও দেখে নি। মহাপ্রলয়ের স্বাদ পেলে তারা এই ক'ঘণ্টায়।

তাও, সর্বনাশের পূর্ণ পরিমাণটা একেবারেই জানা যায় নি। কারণ বলবার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। যারা বেঁচে ছিল, তাদেরও সংবাদ পাঠানোর মতো অবস্থা ছিল না। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তারা। তাছাড়া সংবাদ আসার পথও রুদ্ধ। টেলিগ্রাম টেলিফোন কিছুই নেই—খুঁটিগুলোরও চিহ্ন নেই কোথাও কোথাও।

বৃটিশ সরকার বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন মেদিনীপুরকে জব্দ করবার—এই সুযোগে তাঁরা মানুষের যাতায়াতও বন্ধ ক'রে দিলেন। বিনা হুকুমে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না সেখানে—সেবাব্রতীরাও কেউ নয়।

দুঃখিত হ'ল সবাই। শিউরে উঠল ভগবানের এই নির্মম মার প্রত্যক্ষ ক'রে—শুধু শ্যামা শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে! কেন—ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার তো অত সাধ, কর্ এখন লড়াই। দেখলি তো, ভগবান সুদ্ধু ওদের দিকে। চালাকি করতে গিছলি, দিলে ঠাণ্ডা ক'রে। এখন থাকো কাঁকরমাটি চিবিয়ে—যেমনকে তেমনি!'

তিনি যেন একটা ব্যক্তিগত বিজয়গর্ব অনুভব করেন।—তাঁরই স্বদেশবাসী, স্বভাষাভাষী কতকগুলি মানুষের মর্মান্তিক এই দুর্দশায়।

॥ ৩ ॥

কিন্তু সেই অবস্থাটা যে একদিন তাঁর দোরেও এসে উপস্থিত হ'তে পারে তা একবারও ভাবেন নি শ্যামা। চালের দাম উত্তরোত্তর বাড়ছে দেখেও অতটা ধরতে পারেন নি। অবশ্য সে খবরও তিনি তেমনভাবে পান নি। কিছু চাল কেনা ছিল ঘরে—বহুদিনের মধ্যে কেনবার দরকারও হয় নি। যা ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছেন পাড়া-ঘরে অধমর্ণদের কাছে, সেটা তত মাথাতে যায় নি।

চাল তেল আর নুন, এই লাগে তাঁর উট্‌নোর মধ্যে। আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু হলুদ। লংকা তাঁর উঠোনেই ঢের হয়। অন্য মশলা—ধনে জিরেমরিচ আজকাল কমিয়ে দিয়েছেন একেবারে, একবার এক-এক ছটাক ক'রে আনিয়ে রাখলে তাঁর ছ'মাস চলে যায়। ফোড়নও ব্যবহার করেন না বিশেষ, বলেন, 'যেটুকু তেল খরচ করব তা যদি ঐ লঙ্কা পাঁচফোড়ন কি তেজপাতা চোঁয়াতেই চলে গেল তো ব্যান্ননে রইল কী? আমরা তো বড়লোকদের মতো পলাপলা তেল ঢালতে পারি না, আমাদের অত ফোড়নের শখ ক'রেও দরকার নেই। ফোড়ন তো গন্ধ করার জন্যে, বলি ওর তো কোন স্বদ নেই গা—মিছিমিছি গুচ্ছের পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি?'

সুতরাং দোকানে যাবার দরকার হয় আজকাল তিন মাসে একদিন। কিম্বা আরও বেশীদিন পরে। নিজেই যান অবশ্য। বলাই কোথাও বেরোতে চায় না। তিনি বলেনও না। দোকানে যেতে গেলেও নাকি ফুলবাবু সেজে বেরোতে হবে। এই তো নাকের ডগায় দোকান। সেখানেও কি একটু ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে যাওয়া যায় না? না যায় না যাক। দরকার নেই গিয়ে। এখনও তো ভগবান শ্যামাকে 'অক্ষ্যাম' করেন নি একেবারে। একবার গুটি গুটি গিয়ে দোকানীকে বলে আসা! এই তো! সে তিনি খুব পারেন। একেবারে এক বস্তা ক'রে চাল নেন তিনি,

তাতে নাকি কিছু ওয়ারা হয়। কিছু ঢল্‌তাও বাদ পান। দোকানীরা নাকি বস্তা পিছু পাঁচ পো ঢল্‌তা বাদ পায়—তিনি তাদের কাছ থেকে এক সের আদায় করেন। এই চাল—আর সেই সঙ্গে পাঁচ পো তেল, আড়াই সের নুন, পাঁচ ছটাক হলুদ। এই-তেই তাঁর দু'তিন মাস চলে যায় আজ-কাল। চাল তখনও থাকে, কাজেই শুধু তেল আর নুন আর হলুদ—মাঝে একবার নিয়ে যেতে হয়। তার সঙ্গে দুটি পাঁচ-ফোড়ন আর দুখানা তেজপাতা চেয়ে নেন দোকানীর কাছ থেকে। কোনদিন কিছু একটা ভাল ক'রে রাঁধতে হ'লে কাজে লাগে।

চাল ঘরে ছিল অনেক দিনের মতো—দু'জনে কতই বা খান—তাই চালের দাম বাড়ছে শুনেও অত গা করেন নি। একেবারে বাড়ন্ত হ'তে যখন গিয়ে শুনলেন চাল পঁচিশ টাকায় উঠেছে ইতিমধ্যে—তখন একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলেন। প্রথমটায় বিশ্বাস হয় নি কথাটা। তামাশা মনে ক'রে দোকানীকে দুটো মিষ্টি গালি-গালাজও করেছিলেন (দিদি-নাতি সম্পর্ক পাতানো তার সঙ্গে) কিন্তু শেষে যখন দেখলেন তা নয়, তখন তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠল। তখনকার মতো আড়াই সের চাল নিয়ে চলে এলেন। বলরাম বলল, 'এই বেলা নিয়ে যান দিদিমা—এর পর আরও চড়বে। আমার তো ঠাওর হয় আর পাবেনই না, গোটা দেশের লোককে উপোস ক'রে শুকিয়ে মরতে হবে!'

কিন্তু তা আনেন নি শ্যামা। একেবারে অতটা উঠতে পারেন নি। ভরসায় কুলোয় নি। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, সে যুদ্ধেও বেড়েছিল কিন্তু এত বাড়ে নি। এতটা বাড়া স্বাভাবিক নয়। সরকার যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে।...

তিনি খাওয়াটাই কমিয়ে দিলেন। নিজে নিয়ম-রক্ষার মতো এক গাল ভাত খেতে শুরু করলেন। বাকিটা বাগানের ডুমুর কাঁচকলা থোড় পেঁপে খেয়ে পেট ভরাতে লাগলেন। বলাইকে পুরোপেটা ভাতই দেন, তবে সেও এক-বেলা। বিকেলটা তার জন্যে ঐ শাক-আনাজ সেদ্ধ ব্যবস্থা। বলেন, 'কী করবি মুখপোড়া, যেমন বরাত ক'রে এসেছিস তেমনি তো হবে। বরাত খারাপ না হ'লে এমন হবে কেন?'

তাই কি বাগানের ফসলই শান্তিতে ভোগ করতে পারেন। অভাব দুর্দশা শুধু তাঁরই নয়—আরও অনেকের। তাঁর তো তবু সঙ্গতি আছে কিছু—বেশির ভাগই থালা বাসন বেচতে শুরু করেছে। সুতরাং ফল ফুলুরি আনাজ সব চুরি যেতে শুরু হ'ল। চোর সামলাবার মতো ব্যবস্থা কিছু নেই। বেড়া কি পগারে গরু আটকায়—তার বেশী কাউকে ঠেকাবার শক্তি নেই। শ্যামা শেষ পর্যন্ত নিজেই পাহারা দিতে শুরু করলেন রাত্রে। ঘুমই বন্ধ হয়ে গেল তাঁর প্রায়। নিঃশব্দে প্রেতিনীর মতো অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান—একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে ক'রে। সামান্য কোন শব্দ পেলেই—অনেক সময় দেখা যায় তা বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নয়—তিনি চিৎকার ক'রে গালাগাল দিতে দিতে তেড়ে যান। লাঠি ঠোকেন ঘন ঘন। যেদিক থেকে শব্দ আসছে ঠাওর ক'রে সেই দিকেই ছুটে যান। অবশ্য তাতে কাজও হয়—চোর, যারা চুরি করতে আসে অনেক সময়ই তাদের সে চেষ্টা ত্যাগ ক'রে পালাতে হয়।

শ্যামা সেদিন দোকান থেকে এসে হেমকে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। বাজারের এই অবস্থা, কিছু টাকা না বাড়ালে চলছে না। তার উত্তরে হেম কিছু রূঢ় সত্য কথা লিখে পাঠাল। সে মাইনে পায় মাত্র তিয়াত্তরটি টাকা। তা থেকে ফাণ্ডে কেটে নেয়, মাকে পাঠায় কুড়ি টাকা। বাকী যা থাকে তাতে এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ করা

সস্তার দেশেও দুঃসাধ্য। দাম সেখানেও বাড়ছে। ভাত তো কবেই ছেড়ে দিয়েছে ওরা, দুবেলা রুটি খায়। তাও বোধহয় দুদিন পরে মিলবে না। রেল কোম্পানী যদি ওদের জন্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করে তো শুকিয়ে মরতে হবে। হেম আগে পুরো সংসারের জন্য যে টাকা দিত এখনও তাই দেয়, হয়ত আর বেশী দিন তা দিতে পারবে না। শ্যামার হাতে যা আছে—যা তিনি তেজারতিতে খাটান—এখন কিছু দিন তাই ভাঙ্গিয়েই খান তিনি!......

আর যা-ই হোক, এতটা স্পষ্টভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্যামা। তাঁর খুব ভরসা ছিল অন্তত গোটা-চার পাঁচ টাকা হেম বাড়িয়ে দেবেই। তিনি আরও একবার চোখে অন্ধকার দেখলেন।

এবার অগত্যাই পঁচিশটি টাকা হাতে ক'রে চাল কিনতে গেলেন আবার। কিন্তু দেখলেন ততক্ষণে—এই ক'দিনের মধ্যেই সে চাল ছত্রিশ টাকায় পেঁচেছে।...সুতরাং এবারও কেনা হ'ল না চাল। ছত্রিশ টাকা দরের চাল তিনি কিনে খেতে পারবেন না। সে ভাত তাঁর গলা দিয়ে নামবে না। তিনি নাতির মতো আড়াই সের চাল কিনে সেবারের মতোই, বসে বসে—বুকে ক'রে বয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তার বেশী কিনতে যেন সাহস হ'ল না তাঁর। অথচ এও থাকবে না—বলরাম বার বার সাবধান ক'রে দিল, একেবারেই লোপাট হয়ে যাবে চাল বাজার থেকে—তা শ্যামাও বুঝলেন। বলরামের কথাটা আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল না তাঁর। তবু ছত্রিশ টাকায় এক মণ চাল কেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর পক্ষে যা সম্ভব তাই করলেন। নিজে একেবারেই ছেড়ে দিলেন ভাত। শাক কচু আনাজ সেদ্ধ ধরলেন। বলাইকেও এক গাল ক'রে ভাত দিতে লাগলেন—নইলে হয়ত তার পেট ছাড়বে এই ভয়ে। অত দুটিখানি ভাত রাঁধতে অসুবিধা হয় বলে একদিন ফুটিয়ে পরের দিনের জন্যে জল দিয়ে রাখতে লাগলেন। নিতান্তই সে পাখীর মতো এত কটি—সত্যিই হাতের একগালে ধরবার মতো। বাকীটা ডুমুর আছে, শুষনি শাক আছে! একটা কুমড়ো হয়েছিল—তাতে তিন চার দিন চলে গেল, সেজন্যে ভাবনা নেই তাঁর। নাতিকে বলেন প্রায়ই, 'এমন এক আধ দিন নয়—বুঝলি, গুপ্তিপাড়ায় মাসের পর মাস আমরা এই শাক আনাজ সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়েছি। তোর দাদামশাই কোন্ এক যজমানের দু'মহল বাড়িতে তুলে দিয়ে ডুব মারল, তিনটে মেয়েছেলে আমরা—সঙ্গে একটা বাচ্ছা—একটা পয়সা নেই হাতে। সে যে কী দিন গিয়েছে! এখন তো তবু বয়স হয়েছে, অনেক শক্ত হয়েছি, তিনটে বেটাছেলের কাজ একা করতে পারি। তখন কিছুই জানতুম না, ছেলেমানুষ--তবু দিন কেটে তো গেছে, বেঁচেও তো আছি!

বলতে বলতেই বোধ হয় মনে পড়ে খাওয়া-দাওয়ার ঐ অনিয়মেই তাঁর শাশুড়ীর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই যে পেট ছাড়ল, আর সামলাতে পারলেন না কিছুতেই। অবশ্য বুড়ো মানুষ বলেই—। কিন্তু, তিনিও বুড়ো হয়েছেন এখন। সে সময় শাশুড়ীর যা বয়স ছিল, তার চেয়ে তাঁর বয়স এখন অনেক বেশী। তিনিই কি পারবেন সামলাতে?...স্তব্ধ হয়ে যান শ্যামা—কথাটার মাঝখানেই। কেমন যেন আতঙ্ক বোধ হয় তাঁর।...আবার একটু পরেই জোর ক'রে উড়িয়ে দেন চিন্তাটা। শাশুড়ী সুখী মানুষ ছিলেন, চিরকাল প্রাচুর্যেই অভ্যস্ত তাই সহ্য করতে পারলেন না, শ্যামার শরীর অনেক পাকা, অনেক দুঃখকষ্ট অনিয়ম সহ্য ক'রে পেকে গেছে দেহ—তাঁর কিছু হবে না। শুধু একটা ভয় তাঁর—শাক-আনাজও অফুরন্ত নয়, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সেও—এইবার কি করবেন?

অনেক ভেবে একদিন কিছু আটা কিনতে গেলেন। না হয় দু'বেলা রুটি খেয়েই থাকবেন। কিন্তু তাঁদের বাজারে তখন আটা ময়দাও উধাও হয়েছে। কবে আসবে তবে পাওয়া যাবে আবার—তা বলরাম, রামকমল কেউ বলতে পারলে না। শ্যামা এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। কতকটা দিশাহারা ভাবেই সের দুই গোটা ছোলা কিনে বাড়ি ফিরলেন। কলকাতায় নাকি চিঁড়ে অঢেল পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু সেও পাঁচসিকে সের। জলসা জিনিস চিঁড়ে—এতটার কম পেট ভরে না গায়ে গত্তিও লাগে না। তার চেয়ে ছোলা ভাল। হিন্দুস্থানীরা খায়, ওদের গায়ে জোর কত!......

কিন্তু এই ছোলার ধাক্কা দিদি-নাতি কেউই সামলাতে পারলেন না। অবিরাম শাকপাতা খেয়ে খেয়ে অনভ্যস্ত পেটে বহুদিনই গোলমাল দেখা দিয়েছিল, এবার ভেঙে পড়ল একবারে। তবে দৈব সহায়, এর মধ্যে একদিন মহাশ্বেতা এসে পড়ল মার খবর নিতে।

অভয়পদর চাকরি যাওয়ার পর থেকে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল মহাশ্বেতা —ন্যাড়ার দোকান উঠে যাবার পর বন্ধই করে দিয়েছে প্রায়। বাড়ি থেকে বেরোতেই যেন লজ্জা করে তার আজকাল, "কালা মুখ নীলে করে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।" যে উৎসাহে যে মনের জোরে সে ঘুরে বেড়াত—সে জোর সে উৎসাহের উৎসটাই শুকিয়ে গেছে তার। এ বাড়িতেও আসে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন। এবাব তো তবু কিছু ঘনঘনই এসেছে বলতে গেলে। এসেছে কতকটা এই মন্বন্তরের কথা ভেবেই।

'মা যে কেপ্পন মানিষ্যি—মা কি আর এই বাজারে চাল কিনে খাচ্ছে? দ্যাখো গে যাও হয়ত খাড়া ওপোস দিয়ে পড়ে আছে।' বলেও এসেছে সে তরলাকে সে কথা। তরলার উৎসাহেই, এত কাঁট চালও পেট-কাপড়ে ক'রে বেঁধে এনেছে ও বাড়ি থেকে। পাড়া-ঘরে যার যা হোক, ওদের ঘরে এখনও এ বস্তুটির অভাব হয় নি। অম্বিকাপদ দূরদর্শী লোক, সে বাজারের গতিক বুঝে অনেক আগে থেকে সতর্ক হয়েছে। তাদের চাষের চালও কিছু কিছু আসে—তবে তাতে 'সোম্বচ্ছর' চলে না। কিনতে হয় সাত আট মাসের মতোই। সাধারণত নতুন চাল ওঠার সময় সে কেনে না, দুচার মাস গেলে ফাল্গুন-চৈত্র নাগাদ সে একেবারে যতটা দরকার কিনে ঘরে তোলে। আগে কেনে না, তার কারণ নতুন চালের রস মরে অনেকটা ওজনে কমে যায়, তাছাড়া তাতে পোকাও ধরে তাড়াতাড়ি। আবার খুচরো খুচরো কেনাও লোকসান, বর্ষার মুখে দাম বাড়ে। তাই চোত-কিস্তির আগে, যখন চাল সস্তা থাকে তখন একেবারে কিনে নেয়।

কিন্তু এবার, যেন বাতাসের মুখে খবর পেয়েই, চাল ওঠার সময়ই পুরো বছরের মতো চাল কিনে রেখেছে। বরং একটু বেশীই কিনেছে। নিজেদের ধানটা অন্য বছর একেবারে ভানিয়ে ঘরে তোলে—এবার এমনিই তুলে রেখেছে, তাতে হাত দিতে দেয় নি কাউকে। রেখেছেও তেমনি কায়দা ক'রে—এমন কি মহাশ্বেতাও তার বুদ্ধি আর বুকের পাটা দেখে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারে না—নিচের ভাঁড়ার ঘরটা খালি করিয়ে তাতেই একেবারে ঠেসে পুরেছে সমস্ত ধান—তারপর আগাগোড়া ইট দিয়ে গেঁথে দিয়েছে তার দোর-জানালার ফাঁকগুলো। মিস্ত্রী ডাকেনি তা বলা বাহুল্য, সেটা বড়কর্তার ওপর দিয়ে গেছে—দু ভাইতে মিলে করেছে অবিশ্যি—মিস্ত্রী ডাকলে জানাজানি চাউর হয়ে যাবে কথাটা, সেও সত্যি; কিন্তু রেখেছে তো বাপু, চারদিকে এই হাহাকার, একটু ফ্যানের জন্যে কী হ্যাঙ্গালি জ্যাঙ্গালি, রাত-

দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব, কার বাগানে কচু কার বাগানে ওল এই খুঁজে খুঁজে—কিন্তু ওদের তো এতটুকু চিন্তাও রাখে নি মেজকর্তা। শুধু এ বছর নয়—ও বছরেও বেশ কিছুদিন বসে খেতে পারবে, সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে! ও বছরে বোধহয় আর কিনতেই হবে না, নিজেদেরটা এসে পড়লে পুরো বছর চলে যাবে।

'মেজকর্তা কেপ্পন হোক আর যা হোক বাপু', মার কাছে স্বীকার করে মহাশ্বেতা, 'এদান্তে তো রাত্তির বেলা দু চোখের পাতা এক করে না, সন্ধ্যে থেকে খালি গেলাস গেলাস চা খায় আর ঠায় সারারাত কান খাড়া ক'রে জেগে বসে থাকে। মধ্যে মধ্যে উঠে ভূতের মতো ঘুরেও বেড়ায় গোটা বাড়িটা। আগে যেমন চায়ের পাট দেখলে জ্বলে যেত—ছোট ভাইকে বকত অষ্টপ্রহর—এখন তেমনি নিজেই চোদ্দ পনেরো কাপ চা খায় পেত্যহ। আরও নাকি ভয় তার ঐ ধান-চালের জন্যেই। আঠারো গণ্ডা তালা দিয়েও নিস্তার নেই—বলে যা আকাল, টাকার চেয়ে ধান-চালেই বেশী টাঁক লোকের!'

আবার একটু থেমে বলে, 'আমাদের এঁর তো দিনেরেতেই ঘুম নেই, ওর মতো ঘুরে বেড়ায় না বটে, তবে সারা রাতই যে জেগে থাকে তা দালানে বেরোলেই টের পাই। এমন ক'রে কদিন বাঁচবে কে জানে। খাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে—দুবেলা ভাতে বসে ঐ অব্দি। যেন ঐ কটা চাল বাঁচলেই গেরস্তর সব সুসার হয়ে যাবে!... ওর আরও ভাবনা হয়েছে পাঁটাগুনোর জন্যে। মুখে কিছু না বলুক—বলি ওরই তো ছেলে গা। একটা কারও কোন গতি হ'ল না—সব বসে বসে খাচ্ছে, একি কম ভাবনার কথা। একটা যা হোক দোকানদানী ক'রে দিলে মেজকত্তা, তা এমন গাধা সব- দুদিনে মোট মোট টাকার মাল ধার দিয়ে যথাসব্বস্ব ফুঁকে বসে রইল। আবার যে কে সেই—গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গেরস্তর অন্ন ধ্বংসাচ্ছে!... বড়টার তিন-তিনটে ছানা হয়ে গেল,—তবু তো একটা আঁতুড়ে গেল তাই—নইলে চারটে—তাই কি তার একটু হুঁশপব্ব কি ভয়ডর আছে। উলটে এখন আর মাগের পাছতলা ছেড়ে নড়ে না এক মিনিট। দিনরাত পাহারা দিচ্ছে বৌকে—মুয়ে আগুন!.. আর করবেই বা কি বলো, ওর হয়েছে সেই—দ্যাখ্ তোর না দ্যাখ মোর, চোর ডাকাতের ভয় পেটে পুরলেই রয়—ভেয়েরা থেকে শুরু ক'রে গুরুজন পজ্জন্ত—সবাই যদি টানাটানি করে ফাঁক পেলেই, ও-ই বা কি ভরসায় নিশ্চিন্তি থাকে বলো।'

কিন্তু এ সব কথা অনেক পরে উঠেছিল। কথা প্রসঙ্গে। মহাশ্বেতা বাপের বাড়ি ঢুকে মা আর বোনপোর অবস্থা দেখে প্রথমে তো কেঁদেই আকুল। দুজনেই কঙ্কালসার হয়ে গেছে। ঘন ঘন পাইখানা যাচ্ছে আর ফিরে এসে মাদুরে পড়ে ধুঁকছে।

কান্না থামতে একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় মহাশ্বেতার। যেন জ্বলে ওঠে সে। মাকে চিরকাল ভয় ক'রে এসেছে সে, কিন্তু এখন তাঁর প্রতি আন্তরিক টানেই আর সে ভয় থাকে না।

'মরণ তোমার! গলায় দড়ি। মা হও—গুরুজন, বলতে নেই—কিন্তু তোমার এবার মরাই উচিত।...পয়সার আণ্ডিলের ওপর বসে আছ তাও দর দেখে পেছিয়ে এলে, ভাত খাবার চাল দুটো—যা খেয়ে প্রাণ বাঁচবে—সে জিনিসও ভরসা ক'রে কিনতে পারলে না? গুচ্ছের ঘাসপাতা খেয়ে মরতে বসেছ! পয়সার এত মায়া! পয়সা কি তোমার সঙ্গে যাবে? ছালা বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে পয়সা? এ যা অবস্থা—শ্বাস উঠতে যা বাকী, আর দুদিন এইভাবে চললেই তো টেঁসে যাবে—তার

পর? ছেলেরা তো খবরও পাবে না, তার আগেই তো পাড়ার বারো ভূতে— এসে লুটপাট ক'রে নিয়ে সরে পড়বে—তোমার এত কষ্টের বুকে ক'রে জমানো পয়সা! সেইটেই খুব ভাল হবে—না? তবু প্রাণে ধরে প্রাণ বাঁচাবার জিনিসটা কিনতে পারবে না। হাত্তোর পয়সার মায়া রে! নিজে তো মরছই—ঐ একরত্তি ছেলেটাকে পর্যন্ত না খাইয়ে মারতে বসেছ!...ছোলা! ছোলা খেয়ে জীবনধারণ করবে! ছোলা খায় ঘোড়ারা, ঐ খেয়েই অমন বিশ পঞ্চাশ কোশ দৌড়য় তারা ভারী ভারী মাল নিয়ে? তোমাদের কি ঘোড়ার পেট—না অত দৌড়ঝাঁপ করো তোমরা? আর এতই বা কি, এক মাসে তো তোমাদের আধমণ চালও লাগে না—না হয় কুড়ি টাকার চালই খেতে। শুধু ভাতও তো খাওয়া যায়, নুন দিয়েও ভাত ওঠে ক্ষিদের সময়। দুধ নয়, ঘি নয়—কেনা আনাজ নয়—কোন খরচই তো নেই—একগাছা ক'রে ট্যানা পরে তো থাকা, দুটো পেটের ভাতের জন্যেও পয়সা খরচ করতে পারো না? এ টাকা তোমার কী কাজে আসবে শুনি? নিজের ছেরাদ্দের জন্যে জমাচ্ছ, না ছেলেমেয়েদের ছেরাদ্দের জন্যে?'

এক নিঃশ্বাসে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে বলে যায় মহাশ্বেতা। এই উপলক্ষে নিজের কিছু পূর্বসঞ্চিত জ্বালাও বোধ হয় বেরিয়ে আসে তার।

কিন্তু শ্যামাও আজ রাগ করেন না। হয় রাগ করার অবস্থা নেই, নয় তো তিনি নিজেই মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছেন এই দুদিনে। তিনি বরং একটু অপ্রস্তুতভাবেই চিঁ চিঁ ক'রে বলেন, 'তা তাই না হয় বাপু কিনব এবার।...মুশকিল, বাজারে তো পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় পাওয়া যাবে—মেজকত্তা তো ঘাঁৎঘোঁৎ জানে শোনে—তাকেই না হয় বলিস না কিছু চাল যদি কিনে দিতে পারে। যা দাম হয় দোব—'

মহাশ্বেতা নিজেই উনুনে পাতা জ্বেলে সঙ্গে-আনা চাল কটি চাপিয়ে দেয়। সবটা চাপায় না—মরা পেট, বেশী ভাত সইবে না—বরং দুটি থাকলে কাল খেতে পারবে। দুটো কাঁচকলাও যোগাড় করে অতিকষ্টে। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলা নিজে বসে থেকে ওদের দিদি-নাতিকে খাইয়ে বাড়ি আসে।...

অম্বিকাপদকে চালের কথা বলতে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলল, 'এখন তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আছে যাদের কাছে, তারাও সহজে বার করবে না। কেন না—একবার খবর পেলে হয়ত লুটপাট হয়ে যাবে। তা না হ'লেও—লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি ক'রে, এতকাল নেই নেই বলে এসেছে!...তা এক কাজ করো না হয়, তোমার ছেলেদের বলো—পারে তো খানিকটা চাল এখনকার মতো পেঁাছে দিয়ে আসুক। ওর আর দাম দিতে হবে না তাঁকে। আপাতত তো ঐ চলুক। তারপর—শুনছি গবর্মেণ্ট থেকে চাল দেবার ব্যবস্থা করছে—মাথা পিছু এক সের না দেড়সের ক'রে—তাহ'লে ও'দের খুব অসুবিধা হবে না। আর না দেয়—তখন খোঁজখবর করা যাবে বরং!'

দুর্গাপদ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে, 'হ্যাঁ, গবর্মেণ্ট চাল ছাড়ছে, তুমিও যেমন! ওসব কথা রেখে বসো দিকি! ওরাই তো মিলিটারীর জন্যে চড়া দামে কিনে কিনে চাল পাচার করলে দেশ থেকে, আমাদের জব্দ করবে বলে—তবে আবার ছাড়বে কিসের জন্যে?'

'ছাড়বে আরও বেঁধে রাখার জন্যে। তাদের হাতে চাল থাকা মানেই তো টিকি বাঁধা পড়া তাদের কাছে।...আর সবাই যদি মরেই গেল তো ওরা রাজত্ব করবে কাকে নিয়ে। জব্দ করতে চেয়েছিল—জব্দ হয়ে গেছে। যারা ইংরেজ তাড়াতে চেয়েছিল তারাই এখন হামলে পড়েছে চাকরির জন্যে। চাকরি দিচ্ছেও দুহাতে। আমি তো

ধনাকে বলেছি—চট্ ক'রে ড্রাইভারীটা শিখে নিতে—তাহলে হয়ত একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারব। এখন মিলিটারীতে ঢুকতে পারলে চাল চিনি এসব ব্যাপারে নিশ্চিন্তি!'

তারপর একটু থেমে অম্বিকা আবার ভাইকে বললে, 'আর এরাই সব চাল টেনে নিয়েছে বলে চাল উবে গেছে—সেটাও ঠিক নয় হয়ত। এ দেশের চালে এ দেশে কুলোত না কখনই। জাহাজ জাহাজ চাল আসত রেঙ্গুন থেকে, তোমরা তার খবরও রাখতে না। সেইটে বন্ধ হয়েই এত মুশকিল হয়েছে। আমি জানি—আমি দেখেছি, আমাদের এক অফিসের বন্ধুর চালের কারবারও ছিল। আমড়াতলার মুসলমানদেরই একচেটে ছিল প্রায় কারবারটা, জাহাজ জাহাজ চাল আনাত, মোটা চাল—পৌনে তিন টাকা দরে সে চাল বিকোত এখানে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চাল খালাস করতে হ'ত জাহাজ থেকে—তা গুদোম-টুদোমের ধার ধারত না তারা। একটা চৌকী পেতে ডকে বসে যেত, চাট্‌টি চাট্‌টি নমুনা নিয়ে, খবর পেয়ে ব্যাপারীরাই হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ত—মুখে মুখে কারবার—মোটা মোটা টাকার মাল, কেউ বিশ গাড়ি কেউ চল্লিশ গাড়ি গস্ত ক'রে নগদ টাকা জমা দিয়ে আসত, রসিদ নেই পত্তর নেই পুরনো মক্কেল হ'লে ঠিকানাও জিজ্ঞেস করত না, নতুন হ'লে একটা চিল্‌তে কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিত বড় জোর। বিশ্বাসের ওপর কারবার—কিন্তু ঠিক সময়ে মাল পেঁছে যেত—এক চুল এদিক ওদিক হ'ত না। প্রথমবার যেবার যাই, আমার সন্দেহ হয়েছিল, বিকেলে পাঠাবার কথা, আমি সকাল ক'রে অফিস থেকে বেরিয়ে দেখতে গিছলুম মালটা পেঁছয় কিনা। তা চারটেয় পেঁছবার কথা—পৌনে চারটেয় গিয়ে দেখি সার সার মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তখনই।'

চাল, দুই ছেলে ধনা আর ন্যাড়ার হাতে আন্দাজে দু পুঁটুলি বেঁধে দিলে মেজ-কর্তা—মহাশ্বেতার মনে হ'ল আধমণের কম নয়। যতই যা বলুক সে, এতদিন মুখের সামনেই নানা কটু কথা বলে এসেছে—গালাগাল-মন্দও কম দেয় নি—কিন্তু এখন এতটা উদারতার সামনে নিজেকেই যেন ছোট মনে হ'তে লাগল। মনে হ'ল—বড়-কর্তা খুব ভুল করে নি হয়ত এত বিশ্বাস ক'রে—দোষেগুণে মানুষটা সত্যিই খুব খারাপ নয়।

সত্যি-সত্যিই এর দিনকতক পর থেকেই কণ্ট্রোলে চাল দেওয়া শুরু হ'ল। মাথা পিছু এক সের ক'রে চাল—লাইন বেঁধে দাঁড়াতে হবে তার জন্যে। সে লাইন শুরু হয় আগের রাত থেকে। ক্রমশ আগের দিন বিকেল থেকে লাইন দেওয়া শুরু হ'ল। প্রথম দিকে না থাকতে পেলে ভরসা থাকে না চাল পাবার। কোন দোকান এক বস্তা কোন দোকান হয়ত দু বস্তা চাল পায়—এক সের ক'রে দিলে আশিজন কি একশ' ষাট জনেই মাল কাবার হয়ে যায়। ভোর থেকে যে দাঁড়াল সে হয়ত বেলা বারোটার সময় শুনল যে চাল ফুরিয়ে গেছে সেদিনের মতো—আবার সেই পরের দিন কি অমুক দিন দেওয়া হবে। সেইজন্যেই সবাই চেষ্টা করে অপরের চেয়ে আগে দাঁড়াতে। সকলের সময় নেই এত, তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না লাইনে দাঁড়ানো। ফলে যারা দাঁড়ায় বারো চৌদ্দ ঘণ্টা আগে থেকে, বসবাস করে সেখানে বলতে গেলে, তারা ছ'আনা সেরে কেনা চাল বারো আনা—একটাকা পর্যন্ত দরে বিক্রী করে অনায়াসে। এ একটা যেন নতুন ব্যবসা শুরু হয়ে গেল।

খবরটা শ্যামার কানেও পেঁছল বৈকি!

লোভে তাঁর স্তিমিত দৃষ্টি জ্বলে উঠল। তিনি বলাইকে বললেন, 'বসেই তো থাকিস, একটা আসন পেতে বসে থাক্ না ওখানে—তবু দু'চারটে পয়সা আসবে!'

বলাই সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'আমি পারব না।'

'কেন পারবি নি শুনি? বসে বসে তো আছিস। এটুকু পারিস না? খোরাকীটা আসে কোত্থেকে?'

'না পারো দিও না খেতে। তুমি নিজেই খাও গে।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বলাই।

ডাক পেড়ে গালাগাল দেন শ্যামা, 'আ মর্ মুখপোড়া! বাক্যির ছিরি দ্যাখো না! লেখাপড়া শেখা নেই, এক পয়সা রোজগারের চেষ্টা নেই—খাচ্ছেন আর বসে আছেন থুম্ হয়ে—কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যির বেলায় তো ঠিক আছে!...হবে না কেন, কেমন বংশে জন্ম! বেউড় বাঁশের ঝাড় যে! হারামজাদার ছেলে হারামজাদাই হবে। এ তো জানা কথা! আমারই দুর্বুদ্ধি, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছি!' ইত্যাদি—

কিন্তু যতই গালাগাল দিন আর যাই করুন বলাইয়ের অবিচল স্থৈর্য নড়াতে পারেন না। মনে পড়ে যায় নিজের ছোট ছেলের কথা, মারের চোটেও তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেন নি। চোরের মার সহ্য ক'রেও বসে ছিল চুপ ক'রে ঠায়—এই জানলাতেই। নরাণাং মাতুলক্রম—না কি যেন বলে লোকে—সেই মামারই তো ভাগ্নে।

শেষ পর্যন্ত তোষামোদেরও আশ্রয় নেন। ভাল নতুন কাপড় বার করে দেবেন, এমন প্রস্তাবও করেন। কিন্তু বলাইয়ের সেই এক কথা, 'আমি পারব না।'

শেষে রাগ ক'রে নিজেই একদিন যান লাইন দিতে। আগের দিন থেকে দাঁড়াতে পারেন না—রাত চারটেয় রাজগঞ্জের ভোঁ বাজতেই উঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান, কিন্তু তবু চাল পান না। তাঁর থেকে ছ' সাতজন লোক আগে আসতেই চাল বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়েন। দুঃখে ক্ষোভে চোখে জল এসে যায় তাঁর। আর একদফা গাল দেন নাতিকে। ও মুখপোড়া গেলে আগের দিন রাত থেকেই গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে আর এমন শুধু-হাতে ফিরতে হয় না!

চাল তো মেলেই না—উল্টে কথাটা প্রচার হয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। ক্রমশ এ বাড়িতেও পেঁছিয় খবরটা। অম্বিকা অবাক হয়ে তার বৌদিকে বলে, 'সে চাল এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল আবুই মার? না, আগে থাকতে সঞ্চয় করতে চাইছেন? তা বলাই থাকতে উনিই বা দাঁড়াতে গেলেন কেন? বলাই যদি না-ই পারে, আমাদের তো বলতে পারতেন, না হয় এরাই কেউ গিয়ে দাঁড়াত!...যাই হোক, মাকে বলে এসো, চাল ফুরোলে যেন আমাদেরই খবর দেন, ও'কে আর এই বয়সে ঐ সত্তিকজাতের সঙ্গে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে না!'

মহাশ্বেতার মুখ অপমানে কালো হয়ে যায়। সে আবারও মায়ের কাছে এসে ঝাল ঝাড়ে একচোট, 'বলি আর কত মুখখানা পোড়াবে আমার! এতেও কি শান্তি হ'ল না? আমি বেশ বলতে পারি চাল নয়—পয়সার লোভে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি, চড়া দামে বেচবে বলে! ছিঃ ছিঃ! পয়সার এত লালস তোমার? এ পয়সা কাকে দেবে তুমি, প্রাণে ধরে তো জ্যান্তে কাউকে দিতে পারবে না। এ তো দেখছি তোমায় যক করতে হবে। তাই না হয় করো, হাতের কাছে নাতিটা আছে—ওকেই যক্ করে দাও—পয়সা আগলে বসে থাকবে চার যুগ!'

এই প্রথম বোধ করি শ্যামা কোন কথা কইতে পারলেন না—বিশেষত বড়মেয়ের কথার জবাবে—মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদেশকে অনেক জিনিস শিখিয়েছে, অনেক জিনিস দিয়েছে-- বেশীর ভাগই মন্দ—তার মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটা সেটা হ'ল ফালতু আলটপ্‌কা টাকা পাওয়ার লোভ। খেটে যা পাওয়া যায় তাতে আর খুশী রইল না এদেশের মানুষ, আরও কিছু তার চাই। যে টাকার আশা ছিল না, হিসেবে যা ধরা নেই, যার হিসেব রাখতেও হবে না—এমন খানিকটা টাকা। এই লোভের পথ ধরেই এল বহু জিনিস—চুরি-জুচ্চুরি, কালোবাজারী, চোরাকারবার, নিষিদ্ধ মাল পাচার, ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া, জালিয়াতি—আরও অনেক। আরও বেশী, অনেক বেশী। অনেক জঘন্য অনেক ঘৃণ্য জিনিস। যে সবের কল্পনা করেও আগে শিউরে উঠত ভদ্র শিক্ষিত মানুষরা। এই টাকার জন্যে, এই লোভের জন্যে সে না করল এমন কাজ নেই, দিল না এমন জিনিস নেই। এই টাকার জন্যে সে বেচল তার সততা, তার সত্যনিষ্ঠা, তার বিবেক, তার ন্যায়-অন্যায়-বিচার—তার আত্মসম্মান, তার সন্তুষ্টি—এমন কি তার অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাও। টাকা চাই তার—বাড়তি টাকা, ফালতু টাকা, যে টাকা নিয়ে সে যা খুশি করতে পারবে; তার সাধ্যের অতীত, তার প্রাপ্যের অতীত সুখে থাকতে পারবে।

ইংরেজ সরকারও তা জানতেন। মানুষ চিনতেন তাঁরা। এদেশের মানুষকেও চিনেছিলেন। তাই তাঁরা এদের আনুগত্য আর এদের মনুষ্যত্ব কিনতে কিছু টাকা উড়িয়ে দিলেন বাতাসে। কার্নিভালের দিনে আকাশে ওড়ানো কাগজের কুচির মতো নোট উড়তে লাগল চারিদিকে। সে টাকা যারা পারল ধরে নিল। 'যুদ্ধের বাজারে দু পয়সা করেছে' সেই ভাগ্যবানদের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই নিবৃত্ত হ'ল দেশের বাদবাকী ভাগ্যহীন লোকেরা। কীভাবে সে দু পয়সা করেছে, যুদ্ধের বাজারে কে কি ভাবে উপার্জন করল—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। সহজ সত্যটাকে সহজেই মেনে নিল। ঈষৎ ঈর্ষা বোধ করল হয়ত, কেউ কেউ 'চুরির পয়সা'য় এই অভিধা দিয়ে সে ঈর্ষা চরিতার্থও করল—কিন্তু সে চুরি ধরিয়ে দিতে, মানুষের সমাজে এই অমানুষদের মুখোস খুলে দিতে চেষ্টা-মাত্র করল না। কারণ যারা গাল দিচ্ছে তারাও আশা রাখে যে তাদের সামনেও একদা এই 'চুরির পয়সা' উপার্জনের পথ উন্মুক্ত প্রসারিত হয়ে যাবে।......

পয়সা উড়ছে বাতাসে। যারা ভাগ্যবান আর যারা বুদ্ধিমান তারাই ধরে নিচ্ছে। হরেনও ধরল সে টাকা। স্বর্ণর বর হরেন—মহাশ্বেতার জামাই। নানা বিচিত্র পথ ধরল সে। তার অফিসের ক্যাশ ছিল তার হাতে—তারই কিছু হেরফের করে টাকা খাটাতে লাগল। কিসে খাটাল তা কেউ জানে না। স্পষ্ট করে সে বলল না কাউকেই। ভাইয়েরা বড় হয়েছে, তাদেরও বিয়ে হয়েছে, সংসার হয়েছে। প্রধানত তারাই কৌতূ-হলী। পয়সার আভাস পাচ্ছে, কিন্তু তার চেহারাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। সেটা আসবার পথটাও খুঁজে পাচ্ছে না। দূরের মানুষ পায় সে আলাদা কথা। এ ঘরের মানুষ—এর এই ধনী হবার পথটা তাদের জানবার কথা—আর জানলে তারাও সে পথে যেতে পারে। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও তারা বার করতে পারল না সে পথের সন্ধানটা।

তাদের আরও কষ্ট—তারা সে পথের ইঙ্গিতটা পাচ্ছে। কারা সব আসে দাদার কাছে, দোর বন্ধ করে কী সব শলা-পরামর্শ আঁটে—আবার বেরিয়ে চলে যায়। অনেক সময় হরেনও চলে যায় তাদের সঙ্গে। হয়ত বা তাদের সঙ্গে করেই নিয়ে আসে। শিবপুরের এই সংকীর্ণ গলিতে বড় বড় মোটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। সে গাড়ি থেকে নামে নানা জাতের নানা বর্ণের লোক। এরা সবাই হরেনের লোক, হয়ত বা তার কারবারের অংশীদার।

হরেন আজকাল ফেরে বহু রাত্রে। সন্ধ্যা রাত্রে ফিরলে লোক সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আবার তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ছুটি পেতে প্রত্যহই গভীর রাত হয়ে যায় তার। কোথায় ঘোরে তা কে জানে। কাউকে বলে, কিছু কিছু ঠিকা নিয়েছে সে অপরের সঙ্গে ভাগে। কিন্তু কিসের ঠিকা তা কখনও বলে না। আবার কাউকে বলে, 'সাপ্লাইয়ের কাজ ধরেছি কিছু কিছু, সময় তো নেই, তাই আপিসের পর ঘুরতে হয়।' কিসের সাপ্লাই, কাকে সাপ্লাই দেয় তা অবশ্য কেউই জানতে পারে না। ওর কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারে না ভাইয়েরা। বেশীর ভাগই আসেন পাঞ্জাবী সিন্ধী ভদ্রলোক। মারোয়াড়ীরাও আসেন কেউ কেউ। তাঁরা সহজে কাউকে পাত্তা দেবার মানুষ নন। তাঁদের পেটের কথা টেনে বার করা ওদের অন্তত সাধ্যাতীত! তাঁরা সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। খাতিরও করে হরেন যথেষ্ট। তাঁদের মুহুর্মুহু চা যোগাবার জন্য একটা আলাদা ঝিই রেখেছে সে ইদানীং।

তবে যা-ই করুক, টাকা যে বেশ কিছু আসছে তার, আকাশে ওড়ানো টাকা যে ধরছে সে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে-টাকা গোপন করতে পারে না সে, করতে চায়ও না হয়ত। তাকে কেন্দ্র ক'রে যে একটা প্রাচুর্য উছলে উঠছে সেটা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ, তা চেপে রাখা সম্ভবও নয়। তবে একটা জিনিস তার ভাইয়েরা আঁচ করে ঠিকই, আর তাই থেকে তাদের ঈর্ষাবিষদগ্ধ হৃদয় কিছু সান্ত্বনাও লাভ করে। হরেনের হাতে এমন কোন মূলধন নেই যাতে যুদ্ধের ঠিকা নিয়ে সামাল দিতে পারে। এ টাকা আসছে ওর অফিস থেকে নিশ্চয়। হয়ত ওর সঙ্গে আর যারা ক্যাশে থাকে—কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে কিম্বা লভ্যাংশের লোভ দেখিয়ে মুখ বন্ধ করেছে তাদের। কিন্তু একথা চাপা থাকবে না। একদিন না একদিন ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। আর তহবিল তছরূপ ঘোরতর অপরাধ, ধরা পড়লে বাছাধনের এই হঠাৎ বড়মানুষী বেরিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

কিন্তু সে সান্ত্বনা বা আশ্বাস কোন কাজেই লাগে না বেচারাদের। ধরা পড়বার আগেই ভাঙ্গা ক্যাশ পুরিয়ে দেয় হরেন। মোটা মোটা টাকা যার লাভ হচ্ছে তার সেটা পুরিয়ে দেওয়া কিছু আশ্চর্যও নয়। সুতরাং অফিসে কোন গোলমালই হয় না—বরং টপাটপ মাইনে বাড়ে। মেজভাই জীবেনও ঐ অফিসে কাজ করে, সে-ই সে উন্নতির সাক্ষী দেয়। কালো মুখ আরও কালো হয়ে যায় আত্মীয়দের।

এই সব হুল্লোড়ে—টাকা এবং তার আনুষঙ্গিকে—বেচারী স্বর্ণলতার কথাটা বিশেষ আর মনে থাকে না হরেনের। সে তো আছেই, তার সংসার তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সে ব্যস্ত আছে। সবাইকে তো সে-ই দেখে। তাকে আবার দেখতে হবে কেন? বরং সে ভালই থাকবে এবার—সংসার ভাল করেই চালাতে পারবে—অভাব যখন আর কিছু নেই কোন দিকে। নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার করুক। মাস গেলে শুধু মাইনের টাকা নয়—আরও অনেক টাকা, প্রায় মাইনের দ্বিগুণ টাকা ধরে দেয় সে স্ত্রীকে। দিন-রাতের ঝি রেখে দিয়েছে হরেন জোর ক'রে। ঠাকুরের রান্না খেতে ঘেন্না করে

বলেই রাখে নি। তাদের সংসারের বহু বিচিত্র রান্না, মাইনে করা লোক দিয়ে হওয়াও শক্ত—তবু প্রয়োজন হ'লে তাও রাখতে পারবে। সে কথা তাকে বলেই রেখেছে হরেন। কোন রকম কষ্ট করার আর দরকার নেই স্বর্ণর। এ সব ছাড়াও কাপড় গয়নার জন্যে মাঝে মাঝে দমকা কিছু টাকা ধরে দেয় হরেন। সময় নেই বলেই নিজে কিনে দিতে পারে না। কিন্তু তাতে তো স্বর্ণরই সুবিধা, পছন্দ-মতো মাল কেনার স্বাধীনতা থাকে।...

এই সব সহৃদয় বিবেচনা এবং অবাধ স্বাধীনতায় স্ত্রীদের ভাল থাকবারই কথা। যে কোন স্ত্রীই এমন বন্দোবস্তে সুখী থাকে। স্বর্ণও ভাল আছে নিশ্চয়। অন্তত হরেন তাই ধরে নিয়েছে।

আসলে আজকাল স্বামী-স্ত্রীর দেখাই হয় কম। অত রাত ক'রে ফেরা নিয়ে প্রথম প্রথম স্বর্ণ কিছু অনুযোগ করেছিল, কিন্তু হরেন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের জীবনে সুযোগ বেশী বার আসে না। তার মতো কেরানী জীবনে যে সুযোগ এসেছে তা কল্পনাতীত। এই বেলা ভাগ্য ভাল থাকতে থাকতে, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে এর পর আপসোসের সীমা থাকবে না। সুতরাং মিছি-মিছি মূর্খ অজ্ঞ স্ত্রীলোকের মতো স্বর্ণ যেন এই তুচ্ছ কথা নিয়ে অশান্তি না করে। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবন তাদের—এতগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে গেল—মরে-হেজে গিয়েও পাঁচটা—এখনও কি স্বর্ণ স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে?...মদ ভাঙ যে খাচ্ছে না তা তো দেখতেই পাচ্ছে স্বর্ণ—সে গন্ধ তো আর ঢাকা থাকে না। রাত্রে বাইরেও থাকছে না, যখনই হোক, যত রাত্রেই হোক—বাড়িতে ফিরছেই প্রত্যহ—তখন আর অত ভয় কিসের?

স্বর্ণও কথাটা বুঝল। স্বামীর ওপর চিরকালই তার অগাধ বিশ্বাস। হরেন তাকে ভালবাসে ঠিকই। হয়ত একটু বেশীই বাসে। কখনও কখনও সেটা স্বার্থপরতার পর্যায়ে পড়ে যায় বরং। সে বিষয়ে স্বর্ণ নিশ্চিন্ত। সুতরাং হরেনের কথাগুলো সে নিজে তো ষোল আনা বিশ্বাস করেই, অপরে কোন সংশয় প্রকাশ করলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে তাদের সঙ্গে। এ শ্রেণীর সংশয় বা আশঙ্কা প্রকাশ করে তার জায়েরাই বেশী। মেজ জা শোভনা তো প্রকাশ্যেই বলে, 'পুরুষমানুষের রাশে অতটা ঢিল দেওয়া ভাল নয় দিদি। অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না। সত্যি কথা বলতে কি—ভাসুর গুরুজন, বলতে নেই কিছু—কিন্তু ওঁর ভাবভঙ্গীগুলো আমার বাপু আর ভাল লাগছে না কিছুদিন থেকে। তুমি একটু চোখ-কান খুলে রেখো।'

তাতে স্বর্ণ বিষম চটে যায়। বলে, 'তোমাদের চোখ-কান ভাই এত খোলা আছে যে, আমার আর খোলা না রাখলেও চলবে।...পুরুষমানুষ, যদি একটু ইদিক-ওদিক করেই—তাতে এমন মহাভারত অশুদ্ধই বা হয়ে গেল কি? আর তাতে কার কি এলো-গেলোই বা? বলি ক্ষেতি হ'লে তো আমারই হবে—বরটা তো আমার, না আর কারুর? অপরের এত মাথাব্যথা কেন তাতে?'

অগত্যা শোভনা চুপ ক'রে যায় তখনকার মতো। কিন্তু হিতৈষী বলতে শোভনা শুধু একা নয়—এমন উৎকণ্ঠা আরও দু'চারজন প্রকাশ করে। সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করে স্বর্ণ। বলে, 'মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে মলো পাড়া-প্রতিবেশী! তা তোদের হয়েছে তাই। বলি আমার চেয়ে তো সে তোদের আপন নয়, তবে তোদের এত চিন্তা কেন? মার চেয়ে ব্যেথিনী, তারে বলে ডান—তা জানিস না?'

আবার হয়ত কাউকে হাসতে হাসতে—একটু বা চোখ-টিপে বলে, 'ওলো, অনেক

দিন ঘর করেছি—আমারও অরুচি ধরে গেছে, ওরও। আমার মুখ বদলাবার উপায় নেই তাই, নইলে কি আমিই ছেড়ে কথা কইতুম? যার উপায় আছে—সে দিন-কতক বদলে আসুক না!...আমার অত ভাতার ভাতার বাই নেই তোদের মতো। ভোগও করে নিয়েছি তো ঢের দিন—এখন আর ওতে আছে কি? রসকষ যা ছিল তাতো সব শুক্যে গেছে এ্যাদ্দিনে—কিছু কি আর আছে? এখন তো শুধু পড়ে আছে ছোবড়া-খানা, তা ও যে যা পারে নিক, ওর জন্যে অত আঁচলে গেরো দিয়ে রাখার দরকার নেই।...বরং মানুষটাকে নিয়ে কেউ আর চাট্টি টাকা দেয় তো দিক, আমার টাকাটা এলেই হ'ল!'

কিন্তু ক্রমশ স্বর্ণলতা নিজেও যেন সে অখন্ড বিশ্বাসটা রাখতে পারে না। ফিরতে রাত হয় বলে শুধু নয়—আজকাল অধিকাংশ দিনই—বাড়িতে খায়ও না হরেন। স্বর্ণলতা এমন বহুদিন খাবার সাজিয়ে বসে থেকেছে দীর্ঘরাত পর্যন্ত—নিজের এবং হরেনের দুজনের খাবারই শোবার ঘরে এনে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে—কিন্তু রাত দেড়টা কি দুটোর সময় এসে হয়ত হরেন জানিয়েছে যে কোন্ বিলিতি হোটেলে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সে জোর করে ডিনার খাইয়ে দিয়েছে। অথবা গুরুবচন সিং জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে, সেইখানে খেয়ে এসেছে। ফল হয়েছে এই যে, স্বর্ণরও খাওয়া হয় নি আর। অত রাত অবধি বসে বসে ঢোলবার পর এই সংবাদ শুনে একা বসে আর খেতে ইচ্ছা করে নি! হরেনের খাওয়ার নানা নটখটি, অনেক রকম রান্না না হ'লে সে খেতে পারে না। বহু দুঃখে বহু মেহনতে প্রস্তুত সে সব খাদ্য হরেনের ভোগে এল না—সেটাও কম দুঃখের হেতু নয়। তখন সেগুলো নিজে নিজে গিলতে স্বর্ণর চোখে জল এসে যেত।

তবু—তখন যদি হরেন সামনে বসে দুটো কথা কইত কি গল্প করত, কি খাবার জন্যে পীড়াপীড়িও করত তো আলাদা। সে এতই ক্লান্ত হয়ে আসে যে স্বর্ণর খাওয়া হ'ল কি হ'ল না, সেটাও চেয়ে দেখবার ধৈর্য থাকে না তার তখন। কোনমতে জামা-কাপড় ছেড়েই শুয়ে পড়ে। এমন কি সকালে কোন ছেলেমেয়ের অসুখ দেখে গেলেও কেমন আছে জিজ্ঞাসা করার কথা মনে থাকে না তার। পরের দিন সকালে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

অবশেষে হরেনই প্রস্তাব করল যে, স্বর্ণ যেন তার জন্যে জেগে বসে না থাকে। খাবারও না আর শোবার ঘরে এনে রাখে। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর স্বর্ণর এমনভাবে জেগে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। খাবারটাও এ ঘরে রাখার দরকার নেই—এসে ঢাকা খুলে খাবার খেতে গেলেই স্বর্ণর ঘুম ভেঙে যাবে, স্বভাবতই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে বসবে, বাতাস করতে চেষ্টা করবে—ফলে রাত্রিজাগরণ তার বন্ধ হবে না কোনদিনই। সুতরাং বাইরের ঘরের টেবিলে ভারী লোহার ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেওয়াই ভাল, খেতে ইচ্ছা হ'লে খাবে, নয় তো খাবে না—এক সময় শুধু গিয়ে চুপি চুপি শুয়ে পড়বে হরেন। একবার উঠে দোর খুলে দেওয়াটা এমন কিছু হাঙ্গামা নয়। আর—যেদিন খুব বেশী রাত হবে, আড়াইটে কি তিনটে—সেদিন অত ঝামেলাও করবে না—বাকী দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ঐ বাইরের ঘরের ইজি-চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্বর্ণ অবশ্যই খুব সহজে এ প্রস্তাবে রাজী হয় নি। এ তার সমস্ত জীবন-সংস্কারের বিরোধী। স্বামী সারাদিন খেটেখুটে এসে বাইরের ঘরে ঢাকা খুলে একা বসে খাবে—আর সে নিশ্চিন্ত হয়ে খাটে শুয়ে ঘুমোবে—এ কেমন করে হয়?... কিন্তু হরেনই জেদ করতে লাগল ক্রমাগত। এবং হয়ত বা কথাটাকে জোর দেবার

জন্যেই, পর পর দু-তিন দিন আড়াইটেরও পর ফিরল সে, অত রাত্রে যে খেতে বসল না তা বলাই বাহুল্য। অগত্যাই রাজী হ'তে হ'ল স্বর্ণকে। তার বুদ্ধিমতী জায়েরা আর একবার বিজ্ঞর হাসি হাসল আড়ালে।

এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর যেটুকু যোগ ছিল এতদিন—সেটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। আজকাল প্রায়ই শেষ রাত হয়ে যায় হরেনের ফিরতে। ফলে শুধু খাওয়া নয়, শোওয়ার ব্যবস্থাটাও পাকাপাকিভাবে বাইরের ঘরেই ক'রে নিল সে।

কিন্তু রাত হওয়াটাই কি তার একমাত্র কারণ।

বুকের মধ্যে একটা শীতল হতাশা অনুভব ক'রেও স্বীকার করতে হয় স্বর্ণকে শেষ পর্যন্ত যে—তা নয়।

বহুদিন আত্মপ্রতারণার চেষ্টা করেছে সে, দিদিমার ভাষায় 'মনকে আঁখি ঠারতে চেয়েছে—কিন্তু প্রতারিত করা যায় নি শেষ পর্যন্ত। মনের অগোচর পাপ নেই—মনে মনে মানতেই হয়েছে এক সময়ে যে, তার জায়েদের উপদেশই ঠিক, রাশ অনেক আগেই টানা উচিত ছিল। রাত্রে দেখা হয় না আজকাল আর কোনদিনই—কিন্তু সকালে হয়। চা এনে স্বর্ণকে ঘুম ভাঙ্গাতে হয় প্রত্যহ। বিলাতী সুরার গন্ধ দেশী মদের মতো অত উগ্র নয় হয়ত—তবু পরের দিন সকাল পর্যন্ত তার স্মৃতি রাখার পক্ষে পর্যাপ্ত। গন্ধটা ঠিক না চিনলেও অনুমান করতে পারে। পথে-ঘাটে আসা-যাওয়ার সময় মাতাল দু-একজন পাশ দিয়ে গেছে—সে কথাটাও মনে পড়ে যায় এ গন্ধ থেকে।

আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না স্বর্ণ। সকালে ঘুম ভাঙ্গবার সময় কলহ-কোন্দল করতে নেই বলে—কিন্তু তারই বা আর অবসর কই এ সময় ছাড়া। অগত্যা তাকে সেই সময়েই কথাটা তুলতে হয়, 'হ্যাঁ গো, কাজ কাজ বলে তুমি সব্বনাশ শুরু করেছ! এই ছাই-ভস্ম ধরেছ! এই জন্যেই বুঝি আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা? এই তোমার ব্যবসা করা? কাজ নেই আর আমার এমন ব্যবসা ক'রে। যাও বা ছিল রয়ে বসে—তাও যাবে বাঁদ্য এসে, এ নেশা একবার ধরলে পথে বসতে দেরি হবে না। তুমি যেমন চাকরি করছিলে, যেমন সন্ধ্যের সন্ধ্যেয় বাড়ি আসছিলে তাই এসো—আমার অত বড়মানুষ হয়ে দরকার নেই আর!'

অপ্রিয় সত্য সকল অবস্থাতেই অরুচিকর, এমন নেশা ভাঙ্গাবার পরের অবস্থার তো কথাই নেই। তবু হরেন কোন রাগারাগি করে না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'এই দ্যাখো! তবে আর মুখ্যু বলেছে কেন! ওরে পাগল, সায়েবী ডিনারের এ একটা প্রধান অঙ্গ, বিশ্বাস না হয়, যে লোক একটু লেখাপড়া জানে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রো। আমি কি আর নেশা করার মতো খাই—যেটুকু না খেলে নয়, সেইটুকুই খাই।'

'কই—এর আগেও তো সায়েবী ডিনার খেয়ে এসেছ কতদিন। তখন তো এমন গন্ধ পাই নি।'

'পাবে কি, মধ্যে যে ও জিনিস একেবারে মিলছিলই না। না দিতে পারলে আর খেতে বলবে কি ক'রে? বোতল-ধোয়া জল খেতে বলবে কি?,

'তা অত তোমার রোজ রোজ ডিনার-মিনার খাবার দরকারই বা কি! রোজ রোজ পরের ঘাড়ে চেপে খেতে লজ্জা করে না।'

'পরের ঘাড়ে কী গো। অদ্ধেক দিন তো আমাকেই সব খরচা দিতে হয়। এই তো কালই—একটা ডিনার দিতে সাড়ে আটশো টাকা খরচা হয়ে গেল!'

'ওমা! কারুর বে-পৈতেতেও তো এত খরচা হয় না। এমন ক'রে পয়সা ওড়ালে

কদ্দিন চালাতে পারবে? এইভাবে বাজে পয়সা উড়িয়ে কত রাজা-মহারাজা ফতুর হয়ে গেছে জানো? তুমি তো কোন্ ছার!...না না, তোমাকে আর অত ডিনার ফিনার দিতে হবে না! ফের যদি শুনি তুমি এমনি ইয়ার বগ্‌গ নিয়ে মাইফেল ক'রে টাকা ওড়াচ্ছ, তাহলে আমি মাথামুড় খুঁড়ে রক্তগঙ্গা করব বলে দিচ্ছি!'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে হরেন। বলে, 'তুমি একটা আস্ত আবর, মাইরি! ওরে বাবা, ওটা পয়সা ওড়ানো নয়, পয়সার সুতোয় খেলানো। বেনোজল ঢুকিয়ে ঘরেজল বার করতে হয় শোন নি কখনও? এও সেই রকম। আমার আদ্ধেক কাজ তো ঐ ডিনার-লাঞ্চ খেতে-খেতেই হয়। এসব বিলিতি দস্তুর। এই যে ব্যারিস্টার হ'তে সব বিলেতে যায়—কটা ডিনার আর কটা লাঞ্চ খেলেই পড়া শেষ। সেও গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে খেতে হয়—তা জানো!'

অত শত বোঝে না স্বর্ণ, তবু স্বামীকে অবিশ্বাসও ঠিক করতে পারে না, ম্লান মুখে বলে, 'কে জানে বাপু, ও যা জিনিস, ওর নাম শুনলেই ভয় করে। কতলোকের সব্বনাশ যে হ'তে দেখলুম তার কিছু ইয়ত্তা আছে! ঐ একটু আধটু থেকেই শুরু হয়—প্রেথম প্রেথম সব্বাই বলে যে ও কিছু নয়—তারপর নেশা যখন ঘাড়ে চেপে বসে তখন আর জ্ঞান থাকে না কারুরই! এ পোড়ার লড়াই যে কবে শেষ হবে—এই সব কান্ডকারখানা বন্ধ হবে—যুদ্ধু শেষ হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব খাড়া-খাড়া!'

হরেন তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়, 'ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে এনো না বলে দিচ্ছি, খবরদার! যদ্দিন যুদ্ধ চলে তদ্দিনই লাভ। যুদ্ধই লক্ষ্মী আমার!'

তা সত্যি। স্বর্ণ ভাবে, শুধু হরেনের কেন, আরও অনেকের কাছেই এ-যুদ্ধ লক্ষ্মী। ওর ভাইয়েরা যে কেউ কোনকালে রোজগার-পাতি করবে, পয়সা ঘরে আনবে—তা একবারও ভাবে নি সে। এই যুদ্ধের দৌলতেই তা সম্ভব হ'ল! সেজ ভাই ধনা ড্রাইভারী শিখে মিলিটারীতে নাম লিখিয়েছে, সে নাকি কেল্লার লরী চালাচ্ছে আজকাল। শুধু মাইনেই নয়, এদিক ওদিকও বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছে নাকি। বাইরের মাল স্টেশনে, জাহাজ-ঘাটায় পেঁছে দেবার পথে এক বস্তা চিনি কি এক বস্তা সিগারেট নামিয়ে দিয়ে যায়—মোট মোট টাকা পায় তাতে! অবিশ্যি ভাগ দিতে হয় তা থেকে অনেককে—তবু দিয়ে থুয়েও ঢের থাকে। ধনা এর মধ্যে রেডিও কিনেছে, আবার আলমারি কিনব কিনব করছে। মেজকা তো তারও বে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। ন্যাড়াও কি যেন লেদ্ না কী বলে, তারই কাজ শিখে কোন্ পাঞ্জাবীর কারখানাতে ঢুকে পড়েছে। বাকী দুটো ভায়েরও হয়ত কিছু কিছু গতি হয়ে যাবে—লড়াইটা আর কিছুদিন চললে। কিছু হ'ল না শুধু বুড়োরই। আর হবেও না কোন দিন তার কিছু। চিরকালই কাকাদের ভায়েদের হাত-তোলায় জীবন কাটাতে হবে। মুখপোড়া!...স্বর্ণ মনে মনে সাধারণভাবে গুরুজনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বড়ভাইকে গাল দেয়।...মুখপোড়ার যে আবার সন্দ-বাই ধরেছে। দিনরাত নাকি বৌকে পাহারা দেয় আজকাল, আঁচল ধরে ধরে ঘোরে। বৌটারই শতেক ক্ষোয়ার। বিয়েন তো অগুনতি—কটা জন্মাচ্ছে কটা মরছে আর কটা রইল তা বোধ করি ওরাও হিসেবে রাখে না। সেদিন মেজকাকে জিজ্ঞেস করেছিল স্বর্ণ, সেও বলতে পারে নি। অথচ এ গোটা ভূ-ভারতের হিসেব মেজকার নখদর্পণে সে কথা কে না জানে!...এক মাসও বোধ হয় জিরোতে পারে না বেচারী, বারোমাসেই পেটে বোঝা নিয়ে ঘুরছে আর সংসারের খাটুনি ষোল আনা বজায় দিচ্ছে।

'মেয়ে জন্মের শতেক জ্বালা। মুয়ে আগুন মেয়ে জন্মের!' মনে মনে বারবার

বলে স্বর্ণ। হয়ত নিজের কথাটা মনে ক'রেই বলে। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে।

॥ ২ ॥

স্বর্ণলতার শরীর ভেঙেগেছে অনেকদিন; তার স্বাস্থ্য অসাধারণ রকমের ভাল বলেই এতদিন সে তথ্যটা কারও নজরে পড়ে নি। তার প্রসঙ্গে বিশ্রাম বা কর্মহীনতা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সে দিনরাত এই সংসারে খাটবে সেইটেই যেন স্বাভাবিক। সেই কথাই সবাই জানে। সে খাটুনিও উদয়-অস্ত। শাশুড়ী অথর্ব হয়েছেন, অন্ধ হয়ে গেছেন প্রায়—তবু তাঁর খোরাকটি ঠিক বজায় আছে। সে বিচিত্র খাদ্য-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় নি। আর তার আয়োজনের ভারও স্বর্ণরই ওপর চেপে আছে এতাবৎ কাল। অন্য বৌ এসেছে বটে কিন্তু তাদের রান্না তাঁর মুখে রোচে না। তারা নাকি সব মেলেচ্ছও, তাদের হাতে খেলে বামুনের বিধবার জাতজন্ম থাকে না। তারা নাকি হাত ময়লা হবার ভয়ে গোবরে হাত দিতে চায় না, হাজা হবার ভয়ে হাত ধোয় না। চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখেই টপ্ করে ভাঁড়ারে হাত দেয় তারা। তাঁর পোনে-চারকাল কেটে গেছে, এখন কি আর এসব অনাচার তাঁর সয়? না হয় না-ই খাবেন তিনি। এ তো আর অল্পবয়সী ছুকরী-দের মতো নোলা'র জন্যে খাওয়া নয়—তাঁর খাওয়া এখন 'পেট ব্যাগল্‌তা'—জীবন-ধারণের জন্য। তা আর বাঁচার দরকারই বা কী তাঁর? বাঁচতে চানও না তিনি। কেউ যদি দয়া করে খানিক বিষ খাইয়ে দেয় তো তাকে আশীর্বাদই করবেন প্রাণ ভরে।

অর্থাৎ সে-ই এধারে বেলা তিনটে এবং ওধারে রাত এগারোটা পর্যন্ত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে বসে থাকা অব্যাহত আছে। উপরন্তু ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—তাদের জন্যে আরও ঢের খাটুনি বেড়ে গেছে তার। জায়েরা এসেছে বটে একে একে, কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হয় নি। একটু-আধটু ফায়ফরমাশ খাটা ছাড়া কোন কাজ পায় নি তাদের দ্বারা। তাও, তারা ক'দিনই বা ঝাড়া-হাত-পা থেকেছে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো প্রায় আঁতুড়ঘরের ব্যবস্থা। তারপর এখন তো কথাই নেই—যে যার আলাদা সব। বুড়ো শাশুড়ীকে কোন বৌ-ই নিতে চায় নি। তিনিও যেতে চান নি কারুর ভাগে! তিনি ভালভাবেই জানেন যে তাঁর এত ঝামেলা, এত দাপট আর কোন বৌ সহ্য করবে না।

অবশ্য স্বর্ণ বলেও নি কাউকে কিছু। নিজেই নিঃশব্দে বহন করেছে এ-বাড়ির জ্যেষ্ঠা বধূর যত কিছু দায়-দায়িত্ব। শাশুড়ীকে ও ঘাড় থেকে নামাতে চায় নি। নিজেই মুখ বুজে সহ্য করেছে এই অমানুষিক খাটুনি আর অমানুষিক হৃদয়হীনতা।

কিন্তু এবার শুধু তার মন নয়—দেহও বিদ্রোহ করল। আর নয়, আর পারবে না কিছুতেই এ বোঝা বইতে, এ ভার টানতে। তার সহ্যশক্তি সহনশীলতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে এবার। দড়িতে টান পড়তে পড়তে শেষ তন্তুটিও ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছে। আর সে পারবে না নিত্য নানা লোকের বিবিধ জুলুম সহ্য করতে। এবার পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে দীর্ঘদিনের এই একটানা জীবনযাত্রায়।

জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন থেকেই। প্রত্যহই জ্বর আসছিল একটু একটু। বিকেলের দিকে আসত আবার রাত্রে ছেড়ে যেত। কিন্তু ক্রমশ ছাড়াটা বন্ধ হয়ে গেল, সামান্য জ্বর নাড়িতে লেগেই থাকে দিনরাত। উল্‌টে নূতন উপসর্গ দেখা দিল—

কাশি। অষ্টপ্রহরই অল্প অল্প খুক্‌খুকে কাশি লেগে থাকে। ইদানীং সে কাশির বেগও বেড়েছে।

জ্বরের কথা স্বর্ণ কাউকেই বলে নি এতদিন। বিশেষ যে সাবধানে থাকত তাও নয়। স্নানও করত মাঝে মাঝে। ভাত তো খেতই!

অবশ্য সে না খাওয়ারই মধ্যে। ভাতের কাছে বসত শুধু। কিছুই খেতে ইচ্ছে করত না তার। দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তুতে। খাওয়া কমবার ফলেই হয়ত দেহটাও শুকিয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সে বেঁটে হ'লেও চিরদিনই তার গোলালো গোলালো নরম নরম গড়ন, সেজন্যে একটু মোটাই মনে হ'ত তাকে হঠাৎ দেখলে—কিন্তু এখন একেবারেই কঙ্কালসার হয়ে উঠল। ওর সেই মেমসাহেবদের মতো ফরসা রঙেও বিবর্ণতা ঢাকা পড়ল না—স্বভাবগৌর বর্ণ ছাপিয়ে উঠল রক্তহীনতার চিহ্ন।

স্বর্ণ না বললেও এসব লক্ষণগুলো অপরের চোখে পড়তে পারত। কিন্তু কার চোখে পড়বে? শাশুড়ী ভাল দেখতে পান না, পেলেও লক্ষ্য করতেন কিনা সন্দেহ। আর যার চোখে পড়ার কথা সবচেয়ে বেশী, তার সঙ্গে তো দেখাই হয় না আজকাল ভাল করে। সকালটুকুই যা বাড়িতে থাকে শুধু—ঘণ্টা-দুই বড়জোর—সে সময়েও সর্বদা ব্যস্ত থাকে। লোক আসার বিরাম নেই কোন সময়েই, যদি বা কোন সময় একটু ফাঁক রইল তো কাগজপত্র হিসাবনিকাশ আছে। তাতেই সময় কেটে যায়। কোনমতে এক সময় উঠে মাথায় জল ঢেলে খেতে বসে। তাও, অন্যমনস্কভাবেই খায়, কেউ কথা কইলে অন্যমনস্কভাবেই জবাব দেয়। কারও দিকে ভাল করে তার তাকাবারই অবকাশ নেই।

তবু এক সময় তাকাতে হ'ল। একদিন আর কোনমতেই উঠে দাঁড়াতে পারল না স্বর্ণলতা। মুখ গুঁজড়ে পড়ল একেবারে।

এরকম এ সংসারের ইতিহাসে কখনও ঘটে নি, এক স্বর্ণলতার আঁতুড়ে ঢোকবার সময় ছাড়া। সে সময় তবু কিছু প্রস্তুতি থাকত আগে থেকে, অন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা থাকত। কিন্তু এর কোন প্রস্তুতি ছিল না। মাথাতে আকাশ ভেঙ্গে পড়ল সকলকার। কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। ছেলেরা কিছুই পারে না, এ বাড়িতে কোন বেটাছেলের জল গড়িয়ে খাওয়ারও রীতি নেই। পারত এক মেয়ে—কিন্তু স্বর্ণর বড় মেয়েটিরই বয়স এই সবে বছর-দশেক। সে একটু-আধটু ফায়-ফরমাশ খাটতে পারে মাত্র। তাকে দিয়ে রান্নার কোন কাজ কখনও করায় নি স্বর্ণ, ও দিকেই যেতে দেয় নি। তাছাড়া এখন ইস্কুলে পড়া রেওয়াজ হয়েছে, পাড়া-ঘরের অধিকাংশ মেয়েই ইস্কুলে পড়ে—রেবাকেও দিতে হয়েছে। স্বর্ণলতার কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। সুতরাং সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে চলে যায়—তাকে কাজকর্ম শেখাবেই বা কখন?

হরেন এতকাল সংসারের দিকে মন দেয় নি—দেবার দরকার হয় নি বলে। এখন আর মন দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। সে দস্তুরমতো বিরক্তও হয়ে উঠল সেজন্য—এটা যেন তার ওপর একটা অবিচার বলেই মনে হ'তে লাগল। বললে, 'কৈ, তোমার এমনধারা অসুখ হয়েছে—এতকাল ধরে ভুগছ, আমাকে বলো নি তো?'

এর উত্তরে অনেক কিছু বলতে পারত—কিন্তু কখনই কোন কটু উত্তর, কথার দ্বারা কোন মর্মান্তিক আঘাত কাউকে দিতে পারে না স্বর্ণ। আজও পারল না, ম্লান হেসে শুধু বলল, 'কী আর বলব, তুমি ব্যস্ত থাকো—তুমিও তো খাটছ ভূতের

মতো, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করব?'

'সামান্য আর কোথায়—এ তো বেশ ভাল রকমই বাধিয়ে বসে আছ দেখতে পাই!'

'বেশ ভাল রকম বলে কিছু তো তেমন বুঝতে পারি নি, তা'হলে বলতুম!'

ঈষৎ যেন লজ্জিতভাবে, কৈফিয়তের সুরেই বলে স্বর্ণলতা।

সে যেটা বলতে পারে না, সেটা বলে দেয় জীবেন, ওর মেজ দেওর। বলে, 'এতদিন ধরে ভুগছে, এই চেহারা হয়ে গেছে—তবু মুখ ফুটে বল্‌তে হবে যে অসুখ, তবে তুমি ডাক্তার দেখাবে? বাধিয়েছে—সে তো বৌদির দিকে চাইলেই বোঝা যায়।......তুমি কি একবারও বৌদির দিকে চেয়ে দ্যাখো নি এই একটা বছরে?'

হরেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না সহজে, 'তা তোরা তো দেখেছিলি, তোরাও তো বলতে পারতিস। দেখছিস তো আমার নাইবার খাবার সময় নেই—এদিকে রাত দুটো-আড়াইটেয় ফিরি, ওদিকে নটা না বাজতে বাজতে বেরুই। আমার কি কোনদিকে চাইবার ফুরসুৎ আছে?......একবার কথাটা কানে তুলতে কি হয়েছিল? তোদেরও তো কম করে নি তোদের বৌদি!'

মাকে গিয়েও তিরস্কারের সুরে প্রশ্ন করে হরেন, 'ওর এমন দশা হয়েছে তা আমাকে একবার বলতে পারো নি!'

ওর মা অবশ্য দমবার পাত্রী নন, সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেন, 'আমি কি চোখে দেখতে পাই যে, কী দশা হয়েছে তা টের পাব?......না কি তোমার বৌই আমাকে বলে কখনও—কী হচ্ছে না হচ্ছে! দাসী বাঁদী পড়ে থাকি, যখন হোক দয়া ক'রে দুটো খেতে দেয় ভিক্ষের ভাত—এই পর্যন্ত।......আমাকে কি গুরুজন আপনার জন বলে মনে করে?......আর আমি যদি বুঝ্‌তেই পারতুম—তোর টিকি দেখতে পাচ্ছি কখন যে বলব। বছরে একদিন দেখা হয় কিনা সন্দেহ।......আর আমাকেই বা এমন চোখ-মুখ রাঙিয়ে তেড়ে এসেছিস কিসের জন্যে? তোর মাগ, রোজ রাত্তিরে গলা জড়িয়ে শুচ্ছিস, তুই টের পাস না?......আ ম'ল যা! আমার কাছে এসেছেন—বৌয়ের কেন অসুখ করল, কেন সে অসুখের কথা ও'কে জানানো হ'ল না তার কৈফিয়ৎ চাইতে!......বেহায়া বেইমান কমনেকার!'

কিন্তু বকাবকি অনুযোগ অভিযোগের সময় বেশী নেই হাতে। সেদিনের মতো অবশ্য ভাইয়ের বৌরাই চালিয়ে দেবে—একবাড়িতে থাকা—সেটুকু চক্ষুলজ্জা এখনও আছে তাদের—তার পর?

অগত্যা ডাক্তার ডাকারও আগে ঠাকুরের খোঁজ করতে বেরোতে হয়। অফিস কামাই ক'রে সারা বেলা ঘুরে প্রায় ডবল মাইনে কবুল ক'রে শেষপর্যন্ত এক বামুন ঠাকরুণকে ধরে নিয়ে আসে হরেন।......

মধ্যবয়সী বিধবা একটি, তবে অনেকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। পাড়াঘরে যে-সব রাঁধুনী দেখা যায় সে রকম নোংরা নয়। বামুনের মেয়েও বটে—জানাশুনো জায়গা থেকে নিয়ে এসেছে। সেই সুদূর বেহালার কাছে সোরশুনো না কী এক জায়গা আছে, সেইখানে বাড়ি—সেখান থেকে আসতেই নাকি আট টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়েছে হরেনকে—আত্মীয়স্বজন অনেক আছে সেখানে, তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে খোঁজখবর ক'রে এনেছে। মার জন্যেই এত কাণ্ড করা—ঠিক সৎ-ব্রাহ্মণের মেয়ে না জানলে তিনি ওর হাতে খাবেন না।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, পরিষ্কার কাপড়-জামা, কথাবার্তা ভাল—সবই ঠিক, তবু স্বর্ণর এতকালের ঘরকন্না, তার অতি প্রিয় ও অতিপরিচিত হেঁশেলের মধ্যে একটা অপরিচিত মেয়েছেলে গিয়ে ঢুকল—বহুকাল, হয়ত বা চিরকালের জন্যেই; তার পরি-

পার্টী ক'রে নিজের হাতে সাজানো ভাঁড়ার—কী অগোছালো নোংরা ক'রে তুলবে তা-ই বা কে জানে, কী রেঁধে দেবে তার স্বামীপুত্রকে, হয়ত মুখেই তুলতে পারবে না কেউ—না খেয়ে খেয়ে রোগা হ'তে থাকবে বাচ্ছারা;—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে স্বর্ণলতার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল। তার শোবার ঘরের একটা জানলার মধ্য দিয়ে তাদের রান্নাঘরটা দেখা যায়, বামুন-মেয়েকে সেখানে ঢুকতে দেবার পর থেকে আর ওদিকে একবারও চাইতে পারল না সে, দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে রইল সমস্তক্ষণ।......

রাঁধুনী ঠিক হ'তে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ওর চিকিৎসার কথা ভাবতে বসল হরেন। সকালে অবশ্য পাড়ার ডাক্তার—যিনি ওর ছেলেপুলেদের অসুখ হ'লে দেখেন—তাঁকে খবর পাঠিয়েছিল, তিনি এসে দেখে কী সব ওষুধ ইঞ্জেকশনও দিয়ে গেছেন, কিন্তু তার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার আর ফুরসুৎ হয় নি। অবশ্য সেজন্যে খুব ক্ষতিও বোধ করে নি কেউ। কারণ তাঁকে দিয়ে যে শেষ অবধি চলবে না সে বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত। খুব সাংঘাতিক কিছু না হ'লে স্বর্ণ এমনভাবে শুয়ে পড়ত না—এটুকু হরেনও বোঝে।

ভায়েরা পরামর্শ দিল, বত্রিশ টাকা ফীয়ের কোন বড় ডাক্তার ডাকতে। জীবেন বলল, 'স্যাকবার ঠুক-ঠাক কামারের এক ঘা, এসব ডাক্তার দেখিয়ে কোন লাভ হবে না, মিছিমিছি ভোগান্তি। অল্পে যাবার মতো কিছু হয় নি বৌদির। মানুষটা পড়ে থাকলে তোমারই ক্ষেতি, আর ওসব ঢিমেতেতালা চিকিৎসায় শেষ অবধি খরচ কম পড়ে না—মিছিমিছি এখন সামান্যর জন্যে ও দৃষ্টি-কৃপণতা না করাই ভাল!'

হরেনের মা কিন্তু কথাটা শুনে হেসে খুন হলেন। বললেন, 'পোড়া কপাল। ও ওর শুক্‌নো-সূতিকা হয়েছে—কম বিয়েন তো আর বিয়োলো না এই বয়সে। শরীরের বাঁধুনি ভাল, তোয়াজে আছে, ভাল-মন্দ খাচ্ছে তাই—নইলে কবেই পড়ত।...তা ডাক্তারীতে ওর কী করবে? কোন পুরনো বিচক্ষণ দেখে কবিরাজ দেখা—নয়ত হোমিওপাথী কর। হোমিওপাথীতে এসব রোগ আজকাল খুব চটপট আরাম হচ্ছে।'

কথাটা অবশ্য উপস্থিত কারুরই ভাল লাগল না। তাঁর ছোট ছেলে অতুলই জবাব দিল, 'তবে মা সেবার তোমার সামান্য আমাশার সময় দাদা হোমিওপাথিক ডাক্তার এনেছিল যখন—তুমি বেঘোরে মেরে ফেললে বলে ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলে কেন?'

'সে আমার সামান্য রোগ হয়েছিল! আমাশা!...সে তো আধা-কলেরা হয়েছিল বলতে গেলে। সে কি সহজ রোগটি বেধেছিল আমার!...তার সঙ্গে এর তুলনা!... বৌ যে! আসলে আমার এ ক্ষেত্রে কথা কইতে যাওয়াই ভুল হয়েছে। বুড়ো মার জন্যে ডাক্তার ডাকা বাজে খরচা--কিন্তু বোন্দের বেলা তো আর তা নয়। তাদের যে মহামূল্য জীবন......বেইমান, বেইমান না হলে আর এত দুর্দশা হয়। মা না থাকলে সব এক একটা বৌ পেতিস কী ক'রে আজ? এত বড়্‌ডা হ'তিস কী করে!...বলে অসৈরণ সইতে নারি শিকে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ি।...ডাকো বাবা, ডাকো তোমাদের যাকে খুশি, আমার নাকে-কানে খৎ যদি কোন কথা বলি আর। বিলেত থেকে সায়েব ডাক্তার আনাও না, সেই তো ভাল! পয়সা হয়েছে দুটো—খরচ করতে হবে বৈ কি। আধুনিকের ধন হ'লে সে পয়সা ডাক্তার-বদ্যি আর উকীল-বারেস্টারেই খায় চিরকাল—এ তো জানা কথা!'

যাই হোক--শেষ পর্যন্ত বত্রিশ টাকা ফীয়েরই ডাক্তার একজন এলেন। তিনি

কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার পরই গম্ভীর হয়ে উঠলেন, আরও খানিকক্ষণ ভাল ক'রে দেখে বাইরে গিয়ে হরেনকে বললেন, 'এ তো দেখছি মোক্ষম রোগ ধরিয়ে বসে আছেন। টি-বি। খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখেন নি আপনারা—হয় কিছু খান নি, নয় খাওয়া হজম হয় নি। দারুণ অপুষ্টি—তার ওপর সাত-আটটি সন্তান প্রসব এবং অমানুষিক খাটুনি—এই জন্যেই এটা হয়েছে। এ রোগ অবশ্য আজকাল আর আয়ত্তের বাইরে নয়—কিন্তু ঘরে রেখে কি পারবেন আপনারা চিকিৎসা করতে? ওষুধের চেয়েও এ রোগে বড় কথা শুশ্রূষা আর পথ্যি।...বরং যদি যাদবপুরে কি মদনাপল্লীতে নিয়ে যেতে পারেন তো দেখুন।'

অক্ষর দুটো শুনেই হরেনের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। সে কোনমতে বার দুই ঢোঁক গিলে শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'টি-বি?......ঠি-ঠিক বলছেন? মানে ভাল ক'রে দেখেছেন তো? ভুল হয় নি?. .মা বলছিলেন যে শুকনো সুতিকা না কি একরকম রোগ আছে—ওরও তাই হয়েছে?'

'সেও একরকমের কন্‌জাম্পটিভ্‌ ডিজীজ—কিন্তু না, ভুল হয়েছে বলে মনে হয় না। টি-বি তো বটেই. বেশ অনেকদিনই হয়েছে। উনি কাউকে কিছু বলেন নি, রোগ চেপে চেপে রেখেছেন।...অবশ্য এক্‌স রে তো করাতেই হবে, আরও কিছু কিছু পরীক্ষা আছে—কিন্তু সে যাই করান, আমার বিশ্বাস ঐ একই রেজাল্‌ট্‌ পাবেন। আমি ওষুধ ইন্‌জেকশন লিখে দিয়ে যাচ্ছি—থুথু রক্তপরীক্ষা এক্‌স্‌রে—এসব কোথায় কী ভাবে করাবেন তাও লিখে দিয়ে যাচ্ছি, তবে সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল ওঁকে কোথাও সরানো। বাড়িতে রেখে এ চিকিৎসা করানো শক্ত। তা-ছাড়া ছেলেমেয়েদের এখনই সিগ্রিগেট করা উচিত—সে কি পেরে উঠবেন?'

হরেন তাঁর সব কথা শুনলও না ভাল করে। যন্ত্রচালিতের মতোই প্রেসক্রপশনগুলো নিল তাঁর হাত থেকে। তার তখন মাথা ঘুরছে। সে যে এত ভীতু তা এতকাল বোধ করি সে নিজেও জানত না। রোগটার নাম শোনা পর্যন্ত তার হাত পায়ের জোর চলে গেছে। খুব স্পষ্ট কোন ধারণা নেই বটে তবে রোগটা যে সাংঘাতিক তা জানে। মারাত্মক রকমের ছোঁয়াচে। যদি ওর থেকে আর কারও হয়? ছেলেমেয়েদের,,কিম্বা তার নিজেরই? এতদিন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া সব ওর হাতেই হয়েছে, শোওয়াও—রোজ না হোক, মাঝে-মধ্যে এক আধদিন ওর পাশে শুয়েছে বৈকি! কতদিন ধরে ঐ রোগ ঢুকেছে ওর মধ্যে তার ঠিক কি, ডাক্তার তো বলে গেল অনেকদিন—তিন-চার ঘণ্টাও যদি শুয়ে থাকে তাই যথেষ্ট, ও রোগের বিষ নিঃশ্বাসে ছড়ায় নাকি; ভাবতেই মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল হরেনের।

সে আতঙ্ক—যেমন দুর্বলচিত্ত লোকের হয়ে থাকে—শিগ্‌গিরই একটা বিজাতীয় আক্রোশের আকার ধারণ করল। ডাক্তার চলে যেতে সে ভেতরে এসে সেই আক্রোশের বিষ প্রায় সমস্তটাই উদ্‌গীরণ করল তার স্ত্রীর ওপর।...কেন সে এতকাল ধরে এই রোগ ভেতরে ভেতরে পুষে রেখে দিয়েছে—কেন জানায় নি যে রোজ ওর জ্বর আসছে একটু ক'রে—এমনভাবে শরীর ভেঙেগ যাচ্ছে...হরেন কি চিকিৎসা করাত না শুনলে? না কি সে এতই কৃপণ যে ওর অসুখ হয়েছে শুনেও পয়সা খরচের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত? কখনও কি ডাক্তার ডাকে নি সে স্ত্রীর জন্যে? তার এত কি পয়সার মায়া দেখল স্বর্ণ। কী এমন কৃপণতা করেছে সে এতকালের মধ্যে? এমনভাবে এই রোগটি বাড়িয়ে এখন এইভাবে চারিদিক জ্বালাবার কি দরকার পড়ল? এত আড়ি কার ওপর ওর? মরতে তো নিজের ছেলেমেয়েরাই মরবে—না কি অপর কেউ...ইত্যাদি ইত্যাদি—

কথাগুলো শুনতে খুবই ভাল, আপাত-বিবেচনায় মনে হয় স্ত্রীর জন্যে উদ্বেগই এ উষ্মার মূল কারণ, কিন্তু যে দীর্ঘকাল এই স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছে তার তা মনে হবার কোন কারণ নেই। স্বর্ণরও তা হ'ল না। সে মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় জল ঝরে পড়তে লাগল। হরেন যে কী পরিমাণ ভয় পেয়েছে এবং সেইজন্যেই যে এমন দিশাহারা হয়ে উঠেছে—একটা আপদ একটা বোঝার মতো মনে হচ্ছে এখন স্ত্রীকে—কোন মতে দূর করে দেবার আশু কোন পথ দেখতে না পেয়েই যে এতটা ক্ষেপে উঠেছে—তা বুঝতে বাকী রইল না তার একটুও।

প্রাথমিক ঝাঁঝটা কেটে যাবার জন্যেই হোক—অথবা স্ত্রীর চোখের জল লক্ষ্য করেই হোক—অনেকটা প্রকৃতিস্থ হল হরেন। বোধহয় নিজের ভুলও বুঝতে পারল খানিকটা। রাগারাগি করলে ঝগড়া-বিবাদ করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে কিছুটা দেরি হয়—বরং মিষ্টি কথায় কাজ হয় অনেক সহজে, এটা এই কিছুকাল ব্যবসা করার ফলে বেশ বুঝেছে সে। তাই খানিকটা চুপ করে থেকে অনেকখানি নরম গলায় আবার বলল, 'না—রাগ কি আর মানুষের সহজে হয়? দেখছ আমি কী রকম ব্যস্ত থাকি সর্বদা—নাইবার-খাবার সময় নেই—আমাকে একটু মুখ ফুটে বলতে কি হয়েছিল? তুমি চারচালের ভার নিয়ে আছ তাই না আমি এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে খাটতে পাচ্ছি। এখন কি আতান্তর অবস্থা হবে ভাব দিকি। ছেলেমেয়ে-গুলোর কথা ভেবেও তোমার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যতই ব্যস্ত থাকি—তাদের অসুখ হ'লে আমাকে তো ঠিক বলেছ, আমিও তার ব্যবস্থা করেছি—নিজের অসুখের কথাটা একবার কানে তুলতে পারো নি? সেটা বুঝি চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল তোমার?—না কি?...আমি কি তোমার কুটুম্ব, না দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছি বাড়িতে যে এত চক্ষুলজ্জা?'

খুবই ন্যায্য কথা। শুনলে যে কোন স্ত্রীরই পুলকিত হওয়া উচিত। কিন্তু স্বর্ণ তা হ'ল না। জবাবও দিল না কিছু। পরবর্তী আক্রমণটার জন্যেই অপেক্ষা করতে লাগল শুধু।

সেটা আসতেও অবশ্য আর দেরি হ'ল না। হরেনের ধারণা যে তার স্ত্রী নির্বোধ, অনেকটা ছেলেমানুষ এখনও। তাই বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজনও বোধ করল না। একবার সামান্য কেশে গলাটা সাফ্ করে নিয়ে মাথার পিছন দিকটা চুলকোতে চুল-কোতে বলল, 'দ্যাখো একটা কথা ডাক্তার তো বারবার বললেন, হাসপাতালে পাঠাবার কথা—আর যতদিন তা না হয়—অন্তত এবাড়ি থেকে ঠাঁইনাড়া করে অন্য কোথাও রাখার কথা। বেশ জোর দিয়েই বললেন—এ রোগ নাকি বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা কঠিন—হাসপাতালেই পাঠাতে হবে। এ রোগের হাসপাতালে খরচা অনেক—তা তাতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু যুদ্ধের বাজার বুঝতেই তো পারছ—অনেক সই-সুপারিশ না ধরলে হাসপাতালে বেড পাওয়া যাবে না। তা আমি বলছিলুম কি ততদিন না হয়—তোমাকে মৌড়ীতে রেখে আসি না—?'

'না।' হরেনের কথা শেষ করতে না দিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল স্বর্ণলতা। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম কথা কইল সে—কিন্তু তার চোখের জলের সঙ্গে কণ্ঠের এই অস্বাভাবিক দৃঢ়তা একেবারেই বেমানান মনে হ'ল হরেনের কাছে। সে বেশ একটু চমকেই উঠল।

'না।' গলায় রীতিমতো জোর দিয়ে বলল স্বর্ণ, 'তোমার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বাড়িতে নেই?...তোমার ছেলেমেয়ের কথা, ভাই-ভাইপোদের কথা—

নিজের কথাই ভাবছ শুধু। তোমাদের প্রাণের দাম আছে, আর তারাই একেবারে এত ফেলনা—না? কেনই বা তারা বইবে এ দায়? তোমার লজ্জা করে না একথা তুলতে? তারা একগাদা টাকা খরচ করে বে দিয়েছে তত্ত্বতাবাস লোক-লৌকিকতার কোন ত্রুটি রাখে নি কখনও—তার পরিবর্তে এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত ভূতের মতো খেটে গেছি—একাধারে ঝি আর রাঁধুনীর কাজ করেছি এতবড় সংসারে। উদয়-অস্ত হলেও বাঁচতুম—ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বারোমাস তিনশ পঁয়ষট্টি দিন একভাবে খেটে শরীর পাত করেছি তোমার এখানে—এখন এই রোগ ধরেছে বলে আর একদণ্ডও সহ্য হচ্ছে না?...বাড়ির পুরনো ঝিকেও এত সহজে লোকে ঘাড় থেকে নামাতে পারে না। এত কাল তো একবেলার জন্যেও তাদের বাড়ি যেতে দিতে না, আজ আমি কাজের বার হয়ে গেছি বলেই যেখানে হোক ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে নামিয়ে রেখে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!...কেন যাব আমি—কিসের জন্যে? এ বাড়িতে আমার কোন জোর নেই? তোমার এ অসুখ করলে আমি কোথাও দূরে পাঠাবার কথা ভাবতে পারতুম? না কোন ছেলেমেয়ের অসুখ করলে তুমি একথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতে?'

কাশির ধমকেই চুপ করতে হয় একটু। বোধহয় এতখানি উত্তেজনায় অপরিসীম ক্লান্তও হয়ে পড়ে। খানিকটা চুপ করে থেকে একটু সামলে নিয়ে প্রায়-রুদ্ধ-কণ্ঠে আবার বলে, 'বেশ তো, বাড়িতে রাখার যদি এতই অসুবিধে হয় তো—দূর করার অন্য উপায়ও তো আছে। কড়িকাঠও আছে, পরনের ছেঁড়া শাড়িও জুটবে একখানা।...তাতেও যদি মনে করো—পুলিশ-ফুলিশ নানান হ্যাংগামে পড়তে হবে—কোনমতে একখানা রিক্‌শা ডেকে গঙ্গার ধারে পাঠিয়ে দাও, আর কোন দায় বইতে হবে না তোমাদের, কোন ভাবনাও ভাবতে হবে না।...এত পয়সার জোর দেখাও যখন তখন—পয়সা ফেললেও হাসপাতালে জায়গা হয় না? না অনর্থক জেনেই সে বাজে পয়সাটা খরচা করতে চাইচ না? না কি—ভয় পাচ্ছ যদি হাসপাতালে গিয়ে ভাল হয়ে আসি? ঠিক ঘর করতেও সাহস হবে না—অথচ সে ক্ষেত্তরে আর একটা বৌ আনতে চক্ষুলজ্জায় বাধবে! তাই যদি হয় তো—দুটো দিন সবুর করো—খোরাকী বন্ধ করলে আপনিই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে!'

হরেন অপ্রতিভের মতো চুপ করে বসে থাকে। তখনই যেন কোন কথা যোগায় না তার মুখে। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'ঐ নাও! দ্যাখো একবার কাণ্ডখানা। বলে যার জন্যে চুরি করি—সেই বলে চোর। তোমার ভালর জন্যে বলতে গেলুম—'

ততক্ষণে আবারও অশ্রুর বন্যা নেমেছে স্বর্ণর চোখে। সে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'থাক—আমার ভাল আর ভাবতে হবে না তোমাকে। জীবনভোরই তো ভেবে এলে—আর কেন!'

॥ ৩ ॥

বাপের বাড়িতে যেমন সরানো গেল না স্বর্ণকে—তেমনি হাসপাতালেও না। কোন হাসপাতালেই নাকি 'বেড' নেই। অর্থাৎ যতটা উদ্যম থাকলে এই যুদ্ধের বাজারে ভর্তি করানো সম্ভব হ'ত—ততটা উদ্যম হরেনের ছিল না। তার নিজের অবসর

কম—এ সব ব্যাপারে তাকে বন্ধু-বান্ধবদের ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশী। তাদেরই বা কী এত গরজ যে, দিন-রাত ঘুরে তম্বির তদারক করে বেড্-এর ব্যবস্থা করবে অপরের স্ত্রীর জন্য?

সুতরাং কিছুই করা গেল না—পাড়ার এক সাধারণ ডাক্তারকে দিয়ে মামুলী চিকিৎসা ছাড়া। জীবেন বলেছিল নার্স রাখতে কিন্তু তাও হয়ে ওঠে নি। দিনরাত নার্স রাখতে গেলে অনেক খরচা—খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, দুটি নার্স দিনে চার টাকা ও রাত্রে আট টাকার কমে হবে না। প্রত্যহ এই বারো টাকা খরচা ছাড়াও তাদের খাওয়ার খরচ এবং ঝঞ্ঝাট আছে। মনে মনে একটা আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব ধরেই 'হ্যাঁ—এই চেষ্টা করছি' 'অমুককে বলে রেখেছি' 'সুবিধে মতো লোক দেখতে হবে তো—বাড়ির মধ্যে ঢোকানো,' বলে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। কারণ তারপর আর কথাটা কেউ তুলল না, ভুলেই গেল সকলে।

এধারে স্বভাবতই বাড়ির লোক সন্ত্রস্ত ও সতর্ক হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে নিজে-দের ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে সকলে। ছোট ভাই শাশুড়ীর অসুখের অজুহাতে সপরি-বারে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠল। তার শ্বশুরদের অবস্থা ভাল কিন্তু বাকী দুজনের সে সুবিধা নেই। তারা যতটা সম্ভব এই ঘরখানা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই জায়েরা একবার করে বাইরে থেকে 'আজ কেমন আছ দিদি' জিজ্ঞাসা করে যেত। সেইটুকুর জন্যও সতর্কতার অন্ত ছিল না অবশ্য। মেজবৌ দুই নাকে ইউক্যালিপ্‌টাস তেল দিয়ে তবে ওদিকে যেত। সেই রকমই জীবেনের নির্দেশ। ও রোগের বিজাণু নাকি নিঃশ্বাসেই বেশী আসে।

ওঘর—স্বর্ণদের ঘর সকলেই পরিহার করেছে। স্থানাভাবে হরেনের ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমার ঘরে শোয় এখন। তাঁর অবশ্য প্রবল আপত্তি ছিল কিন্তু হরেন এ ব্যাপারে মায়ের কোন কথাই শোনে নি। পরোক্ষে আভাস দিয়েছে যে তেমন কোন অসুবিধা বোধ করলে তিনি অনায়াসে তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর ঘরে গিয়ে শুতে পারেন। প্রায় সত্তর বছর বয়স হ'তে চলল তাঁর—এত আর এখন জীবনের মায়া কিসের?

ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের কাছেও যেতে পায় না। হরেনের কড়া নিষেধ। শুধু বড় মেয়ে রেবা মধ্যে মধ্যে দুপুরে বা বিকেলে এক-আধবার লুকিয়ে মার ঘরে যায়. এটা ওটা হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়ে আসে।

আগে স্বর্ণ নিজেও বারণ করত ওদের আসতে। ইদানীং আর করে না। এর মধ্যে একদিন ওর খাবার ঘটির জল ফুরিয়ে গিয়েছিল—বার বার ক্ষীণকণ্ঠে 'একটু জল' 'ওগো তোমরা কেউ আমাকে একটু খাবার জল দিয়ে যাও না গো' বলে হেঁকেছে—কিন্তু কেউই আসে নি বা জল দিয়ে যায় নি। জায়েরা সামনেই উঠোন পেরিয়ে কলঘরে গেছে—তারা শুনতে পায় নি, অথবা শোনে নি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে শুকনো কাশিতে বেচারার দম বন্ধ হবার মতো হয়েছিল। মরেই যেত হয়ত—রেবার জন্যেই বেঁচে গিয়েছে সেদিন। কি একটা উপলক্ষে রেবার সকাল করে ছুটি হয়েছিল, বাড়ি ফিরে মার ঐ অবিরাম খুকখুকে কাশি শুনে সে নিজে থেকেই আগে ছুটে এ ঘরে এল। তখন আর জল চাইবার মতোও শক্তি ছিল না স্বর্ণর—সে শুধু ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিল জলের গেলাসটা। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার পরে আর স্বর্ণ কাউকে নিষেধ করে নি ওর ঘরে ঢুকতে।

নার্স রাখা তো হয়ই নি—এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল কোন হাসপাতালের আয়া বা দাইকে বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে এনে রাখতে তাও হয়ে ওঠে নি। নিহাৎ

স্বর্ণর অদৃষ্টে বেঘোরে মৃত্যু নেই বলেই বোধহয়—ওদের বুড়ী ঝি আয়না দিনকতক পরে এ ঘরের কাজ নিজের হাতে তুলে নিলে। রাত্রেও ওর ঘরে শুতে শুরু করল। তার একটি মেয়ে আছে গিরিবালা বলে,—দেশে থাকে সে—কদাচিৎ কখনও দেখা হয়—তার জন্যেই বুড়ীর আরও চাকরি করা,—সে নাকি কতকটা স্বর্ণর মতোই দেখতে। তার মায়াতেই আয়নার এতটা টান স্বর্ণর ওপর। হয়ত এতাবৎকাল স্বর্ণর সস্নেহ ভদ্র ব্যবহারও একটা বড় কারণ।

আয়না স্বর্ণর ভার নিতে হরেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। নিশ্চিন্তও হ'ল অনেকটা। যতই যা হোক—এই দেড় মাস দু মাস ধরে বিবেকের একটা খোঁচা ভেতরে ভেতরে কোথায় ছিলই তার। স্বর্ণর অস্তিত্বটা একেবারে ভুলে থাকা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এবার সে খোঁচাটুকু আর রইল না, নিশ্চিন্ত হয়েই পিছন ফিরল স্ত্রীর দিকে। ডাক্তার দেখাচ্ছে, সেবা করার জন্য ঝি রেখেছে—তার কর্তব্যে কোন ত্রুটি আছে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না আর। সে সংসারের জন্যে আর একটা ঝি বহাল করল, যাতে আয়নার আর এদিকে কোন দায়-দায়িত্ব না থাকে। বাকী লোকের নিরাপত্তার জন্যেও সেটা আরও দরকার অবশ্য, কিন্তু হরেন তা স্বীকার করল না। আয়নার মাইনে দু টাকা বাড়িয়ে দিল সে নিজে থেকেই। অর্থাৎ খরচের জন্য সে ভাবছে না একবারও, কার্পণ্য করছে না কোন দিকেই। শুধু একদম সময় নেই বলেই—এইসব কারণে আয় বৃদ্ধির দিকে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়েছে বলেই—স্ত্রীর দিকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার।

এই অসুখে পড়ার পর, বা অসুখটা কী ধরা পড়ার পর স্বর্ণরও অন্তরের দিকটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। এসব কোন কিছুই আর তাকে স্পর্শ করতে পারত না—আঘাত দিতে পারত না। এক কলকল্লোলা স্রোতস্বিনী হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে কোন অনুযোগ কোন নালিশ করত না কারও কাছে। এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত স্বার্থের চেহারা সে অনেক রকম দেখেছে—স্বামীর সম্বন্ধেও বিশেষ মোহ তার ছিল না—তবু ঠিক এরকমটা, এতটা জানত না। এমন যে হ'তে পারে তা কখনও ভাবে নি। সারা জীবনটা পাত করেছে সে—সমস্ত শক্তি সমস্ত স্বাস্থ্য—শেষবিন্দু রক্ত ঢেলে দিয়েছে সে এই সংসারে, তার বিনিময়ে এতটা ঔদাসীন্য সে আশা বা আশঙ্কা করে নি। মানুষের এ চেহারাটা তার কল্পনার বাইরে। এই আঘাতেই সে এমন স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে কিছু চাইবার প্রবৃত্তি আর তার নেই।

শুধু একটা বিষয়ে সে এখনও অনমনীয়।

হরেন তার বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল ওকে না জানিয়েই। অর্থাৎ তারা যদি এসে নিয়ে যায় তো যাক। এসেছিলও তারা। বাবা মেজকাকা মা সবাই এসেছিল। এমন কি ওর ভায়েরাও এসেছিল সকলে। নিয়ে যাবার প্রস্তাব অবশ্য তারা করে নি। করে নি ছোঁয়াচে অসুখের ভয়ে নয়—ওখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসা হবে না সেই ভয়ে। মেজকাকা সে কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে জামাইকে। তবে মা থাকতে চেয়েছিল মেয়ের কাছে। এভাবে পড়ে থাকলে হয়ত একটু তেষ্টার জলও পাবে না সময়মতো—এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিল মহাশ্বেতা। কিন্তু স্বর্ণ কিছুতেই রাজী হয় নি সে প্রস্তাবে। বলেছিল, 'তাহ'লে আমি মুখে জল দেবো না, দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকব।...ওপোস ক'রে শুকিয়ে মরব। কেন, কিসের জন্যে তুমি এসে আমার কন্না করতে যাবে তাই শুনি! দেহটা পাত করেছি যাদের জন্যে তাদের শক্তে পোরে তারা দেখবে; না হয় তো মরে পড়ে থাকব—ঠ্যাং ধরে টেনে

ফেলে দেবে এরা—ব্যস্ চুকে যাবে ন্যাটা!...যদ্দিন পেরেছে আমাকে ঘানিগাছে ফেলে সব রক্ত নিংড়ে বার ক'রে নিয়েছে, এখন এই ছিবড়েটাতে কোন কাজ নেই, ঘর-জোড়া ক'রে পড়ে আছি বলে বুঝি বাপেদের কথা মনে পড়েছে?...বাবার অমন সব্বনাশের দিনেও একবেলা যেতে দেয় নি এরা—নিদিনিদিখ্যেতে পঞ্চাশ ব্যান্নন রান্নার অসুবিধে হবে বলে—এদের ঝিগিরি বামনীগিরির কাজ আটকে যাচ্ছিল বলে—সে কথা আমি ভুলি নি, কাঁটার মতো বিঁধে আছে বুকে। এখন কেন যাব? আমিও যাব না, তোমরাও এসো না কেউ। জেনে রাখো তোমাদের মেয়ে মরে গেছে।'...

ওরা অবশ্য এসেছে তার পরেও। মহাশ্বেতা এসেছে, তরলা এসেছে। মেজ-কাকীও এসেছে দু একবার। কিন্তু থাকতে দেয় নি স্বর্ণ কাউকেই। বাপের বাড়ি যেতেও রাজী হয় নি। বলেছে, 'এদের বাড়ির রোগ তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঢোকাব কিসের জন্যে গা—সুখ-সোমন্দা! এদের বাড়ির রোজগার তো এটা, এখানেই খরচ ক'রে যাই!

তবু, স্বামী যে ঠিক তাকে এইভাবে একেবারে পরিহার করে চলবে অতটা বোধহয় মনে করে নি স্বর্ণ। মনের মধ্যে কোথায় একটা ক্ষীণ আশা ও আশ্বাস ছিল যে এতদিনে একটুখানি মায়াও অন্তত পড়েছে তার ওপর। সামান্য একটা বনের পাখী পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে তার ওপর—গোরু-কুকুর পুষলে তো কথাই নেই। কিন্তু সে আশ্বাস আর রাখা যায় না। দিনের পর দিন যায়,—একটা সপ্তাহের সঙ্গে আর একটা সপ্তাহ যুক্ত হয়, হরেন এসে ওর ঘরের সামনেও দাঁড়ায় না একবার। জায়েরা পরের মেয়ে—কথায় বলে দেইজী শত্রু, তবু তারাও তো একবার করে, বাইরে থেকে হ'লেও, দিনান্তে যখন হোক খবরটা নিয়ে যায়—'কেমন আছ দিদি? ...দেওররা চৌকাঠের মধ্যেও ঢোকে এক-আধবার! জীবেন বেশ খানিকটা ভেতরে এসেই দাঁড়ায়। হরেন কি একবারও খোঁজ করতে পারে না? তার কি এতই প্রাণের মায়া?...না কি সত্যিই তার এত কাজ?

শেষেরটা বিশ্বাস করতে পারলে হয়ত বেঁচে যেত স্বর্ণ। মানুষের ওপর এমন-ভাবে আস্থা হারাত না। মনের মধ্যে একটা শেষ অবলম্বন থাকত অন্তত। কিন্তু তাই বা পারে কৈ? সে ভেতরে আসছে, মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কইছে—এইখান দিয়েই কলঘরে ঢুকছে, বামুন ঠাকরুনকে বিবিধ রান্নার ফরমাশ করছে—এসব তো ঘরে শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছে স্বর্ণ, দেখছেও কতক কতক। এর মধ্যে এইখান দিয়ে চোদ্দবার যাতায়াতের সময় কি একবারও একটু থমকে দাঁড়িয়ে তার খোঁজ নিতে পারে না সে?...আয়নাকে ডেকে নাকি তত্ত্ব নেয় মাঝে মাঝে, ডাক্তারের কাছেও নাকি খোঁজ নেয় অসুখের ও চিকিৎসার। কিন্তু আসল মানুষটার খবর নিতে কি হয়? ও যে এইখানেই কাঙালের মতো তার মুখ চেয়ে পড়ে থাকে তা কি একবারও ভেবে দেখে না সে?...বিশ্বাস হয় না ওর, কিচ্ছু বিশ্বাস হয় না। আয়না মিছে ক'রে বানিয়ে বলে, তাকে মিথ্যে স্তোক দেয়। পুরনো চেনা ডাক্তার —সেও ভদ্রতার খাতিরেই মিথ্যে কথা বলে নিশ্চয়।

দিন গোনে একটা একটা ক'রে স্বর্ণ। হরেন শেষ কবে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে তার খবর জিজ্ঞাসা করেছে—সে তারিখটা মনে ক'রে রেখেছে সে স্থান-কাল-পাত্র-একাকার-করা ব্যাধির এই প্রবল বিভ্রান্তির মধ্যেও। পনেরো, ষোল, সতেরো—কুড়িও হয়ে যায় একসময়ে।...আগে একটা তীব্র অভিমান, একটা দিক্‌দিশাহীন উষ্মা, প্রচণ্ড চিত্তক্ষোভ ঠেলে ঠেলে উঠত তার মনের মধ্যে, মনে মনেই সহস্র অনুযোগ তুলত, উত্তর-প্রত্যুত্তরের মহড়া দিত। তীক্ষ্ন বাক্যবাণে প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত

করতে চাইত। কিন্তু ক্রমশঃ সে অভিমানটুকু রাখার মতোও মূলধন যেন খুঁজে পায় না এখন। একেবারেই দেউলে হয়ে গেছে সে, নিঃস্ব হয়ে গেছে। এখন শুধু তাই একটা অসহায় কান্নাই বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে ওঠে। তার দাম কারুর কাছে ছিল না কখনও—আজও নেই। হয়ত একদিন ছিল তার শৈশবে কৈশোরে—তার মা কাকা কাকীদের কাছে, হয়ত বাবার কাছেও—আর সেই দীন অনাথ ছেলেটা,—সেই অরুণের কাছেও—কিন্তু এখানে যেটুকু তার দাম তা শুধু তার কাজের। যতদিন কাজে লেগেছিল ততদিনই তার কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল এ বাড়িতে। আজ তার সে শক্তি গেছে ফুরিয়ে—আজ আর তাই মূল্যও কিছু নেই।

যত কাঁদে, যত মনের মধ্যে মাথা কোটে—ততই অসুখও বাঁকা পথ ধরে। প্রথম প্রথম চিকিৎসাতে মন্দ ফল হয় নি। বিবর্ণ মুখে একটু রক্তাভা দেখা দিয়েছিল, অবশ হাত-পায়েও একটু বল ফিরে এসেছিল কিন্তু তারপরই আবার যেন কোথায় কী একটা গন্ডগোল বাধে, ওর প্রাণশক্তি সাড়া দেয় না আর কোন ওষুধেই। বরং অবস্থার যেন দিন দিন অবনতিই ঘটতে শুরু করে।

ডাক্তার সে কথা হরেনকে জানান। প্রাণপণে হাসপাতাল ঠিক করতে বলেন। হরেন চিন্তিত হয়, বিরক্ত হয়—কিন্তু তবু তোড়জোড় ক'রে হাসপাতালে বেড্ ব্যবস্থা করতে পারে না।

ডাক্তার অবশ্য আশ্বাস দেন স্বর্ণকে, 'ওঁকে বলেছি—দরকার হ'লে ঘুষ দিয়েও ব্যবস্থা করতে—এবার মনে হচ্ছে একটা সীট পাওয়া যাবে। হাসপাতালে না গেলে সারতে অনেক দেরি হবে কিন্তু। আপনি যেন আবার হাসপাতাল শুনে কাঁদতে শুরু ক'রে দেবেন না।'

স্বর্ণ ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমি কাঁদব না। আমি এখান থেকে বিদেয় হ'তে পারলেই বেঁচে যাই—কিন্তু হাসপাতালে যাওয়াও আমার হবে না ডাক্তারবাবু, আমি এই আপনাকে বলে রাখলুম!'

'কেন—উনি তো চেষ্টা করছেন খুব!'

'মিছে কথা। হাসপাতালে গিয়ে যদি আমি বেঁচে ফিরে আসি আমাকে নিয়ে ও কি করবে বলতে পারেন? ভরসা ক'রে ঘরে নিতে পারবে না—অথচ আর একটা বিয়ের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এ এমনি ক'রে পড়ে থাকলে শিগ্‌গিরই সব পথ খুলে যাবে—বুঝছেন না!...ওর এখনও ঢের বিয়ের বয়স আছে, আমার চেয়ে অনেক ভাল বৌ জুটে যাবে!'

হা হা ক'রে হেসে ওঠেন ডাক্তার।

'এ তো আপনাদের মান অভিমানের কথা হ'ল। ও কোন কাজের কথা নয়। হচ্ছে, হচ্ছে—ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই এর মধ্যে।'

এ-কথার কোন উত্তর দেয় না আর স্বর্ণ। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে। হায়রে! মান অভিমানের কথা বলে যদি এই মর্মান্তিক সত্যটাকে সেও উড়িয়ে দিতে পারত!...কিন্তু সে সব আর এই নিরীহ লোকটাকে বলে লাভ কি? সে প্রাণপণে শুধু ওঁর সামনে থেকে চোখের জলটাকে গোপন করার চেষ্টা করে।

তা হ'লেও, স্বামী সম্বন্ধে স্বর্ণ যতই মোহমুক্ত হোক, হরেন যে আর দুটো দিনও সবুর করতে পারবে না, এত শিগগির এই কেলেঙ্কারী ক'রে বসবে, তা কল্পনাও করতে পারে নি সে।

সন্দেহ করেছিল অবশ্য প্রথম দিন থেকেই। চোখের আড়ালে গেলেও তার

মনের আড়ালে যেতে পারে নি হরেন একবারও। স্বর্ণর একটা চোখ আর একটা কান সর্বদা পাতা থাকত হরেনের দিকে, তার মন যেন ছায়ামূর্তি ধরে অনুগমন করত স্বামীকে, বিশ্রামে-অবসরে সমস্ত সময়—ঘরে বাইরে সর্বত্র। ঘরে শুয়ে শুয়েও ওর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করত সে।...কাজেই হঠাৎ একদিন হরেনের সকাল ক'রে বাড়ি ফেরাটা অগোচর রইল না তার। কোনদিনই যে রাত দুটো-আড়াইটের আগে আসছিল না, বারোটায় আসা তার পক্ষে অপ্রত্যাশিত সকাল।

বিস্মিত হ'লেও বিচলিত হয় নি। নিয়মের ব্যতিক্রম ভেবেছিল।

কিন্তু তার পরের দিনও যখন ঘড়িতে বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়াবার শব্দ হ'ল এবং কড়াটা নড়ে উঠল খুব মৃদুস্বরে, তখনই সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠল স্বর্ণ। এমন তো হয় না, অন্তত বহুদিন হয় নি। ব্যতিক্রমটা নিত্য ঘটতে থাকলে সেটা আর ব্যতিক্রম থাকে না, এ বুদ্ধিটুকু তার এতদিনে হয়েছে। এর অন্য অর্থ আছে কিছু।

সে সম্বন্ধে সজাগ এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবছা কুটিল সন্দেহটা স্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করল মনের মধ্যে। দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সহজ হয়ে এল অঙ্কটা। নতুন যে অল্পবয়সী ঝিটি এসেছে সে শ্যামাঙ্গী হ'লেও লাবণ্য-বতী। তবু তার সম্বন্ধে কোন কথা হয়ত এত চট্ ক'রে ভাবত না, যদি না কদিন আগেই অত্যন্ত বেমানান রকমের ফরসা এবং এই যুদ্ধের বাজার হিসেবেও বেশ মাঝারি দামের কালাপাড় শাড়ি একখানা পরতে দেখত তাকে। একখানা নয়—এক জোড়াই এসেছে মনে হ'ল—কারণ একখানা কেচে আর একখানা পরা চলছে।......

সবাই ঘুমোচ্ছে, গোটা বাড়িটাতে নেমে এসেছে একটা শান্ত নিস্তব্ধতা। অতি সামান্য সামান্য শব্দ—কিন্তু সেগুলোও প্রগাঢ় সুষুপ্তিই সূচিত করে। জীবেনের নাক ডাকে, সেটা এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে অল্প। পাশের বাড়ি তিনতলায় রমার ছেলেই বোধ হয়—খুঁৎ খুঁৎ ক'রে কাঁদছে সেই থেকে। আয়নার নাক ডাকে না—কিন্তু দাঁতপড়া তোবড়ানো মুখে ঠোঁটের বাধা ঠেলে বেরোতে নিঃশ্বাসেরই একটা অস্ফুট শব্দ হয়। সেটাও নিয়মিত—সুতরাং তা আর কানে বাজে না।

নিয়মিত এসব শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে সামান্য যেটি অস্বাভা-বিক, নতুন, সেটি ঠিকই কানে এসে পৌঁছয়। দরজা খুলে ভেতরে এল হরেন। কলঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এল। ফিসফিস ক'রে কাকে কি বলল। বোধহয় ঝিকেই বলল কিছু—কিম্বা রাঁধুনীকে। বামুন ঠাকরুন যে এতরাত পর্যন্ত জেগে আছেন তা মনে হয় না।......এবার বোধহয় ঘরে ঢুকে ঢাকা খুলে খেতে বসল। আবার এল ভেতরে। সম্ভবত আঁচাতে এল এবার।

এ সবই যথাসম্ভব সন্তর্পণে করে হরেন—চিরকাল খুবই সতর্ক সে, আর কারও ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার। কিন্তু তবু যে জেগে কান পেতে আছে তার কাছে সে শব্দ না পৌঁছবার কথা নয়।......

কিন্তু কলঘর থেকে ফিরে গেল—সেও তো প্রায় মিনিট-পাঁচেকের কথা। দরজা বন্ধ করার শব্দ হ'ল না কেন?

স্বর্ণ আর থাকতে পারল না। প্রাকৃতিক কাজের সুবিধার জন্য কদিন আগে সে-ই ব্যবস্থা ক'রে নিচে মেঝেয় বিছানা করিয়েছে। সুতরাং উঠে হামা দিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে যাওয়ার খুব অসুবিধা হ'ল না স্বর্ণর। বেশী দূর যেতেও হ'ল না তাকে অবশ্য। চৌকাঠের কাছে যেতেই দৃশ্যটা নজরে পড়ল।

ওর এই সারেরই শেষ ঘরখানা হ'ল বৈঠকখানা ঘর। আজকাল পাকাপাকি-

ভাবেই ঐ ঘরে থাকে হরেন। এই রকের ওপরই সে ঘরের দরজা। একটু উঁকি মারলেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সে ঘরের দরজা ছাড়িয়েও—ওদিকের দেওয়াল পর্যন্ত। আর দেখতেও পেল সে। নিঃশব্দে একটা টানাটানি চলছে ঐ দরজারই সামনে। একজন আর একজনকে হাত ধরে টানছে বোধ হয়।...অন্ধকারে মুখ চোখ ঠাওর হবার কথা নয়। হ'লও না। কিছুই ঠাওর হ'ত না এই কৌটোর মতো বাড়িতে, যদি না রাস্তার আলোর একটা আভাস রমাদের সাদা বড় বাড়িটার দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে একটা ঝাপসা রকমের আবছায়া সৃষ্টি করত। যুদ্ধের আগে আরও ভাল আলো পাওয়া যেত অবশ্য, গ্যাসের আলোর অনেকটা এসে পড়ত ওদের দেওয়ালে। কিন্তু এখন ঠুলি-পরা আলো অতদূর পেঁছয় না। এখন যেটুকু আলোর মতো নামে এ বাড়িতে, তাতে চোখ অভ্যস্ত না হ'লে কিছুই দেখতে পেত না।

কিন্তু মুখ চোখ ঠাওর না হ'লেও চলবে। সাদা ধবধবে শাড়িটাই যথেষ্ট। হরেনের পাটকরা ধুতিটাও।

অল্প কিছুক্ষণের টানাটানি। ধ্বস্তাধ্বস্তি কিছু নয়। যে-পক্ষকে টানা হচ্ছে তার যে খুব একটা অনিচ্ছা তাও নয়। বাধাটা খুবই ক্ষীণ, ক্ষীণতর চক্ষুলজ্জার একটা বহির্প্রকাশ মাত্র। কারণ কয়েক মুহূর্তেই সে প্রতিরোধ শেষ হয়ে গেল। দুজনেই নিঃশব্দে গিয়ে ঘরে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আর কিছু দেখতে পেল না স্বর্ণ। আর কিছু দেখতে পারল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

আয়নাই ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। তাঁর চেঁচামেচিতে পরে অবশ্য আরও অনেকে ছুটে এল। নতুন ঝি-ই সর্বাগ্রে। গায়ে মাথায় কাপড় জড়াতে জড়াতে এসে দাঁড়াল সে। বাকী যারা এল তারপর, তারা ওর এই আগমনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করল না। কোন্‌খানা থেকে উঠে এল সে তা তো নয়ই। ওরই নিশ্চয় আগে ঘুম ভেঙেছে—এই কথাই বুঝল সকলে।

আয়না ভেবেছিল অন্য ব্যাপার। আরও খারাপ কিছু ভেবেই অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল। শয্যাশায়ী রুগীকে ঐভাবে চৌকাঠের ওপর মুখ থুবড়ে নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে সাধারণত যা মনে হয় আগে—তাই মনে হয়েছিল তার। কিন্তু গায়ে হাত দিয়ে একটুখানি আশ্বস্ত হ'ল সে। গা তখনও গরম। একেবারে প্রাণটা বোধহয় যায় নি এটা ঠিক। তবু, ভয়ানক একটা যে কিছু ঘটেছে তাতেও সন্দেহ নেই। এমনভাবে দাঁতে দাঁত লেগে ভিরমি যেতে স্বর্ণকে কখনও দেখে নি আয়না, এই দুতিন মাসে একদিনও।

আয়নার চেঁচামেচিতে হরেনকেও এসে দাঁড়াতে হ'ল। কিছু দেরি ক'রেই এল সে—এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে সেটা জানাবার জন্য। ব্যাপারটা শুনে বলল, 'তাই তো —বিছানা ছেড়ে এখানেই বা এল কী করে? কলঘরেটরে যাবার চেষ্টা করেছিল নাকি?......তাহ'লে তো বড় অন্যায় কথা। বাড়ির সব জায়গায় রোগ ছড়িয়ে বেড়ানো তো ঠিক নয়।'

জীবেনই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে তাকে, 'আচ্ছা, সেসব নিকেশ পরে নিলেও

চলবে। আগে ডাক্তারবাবুকে খবর দেবার ব্যবস্থা করো তো!'

অগত্যা ডাক্তারের কাছেও যেতে হ'ল।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

'কোন শক্-টক্ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। হার্টের যা অবস্থা—এটা খুব খারাপ হ'ল।......কিন্তু কী করে হ'ল কেউ জানেন না আপনারা?'

হরেনের সুগৌর মুখ অকারণেই লাল হয়ে উঠল। বার দুই ঢোঁক গিলে বলল, 'সেটা আমরা ঠিক—। মানে আমি তো এ ঘরে থাকি না আজকাল। মাঝরাত্রে উঠে কখন যে—। আয়না মানে আমাদের পুরনো ঝি অবিশ্যি ছিল—তবে জানেন তো —সার্ভেন্টরা য়্যাজ এ ক্লাস ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল্।'

ডাক্তারের চেষ্টায় কিছু পরেই জ্ঞান হ'ল স্বর্ণর, কিন্তু কী ক'রে যে এমন হ'ল তা জানা গেল না। সে কিছুই বলতে চাইল না। তার নাকি কিছুই মনে নেই। কেন উঠে অমনভাবে দোরের দিকে গিয়েছিল তাও বলতে পারল না। কথা কইলও না বিশেষ। দুই একটা কথা বলার পরই সেই যে ক্লান্তভাবে চোখ বুজল আর খুলল না কিছুতেই। এমন কি তার এত প্রত্যাশিত, এত পথ-চাওয়া স্বামী তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও যেন দেখতে পেল না সে।

বোধ হয় তার উপস্থিতি টের পেয়েই আরও দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল।

ডাক্তারও বেশী কথা বলাতে চাইলেন না। ওদেরও বারণ করলেন বেশী প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করতে। এরকম ফীটের পর অপরিসীম ক্লান্তি আসে, সেইটেই স্বাভাবিক। এখন বরং যেটা সর্বাগ্রে দরকার, সেইটেই করুক তারা—কিছু গরম পানীয় বা পথ্য এনে দিক।

কিন্তু সেইখানেই একটা বড় রকমের গন্ডগোল বাধল। কিছুই খেতে চাইল না সে—একবিন্দু কিছু মুখে তুলতে রাজী হ'ল না। তার এক কথা—'আমার কিছু ভাল লাগছে না– আমাকে একটু ঘুমোতে দাও তোমরা, তোমাদের পায়ে পড়ি!'

প্রথমে ঝি পরে জা-দেওররা এল। অনুরোধ অনুযোগ—শেষে কিছু ধমক-ধামকও করল তারা। এমন কি স্বয়ং শাশুড়ীও, প্রাণপণে নিজের শুচিতা ও স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে, বাইরে থেকে নাকি-সুরে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে গেলেন। কিন্তু স্বর্ণ সেই যে দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে ছিল—এদিকে ফিরলও না, কথাও বলল না। খেলও না কিছু।

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার—এই উপলক্ষে বাড়ির প্রায় তাবৎ লোকই এল খাওয়ার জন্য উপরোধ-অনুরোধ, পীড়াপীড়ি করল, কেবল যার সর্বাগ্রে আসবার কথা সেই হরেনই—একবারও এল না বা কেন তার স্ত্রী কিছু খাচ্ছে না—এ প্রশ্ন করল না। বরং সে যেন চেষ্টা করেই একটু আড়ালে আড়ালে রইল। ভাইয়েরা ডাকতে গেলে বলল, 'তোমরা সবাই বলছ তাতে যখন খাচ্ছে না, আমি বললেই কি খাবে? তা নয়, এইসব অসুখে মাঝে মাঝে একটা অকারণ অভিমান হয়। এই ধরনের মনোভাব থেকেই ফীটটাও হয়েছে। এখন আর বেশী বকিয়ে লাভ নেই, বরং খানিকটা ঘুমোতে দাও, ঘুম ভাঙ্গলে মাথা ঠান্ডা হ'লে আপনিই খাবে!'

হরেন নিজেও সেদিন বাড়িতে খেল না। দেরি হয়ে গেছে, এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে এক গ্লাস শরবৎ খেয়ে বেরিয়ে গেল। অত্যন্ত নাকি জরুরী কাজ আছে অফিসে, কী সব হিসেবের গোলমাল হয়েছে ক্যাশে—সাহেবরা আসবার আগে সেটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে—অকারণেই সবাইকে শুনিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেল।

কিন্তু খানিকটা ঘুমিয়ে উঠেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হ'ল না। কোন খাদ্যই—জল ছাড়া অন্য কোন পানীয়ও মুখে তুলতে রাজী হ'ল না স্বর্ণ। এমন কি কোন ওষুধও না। যাকে বলে দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকা—তাই রইল সে।

জা-দেওরদের মধ্যে জীবেনই চিরদিন বৌদির একটু বেশী অনুগত, আজও সে টানটা তার সম্পূর্ণ যায় নি। অফিসের ফেরৎ বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে ওর এই কঠোর উপবাসের কথা শুনে অফিসের পোশাকসুদ্ধই বৌদির ঘরে এসে ঢুকল। ঝিকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'বলি মতলবটা কি বল তো বৌদি, তুমি কি আত্মহত্যে করতে চাও?'

এবার কথা বলল স্বর্ণ, ওর দিকে মুখও ফেরাল। দেওরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'বাঁচব না বেশীদিন—এটা তো ঠিক? সে তোমরাও বুঝছ, আমিও বুঝছি। মিছিমিছি এই পেরমায়ুটা অনত্থক কটা দিন টেনে বাড়িয়ে লাভ কি? নিজেরও দগ্ধানি—তোমাদেরও জ্বালাতন। আমি বিদেয় হ'লে তোমার দাদা একটা বিয়ে করতে পারবে—সে তবু ভাল। তার দুদ্দশা আমি আর চোখে দেখতে পারছি না ঠাকুরপো। তাই—যেতেই যেকালে হবে—যাওয়াটা একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির করতে চাই।......কটা দিন কোন মতে একটু চোখ-কান বুজে থাকো—তারপর আমারও পোড়ানির শেষ, তোমরাও সব দায়ে নিশ্চিন্তি! আর কারুর জন্যে ভাবতে বসতে হবে না!'

কী বুঝল জীবেন, কে জানে। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল শুধু, 'যার দুর্দশা বরাতে আছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না বৌদি। পাঁকের মাছ পাঁকেই ভাল থাকে। কিন্তু তুমি শুধু দাদার কথাই ভাবছ কেন, ছেলেমেয়েগুলোর কথাও ভাবো। একটা সৎমা এসে ঘাড়ে চেপে বসলে কি ওরা মানুষ হবে—না বাঁচবেই কেউ?'

'আমি আর কারুর কথাই ভাবব না ঠাকুরপো', স্বর্ণ দৃঢ়স্বরে বলে, 'সোয়ামী পুত্তুর-সংসার সবেতে আমার ঘেন্না হয়েছে। এবার আমি ছুটি চাই তোমাদের কাছে শুধু। ব্যাগত্তা করি আমাকে ছেড়ে দাও!'

জীবেন এবার চুপ ক'রে গেল। ভাল মানুষ স্বর্ণর এ চেহারা, কণ্ঠের এ দৃঢ়তা তার কাছে একেবারে নতুন। সে হাত-পা নেড়ে চেঁচায়, কথায় কথায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, পীড়াপীড়ি ক'রে বকে-ঝকে লোককে খাওয়ায়, খাওয়া নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে—সেই স্বর্ণই জীবেনের পরিচিত। সেই সরল, স্নেহ-কোমল মানুষটার এই রূপান্তর কতখানি আঘাতে সম্ভব হয়েছে—তা বুঝেই আর বৃথা কথা বাড়াতে চাইল না সে। এ আঘাত যার কাছ থেকে এসেছে সে নিজে এসে ক্ষমাপ্রার্থনা না করলে, অনুতাপে প্রতিশ্রুতিতে এই নিদারুণ বেদনা মুছে নেবার চেষ্টা না করলে—কোন লাভ হবে না অপর কারুর অনুরোধ-উপরোধ পীড়াপীড়িতে। তার চেয়ে দাদা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। সে এলে তাকে বুঝিয়ে বলে, প্রয়োজন হয় তো জোর করেই তাকে এ ঘরে পাঠাবে। তার জন্যে দরকার হ'লে তাকে ভয় দেখাতেও পশ্চাদ্‌পদ হবে না জীবেন। নতুন ঝি সম্বন্ধে দাদার দুর্বলতাটা বাড়িসুদ্ধ সবাইকার চোখেই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। জীবেনের অনুমান, বৌদির আজকের এই আচরণের সঙ্গে সেই অশোভন পক্ষপাতের কোন নিগূঢ় যোগাযোগ আছে। ঐ দিক দিয়েই হরেনকে জব্দ করতে হবে, লোক-লজ্জা কেলেঙ্কারীর ভয় দেখিয়ে!......

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত কিছু করতে হ'ল না। তার আগেই সন্ধ্যার সময়

একেবারে অপরিচিত একটি আগন্তুক এসে উপস্থিত হ'ল ওদের বাড়িতে, ওদের জীবনে।

কেউই তাকে চিনত না এ বাড়িতে। কেউই দেখে নি। দামী সাহেবী পোশাক-পরা রীতিমতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একটি ভদ্রলোক মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একটা গাড়ী থেকে নেমে হরেনবাবুর বাড়িটা কোন্ দিকে খোঁজ করছেন—এ খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়ি পৌঁচেছিল। স্বর্ণরই বড় ছেলে ভুতু ইস্কুল থেকে ফুটবল খেলে ফিরছিল, সে-ই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে মেজকাকাকে খবরটা দিলে। সে স্পষ্ট শুনেছে হরেনবাবুর নাম—তবে তার সাহস হয় নি এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দেবার বা সঙ্গে ক'রে ডেকে আনবার। অতবড় গাড়ি থেকে অমন ফীটফাট দামী পোশাক পরে যে নেমেছে—সে ভুতুর সঙ্গে কথা কইবে বা ভুতু কথা কইলে জবাব দেবে—এমন ভরসা তার হয় নি। ওদের সঙ্কীর্ণ চার হাত গলি, তার মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না, কিন্তু বাইরের যে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে সেও যথেষ্ট চওড়া নয়। ও গাড়ি সালকে-শিবপুরের সব রাস্তাতেই বেমানান। তাই শুধু গাড়িখানা দেখতেই বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে—ভুতু সে খবরটাও দিল কাকাকে।

জীবেন শুনে কৌতূহলী হয়ে বাইরে যাচ্ছে—এমন সময় সদরে কড়া নড়ে উঠল। সে ভদ্রলোক এসেছেন।

জীবেন দেখল ভুতুর বর্ণনা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। সে নিজেও একটু শৌখীন, মোটামুটি ভালো চাকরিই করে—পোশাক-আশাকের দর সম্বন্ধে তার ধারণা অনেকটা নির্ভুল। ভদ্রলোকের গায়ে যে পোশাক—সত্যিই তার দাম অনেক। লোকটি যে অবস্থাপন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখতেও বেশ সুপুরুষ, বয়স জীবেনের চেয়ে কমই হবে—যদিচ এই বয়সেই ছোকরা এমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য আয়ত্ত করেছে যে দেখামাত্র সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় মনে—বেশ সমীহ ভাব জাগে।

মিনিটখানেক দুজনেই দুজনকে চেয়ে দেখল নীরবে। তারপর জীবেন যেন একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই আপনার?'

'এটা কি হরেনবাবুর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হরেনবাবু বাড়িতে আছেন?'

'না। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'বলছি। তিনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন?'

'রাত বারোটা-একটার আগে নয়, দুটো-আড়াইটেও হ'তে পারে।'

একটু হাসির ভঙ্গি ক'রে উত্তর দিল জীবেন।

'ও, তাই নাকি?...তা অত রাত্রে তো আর—। তাঁকে অন্য কোন্ সময় বাড়িতে পাওয়া যায়?'

'সকালে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত।'

একটুখানি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, 'আচ্ছা বৌদি—মানে হরেনবাবুর স্ত্রী কেমন আছে বলতে পারেন?......একটু—একটু ভালর দিকে কি?'

জীবেন ক্রমেই বেশী বিস্মিত হয়ে উঠছে।

'মধ্যে একটু ভালর দিকেই গিয়েছিল কিন্তু আবার এই দিনকয়েক হ'ল—।... আজ তো খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু—আপনি, মানে আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক?'

'আমি ওর সম্পর্কে ভাই হই। ওকে বললেই চিনতে পারবে। আপনার চেনবার কথা নয়, আপনার দাদারও—হরেনবাবু আপনার দাদা তো?—চাক্ষুস চেনেন না আমাকে, পরিচয়ে চেনেন হয়ত, বুঁচি মানে স্বর্ণলতার মুখে শুনে থাকবেন।.. আমি একটু ওকে দেখতে চাই, আসলে ওকে দেখতেই আমি এসেছি—ওর এই অসুখের খবর শুনে। আপনি আপনার বৌদিকে গিয়ে বলুন যে, তার অরুণদা এসেছে—তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

আজ কি আর চমকের শেষ হবে না?—জীবেন ভাবে। তার বৌদির ভাই বলতে এতাবৎ কাল যাদের দেখে আসছে—ময়লা খাটো কাপড় আর কোঁচকানো সস্তা দামের ছিটের জামা পরা কতকগুলি নিরক্ষর গ্রাম্য ছোকরা—তাদের সঙ্গে এই সুবেশ সুশ্রী কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকটির কোন সম্পর্ক আছে, তা কেউ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বিশ্বাস করা শক্ত।

'কিন্তু এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, বৌদির শরীর খুব খারাপ,—এখন কথাবার্তা বলা উচিত নয় তার পক্ষে—', এইটেই বলতে যাচ্ছিল জীবেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, যে অসহ্য গুমোট আবহাওয়া চলছে, তাতে বাইরের এই দমকা বাতাস লাগলে কিছু উপকারই হ'তে পারে। বাপের বাড়ির লোককে দেখলে কিছু নরম হয়ে পড়বেই—আর এখন সেইটেই সবচেয়ে দরকার।

সে বাইরের ঘরের দরজা খুলে আলো জেবলে দিয়ে বললে, 'আপনি বসুন একটু—আমি দেখছি তিনি জেগে আছেন কি না!'

স্বর্ণ বহুক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারল না কথাটা, 'কী বলছ তুমি! অরুণদা! কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে—সে যে বহুকাল দেশ-ভুঁই ছাড়া। সেই আমার বের পরদিন উধাও হয়েছে—আজ অবধি আর কোন খবর নেই। সে কি বেঁচে আছে এখনও? বেঁচে থাকলে এতকালের মধ্যে আমার উদ্দিশ নিত না একবারও? ...না, না, নিশ্চয়ই তুমি ভুল শুনেছ ঠাকুরপো, আর কাউকে খুঁজছে দেখগে যাও, অন্য কোন অমুক বাবুর বৌকে খুঁজতে এসেছে, লোকে এই বাড়ি দেখ্যে দিয়েছে!'

'কিন্তু তোমার নাম বলছে যে মায় তোমার ডাক-নাম সুদ্ধ!'

'ও মা, সে কি কথা! সত্যি অরুণদা এসেছে তা'হলে—?'

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণর স্তিমিত নিঃশেষিতপ্রায় সত্তায় যেন একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়েছিল। এখন তার প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল। দুর্বল দেহে সামান্য উত্তেজনাই যথেষ্ট—এ তো একটা ঢেউয়ের মতো এসে পড়েছে সংবাদটা! অরুণদা মানেই তার বাল্যের কৈশোরের সহস্র স্মৃতি। বাপের বাড়িতে সকলের আদরে প্রশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়া, সর্বত্র সমস্ত ব্যাপারে অখণ্ড প্রতাপ, তার বিয়ে, উৎসব সমারোহ—কত কী আশার স্বপ্ন দেখা সেই প্রাণোচ্ছল দিনগুলি—একসঙ্গে যেন ভীড় ক'রে ঢুকতে চাইছে তার মাথার। ঐ ছেলেটিও—মুখচোরা লাজুক ভীরু ছেলেটি—স্বর্ণর স্নেহচ্ছায়াপ্রত্যাশী, একান্তভাবে নির্ভরশীল অসহায় অনাথ ছেলেটি। যাকে খুঁজে আনতে হ'ত বাঁশবন ডোবার ধার থেকে, জোর ক'রে ধরে না খাওয়ালে যে খেত না।...সে সব স্মৃতি—বিশেষ ক'রে আজকের এই মোহভঙ্গের ও সর্বপ্রকার আশাভঙ্গের দিনে রক্তে যেন কী এক অদ্ভুত বেদনাভরা, চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, সে চাঞ্চল্য তার দুর্বল বুকে গিয়ে সজোরে আঘাত করছে। বুকের মধ্যে কী একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে।......

সে প্রাণপণে বুকটা চেপে ধরে চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ, আগের মতোই

স্থির নিশ্চল হয়ে।......

তার সেই যন্ত্রণাবিকৃত বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে জীবেন ভয় পেয়ে যায়, বলে, 'তবে থাকগে। আমি বলে আসি বরং অন্য একদিন আসতে, আজ তোমার শরীর ভাল নেই—'

'উঁহু, উঁহু,' চোখ বুজে বুজেই ইঙ্গিতে নিরস্ত করে স্বর্ণ—কিন্তু তখনও কোন কথা বলতে পারে না।

ফলে জীবেনও বিপন্নমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে, কী করা উচিত ভেবে পায় না। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয়; একটু আগেই এ ঘরে এত ঘন ঘন আসার জন্য স্ত্রীর কাছে বকুনি খেয়েছে। 'ছেলেমেয়েগুলোকে সুদ্দু না মজালে তোমার চলছে না বুঝি? চোদ্দবার ঘরে ঢুকে ঐ রুগীর গায়ের ওপর ঢলাঢলি না করলে বুঝি আর বৌদির ওপর সোহাগ জানানো হয় না? যার পরিবার সে কত ঢুকছে ঘরে?' ইত্যাদি। তখন কাপড়-জামা বাইরে ছেড়ে রেখে ভাল ক'রে গা-হাত-পা ধুয়ে তবে ঘরে ঢুকতে পেয়েছিল। এখন আবার এ ঘরে এতক্ষণ থাকতে দেখলে হয়ত বাড়ি মাথায় করবে। আর কিছু নয়—কথাগুলো স্বর্ণর কানে না ওঠে, এই ভয় জীবেনের। মেয়েদের এ সব বিবেচনা নেই, কিন্তু পুরুষদের কাছে এগুলো লজ্জা ও পরিতাপের কারণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে দাঁড়াতে হ'ল না আর, স্বর্ণ একটু সামলে নিয়েই চোখ খুলে বলল, 'আচ্ছা, যে লোকটা এসেছে—কেমন দেখতে বল দিকি? পোশাক-আশাক কেমন দেখলে?'

'সুন্দর চেহারা। আর পোশাকও খুব দামী, ভাল সাহেববাড়ির স্যুট মনে হ'ল। বিরাট গাড়ি করে এসেছে—'

—'ধ্যুস!' হতাশভাবে মুখে একটা শব্দ করে স্বর্ণ, 'ও তবে অন্য কেউ। এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছল সে, তিন কুলে কেউ নেই,—কোথায় দাঁড়াবে, কী খাবে তারই ঠিক ছিল না সে অত পয়সা কোথায় পাবে?'

'তা কি বলা যায়! যুদ্ধের বাজারে পয়সা উড়ছে। কে কম্‌নে দিয়ে কী ধরে নিচ্ছে তা কেউ জানে না। তবে অত কথায় দরকারই বা কি, ডেকেই আনি না, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাক।'

'আনবে? কিন্তু আমার এই ব্যায়রামের মধ্যে আনা ঠিক হবে?...তাকে বলেছ আমায় এই রোগ ধরেছে?'

'সে সব জানে। জেনেই দেখতে এসেছে। অন্তত তাই তো বললে।'

'জানে? জেনে দেখতে এসেছে?...কিন্তু তা কী করে হবে? সে কি এ রাজ্যিতে ছিল? কে জানে বাপু আমার মাথার মধ্যে যেন সব গুলো্য যাচ্ছে!...তা আনো না হয় তাকে ডেকে। ভুল হয় তো চলেই যাবে। বুঝব আমার নামে পাড়া-ঘরে আরও লোক আছে।...কিন্তু তিন-তিনটে নাম কি মিলে যেতে পারে এমন করে?'......

॥ ২ ॥

অরুণ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতে জীবেনের ইঙ্গিতে আয়না একটা টুল এগিয়ে দিল বিছানার কাছাকাছি। অরুণ কাছে এসেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু টুলটা দেখতে পেল না। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বিছানার দিকে—অথবা বিছানার ওপর শাড়িতে-

জড়ানো যে কঙ্কালটা পড়ে আছে, তার দিকে।

ঘরে ষাট বাতির আলো, ভেতরের ঘর বলে ঠুসি পরাবার দরকার হয় নি—বেশ জোরালোভাবেই এসে পড়েছে ওদের ওপর, দুজনেই দুজনকে কাছ থেকে দেখছে—তবু কেউ-ই যেন চিনতে পারছে না কাউকে। চিনতে পারার হয়ত কথাও নয়, কারণ দুজনেরই সেই শেষ দেখার পর অবিশ্বাস্য রকমের পরিবর্তন ঘটেছে।

অরুণদা বলতে সেই ওর বিয়ের দিনের চেহারাটাই মনে আছে স্বর্ণর। ফরসা সে বরাবরই, কিন্তু সে যে এত ভাল দেখতে তা একবারও মনে হয় নি তখন। হয়ত অত রোগা ছিল বলেই বোঝা যেত না। আসলে অরুণের চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য অত লক্ষ্যও করে নি স্বর্ণ কখনও। যে মানুষটা শুধু আত্মীয়, তেমন নিকট-সম্পর্কের কেউ নয়, যে আরও অনেকের মধ্যে একজন হয়ে মিশে থাকে, কখনও সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে না, তার চেহারা ঠিক কেমন তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না বোধহয়। অত কাছাকাছি ছিল বলে ভাল করে তার মুখচোখের দিকে তাকিয়ে দেখার কথা মনেও হয় নি কোনদিন।

কিন্তু তবু, আদল একটা মনে আছে বৈকি! স্বর্ণ এখন এই গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ মানুষটার মধ্যে সেই ভীরু লাজুক ছেলেটির আদলই খুঁজতে লাগল প্রাণপণে। মানুষে মানুষকে চেনে বেশির ভাগই চোখ দেখে, কিন্তু তাও যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে সদা-সঙ্কোচ-বিনম্র চাহনির চিহ্নমাত্রও নেই এই স্থির আত্মপ্রত্যয়ী দৃষ্টিতে।...

পরিবর্তন হয়েছে স্বর্ণরও।

আজকের এই রুগ্ন কঙ্কালসার প্রায়-মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটির মধ্যে সেদিনের সেই প্রাণচঞ্চলা বালিকাটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে অরুণের একেবারে চিনতে না পারার কথা নয়। কারণ সে তার আপাত-নত চোখে সেদিন স্বর্ণকে খুঁটিয়েই দেখে-ছিল। শুধু স্বর্ণকেই দেখেছে বোধ করি জীবনে, অপর কোন মেয়ের দিকে কোন-দিন তাকাবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন বোধ করে নি। তাই স্বর্ণের দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য তার পরিচিত। বিশেষত ওর ঐ কটা চোখ—সে চোখ আজ কোটরগত হ'তে পারে কিন্তু তার বর্ণান্তর ঘটা সম্ভব নয়।

অবশেষে চিনতে পারল দুজনেই।

দুজনেরই দুজনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এল। দুজনের অবশ্য দুই ভিন্ন কারণে। স্বর্ণর বহু স্মৃতি বহু বেদনা নিঙড়ানো জল এ। তার অশ্রুর উৎস অতীতে। অরুণের অশ্রুর উৎস বর্তমানে। স্বর্ণর এই পরিণাম দেখেই তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ওর চোখেও ছিল সেই বিয়ের আগের দিনগুলোর স্মৃতি। সর্বশেষ স্মৃতি, বিয়ের সময়কারই। গোলগাল গড়নের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির ছবিই এতকাল মনে ছিল তার। সেই চেহারাটাই মনে করে রাখার চেষ্টা করেছে সে, সেই চেহারারই স্বপ্ন দেখেছে অবসর সময়ে। সে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যর এমন পরিবর্তন হ'তে পারে তা কখনও ভাবে নি।...

বহু কষ্টে গলার কাছের ঠেলে-ওঠা ডেলাটাকে দমন করে স্বর্ণ প্রায় চুপিচুপি বলে, 'এতদিন পরে মনে পড়ল তাহলে বুঁচিকে অরুণদা! ও, কী কষ্টটাই দিয়েছিলে আমাদের তুমি। বাব্বাঃ। তোমার মনে এত ছিল তা কে জানত, তাহলে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে জোর করে সঙ্গে নিয়ে আসতুম শ্বশুরবাড়ি!...কতদিন ভেবেছি তোমার কথা, দুপুর-বেলা একা কাজকর্ম করে বেড়াতে বেড়াতে, কিম্বা রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলেই তোমার কথা মনে পড়ত। কেবলই মনে হ'ত যে কোথায় আছ, কী

করছ—মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন জুটছে কিনা, দুবেলা খেতে পাচ্ছ কিনা—এই সব কথা।...মনে হ'ত তুমি বুঝি এখনও তেমনি মুখ-চোরাই আছ। কেউ খেতে না দিলে তো খেতে না কোনদিন, তাই, মনে হ'ত হয়ত কোনদিনই পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না।...সত্যি, বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এই কদিন বিছানায় পড়ে পড়ে বহুবার তোমার কথা ভেবেছি। ভেবেছি যাবার দিন তো ঘুনিয়ে আসছে—মরবার আগে যদি জানতে পারতুম যে, তুমি বেঁচে আছ, তা'হলে নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারতুম!'

কথাগুলো বলতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলতে হ'ল স্বর্ণকে। একে দুর্বল শরীর তায় সারাদিন অনাহার—কথা কইতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে ওর তখন।

অরুণেরও উত্তর দিতে সময় লাগল। এ-কথা শোনবার কখনও আশা করে নি সে। এ তার সুদূর কল্পনারও অতীত। দুরাশা—একান্তই দুরাশা। তাই তার পক্ষে উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। সে স্বর্ণর দিকেও চাইতে পারল না আর, জলটা বাইরে যদি উপ্‌চে পড়ে তো সে বড় লজ্জার কথা হবে। ওপাশের পিকদানিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্বর্ণই কথা বলল আবার, 'হ্যাঁ অরুণদা, তুমি নাকি আমার এই ব্যায়রামের খবর পেয়ে দেখতে এসেছ?—ঠাকুরপো বলছিল? তুমি আমার অসুখের খবর পেলে কি করে?...এ টহরনে ছিলে নাকি তুমি?'

এবার অরুণ উত্তর দিল, 'আমি যেখানেই থাকি, তোমার খবর ঠিক পেঁছিয় আমার কাছে। তোমার কোন খবর আমার অজানা নেই।'

আরও অনেক কিছু বলতে পারত সে। বলতে পারত যে, 'আমার একটা চোখ ও একটা কান, মন আর মাথার আধখানাও আমি সর্বদা তোমার কাছেই রেখে দিই। আমার গোচরসীমার বাইরে তুমি একটুখানির জন্যেও যেতে পারো নি কোনদিন। আমি দূরে থাকলেও আমার একটি অতন্দ্র সত্তা দিনরাত তোমার কাছে প্রহরায় থাকে।' কিন্তু নাটক করা তার কোনকালেই অভ্যাস নেই, আজও পারল না। হৃদয়াবেগ সে দমনই করল বহু চেষ্টায়।

'ওমা, তাই নাকি!...কী হবে মা। অথচ তোমার একটা খবরও দাও নি কখনও! কী ছেলে বাবা তুমি। ধন্যি, পাষাণ প্রাণ তোমার!'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'যাক, তবু যে এখনও এলে দয়া করে সে-ও ভাল। নইলে মরবার আগে শেষ-দেখাটাও হত না। এ তবু নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারব।'

অরুণ কেন গলাটাকে কিছুতে আয়ত্তে আনতে পারে না? নিজের ওপরই রাগ হয়ে যায় তার। এত চেষ্টা করেও গলার মধ্যেকার কাঁপনটাকে সংযত করতে পারে না কেন?...

বেশ খানিকটা পরে, প্রায়-বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে এরই মধ্যে? তোমাকে আমি জোর করে বাঁচিয়ে রাখব—সারিয়েও তুলব!'

সেই পুরাতন হাসি ফুটে ওঠে স্বর্ণর মুখে, আর সেই সময়েই চকিতে অরুণের মনে হয়—যাকে সে চিনত, যে তার পরিচিত, এ সেই পুরনো বুঁচি।

স্বর্ণ হেসে বলে, 'কত গেল রথারথী, সেওড়া গাছে চক্রবত্তী।...তুমি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে? তবেই হয়েছে। বলি মন্তরতন্তর, দৈব ওষুধবিষুধ কিছু জানো নাকি? নাকি ঝাড়ফুঁক শিখেছ? এত জোরের সঙ্গে কথা বলছ?'

অরুণ এ বিদ্রূপের কোন উত্তর দেয় না। বোধ করি এর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটা ওকে স্পর্শও করে না। সে সহজ শান্তকণ্ঠে বলে, 'আমি পাহাড়ের ওপরে ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে ঘর ঠিক করেছি, তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে। সেই জন্যেই এসেছি আজ, হরেনবাবুকে বলতে। খরচপত্র সব আমি জমা করে দিয়েছি—তাঁর কোন অসুবিধে বা অমত হবে বলে মনে হয় না। তা আজ তো আর দেখা হ'ল না, কাল সকালে এসেই দেখা করব। সময়ও নেই বেশী হাতে, ওদিকে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি, পরশুর ট্রেনে রিজার্ভেশন করা আছে।...হরেনবাবুর এতে আপত্তি হবার কথাও নয়—উনি তো অনেক চেষ্টা করেও এখানে বেড যোগাড় করতে পারেন নি কোন হাসপাতালে, এটা যখন পাওয়া গেছে, তখন নিশ্চয় খুশিই হবেন উনি।...টাকাকড়ি ওখানে যা কিছু ও'র নামেই জমা দিয়েছি। উনি যদি যেতে চান—তিনটে বার্থই রিজার্ভ করেছি আমি, কাঠগুদাম পর্যন্ত।'

ঠিক এ উত্তরের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না স্বর্ণ। তার মুখে ব্যঙ্গের হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল একটা সুগভীর বিস্ময়। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবারও সেই আগের মতো চুপিচুপি বলল, 'তুমি আমার জন্যে হাসপাতালে ঘর ঠিক করেছ? তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? নিজের খরচায়?...কেন, কেন এ ছিষ্টি করতে গেলে অরুণদা, আমার যে আর মোটে দেরি নেই মরবার! বাঁচতেও আমি চাই না যে। বাঁচায় আমার ঘেন্না হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। আমি যে—আমি আজ মরব বলেই সারাদিন ওপোস করে পড়ে আছি যে। আমার জন্যে অনর্থক কেন এত পয়সা খরচ করতে গেলে অরণদা! ছি ছি। কেন এসব করলে তুমি!'

এবার অরুণ ভরসা করে আবার ওর চোখের দিক চাইল। তেমনি শান্তস্বরে বলল, 'কিন্তু ইচ্ছে করলেই মরতে পারো তুমি—এমন কথাই বা কে তোমার মাথায় ঢোকাল! যা খুশি তুমি করবে, আর আমরা চুপ করে বসে দেখব সবাই, এ তুমি ভাবলে কী করে!...তুমি সুখে থাকবে, ভাল থাকবে—এই আশা করেই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিলুম, ধরে রাখার চেষ্টা করি নি। সেইজন্যেই এতকাল সরে ছিলুম, কখনও সামনে আসবার চেষ্টা করি নি। তোমার সুখের পথে, শান্তির পথে আমার দুর্ভাগ্যের ছায়া না কোনদিন পড়ে, ভগবানের কাছে নিত্য এই প্রার্থনাই করেছি দিনরাত। কিন্তু তাই বলে দুঃখের দিনেও সরে থাকব, এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব—এ তুমি মনে ক'রো না একবারও। এবার জোর করেই ধরে রাখব তোমাকে—দরকার হয় তো। এত সহজে রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে।'

এবার আর চোখের জল বাধা মানে না স্বর্ণর। দুই চোখের কোল উপ্‌চে দরদর ধারে ঝরে পড়ে। এ কতকটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আনন্দেরও। এখনও তার প্রাণের এত মূল্য আছে তাহলে কারুর কাছে! পৃথিবীর সবাই তাহলে স্বার্থপর নয়, নির্মম নয়—অকৃতজ্ঞ নয়। এখনও অন্তত এমন একটি লোক আছে যে কোন প্রতিদানের আশা না রেখেই তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে চায়! তার সুখের জন্যই তাকে রাখতে চায়!

অরুণকে পৌঁছে দিয়েই, ওরা পরস্পরের পরিচিত এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হবার পরই, জীবেন বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু আয়না ওধারের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল এদের দিকে! অরুণ তাকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'কিছু খেয়েছে ও?' আয়নাও ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না কিছুই মুখে দেয় নি।'

অরুণ তখন—স্বর্ণ শুনতে পায় এমনভাবেই—বলল, 'ওকে দুধ না হর্লিকস্ কি

দেবে গরম করে দাও দিকি। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

আয়না ত্রস্তেব্যস্তে গরম জলের সন্ধানে ছুটল। ধড়ে যেন প্রাণ এল তার...... সারাদিন তারও খাওয়া হয় নি। বুড়ো মানুষ সমস্ত দিন অনাহারে কান্নাকাটি করে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

অরুণ এবার স্বর্ণর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'সত্যি সত্যিই তুমি খাও নি সারাদিন? ...এ পাগলামি তোমার ঘাড়ে চেপেছিল কেন? ও মানুষটাকেও তো খেতে দাও নি দেখছি!'

'ওসব কথা এখন থাক অরুণদা', অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে উত্তর দেয় স্বর্ণ, সজল চোখে একটু হাসি ফোটাবারও চেষ্টা করে, 'এখন আর ওসব কথা বলব না। ভাববও না। ...অন্য কথা বলো। তোমার কথা।...আচ্ছা, তাহলে মেজঠাকুরপো যা বলছিল তাই সত্যি? তুমি খুব বড়লোক হযেছ?...খু-উ-ব? অনেক পয়সা হয়েছে তোমার?'

'কে বললে এসব কথা? এত সব আবার কবে শুনলে? তবে যে বলছিলে আমার খবর পাও নি—'

'মেজঠাকুরপো বলছিল এই মাত্তর। তুমি নাকি এত বড় মটরগাড়ি করে এসেছ যে, রাস্তার লোক জড়ো হয়ে গেছে? আমার ছেলেও দেখে এসেছে—ভুতু। এত এত পয়সা কি করে কামালে অরুণদা? চাকরি করছ বুঝি আজকাল মোটা মাইনের?'

দূর পাগল! চাকরি করে কি কেউ বড়লোক হয়? যত বড় চাকরিই করুক। ও গাড়ি আমার নয়—যে সাহেবের সঙ্গে কাজ করি, তাঁরই গাড়ি।'

'সাহেবের সঙ্গে কাজ করো? সে আবার কী কাজ!'

একটুখানি চুপ করে থেকে অরুণ বলে, 'সে এক রকমের ব্যবসাই। এই যুদ্ধের নানা জিনিস যোগানো গভর্নমেণ্টকে। আমি আর কী করে করব। ম্যাকগ্রেগার ডানকান কোম্পানীর বড় সাহেব একা গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, আসানসোলের কাছে য়্যাকসিডেণ্ট হয়—এক লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে। সে লরী পালিয়ে আসে, গাড়ি-সুদ্ধ পাশের খানায় পড়ে ছিলেন সাহেব! আমি সাইকেল করে আসছিলাম ঐ পথে —ঐ অবস্থা দেখে গাঁয়ের লোকজন ডেকে সাহেবকে গাড়ি থেকে বার করে কোনমতে একটা গাড়ি যোগাড় করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। সেই আলাপ সাহেবের সঙ্গে। আমার ওপর তাঁর একটা মায়াই পড়ে যায় বোধহয় ঐ ব্যাপারে। তাছাড়া বিশ্বাসী লোকও খুঁজছিলেন একজন—অনেকদিনই ও'র এই সাপ্লায়ের কাজে নামার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চাকরি করে সোজাসুজি তো আবার কারবার করতে পারেন না, তাই আমাকে অংশীদার করে নিলেন। উনিই তদ্বির করে অর্ডার যোগাড় করেন, টাকাও ও'র— আমি শুধু খাটি; লেখাপড়ার কাজ, মাল তৈরী করানো, ঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া, এই সবই আমার। খুবই পরিশ্রমের কাজ, অন্য লোকও ছিল না। এতদিন পরে আমিই আর একটি ছেলেকে যোগাড় করে নিয়েছি, বিশ্বাসী ছেলে—সে অনেকটা বুঝে নিয়েছে। তাই তো এখন কদিনের ছুটি পেয়েছি। নইলে তোমার সঙ্গে যাওয়াও হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। এখন আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে দিন-পনেরো-কুড়ি থেকেও আসতে পারব।'

ইতিমধ্যে আয়না এক কাপ হর্লিকস না কি একটা পানীয় তৈরী করে নিয়ে এসেছে। স্বর্ণ আর কোন আপত্তি করল না এবার, অরুণের মুখের দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভভাবে হেসে সেটা খেয়ে ফেলল ভালমানুষের মতো। তারপর অভ্যাস-মতো আয়নাকে একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এবার তুমি দয়া করে মুখে কিছু দিয়ে কেদাত্ত করো আমাকে।...হ'ল তো গেলানো—আজকের মতো প্রাণটা তো ধরে রাখা

গেল, এবার নিজের প্রাণটা বাঁচাও গে।'

আয়না চলে গেলে অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

স্বর্ণ যেন এখনও ব্যাপারটা ঠিক ধারণা করতে পারছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। পাহাড়ের ওপর হাসপাতালে যাবে সে, সেখানে গিয়ে ভাল হয়ে উঠবে? কিন্তু এ রোগ কি ভাল হয়? ভাল হওয়া সম্ভব? সত্যি সত্যিই তাকে সারিয়ে তুলতে পারবে অরুণদা?

আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে পাহাড়ের ওপরই বা হাসপাতাল করতে গেল কেন? সেখানের হাওয়া ভাল বলে? কী রকম হাওয়া সেখানকার? এই হাওয়াই তো—হাওয়া কি আবার দুরকম আছে নাকি?...সে পাহাড় কতদূর তাই বা কে জানে। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হয়, রেলগাড়িতে যাওয়া যায় নাকি সবটা? পাহাড়ে তো নাকি হেঁটে উঠতে হয়, সে কি পারবে অতটা হাঁটতে! মরুক গে, সে-ই বা ভেবে মরছে কেন। অরুণদা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে। পাহাড়ে যেতে পারবে, সেই-টেই বড় কথা। এতখানি বয়স হ'ল, পাহাড় কখনও দেখল না সে—ছবিতে ছাড়া। চোখে দেখে নি, তবু আকর্ষণও কম নয়। ছবিতে দেখেই তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই সবুজ গাছ-পালায় ঢাকা আকাশ-ছোঁয়া মাটির ঢিপিগুলোর মধ্যে না জানি কি এক গভীর রহস্য আছে লুকিয়ে। কে জানে, বুঝি ঐসব জায়গাতেই দেবতারা থাকেন, মুনি-ঋষিরাও বোধ হয় ওখানে তপস্যা করেন বসে। সে শুধু তাঁদেরই জায়গা। আবার মনে হয় তাই বা কেন, শুনেছি তো পাহাড়ের ওপর এখন বড় বড় শহর হয়েছে, রেলগাড়ি যায়, মটরগাড়ি যায়—বড়-লোকরা গরমের সময় যায় হাওয়া খেতে। হরেনও একবার গিয়েছিল, জষ্টি মাসে শাল-দোশালা, গরম কোট, লেপ নিয়ে গেল। ভারী হাসি পেয়েছিল স্বর্ণর সে সময়, এই গরমে গরম জামা। মেজ জা তাকে বুঝিয়েছিল, পাহাড়ে শহর যে সব খুব উঁচুতে, সেইজন্য বারোমাস ঠাণ্ডা। শীতকালে সেখানে ঘাসের ওপর শিশিরগুলো সুদ্ধ জমে বরফ হয়ে থাকে।

কিন্তু ওসবই তার কাছে গল্প-কথার দেশ হয়েছিল এতকাল। ছবিতে দেখা কল্পলোক মাত্র। সে সব দেশ দেখার সুযোগ কখনও হয় নি, হবে বলেও মনে হয় নি। আজ এই মরণের দিকে পা করে—যমের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে বুঝি সেই সুযোগ এল তার জীবনে। কিন্তু যাওয়া কি হবে শেষ পর্যন্ত? পৌঁছতে কি পারবে সেখানে? কিছুতেই যে বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

কোথাও কখনও যেতে পায় নি সে। বাইরে যাবার মধ্যে একবার বড় নন্দাইয়ের দেশে গিয়েছিল। দক্ষিণ দেশ না কি আছে সেইখানে। গঙ্গাসাগর যাবার পথে পড়ে বুঝি। তাও তাঁরা বারোমাস সেখানে কেউ থাকেন না, এই ঠাকুরুন-বাড়ির কাছে টালিগঞ্জ বলে কি এক জায়গা আছে—সেইখানেই তাঁদের বাড়িঘর, কি এক কারখানা—সেইটেই আসল বাড়ি। দেশে যান কদাচিৎ কখনও। সেবার পুজোর পালা পড়েছিল বলে গিয়েছিলেন। সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যা যাওয়া —'জম্মের মধ্যে কম্ম'।

আর কখনও কোথাও বেরোতে পারে নি। বাপের বাড়ি তাই যেতে দিত না এরা। নমাসে ছমাসে, ক্রিয়াকর্ম পড়লে তবে। তাও এক রাতের বৈ দু রাত নয়। এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত এই চার দেয়ালে ঘেরা কোটোর মধ্যে বন্ধ আছে। একটা বড় রাস্তার কি গাড়িঘোড়া মানুষজনের পর্যন্ত মুখ দেখতে পায় না। সামনে পাঁচ হাত চওড়া ইঁট-বাঁধানো গলি, রিক্সাই আসতে চায় না। ওদিকে বড় রাস্তা, সে-ই

বা কতটুকু, দুখানা গাড়ি দুদিক থেকে এলেই সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। সামনে তবু এই যা একটু ফাঁকা--পিছনে রমাদের তিন তলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মতো। দুপাশেও তিনতলা না হোক, ওদের মতোই দুতলা বাড়ি এক-একটি মোতায়েন আছে। হাওয়া-বাতাস বলতেই বিশেষ কিছু নেই। অবকাশের মধ্যে এই এক ফালি উঠোন আর ছাদ। আকাশ দেখতে হ'লে হয় ছাদে উঠতে হয়, নয়তো উঠোনে নামতে হয়। জন্মাবধি সে গাছপালা, বাঁশঝাড়, পুকুর দেখে মানুষ—গাছপালা ছাড়া যে বাড়ি হয়, তাই তো জানত না। এখানে এসে চারিদিকে এ ইঁটের পাঁচিল দেখে হাঁপিয়ে উঠত প্রথম প্রথম। তারপর অবশ্য সবই সয়ে গেছে, একটু একটু করে সইয়ে নিতে হয়েছে —এই চার দেয়ালের বাইরে যে বিশাল বিস্তৃত বসুন্ধরা পড়ে আছে, তার কথা আর মনেও পড়ে না বোধহয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টাই। এই দোতলা বাড়ির মোট সাতখানা ঘরেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ওর জগৎ।

তবু এক এক সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় বৈকি।

কোন নতুন ক্যালেণ্ডারে কি ছেলে-মেয়েদের পড়ার বইতে ছবি দেখলে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় যে পৃথিবীতে সবুজ শস্যে ভরা মাঠ আছে, ঘন গাছপালায় ভরা বাগান আছে, পুকুর আছে ডোবা আছে, খানা-খন্দ আছে। সেই সব মুহূর্তগুলোতে ওদের বাগানের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের সেই গো-হাড়গেলে ভরা পগার এবং বাঁশবনের ধারে শিয়ালের গর্তও ভাল লাগে। মন লোভাতুর হয়ে ওঠে সেই বিশেষ গন্ধটার জন্যে, সেই ছায়াঘন স্নিগ্ধ ভূমিখণ্ডটুকুর জন্যে। সন্ধ্যাবেলা—এক একদিন বা বেশ বেলা থাকতেই—কুড়ি পঁচিশটা শিয়াল এসে জড়ো হয় ওদের রান্নাঘরের নর্দমাটার ধারে, এক একটা নির্ভয়ে এগিয়ে আসে দরজা পর্যন্ত, একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। সে সময় ভয় ভয় করত, এখন ঐসব বেদনাবিধুর স্মৃতিমন্থর মুহূর্তগুলিতে তাদেরও পরম বন্ধু বলে মনে হয়।

আরও মনে হয়। দেখে নি সে, তবে কল্পনা করতে পারে। পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র—নিজের মতো ক'রে একটা ছবি খাড়া ক'রে নিয়েছে মনে মনে। নিঃসীম নীল সমুদ্র—ছবি দেখে তাকে ধারণা করা যায় না, তবু সে চেষ্টাও করে মধ্যে মধ্যে। পাহাড়ের ছবি অবশ্য দেখেছে অনেক। দার্জিলিঙের খুব একখানা বড় ছবি বাঁধানো আছে মেজ ঠাকুরপোর ঘরে। অনেকদূরে পশ্চিমে কোথায় সিমলে পাহাড় আছে তার কতকগুলো পোষ্টকার্ডে ছাপা ছবি দেখেছে সে, কে যেন পাঠিয়েছিল—হয়ত এখনও প্যাঁটরার মধ্যে খুঁজলে কাপড়ের তলায় পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও নানান পাহাড়ের ছবি চোখে পড়ে মধ্যে মধ্যে। বায়স্কোপে গিয়েও দেখেছে সে।—পাহাড়ের ছবি ঝরনার ছবি। কোন্ দেশে পাহাড়ে বরফ জমে, তাতে সব মেয়েরা পায়ে কাঠ বেঁধে খেলা করে—একবার দেখেছিল ছবিতে।

সেসব ছবি সেসব দৃশ্য ঐ উন্মনা মুহূর্তগুলোতে যেন একসঙ্গে ভিড় ক'রে মনের পর্দায় ফুটে ওঠে আর তারই মায়া যেন দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে থাকে ওকে। মনটা ছটফট ক'রে ওঠে—একটু ফাঁকায়, দুটো গাছপালার মধ্যে—আর কিছু না হোক নীল আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে।......

সেই দুর্লভ সুযোগ আজ এতদিন পরে হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে ওর—একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।...কিন্তু তবু, এমনভাবেই কি যেতে চেয়েছিল সে? এমনি রুগ্ন অসহায় ভাবে,—সকলের অস্পৃশ্য হয়ে, ঘৃণিত অবজ্ঞাত বিতৃষ্ণার পাত্র হয়ে? স্বামী-পুত্র-কন্যা—সকলকে ছেড়ে?...

একেই বুঝি বলে অদৃষ্টের পরিহাস। নইলে এই পরম ঈপ্সিত ক্ষণে, এই

চার-দেয়ালে-ঘেরা, শ্বাসরোধকরা সংসারটার আকর্ষণ এমন দুর্নিবার বলে মনে হবে কেন? তাকে ছেড়ে যেতে মনের মধ্যেকার বেদনার তন্ত্রীগুলোতে এমন টান পড়বে কেন?

কানে গেল, অরুণদা আস্তে আস্তে বলছে, 'অত ভাবছ কেন? বড়জোর দু তিন মাস, তার মধ্যেই সেরে গিয়ে আবার তোমার ঘরকন্নার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু এখানে থাকলে কিছুতেই তোমাকে বাঁচাতে পারব না। লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমত ক'রো না!'

স্বর্ণ শিউরে ওঠে। অরুণদা কি অন্তর্যামী? এমন ক'রে মনের নিভৃত কথা টের পায় কি ক'রে?... ওর অসুখের খবরই বা তাকে কে দিলে!...নিশ্চয় কোন সন্ন্যিসী-টন্নিসীকে ধরে কোন দৈবক্ষমতা পেয়েছে অরুণদা, এত পয়সাও তাই থেকে। ওসব সায়েব-টায়েব বাজে কথা।......

কিন্তু সে যাই হোক—অরুণদা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। দীন উৎসুক চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। যেন ও দয়া ক'রে সেরে উঠে তাকে কৃতার্থ করবে।......

সে কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ—ঘরকন্নার ভাবনায় তো আমার ঘুম হচ্ছে না একেবারে। সংসারে আমার ঘেন্না ধরে গেছে—এককড়ার টান নেই কারও ওপর আর।...কিন্তু তুমি এই ঘাটের মড়ার বোঝা ঘাড়ে তুলছ—সেই কথাই ভাবছি। হয়ত বাঁচাতেও পারবে না শেষ পর্যন্ত, মিছিমিছি এই খরচান্ত আর ব্যতিব্যস্ত হওয়া!'

আস্তে আস্তে বলল অরুণ, 'ওসব আর না-ই ভাবলে এখন, ওসব ভাবার সময় ঢের পড়ে রইল সামনে। এখন চলো তো!'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণ বলল, 'আমি তো বেঁচে যাই। এদিকে বাঁচব কিনা জানি না, মনে মনে বাঁচি অন্তত। কতদিনের শখ আমার পাহাড় দেখার।'

তারপর একটু সলজ্জ হেসে বলে, 'খুব উঁচু পাহাড়—হ্যাঁ অরুণদা? আচ্ছা, কত উঁচু হবে?'

॥ ৩ ॥

এই দুটো দিন মনে মনে যে ছবিই এঁকে থাকুক স্বর্ণ, কল্পনার রাশ যতই ছেড়ে দিয়ে থাকুক, এমনটি কখনও ভাবতে পারে নি। চমক শুরু হয়েছে সেই যাত্রার গোড়া থেকেই, সে চমক যেন শেষ হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আসার কষ্ট তো ছিলই, প্রাণপণেই তাদের অশ্রুছলোছলো অসহায় ঈষৎ-ভীতার্ত দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছিল, প্রাণপণেই চেষ্টা করেছিল বড় মেয়ে রেবার চাপা কান্নার আওয়াজটা না শুনতে। কান চেপেও ধরেছিল দু-হাতে। স্বামীর জন্যে মন কেমন করার কথা নয়—যদিও হরেন আসবার সময় অনেক মিষ্টি কথা বলেছিল, অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল স্ত্রীকে, সঙ্গে যে তারই যাওয়া উচিত—একথা বারবারই স্বীকার করেছিল—বিস্তর পরিতাপ ও দুঃখ প্রকাশও করেছিল যে, এ সময়েও, এই বিপদ জেনেও শালারা ছুটি দিলে না,—কিন্তু সেদিকে কান দেয় নি স্বর্ণ, কোন জবাব দেবারও চেষ্টা করে নি; ঐ বানানো মিষ্টি কথাগুলো তার নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে চাবুকের মতো গিয়ে বক্তার মুখেই বাজবে—এটুকু জ্ঞান তার ছিল; তবু তার জন্যেও মন-কেমন করেছে বৈকি। অনেকদিনের সম্পর্ক যে! ও তো কখনও

অন্য কারও কথা ভাবে নি কোনদিন, অন্য কাউকে চায় নি ; ঐ একটি মাত্র লোক-কেই একান্ত আপন জ্ঞানে আঁকড়ে ধরেছিল সেই মিলনের প্রথম দিনটি থেকে। বরং কোনদিক থেকেই সে এই রূপবান কান্তিমান শিক্ষিত ভদ্র স্বামীর উপযুক্ত নয়, এই ভেবে সঙ্কোচই বোধ করেছে চিরকাল, নিজেকে অপরাধী ভেবেছে অকারণেই। অনেক বেশী সেবা দিয়ে, অনেক বেশী ভক্তিতে প্রেমে আত্মত্যাগে, নিজের রূপ গুণ বিদ্যার দৈন্য ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছে। আজ হরেন যা-ই ক'রে থাকুক—ওর মনে সে-ই একেশ্বর যে। এতকাল পরে সেই স্বামীকে ছেড়ে যেতে—দীর্ঘকাল, হয়ত বা চিরদিনের জন্যই—মনে বেজেছিল বৈকি!

এমন কি, ঐ যে খাঁচার মতো বন্দীশালার মতো তার শ্বশুরবাড়ি—সেটা ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয়েছিল তার। অনেক শখের, অনেক সাধনার সংসার তার, আবাল্য-স্বপ্ন-দেখা নিজস্ব ঘর-কন্না; তার নিজের বাড়ি, স্বামী-শ্বশুরের ভিটা। নিজের হাতে গুছোনো হে'শেল; পাঁচফোড়নের কৌটো, হিংয়ের শিশিটি পর্যন্ত নিজের হাতে সাজানো, এ বাড়ির প্রতিটি ছোটখাটো বস্তুর সঙ্গেই তার আত্মার বন্ধন, প্রাণের যোগাযোগ। সে এ বাড়িতে আসার পর প্রত্যেকটি ছবি-টাঙ্গানো পেরেক-পোঁতার ইতিহাসও তার মুখস্থ। এর ইট-কাঠ-দোর-জানালা, নোনাধরা দেওয়ালের গর্ত-গুলোও যেন তার বহুকালের পুরনো বন্ধু...তার আপনজন। এদের ফেলে যেতে কষ্ট হবার কথাই তো।

তবু সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে নি। যে নিবিড় অভিমানে সে পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে এমনভাবে এক কথায় অরুণের সঙ্গে অজানা জগতে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে পা বাড়াতে রাজী হয়েছিল—সেই অভিমানই কতকটা বর্মের কাজ করে-ছিল এই দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা থেকে আত্মরক্ষা করতে। যে-আঘাত খেয়েছে সে তার এই এতকালের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া সংসার থেকে, অতিপ্রিয় তার এই বিশ্ব-সংসার-থেকে-বিচ্ছিন্ন-হওয়া নিজস্ব জগৎ থেকে, তার এই জগতের সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক আপন মানুষটির কাছ থেকে—সেই আঘাতই যেন কুর্মের আচ্ছদে পরি-ণত হয়ে তাকে রক্ষা করল এই শেষ মুহূর্তে, তাকে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে দিল না।

কিন্তু কষ্ট যতই হোক, তার জন্য খুব বড় রকমের একটা দৈহিক প্রতিক্রিয়া হ'তে পারল না—বোধ করি তার জীবনে একেবারে অপ্রত্যাশিত এই অভিনবত্বর জন্যেই। অথচ এই প্রতিক্রিয়ারই খুব ভয় করেছিল অরুণ। তার জন্যে তার এক ডাক্তার বন্ধুকে স্টেশনে থাকতে বলেছিল, আপৎকালে যে যে ওষুধ কাজে লাগতে পারে তাও কিছু কিছু সঙ্গে নিয়েছিল। মায় ইঞ্জেকশনের একটা সিরিঞ্জ নিতেও ভোলে নি। কিন্তু সে সব কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন হ'ল না। প্রতিক্রিয়ার পরেও প্রতিক্রিয়া আছে, বোধ করি তাইতেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠল স্বর্ণ।

যে মূল্যবান গাড়ি করে তাকে স্টেশনে নিয়ে আসা হ'ল, সে গাড়িই কখনও চোখে দেখে নি স্বর্ণ। দু-একবার ট্যাক্সিতে না চড়েছে সে তা নয়, কিন্তু সে-সব গাড়ির সঙ্গে এ গাড়ির তুলনাই হয় না। এত বড় যে 'মটর' গাড়ি হয় তা-ই জানা ছিল না কখনও। স্বচ্ছন্দে তাতে শুয়ে আসা চলে, আর শুয়েই এল সে। অরুণ সযত্নে সস্নেহে নিজে হাতে বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে দিল ভেতরে, সে আর জীবেন ড্রাইভারের পাশে বসল। এতটা বয়সের মধ্যে কেউ তাকে এমন যত্ন ক'রে বিছানা পেতে শুইয়েছে বলে মনে পড়ে না। তার মা কাকী যতই ভালবাসুক—এত করবার তাদের অবসরই ছিল না।

সেইটুকু উপভোগ করতে করতেই হাওড়া স্টেশন। বড় একটা হেলানো আধ-

শোয়া চেয়ারে ক'রে এনে তাকে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চড়ানো হ'ল। এর আগে কখনও সেকেণ্ড ক্লাসেই চড়ে নি সে, একবার অর্ধোদয় না কী একটা যোগে সে হাওড়ায় গঙ্গা নাইতে এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে, খুব ভীড় দেখে ছোটকা ওদের একটা ইণ্টার ক্লাসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। টিকিট বদলানো হয় নি, এমনিই চড়েছিল। ছোটকা বলেছিল, এ ভীড়ে আর কেউ টিকিট দেখবে না। তবু সেদিনও ইণ্টার ক্লাসের গদী আঁটা বেঞ্চি চোখেই দেখেছিল, ভীড়ের মধ্যে আর বসবার সুযোগ মেলে নি।...এ নাকি সে সবের চেয়ে ঢের বেশী ভাড়ার গাড়ি, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল স্বর্ণ। পিঠের দিকে ঠেস দেবার জায়গাটা পর্যন্ত গদীআঁটা, মায় মাথার জায়গায় বালিশের মতোই খানিকটা উঁচু করা। আয়নাই কত গণ্ডা। কলঘরের মধ্যেও আয়না। আবার সেখানে এতটুকু একরত্তি একটা পাখা। বেঞ্চির পাশে পাশে জলের গেলাস রাখার কেমন সব আংটা পরানো দ্যাখো। বসে বসে এত ছিষ্টিও তো করেছে বাপু! ভাড়া বেশী নেয় অমনি নয়। এখানে বসবার পর সুখসোমন্দা কত সব তকমা-আঁটা আঁটা লোক সেলাম ক'রে গেল।...

তাও, এ কামরা নাকি একেবারে রিজার্ভ করা। কেউ উঠবে না আর এতে। অনেক টাকা দিয়ে অরুণদা এই ব্যবস্থা করেছে। অরুণের সেই ডাক্তার বন্ধু (মিলিটারী পোশাক আঁটা সায়েবদের মতো একেবারে—হুবহু! মাগো, প্রথমটা তো তাকে দেখে ভয়ই হয়েছিল স্বর্ণর) ওকে শুইয়ে দেবার পর পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'কোন ভয় নেই, শি ইজ অল রাইট। হাউএভার, আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি, প্রিকশন নেওয়া ভাল।'

তা যত্ন ক'রেই ইঞ্জেকশন দিল লোকটা। একটুও লাগল না, কিছু না। বরং আরামে যেন ঘুমিয়ে পড়ল স্বর্ণ একটু পরে। গাঢ় ঘুম—রাত্রে অরুণ খাওয়ার জন্যে ডেকে না তুললে সে বোধহয় সকাল পর্যন্ত ঘুমোতে পারত। খাবারও এনেছে বটে --একরাশ। গরম থাকা বোতল—ঐ রকম আজকাল তার দেওররাও কিনেছে সব, ঘরে ঘরে—তাতে ঝোলের মতো কী একটা। দিব্যি খেতে, সুপ না কী যেন একটা নাম বললে। তার সঙ্গে ফলের রস সন্দেশ—আরও কত কি। নিজে তো খেলে না কিছুই, স্বর্ণ খুব রাগারাগি করতে একটুখানি কি মুখে দিলে—এই পর্যন্ত। আবার বলে, 'তুমি বকাবকি না করলে আমার খাওয়া হ'ত না তা তো জানোই; খাওয়ার অব্যেসটাই চলে গেছে যে!'

এত আরাম জন্মে অবধি পায় নি কখনও। এত আরাম এত সুখ যে মানুষ ভোগ করে তাই জানত না সে। মন-কেমন করতে লাগল ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে। ওদের বাপও পয়সা রোজগার করছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুখে রাখবার কথা ভাবেও না একবার।...মা বাবা, অভাগা ভাইগুলোর জন্যেও মন কেমন করতে লাগল। ওরা এসব জানতেও পারল না কোন দিন। ফার্স্ট ক্লাস কামরার ভেতরে ঢুকে চেহারাটাও দেখতে পেল না। পাবেও না বোধহয় কোনদিন।

স্বর্ণ যেন হাত-পা মেলে এই যাত্রার প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে করতে চলল। এ যেন একটা সুখস্বপ্ন। ভোর হ'তে না হতে কোথা থেকে সব তকমা-আঁটা উর্দিপরা বেয়ারা এসে কেমন খাবার-দাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। অবশ্য এসব খাবার প্রিয় নয় ওর কোনদিনই। আধকাঁচা ডিমের চেহারা দেখলেই গা-কেমন করে—তবু, মচমচে রুটির ওপর মাখিয়ে অরুণদা যখন নিজে হাতে দিলে, তখন আর 'না' বলতে পারল না। বোতল থেকে হর্লিক্স বার করে গুলে দিলে—এক গেলাস। আবার এক ঘণ্টা না যেতে যেতে ফলের রস সন্দেশ। মাগো, এত কেউ খেতে পারে নাকি?

বিশেষ এই মরা পেটে। খাওয়া যদি এতই সহজ তুমি খাচ্ছ না কেন ঠাকুর?...ছেলেটা চিরদিনের পাগল।

সে সুখ-স্বপ্ন একটানা দীর্ঘ ছন্দে তাকে টেনে নিয়ে চলল। একটা বৈচিত্র্য থেকে আর একটা বৈচিত্র্যে। বিলাসের একটা উপকরণ থেকে আর একটায়। সারাদিন এইভাবে চলার পর রাত্রে কী একটা ইস্টিশানে নামতে হ'ল তাদের। এও কী এক বড় ইস্টিশান। তাদের হাওড়ার মতো না হ'লেও বেশ বড়। কত লোকজন। বোরখা পরা-পরা মেয়েছেলের দল। ঘেরাটোপ পরানো আলোতে যেন ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাদের। বেরিলি না কী যেন বললে জায়গাটার নাম।...আবার সেই রকম হেলানো চেয়ার এল, তাকে ঢেকেঢুকে মুড়েসুড়ে কচি ছেলের মতো শুইয়ে দিলে অরুণ। ওখান থেকে নেমে আর একটা গাড়িতে চড়তে হ'ল। এ নাকি ছোট গাড়ি, কিন্তু স্বর্ণর তো মনে হ'ল না তা। এ তো দিব্যি সেই আগের গাড়ির মতোই, ছোট আবার এর কোন্‌খানটায়? কে জানে বাপু, বলছে যখন তখন ছোট হবে নিশ্চয়ই—ওরা কত জানে শোনে, ওদের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে যা অপরের চোখে পড়ে না—কিন্তু এও তো বেশ। শুল তো বেশ আরামেই, হাত পা মেলে।

রাত পোয়াতেই আবার সেই রকমারি খাওয়া। মুখ হাত ধোবার জলটি পর্যন্ত অরুণদা এগিয়ে দিচ্ছে। গামলাই এনেছে একটা তার জন্যে। এমন আরামে থাকলে এক মাসেই কোলা ব্যাং হয়ে যাবে যে। খাওয়া-দাওয়ার পরেই নামতে হ'ল—এই ইস্টিশানই নাকি এ লাইনের শেষ। এখান থেকে মোটরে যাওয়া। বাসেই যেতে হয়, আর তাতে নাকি বড় কষ্ট। অনেক দূরের পথ তো। তার জন্যে নাকি একটা গোটা বাসই ভাড়া করতে চেয়েছিল অরুণদা দেড়শ' টাকা দিয়ে, ওর সায়েব বারণ করেছে। সেই সায়েবই তার কে এক বড় মিলিটারী সায়েব বন্ধুকে বলে আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। মালপত্তর—একটা কি জীপগাড়ি এসেছে আজকাল এই যুদ্ধের হিড়িকে—তাইতে চাপল, ও আর অরুণ অন্য এক গাড়িতে। শুয়ে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে দিব্যি। এ রুগী যাবারই গাড়ি, আগেও দেখেছে স্বর্ণ। পাড়ায় 'ওলা'মার দয়া হ'লে এ গাড়ি তাদের ওখানেও আসে হাসপাতালের গাড়ি, কী সব কড়া ওষুধের গন্ধ গাড়ি-ময়। তা হোক, স্বর্ণর এসব গন্ধ খারাপ লাগে না। এবার ক্যাম্বিশের খাটে ক'রে তুলল তাকে, সেই খাটসুদ্ধই শুইয়ে দিল। ভেতরে শুধু অরুণ রইল,—পাখা. জলের জায়গা আর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে।

কী পথ তা কিছু দেখতে পেল না স্বর্ণ, দুদিকঢাকা গাড়িতে শুয়ে শুয়ে যাওয়া—তবে পথটা যে অনবরত এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারল। সে জন্যেই বোধ-হয়, মাঝে খুব কষ্ট হয়েছিল ওর, হয়ত ভিরমিই যেত যদি না ব্যাপারটা চট্‌ ক'রে বুঝে নিয়ে অরুণদা তাড়াতাড়ি কী একটা ঝাঁঝালো ওষুধ নাকের কাছে ধরত। তাতেই হুঁশ ফিরল আবার, একটু বলও পেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কি ওষুধও খাইয়ে দিল অরুণদা। তারপর আর বিশেষ কষ্ট টের পায় নি।

রাত্রির স্বপ্ন ভাঙ্গে প্রভাতের রূঢ় বাস্তব আলোয়, স্বপ্নের সুখ সত্যকার জীবনে মেলে না সাধারণত। কিন্তু এ যাত্রায় স্বর্ণর ভাগ্যে যেন অঘটনই ঘটছে কেবল। পথের সেই দীর্ঘ সুখ-স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটল নতুন এক স্বপ্নের মধ্যেই। এসে যেখানে পেঁৗছল সে. সেও এক স্বপ্নের দেশ। এ যদি হাসপাতাল হয় তো স্বর্গের চেয়ে হাসপাতালই ভাল। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেল একেবারে। সব দুঃখ দুশ্চিন্তা দুর্বলতা এমন কি সন্তান-বিচ্ছেদ-বেদনা পর্যন্ত

নিমেষে দূরে হয়ে গেল। এ কোথায় এল সে? এমন জায়গা যে হয় তাই যে জানা ছিল না তার কোনদিন। পাহাড়ে না আসুক, পাহাড়ের ছবি সে ঢের দেখেছে, তার ঘরেই কত গণ্ডা টাঙ্গানো আছে—তবু সে যে এমন তা তো ভাবতে পারে নি কোনদিন!

গাঢ় সবুজ গাছপালার আস্তরণে ঢাকা এই এত বড় বড় পাহাড়, চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউয়ের বন, ওপরে ঘন নীল আকাশ (এমন নীল আকাশ তো পোড়ার শিবপুরে কি মৌড়ীতে থাকতে একদিনও নজরে পড়ে নি, আকাশও কি আলাদা আলাদা হয়?)—নিচে রুপোর পাতের মতো নদী। কোশী নদী না কি যেন বললে! একটুখানি নদী কিন্তু তারই কি বিক্রম! তুলোর পাঁজ ধুনতে ধুনতে চলেছে যেন—এমন রাশি রাশি সাদা ফেনা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবে বোঝা যায় ওগুলো তুলো নয়। আসলে পাহাড়ী নদী নামছে নিচের দিকে, জল তীরবেগে ছুটছে—পথে যে অসংখ্য নুড়ি পাথর (পরে জেনেছিল স্বর্ণ নুড়ি নিহাৎ নয়, ওগুলো এক-একটার ওজন একশ মণ পর্যন্ত হবে!) পড়ছে তাতেই ঘা খেয়ে ফেনা কাটছে ওগুলো। বাপ রে কী তোড় জলের, বোধহয় একটা কুটো পড়লেও এখনই খান খান হয়ে যাবে।

কিন্তু নদী অনেক দূর, ঝাউগাছগুলো বড় কাছে, বড় আপন। অরুণদা বলছে ওর নাম পাইন। নাম যাই হোক—ভারী চমৎকার কিন্তু গাছগুলো, কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত ফল ওর, যেন কাঠের খেলনা। আর ওর ডালে কী শনশনে হাওয়া। সে হাওয়া মুখে লাগলেই মনে হয়, বয় বুঝি বেঁচে গেলুম—আর কোন ভয় নেই।

মুখেও বলে সে কথা, অরুণের দিকে চেয়ে বলে, 'না অরুণদা, মনে হচ্ছে আমি বেঁচেই যাব এ-যাত্রা। শাশুড়ী বলেন—শিব-অসাধ্য রোগ বৌমা, এ তো সারবার নয়, একটা প্রাচিত্তির ক'রে ফ্যালো।...কিন্তু এ তো শুনেছি শিবেরই দেশ, এদেশে বোধহয় বেঁচে যায় এ রুগীও। মনে হচ্ছে এই বাতাসেই সেরে উঠব এবার, ওষুধও খাওয়াতে হবে না। শিবঠাকুর বাঁচাবেন বলেই বোধহয় টেনে এনেছেন তোমাকে দিয়ে!'

হাসতে হাসতেই বলে কিন্তু দুচোখের কোণে একটু যেন জলও চিকচিক করতে থাকে সেই সঙ্গে। সেই জল কি এসে পড়ে সুদূর সংসারের স্মৃতিতে, বেদনায়,—না কি নির্মম অকৃতজ্ঞতার আঘাতে? কিম্বা অরুণের প্রতি স্নেহে-কৃতজ্ঞতায়, সেই সঙ্গে ঈষৎ লজ্জাতেও?...কেন যে আসে তা সে নিজেও বোঝে না। কিন্তু বলতে বলতে বুঝি কৃতজ্ঞতাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। বলে, 'ধন্যি ছেলে বাবা তুমি! এতও খবর রাখো, এত ছিষ্টিও জানো।...তুমি যদি লেখাপড়াটা না ছাড়তে তা'হলে আজ জজ-ম্যাজেস্টার হ'তে পারতে। আমি তো বরাবর বলে এসেছি—তুমি না পারো হেন কাজ নেই। কী যে দুর্বুদ্ধি হ'ল তোমার তখন! কিন্তু এ যে অসুমর খরচের ব্যাপার দেখছি সব, সত্যি এত পয়সা হয়েছে তোমার?...তোমার বোনাই যা লোক, মুখে যা-ই বলুক, এক পয়সা দেবে না তোমাকে—তা বলে রাখছি।...তুমি মিছিমিছি একগাদা টাকা দেনায় জড়িয়ে পড়বে না তো?'

অরুণও হাসল এবার। স্বর্ণর শীর্ণ মুখ আর কোটরাগত চক্ষুর চিক্‌চিকিনির দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বলল, 'পড়লুমই বা—তাতে তোমার দেনাটা শোধ হবে তো খানিকটা। সেইটুকুই লাভ।'

'আমার আবার ছাই দেনা! অভ্যস্ত ঝঙ্কার কণ্ঠে ফুটে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে, 'আমার কাছে আবার কবে কি ধার করলে তাই শুনি!...ও সেই সাতটা টাকার কথা

বলছ?......ভাগ্যিস ওটা নিয়ে গেছলে, কী ভাগ্যিস যে ওটুকু সুবুদ্ধি তোমার হয়েছিল—নইলে সত্যিই বলছি—আমার মুখে আর অন্নজল যেত না।...আচ্ছা, কেন অমন ক'রে চলে গেলে অরুণদা বল তো? আমার বে হ'ল বলে—?...তোমার কি মনে হ'ল আমি না থাকলে তোমার ক্ষোয়ার হবে, কেউ দেখবে না?...তা এই যে পথে পথে ঘুরলে, কে তোমাকে অত দেখল বাপু?...না, না, কাজটা ভাল করো নি!'

আবার কি মনে ক'রে বলে, 'নাকি আমার জন্যে খুব মন কেমন করেছিল? ঠিক ঠিক বল তো। আজও আমি ভেবে পাই নে কথাটা!...তা দুটো দিন অপেক্ষা করলে না কেন, আমি তো আটদিনের মাথাতেই এসে পড়লুম। চাই কি আর একটা বছর কাদায় গুণ ফেলে থাকলে, আমি শ্বশুরবাড়িতে পুরনো হয়ে গেলে—আমার কাছেই গিয়ে থাকতে পারতে!'

'ওকথা এখন থাক বুঁচি, ও তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। ওসব কোন কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। সব ভাবনা চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দাও একেবারে!'

স্বর্ণ হেসে উঠল যেন আপন মনেই, 'হি হি, তুমি সেই বুঁচি নামই ধরে রাখলে চিরকাল! তা মন্দ নয় কিন্তু, আগে আগে শ্বশুরবাড়িতে কেউ ও নাম ধরলে লজ্জা করত, মনে হ'ত কী বিচ্ছিরি নাম। কিন্তু এখন বেশ ভাল লাগে, মনে হয় সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। ও নাম ধরে তো এখানে বড় একটা কেউ ডাকে না আর!'

চিকিৎসার এই রাজকীয় ব্যবস্থাতে যে 'অসম্ভব' টাকা খরচ হচ্ছে সেটা তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝেছিল স্বর্ণ, কিন্তু তবু আন্দাজটা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে নি। যখন তা পৌঁছল তখন ব্যাকুলতার সীমা রইল না।

অরুণ বেশীদিন থাকতে পারবে না, ওখানে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এখানে দিন পনেরো থেকে সব বন্দোবস্ত ক'রে চলে যাবে—এ আগে থাকতেই বলা ছিল। এক-মাস দেড়মাস অন্তর এসে খবর নিয়ে যাবে এর পর। অবশ্য হরেনের আসবার কথা, ছুটি পেলেই সে আসবে এখানের গেস্ট হাউসে মাসখানেক কাটিয়ে যাবে—বার বার বলে দিয়েছে সে। তারও 'চেঞ্জ' হবে, স্বর্ণরও খোঁজখবর করা হবে। বড় মেয়েকেও নিয়ে আসবে সে। কিন্তু সে কথায় স্বর্ণ বা অরুণ কেউই বিশেষ ভরসা রাখে নি। স্বর্ণ বলেছে, 'আমি একাই বেশ থাকব অরুণদা, তুমি মাঝে মাঝে এসো সময় মতো—তাতেই আমার হবে। তাও কাজের ক্ষেতি ক'রে তোমাকেও আসতে বলি না। এখানে তো এত লোকজন, আমার দিব্যি চলে যাবে!'

অবশ্য তার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেজন্যে অরুণ করেছেও ঢের। বেশী টাকা দিয়ে 'কট' বা আলাদা ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছে। পরিচর্যার জন্যে যত না হোক, সর্বদা কাছে কাছে থাকার জন্যে সঙ্গিনী হিসেবে একজন নার্সও বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। একেবারে তিন মাসের মতো সমস্ত খরচ—মায় নার্সের মাইনে সুদ্ধ আগাম জমা ক'রে দিয়েছে। ওষুধপত্রের জন্যেও আনুমানিক একটা টাকা গচ্ছিত ক'রে দিয়েছে আপিসে অর্থাৎ সে বা অপর কেউ না এলেও যাতে চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়, চিঠি লিখে জানিয়ে তবে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন না হয়।

এই নার্সের মুখেই খরচের বিপুলতার প্রথম একটা আভাস পেল স্বর্ণ। নার্স বাঙালী নয়, যুক্তপ্রদেশের মেয়ে—স্বর্ণর হিসেবে খোট্টা—তবে এর আগেই সে আর এক বাঙালী মহিলার পরিচর্যা ক'রে কিছু কিছু বাংলা শিখেছিল, কিছুটা সেই বিদ্যেয় আর কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে ইশারায় কথাবার্তার কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

তার কাছেই শুনল, এই যুদ্ধের মধ্যেই কী একটা ওষুধ বেরিয়েছে এই রোগের নাকি সে ইঞ্জেকশন এখনও বাজারে খুব বেরোয় নি, অনেক কাণ্ড ক'রে যোগাড় করতে হচ্ছে—যা আসছে সরকার মিলিটারীদের জন্যেই কিনে নিচ্ছেন। অরুণ নাকি বহু লোককে ধরে অনেক বেশী দাম দিয়ে সেই ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করেছে। এমনিতেই নাকি তার দাম অনেক, এক-একবার যেটুকু ফোঁড়া হয় তারই দামে নাকি একটা ছোট সংসারের একমাসের খরচ চলে যায়। নার্স আশার অনুমান, আশি নব্বুই টাকার কম পড়ছে না এক-একটা ইঞ্জেকশন।

কিন্তু শুধু তো এই ওষুধ নয়—অন্য অন্য ব্যাপারেও কি খরচ কম হচ্ছে! নার্সের মাইনে, এখানকার খাই-খোরাকী, ঘর-ভাড়া—সব খরচেরই একটা আঁচ পেল স্বর্ণ। শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল সে, বিশ্বাসই হ'তে চাইল না তার। বিশ্বাস হবার কথা নয়, এ তার কাছে রূপকথার মতোই আজগুবী একটা অঙ্ক। এত টাকা কেউ কারও জন্যে খরচ করে—তা সে জানবে কী করে? এত টাকা যে কোন সাধারণ লোক—রাজামহারাজা বা সাহেবসুবো ছাড়া—রোজগার করতে পারে তা-ই যে জানে না সে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনে আসছে যে একটা টাকার অনেক দাম, সাত হাত মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। এ লড়াইয়ের বাজারে অনেকে নাকি অনেক টাকা রোজগার করছে তা সে শুনেছে, হরেনও নাকি বিস্তর টাকা কামাচ্ছে— কিন্তু সে কি এত?

অনেক ভাবল সে। তারপর—তার জানাশুনো প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম যে পরিমাণ বেড়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে এবারের এই আসবার ব্যবস্থাটার খরচটাও আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। সেও তো কম নয়, রাজরাজড়ার মতোই তো এসেছে সে। যে শুধু পথেই এত টাকা খরচ করতে পারে, তার পক্ষে এ খরচাই বা অস্বাভাবিক কিসের?

বিশ্বাস হবার পর আরও আকুল হয়ে উঠল সে। এ কী করছে অরুণদা, অরুণদা কি পাগল হয়ে গেল না কি! এ যে দেউলে হবার মতলব তার। তার মতো একটা সামান্য মেয়েছেলে—তার নিজের বোন কি আপন কেউ নয়—নিতান্তই নিষ্পর এক-জন, তার জন্যে এ কি বাড়াবাড়ি কাণ্ড করছে ও!...সে আর স্থির থাকতে পারল না ; এই বারো চোদ্দ দিনেই অনেকটা জোর পেয়েছে পায়ে, কাউকে না ধরেও হেঁটে বাইরে বেরোতে পারে—তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে খুঁজে বার করল অরুণকে। বাগানের এই অংশটা অরুণের বিশেষ প্রিয়, থাকলে এখানেই থাকবে তা সে জানত।

অরুণের সামনে গিয়ে ধপাস ক'রে বসে পড়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'এ কী করেছ অরুণদা, তুমি নাকি আমার জন্যে মাসে ছ-সাতশো টাকা খরচের ব্যবস্থা করেছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? নাকি মতিচ্ছন্ন ধরল তোমাকে? তুমি কী এমন লাট-বেলাট দরের মানুষ যে এই খরচটা করছ। শেষে কি একটা অখদ্যে অবদ্যে মেয়েছেলের জন্যে দেউলে হবে তুমি! বলি মতলবটা কী তোমার?'

অরুণের সুগৌর মুখে বুঝি একটা রক্তাভা খেলে যায় মুহূর্তকালের জন্যে। কিন্তু সে স্থির শান্তভাবেই বলে, 'কে বললে কে তোমাকে এসব কথা? ওসব গালগপ্পে কান দাও কেন?'

ওগো মশাই, আমি আর সেই সেকালের কচি খুকীটি নেই, আর দুদিন বাদে আমার মেয়েরই বে দেবার বয়স হয়ে যাবে। আমাকে থাতামুতো দিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা ক'রো না। ছ সাতশ কি হয়ত আরও বেশীই খরচ করছ। এখানে আনতেই

তো হাজার বারোশো টাকা খরচ করেছ তুমি—আমি কি কিছু বুঝি না!'

সেই ছেলেবেলাকার মতোই চাপা কৌতুকে অরুণের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'বাবা, তোমার এত বুদ্ধি! ইস!'

'না না, হাসি-তামাশার কথা নয়। এর একটা বিহিত না হ'লে আমি অনর্থ করব বলে দিলুম। তার চেয়ে তুমি আমাকে যেখানকার মানুষ সেইখানে রেখে এসো—যা হবার তা হবে। আমার জন্যে তোমাকে ফতুর হ'তে দোব না কিছুতেই!

এবার অরুণও গম্ভীর হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে স্বর্ণর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বুঁচি, তোমার জন্যে ফতুর হ'তে না পারলে আমার ও টাকারই যে কোন দরকার নেই! কোনদিন তোমার কাজে লাগতে পারে এই ভেবেই তো আমার রোজগার করা। নইলে আর আমার কে আছে বলো! কার জন্যে টাকা। যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি তবেই যে আমার বেঁচে থাকারও সার্থকতা! ...তুমি এর জন্যে কিছুমাত্র কিন্তু বোধ করো না, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না। এতে আমারই উপকার হচ্ছে, তোমার কিছু নয়!...আমার জন্যে এটুকু সহ্য করতে পারবে না তুমি?'

আর যা-ই হোক, ঠিক বোধ হয় এ উত্তরের আশা করে নি স্বর্ণ। হঠাৎ সেও যেন আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকবার পর আস্তে আস্তে হাত দুটো অরুণের হাতের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে বললে, 'ছোট কাকী একবার বলেছিল আমাকে, বিশ্বাস করি নি। অনেকদিন পরে—রেবা পেটে সাধ খেতে গেছলুম যেদিন, সেইদিন তোমার কথা উঠতে বলেছিল কথাটা। বলেছিল, "ওলো নেকী, সে আসলে তোকে ভালবেসেছিল। বোধহয় মনে ছিল, লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি করতে পারলে তোর সঙ্গে বের কথা তুলবে। তোর বে হয়ে যাওয়াতেই মনটা ভেঙ্গে গেল—একদিক পানে চলে গেল সব ছেড়েছুড়ে। আর কার জন্যে কী—এই ভাবল বোধহয়।"...আমি ছোট কাকীর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম সেদিন! আজ দেখছি—আমি শুধু নেকাই নই, কানাও।...কিন্তু আজ এই মরণপানে পা ক'রে মিথ্যে লজ্জা করব না, সোজাসুজি বলছি, কী দেখে তুমি আমাকে ভালবাসতে গেলে অরুণদা, তোমার চেহারা ভাল—আর একটা দুটো পাশ ক'রে যেমন তেমন চাকরীতে বসতে পারলেও কত গণ্ডা ভাল ভাল মেয়ে এসে তোমার পায়ে লুটোত। আমার মধ্যে তুমি কী এমন দেখলে!...তোমার জীবনটা আমার জন্যে নষ্ট হয়ে গেল ভাবলে যে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না অরুণদা!'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে প্রায় চুপি চুপি উত্তর দিল অরুণ, 'নষ্ট হ'ল তা তোমাকে কে বললে, বুঁচি, এই তো কাজে লাগল। আর কী দেখলুম তোমার মধ্যে? সেও তুমি বুঝবে না। যে দেখে তার চোখ না পেলে অপরে বুঝবে কী ক'রে কে কার মধ্যে কী দেখল!'

আর কথা কথা বাড়াল না স্বর্ণ, দুই চোখ রগড়ে মুছে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

॥ ৪॥

ভাল ক'রে সেরে উঠতে প্রায় ছ মাস লাগল স্বর্ণর। এইটেই যথেষ্ট দীর্ঘ সময় কিন্তু অরুণ আরও দুমাস জোর করে ওখানেই রাখল। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছিলেন যে, এই সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠার কালটা অন্য কোন স্বাস্থ্যকর

স্থানে গিয়ে কাটাতে। উদয়পুর, ওয়ালটেয়ারের নামও করেছিলেন তাঁরা। স্বর্ণরও —প্রথম দিককার এই স্বর্গপুরী ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু উপায় নেই বুঝেই, সেও চুপ করে ছিল। হাসপাতালে অনেক অভিভাবক, অনেক রক্ষাকবচ আছে—অন্যত্র কে তাকে নিয়ে থাকবে? অরুণের পক্ষে দুতিন মাস একনাগাড়ে থাকা সম্ভব নয়, শোভনও নয় সেটা। ওদের কারুর এখনও দুর্নামের বয়স যায় নি।

এই সময়টুকুর মধ্যে কিন্তু অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। যদিও স্বর্ণ অনেক দিন পর্যন্ত সে খবর পায় নি। অরুণ পেতে দেয় নি—ইচ্ছে করেই। সুবিধেও হয়েছিল অনেকটা, চিঠিপত্র ওখান থেকে বিশেষ কিছু আসত না। দেবেই বা কে, দেবার মধ্যে ভুতু আর রেবাই যা দেয় মধ্যেমিশেলে এক-আধখানা। হরেন একখানাই মাত্র চিঠি দিয়েছিল এখানে—ছুটি নেবার জন্যে খুবই চেষ্টা করছে সে, পেলেই মাস-খানেকের জন্যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসবে—মাত্র—এইটুকুই বক্তব্য ছিল তাতে। স্বর্ণ সে চিঠির উত্তর দেয় নি—ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার অন্তরের পাত্র ছাপিয়ে উঠেছে স্বামীর একটির পর একটি মিথ্যাচরণে—হরেনও আর লেখে নি। কিন্তু ছেলেমেয়ের চিঠিতেও এসব খবর পায় নি স্বর্ণ—অরুণ তাদের বারণ করে দিয়েছিল। যা সাংঘা-তিক রোগ, উদ্বেগের কারণ ঘটলে যতটা যা এগিয়েছে আরও হয়ত বেশী পিছিয়ে যাবে।

একেবারে শেষের দিকে শুনল সব। তাও একবারে নয়, দুবারে।

স্বর্ণর শাশুড়ী মারা গিয়েছেন—সে এখানে আসার মাস তিনেক পরেই। কল-তলায় পড়ে গিয়ে নাকি তাঁর কোমরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না; মা কান্নাকাটি করাতে ছেলেরা কথা দিয়েছিল যে এক্স্-রে করে হাড় ঠিকভাবে বসিয়ে প্লাস্টার করা পর্যন্তই সেখানে রাখা হবে, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে নার্স রেখে দেবে, সে-ই দেখাশুনো করবে, কোন অসুবিধে হবে না তাঁর। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে নার্স বিরল, যদি বা পাওয়া যায়, অনেক টাকা দিতে হবে। সে টাকা কে কতটা দেবে এই ঠিক করতে করতেই কয়েকদিন কেটে গেল। হরেনই সবটা দিতে পারত কিন্তু তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পাওয়াই ভার। তাছাড়া মা যখন তার একার নয় তখন সে সবটা দেবেই বা কেন? শেষে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে কড়া চিঠি লিখতে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে হ'ল কিন্তু নার্স রাখা আর হয়ে উঠল না। বুড়ী ঝি আয়না স্বর্ণর ছেলেমেয়ের মায়া কাটিয়ে কোথাও যেতে পারে নি, সে-ই অগত্যা কিছু কিছু সেবার ভার নিলে। তার হাতে খেতেও হ'ল হরেনের মাকে—এবং দিব্যি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি যে, যে-কাপড়ে সে ময়লা পরিষ্কার করছে সেই কাপড়েই ভাত এনে তাঁকে খাওয়াচ্ছে। সে বুড়োমানুষ, ছেলেমেয়ে সামলে বারবার স্নান করা বা কাপড় কাচা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হরেনের মা প্রথম প্রথম এ নিয়ে কান্নাকাটি ছেলেদের গালিগালাজ করেছিলেন, একদিন না খেয়েও ছিলেন অনেকক্ষণ—কিন্তু কোন ছেলেই তাতে বিচলিত না হওয়াতে শেষে অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য বেশীদিন এ-ভোগান্তি সহ্য করতে হয় নি তাঁকে। আয়নার দ্বারা সেবার স্থূল কাজগুলো চলত, শুশ্রূষা যাকে বলে তা চলত না। সে শিক্ষা তার ছিল না, তাকে কেউ বলেও দেয় নি। একভাবে শুয়ে থাকার ফলে বেড্‌সোর হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত নাকি পেটও ছেড়ে দিয়েছিল। যাইহোক, খুব বেশীদিন ভুগতে হয় নি, পড়ে যাওয়ার মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই ছুটি পেয়ে গেলেন। তবে কখন যে তিনি মারা গেছেন তা কেউ জানে না, মরার সময় ছেলেদের হাতের জলও পান নি। বিকেলে চা দিতে গিয়ে আয়না দেখেছে যে মরে কাঠ হয়ে

পড়ে আছেন বৃদ্ধা!

এই প্রথম খবর।

শাশুড়ী সম্বন্ধে প্রীতি বা স্নেহ থাকার কথা নয় স্বর্ণর মনে, তবু খবরটা শুনে তার কষ্টই হয়েছিল। বিশেষ করে শেষদিনগুলোর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। স্বর্ণর মন স্বাভাবিকভাবেই স্নেহপ্রবণ ও সহনশীল—তাই কখন যে সে শাশুড়ীকে ক্ষমা করেছে মনে মনে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি, এখন বুঝতে পারল। কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই এখানে—যে চোখের জল অজস্রধারায় ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে, তা নির্ভেজাল দুঃখেরই প্রকাশ।

কিন্তু আরও সাংঘাতিক খবর তার জন্যে তোলা ছিল। সেটা পেল আরও কদিন পরে, তার দুমাসের এই শেষ মেয়াদও শেষ হয়ে যাবার মাত্র দিনসাতেক আগে। অবশ্য ঘটনাটাও খুব পুরনো নয়, যদিও তার সূত্রপাত হয়েছে অনেক আগে থাকতেই। সে ইতিহাসও. প্রীতিপদ হবে না বলেই তখন জানায় নি অরুণ।—স্বর্ণ চলে আসার পর আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে হরেন, মদ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আরও। কাউকে গোপন করার চেষ্টা মাত্রও করত না সেসব কথা। প্রকাশ্যেই নতুন ঝিয়ের সঙ্গে 'ঘর' করতে শুরু করে, এমন কি স্বর্ণর শাড়ি-গহনাও তাকে কিছু কিছু বার করে দেয়। ছেলেমেয়েদের বলে দেয় তাকে নতুন মা বলে ডাকতে। কিছু-দিন পরে পরে, যখন সে গৃহিণীপদে বেশ কায়েম হয়ে বসেছে, যথেচ্ছ হুকুম চালাচ্ছে সকলের ওপর এবং সংসারের খরচপত্র করছে—তখন নাকি উচ্ছ্বাসের বশে আলমারী সিন্দুকের চাবিও তার হাতে তুলে দিয়েছিল হরেন। হয়ত ঠিক উচ্ছ্বাসেও নয়—মদের ঝোঁকেই দিয়ে থাকবে—তারপর ভুলে গিয়েছিল কিম্বা আর ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন মনে করে নি। সে যাই হোক, ঝিটি সে সুযোগের সম্ব্যবহার করতে দ্বিধা করে নি, স্বর্ণর সমস্ত গহনা এবং নগদ হাজার দুই টাকা নিয়ে সে একদিন সরে পড়েছে—সঙ্গে নিয়ে গেছে জীবেনদের নতুন ছোকরা চাকরটিকে। ছেলেটা ফুট-ফুটে দেখতে, মাত্র আঠার উনিশ বছর বয়স তার। ঝিয়ের থেকে বয়সে অনেক ছোট। সম্ভবতঃ টাকার লোভ দেখিয়েই তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

হরেন তার এই নতুন গৃহিণীকে ভালবেসেছিল কিনা কে জানে, তবে তাকে বিশ্বাস করেছিল অনেকখানি—এটা ঠিক। এই ঘটনায় তাই আর্থিক ক্ষতির চেয়ে সম্ভবত অপরাধবোধটাই বেজেছিল, আত্মাভিমান যা লেগেছিল। এই শ্রেণীর লোকদের বুদ্ধির অভিমানটাই প্রবল হয়, সেই অভিমানে আঘাত লাগলে মর্মান্তিক বাজে।...কারণ যাই হোক, এই নিরুদ্দেশের ঠিক দুটি দিন পরেই তার একটা 'স্ট্রোক' হ'ল। কোন বিলিতী হোটেলে একা বসে বসে মদ খাচ্ছিল, সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। প্রথমটা মাতাল অবস্থা ভেবে নাকি তারাও অতটা খেয়াল করে নি, ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেছে। শেষে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়াতে ভয় পেয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাইতেই তবু রক্ষা, বাড়িতে পাঠালে কেউ ডাক্তার ডাকত কিনা সন্দেহ, এমনই সকলে বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

হাসপাতালে অনেক চেষ্টায় জ্ঞান যদি বা হয়েছে, পক্ষাঘাতের ভাবটা এখনও যায় নি। সমস্ত বাঁ দিকটা অনড় অসাড় হয়ে আছে। কথাও কইতে পারছে না ভাল করে—কথা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে, খুব মন দিয়ে না শুনলে বুঝতে অসুবিধা হয়। বাড়িতে নিয়ে এসেছে এখন, জীবেনই দেখাশুনো করছে, চিকিৎসাও চলছে—তবে ডাক্তাররা আশা-ভরসা খুব একটা দিতে পারছেন না। তাঁরা আশঙ্কা করছেন,

এই অবস্থাই এখন চলবে দীর্ঘকাল। তাও কোনদিনই একেবারে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ।...

স্যানাটোরিয়ামের মধ্যে নয়, বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে একটা পাহাড়ে-পথের ধারে ঝরা পাইন পাতার ওপর বসে শুনছিল খবরটা। সেটা অপরাহ্নকাল, সামনের পাহাড়-গুলোর তলায় তলায় ইতিমধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, বহু নিচে নদীর রজত-রেখাটা পর্যন্ত অস্পষ্ট ঝাপ্সা হয়ে এসেছে অনেকখানি। কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না স্বর্ণর, সে চেয়ে ছিল সামনের বড় পাহাড়টার চূড়োয় তখনও যে সূর্যরশ্মি-টুকু লেগে আছে—তারই দিকে। একফালি একটু রোদ একেবারে সেই চূড়োরও মাথাটায়——আর নিচে অতল গভীর রহস্যময় অন্ধকার। অন্ধকারটাকে মনে হচ্ছে তরল কোন পদার্থ, নিচে থেকে পাত্র ভরে ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠছে।

আজ প্রথম মনে হ'ল ওর, সন্ধ্যা ওপর থেকে নামে না, নিচে থেকে ওঠে। দিনের বেলা যেন সে ঐ নিচেকার গহন অরণ্যের ঝোপে ঝাড়ে ছায়ায় আত্মগোপন করে থাকে, দিনের দৃষ্টি সরে গেলেই একটু একটু করে মাথা তোলে, ভরসা পেয়ে ওপরে উঠে আসে। তা হোক, তবু সে নিচেরই জিনিস, সে সব সৌন্দর্যকে বিলুপ্ত করতে পারে, একাকার করতে পারে.—তার সৌন্দর্যসৃষ্টির কোন ক্ষমতা নেই. তার কোন নিজস্ব রূপ নেই। যেটুকু দিনের আভাস এখনও প্রকাশিত রয়েছে ঐ সুদূর শিখর-চূড়ায়, তা যেমন মনোহর, তেমনি মহিমাময়। এতদূর থেকেও যেন ওর প্রতিটি পত্র-পল্লবের ঝলমলানি দেখা যাচ্ছে, তাদের শাখাপ্রশাখার ছায়া আলাদা আলাদা বেছে নেওয়া যাচ্ছে।...

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল স্বর্ণ। স্বামী সাংঘাতিক অসুস্থ, হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রী—না হ'লেও চিরদিনের মতো পঙ্গু পরপ্রত্যাশী হয়ে থাকবে। ব্যথা পাবারই কথা, ব্যথা পেলও সে প্রথমটা। ওর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল তীব্র ব্যথার। বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠেছিল যেন, ইচ্ছে হয়েছিল পাখা মেলে সেই মুহূর্তে উড়ে চলে যেতে স্বামীর বিছানার পাশে। আহা, কে-ই বা তার সেবা করছে, কে-ই বা মুখে জল দিচ্ছে! উঠে বসা স্নান করা তো দূরের কথা—নিজে নিজে কিছু খাওয়ারও শক্তি নেই। প্রাকৃতিক কাজগুলোর জন্যে পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে হয়েছে, হয়ত তার জন্যে মুখনাড়া খাচ্ছে কত লোকের। তাও হয়ত শেষ অবধি কেউ করছে না ঠিক সময়ে—ময়লা মেখে পড়ে থাকতে হচ্ছে। মেয়ে করছে অবশ্য, রেবা অনেকটা ওর মতোই হয়েছে—কিন্তু তার কীই বা বয়স, সে কি গুছিয়ে করতে পারছে রুগীর সব কন্না! শুয়ে থেকে থেকে যদি হরেনেরও তার মায়ের মতো শয্যাক্ষত হয়ে যায়! বাপ্ রে, সে অবস্থা ভাবলেই যে বুকের মধ্যেটা হাহা-কার ক'রে ওঠে!...

কিন্তু সে ঐ প্রথম কিছুক্ষণই।

তারপরই একটা বিরাট ঔদাসীন্য বোধ করল ও। এমন কখনও বোধ করে নি এর আগে করবে তা কখনও ভাবে নি, নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল খানিকটা পরে।

মনে হ'ল ওর কী মাথাব্যথা? ও-ই তো মরতে বসেছিল, এখনও সে আশঙ্কা একেবারে দূর হয়ে গেছে কিনা কে জানে, হয়ত এখনও সে মৃত্যু একেবারে ওকে ছেড়ে যায় নি, ওর দেহের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে! যেদিন একে-বারে প্রত্যক্ষ মরণের সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন ওর দিকেই বা কে তাকিয়েছিল? নিষ্করুণ অবহেলায় নির্মম ঔদাসীন্যে শুধু নয়—মর্মান্তিক আগ্র

হের সঙ্গেই সেদিন ওকে বিদায় দিয়েছিল ওর আপনজনেরা। ওকে সরাতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল যেন।...না, সংসার থেকে বিদায়ই নিয়ে এসেছে সে; সংসারও তাকে বিদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে আবার কেন? স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, এমন কি ওর ছেলেমেয়ে—সবই যেন কোন সুদূর পূর্বজন্মের কথা। এজন্মে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এ ওর নবজন্ম। সে জন্মের ঋণ সে শোধ দিয়েছে সংসারকে —কড়ায় ক্রান্তিতে। দেহপাত করে বুকের রক্ত দিয়ে—বলতে গেলে সমস্ত জীবন দিয়েই। এখন এ জন্মের ঋণটার কথাই ভাববে সে।

সে ঋণ তার সামনে বসা এই লোকটার কাছে। সাধারণ ঋণ নয়—যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার ঋণ, একাগ্র মৃত্যুজয়ী ভালবাসার ঋণ। শুধু পয়সা দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে নয়, করুণা বা অবহেলায় নয়—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, যেন যথা-সর্বস্ব পণ ক'রে লোকটা লড়াই করেছে যমের সঙ্গে, স্বর্ণর ভাগ্যদেবতার সঙ্গে। এমন নিখুঁত যত্ন এমন আন্তরিকতা কখনও দেখে নি সে, আর কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। প্রতিটি সত্তা সজাগ রেখে তার কথা ভেবেছে যেন লোকটা! শুধু তার কথাই ভেবেছে, আর কিছু নয়। অথচ কীই বা তার মূল্য, ওর কাছে সে কতটুকু। রূপবান কান্তি-মান, বিত্তশালী ঐ লোকটা ইচ্ছা করলে রাশিরাশি সুন্দর মেয়ে দুপায়ে জড়ো করাতে পারে—সে জায়গায় স্বর্ণ তো কীটাণুকীট। তবুও তাকেই সর্বাগ্রগণ্য করে রেখেছে সারা জীবন, আজও সে-ই তার কাছে সর্বাধিক।

না, স্বর্ণও আর কারও কথা ভাববে না, ওর কথা ছাড়া।...

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল সে, 'তুমি অন্য কোন কথা বলো অরুণদা। ওসব কথা ভাল লাগছে না। শুনে লাভই বা কি, যে কাঠ খাবে সে আঙরা বমি করবে, এ তো জানা কথা। তার জন্যে কে কী করবে আর।'

অরুণ চমকে উঠল যেন। স্বর্ণর কাছ থেকে এ উত্তর আশা করে নি আদৌ। ওর প্রাণ মমতায় ভরা, সকলের জন্যেই ওর টান—এই জানত সে। সেও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'অন্য কথা আর কি বলো! এবার তো ফেরার কথা। পরশু সোমবারের পরের সোমবার ভাল দিন আছে, সেদিন গাড়িরও ব্যবস্থা করতে পারব, সেইদিনই যাব ভাবছি। ওদিকে ট্রেনেও ঐদিন রিজার্ভ ক'রে রাখবার কথা বলে এসেছি আমার বন্ধু আর-টি-ও বচ্চন সিংকে। করে রাখবে নিশ্চয়।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে, এখান থেকে?'

খুব শান্ত, খুব সহজভাবে প্রশ্ন করে স্বর্ণ।

আবারও চমকে ওঠে অরুণ। রীতিমতো থতমত খেয়ে যায়। এবিষয়ে যে কোন প্রশ্ন কি দ্বিধার অবকাশ আছে—তা জানা ছিল না তার একেবারেই। সে হতভম্বের মতো খানিকটা তাকিয়ে থাকে স্বর্ণর মুখের দিকে, তারপর আমতা আমতা করে বলে, 'কেন—বাড়ি?...মানে, বাড়ি ফিরবে তো এবার?'

'বাড়ি!' একবার মাত্র শব্দটা উচ্চারণ করে চুপ করে যায় স্বর্ণ আবার। তার-পর তার কটা চোখের স্থিরদৃষ্টি অরুণের চোখের ওপর রেখে আগের মতোই শান্ত সুরে বলে, 'আগে বোকা ছিলুম বলে বুঝতে পারি নি—এখনও বোকা, তবু মোটা কথাগুলো বুঝতে পারি। আমার জন্যেই তুমি জীবনটা মাটি করলে—এখনও আমার জন্যে জীবনপাত করছ। তুমি আমাকে ভালবাসো—সেটা লুকিও না। আমি জানি, এখন পরিষ্কার সব দেখতে পাই। তুমিই আমাকে ভালবাসো শুধু এ পৃথিবীতে —আন্তিক ভালবাসা—এমন ভাল কেউ আমাকে বাসে নি! কেউ কোনদিন এমন ভাবে আমার কথা ভাবে নি তোমার মতো। আমিও আর কারও কথা ভাবব না। কেন

ভাবব, সে আমি তো মরেই গেছি। আমাকে মরা বাঁচিয়েছ তুমি, এখন তোমারই ষোল আনা জোর।...বাড়ি বলো ঘর বলো—আমার কাছে সবই এখন তুমি।...তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চলো। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার ঝিগিরি করলেও আমার সুখ। আর ঘর করতে চাও—সে আমার ভাগ্যি বলে মানব।'

শুনতে শুনতেই বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল অরুণের মুখ, এখন এই সায়াহ্ন-বেলার পাহাড়ী শীতেও তার ললাটের কোলে কোলে ঘাম দেখা দিল। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার—কাঁপছে বুকের মধ্যেও। সে বার-দুই মুখ খুলতে চেষ্টা করল কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না গলা দিয়ে।

কী বলবে তাও বোধহয় বুঝতে পারল না। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা, এ অকল্পিত সৌভাগ্যে তার বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই। এ কি সত্যিই স্বর্ণ বলছে কথাগুলো—না আর কেউ? না কি তার এতদিনের নিভৃত স্বপ্নই ভুল শোনাচ্ছে তাকে—তার নিজের কলুষিত কামনা?...মাথার মধ্যে এমন ক'রে সব তালগোল পাকাচ্ছে কেন? বুকের মধ্যেই বা কিসের ঢেউ এসব? সে কি এবার পাগল হয়ে যাবে নাকি?...

'কী হ'ল, কথা কইছ না যে? বাক্যি হরে গেল নাকি তোমার? নাকি আমার সঙ্গে ঘর করতেই সাহসে কুলোচ্ছে না? রোগটা এখনও সারে নি ভাবছ?...বেশ তো বাপু, না হয় তোমার ঘরে ঢুকব না, কাছে যাব না, দূরে থেকেই সেবা করব। তোমার কাছে—তোমার বাড়িতে থাকতে পারলেই আমার ঢের।'

না, ভুল হয় নি তার কিছুমাত্র। ঠিকই শুনেছে অরুণ। জীবন ধন্য হয়ে গেছে তার। আশার অতীত সিদ্ধি মিলেছে, এ জন্মের সাধনা শেষ হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

এবার কথা বলতে পারল সে। তার মানসিক অবস্থার পক্ষে আশ্চর্যরকম শান্ত-ভাবেই বলল, 'তোমার অসুখের ভয় আমার একটুও নেই স্বর্ণ।...অসুখ তোমার সেরে গেছে—ডাক্তাররা সমস্ত রকম পরীক্ষা করে দেখেছেন।...আর না সারলেও সে ভয় আমার নেই, কোনদিনই ছিল না। তোমাকে পেয়ে, তোমার জন্যে মরেও আমার সুখ। ...সে কথা নয়, আমি ভাবছি তোমার কথাই!'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না আর। দোহাই তোমার!...এবার একটু নিজের কথাটা ভাবো দিকি!'

'কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আর কোন কথাই যে নেই ভাববার মতো।...তুমি যা দিতে চাইছ—একদিনের জন্যেও যদি তা সম্ভব হ'ত—তা হ'লে আর কোন দুঃখ থাকত না আমার জীবনে, সেই মুহূর্তে মরে গেলেও আমার সুখ ছিল। কিন্তু তোমার এতটুকু দুঃখের কারণ ঘটিয়ে স্বর্গসুখও আমার বিষ লাগবে যে!'

'আমার দুঃখটা তুমি আবার এর মধ্যে কোথায় দেখলে তাই শুনি! এ তো আমি স্বেচ্ছাসুখে যেতে চাইছি তোমার সঙ্গে। বাড়ির কথা বলছ—আমার আবার বাড়ি কোথায়? ও বাড়ি তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়ে বেঁচেছে। তারা তো আমাকে চায় নি—অসুখটা হ'তে শিঁটিয়ে ছিল সবাই। সকলে নিজের কথা ভেবেছে, আমার কথাটা কেউ ভেবেছে কি? এক তুমিই ভেবেছ! ওদের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি?...তাছাড়া যার জন্যে বাড়ি—তার সঙ্গেই তো সম্পর্ক ঘুচে গেছে! তার নাম শুনলে এই গলা অবদি বিষে তেতো হয়ে যায় সবটা।...না, ও বাড়িতে আর আমি যাবো না!'

'কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে? তাদের কথাটা ভাবছ না কেন?'

প্রশ্নটা করে শান্তভাবেই—কিন্তু সমস্ত প্রাণটা যেন তার ঔৎসুক্যে আগ্রহে—কী একটা ঐকান্তিক আশায় তার ঠোঁটের কাছে এসে অপেক্ষা করতে থাকে প্রশ্নের

সঙ্গে সঙ্গে।

'ছেলেমেয়ে!'

একমুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায় যেন স্বর্ণ। আর সেই মুহূর্তকালের নীরবতা-তেই নিজের বিপুল আশা ও অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুদণ্ড শুনতে পায় তার সামনের ঐ লোকটি। আর কিছু শুনতে চায় না অরুণ, আর কিছু শোনবার প্রয়োজনও থাকে না। তার উত্তর সে পেয়ে গেছে।

কিন্তু স্বর্ণ তখনই আবার কথা শুরু করে, কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়েই যেন বলে, 'ছেলেমেয়েও তো তার। আমার দাদামশাই বলতেন, বংশ তো নয় বেউড় বাঁশের ঝাড়। বেউড় বাঁশের ঝাড়ে বেউড় বাঁশই ফলে। বেইমানের ঝাড়ের কথা ভেবে আমার ইহকাল পরকাল খোয়াতে গেলুম কী দুঃখে? ওদের কথা আর আমি ভাবব না। এই কমাসে ভুলেই তো গেছি, আর কেন?...আমি মরে গেলেও যা হ'ত এখনও তাই হবে। বড় হবেই একরকম ক'রে। যাদের ঝাড় তারাই দেখবে। আমি গেলেই কি আর মানুষ করতে পারব?'

'তা হয় না স্বর্ণ!' বুকের সে ঢেউ-ওঠা বন্ধ হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের বাদ-শাহী ঘুচে গেছে চিরকালের মতো। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে যে আশাটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে এখন ঠাণ্ডা মাটির নিচে সমাধিস্থ। সহজ স্বাভাবিক সুবুদ্ধি, দূর-দৃষ্টির পথ অবারিত হয়েছে আবার মাথার মধ্যে। তাই বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই কথাগুলো বলতে পারল অরুণ, 'তা হয় না স্বর্ণ। তোমার ছেলেমেয়ে তোমারই। যে ঝাড়ই হোক তোমারই রক্তমাংসে দিয়ে তৈরী তারা। তাদের কথা আজ না ভাবো—দুদিন পরে ভাবতেই হবে। তাদের ভোলা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। দায়িত্বও অত সহজে এড়াতে পারবে না!'

'আমি ম'লে—তাদের কী হ'ত? তারা কি বাঁচত না—না বড় হ'ত না?

'বড়ও হ'ত—বাঁচতও। কিন্তু তুমি ম'লে তাদের মাথা হেঁট হ'ত না, চিরদিনের মতো একটা লজ্জা একটা কলঙ্কের বোঝা চাপত না।...ছেলেমেয়েদের এত বড় সর্ব-নাশ আর নেই; মায়ের নাম মুখ উঁচু ক'রে যদি না বলতে পারে—তাহলে জীবনটাই তাদের মাটি হয়ে যাবে। নিজের সন্তানরা চিরকাল অভিসম্পাত করতে থাকবে—এ কি তুমি সইতে পারবে? আর সে শাস্তি কেনই বা দেবে তুমি তাদের, তারা তো এখনও পর্যন্ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করে নি। তুমি ম'লে তোমার স্মৃতি তারা পুজো করত, অন্তত করবার চেষ্টা করত, তোমার নামটার সঙ্গে হয়ত একটা ব্যথাও জড়ানো থাকত তাদের মনে—কিন্তু এতে তো তোমাকে শুধু ঘেন্নাই করবে তারা। সে তুমি কি সইতে পারবে? আজকের এই অভিমানের মিথ্যে পর্দাটা যখন থাকবে না তখন তুমিই সেখানে ফিরে যাবার জন্যে মাথা কুটবে, অথচ সে পথ তখন বন্ধ হয়ে যাবে তোমার কাছে চিরকালের মতো। ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো কথাটা।'

'সে যা-ই হোক, 'তোমার মুখ চেয়ে সব সইতে পারব।'

পাগলের মতো একটা ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলে কথাগুলো। বলতে বলতেই তার দুচোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে ওঠে।

'কিন্তু আমি কার মুখ চেয়ে তোমার সে দুঃখ সইব বলো। তোমার মুখ চেয়েই তো আমি আছি। তোমার সুখেই আমার সুখ। তাছাড়া তুমিও সে পারবে না। আমার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাবোধ এখন বলছ কথাগুলো—কিন্তু এ সাময়িক। সন্তানের সঙ্গে যোগ চিরকালের—নাড়ির, আত্মার। সে অত সহজে অস্বীকার করা যায় না।... যখন সে ব্যথা জাগবে মনে, অথচ যখন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার পথ থাকবে

না, তখন আমিও তোমার কাছে বিষ ঠেকব।...এ-কূল ও-কূল দুকূলই যাবে তোমার।'

'তাহলে—তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না—তুমি, তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে!'

আর্তনাদের মতো শোনায় প্রশ্নটা, হাহাকারের মতো মনে হয়।

আর সে হাহাকার উচ্চতর হাহাকারেরই সৃষ্টি করে শ্রোতার মনে, সে আর্তনাদ ব্যাকুলতার প্রতিধ্বনি তোলে। স্বর্ণর এ হাহাকার সাময়িক কিন্তু ওর মনের এ হাহাকার বুঝি কোনদিনই শান্ত হবে না।

বর্তমানের লোভ বড় বেশী। মনে হয় এই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা শুধুই মূঢ়তা। দূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের এ স্বর্গ হারানোর কোন অর্থ নেই। তবু বিচলিত হয় না অরুণ, লোভ জয়ই করে। কারণ ভবিষ্যৎটা সুদূর হ'লেও স্পষ্ট—অন্তত তার কাছে। সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে উত্তর দেয়, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করি নি স্বর্ণ, তোমাকে ত্যাগ করা মানে ইহজন্মই ত্যাগ করা। কিন্তু আমি জানি, তুমি এখন যেটা ভাবছ দুদিন পরে সেটা ভাববে না, আজকের এ ঝোঁক যখন কেটে যাবে তখন আমাকেই তুমি দুষবে। অভিমানের কুয়াশাটা কেটে গেলে নিজের মনের চেহারাটা তুমি দেখতে পেতে, যেটা আমি পাচ্ছি। তাই এত বড় সৌভাগ্য মেনে নিতে ভয় পাচ্ছি, এ দুর্লভ বরও মাথা পেতে নিতে পারছি না।... তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও স্বর্ণ, আমি জানি শুধু ছেলেমেয়ে নয়—স্বামীর টানও তোমার কম নেই। হরেনবাবু তোমারই মুখ চেয়ে আছেন—তাঁর সেবা তোমাকেই করতে হবে। কর্তব্য বলে নয়—তুমি চাও বলেই। স্বামীর প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রতি সব কর্তব্য শেষ ক'রে—ছেলের বৌ যেদিন অপমান করবে, সেদিন সব দেনা-পাওনা শোধ ক'রে আমার কাছে চলে এসো। ততদিন পর্যন্ত এমনি আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষা করব।'

'ততদিন যদি বাঁচি—তবে তো। বাঁচলেও সে তো বুড়ি হয়ে যাবার কথা। তুমিও তো বুড়ো হয়ে যাবে!'

'হোক না। তখনই আমাদের বেশী দরকার হবে পরস্পরকে। দুজনে কোন তীর্থে চলে যাবো। তখন তো আর কোন কলঙ্কের ভয় থাকবে না!'

চুপ ক'রে যায় স্বর্ণ। কিন্তু তার দুটি চোখের কোল বেয়ে কূল ছাপিয়ে অজস্র জল ঝরে পড়তে থাকে ধারায় ধারায়। মনে হয় তার এ কান্নার বুঝি শেষ হবে না। সে দিক থেকে প্রাণপণে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে অরুণ।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বলে স্বর্ণ, প্রায় চুপি চুপিই বলে—যেন কতকটা নিজেকে শুনিয়েই, 'কিন্তু সেখানে গিয়ে কি আর টিকতে পারব? মনের অগোচর পাপ নেই—তোমার কাছে লুকোতেও পারব না—আমিও যে তোমাকে এ কমাসে ভালবেসে ফেলেছি অরুণদা। মানুষকে ভালবাসলে ভোলা যায়—দেবতাকে ভালবাসলে সে ভালবাসা আর ফেরানো যায় না। তুমি দেবতা—তোমাকে যে মন দিয়েছি সে মন যে তোমারই সঙ্গে থাকবে। সেখানে গিয়ে যদি তোমার কথাই ভাবি —পাপ হবে না? তুমিই বলে দাও না, কী ক'রে থাকব সেখানে?'

'হয়ত পাপ হবে, হয়ত কষ্ট হবে—তবু আমার জন্যে না হয় সেটা সইলেই, আমার ঘরে এলে আরও বেশী পাপ হ'ত, আরও বেশী কষ্ট হ'ত।...আমার মন তো এতকাল ধরে তোমার কাছে পড়ে রয়েছে, তাতেও তো আমি কাজকর্ম সব ক'রে গেছি। দেবতা আমি নই স্বর্ণ, মানুষই। মানুষ বলেই—এইমাত্র যে কথাটা বললে অমতে আমার মন ভরে গেছে, আমার এতদিনের ভালবাসা সার্থক হয়েছে। নাই বা পেলুম

তোমার রক্তমাংসের ঐ শরীরটাকে, সে আশা তো করিও নি কখনও—তোমার মনটা যদি পেয়ে থাকি সে-ই আমার বড় লাভ। তুমি আমাকে সুখী করেছ—এই জোরেই তুমি সংসারে থাকতে পারবে। আমি তোমাকে অহরহ সেই আশীর্বাদই করব আজ থেকে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে পাহাড়ের শিখরেও। অন্ধকারে সব যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়, আর কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট ক'রে। আকাশের তারাগুলো জ্বলে শুধু মাথার ওপরে, তারই একটা অস্পষ্ট আভা এসে পড়ে ওদের মুখেচোখে।

পকেট থেকে টর্চটা বার ক'রে অরুণ বলে, 'চলো এবার ফিরি। দেরি হয়ে গেছে—হাসপাতালের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত। তোমারও ঠাণ্ডা লাগছে।'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্যামাই পেড়েছিলেন কথাটা। নইলে কারও মাথাতেই যেত না হয়ত। বলাইয়ের নিজেরও না। তিনিই একে-ওকে বলে মেয়ে ঠিক করেছিলেন। পাড়ারই মেয়ে বলতে গেলে। এ পাড়াতে নতুন এসেছে ওরা। বাড়ি করে উঠে এসেছে নিব্‌ড়ের দিক থেকে। মেয়েটাও একেবারে ফেলনা নয়, পরিপূর্ণ সংসার ওদের, পাঁচ ভাইয়ের বোন। তার মধ্যে তিন ভাই-ই—সামান্য সামান্য হ'লেও—রোজগার করে। মেয়েও শ্যামবর্ণের ওপর মন্দ দেখতে নয়, তেরো-চোদ্দ বছর বয়স, বলাইয়ের সঙ্গে মানাবেও দিব্যি।

এ-সম্বন্ধ পেয়ে খুশীই হয়েছিলেন তিনি। ছোট মেয়ে, সহজে পোষ মানবে—নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারবেন। আরও ভেবেছিলেন—যার কোন আয়ই নেই, এক পয়সা রোজগার করে না, সে অন্তত তেজ দেখিয়ে বৌকে নিয়ে আলাদা হ'তে পারবে না।

বেশ ভেবেচিন্তে হিসেব করেই এ কাজে এগিয়েছিলেন। মেয়ে তারা সহজে দিতে চায় নি। জরদ্গব মূর্খ ছেলে, তার হাতে তাদের একটা বোন—তুলে দিতে যাবে কোন দুঃখে? শ্যামাই সেখানে বসে পাঁচজনকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন, বিয়ে হ'লেই তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব বলাইয়ের নামে উইল করে দেবেন। বাড়ি তাঁর—ইচ্ছে হ'লে ওরা দলিল দেখে আসতে পারে—তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে কেনা। সুতরাং যথেচ্ছ দান-বিক্রয়ের অধিকার তাঁর আছে।

পাড়াতে এসে পর্যন্তই কঞ্জুষ সুদখোর বুড়ির ঐশ্বর্যের সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী শুনেছে তারা! এও শুনেছে যে ঐ মা-বাপ-মরা নাতিকে তিনিই বুকে করে মানুষ করেছেন। সুতরাং ওকে যথাসর্বস্ব দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ছেলের পৈতৃক বাড়ি-ঘরও আছে—বিনা মেরামতে বাড়িটা ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু বাগান-পুকুর-জমি কোথায় যাবে! সব দিক বিবেচনা করে তারা রাজী হয়ে গিয়েছিল।

বিয়েও কতকটা বিয়ের মতোই হয়েছিল। হেম-কনকরাও এসেছিল। দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে গেছে। তাদেরও পীড়িত বিবেক সান্ত্বনা লাভ করেছিল। মা একা থাকেন—তাদের যখন কারও এসে থাকবার উপায় নেই-ই—তখন এছাড়া আর পথ

কি? তাছাড়া—তারা ভেবেছিল—ঘাড়ে চাপ পড়লে যাহোক একটা রোজগারের চেষ্টাও করবে।

শ্যামাই খুশী হয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী।

কিন্তু বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোহ ভঙ্গ হ'ল তাঁর। বৌ ছেলেমানুষ কিন্তু মনের মতো করে গড়ে নেবার মতো মানুষ নয়। যেমন জেদ তার তেমনই তেজ। বিয়ের আটটা দিন কোনমতে মুখ বুজে ছিল, মাসখানেক পরে ঘর করতে এসেই নিজ মূর্তি ধরল। প্রথম দিন বাসন মাজার কথা বলতেই সোজাসুজি বলে দিল, 'বাসন-টাসন মাজতে পারব না আমি, ওসব আমার অব্যেস নেই, হাতে লাগে।'

অগত্যা তাকে রান্নাঘরে লাগালেন শ্যামা। কিন্তু সেখানেও হুলস্থূল বেধে গেল। পাঁচ ছটাক তেলে পনেরো দিন রান্না হয় তাঁর—মালতী এক বেলাতেই তার অর্ধেক খরচ করে ফেলল। তাছাড়াও ফেলে-ছড়িয়ে একাকার কাণ্ড। শ্যামা ঠাকরুন ব্যাপার দেখে বকে চেঁচিয়ে কেঁদে-কেটে হাট বসিয়ে ফেললেন একেবারে। মালতী কিন্তু গ্রাহ্যও করল না। বরং বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিল, 'ওসব ডেয়ো-ডোকলার মতো রান্না আমার দ্বারা পোষাবে না। যে পারে সে করুক!'

পরের দিন রান্নায় না দিয়ে অন্য কাজে টানবার চেষ্টা করলেন শ্যামা, 'নাৎবৌ একবার আমার সঙ্গে বাগানে চল্ তো ভাই, হাতাপিতি করে পাতাগুলো কুড়িয়ে আনি।'

কিন্তু প্রস্তাব মাত্র বেঁকে দাঁড়াল নাৎবৌ, 'কেন, আমরা কি ভিখিরী যে পাতা কুড়িয়ে খেতে হবে? ঘরে দালানে গুচ্ছের পাতা রয়েছে সাপ-বিছের বাসা হয়ে··· ঐগুলোই বরং লোক ডাকিয়ে ফেলিয়ে দিন!'

আরও খানিকটা চেঁচামেচি করলেন ওর দিদিশাশুড়ী, কিন্তু মালতী গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ও'র অনুযোগ অভিযোগ বকুনির কোন জবাব দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করল না।

তবু খুব সহজে হাল ছাড়েন নি শ্যামা। আর দুদিন থাক, যখন বুঝবে যে এই ঘর করা ছাড়া গতি নেই তখন আপনিই ঠাণ্ডা হবে—ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। মিষ্টি কথায় আদর করে কাছে টানবারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুদিন না যেতেই জ্ঞান-নেত্র তাঁর ভাল করে উন্মীলিত হ'ল। বুঝলেন এ-মেয়ে সেই ভবীদেরই একজন, যাকে কোন পরিমাণ তেলসিঁদুরেই ভোলানো যায় না। বসে বসেই খাচ্ছে এসে পর্যন্ত। কিন্তু তাতেও সে তুষ্ট নয়। সে শুধু বসে খেতেই চায় না, ভাল খেতেও চায়। দু-একদিন সামান্য সামান্য নাক-তোলার পর একদিন সটান ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'রোজ রোজ এই থোড়সড়সাড়ি আর শুষ্নি শাকের ঝোল দিয়ে খেতে পারব না আমি। রাত্তিরেও শুকনো কড়কড়ি ভাত খাওয়া আমার পোষাবে না, এই সাফ্ বলে দিলুম।'

'ইঃ'—কণ্ঠে একটা বিচিত্র সুর বার করেন শ্যামা, তাঁর আর সহ্য হয় না, 'খেতে পারব না! নবাবনন্দিনী এলেন একেবারে! তোর দাদারা কটা মাছের মুড়ো রোজ খাওয়াত শুনি!'

'মুড়ো না খাওয়াক—ডাল তরকারী তো দিত। আর অমন ঠাণ্ডা কড়কড়ি ভাতও খেতে হ'ত না।'

'যা যা—তাই খেগে যা সেখানে। আমার কাছে ওসব নবাবী চলবে না।'

'কেন যাব! বসিয়ে খাওয়াবে বলে কি তারা বিয়ে দিয়েছে। তোমরা আমাকে খাওয়াতে বাধ্য!'

'খাওয়াতে হবে বলে কি কালিয়া-পোলাও খাওয়াতে হবে নাকি! যা জুটবে তাই খাওয়াব!'

'যা জোটে তাও তো খাওয়াও না। ছিষ্টি বেচে দাও কেন! বাড়িতে যা হয় তাও তো রাঁধতে পারো। অত পয়সার আহিক্কে কেন! এত পয়সা কে খাবে তোমার। কার জন্যে তাংড়াও? ম'লে তো আমরাই খাব, না হয় জ্যান্তেই খেলুম কিছু!'

শ্যামা এবার ক্ষেপে যান একেবারে, 'য়্যাঁ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বসে বসে আমার মরণ টাঁকছ হারামজাদী!...এক পয়সা দোব না তোদের। পথের ভিখারীকে দিয়ে যাব তবু তোদের দোব না!'

'ইস! দেবে না বৈকি! সকলের সামনে সত্যি করেছিলে মনে নেই? পাঁচ ভাইয়ের বোন আমি, তাদের সঙ্গে চালাকি করেছ শুনলে তারা তোমাকে জ্যান্তে পুঁতবে এই বলে দিলুম। টাকা পাব বলেই তো তোমার ঐ মুখ্খু নাতির হাতে দিয়েছে—নইলে এই পাত্তরে কেউ মেয়ে দেয়!'

এরপর শ্যামা যা কাণ্ড করেন তা ঐন্দ্রিলাকেও হার মানিয়ে দেয়। মালতীও দমবার মেয়ে নয়—ভাতসুদ্ধ থালা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে যায় সে। ফলে শ্যামা আরও চিৎকার করতে থাকেন, মাথা খোঁড়েন, ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেন। কিন্তু তাতে মালতীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সে সারাদিন না খেয়ে পড়ে থাকে, রাত্রে বলাই কাছে টানতে গেলে তাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়।

ফলে বলাইয়েরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। সে. মানসিক গঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে, জন্তুর মতোই বড় হয়ে উঠেছে শুধু। জৈব প্রবৃত্তিগুলো সেই ছাঁচেই ঢালা। বেশীক্ষণ মিনতি করা তার ধাতে পোষাল না, সে ঠাঁই ঠাঁই করে গোটাকতক চড় কষিয়ে দিল মালতীকে। মালতীও তার হাতের ওপরে প্রচণ্ড এক কামড় দিয়ে রক্ত বার করে দিল, তারপর ঘরের এবং বাড়ির দোর খুলে সেই অন্ধকার রাত্রেই একছুটে বাপের বাড়ি চলে গেল।

ওর দাদারা অবশ্য তিরস্কার করল খুব। বলল, 'এতগুলো টাকা, বুড়ি আর কদিন, কটা মাস মানিয়ে চলতে পারলি না?

দুষ্টু ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে মালতী বলল, 'অমন পয়সার মুখে আগুন! না খেয়ে যদি মরেই গেলুম তো পয়সা ভোগ করবে কে?'

পরের দিনই সকালে ওর বড়দা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চাইলেন, বুঝিয়ে বলতে গেলেন ওর ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু মালতী বলল, 'আমি আজই তাহ'লে ওদের ঐ পুকুরের জলে ডুবে মরব—মরব মরব মরব, এই তিন সত্যি করলুম। পুবের সুয্যি পশ্চিমে উঠলেও আমার কথার নড়চড় হবে না।'

অগত্যা তাঁকে নিরস্ত হ'তে হ'ল।...

কথাটা শ্যামার কানে উঠতে তিনি বললেন, 'ভালই হ'ল আমাকে আর খ্যাংরা মেরে তাড়াতে হ'ল না।...এক মাসের মধ্যে যদি নাতির আর একটা বিয়ে না দিই তো কি বলেছি!'

কিন্তু বলাই সেই এক মাসের ভরসাতেও থাকতে পারল না। যে বাঘ নররক্তের স্বাদ পেয়েছে, বেশীদিন নররক্ত না পেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওর কর্মহীন জীবনে —পশুধর্মের তাগিদটাই সর্বপেক্ষা প্রবল। সে কোনমতে পাঁচ-ছটা দিন কাটাবার পর আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। দিদিমাকে না জানিয়েই সোজা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

শালাদের তরফ থেকে অবশ্যই অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হ'ল না কিন্তু মালতী কঠিন হয়ে রইল। তার এক প্রতিজ্ঞা, বলাই যদি ও-বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করে, মানুষের মতো নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে—তবেই মালতী তার ঘর করবে, নইলে এইখানেই ইতি।

বলাই অবাক হয়ে গেল প্রথমটায়। ওর সম্বন্ধে এ আশা কেউ করে তা ওর ধারণার অগোচর। সে অনেক অনুনয় বিনয় করল, পায়ে হাতে ধরতে গেল—কিন্তু মালতী ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতোই অনমনীয় কঠিন হয়ে রইল। শেষে বলাই বলল, 'আমাকে কে কাজ দেবে? আমি তো কিছুই জানি না।'

'সে আমরা বুঝব। তুমি রাজী আছ কি-না তাই বলো।'

রাজী না হয়ে বলাইয়ের উপায় ছিল না।

মালতী তাকে পৈতে হাতে নিয়ে দিব্যি গালিয়ে তবে ছাড়ল। বলাই আর সেদিন ও-বাড়ি ফিরল না। পরের দিনও না—আর কোনদিনই না। শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করতে লাগল পাকাপাকি ভাবে।

শ্যামা প্রথম দিনটা একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। যে কখনও বাড়ি ছেড়ে বাগানে পর্যন্ত বেরোয় না, তার এ অন্তর্ধান চিন্তার কথা বৈকি!

কিন্তু সারারাত জেগে বসে থাকার পর ভোরবেলা যখন খবর পেলেন (একই পাড়ায় দুই বাড়ি—খবর পাওয়ার বিশেষ কোন অসুবিধা নেই) যে বলাই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠেছে এবং সেখানেই রাত্রিবাস করেছে, তখন কোন চেঁচামেচি করলেন না, কোন গালমন্দও দিলেন না, শুধু তাঁর মুখের রেখাগুলো আগেকার মতোই কঠিন হয়ে উঠল।

এইটেই তাঁর চরিত্রের স্বধর্ম—এ ক'দিন যে চেঁচামেচি গালিগালাজ করেছেন সেটা তাঁর বয়োধর্ম-জনিত বিচ্যুতি। সে ক্ষণিকের দুর্বলতা চলে গেছে, বিভ্রান্তিমুক্ত হয়ে তিনি স্ব-স্বভাবে ফিরে এসেছেন আবার। খবরটা যে এনেছিল তাকে খুব শান্ত-কণ্ঠেই বললেন, 'বাঁচা গেল দুগ্‌গার মা। এবার নিশ্চিন্ত হলাম একেবারে। সব বন্ধনই তো খসে গিয়েছে, ঐটে শুধু পায়ের বেড়ির মতো আটকে বসে ছিল। তা আপনি আপনি যে খসে গেল, লাথি ছুঁড়ে জোর ক'রে খসাতে হ'ল না—সেই ভাল। নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলুম।'...

শালাদের চেষ্টায় দিন পাঁচেক পরেই শিবপুরের দিকে কোথায় এক মারোয়াড়ীর কারখানায় চাকরি হয়ে গেল বলাইয়ের। ছোট কারখানা, খাটুনি বেশী মাইনে কম। যতদিন না কাজ শেখে ভাল করে—মাত্র একটাকা রোজ, তাও ছুটির মাইনে নেই। 'আন্‌স্কিল্‌ড্‌ লেবার' ঠিকে হিসেবে নেওয়া হয়েছে—ওদের নাকি রবিবারের ছুটিও পাওনা হয় না। রোজ পাঁচ ছ'মাইল হেঁটে যাতায়াত—লোহাপেটা কাজ, সর্বপ্রকার কর্মে অনভ্যস্ত বলাই পারে না, তার চোখে জল এসে যায় কাজ করতে করতে—রাত্রে ফিরে মড়ার মতো এলিয়ে পড়ে—তবু মালতীর দয়া হয় না। সে বলে, 'এক টাকাটা আড়াই টাকা হতে বেশী দেরি হবে না। আর খাটুনি? প্রথম প্রথম অমন কষ্ট সকলকারই হয়—দু'দিনেই সয়ে যাবে। পুরুষমানুষ খাটবে না তো কি?'

তারপর চুপি চুপি বলে, 'ভাবছ কেন, বুড়ি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? এতদিন তবু ভাবছিল তুমিই খেতে না পেয়ে ফিরে যাবে। এবার চাকরি করার খবর পেয়েছে, কেঁদে এসে পড়ল বলে—দুচারদিনের মধ্যেই। আসুক না, ওর কাছ থেকে মোটামুটি কিছু টাকা বার ক'রে নিয়ে এপাড়ায় তোমাকে একটা দোকান করে দেব। বুঝলে বোকারাম?'

কথাটা বলাইয়েরও মনে লাগে। মনে হয় এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। এক-ফোঁটা মেয়ের বুদ্ধি দেখে প্রশংসায় তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু দেখা গেল বলাই বা মালতী কেউ কিছুমাত্র চিনতে পারে নি শ্যামাকে। শ্যামা কেঁদে এসে পড়লেন না—দু'চারদিনে তো নয়ই—দু'চার মাসেও না। এদিকে বলাইয়ের পক্ষে সে চাকরি রাখা সম্ভব হ'ল না। কোনমতে এক া সপ্তাহ বেরিয়েছিল, তারপর আর কিছুতেই গেল না। মুখ গোঁজ ক'রে বলল, 'ও ভূতের খাটুনী আমার দ্বারা হবে না। আমি মরে যাব। তার চেয়ে তোমরা আমাকে এখানেই কেটে ফেল, সেও আমার ভাল!'

শালাদের উপদেশ অনুরোধ যুক্তি, মালতীর শাসন—কোনটাতেই কোন ফল হ'ল না। মালতী কথা কইল না দু'দিন, ওর ঘরে শুতে গেল না। তবুও বলাই চুপ ক'রে বসে রইল ঘরে। মালতী রাগ করে বলল, 'ওকে খেতে দিও না। কাজে না গেলে খাওয়া নেই। দেখি উপোস ক'রে কতদিন থাকতে পারে, যেমন কে তেমনি'

কিন্তু শালাশালাজদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। একে জামাই তায় ব্রাহ্মণ, উপবাসী অভুক্ত পড়ে থাকবে বাড়ির মধ্যে আর তাঁরা খেয়ে বসে থাকবেন? শেষে শালারাই উদ্যোগী হয়ে একজনকে মধ্যস্থ ক'রে পাঠালেন শ্যামার কাছে। যা হবার হয়ে গেছে, হাজার হোক বালক তো বলতে গেলে—তিনি ওকে মাপ করুন, কিছু টাকা দিয়ে বরং একটা দোকান ক'রে দিন, দু'পয়সা রোজগার করতে শিখুক! এখানেই এসে থাকবে, বৌও মাপ চাইবে তাঁর কাছে।

শ্যামা বললেন, 'দিতে হয়—আমাকে ছেড়ে যাদের মুরুব্বি ধরতে গেছে—তারাই দিক। আমি এক আধলা দেব না। আমি জানি আমার সে নাতি মরে গেছে। সে পরিচয় ধরে যদি কেউ এবাড়ি ঢোকার চেষ্টা করে মুড়ি-খ্যাংরা মেরে তাড়াব।'

তখন অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে বলাইয়ের পৈতৃক সম্পত্তি বেচিয়ে সেই টাকায় ওকে একটা ছোটখাটো মুদির দোকান করে দেওয়া হবে। ও সম্পত্তি থেকেই বা লাভ কি, পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে, বাড়ির জানলা-কপাটগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাচ্ছে পাড়ার লোকে। মালতীর বড়দা তবু এক-বার বললেন, 'জমিগুলো বেচে দাও বরং, ভিটেটা থাকুক, সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে ওরাই গিয়ে বসবাস করতে পারবে।' মালতী রাজী হ'ল না তাতে। সে একবার এর মধ্যে গিয়ে দেখে এসেছে সে বাড়িঘর। সে বললে, 'হ্যাঁ,—তা আর নয়। ঐ নিবান্দা-পুরীতে আমি একা গিয়ে বাস করি আর চোর-ডাকাতে গলাটা কেটে দিয়ে যাক। চোর-ডাকাতে না কাটলেও ভূতে ঘাড় মটকাবে এটা তো ঠিক। সেই বুড়ি, ওর ঠাকুমা না কে, সে ঐ বাড়িতে পেত্নী হয়ে আছে, পাড়াসুদ্ধ সবাই দেখেছে। ওকে যদি দোকান ক'রে দাও, ও তো সে কোন্ ভোরে বেরিয়ে আসবে আর রাত-দুপুরে ফিরবে, আমি একলা ঐ হানাবাড়িতে কার ভরসায় থাকব শুনি?'

সুতরাং সবসুদ্ধই বেচে দেওয়া হ'ল। জলের দামেই একরকম। পাশের বাড়ির দত্তরা কিনলেন। অন্য লোককে বেচলে হয়ত আরও কিছু দাম পাওয়া যেত, কিন্তু কাগজপত্র কোথায় কি আছে, জমির সীমানা চৌহদ্দি কি, কেউ জানে না। পাঁচ ভূতে চেপে বসে আছে দখল ক'রে অনেক জায়গায়। মামলা-মোকদ্দমার ফের, বেশী দাম দিয়ে বাইরের লোক কিনবে কেন? তবু যা পাওয়া গেল সেই টাকার মধ্যে থেকেই মালতীর বড়দা তাঁদেরই জমিতে নিজস্ব মাটির ঘর একখানা তুলে দিলেন, আর বাকী টাকাতে এই পাড়াতেই একটা মুদির দোকান খুলে বসল বলাই।

বলা বাহুল্য সে দোকান মাস চার-পাঁচের বেশী টেকে নি। যে কিছুই জানে না সংসারের, তার পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। হিসেব ক'রে দামটা পর্যন্ত নিতে পারত না বলাই। দুনিয়াসুদ্ধ লোককে বাকী দিয়ে বসে রইল, সে-টাকার কিছুই আদায় হ'ল না! সুতরাং আবারও যে তিমিরে সেই তিমিরে। এদিকে ততদিনে মালতীর একটি মেয়ে হয়েছে। দাদারা চিরকাল বোনের সংসার টানতে পারবেন না —আকারে ইঙ্গিতে ভাল ক'রেই জানিয়ে দিলেন এবার। দাদাদের যদি বা বোন সম্বন্ধে দুর্বলতা ছিল, বৌদিদের ছিল না। বড় বৌদি তো স্পষ্ট বললেন একদিন, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! তেজ দেখিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছিল, তখন হুঁশ ছিল না?...যার তেজে তেজ মেয়েমানুষের—সে মানুষটা কেমন তা ভেবে দেখা উচিত ছিল। ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ তো ছেলেমানুষের মতো থাকে না কেন! দাদাদের কথা শোনা উচিত ছিল না তখন?...বুড়ি দিদিশাশুড়ী, অন্যায় দেখেছে বকেছে—তাতেই আর ঘর করা চলল না?...আমরা শ্বশুরঘর করতে এসে কি রকম উঠতে-লাথি বসতে-ঝ্যাঁটা খেয়েছি—চোখে দ্যাখে নি?'

এবার মালতী সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখল। পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন—এই আশ্বাসেই এতদিন এত জোর দেখিয়েছে, সেই ভাইরা এভাবে সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেবে তা ভাবে নি কোনদিন। মুখে যাই বলুক, সত্যি সত্যিই কিছু না খেয়ে থাকা যায় না।

অবশেষে তারই তাড়নায় বলাই এসে একদিন শ্যামার পায়ে ধরতে গেল, 'আমাকে মাপ করো, আমি না বুঝে অন্যায় ক'রে ফেলেছি!'

শ্যামা হাসলেন একটু। সে হাসি দেখে—কিছু না বুঝেও বলাই শিউরে উঠল। এমন নিরানন্দ কঠিন হাসি সে আর কখনও দেখে নি। শ্যামা বললেন, 'মাপ করেছি আমি অনেকদিনই। তবে যদি মনে করে থাকো যে দয়া ক'রে এসে মাপ চাইলেই আমি গলে যাব আর এরে-বেরে তোমাকে আর তোমার মাগকে ঘরে তুলব—সেটা তোমার মস্ত ভুল। আর না। আর কোনদিনই না। চৌকাঠ যেদিন ডিঙ্গিয়েছ সেইদিন থেকেই সব সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে। নিজে বিষয় বেচেছ, আলাদা ঘরও তুলেছ শুনেছি—নিজের সংসার নিজেই চালাও যেমন ক'রে পারো। কোন সহায় সম্বলই ছিল না আমার, মেয়েছেলে হয়ে যদি এতগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পেরে থাকি, তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে পারবে না?'

এই শেষ আশা ছিল বলাইয়ের, খুবই একটা ভরসা ছিল। মালতীও বুঝিয়েছিল তাই, কেঁদে গিয়ে পায়ে পড়লে ফেলতে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু এতকাল এই মানুষের সঙ্গে ঘর করেছে বলাই, যত মুখ্যই হোক, শ্যামার ভাবভঙ্গী ভাল ক'রেই চেনে। তাঁর মুখের রেখায় এবং গলার আওয়াজে বুঝল যে খুব সহজে কিছু হবে না এখানে। তার মনে হ'ল সত্যি-সত্যিই বুঝি তার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, অতল অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। সে কেঁদে ফেলল এবার, দিদিমার পা দুটো চেপে ধরে বলল, 'তবে আমার কি হবে, কোথায় দাঁড়াব?'

আস্তে আস্তে পা ছাড়িয়ে নিয়ে শ্যামা বললেন, 'এখানে আর কিছু হবে না তা আমি পরিষ্কারই বলে দিচ্ছি। তোমায় ও বৌকে আমি এবাড়ির বেড়া পেরোতে দেব না। ওদের ছেড়ে তুমি থাকতেও পারবে না। যদি বা জায়গা দিই দু'চারদিন পরেই তুমি আবার পালাবে। এবার হয়ত কিছু হাতিয়ে পালাবে। সুতরাং সেও আমি রাখব না। খেটে খাওয়াও তোমার দ্বারা হবে না। যা হবে তা বলে দিচ্ছি—তুমি

ভিক্ষে ধরো!'

প্রথমটা বুঝতেই পারে নি বলাই। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বসে ছিল শ্যামার মুখের দিকে। তারপর বিহ্বল ভাবে কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছিল শুধু। 'ভিক্ষে ধরব? মানে ভিক্ষে করব আমি?'

'আর কি করবে বলো? কি জান! লেখাপড়া শেখো নি যে আপিসে চাকরি করবে, গতর নেই যে কারখানায় গিয়ে লোহা পিটবে কিম্বা মোট বইবে—তাও তো বেয়েচেয়ে দেখেছ শুনেছি, বুদ্ধির জোরও এমন নেই যে ব্যবসা ক'রে খেতে পারবে। সে যারা পারে তারা দু'টাকা একটাকা পুঁজি নিয়েও নিদেন রাস্তার ধারে বসে তেলেভাজা ভেজে সংসার চালায়। ওর কোনটাই তোমার দ্বারা হবে না। যা হবে, যা পারবে তাই বললুম, এখন শোনা না শোনা তোমার মর্জি। বামুনের ছেলে ছেঁড়া জামার মধ্যে দিয়ে পৈতে দেখিয়ে রেলগাড়িতে ভিক্ষে ক'রে বেড়াও, তোফা চলে যাবে। ঐ ক'রে শুনেছি কত লোক দু-পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে ফেলেছে।'

তবু বলাই তখনই উঠতে পারে নি। অত সহজে হাল ছাড়লে তার চলবে না বুঝেই আবারও পায়ে ধরতে গিছল, 'এবারটির মতো আমাকে মাপ করো, বাড়িতে থাকতে না দাও—কিছু টাকা ধার দাও, আর একবার চেষ্টা করি দোকান করবার!'

'বেশ তো, সে তো ভাল কথা। উত্তম কথা। কী গয়না আনবে আনো, কত টাকা চাই তাও বলো। সুদ কিছু চড়াই লাগবে। সেই মতো সোনা হাতে রাখব আমি। বুঝে-সুঝে সোনা এনো!'

'সোনা—?' বিহ্বলভাবে বলে, 'সোনা কোথায় পাবো?'

তবে কি তোমাকে শুধু হাতে টাকা দেব ভেবেছ? কেন, টাকা রাখার আমার জায়গা নেই? কারবার ক'রে তুমি আমার দেনা শোধ করবে সেই ভরসায় টাকা ধার দেব তোমাকে এখনও সেরকম ভীমরতি আমাকে ধরে নি।'

তারপরই নিজ মূর্তি ধরেন, 'সরে পড়ো দিকি বাছা, মিছে বকিও না বসে বসে। আমার এখন ঢের কাজ আছে। উঠে পড়ো, গুটি-গুটি পথ দ্যাখো!'

সেই শেষ। বলাই আর আসে নি। আসতে সাহস হয় নি তার। মালতী রেগে বলেছিল, 'তুমি মিনিষ্যি না কি? হাতটা মুচড়ে ধরলে ঐ বুড়ির দম্ভিষ্যি থাকত কোথায় তাই শুনি! কেড়ে-বিগড়ে নিয়ে আসতে পারলে না কিছু টাকা? নিজের নাতিকে পুলিশে দিতে তো পারত না!'

'হ্যাঁ, তবেই চিনেছ ওকে। ও সব পারে। জেলে দিয়ে ছাড়ত আমাকে তা'হলে। ওসব আমি পারব না। ও যা পাজী, নিজে মরে গিয়ে খুনের দায়ে আমাকে ফাঁসি দেওয়াতে পারে।'

সম্ভাবনাটা মনে করেও যেন শিউরে ওঠে বলাই।

তারপর দুজনেই চুপ করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেমে আসে একটা অসহনীয় নীরবতা। সেদিন আর কারুরই কিছু খাওয়া হয় না। স্ত্রীর কঠিন মুখভাবের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস হয় না বলাইয়ের—আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু আর কিছুই পারে না। তার ভাগ্যের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা জড়িয়ে তার এই সর্বনাশটা করল—এটুকু বোঝে, শুধু তার কি প্রতিকার ভেবে পায় না। এদিক ওদিক থেকে—বড় মাসীর বাড়ি থেকেই বেশীর ভাগ—দু-টাকা এক টাকা চেয়ে আনে। বড় মামাকে চিঠি লেখে—কিন্তু কোথাও থেকে এমন কিছুই পায় না— যাতে দু এক দিনের বেশী সংসার চলে। সুতরাং দিদিমার উপদেশ শোনা ছাড়া কোন উপায়ও থাকে না কিছু।

॥ ২ ॥

ঐন্দ্রিলা খুব সহজে মেয়ের বাড়ি আসতে চায় নি। সে জানত যে সীতার এখানে এসে ওঠা মানে একটা পেট চালাবার বাড়তি খরচ তার ঘাড়ে চাপানো তো বটেই —সামান্য যেটুকু আয়ের পথ ছিল সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাওয়া। বলতে গেলে যে পরের দোরে ঝাঁট দিয়ে পরের কন্না ক'রে পেট চালায়, ভিখিরীর মতো সতীন-পোদের পুরনো কাপড় চেয়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করে, তার মাথার ওপর এই বোঝা চাপাতে ইতস্তত করেছে সে শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু ক্রমশ আর উপায় রইল না। বহু দোর ঝাঁট দিয়েছে সে-ও। বহুদূর ঘুরেছে এই ক বছরে। চেনা জানা—তাদের চেনা তাদের চেনা, এই ভাবে শেকলের গ্রন্থি ধরে ধরে সম্ভব অসম্ভব যত যোগাযোগ করতে পেরেছে—সব জায়গাতেই সে কিছুদিন কিছুদিন কাজ করেছে। বোধ করি তার দুষ্টগ্রহের জন্যই টিকতে পারে নি কোথাও। এক এক জায়গা থেকে এক এক কারণে চলে আসতে হয়েছে। কিছুদিন পর পরই অসহায় ভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। কেউই তাকে বেশীদিন সহ্য করতে পারে নি, কেউই তাকে ধরে রাখতে চায় নি।

কেবল একজন ছাড়া।

সেই তাঁর কাছেও গিয়েছিল সে। বছর খানেক পরেই গিয়েছিল। সে সময়টায় মাসখানেকেরও ওপর কোন চাকরি ছিল না. পুরনো মনিববাড়ি ঘুরে ঘুরে শুধু সামান্য পুঁজিই শেষ হয়ে গিয়েছিল—চাকরি বা চাকরির আশ্বাস মেলে নি কোথাও। তার মধ্যেই শুনতে পেল—নাতির টাইফয়েডের মতো হয়েছে, পয়সার অভাবে কোন চিকিৎসাই হয় নি, পাড়ার কোন্ ভদ্রলোক বই দেখে কী ওষুধ দেন হোমিওপাথী গুলি—তারই ভরসায় পড়ে আছে। এ খবর পেয়ে আর থাকতে পারে নি— লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিসর্জন দিয়ে কোলাঘাটের গাড়িতেই চড়ে বসেছিল আবার।

কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। শুধু ধার-ক'রে আনা গাড়ি-ভাড়াটাই খরচ সার হয়েছিল। গোরুর গাড়িতে করে বেলা দুটো নাগাদ অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় সেই বাড়ির সামনে নেমে দেখেছিল কতকগুলো অপরিচিত ছেলেমেয়ে বাড়ির সামনে খেলা করছে। আগে ভেবেছিল—ডাক্তারবাবুর নাতিরা কেউ হবে। কিন্তু তারপরই মনে পড়েছিল, তাঁর ছেলে বা মেয়ে কারুরই সন্তানসংখ্যা খুব বেশী নয়। তাছাড়া তাদের এমন দীন বেশভূষা হবে না।...তখনই বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছিল, তার ওপর যখন একটি আধ-ময়লা কাপড় পরা কালোমতো মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল. 'তুমি কে গা বাছা, তোমাকে চিনতে পারলুম না তো?' তখন বেশ কিছুক্ষণ সে কোন উত্তর দিতে পারে নি। তারপর অনেক কষ্টে শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'ডাক্তারবাবু? এখানে যে এক ডাক্তারবাবু ছিলেন—?'

'ওমা, তিনি তো কবে মারা গেছেন! তাঁরই ছেলের কাছ থেকে তো এই বাড়ি আমরা কিনেছি। তা সেও তো আজ আট ন মাস হয়ে গেল। তুমি তাঁর কে হও গা বাছা? এত দূরে গাড়ি ভাড়া খরচ ক'রে একেবারে এসে হাজির হয়েছ—অথচ এতদিনের মধ্যেও খবরটা পাও নি!'

উত্তর দেওয়া কঠিন। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আরও কঠিন মনে

হয়েছিল ঐন্দ্রিলার। কোনমতে থতিয়ে থতিয়ে বলেছিল, 'আমি অনেকদিন বিদেশে ছিলুম, শরীরও ভাল ছিল না, চিঠিপত্তর লিখতে পারি নি, আমাকেও কেউ লেখে নি।'

ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়ই মঙ্গলা এসে পড়েছিল। সেদিন হাটবার, সে হাটে যাচ্ছিল। অনেকটা দূর চলেও গিয়েছিল। সেইখান থেকেই গোরুর গাড়ি থামতে দেখে পিছন ফিরেছিল—কতকটা অলস কৌতূহলেই। কিন্তু তারপরই চিনতে পেরেছিল ঐন্দ্রিলাকে। সে পড়ি কি মরি ছুটেছিল আলের পথ ধরে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেছিল, 'ওমা, বামুনদি যে এতকাল পরে! কোত্থেকে এলে গা এমন ভাবে! বেশ মানুষ যা হোক বাপু! কী খোঁজাটাই না খুঁজেছি। এতদিন পরে মনে পড়ল আমাদের কথা! চলো চলো আমার ঘরে বসবে চলো—'

সে ভদ্রমহিলার সন্দেহ তবু যায় নি। তিনি বলেছিলেন, 'তুই এঁকে চিনিস তাহলে? কে রে মঙ্গলা? ডাক্তারবাবুর কে হন?'

'ওমা—চিনি না! ডাক্তারবাবুর অসুখের সময় এসে কী কন্নাটা করেছিলেন। ডাক্তারবাবুর নিজের মেয়ের মতোই।'

এই সামান্য মিথ্যা কথাটুকুর জন্যে মঙ্গলার কাছে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা বোধ করে ঐন্দ্রিলা। যদিও সে মিথ্যার অলীক স্বর্গটুকু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। সে মহিলা আবারও বলেন, তবু রক্ষে!...আমি বলি সেই শেষের দিকে নাকি ডাক্তারবাবুর কে-এক ঢেমনি জুটেছিল—তিনিই বুঝি এলেন এতকাল পরে সোহাগ কাড়াতে!'

মঙ্গলা আর দাঁড়াতে দেয় নি ঐন্দ্রিলাকে, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নিজের ঘরে। বলেছিল, 'ওসব এঁটো কথায় কান দিও না বামুনদি। ডাক্তারবাবু তো মলেন এখানে একা, মরবার সময় সেই আমি যা-ই ছিলুম তাই তবু মুখে একটু জল পড়েছিল। কিন্তুক মরবার পর শোক করার নাম ক'রে বিষয় সামলাতে এসে পাড়া ঘরে বাপের ছেরাদ্দ সাপিণ্ডিকরণের কিছু আর বাকী রেখে যায় নি তো ছেলেমেয়েরা। ধন্যি তোমাদের ভদ্দরনোকদের ঘরের কাণ্ডকারখানা। আমরা ছোটনোক বটে, তবু সত্যি হ'লেও বাপমায়ের নামে এমন কুচ্ছো আমরা মুখে আনতে পারি না—বিশেষ তেনারা গত হবার পর। ছি ছি!'

মঙ্গলাই যাহোক ক'রে একটু খাওয়ার যোগাড়ও ক'রে দিয়েছিল। বলেছিল, নিজেই দুটো ফুটিয়ে মুখে দাও যেমন ক'রে হোক। মুখ তো শুকিয়ে আমসি পারা হয়ে উঠেছে। ঘরে মিষ্টিফিষ্টি কিছু নেই, থাকার মধ্যে মুড়ি আর গুড়। তা বাপু সে আর তোমাদের খেয়ে কাজ নেই—আমাদের তো আর তত এঁটোকাটার বিচের নেই, জেনেশুনে বামুনের বিধবাকে ওসব খাওয়াতে পারব না। এ নতুন হাঁড়ি, নতুন ইঁট পেতে দিয়েছি—দুটো সেদ্ধপক্ক ক'রে নাও, আমি চট্ ক'রে ওদের বাড়ি থেকে একটুকু নুন তেল চেয়ে এনে দিচ্ছি।'

এত হাঙ্গামা তখন করার ইচ্ছা ছিল না, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই করতে হয়েছিল। কিছু না খেলে আবার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত শরীর বইবে না বলেই। খাওয়া কেন—মুখে জল দিতেও ইচ্ছে করছিল না তার। দেহ মন দুইই ভেঙ্গে পড়েছে এক দিক্‌চিহ্নহীন হতাশায়। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়, নিজের এই অদূর এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা ছাপিয়েও যেটা মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে—সেটা হচ্ছে নিরতিশয় আত্মগ্লানি। অমন দেবতার মতো মানুষটাকে বুঝি সে-ই মেরে ফেলল। তিনি কিছুই চান নি তার কাছে, উপকারের কোন মূল্যই দাবী করেন নি। শেষকাল অবধি ভিক্ষার মতো করে চেয়েছিলেন, সে শুধু কাছে থাকুক। তার জন্যে ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন, এমন কি মানসম্ভ্রম, দুর্নামের ভয়ও ত্যাগ করেছিলেন।

দিনরাত পরিশ্রম করে, রাত জেগে, রাশি রাশি টাকা খরচ করে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এতখানি স্নেহের কী মূল্যই সে দিল!...একটা মিথ্যা দম্ভ—সতীত্বের একটা অকারণ আস্ফালন দেখাতে গিয়ে তাঁর বুকে সে চরম শেল হানল। আস্ফালন ছাড়া কী বলবে সে, তিনি যা মানুষ ছিলেন—আর কোনদিন কোন দুর্বলতা প্রকাশ করতেন না, বুক ফাটলেও মুখ ফুটত না। ঐন্দ্রিলা স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেলেও তিনি পিছিয়ে যেতেন। সেটুকু ঐন্দ্রিলা বুঝেছিল, চিনেছিল তাঁকে। অথচ আজ এখানে থাকলে সীতারও কোন অভাব থাকত না, নাতিটাও মানুষ হ'তে পারত। তিনি তো সীতাকে এখানেই আনিয়ে নিতে বলেছিলেন, জমিজমা বাড়িঘর সব লিখে দিতে চেয়েছিলেন!

মঙ্গলা বললে, 'তুমি চলে যাবার পর, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না বামুনদি, মানুষটা যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে গেল। খুব একটা ঘা খেয়েছিল ভেতরে ভেতরে। খাওয়া-দাওয়াও তো ছেড়ে দিলে একেবারে। আমাদের পেড়াপীড়িতে শুধু বসত একবার থালার সামনে ঐ পর্যন্ত। তাই কি দিনেরাতে দুবার বসানো যেত। যা করে ঐ একবার দিনান্তরে......কোথাও যেত না. শুধু চুপ ক'রে বসে থাকত বিছানার ওপরে। ঘরের বাইরেই বেরোতে চাইত না। অত সাধের ডাক্তারী, তা-ই ছেড়ে দিলে। লোক হাতে পায়ে ধরত এসে, হেজ্জা-হিজ্জি করত। তা ঐ এক কথা, আমার শরীর ভাল নেই, আমি পারব না আর। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা —আমি মরে গেছি ধ'রে নাও।...ঐ হালচাল দেখেই আমি বুঝেছিলুম যে বেশীদিন আর নয়, দিন থাকতেই বলেছিলুম ছেলেমেয়েদের খবর দিই, তারা এসে পড়ুক। তা বলে, না—কিছুতেই না। যতদিন আমার জ্ঞান থাকবে ততদিন দরকার নেই। তারা সুখে থাক, শান্তিতে থাক। তুই পারবি নি আমার মুখে একটু জল দিতে এ কটা দিন? আমি বলি, তা পারব নি কেন, তবু ছেলে বলে একটা কথা। তা তার জবাবে বলে, ঐ টেবুলের ওপর পোস্টকার্ট লেখা আছে, যেদিন আমার বাক্যি হরে যাবে, আর চোখ খুলতে পারব নি, সেইদিন ঐ পোস্টকার্টখানা ডাকে দিস।...তাই দিয়েছিলুম, কিন্তুক ওমা. সে ছেলেমেয়ে—জামাই, সেই শালা বাবু এসে আমার ওপর কী টাঁইশ। কেন আগে খবর দেওয়া হয় নি! পেরথমে কোন জবাব দিই নি—শেষে আর থাকতে পারলুম নি, বললুম—তোমরা কে বাপু, তোমাদের তো দেখি নি কোন দিন, চিনিও নি। যাকে চিনতুম, যাকে দেখেছি এতকাল তারই হুকুম তামিল করেছি। বলেছিল একশোবার, বাক্যি হরে গেলে চিঠি দিস, তাই দিইছি।...আর আমি তো বাছা তোমাদের ভিটেবাড়ির পেরজা নই, আমাকে চোখ রাংগাচ্ছ কিসের জন্যে ভাই শুনি! আমি তোমাদের কাছে অত কৈফেয়ৎ দিতেই বা যাব কেন?...বাপের ওপর যদি এতই টান—এতকালের মধ্যে খবর নাও নি কেন বাছা কোনদিন? কৈ, কখনও তো একবার উঁকি মেরেও উদ্দিশ নিতে দেখি নি!...এমনি খুব ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠতে তবে চুপ করে গেল—'

শুনতে শুনতে ঐন্দ্রিলার বজ্রাহতের মতো শুকিয়ে যাওয়া চোখেও যেন ভাদ্রের বন্যা নামে। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মতো। অনেকক্ষণ পরে, খানিকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তারা—তারা এসে আর দেখতে পায় নি বুঝি?'

'না। সেইরকমই ইচ্ছে ছিল যে তেনার। পই পই ক'রে বলে রেখেছিল।... ওরা এসে পৌঁছল যখন, তখন দুপহরের বাসি মড়া হয়ে গেছে। আমাকে বলে রেখেছিল যখন বুঝবি আর বেশী দেরি নেই, তখন তুই-ই একটু মুখে জল দিস আর ভগবানের নাম শোনাস। ভয় পাস নি, লজ্জা করিস নি—তুই-ই আমার যথার্থ

মেরে। তা আমি শুনিয়েও ছিলুম! যতক্ষণ শ্বাস ছিল ততক্ষণ ভগবানের নাম ক'রিছি বসে বসে।'

তারপর একটু থেমে, একটু ইতস্তত ক'রে বলেছিল, 'বাক্যি হরে যাবার একদিন না দুদিন আগে আমাকে বলছে কি, মরবার আগে যদি আর একবার তাকে দেখতে পেতুম তো কোন দুঃখু থাকত না রে। একবার যদি ভুল ক'রেও এসে পড়ত!...বড্ড ইচ্ছে ছিল—। এই অবধি বলে আর রা কাড়ে নি, চুপ ক'রে গিয়েছিল। তবে নাকি কথাটা বলতে বলতে, থেমে যাবার পরও অনেকক্ষণ পজ্জন্ত—হাতের সেই বড় শীল-আংটিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল কেবল।...একবার খুলেও ফেললে হাত থেকে, আবার কী মনে ক'রে পরে নিলে। তা আমার কেমন পেত্যয় হ'ল, আংটিটাই বোধহয় তোমাকে দেবার ইচ্ছে ছিল, লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারল নি। তাই পরানটা যেমনি বেরিয়ে গেল অমনি আমি সেটা খুলে নিজের ঘরে রেখে গেলুম। যদি কোন দিন এসে পড়ো কি ঠিকানা পাই—এই ভরসায়। তা যাই হোক, এসেও গেলে তো বাপু, তেনারই টানে বোধ হয়।...এখন মনে হচ্ছে ভালই করেছিলুম, ওদের হাতে পড়লে আর উপুড়-হাত করত নি। এই তাই কথা তুলেছিল একবার, হাতে আংটির দাগ রয়েছে—সে আংটি কোথায় গেল? নিহাৎ সকালে আমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখেছিল—বেশী ঘাঁটাতে সাহস করলে নি। চামার, সব চামার।...এখানে সাতখানা গেরামের লোক বাবুকে দেবতার মতো মান্যি করত, এতক্কাল কাটল এখানে—তা এখানে ছেরাদ্দ না শান্তি না কিচ্ছু না, একটা কাঁধকাট পজ্জন্ত খাওয়ালে নি। তাড়া-হুড়ো করে মালপত্তর আদ্দেক বেঁধে সরে পড়ল। বাড়ি-জমিও সব ঐখেনে বসে বেচেছে, এদিক আর মাড়ায় নি।...ছেল্দা তো সব কত—ব্যাটা ব্যাটার বৌ তো জুতো খটখটিয়ে এল জুতো খটখটিয়ে চলে গেল—নিতান্ত শ্মশানে গিয়ে জুতোটা একবার খুলেছিল এই যা। তাও বোধহয় সে জুতো নষ্ট হয়ে যাবার ভয়েই—'

আরও বহু কথা বলেছিল মঙ্গলা। সেসব কথা ঐন্দ্রিলা শোনেও নি ভাল করে। শুনতে পারে নি। দু চোখের জলে তার দৃষ্টিই শুধু ঝাপ্সা হয়ে যায় নি—কানও যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঝাপ্সা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ বর্তমানও—তার সমগ্র চৈতন্য, সমস্ত জীবন। তারই অদৃষ্ট আর তারই দুর্বুদ্ধি। নইলে অমন মানুষের অমন মতিভ্রম হবে কেন, আর সে-ই বা অত তেজ দেখিয়ে অত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন। এখানে আর দুটো মাস থাকলে তার কী এমন ক্ষতি কী এমন অধঃপতন হ'ত। অথচ তা থাকলে আজ তার ভাবনা কী? যা-খুশি সে আদায় ক'রে নিতে পারত—চিরজীবনের মতো মেয়ের আর তার হিল্লে হয়ে যেত। এমন ক'রে আর পরের দোরে লাথিঝাঁটা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে হত না তাকে। এখন আর কিছুই রইল না। আশা ভরসা সহায় অবলম্বন—আপনজন বলতে কেউ কোথাও রইল না আর! এতদিনের জীবনে স্বামী ছাড়া আর যে একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী পেয়ে-ছিল সে—তাকে নিজে হাতেই মেরে ফেললে। দুঃখের শেষ তার হবে না ইহজীবনে কোনদিন—তা সে খুবই বুঝেছে কিন্তু এ অনুশোচনারই কি শেষ হবে?

সেইদিনই সেখান থেকে চলে এসেছিল ঐন্দ্রিলা কোনমতে একটু কিছু মুখে দিয়েই। মঙ্গলা বলেছিল দুটো চারটে দিন তার ওখানেই থেকে আসতে, সে প্রবৃত্তি আর তার হয় নি! যেখানে সে সর্বময়ী কর্ত্রী ছিল সেখানে দীনদুঃখিনী আশ্রয়-হীনার মতো দাসীর ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে ইচ্ছা করে নি তার! তা ছাড়া ফেরার গাড়ি-ভাড়া তার কাছে পুরো নেই, সেটাও লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়ে মঙ্গলার কাছ

থেকেই চেয়ে নিতে হবে যখন—তখন আবার কদিন তার ঘাড়ে চেপে "ভূজ্জিধ্বংসে" লাভ কি? দেওয়ারই সম্পর্ক বরং তার, সেখানে হাত পেতে সামান্য কিছু নেওয়াও অপমানের। সে অপমান যত কম সইতে হয় ততই ভাল।

তারপরও বহুদিন বহু জায়গায় ঘুরেছে। বেশ ক বছরই। কোথাও বাসা বাঁধতে পারে নি আর। কোথাও কিছু সুবিধা হয় নি। একান্ত অসময়ে ডাক্তার-বাবুর প্রায় বারো আনা ওজনের আংটিটা হাতে এসে পড়েছিল। তাঁর সে শেষ স্মৃতিচিহ্ন, তাঁর পরম স্নেহের এবং বোধ করি ঐকান্তিক প্রেমের নিদর্শন সেই উপহার—সেটা দুদিনও কাছে রাখতে পারে নি ঐন্দ্রিলা। কলকাতায় ফিরেই বেচতে হয়েছে, নইলে হয়ত নাতিটাকে বাঁচানো যেত না। মেয়েকে পনেরোটা টাকা পাঠিয়েও নিজের হাতে কিছু ছিল—তাইতেই কটা দিন তবু এদিক ওদিক ঘুরে আশ্রয়ের চেষ্টা করতে পেরেছিল। মানুষটা ম'রেও তার চরম দুঃসময়ে একান্ত কাজে লাগল।

কিন্তু সে টাকাও গোনা-গাঁথা। একদিন তাও ফুরোল আবার। অথচ কোন ব্যবস্থাই কোথাও ক'রে উঠতে পারল না। চাকরি দু-একটা যে না পেলে তা নয়—কিন্তু দু-মাস চার মাসের বেশী রাখতে পারল না কোনটাই। এতদিন শত্রুতা করেছে গ্রহ, তার ভাগ্য। এবার শরীরও পিছনে লাগল! হয়ত ঐ বিরূপ গ্রহেরই চরম মার। কিন্তু সে মার আর ঠেকাতে পারল না কিছুতেই। শরীর আর বইল না একেবারেই। নানান রোগে ধরেছে, তার মধ্যে পেটের গোলমালটাই প্রধান। এর শুরুও আজ নয়—ভাল হজম হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরেই, এবার সে গোলমাল প্রবল আকার ধারণ করল। হাত পা ফুলতে লাগল, পেটটা বড় হয়ে উঠল। অর্থাৎ উদুরীর লক্ষণ। শেষ যেখানে চাকরি পেয়েছিল—জয়নগরে, সেখানে মনিবরা বেগতিক দেখে হঠাৎ একখানা রিক্শা ডেকে মালপত্র চাপিয়ে ওকেও তাতে তুলে দিলে। রিক্শাওয়ালাকে ভাড়া আগাম দিয়ে বলে দিলে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে। এত দ্রুত এবং এত আচমকা ঘটল ব্যাপারটা যে ঐন্দ্রিলা রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়ে হ্যাঁ-না কিছু বলতেই পারল না। অভিভূতের মতোই গাড়িতে গিয়ে উঠল। অবশ্য আগেকার মতো ঝগড়া করার শক্তিও ছিল না তার, গলার শির ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গাল-মন্দ দিয়ে পাড়া মাথায় করবে—সে ক্ষমতা একেবারেই চলে গেছে ভুগে ভুগে। তাছাড়া এটা সেও বুঝল যে, ওদের বিশেষ দোষও নেই। পয়সা খরচ করে লোক রাখে লোকে দরকারের জন্যেই, অথচ ঐন্দ্রিলা এই চাকরিতে ঢুকে পর্যন্তই সন্ধ্যার দিকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছে, বাড়ির লোককে রেঁধে নিতে হচ্ছে প্রায় সম্পূর্ণই। সকালেও অসুবিধা কম নয়, এখানে অফিসের ভাত দিতে হয় ভোরবেলা—সাতটার গাড়ি না ধরলে অফিস করা যায় না—কিন্তু সেও পেরে ওঠে না সে। বাড়ির পুরুষরাই যদি নিত্য ভাতে ভাত খেয়ে অফিসে যায় তো রাঁধুনী রেখে লাভ কি?...

ওখান থেকে প্রায় রিক্ত-হস্তে ধুঁকতে ধুঁকতে যখন মেয়ের বাড়ি এসে দাঁড়াল ঐন্দ্রিলা, তখন তার অবস্থা দেখে সীতা চীৎকার ক'রে উঠল। কী মড়ার দশা হয়েছে তার অমন সুন্দরী মায়ের। অমন যে রঙ, তাও যেন পুড়ে তামার বর্ণ হয়ে গেছে। হাত পা নলি-নলি অথচ হাত-পায়ের পাতাগুলো ফুলো ফুলো, পেটটা ঢাক। মেঘের মতো এক ঢাল চুল—সামনের দিকে তার আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই—সব চুল উঠে টাক পড়ে গেছে, পেকেও গেছে অর্ধেক।

কেঁদে ফেলল ঐন্দ্রিলাও। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'তোর কাছেই মরতে এলুম রে এবার, যা হয় ক'রে একটু ঠাঁই দে—নইলে কি সত্যি সত্যিই রাস্তায় পড়ে মরব?'

'ছি ছি, অমন কথা বলতে নেই। চুপ করো, চুপ করো। চলো, ঘরে গিয়ে একটু বসবে চলো আগে।' তখনকার মতো সান্ত্বনা দিয়ে নিজের ঘরে এনে তুলল বটে কিন্তু মনের মধ্যে বিশেষ বল পেল না সীতা। তার অবস্থা আগেকার চেয়েও একটু অসহায় হয়ে উঠেছে। সতীন-পোরা যখন সবাই এক সংসারে ছিল, তখন ভূতের মতো খেটে, বৌদের মন যুগিয়ে নিজের অবস্থা অনেকটা স্থিতিস্থাপক করে নিয়েছিল, যা হোক একটু আধিপত্যের মতোও হয়েছিল। এখন তারা সব ভিন্ন হয়ে গেছে, পৃথক পৃথক সংসার। একজনের ভাগে পড়া ছাড়া উপায় নেই। অনেক ভেবে সে মেজ সতীন-পোটিকেই বেছে নিয়েছিল। তার সংসার কম কিন্তু বৌটিও তেমনি অকর্মণ্য। তার তরফেই আগ্রহ বেশী ছিল। কিন্তু যেখানে ত্রিশ-বত্রিশজনের পাতা পড়ে, সেখানে দুটো লোকের খাওয়া কেউ টেরও পায় না, পাঁচ-ছ'নের মধ্যে দু'জন অনেকখানি। তাদের খরচটা চোখে দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই বেশ একটু সংকুচিত হয়ে থাকতে হয় সীতাদের। অবশ্য ছেলের পড়াশুনা বা কাপড়জামা বাবদ অন্য সতীন-পোরাও কিছু কিছু সাহায্য করে—তবে তা নিয়মিত কিছু নয়, পাঁচবার চাইলে একবার পাওয়া যায়। তার ওপর ভরসা নেই কোন। এক্ষেত্রে আশ্রিতের সংখ্যা দুজনের সঙ্গে আরও একজন যুক্ত হলে এরা কি বলবে—সবসুদ্ধই খোয়াতে হবে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি রইল না সীতার।

প্রথম দু-চার দিন অবশ্য কিছুই বলেন নি কেউ, বরং বড় সতীন-পো উদ্যোগী হয়ে পাড়ার এক ভদ্রলোককে ধরে একটু হোমিওপাথী ওষুধের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। পুরনো চাল মানকচু প্রভৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পথ্যের জন্যে, নিজের সংসার থেকে।

কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে দেখা গেল মেজবৌয়ের মুখ ভার-ভার। আরও দু'দিন পরে মেজকর্তা কার্তিক সীতাকে ডেকে মার কুশল প্রশ্ন করে উপদেশ দিলেন, 'বৌমা, এসব চিকিচ্ছেয় কিছু হবে না, দিদিমাকে যদি বাঁচাতে চাও তো তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও যেমন করেই হোক। ওখানে কাছাকাছি বড় হাসপাতাল আছে—নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্তি, ওষুধপত্তর সবই পাবে, পাশ করা ডাক্তার আছে—কোন ভাবনাই থাকবে না। এখানে এমনভাবে ফেলে রাখলে বাঁচবেন না উনি। এ তো মনে হচ্ছে পুরানো উদুরী—ভাল রকম চিকিচ্ছের দরকার।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, না বোঝবার কোন কারণ নেই। কিন্তু বুঝেই বা উপায় কি? দুশ্চিন্তায় যেন নিমেষে ঘেমে উঠল সীতা, মাথা হেঁট করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'মা যে যেতে চায় না সেখানে মোটে, তাছাড়া মামারাও তো কেউ নেই, সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়েই বা যাবে কে? দিদ্‌মা সেসব পারবে না।'

কার্তিক ভ্রূ কুঁচকে জবাব দেয়, 'তোমার দিদ্‌মা তো এধারে ডোকলা সেধে সেধে এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে ঘুরে বেড়ান—সুদের তাগাদা দিয়ে দিয়ে। তোমার মা-ই বলেছেন সে-কথা। পোদড়া, শালিমার, শিবপুর পর্যন্ত হেঁটে পাড়ি দেন। মেয়েকে মৌড়ীর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবেন না? তাছাড়া তোমার একটা বোনপোও তো থাকে না ওখানে?'

'তার কথা ছেড়ে দিন—সে এক জন্তু! সে বাড়ি থেকে বেরোয়ই না সাতজন্মে!'

'তবু ওখানে পাঠালে, তোমার দিদ্‌মার ঘাড়ে নিয়ে গিয়ে ফেললে কি আর একটা উপায় তিনি করবেন না? হাজার হোক পেটের মেয়ে তো!'

হাত-পা হিম হয়ে আসে। বড় বেশী স্পষ্ট—ইঙ্গিতটা। বেশী দিন না বোঝার ভান করলে হয়ত আরও বেশী কিছু বুঝতে হবে। সকলকেই পথে বসতে হবে

হয়ত। সে আর কথা বাড়ায় না। দিদ্‌মা যে কী রকম মা তাও—বৃথা জেনেই আর বোঝাবার চেষ্টা করে না। বরং আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে মার কছে কথাটা পাড়তে যায়।

কিন্তু সেখানেও কোনও সুবিধা হয় না। ঐন্দ্রিলা কথাটা শুনেই আবার কাঁদতে শুরু করে, 'সেবার বাইরের বাগান থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবার এ মূর্তিতে গিয়ে দাঁড়ালে বেড়ার আগড়টাই খুলতে দেবে না। রাস্তা থেকে খ্যাংরা মেরে বিদেয় করবে! সেবার খ্যাংরা দেখিয়েছিল—এবার মারবে সত্যি সত্যিই।........তবু তখন খাটবার গতর ছিল। বসে খাওয়াবে আবার চিকিচ্ছে করাবে মা? সেদিন পুবের সুয্যি পশ্চিমে উঠবে।...তার চেয়ে সোজা—ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে খালধারে বসিয়ে দে, একেবারে এগিয়ে থাকি। ফেলতেও আর লোক ডাকতে হবে না তোদের, লাশ জ্বালাতেও হবে না—জ্যান্তই শ্যাল-কুকুরে খেয়ে যাবে!'

এর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ছিল তা কাঁটার মতোই বেঁধে সীতাকে। তারও চোখে জল এসে যায়। সে যে কত অসহায় ও অক্ষম, তা বুঝেও বোঝে না মা। অসুখ হলে মানুষ একটু অবুঝ হয়ে পড়ে ঠিকই—তবু চোখে যা দেখেছে, যা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, তাও বুঝতে চায় না কেন?

কিন্তু অভিমানেরও অবসর নেই সীতার। খানিকটা পরে তাই আবারও পূর্ব কথার সূত্র ধরতে হয় তাকে। বলে, 'আচ্ছা, দিনকতক বড় মাসিমার কাছে গিয়ে থাকলে কি হয়? হাসপাতাল তো ওদের বাড়ির কাছেই—কেউ না কেউ নিয়ে যেতে পারবে। বড় মেসোমশাইও তো বসে থাকেন আজকাল—?'

কথাটা বলে ফেলে উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে সে।

ঐন্দ্রিলা তখনই কোন জবাব দেয় না—কিন্তু আস্তে আস্তে শান্ত হয় একটু। চোখের জল মুছে বলে, 'কুটুম-বাড়িতে এমন মড়ার দশা গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াতে পারব না—সে মাথা কাটা যাবে বড্ড। তুই না হয় একটা কাজ কর বরং—তুই-ই একবার যা। ন্যাড়া ধনা শুনেছি কিছু রোজগার করছে এখন, মেজকর্তার দুই ছেলেও আপিসে ঢুকেছে, কান্নাকাটি করলে সবাই কিছু কিছু দেবে। আর যদি মেজকর্তা নিজে থেকে যেতে বলে তো কথাই নেই। সে তবু একটু মান থাকে।'

প্রস্তাবটা সীতার মোটেই ভাল লাগে না। সে চিরকাল ভীতু-মুখচোরা-লাজুক প্রকৃতির মানুষ। নিজের শরীরের ওপর দিয়ে সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে রাজী আছে সে কিন্তু বাইরে কারুর কাছে হাত পাততে, কি ইনিয়ে-বিনিয়ে ভিক্ষা করতে তার মাথায় বাজ পড়ে যেন।

সে খানিকটা চুপ করে থেকে বলে, 'তুমি যেভাবে একে-ওকে ধরে রাঁধুনীর কাজ যোগাড় করো, সেইভাবে আমাকে একটা যোগাড় করে দাও না। তুমি না হয় এখানে থাকতে—? ছেলেটাকে দেখতে পারতে—?'

'তুই কি পাগল হয়েছিস?' এক কথায় প্রস্তাবটাকে উড়িয়ে দেয় ঐন্দ্রিলা, 'কত নশো পঞ্চাশ পাবি তাতে? খাওয়া-পরা বড়জোর দশটা কি বারোটা টাকা। তাতে এখানে আমাদের দুটো প্রাণীর চলে কখনও? এদের রান্না না করলে এরা বসিয়ে খাওয়াবে কেন? তুই গতর খাটাচ্ছিস তাই আমাদের খেতে দিচ্ছে। এ-ই তো বলতে গেলে রাঁধুনীর কাজ। তুই গেলে কি আমি তোর কাজ সাপ্টে করতে পারব? তার আদ্দেকও তো পারব না। আর কাজ না পেলে, ওরা বসিয়ে খাওয়াবে নাকি দু'-দুটো লোককে?'

কথাটা মর্মান্তিকভাবেই সত্য। এবং সেজন্যে খুব দোষও দেওয়া যায় না।

ওদের। জিনিসপত্রের দাম আগুন হয়ে উঠেছে—এখনও বেড়েই চলেছে দিন দিন। কোনকালে যে আবার কমবে, তা মনে হয় না। ওদের চাষের ফসল ঘরে ওঠে বলেই অত টের পায় না এখনও—তবু যা দু-একটা জিনিস কিনতে হয়, তাতেই জিভ বেরিয়ে যায়। দুটো পেট যদি বসিয়েই খাওয়াবে তো এখনই—এক সপ্তাহ না যেতে যেতে—নোটিশ দেবে কেন? দশ-বারো টাকা সে যদি পাঠায়ও, তাতেই বা কি হবে, দুটো লোকের কি খরচা পোষাবে?...

অগত্যা চোখের জল চোখে মেরে দুরু দুরু বক্ষে বড়মাসীর বাড়িই যেতে হয় একদিন।

অবস্থা সকলের সামনেই খুলে বলে। চোখের জলও চেষ্টা করে ফেলতে হয় না, আপনিই পড়ে। নিজের এই অসহায় অবস্থা, এই দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে আরও অনেক বেশী। অনেক অপ্রকাশিত নিরুদ্ধ বেদনা কণ্ঠে পথ না পেয়ে চোখের আগল ঠেলে বেরিয়ে আসে। রুগ্ন অসমর্থ মা—এতকাল ধরে ওর জন্যে জীবনপাত করে আজ বলতে গেলে শেষ অবস্থায় ওর দোরে এসে দাঁড়িয়েছে—দুটো দিনও তাকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নেই ওর। অথচ ওরই স্বামীর জমিজমার আয়ে অত বড় সংসারটা চলছে। চাকরি-বাকরি করে কেউ কেউ, কিন্তু সে আর কতটুকু, সমুদ্রের কাছে পাদ্যার্ঘ।

মহাশ্বেতা মেজকর্তার মুখের দিকে চায়। তার মুখও ক্ষণে আরক্ত, ক্ষণে বিবর্ণ হচ্ছে, তারও অবস্থা অমনিই অসহায় বুঝি; তারও জোর করে কারও জন্য সুপারিশ করার সাহস নেই আর। এই যুদ্ধের বাজারে এত বড় সংসারটা বজায় দিয়ে যাচ্ছে মেজকর্তা—এই-ই ঢের। ফেলে নি সে কাউকে, কারুর পাত পাতাও বন্ধ করে নি। যা হোক পরতেও দিচ্ছে—তা মোটা চটই হোক আর থলেই হোক। তবু ওরই দুটো ছেলে রোজগার করছে, মহার রোজগেরে ছেলে বলতে এখনও পর্যন্ত একটাই, শুধু ন্যাড়া। ধনার চাকরি গেছে এর মধ্যেই। সবচেয়ে ছোটটা এই সবে কোন্ এক কারখানায় ঢুকেছে। রোজগারের মতো রোজগার করতে এখনও তার ঢের দেরি। অথচ সংসার মহারই বড়। সে আবার কোন্ মুখে বোন-বোনঝির জন্যে সুপারিশ করবে?

মেজকর্তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে প্রমীলাও। তার চোখে ভ্রূকুটি। বোধহয় নির্বোধ স্বামীর বদান্যতাকে তার ভয়। কিন্তু অম্বিকাপদ কারও দিকে তাকায় না, চুপ করে বসে সব শোনে। তারপর সীতার অব্যক্ত ও অস্পষ্ট প্রার্থনা স্পষ্ট বা ব্যক্ত হয়ে ওঠবার আগেই উঠে গিয়ে ঘর থেকে পাঁচটা টাকা এনে সীতার হাতে দেয়। বলে, 'বাজারের যা হালচাল, দেখতেই তো পাচ্ছ। আমাকে বাধ্য হয়েই সবদিকে টেনেটুনে চলতে হচ্ছে, ক'দিন তাও চালাতে পারব কে জানে।...এর চেয়ে বেশী আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার। বরং মাঝেমধ্যে যদি খুব ঠেকে পড়ো কখনও তো একখানা চিঠি দিও—এত খরচ করে সাত দেশ ভেঙে আসবার দরকার নেই। যা পারি এক টাকা দু'টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।'

সাফ সাফ পরিষ্কার কথা। কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর বা ধরপাকড়ের রাস্তা থাকে না কোথাও। মাথা হেঁট করে টাকা কটা হাত পেতে নেয় সীতা—নিতেই হয়। চেষ্টা করেও চোখের জল বন্ধ করতে পারে না—গোপন করার চেষ্টা করে শুধু।

প্রমীলা বোধ করি স্বামীর বুদ্ধি-বিবেচনায় খুশী হয়েই ওকে ডেকে আরও দুটো টাকা দেয় নিজের সঞ্চয় থেকে। ছোটবৌ কিছুই করতে পারে না, তার হাতে কিছুই নেই। স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে বা জোর করে টাকা আদায় করার মানুষ সে

নয়।...সে শুধু উঠে এসে পাশে বসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

মহাশ্বেতাও তার সর্বশেষ সামান্য পুঁজি থেকে একটা টাকা বার করে। আড়ালে ওর হাত ধরে কান্নাকাটি করে, 'তুই মনে ভেবে রাখ্ মা তোর বড়মাসী মরে গেছে। আমার কাছে আর কোন আশা রাখিস নি। তোর মাকেও সেই কথা বলে দিস।... আমার ক্ষমতা বলতে তো ও-ই—ঐ তো থুম হয়ে বসে আছে। পাখীর আহার করে বলতে গেলে—পাছে এদের সংসারের ভার বলে মনে হয় ওর খাওয়াটা। সে কি আর শালীর হয়ে ভাইকে বলতে যাবে?...কখনই বলবে না। সে সাহস আমারও নেই আর। এখন তো গুষ্টিসুদ্ধ ওদের হাততোলায় আছি। পারব না বলে ঝেড়ে ফেললেই হ'ল—সে ম্যাদের আর আপীল আদালত নেই। তখন পথে বেরোতে হবে ভিক্ষে করতে।'

ন্যাড়া শুধু ফেরবার বাস-ভাড়াটা দিয়ে দেয় হিসেব করে। সে-ই তুলে দিতে এসেছিল বাসে। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলে, 'বুঝতেই তো পারছিস—কীই বা রোজগার করি, এ কি আর বলবার মতো, না এ থেকে কিছু করা যায়। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সবটাই মেজকাকে ধরে দিয়ে গিয়েছিলুম—মাইনে ওপরটাইম সব, পাই-পয়সা হিসেব করে; তা মেজকাও তো কম চালাক নয়, সবটাই ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "ও তুই-ই রাখ, তোর টিফিন আছে, রেলের টিকিট আছে—এত হিসেব করে মনে করে আমি কি দিতে পারব, তুই বরং এক কাজ কর—একটা ভার নিয়ে নে, আমি নিশ্চিন্ত হই। সারা গুষ্টি বলছি না—তোদের ভাইবোন, বাপ-মা'র যা কাপড়-জামা-জুতো লাগে, তুই সেইটে চালা।" খুবই লেহ্য কথা, নাই বা বলি কোন্ মুখে? টানছে তো কম না, দাদার বছর বছর ছেলে হওয়া—সে বেন তোলা থেকে দুধের খরচ, সবই তো সে যোগাচ্ছে। তবু সবকটা বাঁচে না তাই রক্ষে। আমারই তো দুটো, কম করে তিন পো দুধ লাগে রোজানি। সবই দিচ্ছে, কোনদিন না বলে নি।...আমি কোন্ লজ্জায় বলি এই সামান্য ভারটাও বইতে পারব না? অথচ এতগুলো লোকের কাপড়-জামা-জুতো—তাই কি কম? অবিশ্যি আমার ভায়েদের জামা-জুতো খুব লাগে না—কিন্তু তাহলেও যা লাগে, তাই কিনেই এক-এক মাসে একটা পয়সা বাঁচে না।'

বাড়ি ফিরে সীতা টাকা আটটা কার্তিকের হাতে দিতে সে আকাশ থেকে পড়ে, 'এ আবার কি? এ টাকা কিসের?'

সতীন-পোদের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলবার সাহস নেই সীতার আজও, সে মাথা হেঁট করেই জবাব দেয়, 'বড়মাসীর কাছে গিছলুম, তাঁরাই দিলেন ওষুধ-পত্তরের জন্যে—'

'তা আমাকে দিচ্ছ কেন বৌমা?'

'আপনিই রাখুন। খরচপত্তর তো সব আপনিই করছেন—আমি আর আলাদা করে কী করব ও টাকায়?'

'ও, সেদিন যে কথাটা বলেছিলুম, তাতে বুঝি মনে করলে তোমার মাকে আমি দুটি খেতে দিতেই কাতর, তাই খোরাকী ধরে দিলে চেয়েচিন্তে এনে?...কালটাই এমনি বটে, ভাল কথা কাউকে বলতে নেই। বলে, যার জন্যে চুরি করি, সে-ই বলে চোর। ...আমি বলেছিলুম দিদ্‌মার ভালর জন্যেই—এখানে পড়ে থেকে ঐ হোমোপাথীর গুলি খেয়ে কি আর উদুরী রোগ সারে?...তা যে যেমন বোঝে!'

রাগ যথেষ্ট করল বটে কিন্তু টাকা-ক'টা শেষ পর্যন্ত ট্যাঁকেই পুরল কার্তিক।

॥ ৩ ॥

কিন্তু সেই হোমিওপাথী গ্রলির জোরেই হোক আর নিয়মিত স্পথ্য সেবনেই হোক —শেষ পর্যন্ত কতকটা সামলেই উঠল ঐন্দ্রিলা। নিজে নিজে কিছ্ব না ধরেই উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল একটু, একটু রান্নাঘরে বসে এটা ওটা টুকটাক সাহায্যও করতে লাগল মেয়েকে। আরও কদিন পরে নিজে সেধে বড় নাতি গণেশের সংসারে এতটি বড়িও দিয়ে দিলে বসে বসে। এতাবৎ তার 'পোরের ভাত' খাওয়ার প্রনো সর্ চাল এবং মানমন্ড খাওয়ার কচ্ব গণেশই সরবরাহ করেছে। সে কৃতজ্ঞতা তো ছিলই, অন্য একটা আশাও ছিল বোধ হয়।

কার্তিক সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারের পর থেকে আর ম্খে কিছ্ব বলে নি বটে কিন্তু তার, তার স্ত্রীর এমন কি তার ছেলে-মেয়েদেরও ম্খভাব কি কথাবার্তা থেকে তাদের মনোভাব ব্ঝতে বাকী থাকত না সীতার। ঐন্দ্রিলার এখানে থাকাটা যে একান্ত অবাঞ্ছিত--সে তথ্যটা ভাষা ছাড়া সর্বপ্রকারে ব্যক্ত হ'ত অহরহ। শ্ধ্ব উপায় নেই বলেই—পিঠে কুলো ও কানে তুলো দেবার মতো ক'রে পড়ে থাকা। ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতার ভান করা ছাড়া উপায় ছিল না সীতারও। এখন মা একটু ভাল হ'তেই তাই সে মাকে চেপে ধরল, 'এদের সংসারের তো খ্ব বেশী খাট্নি নেই, এদেরটা তুমি চালিয়ে নাও, আমাকে একটা কোথাও কাজকর্ম দেখে দাও। যা হোক দ্টো পয়সা আসে বাইরে থেকে তব্।...বলতে নেই—খোকাও তো বড় হয়ে গেছে, মাকে ছেড়ে বেশ থাকতে পারবে।'

ঐন্দ্রিলা প্রথম দ্-একদিন কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল—বলেছিল, 'দ্টো দিন সব্র কর, আমিই চলে যাব কোথাও কাজ-কর্ম নিয়ে আবার।'

কিন্তু তারপর, বোধ করি সে সম্ভাবনা স্দ্রপরাহত ব্ঝেই—কী ভাবল, এক-দিন বড় নাতি গণেশকে একটু নিরিবিলি পেয়ে গিয়ে ধরল, 'নাতি-ভাই, একটা কথা বলতে এল্ম। খ্বই জ্বালাতন করছি তোমাদের—কিন্তু আমারই বা আর কে আছে বলো তোমরা ছাড়া? যতদিন গায়ে জোর ছিল, গতর খাটাতে পেরেছি, তত-দিন কাউকেই বিরক্ত করি নি। এখন নিতান্ত ভগবান মেরেছেন বলেই—'

বলতে বলতেই গলা ব্জে এল, বাধ্য হয়েই থামতে হ'ল ওকে।

ততক্ষণে গণেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আক্রমণটা কি ধরনের এবং কোন্ দিক দিয়ে আসবে শেষ পর্যন্ত ব্ঝতে না পেরেই আরও অস্বস্তি তার। কিন্তু ঐন্দ্রিলা বেশীক্ষণ উৎকণ্ঠায় রাখল না, একটু সামলে নিয়েই আবার শ্র্ব করল, 'অনেক দিন তো মেজ নাতির ঘাড়ে চেপে খেল্ম, আর ভাল দেখাচ্ছে না। এখন একটু তব্ মান্ষের মতো হয়েছি—এটা-ওটা কাজও করতে পারছি—তাই, তাই সীতি বলছিল যে তুমিই এদের সংসারটা একটু দ্যাখো, আমি বরং কোথাও বাইরে রান্নার কাজটাজ নিই।...আগে রাজী হই নি—ভেবেছিল্ম নিজেই যা পারি করব, ওকে আর এতটা মাথা হেঁট করতে দোব না, তাছাড়া এখনও ওর তো বিপদের বয়স যায় নি কিন্তু ভেবে-চিন্তে মনে হচ্ছে বাইরে কোথাও গিয়ে বড় সংসার সামলানো, সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। অথচ এধারেও, অন্য কোন পথও তো দেখছি না। তাই তোমাকে বলতে এল্ম, কোথায় যাবে কার বাড়ি, কে কেমন লোক তা তো জানি না হাজার হোক তোমাদেরই বংশের বৌ—যদি তোমাদের জানাশ্নো তেমন কোন বাড়ি থাকে—'

কথাটা শেষ করতে দেয় না গণেশ, বলে ওঠে, 'হ্যাঁ—তা আর নয়! সৎমাই হোক আর যাই হোক, মা তো সম্পর্কে, আমি যাব তার জন্যে রাঁধুনীর-কাজ খুঁজতে! বেশ বুদ্ধি তো আপনার!'...

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'কেন, কেতো কি কিছু বলেছে আপনাদের—!'

এতখানি জিভ কেটে ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না, না, ছিঃ ছিঃ! সে একটা কথাও বলে নি—কেন মিছে কথা বলব! তা নয়, কিন্তু আমার তো একটা বিবেচনা আছে ভাই। তার ওপর চাপটাও তো হচ্ছে খুব!'

এবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে গণেশ। তারপর বলে, 'তা আমি, না হয় ভজা, বিশু, এরাও কিছু কিছু দিলুম। আপনাদের দুজনের মতো চাল-ডাল-কাপড়—এগুলো যদি আমরা ভার নিই, কেতোর ওপর খুব চাপ একটা পড়বে না!'

'সে তো জানি ভাই। ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করুন, বেটারা তোমার লক্ষ-পুষী হোক, ভাত এক মুঠো দিতে তুমি কাতর হবে না তা জানি। কিন্তু ধরো ভাতকাপড় ছাড়া আরও তো খরচ আছে। ছেলেটার লেখাপড়া আছে তো!'

এই অবধি বলে আবার চুপ ক'রে যায় ঐন্দ্রিলা। জিজ্ঞাসু উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে গণেশের মুখের দিকে।

গণেশ কিন্তু তখনই কোন কথা বলে না। খানিক পরে শুধু বলে, 'আচ্ছা ভেবে দেখি একটু। ওদের সঙ্গেও কথা বলি। তবে বৌমাকে ওসব যুক্তি করতে বারণ করুন. ওভাবে আমাদের মুখ ডোবানো চলবে না। আপনি করেন সে আলাদা কথা—কেউ অত খবর রাখে না—তাছাড়া বাবা রাঁধুনী বামনীর মেয়ে কিনে এনেছেন টাকা দিয়ে, তা জানেও অনেকে। কিন্তু বৌমার কথা আলাদা। মেয়ে যে ঘরেরই হোক, এখন আমাদের বাপের বৌ। আমাদের ইজ্জৎটাও তো ও'র দেখা দরকার। ওসব করলে আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না—বলে দেবেন!'

'রাঁধুনী বামনীর মেয়ে'!...'মেয়ে যে ঘরেরই হোক'—!

কথাগুলো চাবুকের মতো এসে বাজে ঐন্দ্রিলার কানে। উত্তরও মুখের কাছে এসে ঠেলাঠেলি করে। এখনও, এই দুর্বল দেহেও, সে এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। এমন উত্তর দিতে পারে যাতে এসব কথা আর মুখে না বেরোয় কোন দিন! কিন্তু তবু, প্রাণপণে উদ্যত রসনা সম্বরণই করে ঐন্দ্রিলা। গত ক বছরে সে অনেক শিখেছে। বিশেষ এই শেষ কটা বছরে। দরিদ্রকে নিঃস্বকে অনেক সহ্য করতে হয়! এই এখন শেষ এবং একমাত্র আশ্রয়, এটা নষ্ট করা চলবে না কিছুতেই। যতই ঝ্যাঁটা-লাথি মারুক—তিন তিনটে লোককে ভাত দিচ্ছে, কাপড় যোগাচ্ছে—মাথার ওপর একটা আচ্ছাদনও দিয়ে রেখেছে।

তবু, বহুক্ষণ পর্যন্ত কানের মধ্যেটা জ্বালা করতে থাকে যেন। মাধব ঘোষালের বিপুল সম্পত্তির কথা মনে পড়ে যায় অনেক দিন পরে। হরিনাথও তখনকার দিনে কম মাইনে পেত না। দুর্ভাগিনী সে—তার দৃষ্টি পড়েই সব ছারখার হয়ে গেল। মানুষ দুটোও গেল—আজ তারা বেঁচে থাকলে সে রাজরানী—আবার নিজের বুদ্ধির দোষে ন্যায্য পাওনাও হারিয়ে বসে রইল। এখনও তো সেই শত্তুররা ভোগ করছে, দেখে আসুক না—কী ছিল তার। ভোলার ভাগের গুলোও কিনে নিয়েছে শিবু. শিবু তো এখন রীতিমতো ধনী। ভোলা রেস খেলে শেষে মদ ধরে সব উড়িয়ে দিয়েছে তাই, নইলে সেও কিছু না ক'রে বসে খেতে পারত!

যাই বলুক আর যাই করুক—গণেশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা সুব্যবস্থাই ক'রে দিল। এইটেই আশা করেছিল ঐন্দ্রিলা, গণেশের কাছে গিয়ে সেদিন কথা পাড়ার কারণটাও এ-ই। সব ভাই মিলে বসে আলোচনা করেই সিম্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বটে তবে প্রধান উদ্যোগী যে গণেশই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়ির মধ্যে কথা-বার্তা যা কিছু—এসব খবর চাপা থাকে না। গণেশের ছেলেরা পর্যন্ত আপত্তি করে-ছিল কিন্তু সে সব কোন কথায় কান দেয় নি সে। ভায়েদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, যে রকম দিনকাল পড়ছে তাতে আজ হোক কাল হোক একটা রোজগারের চেষ্টা কর-তেই হবে সীতাদের। তাছাড়া এভাবে এখানেও চিরকাল রাঁধুনী বামনী করে রাখা ঠিক নয়। যতই হোক, তাদেরই বাবা, বাবা একটা অন্যায় কাজ করলেও মানিয়ে নিতে হয়। রাগের মাথায় তারা সম্পর্কটা উড়িয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি খুব। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ওদের একটা ব্যবস্থা করতে তারা বাধ্য। এ নিয়ে পাড়ায় এখনও ঘোঁট হয় তা সে জানে। নিজের কানেই শুনেছে। তাদেরও তো বয়স হ'ল—এবার ভুলটা সংশোধন করাই ভাল।

খুব একটা হাতি-ঘোড়া কিছু নয়। খিড়কীর দিকে বাগানের উত্তর পূব কোণে কাঠা-তিনেক জমিতে একটা মাটির চালাঘর তুলে দেবে ওরা; সেই জমি আর এক বিঘে ধান-জমি—ওরা ক ভাই, নিজেদের ভাগ থেকেই হোক আর কিনেই হোক—লেখাপড়া ক'রে দেবে ওদের বৈমাত্র ভাই নিতাইয়ের নামে।

তবু এই খবরেই সীতার চোখে আনন্দে জল এসে গিয়েছিল; তুলসীতলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল সে। এতদিন পরে কি দুঃখিনীর ওপর দয়া হ'ল তাঁর? ছোটই হোক আর মাটিরই হোক—নিজের ঘর যা-ই হোক, তার কাছে স্বর্গ। যত যৎসামান্যই হোক, একটু সম্পত্তিও সেটা। নিতাইয়ের পৈতৃক সম্পত্তি।

কার্তিক খুঁৎখুঁৎ করছিল খুবই, 'এতেও তো ওদের চলবে না, এসব নিয়ে থুয়েও যদি আমাদের নাম ডুবোতে বেরোয় বৌমা, তখন কি করবে? মাঝখান থেকে সম্মান যা যাবার তা তো যাবেই, সম্পত্তিটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

গণেশ মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, তা যাবে না। খাওয়া-পরা তো চলছেই, তোর সংসারেই হোক আর আমার সংসারেই হোক—চলেও যাবে। নগদ টাকার যেটা দর-কার—সেটা ও থেকেই হবে খানিকটা। এর পরও বৌমা যে বাইরে কাজ নেবে তা মনে হয় না। সে প্রকৃতির মানুষ সে নয়। ঘর-বাড়ি জমির একটা টান আছে—ফেলে যাওয়াটা অত সহজ নয়।...আর সে যা-ই হোক, আমাদের কর্তব্য আমরা ক'রে গেলুম, তার ধর্মে যা হয় সে করবে। সামান্যই তো গেল—আমরা থাকতে থাকতে দিয়ে গেলুম সে-ই ভাল হ'ল। আমাদের গুণধররা কি দিতেন এর পর? কিন্তু ধর্মের চোখে দায়িত্বটা আমাদেরই থেকে যেত বরাবর।'

আরও একটা ভাল প্রস্তাব দিল গণেশ। ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বলল, 'দিদিমা, একটা কথা ভাবছিলুম। নিতাইয়ের যা পড়াশুনোর অবস্থা, ও যে কোন দিন পাস্-টাস ক'রে কেষ্ট বিষ্টু হবে তা মনে হয় না। তার চেয়ে আমি বলি কি, এক কাজ করা যাক—আমাদের নীলু স্যাকরার ঘরে ওকে সাকরেদ ক'রে দিই, সোনা-রুপোর কাজ শিখুক। দুটো তিনটে বছর লেগে-পড়ে থেকে যদি কাজটা শিখে নিতে পারে তো ওর পয়সা খায় কে তখন!'

প্রথমটা শিউরে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা, 'বামুনের ছেলে স্যাকরার কাজ শিখবে?'

'দেখুন গে যান বামুনের ছেলে জুতোর দোকান খুলে সত্তিক জাতের পায়ে

হাত দিয়ে জুতো পরাচ্ছে!' প্রায় খিঁচিয়ে উঠেছিল গণেশ, 'স্যাকরার কাজে দোষ কি? আমারই তো মামাতো ভায়রা তার ছেলেকে দিয়েছিল বোবাজারের মিনেওলার কাছে কাজ শিখতে। এখন সে শুধু মিনের কাজ করেই ডাইনে বাঁয়ে দুহাতে রোজগার করছে। সোনা চেঁচে যা গুঁড়ো বেরোয়, তা যাদের কাজ তাদের বুঝিয়ে দিয়েও যেটুকু থাকে—নষ্ট বলে বুঝিয়ে দেয় স্যাকরাদের—তাইতেই বৌ মেয়ে বোনকে সোনায় মুড়ে দিয়েছে একেবারে, কলকাতায় সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে একটা বেনেটোলায় একটা দু'খানা বাড়ি কিনেছে। তার বয়সই বা কি, ধরো চল্লিশও পেরোয় নি বোধ হয়।...... স্যাকরার কাজে পয়সা কম!—ষ্যামনে দিয়ে যাও পয়সা। যেতেও কাটে আসতেও কাটে। একই সোনা যতবার আসবে যাবে—বানির কথা ছেড়েই দাও, পানমরা খাদ-ময়লা বাবদই এতটি ঘরে উঠবে। পুরনো সোনা কেনো গালাও—সেই সোনাতেই আবার গয়না গড়াও—পুরো গিনি সোনার দাম দিয়ে যাবে খদ্দের হাসিমুখে। অমন লাভের ব্যবসা আর আছে! আমাদের নীলুই কেন ধরুন না—ছেঁড়া কাপড়ে গেরো দিয়ে পরত, সেলাই করার ছুঁচ জুটত না। সে এখন তিনশো বিঘে জমির মালিক। ঐ অতবড় বাড়ি ফেঁদেছে বাজারের মোড়ে। তবু তো এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে—শহর বাজারে থাকলে আজ ও বহু-লক্ষপতি!'

দীর্ঘ বক্তৃতা দেয় গণেশ, ঐন্দ্রিলাও অভিভূতের মতো শুনে যায়। গণেশ আবার বলে, 'লেখাপড়া কি ওর হবে মনে করেন? এতখানি বয়স হয়ে গেল—এখনও হাই ইস্কুলে যেতে পারল না। কবে পাস করবে—করে আপনার দুঃখু ঘোচাবে! আর পাস করলেই যে চাকরি পাবে তার কোন ঠিক আছে? যুদ্ধের বাজারে তবু কাজ-কর্ম মিলছিল—এবার তো লড়াই থেমেছে—ছাঁটাইয়ের পালা শুরু হবে এবার। প্রথম লড়াইয়ের পর যা হয়েছিল, খুব মনে আছে আমার। একেবারে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। মার্কিন মুলুকে হাজারে হাজারে ছোকরা আত্মঘাতী হয়েছিল কাজ-কর্ম যোগাড় করতে না পেরে!'

যুক্তি অকাট্য। ক্রমশ ঐন্দ্রিলাও বোঝে। বলে, 'তা দ্যাখো তোমরা ভাই—যা ভাল বোঝো।'...

সীতাকে বলতে সে তো রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠল। আরও পাঁচ ছ বছর কি আট বছর পরে ছেলে হয়ত পাস করবে কিম্বা তাও করবে না। সেই সুদূর এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বসে থাকার আর ধৈর্য নেই তার। তার চেয়ে, দু বছর পরে যদি পাঁচটা টাকাও রোজগার করে আনতে পারে তো সে-ই তার ভাল। তবু ছেলের রোজগার, জোরের সংগে সম্মানের সংগে থাকতে পারবে সমাজে মাথা উঁচু করে। ভিক্ষার অন্ন খেয়ে তার অরুচি হয়ে গেছে। আর সে পারেও না, পরিশ্রমেরও শেষ সীমায় এসে পড়েছে এবার, শরীর আর বইতে চাইছে না।

আরও কদিন পরে—মনের মধ্যে সমস্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো তোলা-পাড়া করে ঐন্দ্রিলারও ভাল লাগল কথাটা। মনে হ'ল বুঝি ঈশ্বরই এবার মুখ তুলে চেয়েছেন, নইলে ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ ছোটলোকগুলোরই বা এমন সুবুদ্ধি হবে কেন। মাথাগোঁজার মতো নিজস্ব একটা ঘর, যা হয় একটু জমি, আবার ছেলের রোজগার,—এ তো সীতার ভাগ্যে মণি-কাঞ্চন যোগেরই মতো। এটুকু পেলেই সে খুশী, মনে করবে সৌভাগ্যের স্বর্গদ্বার খুলে গেছে তার সামনে।......

পুজো-সিন্নি দিয়ে যেদিন প্রথম নিজের ঘরে এসে উঠল সীতা সেদিন ঐন্দ্রিলা তাকে বলেছিল, 'যাক্ বাবা—এবার আমি নিশ্চিন্তি, আমার এবার ছুটি। এখন যত তাড়াতাড়ি চোখ বুজতে পারি ততই তোর মঙ্গল, একটা দায় নেবে যায় তোর

মাথার ওপর থেকে। আমার এই একটা পেট কমলে চাই কি ভরসা ক'রে ব্যাটার বে দিয়ে বৌ আনতে পারবি ঘরে। একনাগাড়ে তো খেটে গেলি জীবনভোর—বৌ আনলে তবু সংসার হবে খানিকটা, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে বসে খেতে পারবি তার মাথায় সব চাপিয়ে দিয়ে।'

'তবেই হয়েছে।' হেসে জবাব দিয়েছিল সীতা, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি ফুটেছিল সেদিন, 'বসে খাবারই আমার বরাত দেখছ না! বরং তুমি বেঁচে থাকো—তবু একটু আহা-উহু করবার লোক থাকবে, আমার জন্যে ভাববার, আমার হয়ে টেনে কথা বলার থাকবে।...বসে খাবার সময় যদি সত্যিসত্যিই আমার আসে কোন দিন তো দেখো—সেইদিনই আমি পটল তুলব।'

কথাটা হাসতে হাসতেই বলেছিল সীতা। কে জানে সে সময় তার বিধাতা-পুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা, একটু হেসেছিলেন কিনা!...

মুখে যাই বলুক, এ ঘরে এসে সীতার শুধু আনন্দ নয়, আশাও জেগেছিল একটু। ঘরটা যেন নানাদিক দিয়েই পয় ফলাচ্ছে মনে হয়; এবার হয়ত সত্যিই তার নিরন্ধ্র দুঃখের দিন কাটতে শুরু হ'ল। সব জিনিসেরই আয়-পয় আছে—এ তো নিজের বাস্তু জমি, ভিটে। ঘর করা নাকি অনেকের সয় না—মা বসুমতীকে আঘাত দিয়ে ভিদ গাড়া। অবশ্য এ মাটির ঘর, ভিদ গাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে নি—তবু ভয় একটু ছিল বৈকি মনে মনে। বিশেষ তার যা বরাত। কিন্তু এ ঘরে এসে ওঠবার পর অনেকগুলো সুবিধে হয়ে গেল।

নিতাই নিলুর ওখানে সাকরেদ হয়ে ঢুকেছে দু তিন মাস আগেই, গণেশ যখন কথাটা পেড়েছিল প্রায় তখনই। কিছু দেবার কথা নয়— খানিকটা অন্তত কাজ না শিখলে। এরাও তা আশা করে নি। দয়া ক'রে কাজ শেখাচ্ছে এই ঢের। আর সত্যিই, ওকে দিয়ে তার তেমন কোন উপকার হচ্ছে না এখন। কিন্তু হঠাৎ, এখানে আসার মাসখানেক পরেই, তার দু-টাকা ক'রে মাসে জলপানি বরাদ্দ ক'রে দিলে নীলু, নিজে থেকেই। বললে, 'বামুনের ছেলে, সেই কোন সকালে দুটি ভাত খেয়ে আসে—সারাদিন পড়ে থাকে এখানে—কিছু না দিলে অধর্ম হবে যে!'

কথাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি সীতার। ছেলের রোজগারের টাকা হাতে করবে সে! এক টাকাই হোক, দুটাকাই হোক—ভিক্ষার দান নয়, দয়ার দান নয়--দাসীবৃত্তিরও পুরস্কার নয়। ছেলের দশ আঙুলে খাটা কড়ি। আজন্ম যা দেখে আসছে—দয়া আর অবহেলা—এ তা নয়, তা থেকে কিছু স্বতন্ত্র। দুটাকা ভবিষ্যতের বহু টাকার অঙ্কুর। নূতন স্বর্ণালোকিত জীবনপথের দ্বার-উন্মোচন। খবরটা শুনে মনে হয়েছিল একবার অতর্কিতেই—এত সুখ তার কপালে সহ্য হবে না হয়ত!

এর মধ্যে আর একটু সুবিধা হয়ে গেল ওর। ক্রীতদাসীত্ব থেকে আপনিই মুক্ত হয়ে গেল—পুরোপুরি না হ'লেও আংশিক। ওর যখন ঘর উঠেছে তখনই কার্তিকের বড় ছেলের বিয়ে হয়। সে বৌ দেখতে খুব ভাল নয়, বয়সও ঢের—কিন্তু কাজের মেয়ে, শাশুড়ীর ঠিক উল্টো। ওদের আপনা-আপনির মধ্যেই, ঘরবর কতক জানা-শুনোই, এখানে এর আগে একবার থেকে গেছে সে দুতিন দিন—কনে বৌ বলতে যা বোঝায় তা নয়। এবার এসেই সে রান্নাঘরে ঢুকল, হাঁড়ি-হেঁসেলের প্রধান ভারটা তুলে নিল। সুতরাং নিয়মিত দুবেলা রান্নার দায়িত্ব আর তার রইল না। অনেকখানি স্বাধীনতা পেল। খাটে ঠিকই—কিন্তু এক জায়গায় বাঁধা মাইনের ঝি কি রাঁধুনীর মতো নয়, আশ্রিত গলগ্রহের মতো নয়, এ খাটুনিতে সম্মান আছে কিছু।

এখন সে সব সংসারেরই কিছু কিছু কাজ ক'রে দেয়। তাতে হয়ত আগের চেয়ে খাটুনি কিছু বেশীই হয়—তবু তার ভাল লাগে। এর ফলে সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করে, কেউ চাল কেউ তেল কেউ কাপড়। কোন কোন দিন খেতেও বলে কেউ কেউ। বললে ওদের তিন পুরুষকেই বলে। আজকাল ঐন্দ্রিলাও ঘুরে ঘুরে এদের সংসারে অনেক কাজ ক'রে দেয়—আরও হয়ত দিতে পারে, সীতাই বেশী যেতে দিতে চায় না ওধারে। মার রসনা ও মেজাজ অনেকটা সংযত হয়েছে ঠিকই—কিন্তু স্বভাব এত সহজে যায় না, তা সীতা জানে। দুঃখের জীবনে তার বহু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, অনেক অল্প-বয়সেই। মানুষের মন বুঝতে শিখেছে সে অনেকের চেয়েই বেশী।

আরও একটা সুযোগ ঘটে গেল তার অকস্মাৎ। মধ্যে মধ্যে সামান্য কিছু ক'রে নগদ উপার্জনের উপায় হয়ে গেল। এ অসম্মানের কিছু নয়। কোথাও নিচু হ'তে হবে না এর জন্যে। বরং সর্বদিক দিয়ে ভেবে দেখলে বেশ সম্মানেরই কাজ। কাজটা এলও সেধে, আপনা থেকেই। এখানকারই একটি মেয়ে, বনলতা নাম—কলকাতায় মামার বাড়িতে ছিল দীর্ঘকাল, নাকি তিনটে পাসও করেছে—কিছু-দিন হ'ল দেশে এসে বসবাস করছে। বিয়ে-থা হয় নি কিন্তু সেজন্যে কুণ্ঠিতও নয়, দুঃখিতও নয়। সে-ই এসে বাড়ি বাড়ি আলাপ ক'রে গেছে, নইলে হয়ত কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলবারও সাহস হ'ত না সীতার। জামাজুতো পরা লেখাপড়া জানা হালফ্যাশানের মেয়ে—তাদের সঙ্গে মিশবে এ তাদের ধারণাতেই আসে না।

বনলতা শুধু মিশলই না, বেশ ভাবও জমিয়ে নিল সীতার সঙ্গে। 'মামী' 'মামী' করত, গ্রাম সম্পর্কে—মামীর মতোই মান্য করত, অন্তত বাহ্যিক ব্যবহারে। তার মতো সামান্য অবস্থার গরীব দুঃখী লোককে ঘেন্না করে না, ঘরে বসে গল্প ক'রে যায়—এতে সীতা তার কাছে কৃতজ্ঞও ছিল মনে মনে। বনলতাই কথাটা তুলল এক-দিন। মামী একটা কাজ করতে পারবে? তা'হলে কিছু নগদ পয়সা হাতে আসে খুব সহজে। কাজ অবশ্য কিছুই না—কী একটা রাজনৈতিক দল (এসব শব্দও সীতার অপরিচিত), কী যেন পার্টি না কি যেন বলে তাকে—তারা একটা মিছিল বার করবে; মিছিলটা বড় না হ'লে কারুর চোখে পড়ে না, অথচ তাদের দলে অত লোক নেই, সেইজন্যে তারা ঠিক করেছে বাইরে থেকে যদি কেউ তাদের মিছিলে যোগ দেয় তো যারা বেরোবে তাদের প্রত্যেককে দশ আনা পয়সা, গাড়িভাড়া আর একবেলার খাওয়া দেবে। মামী যাবে?

কথাটা বুঝতেই খানিক সময় লাগল সীতার। সে ভেবে পায় না যে তার কাজটা ঠিক কী। এত পয়সা কি কেউ অমনি দেয়? সে জিজ্ঞাসা করে, 'তা সেখানে গিয়ে কি করতে হবে আমাকে?'

'কিছুই করতে হবে না। ওমা, এ কি কারখানার চাকরি নাকি যে কিছু একটা করতে হবে! শুধু হেঁটে যাবেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে—এই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তারা যখন একটা ধুয়ো ধরিয়ে দেবে—সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেই কথাটা বলবেন। তাও, যদি আপনার কষ্ট বোধ হয় তো চুপ ক'রে থাকবেন—শুধু গেলেই হবে।'

দশ আনা পয়সা—গাড়িভাড়া, আবার খাওয়া। প্রলোভন বড়ই বেশী। খানিকটা ইতস্তত ক'রে কতকটা বিমূঢ়-ভাবেই যেন প্রশ্ন করল সীতা, 'তা তাতে নিন্দে হবে না পাড়া-ঘরে? লোকে যদি কিছু মন্দ বলে—?'

'মন্দ বলবে কেন! এ তো দেশের কাজ। আজকাল মেয়ে-পুরুষ মিলেই তো দেশের কাজ করে সব জায়গায়।...সরকার মানে গবর্মেণ্ট অন্যায় কাজ করছে, সরকার

চোর মিথ্যেবাদী, পুঁজিবাদীদের দালাল—তাদের নিন্দে করতে, তাদের কাজের প্রতিবাদ করতেই আমরা বেরোই। এর মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই। এ তো গৌরবের কাজ। কত বড় বড় নেতারা বেরোয় এই সব মিছিলে জানেন? কত মান্যগণ্য লোক—সরকারও তাদের সমীহ করে চলেন। তাদের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে পথে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ছেলেদের মধ্যে। আর আমরাও তো আছি, আমাদের যদি নিন্দে না হয়, আপনার হবে কেন?...দেখবেন কত তাবড় তাবড় বাড়ির মেয়েরা, যাদের সামনে দাঁড়াতেও আপনারা ভয় পান—তারা বেরিয়ে পড়েছে।...আর এখানেও তো নয়, বাসে ক'রে শহর-বাজারে যাবেন, সেখান থেকে হেঁটে যেতে হবে খানিকটা। সে ঢের দূর, এখানকার কেউ টেরই পাবে না হয়ত।'

নানাযুক্তিতে সে অভিভূত করে সীতাকে। শেষ পর্যন্ত কথা নিয়ে তবে ওঠে। এবং সেই কথা নেওয়ার অজুহাতেই পরের দিন যথাসময়ে এসে ওদের ঘরে হাজির হয় বনলতা। এক রকম জোর ক'রেই ধরে নিয়ে যায়। কালকের অর্ধসম্মতির আজ আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সীতার মনে—এখন তো রীতিমতো ভয়ই করছে—তবু চক্ষুলজ্জাতে পড়েই যেতে হয়। সামান্য অনিচ্ছা প্রকাশ করতেই বনলতা যা কট্‌কট্‌ ক'রে কথা শুনিয়ে দিলে, তারপর আর 'না' বলবার সাহস হয় না।

অবশ্য কাজটা এমন কিছু নয়—সত্যিই। যেটুকু হাঁটতে হ'ল—সেটুকু সীতার কাছে কোন পরিশ্রমই নয়। এর চেয়ে ঢের কঠিন পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত। ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতেই যা একটু লজ্জা হয়েছিল প্রথম দিকটায় (বনলতা বলে 'আওয়াজ তোলা'), কিন্তু ক্রমে তাও সয়ে গেল। সকলের সঙ্গে বলায় খুব একটা চেঁচাতেও হয় না। অবশ্য গাড়িভাড়া যে সকলের দিল ওরা তা মনে হ'ল না। হুড় হুড় ক'রে লোক সব উঠে পড়ল বাস্-এ, কে কার টিকিট নেয় আর কী করে। পাঁচ-ছ জনেরও টিকিট কেটেছে কিনা সন্দেহ—কন্‌ডাক্‌টরকে ভয় দেখাচ্ছিল—এসব জনতার ব্যাপার, বেশী গোলমাল করলে ভাল হবে না। সে মরুক গে, দিলেও ওর আঁচলে তো উঠত না;—যেটা নিয়ে তার মাথাব্যথা, সে দশ আনা পয়সাটা সে পেয়েছিল ঠিক ঠিক। অবশ্য সবাই নাকি পায় নি, সেজন্যে কিছু কিছু অসন্তোষের গুঞ্জনও কানে এসেছিল—কিন্তু সেটা ঠিক কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত তা সীতা জানে না। তার পয়সাটা বনলতা নিজে এনে তার হাতে দিয়েছিল। ঐটেই লাভ। নিখরচায় দশ আনা পয়সা পাওয়া। খাবারও দিয়েছিল, তবে সে খাবার খেতে পারে নি সীতা। রাস্তায় বসে শালপাতা পেতে রুটি আর ডাল খাওয়া তার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। সে রুটিও এক একটা এক রকমের। নানান বাড়ি থেকে এসেছে নাকি, ক্ষমতা বুঝে কোন্ বাড়ি কখানা দেবে তার বরাত দেওয়া হয়েছিল। কেউ চল্লিশ কেউ পঞ্চাশখানা রুটি ক'রে দিয়েছে। ডালটা কেবল বান কেটে কাঠের জ্বালে এখানেই সেদ্ধ করা হয়েছে এক কড়া। সেদ্ধই—তাতে কেবল হলুদ গুঁড়ো আর একটু নুন পড়ল। সীতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সে ডাল রান্নার ছিরি। না তেল না ঘি—না কোন সম্বরা। অবশ্য ভাল ক'রে রান্না হলেও সীতা খেতে পারত না। প্রবৃত্তি হ'ত না তার। বিধবার সংস্কারে বাধত। বনলতাও খুব একটা পীড়াপীড়ি করল না। শুধু মামী মুখে একটু জল পর্যন্ত দিলে না বলে আপসোস করতে লাগল।...

ফিরতেও বেশ রাত হ'ল সীতার। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় যখন বাড়ি এসে পৌঁছল তখন তার সেই অবসন্ন দৃষ্টি ও একান্ত শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে ঐন্দ্রিলা আগুন হয়ে উঠল একেবারে। ঝাঁ ঝাঁ করে বকলও খুব খানিক।

'বলি তোর আক্কেলটা কি? কিসের জন্যে এমন খুন হ'তে গিয়েছিলি তাই

শুনি? ভেবে মরছি আমি, চোদ্দবার ঘর বার করে করে আমার পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল।...সেই কোন্ সকাল নটা দশটায় বেরিয়েছে—ফিরল এই রাত এগারোটায়। ছেলেটা সুদ্ধ ভেবে অস্থির।...ভারী ঐ ক আনা পয়সার জন্যে প্রাণটা খোয়াবি নাকি?...কী ছিরি হয়েছে মুখচোখের, একবার কোন ঘরে গিয়ে আয়নায় দ্যাখ দিকি। মুখে যেন কে সাত বুরুশ কালি মেড়ে দিয়েছে!......এরা বার বার জিজ্ঞেসা করে—কোথা গেল কোথা গেল, বড় নাতবৌয়ের পিঠের ব্যথা বেড়েছে, ওরা খোঁজ করছিল যদি ডাল ভাতটা ক'রে দিতে পারিস—তা কী যে বলি তারই ঠিক নেই। নিজেই গিয়ে যতটা পারি রান্না তুলে দিলুম, বললুম বনলতার সঙ্গে কোথায় গেছে, সেই ধরে নিয়ে গেছে কি কাজের জন্যে। কার্তিক বললে, ও মেয়েটা নাকি ভাল নয়, নানা-রকম ভুচুং দিয়ে মেয়েদের টেনে নিয়ে যায় বাজে কাজে।...আর কখনও ওর সঙ্গে যাবি নি বলে দিলুম। এবার এলে সোজা বলে দিবি—ভদ্রলোক গেরস্তঘরের মেয়ে আমি—ওসব আমার দ্বারা হবে না। দশ আনা পয়সার জন্যে কি যমের বাড়ি যেতে হবে নাকি?'

সেদিন এবং তার পরেও কদিন পর্যন্ত সীতারও সেই রকম মনোভাব ছিল। আর ওসবের মধ্যে যাবে না সে। ভাল লাগে না ওর—নিজেকে একেবারে বেমানান মনে হয়। ওসব তার মতো মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ের জন্যে নয়। এসব কাজ কিছু বোঝেও না সে ভাল কি মন্দ—তাইতেই আরও অস্বস্তি বোধ করছে। আর দর-কারই বা কি, এই ধরনের আন্‌টো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার!...রাস্তার ধারের বাড়ি-গুলো থেকে ভদ্রলোকরা যেভাবে চাইছিল তাদের দিকে, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল সীতার।

কিন্তু দিনকতক পরে আবারও একদিন টেনে নিয়ে গেল বনলতা। এবার বরাদ্দ বারো আনা। মিছিল বেরোবে কলকাতায়, ট্রেনে ও বাসে যেতে হবে। তা হোক বনলতা নিজে এসে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে যাবে রাত্রিবেলা, কোন ভাবনা নেই। আর খুব যদি লজ্জা করে তো মামী যেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে।......ঐন্দ্রিলাকেও নানা যুক্তিতে কাবু করল। পয়সারও খুব দরকার, সেইটেই বড় যুক্তি। জিনিসপত্র চেয়ে নেওয়া চলে, হাত পেতে নগদ পয়সা নেওয়া বড় লজ্জার। মধ্যে অনেক দুঃখ ক'রে বৌদিকে চিঠি লিখেছিল ঐন্দ্রিলা, কনক তার উত্তরে দুটি টাকা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়েছে। লিখেছে যে ওর দাদা যে বৌয়ের হাতে কখনও হাত তুলে এক পয়সা দেয় না তা তো জানেই ও, মিছিমিছি তাকে বিব্রত করে কেন? হেমকে বলে বিস্তর কান্নাকাটি ক'রে এইটুকুর ব্যবস্থা করেছে সে, আর কিছু করতে পারল না। হেমেরও খুব টানাটানি চলছে। জিনিসের দাম বেড়েছে চারগুণ—মাইনে বাড়ে নি। সস্তায় রেশনটা পাচ্ছে—সেই তবু রক্ষে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, খরচ কি কম। ফ্রীতে পড়ে, তবু বইখাতার খরচই কত। চাকরিও হেমের বেশী দিন নয় আর, এর পর যে কী করবে সেই ভেবে এখন থেকে ঘুম হয় না। এখন সন্ধ্যেয় ফিরে একটা দোকানে খাতা লিখে—পনেরো টাকা পায় হেম, সেই ভদ্রলোকই বলেছে চাকরি গেলে সে পুরো দিনের জন্যেই রাখবে, কিন্তু সে আর কতই বা মাইনে দেবে। ইত্যাদি—

এর পর বনলতার সঙ্গে যেতে বারণ করাও কঠিন বৈকি!

আরও দু-একদিন এই ভাবে বেরোতে হ'ল সীতাকে। কথাটা চাপাও রইল না বাড়িতে। কার্তিক বাঁকা হাসি হেসে গণেশকে বলল, 'কালে কালে হ'ল কি! স্বাধীন ভারতে সবাই দেখছি ডবল প্রমোশন পেয়ে গেল। অমন বৌমা যে বৌমা, সাত চড়ে রা বেরোত না যার, সেও লীডার হয়ে গেল!'

কথাটা সীতার কানেও উঠল। ওঠবার মতো ক'রেই বলেছিল কার্তিক। লজ্জাও হ'ল একটু। তবু আরও খারাপ ভাবে যে নেয় নি এই ভাল। একেবারে সোজা-সুজি বারণও করে নি। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলতে হবে।...

এরই মধ্যে একদিন—দিনটা খুব মনে থাকবে ঐন্দ্রিলার, জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও—সকাল থেকেই মন খারাপ ক'রে বসে ছিল সীতা গুম খেয়ে। মন খারাপের কারণ, হরির নোট দেবে বলে অনেক কান্ড ক'রেও পাঁচটা পয়সা যোগাড় করতে পারে নি। অবশ্য হাতে পয়সা ছিল না বলে যে পাঁচ পয়সার বাতাসা আসত না তা নয়, ছেলেকে পাঠিয়ে পাঁচুর দোকান থেকে আনানো যেত অনায়াসেই—অমন দু এক পয়সার জিনিস আনিয়েছেও সে বহুবার কিন্তু হরির নোট দেবে বলেই ধার করতে মন সরে নি। দেবতার পুজা ধার ক'রে দিতে নেই—তার স্বামী প্রায়ই বলতেন। অথচ ঘরদোর সব খুঁজেও তিনটের বেশী পয়সা বেরোয় নি। জমি পেয়েছে কিন্তু তার ধান তখনও ওঠার সময় হয় নি। সেই বা আর কত, এক বিঘেতে বড় জোর দশ মণ ধান হবে, ভাগের পর, অর্ধেক পাঁচ মণ পাবে সে। কিন্তু সে এখন সুদুর-পরাহত। এখন এই অবস্থাটাই প্রত্যক্ষ—দুটো ফুটো পয়সার জন্যে তার হরির নোট দেওয়া বন্ধ রইল। বৌদের কারও কাছে চাইলে পেত সে, দুটো চারটে কেন—চার আনা পয়সাও পেতে পারত। কিন্তু ঐ একই কারণে চাইল না। এ হরির নোটের উপলক্ষটা এমনই যে ভিক্ষে ক'রে বা ধার ক'রে দিতে মন উঠল না তার। বরং দুদিন পরেই দেবে, ছেলের জলপানির টাকাটা হাতে পেলেই—তবু এ হরির নোট ভিক্ষে ক'রে দেবে না সে কিছুতেই।

উপলক্ষটা সৌভাগ্যসূচকই—অকল্পিত অভাবনীয় সৌভাগ্য। কাল সন্ধ্যায় খবরটা দিয়েছে নিতাই। এ মাস থেকে তার জলপানি পাঁচ টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছেন নীলু-কাকা। এই সামনের মাসেই সেই হারে পাবে সে। দু' টাকা নয়—পুরো পাঁচটা টাকা। খবরটা নিয়ে প্রায় নাচতে-নাচতে এসেছিল নিতাই—খুশীতে ডিগবাজি খেতে খেতে। তার নম্র স্বভাবে, বাধ্য বিনত ব্যবহারে এবং কাজ শেখবার আগ্রহেই খুশী হয়েছে নীলু, সে কথা সে গণেশের কাছে বলেওছে এর মধ্যে একদিন। তাতে গণেশই শুনিয়ে দিয়েছিল নীলুকে, 'কিছু তো কাজ হচ্ছেই ওকে দিয়ে, তা একটা চাকর রাখতে হ'লেও ধরো তোমার গে ওর চেয়ে বেশী খরচ হ'ত—আর এ তো ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে তোমার হুঁকোর জল পাল্টানো পর্যন্ত সবই করছে শুনতে পাই। দাও না কিছু বাড়িয়ে, বিধবাটার একটু সুসার হয়।'

এ বেতনবৃদ্ধি নিশ্চয় সেই কথারই ফল। তবু দু টাকা থেকে একেবারে পাঁচ টাকা হবে, আশা করে নি সীতা। এত তাড়াতাড়ি সুপারিশটা কাজে লাগবে তাও ভাবে নি। সব দিক দিয়েই অপ্রত্যাশিত সুখবর। সত্যিই বুঝি পাথরচাপা কপালের প্রণাম জানিয়েছিল মনে মনে—এ ঘরে উঠে আসারই ফল এটা, নতুন ঘর নতুন সৌভাগ্যরই সূচনা করেছে।

ধন্যবাদ দিয়েছিল ভগবানকে, যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেবার কারণ এতাবৎ তার ঘটে নি কোনদিনই, নিতান্ত দেওয়া স্বভাব বলেই দিয়েছিল। বাস্তু দেবতাকেও প্রণাম জানিয়েছিল মনে মনে—এ ঘরে উঠে আসারই ফল এটা, নতুন ঘর নতুন সৌ-ভাগ্যরই সূচনা করেছে।

সেই সময়েই সঙ্কল্প করেছিল সকালে উঠে পাঁচ পয়সার হরির নোট দেবে।

আজ না দিলে ক্ষতি নেই অবশ্য, বর্ধিত বেতনের টাকাটা থেকেই দেওয়া উচিত

বরং—তবু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল সীতার। কেন এমন হ'ল কে জানে, এমন তো বাধা পড়ে না কখনও। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। ভাত চড়াল না, রান্নার কোন যোগাড়ই করল না। শেষে ঐন্দ্রিলাই তাড়া দিল একসময়, 'আ মর, থুম হয়ে বসে রইলি হাত পা গুটিয়ে, ছেলেটা খেয়ে যাবে কি? একে তো এই ভাত খেয়ে যায় বাড়ি থেকে, আবার সেই রাত্রে বাড়ি এসে ভাত খায়—এই এত বড় বেলা দাঁতে কুটো কাটে না একটা। তাও যদি দুটো পেটে না পড়ে তো ছেলেটা মরে যাবে যে।...ওঠ, ভাত চাপা।...আর এবার তো যা হয় ভগবান একটু মুখ তুলে চাইলেন—এবার থেকে ওকে একটা ক'রে পয়সা দিয়ে দিস রোজ—মুড়ি কিনে খাবে। এমনভাবে পিত্তি পড়া ঠিক নয়—বিশেষ ওদের কাঁচা বয়স।...শরীর ভেঙ্গে যাবে একেবারে।'

মার ধমকে সচেতন হয়ে উঠেছিল সীতা। সত্যিই তো, যে ছেলের জন্যে হরির নোট, সে-ই শেষে উপবাসী থাকবে নাকি সারাদিন? এত মন খারাপ করারই বা কি আছে। ভগবান কি আর তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পারছেন না? সীতাও যেন নিজেকে ধমক দিয়েই সক্রিয় ক'রে তুলেছিল।

তারপর অবশ্য সবই যথানিয়মে চলেছিল। নিতাই ঠিক সময়েই খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রান্নাতে বেশী দেরি হওয়ার কোন কারণ নেই, ডাল ভাতে আর ডুমুরের তরকারী—এই তো রান্না। কাঠের জ্বালে কতটুকুই বা সময় লাগে।

নিতাই খেয়ে বেরিয়ে গেলে সীতা এটা ওটা খুচরো কাজ সারছিল তার। স্নান ক'রে এসে ওদের সংসারে যাবে—কারও কোন কাজ আছে কিনা খবর নিতে। গণেশের শাশুড়ী এসে আছেন, ওখানে নিরামিষ হেঁশেলে রান্না বেশী। হয়ত সীতার জন্যে অপেক্ষাই ক'রে আছে গণেশের স্ত্রী। কিন্তু রেঁধে দিয়ে এলে লাভ বই লোকসান নেই, দুটো একটা তরকারী নিয়েও আসতে পারবে নিতাইয়ের জন্যে। ঐন্দ্রিলা স্নান সেরে পুজোয় বসেছে, সেও যাবে একটু পরে ওদিকে—ছোট গিন্নীর ডাল ভিজানো আছে, বড়ি দিয়ে দিতে হবে। ওদের এটা খাওয়ার সময় নয়। একবার খাওয়া—যত বেলা গেলে খায় ততই ভাল।

সীতা ঘর-বারান্দা নিকিয়ে স্নান করতে যাবে, এমন সময় ঝড়ের মতো বনলতা এসে হাজির। আজ একটা বিরাট ব্যাপার ক'রে তুলছে তারা, অনেক লোকের দরকার। আজ গেলে পুরো একটা টাকাই পাওয়া যাবে খরচ ছাড়া; তবে সময় মোটে নেই, কারণ যেতে হবে সেই বাগনানের দিকে, অনেক দূরে। বাস ট্রেন অনেক হাঙ্গামা। যেতে 'হলে এখনই বেরোতে হবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা না হ'লে গাড়ি ধরা যাবে না।

ঐন্দ্রিলা হাঁ হাঁ ক'রে উঠেছিল 'সারা দিনের ফের, অতদূরে যাওয়া—ফিরতেই কোন্ না বেশী রাত হবে—রান্না ভাত দুটি মুখে দিয়ে যা। একটা জল খাওয়া নেই কিছু না, রাত্তিরে একগাল মুড়ি চিবিয়ে থাকা—দিনান্তরে দুটো ভাতও যদি না পেটে পড়ে, তা'হলে বাঁচবি কি ক'রে?'

কিন্তু ভাত খওয়ার আগে স্নান সারা আছে, আহ্নিকপুজো আছে—খুব তাড়াতাড়ি সারলেও আধ ঘণ্টা। বনলতা হাত-ঘড়িটা দেখিয়ে বলেছিল, 'উঁহু, অত সময় নেই। আজ তাহ'লে থাক—আমি একাই যাচ্ছি। তবে আজ গেলে ভাল হ'ত। আমি না হয় ওদের বলে কয়ে আরও কিছু বেশী পয়সা পাইয়ে দিতুম, পথে কোথাও বসে একটু জলটল খেয়ে নিতে পারতেন, কী চাট্টি মুড়ি।'

বলতে বলতেই সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল—অর্থাৎ চলে যাবার ভূমিকা। সীতা যেতে দেয় নি। একটা টাকার প্রলোভন ত্যাগ করা আজ তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সকালের

হতাশা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি মন থেকে। তাছাড়া, তার মন বলে—এ সুযোগও ভগবানেরই দেওয়া, এও তার আসন্ন সুসময়েরই একটা লক্ষণ।

সে তিনচার মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়েছিল। মাকে বুঝিয়েছিল যে, একদিন না খেলে মানুষ মরে যায় না। একাদশী তো মাসে দুটো করতে হয়—না হয় আরও একদিন করল। একটু গুড় গালে দিয়ে জল খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বনলতার সঙ্গে।...

অপরাহ্ন পেরিয়ে গেল। সন্ধ্যাও পার হয়ে গেল এক সময়ে। গভীর রাত হ'ল ক্রমশ। পাড়াঘর নিষুতি হয়ে এল। যুগলবাবু রাত দশটার সময় প্রত্যহ মদ খেয়ে মাতলামি করতে করতে যান এই পাড়া দিয়ে, তিনিও চলে গেলেন। কিন্তু তবু সীতার দেখা নেই। সকালের ভাত জল দিয়ে রেখেছিল ঐন্দ্রিলা। সেই ভাতই নিতাইকে দিল। চাল ধুয়ে ঠিক ক'রে রেখেছে—সীতা এলেই পাতা-লতা জেবলে চড়িয়ে দেবে। যে লোক বাইরে তার জন্যে ভাত রেঁধে রাখতে নেই—অকল্যেণ হয়, নইলে ফুটিয়েই রাখত গরম ভাত দুটি।...কিন্তু আর কখন আসবে সে?

ঐন্দ্রিলা আর থাকতে না পেরে গণেশের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। গণেশ অনেক বাঁকা এবং কটু কথা শোনাল, কিন্তু বেরিয়েও পড়ল একটা ছেলেকে ডেকে আলো এবং লাঠি নিয়ে। তাতেও খবর বিশেষ পাওয়া গেল না, বনলতা সুকুমার —যারা ও দলের পান্ডা এখানকার, তারা কেউই ফেরে নি। ওধারে হয়ত ঠিক সময় গাড়ি ধরতে পারে নি কিম্বা এদিকেরই—তাই ফিরতে পারে নি কেউ। ঘুরে এসে এই আশ্বাসই দিয়েছিল গণেশ।

একেবারে সকালবেলা সুকুমার এসে খবরটা দিল। কাল ওখানে ওটা ঠিক ঠিক সাধারণ প্রতিবাদ মিছিল নয়—আর একটু গুরুতর ব্যাপার ছিল। হাঙ্গামা প্রবল হয়ে ওঠায় পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়—আর তার ফলেই,—একটা গুলি ছিটকে এসে লেগে সীতা মারা গেছে। লাশ পুলিশের জিম্মায় আছে এখনও। ও'রা কি কেউ যেতে চান?

॥ ৪ ॥

ভগবানের এই শেষ চরম মার—এই এত বড় আঘাতটাও ঐন্দ্রিলাকে একা সহ্য করতে হ'ল—নিদারুণ দুঃসময়েও কেউ কাছে এসে দাঁড়াল না। খবর গিয়েছিল সব জায়গা-তেই। কিন্তু কেউই আসতে পারে নি। এসেছিল একমাত্র বুড়ো—মহার বড় ছেলে। সে আসা আর না আসা দুই-ই সমান।

শ্যামা খবরটা শুনে দুঃখিত হয়েছিলেন খুবই। নাতনী বলে নয়, সীতাকে তাঁর স্বভাবের জন্যেই ভালবাসতেন। তাহলেও—তাঁর আসা সম্ভব নয়। জীবনে কোন দিন জামাইবাড়ি যান নি তিনি—জামাইবাড়ি যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সামর্থ্যও এসেছে কমে। সব চেয়ে বড় কথা—এখন বাড়ি-ঘর ছেড়ে এক বেলার বেশী থাকা সম্ভব নয় কোথাও।

দুঃখ হয়েছিল ঠিকই—তবে যে খবরটা দিতে এসেছিল তাকে কথাও শোনাতে ছাড়েন নি! মেয়ে তাঁর নির্বোধ—নাতনী আরও নির্বোধ হবে সেইটেই স্বাভাবিক। আর মরতে বোকারাই মরে চিরকাল। গেরস্ত ঘরের মেয়ে-ছেলে, বামুনের বিধবা —ও সব ধিঙ্গীপনা করতে যাওয়াই বা কেন! ঐন্দ্রিলার কি এতখানি বয়সেও এত-

একটু আক্কেল হ'ল না! সে কী বলে এ সব বরদাস্ত করেছে! সে বারণ করতে পারে নি? যেমন এই বেহায়াপনায় প্রশ্রয় দিয়েছে—তেমনি মরুক এখন আজীবন কপাল চাপড়ে। স্বাধীন হয়েছেন সব, স্বাধীন জেনানা। মন্দদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লীডারী করবেন।......সরকারের সঙ্গে লড়বেন। রাজত্ব উল্টে যাবে তাদের একেবারে, কতক-গুলো পাড়াগেঁয়ে মেড়ার ঐদুটো বুকনিতে। হাত্তোর বুদ্ধি রে! বোকা, বোকা। মেগেটা তাঁর চিরকাল বোকা। ঐ নাতনীকে তাঁরা এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন —এ কটা তুচ্ছ কারণে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাক্ষসের ঘরে তুলে দিয়ে এল। সেই বোকামির ফল জীবন-ভোর ভোগ করছেন নিজে—নিজের মেয়েও। কথায় বলে না, যে মরবে আপনার দোষে, কী করবে তার হরিহর দাসে! তা ওদেরও হয়েছে সেই দশা!

বিস্তর কথা শুনিয়ে—ঘরে কিছুই নেই, ছেলেটিকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না বলে বিস্তর দুঃখ প্রকাশ ক'রে—একটা টাকা বার ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি গরীব মানুষ, এর বেশী আর তাঁর সামর্থ্য নেই, ঐন্দ্রিলা তো জানেই তার মায়ের অবস্থা। পরের টাকা সুদে খাটিয়ে দেন—লোকে ভাবে না জানি কত বড় মহাজন... সে সঙ্গতি থাকলে মেয়েকে পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করতে দেবেন কেন?......

হেমও আসতে পারে নি। কারণ ঠিক সেই সময়েই কনক গুরুতর পীড়িত, শয্যাগত হয়ে পড়েছিল। যার কখনও অসুখ করে না বিশেষ, তার একটু কিছু হলেই লোকে অঘটন ভাবে, অসুবিধাতেও পড়ে। এ তো টাইফয়েড, সত্যি সত্যিই সাংঘাতিক অসুখ। বাড়িতে দেখবার বা করবার লোক নেই বলে রেলের হাসপাতালে দিয়েছে, কিন্তু তাতে দায় বেড়েছে আরও। নিজের ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া সব দেখতে হচ্ছে হেমকেই। রান্না সে কোন দিনই করে নি, করতে পারেও না—তবু যা হোক আধসেদ্ধ-পোড়া—নামিয়ে দিতে হচ্ছে। বিকেলে বাজার থেকে রুটি করিয়ে আনে, কোন্ দোকানীকে চারটে পয়সা আর আটা দিয়ে। কিন্তু তারও ঝঞ্ঝাট আছে—তার সঙ্গে আছে হাসপাতালে ছুটোছুটি। কাজেই আর এক পাও কোথাও নড়া সম্ভব নয়।

আর—হেম কথাটা লিখেও ছিল ঐন্দ্রিলাকে—এসেই বা কি করবে। মরা তো আর বাঁচাতে পারবে না। চিঠি আসতে আসতেই তো তিন দিন কেটে গেছে— অপঘাত মৃত্যু, শ্রাদ্ধ-শান্তি যা হবার তা এর মধ্যে হয়ে গেছে নিশ্চয়। শোকের প্রথম প্রচণ্ড দুঃসহতাও কেটে এসেছে অনেকটা। এখন গিয়ে লাভ কি? নাবালকের ভার নেবার সাধ্য তার নেই যখন, তখন না যাওয়াই ভাল। আপন নিয়মে যা হচ্ছে তাই হোক। যারা এতকাল দেখেছে তারাই দেখবে নিশ্চয়।...

গোবিন্দদের বাড়িও খবর পাঠিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। পাড়ার একটি ছেলে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই এসব খবর দেবার ভার নিয়েছিল। নিজে গাড়িভাড়া খরচ করে ক'রে ঘুরেছিল, যদিও ফল কিছুই হয় নি। অনর্থক তার এই ক্ষতি করার জন্যে ঐন্দ্রিলা লজ্জাই বোধ করেছিল পরে।

রানী-বৌদি মরবার পর ওদের কোন খবরই পায় নি দীর্ঘকাল। বড়মাসীর মৃত্যুসংবাদটাও এখানে এসে শুনেছে এবার। বড় দুঃখে শেষ জীবনটা গেছে কমলার। পক্ষাঘাতের মতো সব অঙ্গ পড়ে গিয়েছিল, ইদানীং উঠতে পারতেন না একেবারেই। ফলে অনেক সময় ময়লা মেখেই পড়ে থাকতেন। গোবিন্দর নতুন বৌ এ সব পারত না—মনও ছিল না তার। একে তো শ্বশুরবাড়ি পা দেওয়া থেকেই জুতোসেলাই চণ্ডীপাঠ খাটুনি শুরু হয়েছে, তার ওপর শয্যাশায়ী রুগীর সেবা—অত সে পারে

না। আগে নাতনীরাই দেখত; কিন্তু গোবিন্দ নিজের বিয়ের পরেই এই পক্ষের সম্বন্ধীর সঙ্গে পরিবর্ত করে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, সে শ্বশুরবাড়িতেই থাকে বেশির ভাগ। ছোট মেয়েটাকে তার দিদিমা এসে নিয়ে গিয়েছেন এই বিয়ের পর, গোবিন্দ আর চাড় করে ফিরিয়ে আনে নি। তার ফলে, মুখে জল দেবারই কেউ ছিল না বলতে গেলে, সেদিক দিয়ে মরেই বেঁচেছেন কমলা। হঠাৎ রাত্রে ঘুমের মধ্যেই একদিন প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। একেবারে শেষ হবার সময়টায় আর কষ্ট পান নি বিশেষ।

তবু, গোবিন্দ ছিল বাড়িতে যখন খবরটা যায়। শুনলও সব, তবে তারও আর কিছু করার উপায় ছিল না। চাকরি তার নামমাত্রে ঠেকেছে এখন। সেও সব দিন যায় না, মাইনেও তাঁরা পুরো দেন না, পাঁচ-দশ করে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু আদায় হয়। এ ধরনের প্রেস আরও সব হয়েছে, তাদের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম অনেক ভাল—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে বরং কারবার গুটিয়ে আনছে মালিকপক্ষ। মধ্যে থিয়েটার লাইনে দু-এক টাকা বাড়তি রোজগার হচ্ছিল, সাজিয়ে দেওয়া, রং করে দেওয়া এইসব করে চার-পাঁচ টাকা করে পেত, এখন তাও হয় না। শরীরের জন্যে পেরে ওঠে না। খুবই দুরবস্থার দিন কাটছে তার। সে স্পষ্টই বলে দিল, 'যাওয়া তো উচিত ছিল ভাই এখনই, আমাদেরই তো গিয়ে দাঁড়ানো কর্তব্য —কিন্তু ভগবান মেরেছেন, এখন গাড়িভাড়ার পয়সাটাই যোগাড় করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আর অত বড় বিপদে শুধু শুধু গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা করে এসে তো কোন লাভ নেই ......'

বাকি থাকে কান্তি। তাকে খবরই পাঠানো গেল না। তার ঠিকানাই জানে না কেউ। সুতরাং আত্মীয় বলতে কেউই এল না। কেউ এসে একবার একটু সান্ত্বনাও দিল না। নিজের শ্বশুরবাড়িতে খবর দেয় নি ঐন্দ্রিলা, ঘেন্নাতেই দেয় নি। তারাও কেউ আসে নি। যা করলে সীতার সতীনপোরাই বরং। যা হয় একটু শুদ্ধ হবার ব্যবস্থাও করে দিলে ছেলেটার। নিয়মমতো যেটুকু যা করা দরকার সবই হ'ল। মায় দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াবারও আয়োজন করে দিল।

ওরাই ঐন্দ্রিলাকে ভরসা দিল। বলল, 'আপনিই থাকুন এখানে—ওর অভিভাবক হয়ে। যতদিন না ওর নিজের পেট চালাবার মতো সামর্থ্য হয়, ততদিন আমরা কিছু কিছু দেব। ঐ জমিটা আছে, ওর আয়ে ঘরের মেরামত, খাজনা, এগুলো চলে যাবে মনে হয়। তাছাড়া ওর জলপানি তো রইলই, আরও বাড়বে নিশ্চয়—যত দিন যাবে।...আপনিই বা এই বয়সে এই শরীরে কোথায় যাবেন? আপনি গেলে ছেলেটাকেই বা কে দেখবে। যতদিন বাঁচবেন, ও আপনারই দায়। আপনাকেই দেখতে হবে।'

বুক ভেঙ্গে যাবারই কথা। মনে হয় নি ঐন্দ্রিলার যে সে আর কোনদিন উঠতে পারবে, আর কোনদিন স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার টানতে পারবে। বিশেষ এই ঘর—এই সংসার। তবু উঠতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত, রান্না-খাওয়া, ঘর-সংসারের অন্য সব কাজই শুরু করতে হ'ল। ঐ ছেলেটার মুখ চেয়েই বুক বাঁধতে হ'ল ওকে—মেয়েরই গুঁড়োটুকু। যদি বাঁচে, যদি কোনদিন বিয়ে-থা করে মানুষের মতো ঘর-গেরস্থালি পেতে বসতে পারে তো তার নাম থাকবে। তারও, ওরও! ঐ দৌহিত্র-টুকুই ওরও ভরসা, জলপিণ্ডের স্থল। অবশ্য বাঁচবে সে ভরসা আর করে না সে। দিদিমা বলতেন যে আঁটকুড়ো হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে,—ভগবান যে নমুনা দেখিয়েছেন ওর ভাগ্যের, তাতে এই শেষ জলপিণ্ডটুকুর ব্যবস্থাও রাখবেন কিনা সন্দেহ। উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়, তার অদৃষ্টও সেই শুরু থেকেই বুঝে

নিয়েছে ঐন্দ্রিলা। আশা আর রাখবে না, পরের বাড়ির কাজ করার মতোই করে যাবে। চাকরি যতদিন থাকে। গেলেও হা-হুতাশ করবে না। পথেই নেমে আসবে আবার।

॥ ৫ ॥

সব চেয়ে যার ভরসা করেছিল ঐন্দ্রিলা, সেই অভয়পদও এল না। ওরা কেউই আসে নি—এক বুড়ো ছাড়া। বুড়োর হাত দিয়েই মেজকর্তা দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

অভয়পদর আর আসা হবেও না কোনদিন। কোথাও আর যেতে পারবে না সে। যে অভয়পদকে সে চিনত—তারা সবাই চিনত, সে আর নেই। সেই প্রাক্তন খোলসটার মধ্যে থেকে পরিচিত মানুষটা কবেই যেন বিদায় নিয়েছে। খোলস যেটা পড়ে আছে, সেটাও যেন রক্ত-মাংসের কিছু নয়—পাথর। পাথরের মতোই স্থাণু ও জড়।

অনেকদিন ধরে স্থির নির্বাক হয়ে বসে আছে অভয়পদ। বসে থেকে থেকে আরও স্থির আরও নির্বাক হয়ে গেছে সে। চাকরি যাবার পর প্রথম প্রথম বাগানের কাজ করত এটা-ওটা, সারাদিন বাগানেই থাকত প্রায়। এখন সেটুকুও আর পারে না। শরীরে কুলোয় না আর। অতিরিক্ত শীর্ণ হয়ে গেছে সে, শীর্ণ আর দুর্বল। সেখানেও তার এক নতুন পরীক্ষা, না খাওয়ার পরীক্ষা। একটা মানুষ কত কম খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে—সেইটেই যেন পরখ করে দেখতে চায় সে। দিনান্তে একবার, তাও পাখীর আহার করে। শুধু ভাতের সামনে বসে মাত্র। সেটাও যে বন্ধ করে নি—বোধহয় চেঁচামেচি গোলমাল করবে এরা, অনুরোধ উপরোধ কান্নাকাটি করবে—এই ভয়েই। নিজের সর্বপ্রকার ব্যয় কমিয়ে ফেলার সঙ্কল্প তার। দীর্ঘ দেহ সহ পুরুষ, পাঁচহাত ধুতি পরা কোনক্রমেই সম্ভব নয় তাই সে চেষ্টা করে না, কিন্তু সাতহাতীর বড় সে আনতে দেয় না। জামা বাড়িতে অবশ্য কখনই গায়ে দেয় না—খুব শীত পড়লে পুরনো অফিস যাবার কোটগুলো বার করে পরে। সেগুলোও সে বরাবর কিনত রেলের বাবুদের কাছ থেকে, বেশীর ভাগই আধপুরনো। রাত্রে কাঁথা গায়ে দিয়ে কাটে বরাবরই। এখনও তাই। তফাতের মধ্যে খুঁজে খুঁজে ছেঁড়া কাঁথাগুলো এনে গায়ে দেয়।

কাঠের বেঞ্চে শোওয়াও বহুকালের অভ্যাস। ইদানীং সেখানে যা কেবল একটু উন্নতি হয়েছে। শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে গেছে না খেয়ে খেয়ে—হাড়গুলো উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে সর্বাঙ্গে। সেই অবস্থায় কঠিন অনাবৃত কাঠের ওপর শুয়ে গাময় ঘা হতে শুরু হয়েছিল। সে ঘায়ের সঙ্গে এ শোওয়ার কোন সম্পর্ক আছে, সেটা কেউই বুঝতে পারে নি। মহাশ্বেতাও না। লক্ষ্য করেছিল অম্বিকাই। ঘায়ের জায়গাগুলো মিলিয়ে দেখেছিল—উঁচু-হয়ে-ওঠা হাড়ের জায়গাগুলোর সঙ্গে। সে-ই ধুনুরী ডাকিয়ে বেঞ্চের মাপে একটা সরু তোশক করিয়ে দিয়েছে। তৈরী করিয়ে নিজের হাতে পেতে দিয়ে দাদাকে বলে গেছে, 'এর ওপর শুয়ো যেন। আমি তোশক করিয়েছি, এ সরু তোশক আর কোন কাজে লাগবে না।...শুধু শুধু কতকগুলো ঘা-নিয়ে জ্বালাতন হয়েই বা লাভ কি!'

আর কিছু বলে নি অম্বিকা। কোন ভাইয়েরই বেশী কথা বলা অভ্যাস নেই। কিন্তু সেই দুটি কথাতেই কাজ হয়েছে। মহাশ্বেতারা ভেবেছিল—এতকাল পরে

কিছুতেই বিছানাতে শুতে রাজী হবে না সে—কিন্তু অভয় একটু ইতস্তত করে শুয়েই পড়েছে শেষ পর্যন্ত। তারপরও আর কোন আপত্তি ওঠে নি। নতুন ব্যবস্থাকে সে মেনে নিয়েছে।

তবে—তফাৎটা কি সে বুঝতে পারে? সে কি অনুভব করে শয্যার এই অভিনব (তার কাছে) কোমলত্ব। এ একটা অদ্ভুত অবস্থা অভয়পদর। এরা সবাই লক্ষ্য করেছে—সে চেয়ে থাকে কিন্তু তার নজরে যেন কিছু পড়ে না। রকেই বসে থাকে বেশির ভাগ—ওর সামনে দিয়েই গরু-ছাগল এসে গাছপালা খেয়ে গেলেও কিছু বলে না। একটা শব্দ পর্যন্তও করে না তাড়াবার জন্যে। সাধারণভাবে কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর পায় না। অনেকক্ষণ ধরে সামনে এসে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও হুঁশ হয় না তার।

এ নিয়ে নানান রকম কানাঘুষো হয় বাড়িতে বা জ্ঞাতিমহলে। 'বেব্‌ভুল হয়ে আসছে ক্রমশ', 'ভীমরতি অবস্থা', 'আর দেরি নেই বেশী'—এ সব কথাও কানে যায় মহাশ্বেতার। শোনে আর আড়ালে চোখের জল মোছে। শুধু ভয় নয়—অনুতাপেরও জল এটা। মনের কোণে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে বোধহয় তার গঞ্জনাতেই মানুষটা তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে আনছে, 'ওপোস করে শুকিয়ে মরতে চাইছে।' টাকাটা যাবার পর দিনকতক প্রায় দিবারাত্র স্বামীকে কটু-কাটবা করত, কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে মাথা খুঁড়ে অভয়পদকে উত্ত্যক্ত-উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলত। এরা সবাই অনেক নিষেধ করেছে তখন, বলেছে, 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না অমন করে—শেষে কি মানুষটা আত্মঘাতী হবে?' কিন্তু তখন কারও কথা শোনে নি টাকার শোকে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল, আর সেই ক্ষতির জন্যে নিজের অতিরিক্ত লোভ নয়—স্বামীকেই দায়ী করত সে।

কিন্তু ইদানীং অভয়পদর এই স্তম্ভিত অবস্থা দেখে তার যেন চৈতন্য ফিরেছে কতকটা। এবার সে ভয় পেয়েই চুপ করেছে। আসলে অভয়পদের জন্যে যে চিন্তার কিছু আছে, তার জন্যেও যে কোন দিন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠবার কারণ ঘটতে পারে, সেটাই ভাবে নি কেউ। তার স্ত্রীও না। কিন্তু এখন নিজের আসন্ন সর্বনাশের চেহারাটা স্পষ্ট না হলেও—আবছামতো দেখতে পেয়েছে সে। যতই যা হোক—তবু ঐ মানুষটা যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণই তার জোর, তার যতকিছু 'দম্ভজিয্য'—ও না থাকলে তো পথের ভিখিরী। এধারে যতই বোকা হোক—এতবড় ক্ষতিটা বোঝার মতো সাংসারিক জ্ঞান তার আছে।

তাছাড়াও বোধ হয় কিছু আছে—নিজের স্থূল লাভ-লোকসানের প্রশ্নটা ছাড়াও।

ওরা যে স্বামী-স্ত্রী, পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানুষ দুজন, সবচেয়ে আপন পরস্পরের, এটা ওরা ভুলেই গিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। অথবা, সেটা ভাবার কোন অবসর বা অজুহাত মেলে নি ওদের জীবনে। তবু কোথায় সূক্ষ্ম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো সে বোধটা ছিলই—জীবনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে। ছিল বলেই নতুন করে সে অস্তিত্বটাকে খুঁজে পেয়েছে মহাশ্বেতা। আর সেই সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সমস্ত আকুলতা উদ্বেগ ও মমতায় টান পড়েছে তার।

তার অমন সুন্দর স্বামী—মহাদেবের মতো।

অমন দেবতার মতো স্বভাব তার। নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার নিরাসক্ত। সকল প্রকার মানবিক ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে। অথচ দয়ামায়ায় পূর্ণ—সে পরিচয় মহাশ্বেতা তো কতবারই পেয়েছে। যে যেখানে আছে মহাশ্বেতার আত্মীয়, সকলেই এ মানুষটার কাছে উপকৃত। তাকে কোন দুঃখ স্পর্শ করে না কিন্তু পরের দুঃখ সম্বন্ধে সে এত-

টুকু উদাসীন নয়। বহু ভাগ্যে এমন স্বামী মেলে, আর বহু জন্মের পাপে এমন স্বামী পেয়েও ক্ষোয়াতে হয়।...

আরও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মহাশ্বেতাকে তার জ্যাঠতুতো বড় জা। সে বলেছে, 'সংসার থেকে ছেলেপুলে থেকে যখন একেবারে সরে যায় মানুষ, তার মনের নেপু-চোটা চলে যায়—তখন আর তাকে ধরে রাখা যায় না। সন্ন্যাসী হয় সে এক রকম, ঘরে থেকে মনটা এমনভাবে ঘর-সংসার থেকে সরে যাওয়া ভাল না। মায়ার টান গেলে আত্মা আর থাকবে কেন? টানটাই তো ধরে রাখে গা।'

বড় ভয় ধরেছে মহাশ্বেতার কথাটা শোনবার পর থেকে। টানটা ফিরিয়ে আনার জন্য উঠে-পড়ে লেগেওছিল কিছুদিন। কিন্তু কি করলে সেটা ফিরে আসে, ঠিক কি করা উচিত তা ভেবে পায় না। মধ্যে, তরলারই পরামর্শে খুব সটেপটে ধরেছিল সে স্বামীকে, 'তুমি বাপু মন্তরটা নিয়ে নাও। মন্তর নিয়ে জপ আহ্নিক করতে থাকলে মনটা ভাল হবে।'

ওদের কুলগুরু আছেন, এরা বাড়ি সুদ্ধ বড়রা সবাই দীক্ষাও নিয়েছে, অভয়ের অনুমতি নিয়ে মহাশ্বেতাও নিয়েছিল। কেবল অভয় নিজেই নেয় নি। তখন সবাই খুব জেদ করাতে বলেছিল 'ভগবানকে ডাকব তার জন্যে আর একটা মানুষকে সুপারিশ ধরার কি দরকার? তাঁকে ডাকার ইচ্ছে যদি মন থেকে না জাগে তো হাজার মন্তর নিলেও তাঁকে ডাকা হবে না। এই যে সকাল বেলা গিয়ে রোজ আহ্নিকে বসো—ভগবানের কথা কতটুকু ভাব বলো তো!'

তখন তবু যুক্তি দিত। এখন কথাই বার করা যায় না। বার বার বলার পর একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, 'ও আমার ভাল লাগে না।'...

আরও নানা উপায়ে সংসারের দিকে স্বামীর মন ফেরাবার চেষ্টা করেছে মহাশ্বেতা, মায়ার টানকে প্রবল করে তুলতে চেয়েছে। ছোট একটা নাতিকে এনে কোলের কাছে—কখনও বা কোলের ওপর বসিয়ে দিয়েছে, নাতি-নাতনীদের পাঠিয়েছে কাছে বসে গল্পগুজব করতে, তাদের দিয়ে খাবার করে পাঠিয়ে দিয়েছে—শিখিয়ে দিয়েছে, জোর করে আবদার করে খাওয়াবি, একটু কিছু খাওয়াতে পারলে একটা পয়সা দেব, কিন্তু কোনটাতেই কোন ফল হয় নি। তার সেই নির্লিপ্ত নিরাসক্তি, জীবন সম্বন্ধে নিতান্ত নিরুৎসুকতা তাকে যেন বর্মের মতোই আচ্ছাদিত করে রেখেছে, সে বর্ম ভেদ করা যায় না কোন অস্ত্রেই।

অথচ এটাকে বিষাদ বলে ভাববার কোন কারণ নেই। আগে বরং একটা হতাশা একটা দুঃখের ছায়া তার মুখে দেখা যেত—এখন সেটাও নেই। আগেকার ভাবলেশহীন মুখভাবই ফিরে এসেছে আবার বরং যেন আরও ভাবলেশহীন, আরও পাথরের মতো হয়ে উঠেছে মুখটা। মানুষটাই যেন পাথর হয়ে গেছে—ভিতরে-বাইরে। পাথরের মতোই নিশ্চল পাথরের মতোই প্রাণস্পন্দনহীন। অমনি পাথর হয়ে গেছে বুঝি মনটাও, কোন কিছু ভাববার অভ্যাস ফেলেছে হারিয়ে।

কিন্তু তা নয়। এরা বুঝতে পারে না। ভাবেই সে বেশী আজ[illegible]। সে ভাবনা বড় বেশী মনের গভীরে, আর সে ভাবনাতে একেবারে ডুবে তলিয়ে গেছে বলেই সেটা চোখে পড়ে না।

চিন্তা নয় এটা—ভাবনাই। সমস্ত মানসিক সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা। এই থেকেই তার আত্মা আনন্দ-রস আহরণ করে। এটা তার ভাবনা-বিলাস।

বাইরে যতটা নিষ্ক্রিয় সে ভেতরে ততটাই সক্রিয়। মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে সে

তার পূর্ব জীবনের রোমন্থন করে। করেই যায় বার বার। কর্মজীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাসটাকে মানস-জগতে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেষ্টা করে। বারবার একই জীবনযাপন করতে চায় সে। করেও। সেই জীবনেই সে বেঁচে আছে, সেইখানেই তার অস্তিত্ব। বাইরের জগতে সে মৃত—তাই অমন স্থাণু।

সে জীবনটা চলচ্চিত্রের মতো অভিনীত হতে থাকে তার মনের পর্দায়। উপন্যাসের মতো মনের পাতায় লিখে যায় সে। তা নিয়ে তার যত্ন ও উৎকণ্ঠারও অবধি নেই। প্রতিটি অনুচ্ছেদ ঠিক সন তারিখ ধরে ধরে—পারম্পর্য বজায় রেখে সাজানো প্রয়োজন। এদিক ওদিক—আগুপিছু না হয়ে যায়। এক এক সময় সংশয় জাগে—ভুল হচ্ছে না তো? যত্ন করেই আবার সেটা সংশোধন করে। মনে করে করে মিলিয়ে নেয় অন্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেঃ

শশীবাবু যেবার রিটায়ার করল সেইবারই লং সাহেব নতুন এল বিলেত থেকে। শশীবাবুর সে কী আপসোস, এই নতুন সাহেবটা কেমন তা নেড়ে চেড়ে দেখা হ'ল না। শশীবাবুর জীবনে ঐ একটিই ধ্রুব চিন্তা ছিল—আনন্দ বলুন, বিশ্রাম বলুন আর শখই বলুন—সাহেবদের কী করে বোকা বানাবেন। তাদের কত বুদ্ধি—যে বিদ্যে-বুদ্ধির অহঙ্কারে বেটারা ওঁদের থেকে অত বেশী মাইনে নেয়—সে বুদ্ধির দৌড় কতটা তাদের বুঝিয়ে দেবেন আচ্ছা করে। তাদের নাকের জলে চোখের জলে করাবেন।...করাতেনও, ওঃ সেবারে হাচিনসন সাহেবকে কী জব্দটা না করলেন, সেই আসাম রেলের ঠিকের ব্যাপারে।...আচ্ছা, শশীবাবু রিটায়ার করলেন সেটা কোন সাল? উনিশশো নয় হবে—না দশ? না না, শশীবাবু তো রিটায়ার করলেন তাঁর বড় জামাইটি মারা যাবার পর, সেই শোকেই কতকটা। যুদ্ধে গিয়েই তো মারা গেল সে জামাই, ফরাসী মুলুকে কোথায় যেন ম'ল—লাশটা জ্বালানোও হ'ল না। এঁরা কুশের পুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধশান্তি করলেন।...তা হ'লে—দশ কি করে হবে? চোদ্দ সালের আগে তো হ'তে পারে না। অথচ লং সাহেব যেন এসেই সদ্য-মরে-যাওয়া রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্যে শোক-সভা করলেন না?—আসার বোধ হয় সাত-আট-দিনের মধ্যেই সভাটা করা হ'ল। শশীবাবু রিটায়ার করার সময় কে এলেন তাহলে—ম্যাকডুগাল কি? না, ম্যাকডুগাল এল অনেক পরে। ম্যাকডুগাল একেবারেই ম্যানেজার হয়ে এসেছিল। তার জন্যে হঠাৎ বড় করে একটা সভা ডাকা হ'ল অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। সেই প্রথম ও রকম সভা হ'ল ওদের।

ম্যাকডুগালের সে সভাটার কথাও বেশ মনে আছে অভয়পদর। গঙ্গার ধারে সামিয়ানা খাটিয়ে খুব জোর সভা হয়েছিল। ঠিক ছিল সামিয়ানার নিচে শুধু বাবুরা বসবেন। কারখানা মিস্ত্রীরা—তখনকার দিনে কুলীই বলা হ'ত সকলকে—আর তার মতো যে সব কর্মচারী, না বাবু না কুলী তারাও সামিয়ানার বাইরে ঘিরে দাঁড়াবে। শীতকাল সেটা, বেলা দুটোয় সভা—কোন অসুবিধেই হবে না। বড়দিনের মুখটাতেই সভা ডাকা হয়েছিল, বেশ মনে আছে অভয়পদর।...সেও ছিল দাঁড়ানোর দলে—দাঁড়িয়েই ছিল এক কোণে—হঠাৎ ডানকান সাহেবের নজর পড়ে গেল। ডানকান ট্যাঁস সাহেব ছিলেন কিন্তু কে বলবে পাকা সাহেব নন। আর তেমনি মেজাজও ছিল, বড় বড় সাহেবদের যেমন দিলদরিয়া মেজাজ হয়—সব দিকে নজর, সকলের ওপর সমান দৃষ্টি। ডানকানই অভয়পদের ওপরওলা লাহিড়ীবাবুকে বললেন, 'ওকে ভেতরে এনে বসাও অভিকে—(ডানকান অভয় উচ্চারণ করতে পারতেন না—বলতেন অভি), ও কেরানীর অনেক ওপরে, আধা-ইঞ্জিনীয়ার বলতে পার ওকে।'

ওঃ, সে কী চোখ টাটিয়েছিল সেদিন সকলকার। কেরানীবাবুরাও, ম্যাকডু-

গালকে দেখবে কি—উলটে ওকেই দেখেছে শুধু। সভার পর খাওয়ার সময়ও—মিস্ত্রীদের সব হাতে হাতে দেওয়া হ'ল কমলালেবু আর কেক, অভয়পদ বাবুদের সংগে মাটির সরা পেল। কেক কমলালেবু ছাড়াও তাতে একটা করে সিংগাড়া আর কি যেন—হ্যাঁ, ভূষণবাবু খইচুর আনিয়েছিলেন ধনেখালি থেকে—সেই খইচুর ছিল। অভয়পদ খায় নি সে-সব, কোনকালেই আপিসে কিছু খেত না—সরাসুদ্ধ ঝাড়নে বেঁধে বাড়ি এনেছিল। তা নিয়ে কত হাসাহাসি, বাবুরা টিটকিরি দিয়েছিল, বাবুর খানা কি কুলীর পেটে সহ্য হয়!......অথচ, অভয় হলপ করে বলতে পারে, বাবুরা সবাই কিছু কিছু পকেটে করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। একটা নিয়ে লুকিয়ে রেখে আর একটা সরা নেবার জন্যে বাবুরা যে কাণ্ড করেছিল—কেউ তিন-চারটেও নিয়েছে—সে উঞ্ছবৃত্তি অভয় কোনকালে করতে পারবে না, করেও নি সে।......

সেই কেক নিয়েই তো সেবার কী গণ্ডগোলটা না হ'ল। অভয় কেকটা নিয়ে গিয়ে মাকে খেতে দিয়েছিল। সে কথাটা কেমন করে যেন চাউর হয়ে যায় পাড়ায়-পাড়ায়, রায়েরা মজুমদাররা—তার সংগে ওদের জ্ঞাতিরা মিলে সে কি ঘোঁট সকাল-সন্ধ্যে—কী সমাচার, না অভয় ডিম দেওয়া কেক খাইয়েছে ব্রাহ্মণের বিধবাকে। কথাটা ক্ষীরোদার কানে পৌঁছতে তিনি শুষ্ক মুখে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, ওরা যা বলছে—সত্যি?' অভয় তার জবাবে মিথ্যেই বলেছিল, 'তুমি ক্ষেপেছ! এসব কেকে আবার ডিম দিচ্ছে! ডিম অত সস্তা কি না!' বাইরে থেকে শুনে চোখ বড় বড় করে মহাশ্বেতাও স্বামীকে বলতে গিয়েছিল, 'এটা তুমি কি করলে! ছি ছি,—এর তুল্য পাপ আছে। মাকেও নরকে মজালে, নিজেও মজলে।' খুব উত্ত্যক্ত করে তুলতে তাকে বলেছিল, 'বেশ করেছি খাইয়েছি। পাপ হয় আমার হবে, সে আমি বুঝব। মার আবার পাপ কি, মা তো অজান্তে খেয়েছে।'

আজও সে জন্যে দুঃখিত বা অনুতপ্ত নয় সে। মা কতদিন তাকে বলেছেন তার আগে, 'হ্যাঁ রে, কেক আবার কি মিষ্টি রে?' 'কেক কেমন খেতে রে?' 'সায়েবরা যখন খায় তখন নিশ্চয়ই খুব ভাল মিষ্টি। তা সন্দেশের চেয়ে ভাল? তোরা তো খেয়েছিস—?' এত করে বলার মানেই তাঁর মহাপ্রাণী খেতে চেয়েছিল : সে খাওয়ানোতে কোন দোষ আছে বলে মনে করে না অভয়পদ।......

ঐ ম্যাকডুগালই আবার যখন চলে গেল—বিলেতেই আর একটা কি বড় কাজ পেয়ে, তখনও খুব ধুমধাম করে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়েছিল তাকে। সেবার তো অভয়পদর আরও খাতির। সাহেবদের মহাজন সে, খাতক সাহেবরাই তাকে নিয়ে গিয়ে সামনে বসিয়ে দিয়েছিল।......উঃ, ব্যাটারা কি ঘা-ই দিয়ে গেল! হাসি, খাতির, কাঁধে হাত রাখা, তার আড়ালে কী শয়তানিই ছিল ব্যাটাদের মনে। পঙ্কজবাবু বলতেন ঠিক কথাই—'সাদা চামড়াকে কখনও বিশ্বাস করবে না। ওরা মিছরীর ছুরি!'

থাক সে কথা। অভয়পদরই অদৃষ্ট। নইলে সব সাহেব কিছু সমান নয়। সেই যে হাওড়ার পুলের প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিয়েছিল সে—সে সময়, সত্যিই যখন জলের মতো বুঝিয়ে দিলে, তখন ওদের এখানকার বড় সাহেব যিনি ছিলেন এগিয়ে এসে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ওর সংগে হ্যাণ্ডশেক করেছিলেন। বিলেত যাবার সময় নিজের গায়ের গরম কোটটাই দিয়ে গিয়েছিলেন—উপহার। সে কোট আজও খোকা—মানে দুর্গা গায়ে দিচ্ছে। বিলেত গিয়েও দু-তিন বছর পর পর বড়দিনে কার্ড পাঠিয়েছিল অভয়কে মনে করে করে। না, সবাই অকৃতজ্ঞ নয়, একজন দুজনের জন্যে সব সাদা চামড়াকে গাল দেবে না সে।......

এমনিই স্মৃতি রোমন্থন করে যায় সে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঠায় একভাবে বসে থাকে এক জায়গায়। অনেকক্ষণ পর পর চোখের পাতা পড়ে শুধু, সেইটুকু থেকেই প্রাণস্পন্দন টের পাওয়া যায়। বাকীটা পাথরের মতোই স্থির অনড় হয়ে থাকে। সাদা দাড়ি-গোঁফে সাদা চুলে ফর্সা রং-এ শ্বেত পাথরের মূর্তির মতোই মনে হয় তাকে। পাড়ার লোক অনেকে দূর থেকে ওকে দেখায়—জীবিত মানুষ কেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে। মন শুধু কাজ করে যায়, দ্রুত নয়—তাড়াহুড়ো নেই কোথাও আর—আস্তে আস্তে সময় নিয়ে সে স্মৃতির আলপনা এঁকে যায়। জাল বুনে যায় ক্রুশকাঠির বোনার মতো। আলপনা একবার শেষ হ'লে মুছে ফেলে, আবার শুরু করে গোড়া থেকে। ক্রুশের চেন—খোলে আর বোনে। সেখানে যেমন তাড়াও নেই তেমনি বিশ্রামও নেই। গভীর থেকে গভীরে ডুবে যায় হয়ত—তবু ঐটেই তার জীবন, ঐখানেই এখনও সে কর্মঠ আছে।

তার এ ভাবনা-বিলাসের খবর তার বাড়ির লোক কেউ রাখে না। এ তার গোপন সঞ্চয় যেন, কৃপণের মতো নিজেই নাড়ে-চাড়ে, সযত্নে অন্যের থেকে আড়াল করে রাখে। দৈবাৎ কখনও এ রহস্যটা ধরা পড়ে যায়। হয়ত অনেকক্ষণ ধরে মহাশ্বেতা কিছু বলছে, আগে খেয়ালই করে নি, যখন খেয়াল হল তখনও, তার দিকে না চেয়েই উত্তর দিল, 'ও তিনটে কয়েল বাদ। ওগুলোতে কি দোষ আছে, গ্রেগরী সাহেব দিতে বারণ করেছে!'

কিম্বা দুর্গাপদ এসে হয়ত কোন চমকপ্রদ খবর দিল—বেশ চেঁচিয়েই বলে সে—দাদার এই অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে—কিন্তু তাতেও শুনল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। শশীবাবু বলেছে আমাকে।' নাতি এসে গলা জড়িয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে হয়ত—দাদু বলে উঠল, 'কোটটা—কোটটা আগে সেলাই করে দিতে বল তোর মাকে।'

অবশ্য এগুলো দৈবাৎই। তবু সকলেই শুনেছে এক আধবার। এরা বলে, 'ভুল বকছে।' বলে, 'এই রকমই হয়। ক্রমশ সব গুলিয়ে যায় মাথার মধ্যে।' একমাত্র তরলাই বাড়ির মধ্যে যা ধরতে পারে এর রহস্যটা। বলে, 'না দিদি, ভুল-বকা নয় ওসব। আমার মনে হয়, উনি দিন-রাত বসে বসে কেবল আফিসের ভাবনাই ভাবেন। সেই সব আগেকার কথা।—বোধ হয় সেই কথা তুলে কেউ গল্প করলে উনি অনেকটা চাঙ্গা হ'তে পারেন। অনেক দিন তো কাটালেন ওখানে—ঐ কথাই ভাল লাগে।'

কিন্তু তরলার কথায় কেউ কান দেয় না। মহাশ্বেতা তো নয়ই—সংসারের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা এত গভীরভাবে ভাবতে পারে কেউ তা তার ধারণাতেও আসে না।

প্রদীপের শিখা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ক্রমশই—তবু তা যে খুব তাড়াতাড়ি নিভবে কেউ ভাবে নি। এইভাবেই আরও দু-চার বছর চলবে, সকলেই আশা করেছিল। এদের দেহের গঠনই ভিন্ন, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী মজবুত অনেক বেশী ঘাতসহ। বোধহয় এটা পেয়েছে ওরা মায়ের কাছ থেকে, তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং জরা-জনিত দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনও কঠিন ব্যাধি কিছু তাঁর নেই। কিম্বা দুঃখে-কষ্টে পোড় খেয়ে খেয়েই ক্রমশ মজবুত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অভয়পদর দেহ যে সাধারণ রক্ত-মাংসের, কালের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি অন্য মানুষের মতো তাকেও ক্ষইয়ে আনতে পারবে, এটা কেউ ভাবতে পারত না ঠিক। তার কারণও ছিল। এ বাড়ির কেউই কখনও অভয়পদকে বিশেষ অসুস্থ হতে দেখে নি

বরং দেখেছে বারো মাস তিনশো প'য়ষট্টি দিন কঠোর পরিশ্রম করতে—কী আফিসে কী বাড়িতে। বিশ্রাম শব্দটার সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, দৈনিক পাঁচ ঘণ্টার বেশী সে ঘুমোয় না, শোয় নিরাবরণ কাঠের বেঞ্চিতে। বিলাস তো নয়ই, আরামও তার সয় না। তার রক্তে অনন্ত প্রাণধারা প্রবাহিত, তার অস্থিতে অমিতবীর্য কাঠিন্য। সে যে এখন বসে থাকে—নিতান্ত ইচ্ছা করেই—এও তার এক রকমের তপস্যা, কষ্ট-সহিষ্ণুতার একটা পরীক্ষা। নইলে ইচ্ছে করলেই, আজও সে ঘুরে-ফিরে আবার আগেকার মতো কাজকর্ম করতে পারে নিশ্চয়। তার এ কর্মবিমুখতার মূলে দৈহিক কারণ নেই ততটা—যতটা মানসিক কারণ আছে।

হয়ত তাই। কিন্তু দেহের ওপর মনের প্রভাব যে অনেকখানি সেটা এদের জানা ছিল না তেমন। বেঁচে থাকার আগ্রহ ও ইচ্ছা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লৌহ-কঠিন দেহেও যে ক্ষয় ধরেছে সেটা বুঝতে পারে নি। তাই, প্রথম যেদিন ছটা বেজে যাবার পরও অভয়পদ চোখ বুজে বিছানাতেই শুয়ে রইল, সেদিন প্রথম দিকটায় উদ্বেগের চেয়ে বিস্ময়ই বোধ করেছিল সকলে বেশী।

তবুও সোজাসুজি এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে সাহস হ'ল না মহা-শ্বেতার, ছুটে গেল সে মেজকর্তার কাছেই। অম্বিকা সারা রাত ঘুমোয় না, সে সন্ধ্যা থেকে বসে গেলাস গেলাস চা খায় আর ভূতের মতো সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ভোরের দিকে মেয়েরা উঠলে সে নিশ্চিন্ত হয়, সেই সময়ই চোখের পাতা দুটোও বুজে আসে তন্দ্রায়। পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত ঘুমোয় একটানা। কেউ ডাকলেও সাড় আসে না সহজে। কিন্তু আজ কথাটা শোনা মাত্র তার সমস্ত জড়তা কেটে গেল, তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল মহাশ্বেতার সঙ্গে সঙ্গে। খবরটা শুনে মুখ তো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলই, মহার মনে হ'ল তার পা দুটোও অল্প অল্প কাঁপছে। সম্ভবত কাঁচা ঘুম ভাঙ্গার জন্যেই, মহা মনে মনে ভাবল।

অনেক ডাকাডাকিতে অতিকষ্টে চোখ খুলল অভয়পদ; মনে হ'ল চোখ মেলে চাইতে তার কষ্টই হচ্ছে রীতিমতো। চোখের পাতাগুলো যেন অবশ হয়ে এসেছে চেষ্টা করেও চাইতে পারছে না।

অনেকক্ষণ সময় লাগল তার ভাল করে চেয়ে দেখতে। অবশ্য চোখ খোলার পর বেশ স্থিরভাবেই চেয়ে রইল সে ভায়ের দিকে, তারপর অতি ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আর না, আর উঠব না আমি। এই শেষ।'

মুখের কাছে ঝুঁকে ছিল মহাশ্বেতা, কথাগুলো সেও শুনতে পেয়েছিল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল। বোধ করি সেই শব্দেই—ঈষৎ ভ্রূকুটি করল অভয়। অম্বিকাপদ বলল, 'কেঁদো না—একটু দ্যাখো, আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি—'

'উঁহু।' আবার কথা কয়ে উঠল অভয়, 'ডাক্তার নয়। তুমি বসো। জীবনে কোন দিন ওষুধ খাই নি—যাবার সময় আর কেন? লাভও নেই কিছু।'

এইটুকু বলতেই বোধহয় অনেকখানি আয়াস করতে হয়েছিল, ক্লান্তিতে চোখ বুজল আবার। অম্বিকাপদ দাদাকে চেনে, বোধ করি একমাত্র সে-ই চেনে। সে আর ব্যস্ত হ'ল না—বেঞ্চির কাছে মেঝেতেই শান্তভাবে বসল।

মহাশ্বেতার কান্নায় বাড়িসুদ্ধ প্রায় সবাই ছুটে এসেছে তখন। দুর্গাপদ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইল অম্বিকার দিকে, অর্থাৎ ডাক্তার ডাকবে কিনা। অম্বিকা ঘাড় নেড়ে নিষেধ করল। তারপর বহুক্ষণ সেই নিস্পন্দ মানুষটার কাছ থেকে কোন সাড়া আসে কিনা দেখে বলল, 'একটু দুধ আনতে বলি। একটু দুধ খাও—মুখ ধোওয়া পরে হবে'খন।'

'না।' চোখ না চেয়েই উত্তর দেয় অভয়পদ, 'কী লাভ?'

'না খেয়েই বা লাভ কি? এদের মনে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া—। আর খেলেও তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না তোমার।'

একটুখানি চুপ করে থেকে অভয়পদ উত্তর দিল, 'খেতে কষ্ট হবে। বোধহয় গিলতে পারব না কিছু। দরকারও তো নেই—'

আরও খানিক পরে আর একবার চোখ খুলল। চারিদিকে তাকাল একবার। সবাইকে যেন দেখে নিল ভাল করে। তারপর আবার ধীরে ধীরে বুজে এল চোখের পাতা দুটো। বলল, 'ওদের এখন যেতে বলো অম্বিকা, এখনই আমি মরছি না। হয়ত আজও মরবো না।...ওঠার আমার শেষ হয়ে গেছে, সেইটেই বলছিলুম।...'

দুপুরের দিকে আর একবার চোখ খুলল সে। তখন শুধু মহাশ্বেতা বসেছিল কাছে। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর আস্তে আস্তে বলল, কতকটা যেন আপন মনেই, 'বড়' তাড়াতাড়ি এসে পড়ল শেষটা। আমিও বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়েও খালধারে গিয়ে পড়ে থাকতুম। জন্মে কখনও গাড়ি-পাল্কী চড়ি নি—মরার পর লোকের কাঁধে চড়তে হবে—ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে!'

বলে হাসলও একটু। বহুদিন পরে সে হাসি বড় করুণ দেখাল ওর মুখে।

সকালে বিস্তর কেঁদেছিল মহাশ্বেতা, আছাড়ি-পিছাড়ি করে কেঁদেছিল—এখান থেকে সরে রান্নাঘরের দাওয়ায় পড়ে। কিন্তু এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে সে। তরলাই তাকে বুঝিয়েছে, 'দিদি কাঁদবার সময় ঢের পাবেন, জীবনভোরই তো তোলা রইল কান্না—। এখন একটু শক্ত হোন। শেষ সময়টা কাছে থাকুন, যতটা পারেন সেবা ক'রে নিন। নইলে এর পর আপসোসের শেষ থাকবে না।'

মহাশ্বেতাও বুঝেছে কথাটা। তরলার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর তার চিরদিনের বিশ্বাস, ঠিকই বলেছে বৌটা। খুব ভেবেচিন্তে বলে—একেবারে নিয্যস্ খাঁটি কথা। সে জোর করে মনকে শক্ত করেছে। শুধু খাওয়ার সময়টাই আর একবার ভেঙে পড়েছিল। আগে অতটা বুঝতে পারে নি। সকাল করেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল মেজবৌ, জোর করে হাত ধরে ওকে এনে বসিয়েছিল আসনে। মহাশ্বেতা প্রথমটা যেতেই চায় নি—'খাওয়ায় ইচ্ছে নেই আমার একদম, সত্যি বলছি। মুখেই দিতে ইচ্ছে করছে না কিছু। আর সে তখন তোদের সঙ্গে না হয় বসব। এখন বুড়ো মাগী আমাকে সাততাড়াতাড়ি খেতে দেবার দরকার কি?' প্রমীলা বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'খেতে তো হবেই, পোড়ার পেট সব্বকাল আছে আর সব্বকাল থাকবে। কাজটা সেরে নিয়ে বটঠাকুরের কাছে একটু স্থির হয়ে বসো। দরকার কিছু না পড়ুক, চোখ খুলে তোমাকে দেখতে পেলেও ও'র শান্তি হবে।'

আর কোন প্রতিবাদ করে নি মহাশ্বেতা কিন্তু প্রমীলা ভাতের থালা এনে ধরে দিতে, চমকে উঠেছিল। আজকাল মাছ তো তাদের বাড়ি ঢোকেই না। জিনিসপত্তরের দাম আগুন, দু'টাকা-আড়াই টাকা সেরের কম মাছ নেই বাজারে—এ রাবণের গুষ্টিকে এক টুকরো করে দিতে গেলেও তো দুসের মাছ লাগে। পুকুর থেকে না ধরানো হলে বা ছোটকর্তা ছিপ ফেলে না ধরলে আর মাছ পাতে পড়ে না। কিন্তু আর যাই হোক--আজ কেউ মাছ ধরতে যায় নি—এই বিপদের মধ্যে। অথচ পাতে এত রকম মাছ এল কোথা থেকে? যে যে মাছগুলো মহাশ্বেতার প্রিয়, তার সবগুলিই আছে, পার্শে, বাটা, চিংড়ি—'এত মাছ এল কোথা থেকে রে? কেউ পাঠিয়েছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল মহাশ্বেতা।

এক মুহূর্ত দেরি হয়েছিল উত্তর দিতে। প্রমীলা যেন কথা খুঁজে পায় নি সেই নিমেষকাল সময়। চোখের পাতা সামান্য একটু অবনত হয়েছিল তার। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট। মহাশ্বেতারও বুঝতে বাকী থাকে নি ইঙ্গিতটা। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে, আছড়ে পড়েছিল থালার পাশে।

ব্যাকুল হয়ে প্রমীলা একেবারে কোলের মধ্যে তুলে নিয়েছিল ওর মাথাটা, 'চুপ চুপ, ও দিদি, এখনও যে মানুষটা বেঁচে। ভাতের থালার সামনে বসে ঠিক দুপুরে কাঁদলে অকল্যাণ হবে যে! চুপ করো, চুপ করো, আমার মাথা খাও!'

চুপ করেছিল একটু পরেই কিন্তু খেতে পারে নি। নিতান্ত অকল্যাণের ভয়েই প্রমীলা তরলার পীড়াপীড়িতে একটু মাছ ভাত তুলে মুখে ঠেকিয়েছিল একবার—নিয়মরক্ষার মতো।...

কিন্তু কাঁদে নি আর। এখনও বিশেষ কান্নাকাটি করল না। একটা কথা বলার জন্য বহুদিন ধরে ছটফট করছে সে—অনভ্যাসে লজ্জায় বলতে পারে নি। আজও সকাল থেকে কথাটা বলতে চেষ্টা করেছে বহুবার। এখন বলতে না পারলে আর বলাই হবে না কোনদিন। এ-ই শেষ সুযোগ বোধহয়। সে স্বামীর পায়ে একটা হাত রেখে সেই কথাটাই বলল, 'আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক বাক্যি যন্ত্রণা অনেক গাল-মন্দ করেছি—আমার পাপের শেষ নেই। তোমার কাছে আজ ঘাট মানছি, তুমি মাপ করো আমাকে।'

'পাপ! আমারই পাপের কি শেষ আছে বড়বৌ!' হঠাৎ যেন অভয়পদ তার কণ্ঠে খানিকটা জোর ফিরে পায়, 'তোমার ওপর ছেলেদের ওপর চিরদিন অবিচার করেছি। আমিই তাদের সংসারে এনেছি—অথচ কোনদিন মানুষ করার চেষ্টা করি নি—অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে বসে ছিলুম। কিন্তু অদৃষ্টের ওপর সে বিশ্বাসও তো ছিল না, সেও তো মিথ্যে—নইলে এত হাঁকড়-পাকড় করে অধম্ম করে পয়সা রোজগার করতে যাব কেন, আর তুমিই বা এমন করে সর্বস্ব খোয়াবে কেন? আমি ঠগ বড়বৌ, আমি চোর জোচ্চোর মিথ্যেবাদী! সকলকে ঠকিয়েছি—তোমাকে, ছেলেদের, জগৎ-সংসারকে ঠকিয়েছি—নিজেকেও ঠকিয়েছি সেইসঙ্গে চিরদিন। আমার অন্যায়ের সীমা-পরিসীমা নেই। পারো তো তুমিই আমাকে মাপ করো।'

জীবনে এত কথা তার স্বামী বোধহয় কোনদিন বলে নি তাকে, এমন নিনু হয়ে তো নয়ই। অত বড় শক্ত মানুষটার এই দুর্গতি দেখে আবারও চোখে জল এসে যায় মহাশ্বেতার। কথাগুলো সব বোঝে না সে—আকৃতি ও আকুলতাটা বোঝে।

অভয়পদরও অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। চোখ বুজে হাঁপাতে থাকে সে। সে হাঁপানোর ধরন দেখে—বিশেষত আজ সকাল থেকে যে ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়ছিল, তারপর এই ঘন ঘন সশব্দ নিঃশ্বাসে মহাশ্বেতার ভয় হয় বুঝি শ্বাসই উঠছে।

কিন্তু সে ভয় পেয়েছে তা চোখ বুজেও বুঝতে পারে অভয়পদ। অতি কষ্টে একটা আঙুল তুলে ওকে আশ্বস্ত করে। ইঙ্গিতে বুকটা দেখিয়ে দেয়। চিরদিন সমস্ত ভয়ে এই স্বামীই ওকে অভয় ও আশ্বাস দিয়ে এসেছে—আজও সে অভ্যাস যায় নি তার। এক সঙ্গে ভিড় করে সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের ইতিহাস মনের সামনে এসে দাঁড়ায় মহাশ্বেতার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উদ্গত অশ্রু দমন করে কাছে সরে আসে সে, আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।......

সত্যিই কঙ্কালসার হয়ে গেছে। হাড়-পাঁজরের খাঁজে যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে চামড়াটা। অমন বলিষ্ঠ মানুষটার এই পরিণতি! অভাগী রাক্ষসী সে, তার জন্যেই বোধ হয় এই হাল হ'ল। তারই দুর্বার লোভ—সেই লোভই তাকে পিশাচী করে তুলেছিল। অগ্র-পশ্চাৎ ভাল-মন্দ কিছু ভাবে নি সে, ছিন্নমস্তার মতো নিজেই নিজের রক্তপান করেছে—মনের আনন্দে নিজের মহাসর্বনাশের সৌধ রচনা করেছে।

আবারও দু-চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে চোখে। এবার আর দমনও করতে পারে না তা—শুধু প্রাণপণে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে শব্দটা নিবারণ করে।

খানিকটা পরে দুজনেই সামলে ওঠে একটু। মহাশ্বেতা প্রায় চুপি চুপি প্রশ্ন করে, 'প্রাচিত্তির করাবে একটা? ও বাড়ির মেজদি বলছিল—এ সময়, এ সময় নাকি করতে হয়।'

'না। প্রাচিত্তির অনেকদিন ধরেই হচ্ছে—তোমরা টের পাও নি। তুষানলে ধিকি-ধিকি পুড়লেও এর চেয়ে বেশী হ'ত না। ওসব লোক দেখানো প্রাচিত্তিরে আমার আর কি করবে?'

একটু পরে আবারও বলে, আরও চুপি চুপি, 'ভগবানকে নিত্য ডেকেছি, বলেছি যদি আমার প্রাচিত্তির শেষ হয়ে থাকে তো এবার আমাকে নিয়ে নাও। কারুর সেবা না আমাকে নিতে হয়—গুয়ে-মুতে না পড়ে থাকি। মনে হচ্ছে তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন এবার, প্রাচিত্তির শেষ হয়েছে।'

বিকেলে আবার অম্বিকাপদ কাছে এসে বসল। দুর্গাপদও। অম্বিকা চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল—দুর্গাপদ দাদার পায়ে হাত বুলোতে লাগল। অভয়পদ চোখ খোলে না, কিন্তু ওদের উপস্থিতি অজানা থাকে না, সেটা টের পায় ওরা।

মিনিট কতক পরে অম্বিকা বলে, কিছুই তো খাবে না বলছ, তা অন্য কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে যদি থাকে—'

এবার উত্তর দেয় অভয়। আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে কণ্ঠ, একটু যেন জড়িয়েও এসেছে। তবু বুঝতে পারে এরা। অভয় বলে, 'ইচ্ছে।......যা আছে তা আর মেটানো হয়ে উঠবে না। পারবে না তোমরা। বহুদিন থেকেই মনে ইচ্ছে ছিল, একবার আপিসের সেই জায়গাটা ঘুরে আসি।'

দুর্গাপদ বলে, 'কিন্তু সে আপিস তো সেখানে নেই দীর্ঘকাল। ভেঙেগ-চুরে সমতল হয়ে গেছে। সে তো অনেক দিন নেই বড়দা—'

'জানি।' শ্রান্তভাবে উত্তর দেয়, 'সেই জায়গাটা—।'

আর কিছু বলে না। সম্ভব নয়, তা এরাও বোঝে। তাই চুপ করে থাকে দুজনেই।

আরও খানিক পরে অম্বিকা বলে, 'আমাকে কিছু বলতে চাও। কোন ভার দিয়ে যাবে—?'

'না। তোমাকে জানি, তুমি যত দিন বাঁচবে বড়বৌ আর ছেলেদের তুমি দেখবে। তারপর—ওদের অদৃষ্ট। কোনদিনই ওদের কথা ভাবি নি, আজই বা নতুন করে ভাবতে বসব কেন?'

'আত্মীয়দের কাউকে দেখবে? খবর দেব?'

'না না।' এই অবস্থাতেও যেন চমকে ওঠে অভয়পদ, 'আমাকে চুপি চুপি যেতে দাও। শান্তিতে। কেউ না, কাউকেই দেখতে চাই না।'

এরপর যেন একেবারেই চুপ করে সে। দুর্গা কী সব প্রশ্ন করে, রাত্রে মহাশ্বেতা তড়িৎ সবাই এসে একটু দুধ খাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করে—কিন্তু অভয় আর কথা কয় না, মুখও খোলে না। একেবারে নিথর হয়ে পড়ে থাকে।

শেষরাত্রের দিকে শ্বাস ওঠার লক্ষণ টের পাওয়া যায়।

টের পায় প্রমীলাই প্রথম। সে-ই ছুটে গিয়ে অম্বিকাকে ডেকে আনে। ছেলে-দের ডেকে তোলে ঘুম থেকে। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায়—কেবল ক্ষীরোদা ছাড়া। তাঁকে কেউ এ খবর জানায়ও নি।

এবার সবাই মিলে ধরাধরি করে নামানো হয় বেঞ্চির ওপর থেকে। তেশুনো মরতে নেই। মাটিতে শোয়ানোই নিয়ম। সাবধানেই তোলে কিন্তু তাও বোধ হয় টের পায় অভয়পদ। কে একজন ঠাকুরঘর থেকে চরণ-তুলসী এনে কপালে বুকে রাখে। অম্বিকা কাছে বসে গীতা পাঠ করে। দুর্গা বুড়োকে বলে তারক-ব্রহ্ম নাম শোনাতে। পাশে দাঁড়িয়ে বলে বলে দেয় সে-ই। ধনা ফোঁটা ফোঁটা করে চরণামৃত দেয় মুখে।

একেবারে ভোরবেলা হঠাৎ যেন চোখের পাতা দুটো নড়ে একটু, ঠোঁটটাও ঈষৎ কাঁপতে থাকে। অম্বিকা হ্যারিকেনের আলোতেই তা লক্ষ্য করে। কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'কিছু বলবে দাদা? কাউকে কিছু বলতে চাও? বৌদিকে ডাকব?

'গায়ত্রী—গায়ত্রীটা ভুলে গেলুম যে। বেঁচে থাকতেই—'

খুব আস্তে আস্তে বলে, শোনাই যায় না এমন ক্ষীণ স্বরে। যে দু-তিনজন ঝুঁকে পড়েছিল মুখের ওপর, তারাই শুনতে পেল। তাও কথাটা শেষ হ'ল না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল—তেমনি হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল।

অম্বিকা জোরে জোরে গায়ত্রী মন্ত্র শোনাতে লাগল। শুনতে শুনতে সেই মৃত্যুপথযাত্রীর বিবর্ণ মুখও যেন উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। মনে হ'ল সে বুঝতে পারছে মন্ত্রটা, মনেও পড়েছে বোধ হয়। হয়ত নিজেও মনে মনে সে মন্ত্র উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে দু-তিন মিনিটের বেশী নয়। তারপরই মাথাটা একদিকে কাৎ হয়ে হেলে পড়ল, দু-একবার পড়ে যাওয়া বন্ধ ঠোঁট নড়ে ফু ফু করে শ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর সব স্থির হয়ে গেল।

কিছুই রইল না আর। কেবল প্রথম ঊষার ক্ষীণ আলোয় মনে হ'ল কিছু পূর্বের সেই প্রসন্ন দীপ্তিটা এখনও মুদিত দুই চোখের কোণে ও বন্ধ ওষ্ঠের রেখায় লেগে আছে। মৃত্যুর কালিমা সে প্রসন্নতা নষ্ট করতে পারে নি।......

ক্ষীরোদার ভাল ঘুম হয় না আজকাল, মাঝে মাঝে তন্দ্রার মতো আসে শুধু। তেমনিই একটা আচ্ছন্নতা এসেছিল ভোরের দিকে। অকস্মাৎ প্রবল কান্নার রোল কানে যেতে চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। বুকের মধ্যেটা আকুলি-বিকুলি করে উঠল ভয়ে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, নিচে নামতেও পারবেন না, শুধু সেইখানে বসেই অসহায় আকুল কণ্ঠে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'হ্যাঁরে—ওরে অ অম্বিকা, অ দুগ্গা!—ওরে অ ছেলেরা—এ কান্না কাদের বাড়ি উঠল রে। ওরে কে গেল রে এমন ভোরবেলা? আমার বাড়িতে কেউ গেল না তো? আমারই কোন সব্বনাশ হ'ল নাকি রে? আমার ছেলেগুলো আছে তো সব? আমার বড়ছেলে, আমার অভয় ভাল আছে তো রে?...ওরে তোরা কেউ আমাকে খবরটা দিয়ে যা না রে। আমি যে আর ভাবতে পারছি না।...ওরে অ ছেলেরা, বুড়ো, হাবলা, তোরা একটিবার কেউ আয় না রে—'

কাউকে দেখা যায় না, কোন সংবাদই পান না তিনি। অথর্ব বৃদ্ধার ব্যাকুল আহ্বানে কেউ ছুটে এসে ওপরে আসে না। সম্ভবত শুনতেও পায় না কেউ। তাঁর *আর্ত আহ্বান ও কাতর প্রশ্ন শূন্য ঘরের চারটে দেওয়ালে ব্যর্থ মাথা কুটে যেন তাঁর* কাছেই ফিরে আসে আবার। ক্রমশ খুঁৎ-খুঁৎ করে কাঁদতে শুরু করেন তিনিও। কাঁদেন নিজের জন্যেই। সবাই তাঁকে অযত্ন অবহেলা অগ্রাহ্য করছে—সেইজন্যে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন একটু পরে। শ্রান্তি থেকেই আচ্ছন্ন ভাবটা আসে আবার, একটু তন্দ্রার মতো বোধ হয়—ঘুমিয়েই পড়েন শেষ পর্যন্ত।

নিচের কান্নার রোলও তখন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। ক্ষীরোদার ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

শ্যামা ঠাকরুন কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখতে পারেন। বেশীদূরে যেতে হবে না—কলকাতার কাছেই, খুবই কাছে থাকেন তিনি। বি-এন-আর দিয়ে গেলে হাওড়া থেকে আট ন মাইলের মধ্যেই। বাসেও যেতে পারেন—বার-দুই বাস বদল করতে হবে, এই যা।

সে বাড়িও তাঁর তেমনি আছে। একটুও বদলায় নি। বাইরের জগতে কত কি পরিবর্তন হ'ল, কত এগিয়ে গেল দেশ, জাতি; চারিদিকে উন্নতির, নতুন ক'রে গঠনের কত আয়োজন, চারিদিকে কর্মব্যস্ততা—নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা। নতুন কল্পনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু সেসব কোন হাওয়াই সে বাড়ির সেই ঘন গাছগাছালিতে পূর্ণ অন্ধকার প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারে না। হাওয়াই ঢোকে না। সমস্ত উঠানটা আম কাঁঠাল পেঁপে গাছে এমন জড়াজড়ি আর সেই গাছে-গাছে এমন বিভিন্ন রকমের লতা যে, দিনের বেলা সামান্য আলো যদি বা তার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে নিচে নামে—হাওয়া একদম আসে না। অথচ হাওয়ার অভাব নেই, এ বাড়ির বাইরে গেলেই হয়ত এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আপনি পাবেন। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন ঝড়ের মতো দক্ষিণা বাতাস বইতে থাকে তখনও সে হাওয়া এই গাছপাতাগুলোর মাথার ওপর দিয়ে, তাদের মাথার ওপরের পত্র-পল্লব কাঁপিয়ে নুইয়ে চলে যায় কিন্তু নিচের ঘর্মাক্ত মানুষের শ্রান্তি দূর করতে তার এতটুকু আভাস পর্যন্ত মেলে না।

সে বাড়ি খুঁজে বার করতেও আপনার অসুবিধা হবে না। স্টেশন থেকে এগিয়ে সরস্বতীর পুল পার হয়ে রাজবাড়ি বাজার ছাড়িয়ে সিদ্ধেশ্বরীতলা ডাইনে রেখে আরও একটু যদি হাঁটতে পারেন, মাত্র রশিদুই পথ—তাহলেই দেখতে পাবেন—তিনদিকে গভীর পগার বা খানায় ঘেরা দ্বীপের মতো বাড়িটি একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তবে খুব চট করে দেখতে পাবেনও না। নিবিড় বাঁশঝাড়ে আর তেপলতের ঘন বেড়ায় আড়াল করে রাখবে আপনার দৃষ্টি; আরও বহু গাছপালা—কলাঝাড়ে ডুমুর গাছে হাসনুহানায়-যেন নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছে সামনের দিকটায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে ঠাওর পাবেন একটা বেড়া, বেড়ার গায়ে ছোট্ট একটু আগড়। আগড় ঠেলে পায়ে-চলা সরু পথের রেখা ধরে বেশ খানিকটা ভেতরে এগিয়ে গেলে বাড়িটা দেখতে পাবেন ভাল করে। সামনের দিকে ছোট পুকুরও আছে একটা, তার পাড়ে পাড়ে নারকেল-সুপুরি-আমড়া তেঁতুলের অসংখ্য গাছ থাকা সত্ত্বেও তবু সেইখানটাই একটু ফাঁকা। বাড়িটা যে আদৌ দেখা যায়—তার কারণ ঐটুকু খোলা জায়গার আলো। তা নইলে বাড়ির ভেতর বার সবটাই প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

এসব গাছপালা শ্যামাই লাগিয়েছেন। এত ঘন গাছপালায় ফল ফসল হয় না তা তিনিও জানেন—খনার বচন তিনিই শোনান কতজনকে, 'গাছ-গাছালি ঘন সবে না, গাছ হবে তার ফল হবে না।' তবু কোনটাই প্রাণ ধরে ফেলে দিতে পারেন না। বরং এখনও পুঁতে চলেছেন এটা-ওটা। কেউ বলতে এলে বলেন, 'থাক থাক। খেতে দিতে তো হচ্ছে না।...আমার বরাতে ফলের ভোগ নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছ। নইলে নিজের অতগুলো থাকতে—! আমার অদৃষ্টই নিষ্ফলা। মাঝখান থেকে ওদের দুষি কেন?...আর কাটো বললেই কি কাটা যায়—? বলে বাড়ির গাছা আর কোলের বাছা দুই-ই সমান।'

কিন্তু নিজেও এক এক সময় ধৈর্য রাখতে পারেন না। বিশেষ যখন পরের বাড়ি কোথাও গিয়ে দেখে আসেন লাউমাচায় বড় বড় লাউ...উঠানে হয়ত মুদঙ্গের মতো কুমড়ো, কিম্বা মোটামোটা কালীবৌ কলার কাঁদি বা গাছ ভর্তি কাঁঠাল-আম—তখন বাড়িতে এসে অবশিষ্ট কটা দাঁত কিড়মিড় করে গালাগাল দেন অকৃতজ্ঞ গাছগুলোকে, 'মরণ তোদের, মরণ! মরণ! পোড়াকপাল হ'লে কি গাছপালাও পিছনে লাগে রে! কেন আমি কি করেছি তোদের? ঐসব চোখখাকী গতরখাকীদের বাড়ি গিয়ে ফসল ঢেলে দিয়ে আসতে পারো—আমাকে একটা দিতেই বুক চড়চড় করে? আমার বেলাই সব আগুন লেগে পুড়ে যায়, ছাতার ধোয়ায় ধুয়ে যায়?'

গাছপালার সেই প্রায় দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করে যদি বাড়িটাতে আপনার নজর চলে তো দেখবেন, বাড়িটা নেহাৎ ছোটও নয়। বাইরের দিকে বৈঠকখানা ঘর আছে, তার রক আছে। ভেতরে দুটো ঘর-দালান—এছাড়া মাটির বড় রান্নাঘর, তার প্রশস্ত দাওয়া এবং বেশ খানিকটা উঠোন নিয়ে পাঁচিলঘেরা মুল বসত-বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বাগান—যে করেছিল তার রুচিবোধ আছে। কিন্তু সে বাড়ির আসল চেহারাটা আজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঘন ছায়ার আস্তরণে যেন ঢাকা পড়ে আছে সবটা, দুপুর বেলা ছাড়া সবটা নজরে পড়াই কঠিন। কখনই রোদ নামে না বলে বাড়িটা কেমন স্যাঁতসেঁতে ভিজে-ভিজেও লাগে বারো মাস। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ছাড়ে। ভিজে ভিজে হওয়ার আরও কারণ তিনদিকে গভীর খানা বা পগার। এ পগার একেবারে কখনই শুকোয় না, গ্রামের অন্য সব পগার শুকিয়ে খট্‌খট করে যখন তখনও এ-খানাটায় সামান্য জল থাকে। তার ফলে ভাম-ভোঁদড় গো-হাড়গেলের স্থায়ী আড্ডা এখানে। বর্ষাকালে পগারের জল উপ্‌চে বাগানে ওঠে। ময়লা নোংরা জল, ঘেন্না হয় সে জলে পা দিতে। তবু শ্যামা তাতে এক সান্ত্বনার সূত্রও আবিষ্কার করেছেন। সে জলের সঙ্গে কিছু কিছু মাছ এসে তাঁর পুকুরে পড়ে—বাগানে বা উঠানে চুপড়ি চাপা দিয়ে ধরাও যায় কিছু কিছু। তিনি খান না, খাবার লোকও কেউ নেই আর, কিন্তু পাড়া-ঘরে বিক্রী করে দুচারটে পয়সা পাওয়া যায়, সেইটেই লাভ।

সাধারণ হিসেবে বাড়িটা বড়ই—তবু তাতে তিলধারণের স্থান নেই। না, ফার্নি-চারে বোঝাই নয়, দালান দাওয়া রক রান্নাঘর, এমন কি শোবার ঘরেও কিছুটা অংশ বোঝাই হয়ে গেছে শুকনো পাতায়। খ্যাংরাকাঠি চেঁচে বার করে নেওয়া নারকেল পাতা তো আছেই—তাছাড়াও আছে অসংখ্য গাছের অসংখ্য শুকনো পাতা ও পালা, আমড়া পাতা, বাঁশ পাতা, সুপুরি পাতা, সুপুরির বেল্‌দো, বাঁশের গোড়া, কঞ্চি। সারাদিনই ঘুরে ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করেন তিনি—একটি একটি করে পাতা কুড়িয়ে বেড়ান—সংগ্রহ করেই চলেছেন। কার জন্যে এখনও তাঁর এই কষ্টস্বীকার উঞ্ছবৃত্তি তা তিনিও জানেন না। তাঁর যা সামান্য রান্না-খাওয়া তাতে বর্তমান সঞ্চয়েই অন্তত বিশ বছর চলবার কথা। আরও অতদিন তিনি বাঁচবেন না এটা ঠিক। তবু সে পাতা জমিয়েই যাচ্ছেন, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। কেউ অনুযোগ করলে কি ঠাট্টা করলে চটে যান। বলেন, 'থাক না বাছা, পাতায় নজর দাও কেন? কেউ কি আমাকে দরকারের সময় এক মণ কাঠ কি কয়লা দিয়ে উগ্‌গার করবে? ওতে আমার সম্বচ্ছরের জ্বালানির খরচা বেঁচে যায়। আর খাওয়াতে পরাতে তো হচ্ছে না ওদের—উল্‌টে ওরাই আমার সুসার করছে সংসারে!...পাতার জন্যে আট্‌কাচ্ছেই বা কার কি? কারুর কি থাকার অসুবিধে হচ্ছে?'

তা হচ্ছে না। কারণ কেউই নেই এ-বাড়িতে। অচির ভবিষ্যতে কেউ আসবে

সে সম্ভাবনাও নেই। এই আড়াই বিঘের ওপর এত বড় বাড়িতে তিনি একাই থাকেন। অথচ থাকবার মতো লোকের অভাব নেই তাঁর। বলতে গেলে হাটের ফিরিঙ্গি তাঁর চারিদিকে। মরে হেজে গিয়েও তিন ছেলে তিন মেয়ে ছিল। একটা ছেলে হারিয়ে গেছে আরও দুটো ছেলে বর্তমান। রোজগারও করে তারা। বিয়ে-থা করেছে, ছেলেমেয়েও আছে। মেয়েও আছে দুটো—তাদের ছেলেমেয়ে! নাতি-নাত্নীদেরও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। জাজ্জ্বল্যমান সংসার। তবু কেউই নেই আজ তাঁর কাছে। ...সন্তান বলতে এখন এইসব গাছপালা, শুকনো পাতা আর টাকার সুদ। চোখে দেখতে পান না, চলেন ভুঁয়ে-মুয়ে হয়ে—কোমর ভেঙ্গে গেছে বহুদিনই—তবু পাতা জমানোরও যেমন বিরাম নেই, তেমনি টাকা জমানোরও না। তেজারতি কারবার ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটি-বাটি রেখে চার আনা আট আনা পয়সা থেকে শুরু করে গহনা-বন্ধক রেখে বিশ পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকাও ধার দেন। সুদও নেন চড়া। চোখে দেখতে পান না বলে কত লোক ঠকিয়ে যায়—আজকাল হিসেব করতেও কেমন গোল-মাল হয়ে যায়, সেটা যে বোঝেন না তাও নয়—তবু ছাড়তেও পারেন না কারবার। প্রবল নেশার মতোই ওটা তাঁকে পেয়ে বসে আছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জিনিসটা কি অনুভব করে দেখে নেন—তেমনি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সিকি আধুলি টাকা বার করে দেন। আর প্রয়োজন হলে সেই ভুঁয়ে-মুয়ে হয়ে হেঁটেই সুদ আদায় করে বেড়ান। হেঁটে যান হেঁটে আসেন—শিবপুর থেকে পোদড়া শালিমার পর্যন্ত।

তবে আজকাল আর যেতে পারেন না। শক্তিসামর্থ্যের অভাব বলে নয়—বাড়িতে রেখে যাবেন এমন লোক নেই বলে। অথচ—ছিল নয়, আজও আছে সবাই। বড় ছেলে-বৌ থাকে জামালপুরে, ওরা নাকি সেখানে খাপরার বাড়ি তুলে নিয়েছে, সেখা-নেই থাকবে। শুধু তাঁর কাছে থাকতে হবে বলেই আসবে না এখানে। ছোট ছেলে বাড়ি-ঘর কিছুই করতে পারে নি, টালিগঞ্জের দিকে কোথায় যেন খোলার ঘর ভাড়া করে থাকে। কালা-হাবা মানুষ, সামান্য আয়—এই বাজারে ঘর-ভাড়া দিয়ে অতি-কষ্টে দিন কাটে—তবু এখানের এই নিজেদের পাকা বাড়িও পছন্দ নয়।

বিধবা মেয়ে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তার যা স্বভাব, সে মেয়ের আর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না শ্যামার। বড় মেয়েই যা ন-মাসে ছ-মাসে আসে এক-আধদিন—মায়ের খবর নিয়ে যায়। তবে তারও বৃহৎ সংসার, ফেলে এসে ওঁকে আগলাবে তা সম্ভব নয়।

এ-সব ছাড়াও কিন্তু ছিল একজন।

বলাইটাই ছিল। সে কোনদিন কোথাও যেতে পারবে না—এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি, পাখীর পাখ্না কাটা গেছে, ওড়বার পথ বন্ধ হয়েছে মনে করেছিলেন। সেই ভাবেই জন্তুর মতো করে রেখেছিলেন তাকে। লেখাপড়া শেখে নি—ভদ্রসমাজে বেরিয়েও কারও সঙ্গে কথা কইতে পারত না। দিনরাত ঘরের কোণে মুখ বুজে বসে থাকত। তবু সেও রইল না। নিজের দোষেই তাকে হারালেন শ্যামা, নিজের বুদ্ধির দোষে। শেষবারের মতো শখ হয়েছিল তাঁর আবার সংসার পাতবার। শেষ শখ জেগেছিল পরের মেয়ের সেবা খাবার। সেই শখেই সব গেল—বেনোজল এসে ঘোরো জল বার করে নিয়ে গেল—মুলে-হাভাত হ'ল। মুখে আগুন তাঁর ইচ্ছে করে নিজের মুখে নিজে নুড়ো জেবলে দিতে! লজ্জা-ঘেন্না নেই—তাই আবার ঐ ছেঁড়া-চুলে খোঁপা বাঁধতে গিয়েছিলেন। সারাজীবন ধরে দেখেও চৈতন্য হ'ল না—নিজের ভাগ্য বুঝতে পারলেন না তিনি—আশ্চর্য!...বলে, 'এত সুখ তোর কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে!' কোন্ লজ্জায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করতে গেলেন তিনি!

বলাই চলে যাওয়ার পর থেকে শ্যামা একাই আছেন। একেবারে নিঃসঙ্গ একক। ভালই আছেন। যারা আসে তাঁর কাছে—অধিকাংশই খাতক—তাদেরও তাই বলেন, 'বেশ আছি আমি, বেশ থাকি একলা একলা। লোক থাকলেও আমার কোন উপকার হবে না এ আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। তবে আর কেন? বরঞ্চ থাকলেই দায়, এ আমি ইচ্ছে হ'লে খাচ্ছি না হয় তো এক ঘটি জল খেয়ে পড়ে থাকছি, অপর কারুর ভাবনা তো ভাবতে হচ্ছে না।'

'তবুও', খাতকরা কর্তব্যবোধে উদ্বেগ প্রকাশ করে হয়ত, 'মানুষের শরীর, বলা তো যায় না। রাত-বিরেতে যদি অসুখ-টসুখ হয়ে পড়ে—'

কথা শেস করতে দেন না শ্যামা 'কী আব হবে তাতে, মরে পড়ে থাকব, এই তো! সে যদি কপালে লেখা থাকে তো ঘুচবে না, লোক থাক আর না-ই থাক। খবর পাবেই ঠিক—বিষয়ের দখল নিতেও অন্তত পচা-মড়াটা বার করতে হবে।...মরবার পর লাশটা কি হবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই!'

না, একাই বেশ আছেন। বেশ থাকেন তিনি। উনআশি বছর বয়স চলছে, রোগে ও অনাহারে শীর্ণ শরীর, সামনে ঝুঁকে পড়তে পড়তে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে মুখটা। কোমর ভেঙ্গে গেছে অনেকদিন, যদিচ দাঁত এখনও সব পড়ে নি। একটু চললেই কোমর পিঠে যন্ত্রণা হয়, খুব কষ্ট হয় যখন মধ্যে মধ্যে একবার কোমরের পিছনে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। সবটা সোজা হয় না, কেমন একটা অদ্ভুত ত্রিভঙ্গ আকার ধারণ করে।

তবু সেই অবস্থাতেই সারাদিন বাগানে ঘুরে বেড়ান প্রেতিনীর মতো। কোথায় এখনও একটা গাছ পোঁতবার মতো আট আঙুল জায়গা খালি আছে—আর কোথায় আছে জ্বালবার মতো একটি শুকনো পাতা—তারই সন্ধানে। অবশ্য দিনের আলো বড় কম। চারটে বাজলেই এ বাড়িতে আলো জ্বালবার প্রয়োজন হয়। মশার গর্জন শুরু হয়ে যায় কোণে কোণে—সেই ভয়াবহ ঝুপ্সি অন্ধকার বাড়িতে একা চুপ ক'রে বসে থাকতে হয় তখন। রাত্রিটাই বড় দুঃসহ। ঘুম হয় না তাঁর আজকাল। কোনদিন এক ঘণ্টা, কোনদিন দু' ঘণ্টা কোন দিন আদৌ চোখ বুজতে পারেন না। তেল খরচার ভয়ে আলোও জ্বালেন না, মনকে বোঝান—'চোখে যখন দেখতে পাই নে তখন আলো জ্বাললেই বা কি না জ্বাললেই বা!' দিনের আহার সারতেই বেলা তিনটে বাজে, রাত্রে খাওয়ার প্রয়োজনই হয় না। যদি বা কোনদিন ইচ্ছা হয়, গভীর রাতে উঠে হাতড়ে হাতড়ে টিনের কৌটো থেকে চালভাজা বার করে অন্ধকারেই তাতে একটু তেলহাত বুলিয়ে নিয়ে আরও গভীর রাত পর্যন্ত বসে বসে কুড়-কুড় ক'রে চিবিয়ে খান। আর হয়ত নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবেন বসে বসে।

এই রাতের বেলাটা একটু ভয় ভয়ও করে আজকাল। আরও সেই জন্যে ঘুম আসে না হয়ত। না, প্রাণের ভয়, অসুখের ভয় নয়। অশরীরী কোন প্রাণীর ভয়ও না। ভয় মানুষের, চোর-ডাকাতের। অবশ্য তার জন্যে সতর্কতারও ত্রুটি নেই। ছাদের কড়ি ও বরগার খাঁজে, রান্নাঘরের মেজে খুঁড়ে—বন্ধকী গহনা ও টাকা লুকিয়ে রাখেন তিনি। দুপুরবেলা রান্নাখাওয়ার সময় দোর বন্ধ ক'রে মেজে খোঁড়েন, আবার বসে বসে গোবর-মাটি দিয়ে বার বার নিকিয়ে সে খোঁড়ার চিহ্ন বিলুপ্ত করেন। যতক্ষণ না নিজেই ভুলে যান কোথায় রেখেছেন—ততক্ষণ নিকিয়েই যান।.....

তবু কাউকেই ডাকেন না তিনি। কাউকে অনুরোধ করেন না কাছে এসে থাকতে। দিনের পর দিন এমনি নিঃসঙ্গ কাটে তাঁর। একা একা বাগানে ঘুরে বেড়ান আর কোমর ছাড়াবার জন্যে মধ্যে মধ্যে বেঁকে-চুরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার

চেষ্টা করেন। শূন্য বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। হঠাৎ একটা উড়ো-কাক জোরে ডেকে উঠলেও চমকে ওঠেন শ্যামা। এমনিই নিঃসঙ্গে দিন কাটে তাঁর—এমনিই সর্বপ্রকার শব্দে অনভ্যস্ত হয়ে গেছেন তিনি।

আজকাল অন্ধকার হবার পরও ঘুরে বেড়ান অনেকক্ষণ পর্যন্ত। রাজগঞ্জের কলে পাঁচটার ভোঁ না বাজলে ঘরে ঢোকেন না। ঘুরে বেড়ান আর হিসেব করেন মনে মনে, তাঁর ছেলে-মেয়েদের সব ধরলে একুশটা নাতি-নাতনী। আর হিসেব করেন, কার কাছে কত সুদ বাকী আছে, সুদে আসলে কার কোন্ বন্ধকী জিনিসের দাম ছাড়িয়ে গেছেঃ 'এবার পাকড়াশী-গিন্নী এলে পষ্ট বলব, না দিতে পারো এলে দিয়ে যাও, আমি আর বসে থাকতে পারব না। এখন বেচলেও আমার ঢের পাওনা থাকবে, সে যা দেবে তুমি তা ঢের বুঝেছি, মিছিমিছি গরীব বিধবার লোকসান করো কেন?' নিজের মনেই মহড়া দেন কথাটার—হাত-পা নেড়ে।

বলাইয়ের খবর তিনি রাখেন না। শুনেছেন যে সে তাঁর উপদেশই শুনেছে, সত্যিই ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে। তা থাক। কে কি করছে না করছে তা জেনে তাঁর দরকার নেই। কাউকেই দরকার নেই আর।

বেশ আছেন তিনি। একাই ভাল আছেন।

—সমাপ্ত—